ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

রজত জয়ন্তী বর্ষ

(২৫শ বর্ষ)

১৩৫৯

সম্পাদক :

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

ফোন্ নং সাউথ ৩১৮১

বার্ষিক মূল্য ৪৲ প্রতি সংখ্যা ।৵০ ষাণ্মাসিক ২।০

সূচীপত্র

২৫শ বর্ষ (বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৫৯)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অছিপুরের বাগানে (ভ্রমণ)	শ্রীসুমিত্রা চক্রবর্ত্তী	৩৩৭
অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র (জীবন-কথা)	শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ, বি.এল	৯০
অবিশ্বাস্য (গল্প)	শ্রীকমলা দত্ত, বি.এ, বি.টি	৪৮০
আফ্রিকার চিঠি (ভ্রমণ)	শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ	১৬৭, ১৮৮
আমাদের লক্ষ্য (কবিতা)	শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ	৩৯৮
আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ		৫৪, ৯৯, ১৩৯, ১৮৩, ২২৪, ২৮২, ৩২৫, ৩৬৭, ৪০৭, ৪৪৭, ৪৮৬, ৫৩৭
আমার কাকা (গল্প)	শ্রীকৌটিল্য	৪৬
আমার বন্ধু মন্মথকুমার (জীবনী)	৺অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি. এস্-সি.	২০০
আলাপ (কবিতা)	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৭
আল্‌পস্-এর আশেপাশে তিন দিন (ভ্রমণ)	অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ	৫
উদয়তিথি (কবিতা)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	৩১
একখানি চিঠি	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	৪৭৪
এক দুর্য্যোগের রাতে (গল্প)	শ্রীকৌটিল্য	১৩৬
এবারের অলিম্পিক (খেলাধুলা)	...	২১০
এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেস	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	৪১৯
এসো ফিরে (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৪১১
কলকাতায় শিশু-উৎসব	শ্রীকৌটিল্য	৪৬০
কলস্বর (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	১১
কাগজ (কবিতা)	শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য	২১৫
কার দোষ (গল্প)	শ্রীরেণুকা দেবী	৩৮৩
কার্ত্তিক (কবিতা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৩৬৫
কেবল-হাসির দেশে (নাটিকা)	শ্রীপ্রভাত বসু	২৩৯
খোকন বীরের কাহিনী (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	২১৪
গয়াসুরের উপাখ্যান (পুরাণের গল্প)	শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী	৪১৫
গাঁজাখুরী গল্প (গল্প)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	২৪
চল (কবিতা)	শ্রীমানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬৬
চল যাই মিশর (দেশ-বিদেশ)	শ্রীগৌরী দেবী	২৬৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চাঁপা ফোটার দিন (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২
চিঠিপত্র		৫০, ৯৭, ১৪১, ১৮২, ২২২, ২৮০, ৩২৩, ৩৬৯, ৪০৬, ৪৮৫, ৫৩৫
চুটকী (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৩৯৯
চৈত্র (ঐ)	শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯১
ছড়া	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৭৮
ছড়া ও ছন্দ	শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়	৩০৭
ছুটীতে গোপালপুর (ভ্রমণ)	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ	২৮৯
ছোট্ট মেয়ে মিণ্টু রাণী (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	১৩০
জগন্নাথ (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	৪৩০
জগন্মাতা (কবিতা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	২৪৩
জননী এসেছে দ্বারে (কবিতা)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	২৪৪
জলশূর ব্রাহ্মণ (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	২৪৫
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য (উপন্যাস)	শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী	২৬, ৭৯, ১২৩, ১৫৭, ২০৪, ২৯৩
ঝগড়াটে পড়ুয়া (নাটিকা)	শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়	৩৫৯, ৪০৩, ৪৭৮, ৪৯২
ডাক্তার বাবু (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	১৫১
ডায়রি (গল্প)	শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ	৮৭
তেইশে জানুয়ারী (কবিতা)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	৪৪৩
দক্ষিণেশ্বর (ভ্রমণ)	শ্রীগৌরী দেবী	৩৪
দাঁত (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	৩৫২
দেবতার বর (গল্প)	শ্রীশান্তা দেবী	২৭৪
ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর		৫৬, ১০০, ১৪৩, ১৮৫, ২২৬, ২৮৪, ৩২৬, ৩৬৮, ৪০৮, ৪৪৮, ৪৮৮, ৫৩৮
নতুন খেলা (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৭
নতুন বই	...	৯৮, ১৮১, ২৭০
নয়া কসরৎ (কবিতা)	শ্রীনীলরতন দাশ	১৭৪
নাকের গল্প (বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২৭১
নামে কি হয় (গল্প)	শ্রীরেণুকা দেবী	১৭১
নিগ্রো উপকথা (গল্প)	শ্রীসুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৮
নিত্যকার জীবনে বিজ্ঞান (বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৫২
নিদারুণ এগ জামিন	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্	১৯৩
নেতাজী তোমারে চাই (কবিতা)	সৈয়দ হোসেন হালিম	৩৭৭
পতিঘাতিনী সতী (ইতিহাস)	শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র ব্রহ্মচারী	৫২৩
পরলোকে অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র	...	৫১
পঁচিশে বৈশাখ (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এ	৩০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পাটেল-বৌএর দস্যি মেয়ে (গল্প)	শ্রীশামুক	২৩৫
পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৫১
পাঁচমিশেলী	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি	৩৬, ১৩২, ১৭৭, ২১৫, ২৬১, ৩৬৩, ৪৩৭, ৫২৯
পিঠে-ইতিহাস (গল্প)	শ্রীকাত্তিক মজুমদার	২৫০
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা		৫৬, ১০১, ১৪৩, ১৮৫, ২২৭. ২৮৫, ৩২৭, ৩৬৯, ৪০৯, ৪৪৯, ৪৮৯, ৫৩৮
পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল		৪৫, ১০০, ১৩৫, ২২৭, ২৮১. ৩২২, ৩৬৬, ৪০৮, ৪৪৮, ৪৮৭, ৫৩৩
প্রকৃতির খেয়াল		৬৮
প্রতিশোধ (গল্প)	শ্রীসুবোধ বসু, এম্.এ, বি. এল্	২৫৩
প্রায়শ্চিত্ত (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এ	৩০৯
বকধার্মিক (উপন্যাস)	শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ	৩৩৪, ৩৮০, ৪১৭, ৪৬৬, ৫০৬
বরষায় (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. ঐ	১৩০
বর্ষার কবিতা (ঐ)	শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত	১৭৫
বল তো		২৩, ২২৫, ৪৩৬
বাদলা বেলার চিঠি (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৯
বারেক থামাও নাও (ঐ)	শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিক	৭৭
বিচার (গল্প)	শ্রীকৌটিল্য	২১৮
বিচিত্র ভারত		৫১৪
বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা	শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী	৪০
বিশ্বাস (গল্প)	শ্রীরেণুকা দেবী	১২৬
বিষে বিষক্ষয় (ঐ)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি. এস্-সি	৫১০
বিসর্জন	জনৈক পুরবাসী	১৬, ৫৮, ১০৪
বীজ (গল্প)	শ্রীরেণুকা দেবী	২৪৬
বীণাপাণি (কবিতা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৪৪২
বেলুন ওড়ানোর গল্প (বিজ্ঞান)	শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত	৩০৩
বোধন (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২২৯
ভাগবতের গল্প	শ্রীজয়দেব রায়, এম্.এ, বি. কম্	৬১
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক (গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা)		৪৩, ৯৮, ১৭৬, ২২১, ৩.১, ৪৮৩ ৫৩৩
ভারত-পাকিস্তান শেষ টেষ্ট	শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়	৩৯৫
ভৌতিক সিন্দুক (বড় গল্প)	শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ	২৯৯, ৩৪০, ৩৭৩, ৪১২, ৪৭৫
মণিমঞ্জুষা		২৭৯, ৫৩৪
মধুর চাষ	শ্রীদ্বিজেন মল্লিক	২৩০
মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা		৫৩৮
মহাকাব্যের গল্প	শ্রীজয়দেব রায়, এম্.এ, বি. কম্	৩৭৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মহাকালের পূজারী (উপন্যাস)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৭৩, ১১৫, ১৬০, ২০৭, ২৯৬, ৩৪৮, ৩৮৭, ৪২২, ৪৫২, ৪৯৭
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৭১
মিণ্ট রাণীর ডায়রি থেকে (ঐ)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৩২৯
মৃত্যু যখন ঘুমিয়ে থাকে	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	৪৫৬
মোর ঘরেতে (নাটিকা)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৬৪
মৌমাছির কথা (বিজ্ঞান)	শ্রীদ্বিজেন মল্লিক	৩৩০
যাত্রায় অযাত্রা (গল্প)	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহু, এম্.এ, বি.টি, কাব্যপুরাণতীর্থ	৪০০
যাঁদের লেখা তোমরা পড়	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৪৭, ৩১৩, ৩৪২, ৩৯০, ৪২৫, ৪৬৯, ৫০১
রজত জয়ন্তী (কবিতা)	বন্দে আলি মিয়া	৫৭
রামধনুর রজত জয়ন্তী (শুভেচ্ছা-বাণী)		১
রাশিয়ার নেতা ষ্ট্যালিন (জীবন-কথা)	শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ. বি.এল্	৫২৬
রাসায়নিক ভূত (বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্. এস্-সি	১১২
রোগ দু' রকম	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৫১৫
লাঙ্গুল-সংবাদ (ব্যঙ্গচিত্র)	শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য	২৪২
শরতের হাঁস (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	২৪৪
শিশুসাহিত্য-সংবাদ		৪৪৬
শেষ পাতা (গল্প)	শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ	১৯৬
শ্যামসুন্দর (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১০৩
ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন যাঁর আবিষ্কার (বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৪৪৩
সব নয় ছয় (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	২৫৬
সমাধান (ঐ)	শ্রীরেণুকা দেবী	৩১৮
সমুদ্রে যারা পাহারা দেয়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৮২
সাজের ঘটা		৭২
সাত ঘোড়া রথ চলে সূর্য্যের (কবিতা)	শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী	৩৩
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর		৪০, ২৮১
সোনার বালুচরে (উপন্যাস)	শ্রীঅশোক সেন, এম্. এ	২০, ৬৯, ১২০, ১৬৩, ১৯১
স্বাগত (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	৭৮
হকি খেলার গল্প (খেলাধুলা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র, বি.এ, সাহিত্যভারতী	৪৯৫
হা' ঘরে (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৪৫
হাসিখুসি	শ্রীবিনতা মজুমদার	২৮৩

অভ্যুদয়ের বই

পড়বার মত এবং উপহার দেবার মত

অনুবাদ

দি আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো
—এইচ. জি ওয়েলস্ (২য় সংস্করণ) ২৲
দি ইনভিজিবল ম্যান
—এইচ. জি ওয়েলস্ ১॥০
দি ওয়ার অব দি ওয়ার্লডস্
—এইচ. জি ওয়েলস্ ২৲
এইচ. জি ওয়েলসের গল্প—সম্পাদক
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২৸০
দি কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড—ব্যাল্যাণ্টাইন
(২য় সংস্করণ) ১।০
দি গরিলা হাণ্টার্স—ব্যাল্যাণ্টাইন ১।০
দি ডগ ক্রুসো—ব্যাল্যাণ্টাইন ১৲
হোয়াইট ফ্যাঙ—জ্যাক লণ্ডন ২৲
নিকলাস নিক্‌ল্‌বি—চার্লস ডিকেন্স ১৲
দি ব্ল্যাক টিউলিপ
—এ্যালেকজাণ্ডার ডুমা ১॥০
মাষ্টারম্যান রেডি
—ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট ১৲
দি চিলড্রেন অব দি নিউ ফরেষ্ট
—ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট ১।০
দি চ্যানিংস—মিসেস হেনরি উড ১॥০
অথই জলের রূপকথা—চার্লস কিংসলে
('দি ওয়াটার বেবীজ'এর অনুবাদ) ১॥০
দি ইলিয়াড—হোমার ১৲

অন্যান্য

রুণুটুনুর এ্যাডভেঞ্চার
—হেমেন্দ্রকুমার রায় ১৸০
বিশালগড়ের দুঃশাসন
—হেমেন্দ্রকুমার রায় ২৲
অদৃশ্য কালো হাত—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
(২য় সংস্করণ) ১৲
ময়ূরকণ্ঠী বন—সুকুমার দে সরকার ২৲
২৪শে এপ্রিল চুপ
—সুকুমার দে সরকার ১৲
নিশাচর—সুকুমার দে সরকার ১৲
ভ্যাম্পায়ার—মণিলাল অধিকারী ১৲
রক্তাভ-বুদ্ধ—মণিলাল অধিকারী ১।০
আমার ভালুক শিকার
—শিবরাম চক্রবর্ত্তী ১॥০
রক্তপিপাসু—রবি সেন ১৲
যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত
রঙীন হাসি—সুনির্ম্মল বসু (ছড়া) ॥০
খোকখুকুর আসর—মণিলাল অধিকারী
(গল্প) ।৵০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
২৪বি লেক রোড, কলিকাতা-২৯
বিক্রয়কেন্দ্র—৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

সলোমন এণ্ড কোং

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড (মোহতা হাউস) কলিকাতা-১

নানা প্রকার ডিজেল—কেরোসিন—পেট্রোল-
ইঞ্জিন, হ্যাণ্ড ও পাওয়ার-পাম্প—গ্যালভানাইজ্‌ড
টিউব প্রভৃতি আমদানী ও প্রস্তুতকারক।

সোল প্রোপ্রাইটার : **নৃপেন ভট্টাচার্য্য**

GRAM : 'AGRASTONS' • • • PHONE : BANK 4497

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

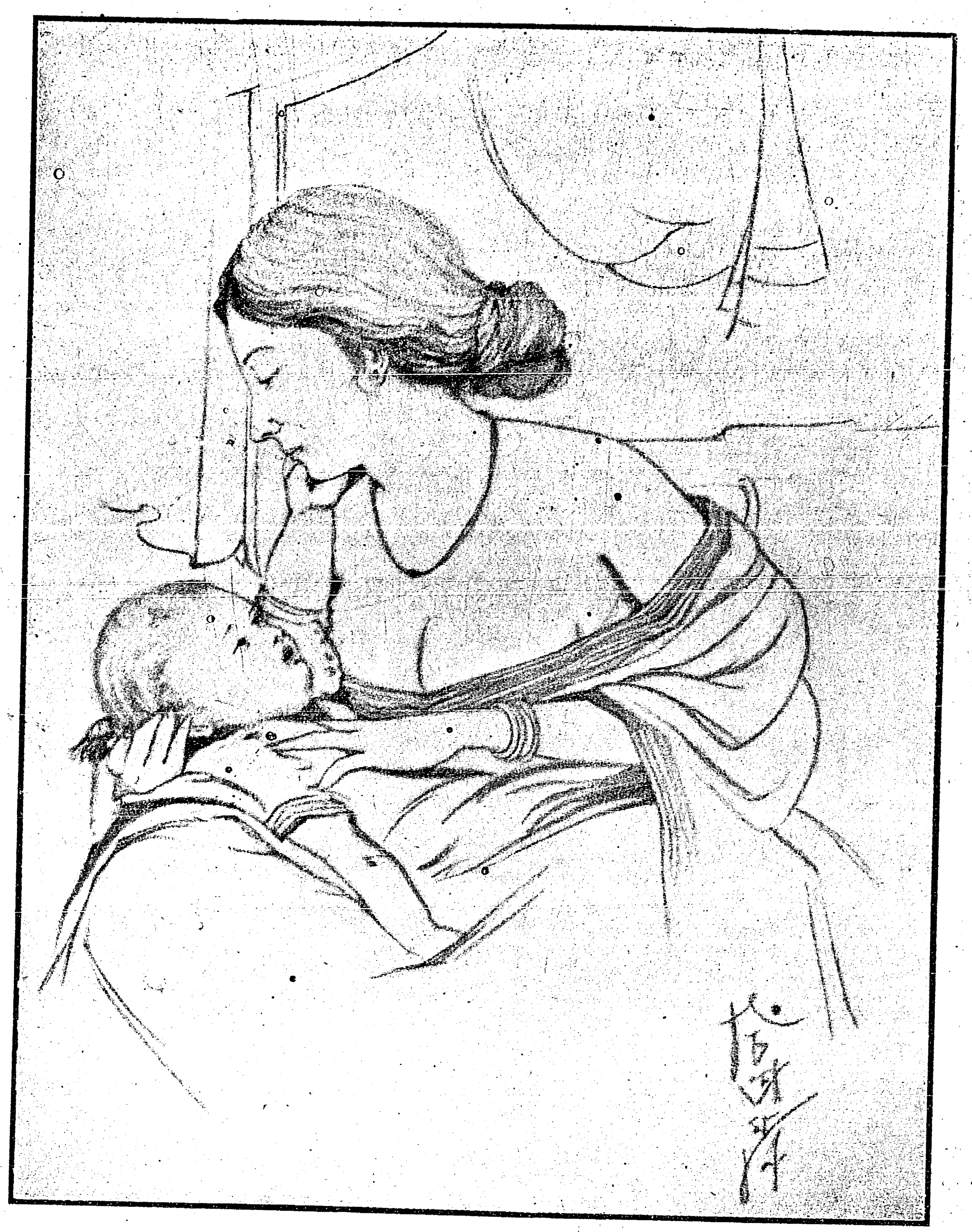

মা

আর. সি. ম্যাগাজিনের সৌজন্যে

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৫৯ | ১ম সংখ্যা

রামধনুর রজত জয়ন্তী

১

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জয় ভগবান্, জয় বিশ্বেশ্বর,
শুভ শুভ তব পঁচিশটি বৎসর।
আজিকে তোমার রজত জয়ন্তী,
বহিতেছে বায়ু চম্পকগন্ধী।
সুনীল আকাশে সোনার আলোক ফুট্ছে,
পার্থিব রজ মধুময় হয়ে উঠছে।
আদর করিয়া যাহারা তোমায় ডাকলে,
ঝঞ্ঝা ও ঝড়ে বক্ষে আগুলি রাখলে,
দিল সুধা যেই পিক পাপিয়ার দল গো,
যে সব কুসুম দিল নব পরিমল গো,

আজি সেই সব প্রিয়জনে মনে পড়ছে,
একসাথে হাসি অশ্রুর ধারা ঝরছে।
চোখে যে তোমার দিল সোঁহাগের অঞ্জন
আজ বহুদূরে তোমার সে মনোরঞ্জন!
সুখের এ দিনে দুঃখের কথা থাক্ গো,
সার্থক তুমি, দুর্লভ তব ভাগ্য।
স্বাধীন দেখি' যা লভিলে বিপুল হর্ষ,
দেখিবে বিশাল উজ্জল ভারতবর্ষ।
দিলাম তোমারে চাঁদমালা, দিনু চন্দন,
করে প্রণয়ের রাখী ক'রে দিনু বন্ধন।
হও প্রতিভার বাহন জগন্মান্য,
দিলাম আশীষ—দূর্ব্বা এবং ধান্য।

২

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

শিশু রামধনু আজ যৌবনে পড়েছে,
তনু তার ঘিরে ঘিরে কত রং ধরেছে।
কত গান, কত গাথা, কথা-ছবি-ছড়াতে—
কত ভাষা, কত আশা, কত মধু ঝরাতে
এসেছিল একদিন, সার্থক হোলো তা;
নাহি জানে ছলা-কলা, নাহি কোনো খলতা;
সাদা-সিধা পথে চলে, মুখভরা হাসিতে,
মন চায় বারে বারে আজো ভালবাসিতে।
রামধনু, তোমা দেখে আহ্লাদ না ধরে,
আশিস্ জানাই আমি প্রাণ-ভরা আদরে।

৩

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

পঁচিশ হ'ল সত্যি?
রঙের বাহার কোথাও ফিকে
হয়নি ত' একরত্তি!
বয়স গুণে মরে যারা
কি ছাই তারা জানে!
পাঁজির বয়স করবে কি তার
রামধনু যার প্রাণে!

৪

শ্রীনরেন্দ্র দেব

না জানি সে কবে কোন্ দিন—
আষাঢ়ের সজল আকাশে
উঠেছিল সহসা প্রথম
ধনু এক সাত রঙে রাঙা!
প্রসারিত দু'বাহু রঙীন
পূব হ'তে পশ্চিমেতে ভাসে,
নহে সে ত' রাবণারি যম
সে ত' নহে হরধনু ভাঙা।

কে দিয়েছে নাম রামধনু?
সুবিশাল যে ধনুর তনু
সপ্তবর্ণে আঁকা অভিরাম!
এ ধনু কি ধরিত শ্রীরাম?
আকাশ হইতে এর ক্ষিতি,
যতনে এনেছে ভরি প্রীতি;
তাই আজ আবাসে আবাসে,
মাসে মাসে রামধনু হাসে।

হাসি তার হোক সমুজ্জ্বল,
দীপ্ত করি গগন পটল।

৫

স্বপন বুড়ো (শ্রীঅখিল নিয়োগী)

মনের গগনে 'রামধনু' মেলে
রঙের পাখা—
কত না কবিতা, গল্প, কাহিনী
হৃদয়ে আঁকা!

পঁচিশ বছর ছড়ালে কত না
রঙীন আলো,
রামধনু-রঙা 'রামধনু'টিরে
বেসেছি ভালো।

রঙের কাজল পরালে দেশের
শিশু-কিশোরে—
ঝলমল করি ডাকিছ সবারে
রূপালী ভোরে!

কবে 'রামধনু' ছড়াবে আবার
সোনালী আলো,
সেই আশা নিয়ে পথ চেয়ে রবো,
বাসিবো ভালো।

৬

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

চব্বিশ বছরের উজ্জ্বল জীবনের
পূর্ণ কি পরিণতি আজ?
সম্মুখে ঝলিছে কি আরো আলো
কিরণের?—
আরো রং বেরঙের সাজ?
রামধনু—রামধনু—শিশুমনগগনের
অমলিন ঝলোমলো রূপ,
যত দেখি তত যেন ছবি জাগে স্বপনের,
বিস্ময়ে হয়ে থাকি চুপ!
চলো চলো সাথে যাই,—আকাশের
নীল রঙ,
ঝর ঝর ধারা বরষার,
কিছু রোদ, কিছু মেঘ, ঝণরণ ঝম্ ঝম্
ধনুকে কি জাগে ঝঙ্কার?
রামধনু রামধনু; আমাদের আশীষের
যদি কিছু থাকে মূল্যই,
দিয়ে যাই, ব'লে যাই, তোরে ভালো
বাসি ঢের,
আয় কাছে সোনামাখা বই!

৭

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রামধনুর আগামী বৈশাখ মাস হইতে পঁচিশ বৎসর আরম্ভ হইবে, এ সংবাদ পরম আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কিশোরদের মাসিক পত্রের এই দীর্ঘজীবন লাভ আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হয়। আজ শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুনিপুণ পরিচালনার পর স্বর্গত মনোরঞ্জনের অশ্রান্ত শ্রম ও যত্নের কথা মনে হইয়া আপনা হইতেই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। শ্রীমান

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের সুযোগ্য পরিচালনা, সাহিত্যপ্রীতি ও মধুর স্বভাবই শিশু ও কিশোর চিত্তরঞ্জনে, রামধনুর সাফল্যের কারণ। সাতটি বর্ণ বৈচিত্র্যে—বিজ্ঞান, সাহিত্য, কবিতা, ভ্রমণ, রূপকথা, গল্প ও উপন্যাস—রামধনুর রূপমাধুর্য্য ও গুণমাধুর্য্য যুগে যুগে শিশু ও কিশোরচিত্তকে আলো-ঝলমল শতদলের মত সপ্তরশ্মিতে চিরউজ্জল করিয়া রাখিবে। রামধনুর জয়যাত্রা শতবর্ষও একদিন পূর্ণ করিবে—সে কথাও আনন্দের সহিত স্মরণ করিয়া শরীর ও মনে পুলকরোমাঞ্চ উদিত হয়। রামধনু দীর্ঘজীবী হউক, সম্পাদক দীর্ঘজীবী হউন এবং তাঁহার পরিবার, পরিজনও সুখে, স্বাস্থ্য ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করুন আজ এই নববর্ষে ঈশ্বরের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

৮

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার (সম্পাদক, মৌচাক)

রামধনুর ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়াতে তার সহযাত্রী "মৌচাক" আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই ২৫ বৎসরে "রামধনুর" রং কোন দিন ম্লান হয় নাই। বরং দিন দিন উজ্জ্বল হয়েই উঠছে।

শেষ বর্ষণের পর আকাশে যখন রামধনু ফুটে ওঠে তখন তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। এই ২৫ বৎসরে আপনার রামধনুর বর্ণচ্ছটা বাংলার শিশুচিত্তকে জয় করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শুভদিনে অন্তরের সঙ্গে রামধনুর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

৯

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শিশুকাল থেকে রামধনু দেখে আসচি, কিন্তু কোন দিনও রামধনুর দেশে যেতে পারি নি। বছর কতক পূর্বে এক বর্ষণক্লান্ত দিনান্তে সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রেলে যেতে যেতে পথের বাম দিকে সিক্ত তৃণপ্রান্তরে আমাদের কাছ থেকে মাত্র হাত পঞ্চাশেক তফাতে দেখেছিলাম, রামধনুর একটি প্রান্ত! ঘটনাটি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি নয়নানন্দকর। আজও স্মৃতিপটে সেই রঙগুলি উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু সেদিনও তা স্পর্শ করতে পারি নি। তবে সে শূন্যস্থিত রামধনু। এখন মাসান্তে পুস্তকাকারে যে রামধনু হাতে আসে তাও কম আনন্দদায়ক নয়। আরও আনন্দ হচ্ছে এই কথা মনে করে যে, এর বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হ'ল। অন্ততঃ আর পঁচিশটা বছর কি এর সঙ্গে যুক্ত হবে না? হওয়াটা কিছুই আশ্চর্যের নয়। কারণ রামধনু মিলায় কিন্তু রামধনু চিরকালের।

১০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

আকাশের রামধনু একটুতেই মিলিয়ে যায়, আমাদের রামধনু যে আকাশে মিলায় নি, এখনো হাতে হাতে মিলছে সেটা বোধ করি রামধনুর মতই ঝক্‌ঝকে কচি কচি হাতের টানেই। রামধনুর আকাশে আজো যে এই রঙের সমারোহ তা বোধ হয় সেই তাঁদের রঙীন মনের অফুরন্ত ভাঁড়ার থেকে ধার নিয়েই।

১১

শ্রীলীলা মজুমদার

ভাই রামধনু,

তোমার পঁচিশ বছর বয়স হ'ল এ আমি ভাবতেই পারছি না। (আমার, ভাই, মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স।) দুনিয়াতে যেখানে যা কিছু ভালো আছে সব তোমার হোক্। তোমার রূপ হোক, গুণ হোক, সহস্র বছর পরমায়ু হোক্। তোমার স্থান হোক্ সাহিত্যের সিংহদরজার পাশেই। তোমাকে নিয়ে বাবা-মা'রা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করুক্। তুমি যে পাঠ্য পুস্তকের যমজ ভাই আর চলচ্চিত্রের বড় দাদা এ কথা সকলে বুঝতে পারুক্।

এত সব ভালো কথা বল্‌লাম, তা হ'লে তোমার জন্মদিনে নেমন্তন্ন করবে ত'? ইতি—

তোমার পুরোন বন্ধু লীলা মজুমদার

১২

শ্রীইন্দিরা দেবী

ভাই রামধনু,

তোমার জন্মজয়ন্তীর খবরে পরম আনন্দ পেলাম। এই পঁচিশ বছর ধরে তুমি তোমার সপ্ত রংএর বর্ণচ্ছটায়—শিশু থেকে বৃদ্ধের পর্য্যন্ত মনের ও চোখের আনন্দ ও তৃপ্তি দিচ্ছ। শিশুকাল পার হয়ে এসেও মাসের সেই দিনটিতে আজো সাগ্রহে প্রতীক্ষা করি তোমার আসার আশায়। তোমার বর্ণে চোখ ভরে, ভিতরের দানে মন ভরে। তাই তোমার শুভ জন্মজয়ন্তীতে ২৫ বছরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার আপন মহিমায় তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে শিশু-কিশোরদের তথা পরিণত বয়স্কদেরও আনন্দ দাও—তোমার সুবর্ণ জয়ন্তী হোক—আজকের দিনে এই প্রার্থনা।

১৩

অরূপ (সম্পাদক, কিশোর বাংলা)

রামধনুর রজত জয়ন্তী বর্ষের শুরুতে কিশোর বাংলার প্রত্যেকটি ভাইবোনের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন ও ভালবাসা জানাচ্ছি। রামধনু দীর্ঘজীবী হোক।

১৪

শ্রীফণীভূষণ গুপ্ত

সময়ের মাপকাঠিতে ২৫টা বৎসর কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের জীবনের মাপকাঠিতে ইহা কারও পরিমাপে অর্দ্ধেক, কারও এক তৃতীয়াংশ। আর—এর বেশী যাঁরা বাঁচেন তাঁরা সত্যিকারে বাঁচেন কিনা সন্দেহ।

কৈশোরে, যৌবনে ছেলেমেয়েদের বহু মাসিকপত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু তাদের ভিতর আজ ক'খানাই বা চলতি আছে তার হিসাব দেওয়াই মুস্কিল। তবু যে দু'-একখানি ছেলেদের কাগজ আজ ২৫ বৎসর পূর্ত্তি করিতে পারিয়াছে তাহা পরিচালকের কর্ম্মনিষ্ঠা এবং গ্রাহকদের আগ্রহের জন্যই সম্ভব হইল। রামধনু আজ ২৫ বৎসরে পড়ার জন্য তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বিংশ শতাব্দীর এই ২৫টি বৎসরের মত ঘটনাবহুল সময় মানুষের জীবনে আর আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। তবু এত সব বাধাবিপত্তির ভিতরেও যে পরিচালক সম্পাদক কাগজটি ২৪ বৎসর নিয়মিত বাহির করিয়া রজত জয়ন্তী বর্ষে পৌঁছাইতে পারিলেন সে জন্য বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে অকুণ্ঠ চিত্তে ধন্যবাদ দিবে। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ তাঁর কথাই বারে বারে মনে হইতেছে যাঁর অনবদ্য লেখনী কর্ম্মময় জীবনের মধ্যে হঠাৎ স্তব্ধ না হইলে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা হুকাকাশির আরও বহু বিচিত্র নির্দ্দোষ অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইতে পারিত। তাঁর অপূর্ব্ব অনুবাদের সাহায্যে আরও বহু প্রখ্যাত পুস্তকের সহিত পরিচিত হইতে পারিত।

রামধনুর আরও সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি এবং আশা করি আরও বহুদিন দেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বহন করিয়া যেন সে আমাদের ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন করিতে পারে।

১৫

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"রামধনু" পঁচিশ বছরে পদার্পণ করিল। আজ এই সঙ্গে মনে পড়ে পঁচিশ বছর আগেকার কথা,—একদিন সকালে বন্ধুবর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য "রামধনুর" ছবি আঁকার ভার আমাদের উপরে দিবার জন্য আমাদের মেসে (৩০ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর কত ঘটনা ঘটিল! বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই মনোরঞ্জন বাবু গেলেন চলিয়া। আসিল দুর্ভিক্ষ, আসিল রাষ্ট্রবিপ্লব, আসিল স্বাধীনতা; এক শতাব্দীতেও লোকে যা দেখে না আমরা এই সিকি শতাব্দীতে তাই দেখিলাম।

কামনা করি "রামধনু" সমস্ত বাধাবিপত্তি পদদলিত করিয়া তার বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দেশের শিশুমন-আকাশকে উদ্ভাসিত করুক। তার জয়যাত্রা সার্থক হইয়া উঠুক।

১৬

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

ক্ষিতীন বাবু, রামধনুর রজত জয়ন্তী হবে শুনে বড়ই আনন্দ হ'লো। আপনার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত এবং মনোরঞ্জনের স্মৃতি-মণ্ডিত রামধনু—আজ পঁচিশ বছর পার হ'লো—শিশু-সাহিত্য-জগতের এ একটি বিশিষ্ট ঘটনা বলেই আমি মনে করি।

মনোরঞ্জন বাবু ছিলেন আমার সহাধ্যায়ী, এবং তিনিই আমাকে শিশু-সাহিত্যের আসরে নামিয়েছিলেন। শিশু-গল্প রচনায় একটি নূতন ভঙ্গী দিয়ে গেছেন মনোরঞ্জন। তিনিই প্রথমে দেখিয়েছিলেন,—সায়েন্টিফিক্ জগতের ব্যাপার-গুলিকে কল্পরাজ্যের ডাইমেনশন্ দিয়ে কী ভাবে নূতন রূপ দান করা যায়। তাই, তাঁর লেখা কাহিনীগুলো কখনো যুক্তি-বিচারের সীমা হারিয়ে একেবারে অদ্ভুত অসম্ভবের পর্য্যায়ে পাড়ি দেয় নি। অতএব রামধনু হয়েছিল শিশু-সাহিত্যে একটি নূতন কল্পলোক। আপনি তাঁর উপযুক্ত ভাই এবং বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারী। রামধনুর রঙ লেগে অনেক খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্য-লেখক গড়ে উঠেছেন। তাঁদের অনেকেই এখনো জীবিত আছেন,—কেহ কেহ পরলোকগত হয়েছেন। আজ তাঁরা সকলেই আনন্দ লাভ করবেন।

রামধনুর দীর্ঘজীবন আমি কামনা করি। আশা করি, ভবিষ্যতে একদিন আপনাদের ছেলেমেয়েরা এর পরিচালনার ভার নেবে,—হয়তো নাতী-নাতনীরাও। সেদিন আমি থাকবো না,—সেদিন রামধনুর হীরক-জয়ন্তী হবে।

১৭

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

আজ রামধনুর রজত-জয়ন্তী। রামধনুকে যা'রা সত্যিকারের ভালবাসে নিজেকে আমি তাদেরই একজন ব'লে মনে করি। আমি ভালবাসি রামধনুকে—ভাল-বাসি রামধনুর লেখকদের—তার পাঠক-পাঠিকাদের, আর ভালবাসি তার সুযোগ্য সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণকে; আজকে রামধনুর সঙ্গে সকলকে শুভকামনা জানাই। রামধনু আজ যশোত্তীর্ণ। লেখক হিসাবে বহুদিন ধরে রামধনুকে সঙ্গ দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছি এ কথা ব'লে নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবার মত হীনতা আমার নেই, তবে গর্ব্বিত হওয়ার আছে এইটুকু মনে ক'রে যে রামধনুর এই যশের পথে চলার কালে লেখক হিসাবে তার সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল আমার সম্পাদকের সাদর আহ্বানে এবং পাঠকপাঠিকাদের ঐকান্তিক আগ্রহে। অনেক পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে আজ। মনে পড়ে পরলোকগত বন্ধুবর মনোরঞ্জনের

কথা—রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ছিলেন যিনি; যিনি রামধনুকে কোনও দিন অর্থোপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন নি—গ্রহণ করেছিলেন বাংলার প্রিয় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও আনন্দ বিতরণের মাধ্যম রূপে। আদর্শ ছিল তাঁর উচ্চ। আজকের দিনে কামনা করি; রামধনু কোনদিনই যেন সে আদর্শ থেকে স্খলিত না হয়। সেই আদর্শকে সামনে রেখেই যেন রামধনু এগিয়ে চলে যশের পথে—কীর্ত্তির রথে— সপ্ত-রঙে রাঙিয়ে দিয়ে তার পাঠকপাঠিকাদের মনোভূমি, যেমন চলে আসছে এতদিন।

১৮

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (রামধনুর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক)

বাংলা ১৩৩৪ সনের মাঘ মাসে রামধনুর জন্ম। প্রধানতঃ যাহার আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় ইহার আবির্ভাব, যাহার অকালমৃত্যু সাধারণ ভাবে শিশুসাহিত্যের এবং বিশেষ ভাবে 'রামধনু'র অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করিয়াছে সেই মনোরঞ্জনের কথা আজ স্বভাবতঃই মনে আসে। কিঞ্চিদধিক ১৩ বৎসর পূর্ব্বে রিপণ কলেজে অধ্যাপনা ও রামধনুর সম্পাদনা করিবার সময় মনোরঞ্জন আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। সে কথা এখন ভাবিয়া লাভ নাই। মনোরঞ্জনের অনুজ রামধনুর বর্ত্তমান সম্পাদক যে শিশুসাহিত্যের সহিত একীভূত হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় ইহার উন্নতিবিধানে যত্নশীল, তাহাই সান্ত্বনার বিষয়।

এইরূপ পত্রিকা প্রচারে প্রথমাবস্থায় অনেক অর্থক্ষতি অপরিহার্য্য। তৎসত্ত্বেও রামধনু সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের উন্নতিকল্পে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক প্রবন্ধাদি দ্বারা রামধনুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রথম সংখ্যায় উদ্বোধনী কবিতা লিখিয়াছিলেন আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার। তিনি ইহজগতে নাই কিন্তু যতদিন বর্ত্তমান ছিলেন কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারা অনেক সময়েই রামধনুকে অনুগৃহীত করিতেন। সুকবি কুমুদ-রঞ্জন মল্লিক ও কবিশেখর কালিদাস রায়ও প্রথম সংখ্যা হইতেই ইহাকে স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বার্-এট্-ল, কংগ্রেস্-নেতা নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপণ্ডিত প্রিয়রঞ্জন সেন, এম্. এ, পি. আর. এস্ এবং অন্যান্য মনীষীর আনুকূল্যে বঙ্গসাহিত্যে পদার্পণ করিয়া রামধনু পরেও অনেক প্রবীণ ও নবীন সুলেখককে শিশুসাহিত্যক্ষেত্রে আকর্ষণ করিয়াছে। রামধনুর লেখক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক সকলেই আজ ধন্যবাদের পাত্র।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা; রামধনু যেন আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে ইহার সুনাম অক্ষুণ্ণ ও বর্দ্ধিত করিতে পারে।

আল্‌প্‌স্‌-এর আশেপাশে তিন দিন

অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১। শনিবার বিকেলে হঠাৎ মেঘের মত লাল-কালো ছায়ায় ফরাসী উপকূল চোখে পড়ল। ক্রমে মার্সেই বন্দর। তার পথরোধ না ক'রেও সামনে যে পাহাড়ের দ্বীপগুলি, তার একটির উপর দুর্গ; নজরে আসবেই। এইটিই ডুমার 'কাউন্ট অব্ মন্টিক্রিস্টো'তে খ্যাত সেই শ্যাতু দ্য ঈফ (ঈফের দুর্গগৃহ)।

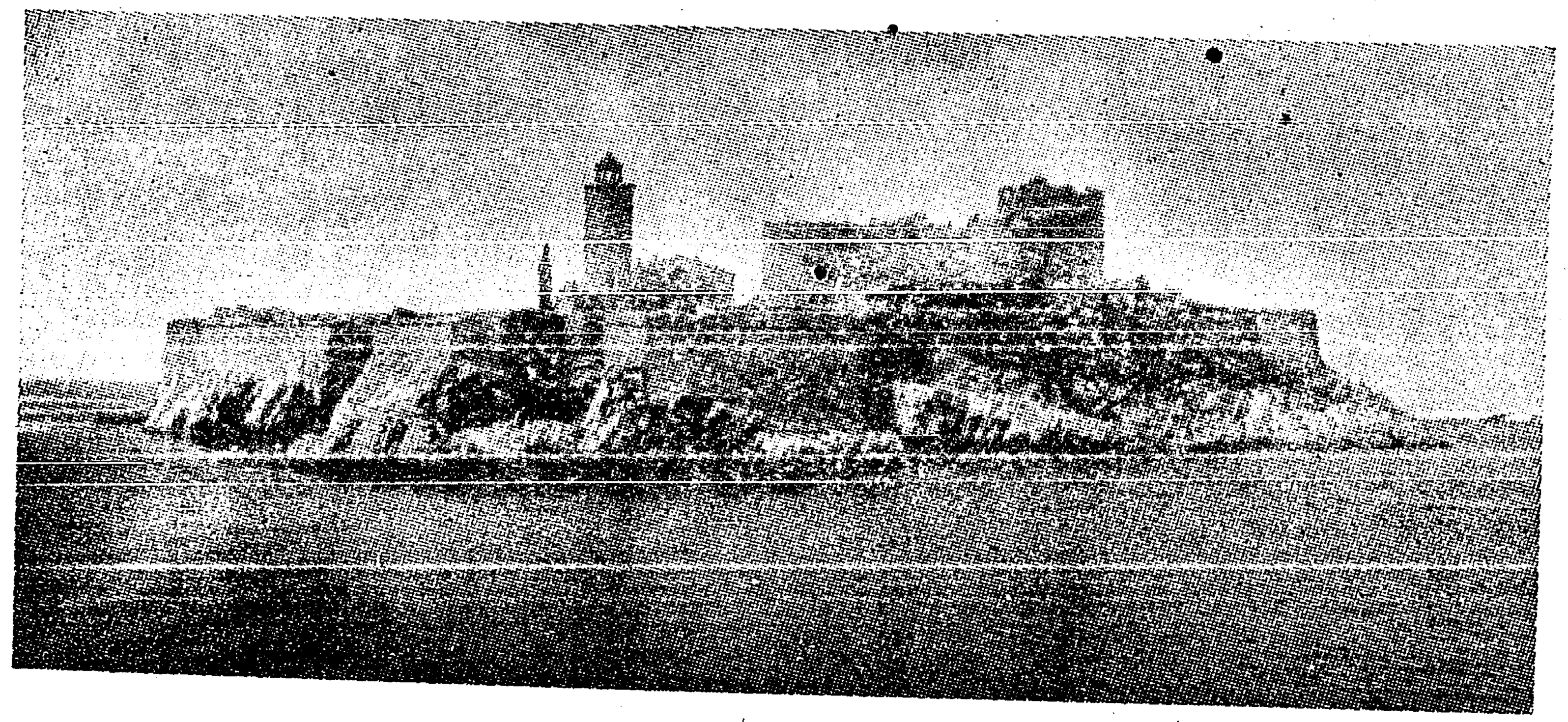

শ্যাতু দ্য ঈফ— মার্সেই

এখানেই স্বাধীনতার পূজারী মিরাবো বন্দী হয়ে ছিলেন। অনবরত নৌকোয় চ'ড়ে দলে দলে লোক এখানে আসে। আমি সন্ধ্যার পর গিয়ে ছিলাম। বাজনা বাজিয়ে যাত্রীদের

দিয়ে যাই, কখনও রেলগাড়ী। দু'পাশে আঙুরস্তবক সহ কেয়ারী করা গাছ, কুটীর আর পাহাড়ের উপর নানা রূপের ও রঙের দৃশ্য। বাস্ কোথাও কোথাও একেবারে সমুদ্রের পাশ দিয়ে ৪।৫শ' ফিট উঁচুতে যাচ্ছে—ভয় হয়, বুঝি নীচে পড়ে যায়, যেমন কাশ্মীরী বা অন্য পাহাড়ে রাস্তায় হয়। খালি এখানে সমুদ্রের উত্তাল

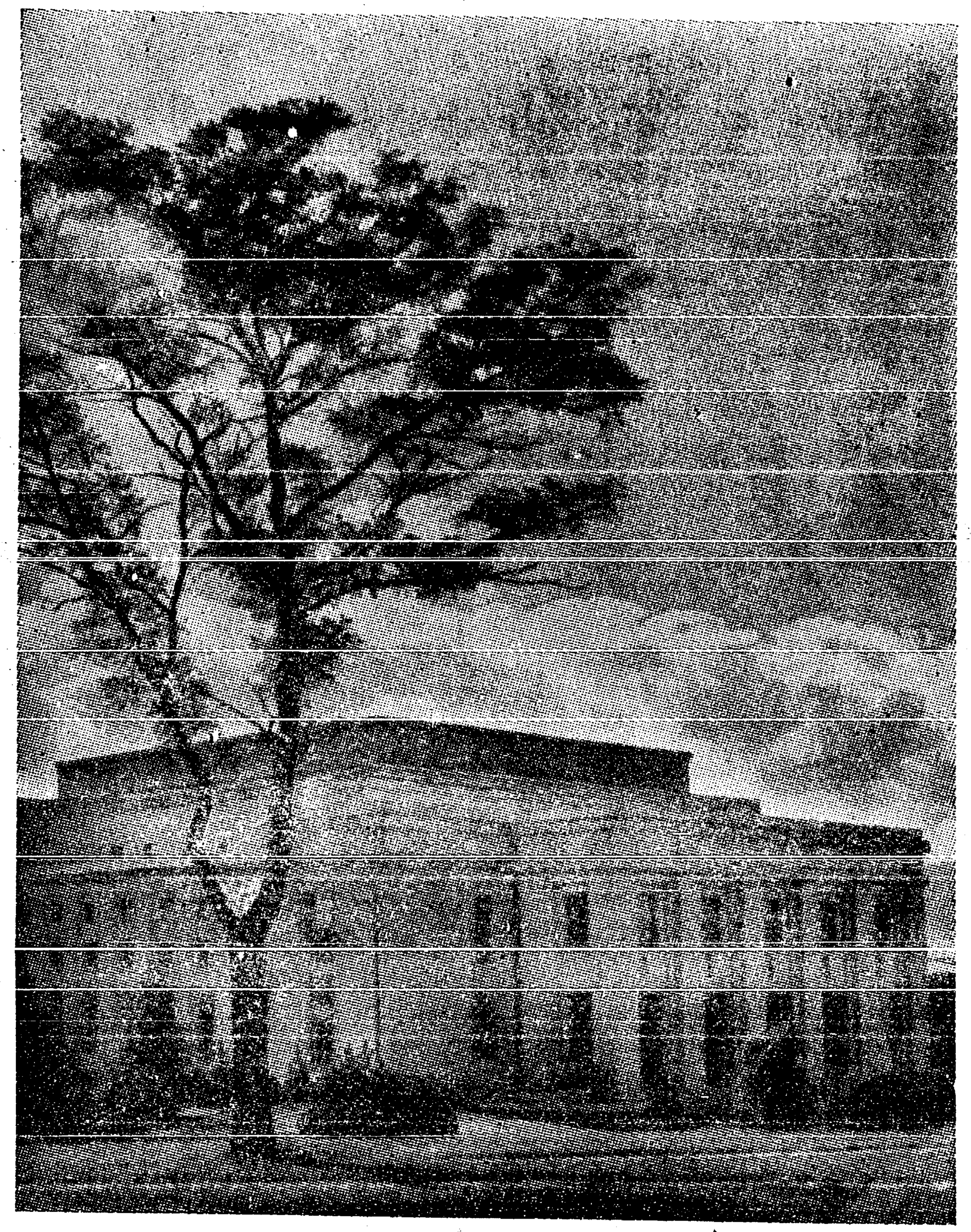

প্যালেস্ অব্ নেশন্স্—জেনেভা

জলরাশি। স্নানের একটার পর একটা আড্ডায় কী ভিড়! কেউ অল্প জলে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে, কেউ সাঁৎরে, কেউ পায়ে-চালানো নৌকো নিয়ে গভীর জলে গেছে। ডাঙ্গায় খাবার-পরবার পসারীদের ভিড়।

দেশ-বিদেশের বিখ্যাত লোকদের নামে রাস্তা। রুজভেল্টের নামে একটা রাস্তা হয়েছে। নীস্ আমাদের শেষ গন্তব্য। তার আগে বড় স্নানের আড্ডা ক্যানে। বহু ধনী লোকের নৌকো, ষ্টীম-বোট, ইয়ট এ সব জায়গায়। আগা খাঁ এই অঞ্চলে অনেক সময় কাটাতেন। এর অল্প দূরেই মন্টি কার্লোর প্রমোদ ও জুয়ার আড্ডা।

পথে টুলোঁর বন্দর। এখানে হিটলারী যুদ্ধের শেষ পর্ব। মার্শাল পেঁতা এ জায়গাটায় ঘাঁটি করেছিলেন। এখনও বহু জাহাজ উদ্ধার হচ্ছে—পাশের পাহাড়ে এখনও কামান দাগার কেন্দ্রগুলি হাঁ ক'রে রয়েছে। টুলোঁর ব্যবসাস্থল, বিচারালয় ও নাবিকদের শিক্ষাকেন্দ্র জমকালো। নানা সহরে গির্জ্জার রকম-ফের দেখছিলাম। চায়ের ব্যবস্থা ও প্রাচুর্য্যও লক্ষ্যণীয়। এ অঞ্চলে গান-বাজনা, সাহিত্য-চর্চ্চা প্রখ্যাত; পুতুল ও মাটির কাজ মিউজিয়ামের মত ক'রে দেখিয়ে বিক্রি করছে।

দুপুরে এক হোটেলে খেলাম সুমিষ্ট খরমুজ-সহ রুটি, বেগুণ-প্রমুখ পাঁচমিশেলি দিয়ে রান্না তরকারী, মাংস ও আনারসের টুকরো। আর কোডাকের ফটোর প্রকাণ্ড দোকানে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড গাঁদাফুলের এক তোড়া। রক্ত ও শ্বেত করবীও বহু জায়গায় ফুটে আছে। লাভাভ্যু ব'লে একটা জায়গায় দেখলাম সমুদ্রতীরে স্নানরতদের মধ্যে তামাটে রঙের কয়েকটি মহিলা। সম্ভবতঃ এঁরা স্পেন অঞ্চলের হ'তে পারেন।

প্রতি সমুদ্রতীরবর্তী সহরেই যুদ্ধে মৃতদের স্মারকস্তম্ভ—এ অঞ্চলের ও কত দূর দূরান্তের!

নীস্ সহরে পৌছলাম ঠিক সূর্য্যাস্তের মধ্যে। ফুলবাগান ও বাড়ীঘরের বৈচিত্র্যের মধ্যে সূর্য্যাস্ত যেন জমছিল না। সমুদ্রতীরে কত বড় বড় হোটেল, বাড়ী, নাচঘর, পার্ক ও বাগান! দেখে তো আমি হতভম্ব! রিভীয়েরা অঞ্চলে এলে কোথাও যে পৃথিবীতে অভাব বা দারিদ্র্য আছে তা মনে হয় না। কাজেই অতি দ্রুত ষ্টেশনে এসে রাতের ট্রেনের টিকিট কিনলাম আবার মার্সেইএর পথে জেনেভা যাবার।

১১ই সেপ্টেম্বর : সোমবার। প্রাতে জেগে দেখি প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী এধারে ওধারে। শেষ রাতের আলোয় ওপরে কুয়াশার মধ্যে প্রথম সূর্য্যালোক ঢুকবার চেষ্টায় অপরূপ বৈচিত্র্য। বহু সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গাড়ী এগোয়। পাশে পাশে হ্রদের জল, নৌকো, সুন্দর সুন্দর পোল, বিজলী বাতির কেন্দ্র, আর এ অঞ্চলের বিখ্যাত গরুর পাল।

৯টার পর সুইস অঞ্চলে পৌঁছলাম। এরা যে আরও সুবিন্যস্ত কাজকর্ম্মে তা বোঝা যায়। চাষবাস, নড়াচড়ায় আঁটসাঁট। জেনেভা সহর তো ছবির মত! ফুলের কেয়ারি, ফোয়ারা, সুন্দর রাস্তা—এত সাজান যে মন হয় বিখ্যাত হ্রদটিও বুঝি এরা তৈরী ক'রে এনে বসিয়ে দিয়েছে সহরটা গড়ে ওঠার পর।

জেনেভায় আমার আর তর সইল না;—আন্তর্জাতিক শ্রম-প্রতিষ্ঠানের ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউরোপীয়) অফিস দেখতে বেরুলাম। দুই-ই প্রথম মহাযুদ্ধের পর মানুষের শান্তি-প্রয়াসের নিদর্শন। ভাস্কর্য্য, দেয়ালে-আঁকা ও প্রকাণ্ড ছবি, দেশ-বিদেশের দেওয়া উৎকৃষ্ট মার্বেল, চামড়া, রবার, কাঠ, দরজা ও স্থপতিদের বুদ্ধি এই দু'জায়গায় প্রত্যহ কয়েক শ' দর্শক হাজির করে। এখন অর্থনীতিক ও সামাজিক সংস্থার সভা চ'লছে। ভারতের অর্থশাস্ত্রী আদারকরের সঙ্গে দেখা হ'ল। জেনেভা সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী নয়—কিন্তু বিশ্বের সমবায়-প্রচেষ্টার রাজধানী বলা যায় একে।

দূরে পর্ব্বতশ্রেণী;—পরিষ্কার দিনে মঁ ব্লাঁ দেখা যায়। জেনেভার সহর কয়েকটি ফুলের মত হ্রদে ভাসছে। কত দেশের লোক, কত ভাষাভাষী, কত রকমের নরনারী কত কাজে এখানে এসেছেন! জিজ্ঞাসা ক'রে, জেনে ভরসা হয় পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ১৯২৭-৩৬ সালে লীগ্ অব্ নেশনস্‌এর বাড়ী (যা এখন ইউনাইটেড নেশনস্‌এর ইউরোপীয় অফিস) তৈরী হয়, তাতে নানা ছবির মধ্যে আছে স্পেনীয় চিত্রশিল্পী সের্টএর আঁকা "আশা"। দুই কামানের মুখের উপর দাঁড়িয়ে মা শিশুকে তুলে ধরেছেন—নিজে অসংখ্য মা-বোন যুদ্ধ-ফেরতদের আহ্বান করছেন। জেনেভা এই আশারই প্রতীক্। পর্ব্বতের শুভ্র শীর্ষ ও হ্রদের শান্ত বুক স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়েছে শ্রান্ত, বিভ্রান্ত মানবসমাজকে।

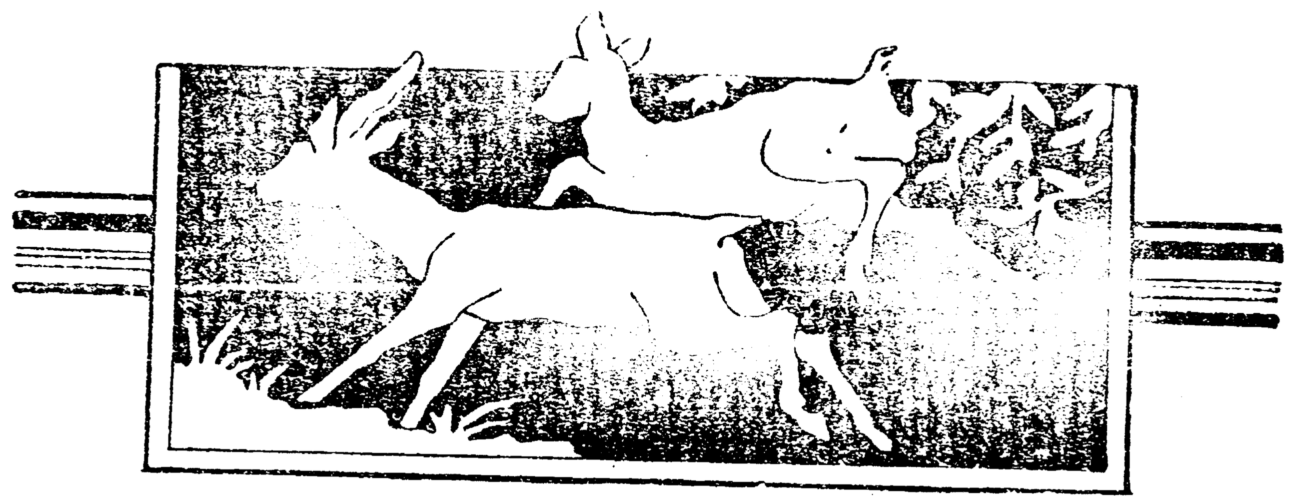

কল-স্বর

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

অবিনাশের আপিসে এসেছে অভিলাষ। সাড়ে চারটা পার তখন, ছুটি হব-হব, কিন্তু তখনো অবিনাশের হাত কামাই নেই। তখনো সে নিজের মেশিনে বসে; মেশিনের মতই কাজ করে যাচ্ছে দু'হাতে।

রাশি রাশি আঁক। লম্বা লম্বা যোগ। বড়ো বড়ো হিসেবের ফিরিস্তি। সে সব চক্ষের পলকে দেখতে না দেখতে মেশিনের সাহায্যে কষিত হয়ে কাগজের পিঠে বসিত হচ্ছে। দেখলে তাক লাগে।

তাক্-লাগানো এই আঁকের কলটার নাম কম্‌প্টোমিটার। বড়ো বড়ো আপিসে থাকে। বারো জন হিসেবীর কাজ একটা মেশিনে মাথা খাটিয়ে নিকেশ করে—মিনিটের মধ্যে, একলা। কলকব্জার এই মাথা, গোড়ায় মানুষের মাথার থেকে বেরুলেও, এখন মানুষের মাথাকে টেক্কা মারছে।

অভিলাষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখতে দেখতে ছুটির ঘণ্টা বাজলো। নিজের কাজ বাজিয়ে, কাগজপত্তর গুছিয়ে রেখে উঠে পড়লো অবিনাশ। বেরিয়ে পড়লো দুই বন্ধুতে আপিস থেকে। জমলো গিয়ে এসপ্ল্যানেডের কাফেটোরিয়ায়।

'ইস্! মেশিনের এ রকম মাথা!' খাবার টেবিলে বসেও অভিলাষের মাথায় কম্‌প্টোমিটার ঘুরছে তখনো—'ভাবতেই পারা যায় না! বড়ো বড়ো যোগ-বিয়োগ ঠিক দিচ্ছে মিনিটের মধ্যে। ঠিক ঠিক দিচ্ছে তার ওপর।'

'ঠিকে ভুল হয় না কখনো।' অবিনাশ তার ওপরে যোগ দেয়।

'বিজ্ঞানের কী বাহাদুরি! দেখে অবাক হতে হয়।' অভিলাষ বলে।

'এ আর কী দেখলি!' অবিনাশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বাৎলায়—'মেশিনে কথা কয় তা জানিস? মেশিনের সঙ্গে চালাকি না। চাট্টিখানি নয়। মেশিন কথা কইছে ভাবতে পারিস এ কথা?'

কেন ভাবতে পারবে না শুনি? সে কথা কি অভিলাষের অবিদিত? গ্রামোফোন, রেকর্ড, রেডিও—এদের বোলচাল কি জানা নেই ওর? কী ওগুলো? মেশিন্‌ই তো? মেশিন ছাড়া কী আর?

আরে না না, তার কথা বলছে না অবিনাশ। এমন মেশিন যা মানুষের মতই কথা কয়, কথার জবাব দেয়, ঠিক তার মতই বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকে। টেলিফোনের কল্ ধরে, খবরা-খবর লেনদেন করে, ঘরবাড়ি পাহারা দেয়—সেই রবট্-মানুষের কথাও সে বলছে না। এমন মেশিন যা মানুষের অন্তস্তল অবধি দেখতে পায়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব নখদর্পণে, আর সমস্ত ঠিক ঠিক বাৎলায়।

অভিলাষ চোখ বড়ো করে তাকায়—'আছে নাকি এমন মেশিন?'

'আছে বলে আছে! মানুষের চোখে ধুলো দেয়া যায়, কিন্তু তাদের চোখে? অসম্ভব। তাদের সঙ্গে চালাকি চলে না। একবার তাদের একটার সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে—না বাবা, কলদের আমি রীতিমত সমীহ করে চলি।'

'কি রকম, শুনি?' শোনবার জন্যে হাঁ করে অভিলাষ। —'সেই মেশিনের সঙ্গে কোথায় তোর মুলাকাৎ হোলো? হঠাৎ যে কলদের এত খাতির করতে গেলি? বল্ আমায় সমস্ত। বিলেতেই বুঝি?'

'বিলেতে নয় রে, নিউইয়র্কে।' অবিনাশ প্রকাশ করে।—'জাহাজের চাকরি করি তখন। ইউরোপ, আমেরিকা, ফার ঈস্টের—এ বন্দর থেকে সে বন্দরে—মালের যোগানদারি কাজ আমাদের। এক এক বন্দরে এসে আমদের জাহাজ লাগে। মাল খালাস হয়, নতুন মালের আমদানি আসে—কিছুদিনের জন্যে নোঙর ফেলে খাড়া থাকে জাহাজ। জাহাজ বন্দরে ভিড়লে কাজের ভিড় থাকে না। হপ্তা দু' হপ্তার ছুটি মেলে তখন। সবাই মিলে ডাঙায় নেমে পড়ি আমরা। লাগাও সহরে গিয়ে ফূর্তি লাগাই। সময় থাকলে কাছাকাছি আরো দু'-একটা সহর ঘুরে আসা যায়—সেই ফাঁকে দেখে আসা যায় নানান্ জায়গা। বুঝলি ভাই অভিলাষ, এতো তো সহর দেখলাম, নিউইয়র্কের মতন ওরকম আর দেখি নি—অমনটি আর হয় না। কী বর্ণনা দেব তোকে নিউইয়র্কের—'

'জানি জানি।' কাহিনীর গোড়াতেই অভিলাষ আর আগাতে দেয় না—'আমারও দেখা সব—এই চোখেই। সিনেমার ছবিতে দেখেছি ঢের ঢের! আমেরিকার কোন্ সহরটা দেখি নি? কী দেখতে বাকী আছে? হলিউডের দৌলতে এমন কি পিকিং হংকং পর্য্যন্ত দেখলায়! গুড্ আর্থ্? গুড্ আর্থ্ দেখেছিলিস্? বিলকুল চায়না।'

না, নিউইয়র্কের কাহিনী শুনতে চায় না অভিলাষ। নগর-বর্ণনার একটি বর্ণও সে শুনতে রাজি নয়। শুধু অভিলষিত খবরটিই সে জানতে চায়—'তোর সেই আলাপী মেশিন্টার কথা বল্ আগে।'

'বলছি তো, তখন আমি নিউইয়র্কে গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল্ ষ্টেশনে বসে। পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের গাড়িতে বোসটনে যাবো। বোস্টনের আলাপী আমার এক বন্ধু সেখানে থাকেন, তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি। বসে আছি ইষ্টিশনে, বসে বসে দেখছি মানুষের আনাগোনা। আমার একটু দূরে একটা মেশিন। আমাদের হগ্ সহেবের বাজারে ওজন নেবার যে অটোমেটিক যন্ত্রটা আছে না?—সেই যাতে আনি ফেলে দিলেই ওজন বলে দেয়?—অনেকটা সেই ধরণের। হঠাৎ দেখি, একটা মোটাসোটা লোক হন্তদন্ত হয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল—এসে সেই মেশিনটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে। তার তলায় পাদপীঠের মতন যে একটুখানি জায়গা ছিলো, খাড়া হোলো সে তার ওপর। মেশিনের গায়ে গর্ত্তের মত একটা ছিলো, তার মধ্যে একটা সেণ্ট্ ফেলে দিলে—'

'একটা সেণ্ট্ নয়, একটু সেণ্ট্।' অভিলাষ শুধরে দিতে যায়। 'ব্যাকরণ ভুল হচ্ছে

তোমার। গন্ধদ্রব্য, তরলসার—এ সব জিনিষের একটা হয় না, একটু হয়। যেমন ধরো, জল—। জলকে ধর্ত্তব্য করে, দৃষ্টান্ত দিয়ে, জলের মতই সে সোজা করতে চায়—'আমরা কি একটা জল বলি? বলি, একটু জল।'

কিন্তু তারপরেও তার একটা (কিংবা একটু) খট্‌কা থাকে—'কিন্তু ভাই, মেশিনের মধ্যে গন্ধ ঢালবার মানে কি? তার কি নাক-মুখ আছে?'

'সে সেণ্ট্ নয় গো পণ্ডিত, সে সেণ্ট্ নয়। মহাপুরুষদের আমরা যে সেণ্ট্ বলি তাও না। এক ডলারে একশ' সেণ্ট্ হয়—জানিস্ নে? এ হচ্ছে সেই সেণ্ট্। আমাদের আনির মতন নিকেলের চাকৃতি। যাক, শোন্ তারপর। সেণ্ট্‌টা চালান্ করে লোকটা পাদপীঠের সেণ্টারে গিয়ে দাঁড়ালো। কী আশ্চর্য্যি, পর মুহূর্ত্তেই লাউড্ স্পীকারে যন্ত্রটার গলা খন্ খন্ করে উঠলো—তোমার ওজন হচ্ছে; একশ' সত্তর পাউণ্ড। নাম—বেসটার চাওয়েল্স্। পাঁচটা কুড়ির গাড়িতে তুমি ব্রুষ্টারে যাচ্ছো। চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম্। ভালো কথা, ক্যাথারিন্ তোমাকে যে উল্ নিয়ে যেতে বলেছিলো তা তোমার মনে আছে তো?

ঐঃ যাঃ!

'ঐঃ যাঃ! উল্ কিনতে তো ভুলে গেছি! বলেই লোকটা এক লাফে নেমে পড়লো মেশিনের থেকে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো আবার—ষ্টেশনের বাইরে।

'আমি তো তাজ্জব বনে গেছি। "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।" মেশিন্ও নই। কিন্তু মেশিন যে মানুষকে হার মানাবে এমন কথা ভাবাও যায় না। ক্যাথারিনের ছেলের কাঁথার জন্যে কি তাঁর বাবার গলাবন্ধ বুনতে উলের দরকার, তার খবরদারি করবে বেপাড়ার এক মেশিন্? জানা নেই, শোনা নেই—বিল্‌কুল্ অচেনা, বেস্টারের বেস্ট ফ্রেণ্ডের মধ্যেও নয়, চাওয়েলস্‌এর পারিবারিক চৌহদ্দীতে গতিবিধিও নেই যার—পয়সা দিলে বড় জোর সে ওজন জানাতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি প্রয়োজনও জানাবে? আদার ব্যাপারীর কাছে জাহাজের খবর?

'জাহাজের ব্যাপারী হ'লেও তাক্ লেগে গেল আমার। অবাক্ হয়ে ভাবছি, এমন সময়ে এক মেয়ে, বেশ নাদুসনুদুস, এসে দাঁড়াল সেই মেশিনটার ওপর।

'নিকেলটা ফেলতে না ফেলতে বিটকেল আওয়াজ বেরিয়েছে মেশিনটার—আপনার ওজন এখন দু'শো চল্লিশ পাউণ্ড। গত মাসের থেকে চার পাউণ্ড কমেছে। এজন্য, মিসেস্ উইলমট, আপনাকে আমার অভিনন্দন। আপনার গাড়ি ছাড়ো ছাড়ো। সাত নম্বর গেট দিয়ে ছুটুন এক্ষুণি—যদি পাঁচটা তিরিশের গাড়ি ধরতে চান।

'মেয়েটি তখনই নেমে পড়লো মেশিনের থেকে, ফিরে তাকে ধন্যবাদ জানাবারও ফুরসৎ পেল না। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ছুট লাগালো থপ্ থপ্ করে।

'আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। উঠে গেলাম মেশিনটার কাছে। কাছে গিয়ে

ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। গ্লাস্ কেসের ভেতর দিয়ে বেশ নজর যায়। অনেক ঘোর-প্যাঁচ আছে তার ভেতরে, চাকা আর জড়ানো তার। ইলেকট্রিক মোটর, কয়েল্ড কয়েল, রেডিয়ো পার্ট্স, ফোঁটো সেলস্—দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সব নিয়ে এক ঘোরালো ব্যাপার।......'

'তোমার কাছে কোন সেণ্ট ছিল না?' অভিলাষ জিজ্ঞেস করে।

'কেন থাকবে না? এমন কিছু আমি ভেভিল নই! সেণ্টরা আমার কাছে হরদম আসে যায়। একটা সেণ্ট খসিয়ে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের এই বাচ্চাটাকে পরখ করার আমার সখ হোলো। তার ঘাড়ে একবার চেপে দেখার আশ্টা আমিও মিটিয়ে নিলাম—

'দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আওড়াতে সুরু করেছে মেশিনটা—

'তোমার ওজন হচ্ছে একশ' ত্রিশ পাউণ্ড—তার মধ্যে আট পাউণ্ড তোমার ওভার-কোটটারই ওজন। আর একটু মোটা হওয়ার দরকার তোমার। ভোজন বাড়াও বাপু, ওজন বাড়বে তা হ'লেই। তুমি একজন বাঙালী। বিক্রমপুরের বাঙাল। তোমার নাম ওবিনাশ ট্রাফ্ডার।

'আমি বাধা দিয়ে বল্লাম, উঁহু, ভুল হচ্ছে, ঠিক ঠিক হোলো না। ট্রাফ্ডার নয়, তরফদার। বলব কি ভাই, মেশিনটা আমার কথার জবাব দিল চোটপাট—বল্লে, ও একই কথা। ট্রাফ্ডারও যা টারাফডারও তাই।'

অভিলাষ বলে—'তোমারও যেমন! ওদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে গেছ! সাহেবরা কি ত-উচ্চারণ করতে পারে? উচ্চারণ শুদ্ধ হতে এখনো ঢের দেরী ওদের।'

'যা বলেছিস। আমিও মেশিন সাহেবকে বেশী আর ঘাঁটাই নে। তর্কার নিয়ে বাজে তকরার করে কী হবে? মেশিনটা থামে নি তখনো,—বলেই চলছে একটানা,— তা বাপু, ঠিক ঠিক ট্রাফ্ডার না হলেও তুমি একজন ওস্তাদ লোক। ফাঁকি দিতে ওস্তাদ। সেণ্ট বলে আমার কাছে একটা পাকিস্তানি আনি চালিয়েছো, ভাবছো তা কি আমি টের পাই নি? কিন্তু সে কথা যাক্, বোস্টনে যাবার পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের গাড়ী যদি ধরতে চাও তা হ'লে আর দেরি কোরো না। তের মিনিট মাত্র বাকী আছে তোমার ট্রেনের। চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম'।

'তের মিনিট, সে ঢের সময়। টিকিট কাটা ছিলো আমার। আমি বল্লাম—দাঁড়াও! তোমায় দেখাচ্ছি! মজা টের পাবে। মেশিনটাকেই বল্লাম, কিন্তু নিজের মনে মনে। তোমাকে যদি না বেকুব বানাতে পারি তো আমি বাংলা দেশের ছেলে নই। তক্ষুনি চলে গেলুম এক সালুনে—সেখানে গিয়ে আমার গোঁফ জোড়া কামিয়ে ফেল্লাম। তারপর পোষাক বদলালাম আমার। একটা পরচুলা আঁটলাম মাথায়। হাতে নিলাম একটা বেলুন। এই ভাবে ভেক বদলে ফের ঢুকলাম ষ্টেশনে। এবারটি বাছাধন? চিনতে পারবে আমায় আর? গোঁফ বাদ দিয়ে এই পোষাকে আর এমন পরচুলায়? অন্য পর কি, আমাকে দেখে আমার বাবাও চিনতে পারবেন না। হুঁ হুঁ!

'ছদ্মবেশ ধরে আপন মনে হাসতে হাসতে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মেশিনটার ওপর। নিকেলটা দিয়েছি ওর ফোকরে। দাঁড়িয়ে আছি চুপ করে। ওটাও চুপচাপ। উচ্চবাচ্যই নেই ওর কোন!

'হ্যাঁ, হয়ে গেছে বাছাধনের! যেমনি না একটু ভোল ফিরিয়ে আসা আর সমস্ত গোল! আর ওর মুখে কোন বোল নেই। টু-শব্দটিও না। চাকাওয়ালা ঘোরালো তারের বৈদ্যুতিক ব্রেনের সাধ্যি হোলো না যে আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারে। আমার সঙ্গে চালাকি?

'জয়গর্বে মশগুল হচ্ছি মনে মনে, ও মা, এমন সময়ে ঘ্যানঘ্যান করে উঠেছে মেশিনটা:

'তোমার ওজন একমণ বাইশ পাউণ্ড। ওভার কোটটা ছেড়ে এসেছো বলে আট পাউণ্ড কম আগের থেকে। গোঁফটা ফেলে আসার জন্য এমন কিছু ইতর-বিশেষ হয় নি। যে ছিটে-ফোঁটা কমেছিল তোমার হাতের বেলুনে সেটা পুষিয়ে গেছে। তুমি একজন বাঙ্গালী; তোমার নাম হচ্ছে ওবিনাশ ট্রাফডার। ট্রাফডার কি টারাফ্ডার যা তোমার অভিরুচি—যেটা বল্লে তুমি খুসি হও। ফাঁকি দিতে ওস্তাদ বলেছিলুম তোমায়, তাই না? কিন্তু বোকামি করে ফের আমায় ফাঁকি দিতে এসে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের গাড়ী তুমি হারিয়েছ। সেই সঙ্গে দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, সালুনে তোমার যে ওভারকোট ছেড়ে এসেছো সেখানাও তুমি হারালে। এইমাত্র সেখানকার আর এক খদ্দের সেটা নিজের গায়ে চাড়িয়ে সটকান দিচ্ছেন। সেই ওভারকোটের পকেটে আছে তিনশ' পঞ্চাশ ডলার নগদ, তোমার ট্রাভলার্স্ চেক্-বই, পার্কার ফিফ্টিওয়ান, আর তোমার পাস্পোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র......

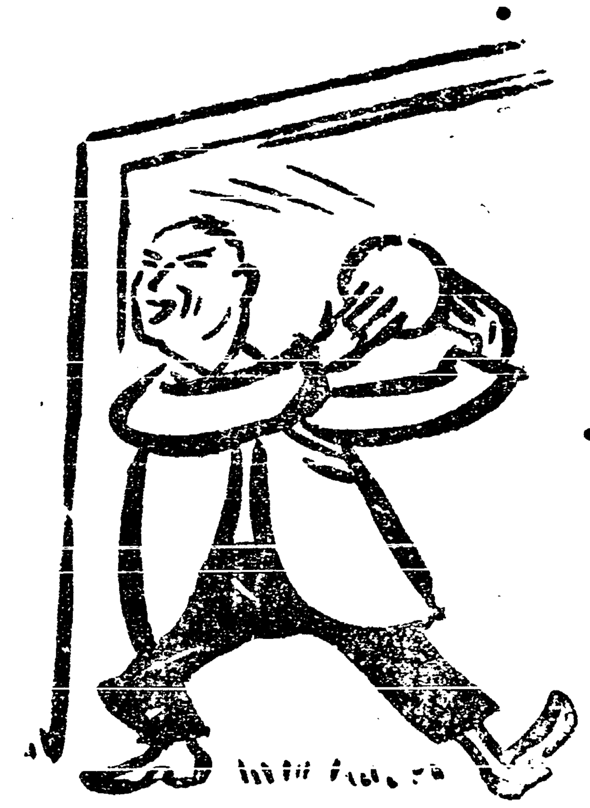

আমি আর দাঁড়াই নে।

'কিন্তু তার ফিরিস্তি শোনার জন্য আমি আর দাঁড়াই নে। ছুট মারি সালুনের দিকে। পরচুলা পড়ে খসে। কিন্তু না হ'ক হয়রানি কেবল!'

'পেলে না তোমার কোট?' অভিলাষ জিজ্ঞেস করে।

'ট্রেনও হারালাম—আর আমার ওভারকোটও।' পুরানো স্মৃতি উথলে উঠে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে অবিনাশের।—'তারপর থেকে মেশিনকে আমি ডরাই। মানুষের কাছে যদি বা কোন চাল মারি কখনও—মেশিনের কাছে একদম কোনো বেচাল নয়!'

বিসর্জন

দ্বিতীয় অঙ্ক

জনৈক পুরবাসী

[শিশুসাহিত্য-পরিষদের সাহিত্যিকেরা অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন নাটক'। তারই 'অন্দরের' খবর শোনাচ্ছেন একজন সাহিত্যিক অভিনেতা। প্রথম পর্য্যায় বা প্রথম অঙ্কের গল্প গত বছর শোনান হয়েছে। এবারে শোন তার পরের কাহিনী।]

অতঃপর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কাছে সংবাদ পৌঁছুতেও বিলম্ব হ'ল না। সকলের মধ্যেই "সাজ সাজ" রব পড়ে গেল। কিন্তু মুখে ফুটলো উল্টো বুলি; ভাবখানা—"ঢের হয়েচে; আর নয়।"

কিন্তু তারপর কবে, কখন আবার রিহার্সাল শুরু হ'ল তা মনে নেই। "প্রম্‌টাররাও" আমারই মতো ঘটনাটি একদম ভুলে গেছে। তবে কোথায় শুরু হ'ল, তা মনে আছে। মনে আছে ঘাসে ঢাকা বিশাল মাঠের এক পাশে প্রকাণ্ড ঘর—"সম্মেলন কক্ষ"। তার দু'পাশে পূবে-পশ্চিমে লম্বা ঢাকা বারান্দা। পূবের বারান্দাটির কোলে দু'টি কামিনী, একটি অশোক ও কয়েকটি সূর্যমুখী ফুলের গাছ। তার কিছু দূরে একটি পুরানো বট। গাছটির গোড়া কতকাল আগে বাঁধানো হয়েচে কে জানে! তার শান ফেটে এমন চৌচির হয়ে গেছে যে ফাটলগুলির মাঝ থেকে ঘাস ও আগাছার গুচ্ছ উঠে সবুজ জয়ধ্বজা উড়িয়েছে। কক্ষটির দক্ষিণে প্রকাণ্ড কাঠের মঞ্চ। এই মঞ্চটিই নাট্যমঞ্চে রূপান্তরিত হয়ে দর্শকগণের চোখে জল, মুখে হাসি, মনে বিরক্তি আনে। কক্ষের উত্তরাংশে দ্বিতলে বাঁধানো গ্যালারি। মঞ্চটির সম্মুখাংশে তখন ছিল, এবং সব সময়েই থাকে, দু'খানি "উইং" ও তার মাথায় পর্দা ঝোলাবার ব্যবস্থা।

কক্ষটির মধ্যে মঞ্চটির নীচে অনেকগুলি চেয়ার। মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখা ও আলো। এই কক্ষটির মধ্যে দশ-পনেরো জন লোক কথা বললে বক্তা নিজের কণ্ঠস্বরেই চমকে উঠে। এমনি স্থানে আমাদের বিসর্জনের বাজনা বেজে

উঠলো। সে বাজনা শুনে আমরাই মেতে উঠলাম। বাইরে সু-উচ্চ প্রাচীরের ওধারে গ্যাসের আলো-মাখা মাঠ-ভরা অন্ধকার, ঘাসের বনে ঝিঁঝির বুক-চেরা ডাক, বটের শাখায় পেচকের গভীর আর্তনাদ, পথ-চলতি মোটরের হর্ণের আওয়াজ, রিক্‌সার ঠং ঠং; ভিতরে কাঠের মঞ্চে আমাদের পদশব্দ, দেওয়ালে দেওয়ালে ও ছাদে নানা কণ্ঠের প্রতিধ্বনিত প্রতিধ্বনি এবং পাখার অবিরাম হুস্ হুস্ শব্দ।

কিন্তু চাঁদপাল ও গণেশ কই? সবাই এল, এমন কি পুরুতঠাকুরও এতগুলি যজমানের কাকুতিতে দ্রব হয়ে না এসে থাকতে পারলেন না, কিন্তু চাঁদপাল ও গণেশ তো এখনও আসে না! রাজামশাই তাঁর স্বভাবগত প্রশান্তিভরে বললেন, "ভয় নেই, সব ঠিক আছে। তোমরা নিজের নিজের পার্ট বল না।"

শেষে একদিন উদয় হলেন আমাদের পালের চাঁদ শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য। দেওয়ানখানায় যে অন্ধকার ছিল তা ধীরে কেটে গেল। কিন্তু তাঁর দেহের ঔজ্জ্বল্যে নয়, অভিনয়-কুশলতায়।

মনে পড়চে না, নেপাল, অক্রূর অথবা জয়সিংহ, কে যেন তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করে বস্‌লো, "দাদার কি ফিমেল পার্ট করার অভ্যাস আছে?"

আমার চোখে তাঁর অভিনয়-বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ "মেল" ও "ফিমেলের" হাবভাবের পার্থক্য একদিনও ধরা পড়ে নি। কেবল দেখছিলাম খাশা অভিনয় করছেন। দেহের সামান্য চাঞ্চল্যও নেই। দক্ষিণ বাহু সমুখে তুলে তর্জনী উঁচিয়ে এমন ধীর ভাবে মাঝে মাঝে সঞ্চালন করছিলেন যে দেখতে চমৎকার লাগছিল। এর মধ্যে ওরা "ফিমেলত্ব" কোথায় পেল?

দাদাও উত্তরে বললেন, "মাঝে মাঝে।"

যেন সব-জানি ও সব-বুঝি এমনি ভাব দেখিয়ে বললাম, "তাই বলুন।"

কিন্তু এমন চাঁদও একদিন পাল তুলে অস্তসাগরে সেই যে পাড়ি দিলেন আর উদয় হলেন না। এই চাঁদপালটিকে সৃষ্টি করতে রবীন্দ্রনাথকে যে কতবার চৌকি ছেড়ে উঠতে হয়েছিল কে বলবে?

অবশেষে একদিন রাজামশাই নিয়ে এলেন শ্রীবারীন দাশগুপ্ত নামক জনৈক ভদ্রলোককে। তিনিও ভদ্রলোকের এক কথার মতো ঐ পদেই আ-অভিনয় বহাল রয়ে গেলেন।

আর এলেন গণেশ শ্রীশ্রীহরি গাঙ্গুলি। মাথায় খাটো, কথায় বড়, কাজে দড়, বগলে পোর্টফোলিও ব্যাগ, পরনে কোট-পেন্টলুন শ্রীশ্রীহরিকে কে না চেনে?

কাজেই তাঁর পরিচয় কি আর দেবো? তিনি এসেই তড়বড় করে বললেন, "পাবলিসিটি দিয়ে সব মাত্ করে দেবো।"

শ্রীশ্রীহরির কথায় অবিশ্বাস করে এমন কেউই ছিল না এবং এখনও নেই। সবাই বললে, "শ্রীশ্রীহরি যখন বলছেন তখন তাই-ই হবে।"

পাবলিসিটি কে না চায়? শুনেছি সেকালে এবং একালে বক্তৃতাদি দেবার পর অনেক নামকরা লোক খবরের কাগজের অফিসে—সম্পাদকীয় মহলে (স্তম্ভে নয়) গিয়ে বসে থাকতেন ও থাকেন। কাজেই শ্রীশ্রীহরিকে বললাম, "ভাই রে, আমার কথাটা মনে রাখিস্।"

সেও বললে, "দেখুন না কি করি।"

এ কথা একশ' বার স্বীকার করবো যে সে কথা রেখেছিল বটে।

অতঃপর কাগজে আমাদের প্রত্যেকের অভিনয়-কুশলতার এমন পাবলিসিটি সে দিয়েছিল যে নক্ষত্ররায়, প্রহরী ও ধ্রুব ছাড়া আর কারো মনে কোন খেদই ছিল না; এমন কি নিজেকেও বাদ দেয় নি। ভাগ্যে স্বর্গে খবরের কাগজ যায় না।

এই সঙ্গে প্রমট্ করতে আবির্ভূত হলেন শ্রীধীরেন দত্ত। একেবারে পাকা সাহেব। মাথায় মস্ত টাক, তার তিন দিক্ ঘিরে কাশের মতো সাদা চুল। গায়ের রঙ—না, থাক্। মুখখানি পরিষ্কার কামানো, আঙুলে গুটি কয়েক আংটি। "থিয়েটার" করা ও করানোর ভারী ঝোঁক। অত বড় শরীরে রাগ বলে কিছুই নেই। উদয়াস্ত জাহাজঘাটায় কাটিয়েও রিহার্শাল দেবার উৎসাহ এত বেশী থাকে যে দেখলে মনে হয় "আমরা আর কি করচি? থিয়েটার করতে হলে ধীরেন বাবুই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।" চোখে চশমা থাকতেও রাত্রে তিনি আমাদেরই মতো অক্ষর-কানা। বইখানা দু'হাতে চোখের সম্মুখে বেশ কিছুটা তফাতে ধরে মাথাটা এদিক্ ওদিক্ হেলিয়ে ভ্রূ কুঁচকে অক্ষরগুলি পড়বার চেষ্টা করতেন। কিন্তু অক্ষরগুলোও এমনি চঞ্চল ও দুরন্ত যে বিজলী আলোর ঔজ্জ্বল্যে পাতার ওপর দিয়ে পিছলে বেমালুম আত্মগোপন করতো। তিনিও ছাড়তেন না। বইখানিকে ঝাঁকি দিয়ে, এদিক্ ওদিকে কাৎ করে তাদের দৃষ্টিপথে এনে দাঁড় করাতেন। অক্ষরগুলোও প্রতিশোধ নিতে ছাড়তো না। তাই "অক্রূর" হ'ত "নেপাল", "গোমতীর শীর্ণ জলরেখা" "গোমতীর জল খা" হতে হতে রয়ে যেত। কখন কখন দু'-একটি পংক্তি একদম যেত তলিয়ে। তবুও বলবো, তাঁর মতো নিষ্ঠা কারো ছিল না, কোন দিন হবে না, হতে পারে না। এর ওপর ছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা "মোশান মাষ্টারী" করবার। করতেনও। কিন্তু পুরুত ঠাকুরের "ফুৎকারে ফাটিত সেই আশার বেলুন

জলবিম্ব সম।" আমাদের পুরবাসীদের প্রতি তাঁর বরাবরই কেমন একটু তাচ্ছিল্য ভাব ছিল। তবে এটাকে তাঁর দোষ বললে খুবই অন্যায় হবে। কারণ আমাদের জন্য সত্যিকারের মাথাব্যথা খুব কম লোকেরই ছিল, কিন্তু আমাদের কাঁধে পা রেখে ওপরে উঠবার আগ্রহ ছিল অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষীরই।

যাই হোক, রিহার্শালের পথ ধরে আমরা ধীরে অভিনয়ের দিকে এগিয়ে চললাম। স্থির হ'ল, ঐ ঘরে ঐ মঞ্চেই পটাদি সজ্জিত করে অভিনয়ানুষ্ঠান হবে। কিন্তু টাকার খোঁচাটি মাঝে মাঝে মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে লাগলো।

যেমন আগে হ'ত এখনও তেম্নি কেউই বড় একটা ঠিক সময়ে আসেন না। এক একদিন গিয়ে দেখি, সব অন্ধকার। কোন কোন দিন দেখি মাঠের অন্ধকারে বটতলার কাছাকাছি একটি জায়গায় জোনাকির মতো কি জ্বলছে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাই। সাপের, বাঘের, ভূতের বা চোর-ডাকাতের ভয়ে নয়, অচেনা লোকের ভয়ে। গিয়ে দেখবো হয়তো সবজান্তা কোন তরুণ বা তরুণ-সংঘ, আলোচনায় উন্মত্ত। আমাকে দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলবে অথবা সকৌতুক হাস্যে বিদ্ধ করবে। কিন্তু আমার ভাগ্য নিতান্তই ভাল বলতে হবে যে, এ রকম অবস্থায় কোনদিনই অচেনা কারো সম্মুখীন হতে হয় নি। কোন দিন দেখেছি নেপাল, কোন দিন নেপাল, জয়সিংহ ও অপর্ণা, কোন দিন নক্ষত্ররায়, দূরস্থিত নক্ষত্রের মতো জ্বলছেন ও নিবছেন। আবার এক একদিন অন্ধকারে সম্মেলন-কক্ষের দরজাটি কোন রকমে খুলে ভিতরে ঢুকে দু'হাতে অন্ধকার ঠেলতে ঠেলতে মঞ্চের সিঁড়ি পর্যন্ত যাই। তারপর সিঁড়িপথে ধাপে ধাপে উঠে সুইচের কাছে গিয়ে ভয়ে ভয়ে সুইচ টিপি। বালিগঞ্জের বিদ্যুৎ ভারি শক্তিশালী! ও ধাক্কা দেয় না, আকর্ষণ করে। অমনি বিশাল কক্ষটি আলোয় ভরে ওঠে। তাকিয়ে দেখি, শূন্য চেয়ারগুলি কোথাও ছড়ানো, কোথাও নিঃসঙ্গ। জানালার ধারে দু'-একটি শূন্য পেয়ালা—চায়ের। কক্ষের প্রত্যেকটি জানালা ও দরজা রুদ্ধ। সেগুলি খুলে একখানি চেয়ার বাইরে পূবের বারান্দার অন্ধকার কোণে টেনে নিয়ে একাকী বসে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকি।

এক-একদিন দু'-চারজন এসে সদর দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, "কেউ আসে নি।" এবং কেউ কেউ বাইরে বারান্দাতেও বেরিয়ে আসেন কিন্তু আমায় দেখতে পান না। আমার গায়ের রঙই না হয় অন্ধকারে মিশে যাবার মতো, কিন্তু জামার রঙে তো সাহেবেরও হিংসা হবার কথা।

(ক্রমশঃ)

সোনার বালুচরে

শ্রীঅশোক সেন, এম্. এ

এর আগে যা বেরিয়েছে :—আমার বন্ধু উইল ঘরবাড়ী ছেড়ে দক্ষিণ ক্যারোলিনার একটি ছোট্ট দ্বীপে পুরোনো বিশ্বস্ত নিগ্রো চাকর জুপিটারকে নিয়ে বসবাস সুরু করেন। তাঁর ছিল কীটপতঙ্গ সংগ্রহের বাতিক। একদিন তিনি একটা অদ্ভুত সোনালী পোকা পেয়ে আমাকে তার ছবি এঁকে দেখান। ছবি দেখে আমার মনে হ'ল ওটা একটা মড়ার মাথার খুলির নক্সা। এ কথা শুনবার পর থেকেই উইলের হাবভাব কেমন অদ্ভুত হয়ে গেল। তার পর একদিন তাঁর আহ্বানে আমাকে তাঁদের সঙ্গে নদীর ওপারের পাহাড়ে এক অভিযানে যেতে হ'ল। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এক ওক গাছের ডালের ওপর পাওয়া গেল একটা মড়ার মাথার খুলি। উইলের নির্দ্দেশ মত সোনালী পোকাটাকে সূতোয় বেঁধে সেই খুলির ডান চোখের ভিতর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে ঠিক তার তলা চিহ্নিত করা হ'ল। তার পর সেখানটা খানিকটা খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল দু'টো পুরো নরকঙ্কাল! এইবার পড়।

—ছয়—

গর্ত্তের মধ্যে কংকালের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে অনেক লোহার বোতাম আর পচা তুলোর গুঁড়োর মত কি যেন। কোদালের দু'-এক ঘা পড়তেই বেরিয়ে এল স্পেন দেশীয় বড় ছুরির একখানা ফলা। আরও কিছুটা খুঁড়তে পেলুম সোনা-রূপোর কিছু খুচরো মুদ্রা।

জুপিটার তো স্ফূর্ত্তিতে লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু তার মনিব ভারি নিরাশ হলেন। তবু তিনি আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে বল্লেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আমি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সামনে পড়ে গেলুম—মাটিতে বসানো একটা লোহার আংটায় জুতোটা আটকে গিয়েছিল।

আবার দ্রুত কাজ চলতে লাগল। দশ মিনিট কাটল গভীর উত্তেজনায়। এর মধ্যে একটা কাঠের আয়তাকার সিন্দুক প্রায় বের করে এনেছি। সিন্দুকটা আশ্চর্য রকম মজবুত—মাটির নীচে ছিল বলে কোন রকম নষ্ট হয় নি! লম্বায় সেটা প্রায় সাড়ে তিন ফুট হবে, চওড়াও তিন ফুটের কম নয়, আর প্রায় আড়াই ফুট গভীর—লোহার ব্যাণ্ড দিয়ে বেশ শক্ত করে আটকান। সমস্ত জিনিষটা জাফরি দিয়ে ঘেরা। সিন্দুকটার ওপরে তিনটে তিনটে করে ছ'টা লোহার রিং রয়েছে—যাতে করে ছ'জন লোক ওটাকে শক্ত করে ধরে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমরা সকলে মিলে অনেক চেষ্টা করে ওটাকে সামান্য একটু নড়াতে পারলুম মাত্র। এত ভারি জিনিস কি করে সরাব তা বুঝলুম না। তবু ভাল যে ঢাকনিটার মাত্র দু'টো মুখ আটকান ছিল। জোর দিয়ে সেটা ধরে টান দিতেই ঢাকনিটা খুলে গেল— দেখলুম, ভিতরে কি যেন রাশি রাশি জমাট বেঁধে রয়েছে! লণ্ঠনের আলো ভিতরে পড়তেই ভাল করে দেখতে পেলুম,—স্তূপীকৃত রত্নালংকার! আমাদের চোখ ঝলসে গেল।

আমার মনের ভাব তখন কি হয়েছিল তা আর নাই বা বললুম। বিস্ময়াভিভূত হওয়া কথাটা বইয়েই পড়েছি, নিজে কখনো অনুভব করি নি। কিন্তু তখন বোধ হয় আমার অবস্থাটা হয়েছিল ঠিক ঐ রকম কিছু। উইল তখন উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়েছেন বলে মনে হ'ল—কোন কথাই তিনি বলতে পারলেন না। জুপিটারের কথা আর কি বলব, নির্ব্বাক্ হয়ে সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। রূপকথার সাত সাগরের মণি-মাণিক্য আজ আমাদেরই সামনে ছড়ান রয়েছে—এ কথাটা সহজে বিশ্বাস করি কি করে?

হঠাৎ জুপের কি হ'ল জানি নে, সে হাঁটু গেড়ে বসে তার কনুই পর্যন্ত দু'হাত ডুবিয়ে দিলে সোনার রাশির মধ্যে। সে ভাবেই সে কিছুক্ষণ বসে রইল; তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের মনেই বল্লে—"সব কিছু এসেছে ঐ সোনার পোকাটা থেকে। কি সুন্দর পোকা! কত রকমই না ওকে গালমন্দ করেছি!" তারপর নিজের দিকেই তাকিয়ে বলল, "বেটা নিগ্রো, এজন্যে তোর লজ্জিত হওয়া উচিত। বল্ হয়েছিস্?"

এখন কি করে এ সব ধনরত্ন সরান যায় তাই ভাবতে লাগলুম। রাত হয়ে যাচ্ছে। ভোর হবার আগেই জিনিসগুলো বাড়ীতে নিয়ে ফেলতে হবে। অনেকক্ষণ এ নিয়ে পরামর্শ চলল, কিন্তু কোন উপায় মাথায় এল না। মাথাও অবশ্য তখন আমাদের ঠিক ছিল না। শেষে খেয়াল হ'ল, বেশীর ভাগ জিনিস নামিয়ে সিন্দুকটাকে হাল্কা করলে হয়তো গর্ত থেকে ওপরে তোলা সহজ হবে। তাই করা হ'ল। যে জিনিসগুলো নামানো হ'ল সেগুলোকে একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে রেখে কুকুরটার ওপর দেওয়া হ'ল সেগুলো পাহারা দেবার ভার। জুপিটার তাকে কড়া আদেশ দিয়ে গেল, সে-জায়গা থেকে সে যেন এক পা-ও না নড়ে, ডাকাডাকি না করে। তারপর অতি কষ্টে সিন্দুকটাকে গর্ত থেকে তুলে আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। লম্বা পথ হেঁটে যখন ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলুম তখন রাত একটা হবে। এতটা পরিশ্রমের পর আবার তখুনি বেরুতে পারলুম না। দু'টো পর্য্যন্ত বিশ্রাম করে খাওয়া-দাওয়া সারলুম, তারপর আবার রওনা হলুম। এবারে সঙ্গে নিলুম তিনটে শক্ত বড় থলি। চারটের কিছু আগে গর্তের কাছে এসে পৌছলুম, তারপর বাকি রত্নগুলি তিনজনে সমান অংশে ভাগ করে আবার বাড়ীর দিকে চললুম। যখন বাড়ীতে পৌছলুম তখন পূর্বাকাশে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে।

—সাত—

ক্লান্তিতে শরীর আমাদের অবশ হয়ে আসছিল, আর দাঁড়াতে পারছিলুম না। তখুনি সকলে ঘুমুতে গেলুম। তিন-চার ঘণ্টা পর সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন সকলের মনেই এক চিন্তা ঘুরছে। অন্য সব কাজ ফেলে বসে গেলুম গুপ্তধনের হিসেব-নিকেশ করতে। সিন্দুকটা একেবারে ঠাসা ছিল। সেদিন সমস্ত দিন এবং রাত্রিরও বেশীর ভাগ সময় জিনিসগুলো ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখলুম। কিছুই সাজান ছিল না, সব এলোমেলো ভাবে স্তূপ করা ছিল। খুব সাবধানে বাছাই করে সাজানোর পর দেখা গেল, যা ভেবেছিলুম তার চেয়ে ঢের বেশী ধন-

দৌলতের মালিক আমরা। তাতে তখনকার দিনের সাড়ে চার লক্ষ ডলারের বেশী মূল্যের মুদ্রা ছিল। এক টুকরোও রূপো ছিল না, সব কিছুই আগের আমলের নানা রকমের সোনার জিনিস—ফরাসী, জার্মান, স্পেন দেশীয় মুদ্রা। কয়েকটি ইংলণ্ডের গিনি এবং আরো অনেক রকমের মুদ্রা যা আগে কখনো দেখি নি। অনেকগুলি খুব ভারি বড় মুদ্রা ছিল,—লেখাগুলো একেবারে মুছে গেছে বলে কিছুই পড়তে পারলুম না। রত্ন ও অলংকারগুলির দাম ঠিক করতে আমাদের আরো অসুবিধা হ'ল। সব শুদ্ধ একশ' দশটা হীরে ছিল—তার মধ্যে কতকগুলি খুবই বড়। এ ছাড়া পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত মণিও ছিল অনেকগুলি। আর সোনার গয়না, মূর্তি, বাসনপত্র ইত্যাদি যে কত ছিল তার আর হিসেব দেওয়া যায় না।

তবু হিসেব করে মনে হ'ল, সিন্দুকের সমস্ত জিনিসের দাম কম করে ১৫ লক্ষ ডলার তো হবেই। পরে অবশ্য যাচাই করে বুঝেছি, আমরা খুব কম করেই দাম ধরেছিলুম। ওর চেয়ে ঢের বেশী দামে ওগুলো বিক্রী করা গিয়েছিল।

গহনাপত্র সব পরীক্ষা করে বাছাই করা হয়ে গেলে আমাদের উত্তেজনাও আস্তে আস্তে কমতে লাগলো। আমার মনের মধ্যে কিন্তু একটা চিন্তাই সব সময়ে ঘুরছিল—কেমন করে কি হ'ল ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না; সমস্ত রহস্যটা জানবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লুম।

উইল আমার অবস্থাটা বোধ হয় আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তাই হাসিমুখে বল্লেন, "চল, সমস্ত ব্যাপারটা এইবার তোমায় খুলে বলি।"

তার পর তিনি ধীরে ধীরে সুরু করলেন :

"সেদিন রাত্রে পোকা আঁকা কাগজের টুকরোটা তোমায় দেখতে দিয়েছিলুম, সে কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। তুমি বার বার বলছিলে আমার নকশাটা দেখতে হয়েছে একটা মড়ার খুলির মত। তাতে আমি বিরক্তই হয়েছিলুম। পরে আমার খেয়াল হ'ল, পোকাটার পিঠে কতকগুলি অদ্ভুত দাগ আছে। সেজন্যে তোমার কথা কিছুটা সত্যি হতেও পারে। তা হ'লেও তোমার ঠাট্টায় আমি বিরক্ত হয়েছিলুম—কেননা আর্টিস্ট বলে এক সময়ে আমার একটু নাম ছিল। তুমি যখন টুকরোটা আমাকে ফিরিয়ে দিলে তখন রাগ করে আমি ওটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে যাচ্ছিলুম।"

আমি বল্লুম—"সেই কাগজের টুকরোটার কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ। তবে ওটা কাগজ নয়, কাগজের মত দেখতে বটে; প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলুম। কিন্তু ওটার ওপর আঁকতে গিয়ে দেখি জিনিষটা খুব পাৎলা পার্চমেণ্ট। ওটা খুব নোংরা ছিল, তোমার মনে আছে হয়তো! মুড়ে ফেলতে গিয়ে আমার নজর পড়ল সেই নকশাটার ওপর। অবাক হয়ে দেখলুম সত্যি সে জায়গাটায় একটা মড়ার খুলির ছবি।

(ক্রমশঃ)

বল তো কিসের ছবি ?

নীচের ছবি দু'টিতে দু'জন বিখ্যাত লোকের জীবনের দু'টি ঘটনা আঁকা হয়েছে। বলতে পার এঁরা কারা এবং কোন্ সে ঘটনা ?

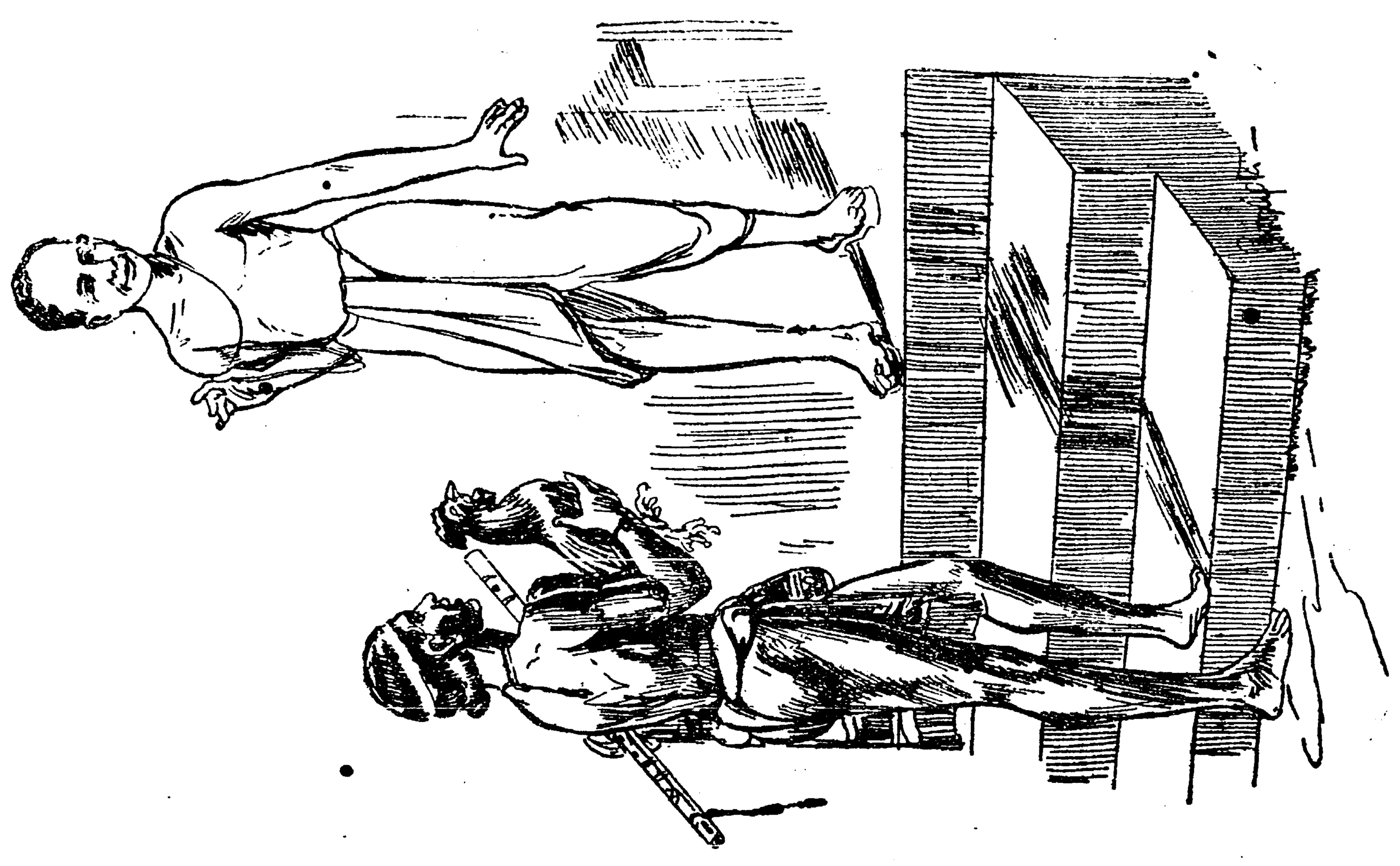

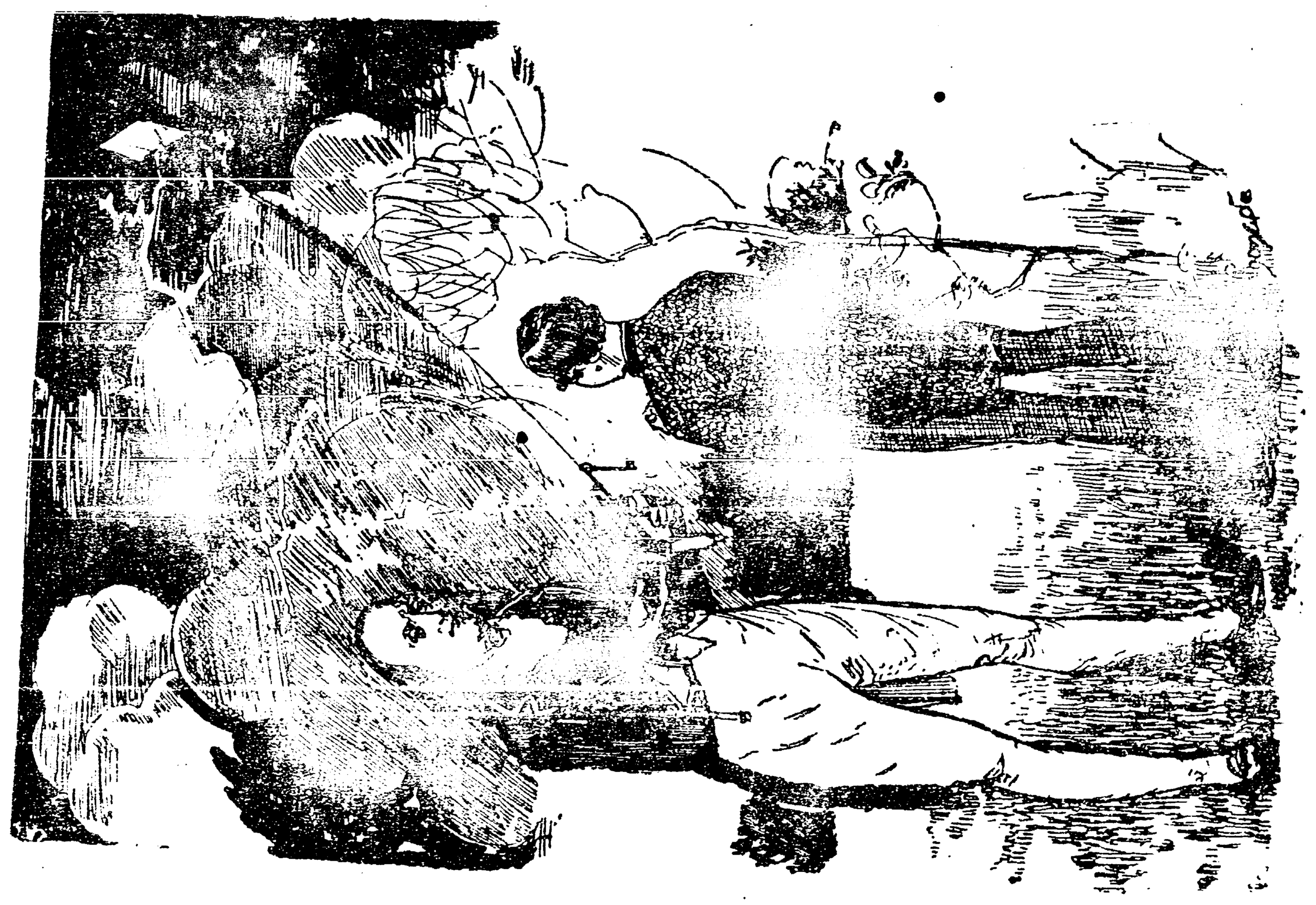

(উত্তর শেষ দিকে দেখ।)

গাঁজাখুরী গল্প

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ট্রেনে আসছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। শীতের রাত। জানালা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে আসছি। গয়া থেকে একদল যুবক উঠলো আমার গাড়ীতে। গাড়ীতে জায়গা ছিল; থিতিয়ে গুছিয়ে বসে তারা এক একটি বিড়ি ধরালো। নীরবে বিড়িগুলি নিঃশেষ করে একজন বললো—ধুৎ, ঠাণ্ডায় বিড়ি তেমন জমছে না। এক ছিলিম গাঁজা চড়ালে মন্দ হয় না!

পোঁটলা থেকে একজন একটি গাঁজার কল্কে বার করলো। গাঁজা সাজা হ'ল, মুখে মুখে ফিরতে লাগলো গাঁজার কল্কে। দেখতে দেখতে ধোঁয়ায় চারিপাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল, একটা বিদ্ঘুটে গন্ধে আমার মাথা ধরে গেল। আমার দিকের জানালাটা খুলে দিলাম। একজন হেসে বললো—বাংগালী বাবুর কষ্ট লাগছে, না?

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকে শীত করলেও বেশ স্বস্তি বোধ করলাম।

সহসা কোথা থেকে একটি পঙ্গপাল এসে পড়লো কামরার ভিতর এবং পড়লো এক গাঁজাখোরের কোলের উপর। ক'দিন আগে এ অঞ্চলে পঙ্গপালের উপদ্রব হয়েছিল, এটি বোধ হয় সেই দলেরই একটি।

গাঁজাখোর সেই পঙ্গপালটি চোখের সামনে তুলে ধরলো, তারপর বললো—এই পঙ্গপাল আমাদের কত ক্ষতি করে, কত চাষী সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমার এক কাকা এই পঙ্গপাল থেকেই বড় মানুষ হয়ে গেল!

—কি রকম?

—আমি তখন খুব ছোট, সেই সময় একবার এদিকে পঙ্গপালের খুব উপদ্রব হয়েছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল এসে ক্ষেত-খামার সব নিশ্চিহ্ন করে দেয়। গাছে একটা পাতা অবধি রাখে নি। কাকা ছিলেন পাটনায়। তিনি শুনলেন নেপালে পঙ্গপাল বিক্রী হয়, লোকে খায়। সেই দিনই তিনি গাঁয়ে এসে সব ক্ষেতের উপর জাল পেতে দিলেন। মাইলের পর মাইল শুধু জাল পাতা। পঙ্গপাল দলে দলে নামে আর আটকে যায়। সেই সব পঙ্গপাল ধরে প্যাক্ করে তিনি চালান দিলেন নেপালে। সেখানে তখন পঙ্গপালের সের তু'-পয়সা করে। কাকা প্রায় এক মণ পঙ্গপাল সেবার বিক্রী করেন। তা থেকে তিনি যে টাকা পান তাইতেই

পাটনা সহরে প্রকাণ্ড বাগানওয়ালা বাড়ী, গাঁয়ে প্রায় হাজার খানেক বিঘে জমি তিনি খরিদ করেন।

প্রত্যেকেই নিবিষ্ট মনে গল্প শুনছিল। এবার দ্বিতীয় গাঁজাখোর বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে বললো,—ও রকম হয়। আমার পিসে মশাইয়ের ঠিক অমনিই হয়েছিল। সেবার সেই যে ভয়ানক ঝড় হয়ে গেল। আমার পিসে মশাই তখন বাড়ীর ছাদে ঘুড়ী ওড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ ঝড়ের এক ঝাপটা এসে লাগলো। তারপরেই পিসে মশাই দেখেন কি যে তিনি একেবারে আকাশে উঠে গেছেন। তাঁর ভয় হ'ল তিনি পড়ে যাবেন। কিন্তু তিনি পড়লেন না, এসে নামলেন এক গাছের উপর। কোথায় জান? ইংলণ্ডে। পৃথিবী তো চব্বিশ ঘণ্টায় এক পাক ঘোরে। পিসে মশাই যতক্ষণ শূন্যে ছিলেন পৃথিবী ততক্ষণে খানিকটা ঘুরে গেছে, কাজেই তিনি নেমেছেন একেবারে বিলাতে। তাঁর ভালই হ'ল, তিনি তখন ডাক্তারী করছিলেন। বিলাতে থেকে এম. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. এস হয়ে ফিরলেন। বড় ডাক্তার হিসাবে পশার জমে উঠলো।

তুমি তো ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবার কথা বলছ—তৃতীয় গাঁজাখোর বললো;—আমার জ্যাঠামশাই উড়েছেন বহুবার। তিনি আসামে চাকরী করতেন। আসাম মুল্লুকের মশা তো জান? যখনই তাঁর খেয়াল হ'ত দেশে আসবেন, তখনই রাত্রে চিটেগুড় গায়ে মেখে শুতেন। আর মশা কামড়াতে এসে গায়ে আটকে যেত। তারপর এক গা মশা বন্ বন্ করে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে আসতো দেশে। মশার বন্ বন্ শব্দ এমনই হ'ত যে মনে হ'ত যেন এরোপ্লেন আসছে! সেই শব্দ শুনলেই আমরা বুঝতাম যে জ্যাঠা মশাই দেশে এলেন।

তুমি মশায় মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার কথা বলছ,—চতুর্থ গাঁজাখোর বললো,—ছারপোকা লোককে টেনে নিয়ে যায় দেখেছ? আমাদের গাঁয়ের মোড়ল ছিল খুব তুর্দান্ত। তাকে শায়েস্তা করার জন্য গাঁয়ের লোকেরা বাছাই করে বড় বড় ছারপোকা ছেড়ে দিয়ে এসেছিল তার খাটিয়ায়। সে জানে না, রাত্রে ঘুমিয়েছে; সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে ছারপোকাগুলো তাকে টেনে নিয়ে গেছে একেবারে গাঁয়ের বাইরে এক জংগলের মাঝে।

বড় ছারপোকা, হুঁঃ!—পঞ্চম গাঁজাখোর বললো.—আমার দাদা এক জোড়া পিঁপড়ে পুষেছিল। তাদেরকে মাখন খাওয়াতো আর রোজ এক মাইল করে দৌড় করাতো। এক বছরের মধ্যে পিঁপড়েগুলো আরশুলার মত বড় হয়ে গেল। তারপর লাগালো ইঞ্জেকশান। আর এক বছরে সেগুলো হ'ল বিড়ালের মত।

তখন সে সে-দু'টি বেচে দিল জার্মানীর হেগনবেক্ সার্কাসে। তখন জার্মানীর সঙ্গে লড়াই চলছে। জাহাজে যাবার সময়ে ইংরেজরা সেই জাহাজখানি ডুবিয়ে দিল, নইলে আমার দাদার নাম হ'ত আজ বিশ্বযোড়া।

এবার আমার দিকে সবাইকার নজর পড়লো, একজন বললো,—বাংগালী বাবু, আপনি কিছু বলছেন না?

আমি আর কি বলবো? আমি বললাম,—আপনারা পিঁপড়ের কথা বলছেন, ছেলেবেলায় আমারও কানের মধ্যে একটি পিঁপড়ে ঢুকেছিল। কামড়ে কামড়ে আমার কান এত ফুলিয়ে দিয়েছিল যে একটা কান একেবারে হাতীর মত হয়ে গিয়েছিল। গরমের দিনে আমি সেই কান দিয়ে বাতাস খেতাম। কত লোক দেখতে আসতো। দেখার টিকিট করেছিলাম এক পয়সা। তা থেকে এক মাসে আমার দশ হাজার টাকা আয় হয়েছিল। সেই থেকে পাছে আর কখনো আমার কানে কিছু ঢোকে তাই মোম দিয়ে কান বন্ধ করে দিয়েছি, আর কিছুই শুনি না।

গাঁজাখোর পাঁচজন মাথা নেড়ে বিজ্ঞভাবে বললো,—হ্যাঁ হ্যাঁ, কানের মধ্যে পোকা-মাকড় ঢুকলে অমন হয়, আমরা জানি।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

এর আগে যা বেরিয়েছে: আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে মান্তাং উপত্যকা। এটা রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশ। একদল শ্বেতাঙ্গ বিশ্রামপ্রার্থী সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এদেরই একটি দলকে পাঠানো

হ'ল রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সদ্ভাব পাতাবার জন্য। দলে রইল দলপতি জো, হেনরী আর ডিক। আর রইল ডিকের শিক্ষিত কুকুর ক্রুসো। গ্রেট প্রেয়ারির প্রান্তর হয়ে, বাইসনের রাজ্য পেরিয়ে 'পনি' রেড ইণ্ডিয়ানদের এলাকায় পৌঁছে ওরা উপহার দিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করল। উপহার পেয়ে পনিরা মুখে সদ্ভাব দেখালেও বাকি জিনিষগুলির লোভে ওদের নজরবন্দী করে রাখল। ইতিমধ্যে ক্রুসোর সাহায্যে একটি রেড ইণ্ডিয়ান ছেলেকে জল থেকে বাঁচানোয় ছেলেটির কৃতজ্ঞ মায়ের সাহায্যে ওরা পালাবার সুযোগ পেল। পনিরা বৃথাই ওদের খোঁজে ফিরল। তার পর পড়।

—এগারো—

নির্জ্জন প্রান্তরের বুকে আবার ঘোড়া ছোটানো শুরু হ'লো। এই ভাবে কেটে গেলো কয়েক দিন। কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও ওরা সিয়াউ রেড্ ইণ্ডিয়ানদের কোনো গ্রামের সন্ধান পেলো না। পথে যে দু'য়েকটা ছোটখাট দলের সন্ধান পেয়েছিলো, ওরা সযত্নে এড়িয়ে এসেছিলো তাদের। কারণ ওরা জানতো তাদের হাতে একবার পড়লে আর নিস্তার নেই।

সেদিন রাত্রে ওরা একটা ছোট নদীর তীরে বিশ্রামের জন্য থামলো। পূরো একরাত্রি একদিন ওরা জলের অভাবে কাটিয়েছে। তৃষ্ণায় সকলেই অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিলো; ঘোড়াগুলোও অস্থির হ'য়ে উঠেছিল।

তাড়াতড়ি সবাই নদীতে নেমে পড়লো। এ প্রান্তরের জল অনেক সময় অত্যন্ত লোনা হয়, কিন্তু ওদের সৌভাগ্যক্রমে এ নদীর জল লবণাক্ত হ'লেও অপেয় ছিল না।

জো বললো, "দাঁড়াও, একটা ব্যবস্থা করছি।" ব'লে সে নদীর তীরে এক জায়গায় বসে হাত দিয়ে বালি তুলতে লাগলো। কিছুক্ষণ বালি তুলবার পর সেখানে যে জল উঠলো, দেখা গেল, তার স্বাদ নদীর জলের থেকে ভালো। সেই জল আকণ্ঠ পান ক'রে ওরা ঠিক করল সে রাত্রিটা ওখানেই কাটিয়ে দেবে।

ওরই মধ্যে গাছপাতার আড়ালে একটা আশ্রয়স্থল বেছে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা শুয়ে পড়লো। শোবার আগে চারিদিকে আগুন জ্বেলে রাখতে ভুললো না, কারণ রেড্ ইণ্ডিয়ান না থাকুক, নেকড়ের অভাব নেই এ অঞ্চলে।

"ঘেউ ঘেউ, ঘেউ ঘেউ!"

ক্রুসোর ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে ওদের ঘুম ভেঙে গেলো। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

"নেকড়ে বোধ হয়!" জো রাইফেল বাগিয়ে ধ'রে বললো।

আবার ক্রুসো গর্জ্জন ক'রে উঠলো; কিছুদূর পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে অধীর ভাবে বাতাস শুঁকতে লাগলো।

"ওঠো ওঠো; ঘোড়া প্রস্তুত ক'রে নাও তোমরা। ক্রুসো নিশ্চয়ই কোনো বিপদের সন্ধান পেয়েছে। কারণ বিশেষ উত্তেজিত না হ'লে ক্রুসো কখনো এমন ব্যবহার করে না!"

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ওরা ঘোড়ায় চ'ড়ে প্রস্তুত হয়ে নিলো।

"কুকুরটাকে ডেকে নাও ডিক!" ফিসফিস ক'রে জো বললো, "ওর চীৎকার শুনলে শত্রু আমাদের আক্রমণ ক'রে বসবে।"

"ক্রুসো, এদিকে আয়!"

কিন্তু ক্রুসো তার আগে থেকেই ভীষণ চীৎকার শুরু ক'রে দিয়েছিলো। একদল রেড্ ইণ্ডিয়ান প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল; ক্রুসোর গর্জ্জনে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে এদের আক্রমণ করলো।

"পালাও, পালাও সবাই!" জো চীৎকার ক'রে উঠলো। "একবার ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই!"

সঙ্গে সঙ্গে তিন জনে সবেগে ধেয়ে চললো। এতক্ষণে রেড্ ইণ্ডিয়ানরা ওদের স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। সোল্লাসে চীৎকার ক'রতে ক'রতে তারা ওদের পেছনে ধাওয়া করলো।

আর লুকোবার চেষ্টা বৃথা জেনে ওরা উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটে চললো। সে এক অদ্ভুত উত্তেজনা।

আক্রমণকারীর দল মহা উল্লাসে পূর্ণবেগে ওদের আক্রমণ ক'রছে। কোন রকমে একবার ধ'রতে পারলে যে সঙ্গে সঙ্গে ওদের মালপত্র, ঘোড়া ছিনিয়ে নিয়ে মাথার চামড়া তুলে নেবে এ খবর জো, ডিক আর হেনরী খুব ভালো ক'রেই জানে। এ ভাবে আক্রান্ত হ'য়ে তারা পাগলের মত ঘোড়া ছোটাতে লাগলো। ঘোড়াগুলোও আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে ধেয়ে চললো বিদ্যুৎগতিতে। কিন্তু তবুও দু'দলের মধ্যেকার ব্যবধান আগের মতই রয়ে গেলো।

"ওরা বুনো ঘোড়ার সওয়ার!" পলকের জন্য পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে জো বললো। "ওদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। দড়ির ফাঁস—ল্যাসো ছুঁড়তে ওরা খুব ওস্তাদ্। মানুষ, এমন কি ঘোড়াকে পর্য্যন্ত ওরা খুব সহজেই ল্যাসোয় বেঁধে ফেলে। সুতরাং খুব সাবধান। আর একটা জিনিষও লক্ষ্য ক'রতে হবে। ব্যাজারদের গর্ত্তে যাতে কোন মতেই ঘোড়ার পা না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পথ চলবে।"

সে বিষয়ে ওদের নতুন ক'রে সাবধান ক'রে দেবার কোন প্রয়োজন ছিলো না। অদূরে একটা ছোট্ট পার্ব্বত্য নদী দেখা যাচ্ছে,—সে নদী ওদের পেরিয়ে যেতে হবে। কোন্খান দিয়ে গেলে নদী পার হওয়া সহজ হবে মনে মনে তার একটা হিসেব ক'রে নিয়ে ডিক সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। জো আর হেনরীও প্রাণপণে ছুটে চললো সেদিকে। একটা বড়গোছের ঝোপ সামনে পড়ায় ডিক তার ডান পাশ দিয়ে ছুটে চললো। জো আর হেনরী তাড়াতাড়ি ধেয়ে গেলো তার বাঁ পাশ দিয়ে। ফলে ওরা আর পরস্পরকে দেখতে পেলো না। কিন্তু তখন আর এ ভুল সংশোধন করবার সময় নেই; কারণ সঙ্গে সঙ্গে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে মহা বেগে তাড়া ক'রে এলো নির্ম্মম রেড ইণ্ডিয়ানের দল। নদীর তীরে পৌঁছে অপর পারের দিকে তাকিয়ে ডিক হতাশ হ'য়ে দেখলো, নদীর ওপারের তীর প্রায় কুড়ি ফুট মতো খাড়াই উঠে গিয়েছে যা ডিঙিয়ে যাওয়া যে কোন ঘোড়ার পক্ষে অসম্ভব; ঘোড়ার বেগ কিছুমাত্র না কমিয়ে কয়েক শ' গজ পথ নদী বরাবর চলবার পর ডিক যেখানে এসে পৌঁছলো, অপর পারের উচ্চতা সেখানে অনেকটা কম এবং কোন দুঃসাহসী ঘোড়ার পক্ষে তা এক লাফে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। ইতিমধ্যে শত্রু তার কাছে এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার মহা-উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠলো।

এক প্রকাণ্ড লাফ মেরে ডিকের ঘোড়া সে বাধা অতিক্রম ক'রে গেলো। কিন্তু ক্রুসো অতটা লাফাতে পারলো না; সে তীর ধরে প্রাণপণে ছুটতে লাগলো। কিন্তু ততক্ষণে রেড ইণ্ডিয়ানদের দলের অগ্রণী তার খুব কাছেই এসে পড়েছে। ল্যাসোটা মুহূর্ত্তের জন্য বন্‌বন্ ক'রে ঘুরিয়ে নিয়ে সে ক্রুসোর মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসোর আর্ত্ত চীৎকারে সারা প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠলো।

ক্রুসোর চীৎকার শোনা মাত্র ডিক ফিরে তাকিয়ে দেখলো ক্রুসোকে রেড ইণ্ডিয়ানটা তূলোর বস্তার মতো স্বচ্ছন্দে তুলে নিচ্ছে। তার এত আদরের ক্রুসোর এই বিপদে ডিক নিজের বিপদের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে ক্রুসোর সাহায্যের জন্য ঘোড়াকে সেদিকে ফিরতে ইঙ্গিত করলো। কিন্তু ঘোড়া তখন তার আয়ত্তের বাইরে চ'লে গিয়েছে—এই প্রথম সে প্রভুর আদেশ অমান্য করলো। উন্মত্তের মতো ডিক লাগাম টানতে লাগলো; কিন্তু কিছুতেই ঘোড়াকে বশে আনতে পারলো না।

এইভাবে বিদ্যুৎগতিতে আরো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ছুটবার পর ডিক আর একবার মাথা তুলে পেছনে তাকালো। রেড ইণ্ডিয়ানদের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে বুঝলো, তারা তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তার বন্ধু দু'জনেরও কোন সন্ধান পেল না সে। তার ঘোড়া নিজের এবং প্রভুর বিপদের কথা স্মরণ ক'রে তখনও তেমনি মরীয়া হ'য়ে ছুটছে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারও গতি বন্ধ হ'ল। একটা ব্যাজারের গর্ত্তে পা আটকে যেতেই ঘোড়াটা ডিগবাজী খেয়ে সশব্দে প'ড়ে গেলো। ডিকও দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো।

(ক্রমশঃ)

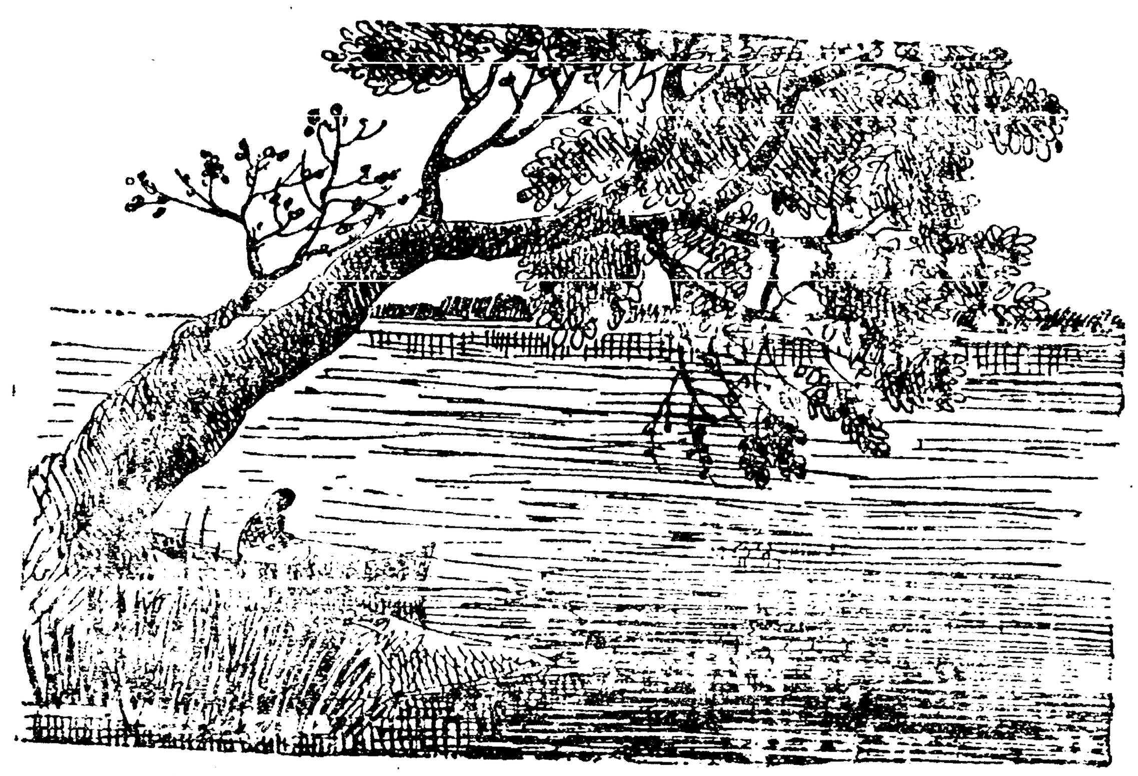

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

বছর পরে আসছ ফিরে
পঁচিশে বৈশাখ,
বরণ করি তোমায় মোরা
বাজিয়ে শুভ শাঁখ।
জানি তোমার বুকের মাঝে
কবির চরণ-চিহ্ন রাজে,
মনের কানে শুনতে পেলাম
মোহন মধুর ডাক ;
তাই তোমারে বরণ করি
পঁচিশে বৈশাখ।

ভোর না হ'তে জাগল সাড়া
সবুজ সাথীর দল,
ফুল চয়নে, মালা গাঁথায়
হয় যে রে চঞ্চল।
কেউ বা রচে পূজার বেদী,
কেউ দেওদার পত্র ছেদি'
বনমালায় তোরণ সাজায়,
বকে অনর্গল ;
কবির পূজায় ভেদ ভুলে সব
খাটছে অবিরল।
দুষ্টু খোকার দস্যিপনা,
খুকুর মিষ্টি কথা,
বাচ্চু সোনার আবোল তাবোল,
'ইভা'র নীরবতা,
ঠোঁট ফুলানো কান্না, হাসি,
মান, অভিমান রাশি রাশি
সকল কিছুই কবির ভাষায়
পায় যে সরলতা ;
কেমন করে ভুলব বল
এমন কবির কথা ?
আজ বোশেখের বজ্রবীণায়
বাজুক কবির বাণী,

সুরের আগুন পুড়িয়ে দেবে
অসুন্দরে জানি।
ডাক শুনে আজ জাগুক সবে,
বিশ্বে আসন পেতেই হবে,
প্রেম-প্রীতিতে পূর্ণ করুক
হৃদয়-পাত্রখানি ;
কান পেতে শোন ডাক দিয়ে যায়
বিশ্বকবির বাণী।

উদয়-তিথি

শ্রীনবগোপাল সিংহ

আবার এসেছে পুণ্য পঁচিশে
বোশেখের সভা মাঝে,
অশোকের বনে স্মৃতির নূপুর
ক্ষণে ক্ষণে তাই বাজে।
কৃষ্ণচূড়ার পাখায় পাখায়
আকাশের পরী আবির মাখায়,
রঙে রঙে আজ দিক্‌বলাকায়
উল্লাস ধরে না যে !
প্রকৃতির মেয়ে সেই রঙে নেয়ে
অপরূপ রূপে সাজে।

মর্ত্ত্য রবির জনম-লগন
গগনে ঘনায়ে এলো,
নভঃরবি যেন নব 'রবি' পাশে
ক্ষণে ম্লান হয়ে গেলো।
কদম-কেশরে খুসীর স্বপন
অলি সনে করে কি যে আলাপন,
কেয়া যেন কার করে সে গোপন
নিবিড় পরশ পেলো ;
চাঁপার প্রদীপে আরতির শিখা
উচ্ছ্বাসে এলোমেলো।

কত না যুগের "কথা ও কাহিনী"
"মহুয়ার" বনে নাচে,
"সঞ্চয়িতার" ভাণ্ডারে কত
"কণিকা" যে ভরা আছে।
"সোনার তরীতে" আছে ভারে ভার
"নৈবেদ্যের" নানা সম্ভার,
বিশ্ব বহিছে কত ঋণভার
এই পঁচিশের কাছে ;
"চৈতালি" সাঁঝে "পূরবীতে" পাখী
কণ্ঠ যে ভরিয়াছে।

যুগে যুগে এই পরম লগ্ন
ধরায় আসিবে ফিরে,
হৃদয়তীর্থে হবে অভিষেক
স্মৃতির সাগর তীরে।
হে কিশোর, তোরা সোনার প্রভাতে
"ছবি ও গানের" অর্ঘ্য নে হাতে,

ব'রে নে আজিকে "শিশু ভোলানাথে"
"স্মরণের" মন্দিরে ;
'ক্ষণিকার' 'খেয়া' বহিয়া এনেছে
শাশ্বত অতিথিরে।

চাঁপা ফোটার দিন

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দখিন্ হাওয়ায় জাগলো সাড়া
বাজ্ল বনের বীণ,
দিচ্ছে দোলা, স্বপনভোলা
চাঁপা ফোটার দিন।
ভোর-আঙিনায় গেলো ডেকে
দূরের দেশের কিশোর যে কে,
দুষ্টু ছেলের খেলায় ঢেকে
মিষ্টি পলাশ বন ;
হাওয়ার দোলায় দুলে দুলে
উড়ে বেড়ায় মন।

ও গাঁয়েতে ফুট্ল চাঁপা
এ গাঁয় পড়ে ঝ'রে,
চাঁপার ঠোঁটে খোকার হাসি,
গেলো ভুবন ভ'রে।
বিজন বনে মাদল বাজে
নাচের তালে সকাল সাঁঝে,
গান উঠেছে খেলার কাজে
শাল-মউলের তলে ;
ঘর-আঙিনায় খোকন নাচে
পুলক-কুতূহলে।

গোঠের বাটে অগাধ মাঠে
ছায়া-নিবিড় গেহে
এলো কে আজ মায়ের বুকে
শিশুর সোনা স্নেহে !
এলো চিকণ কোমল পাতায়,
রাখাল-বাঁশীর বিভোল গাথায়,
ঘর-বাহিরে ভুবন মাতায়
সোনার দিনের গান ;
ফুল-ঝর্ণার আঝোর ঝরায়
ভুবন করে স্নান।

আলো-ছায়ায় কোমল মায়ায়
ভ্রমর উতরোল,
চাঁপার শাখে দোলনা দোলে
দোদুল দোদুল দোল !
পড়ার পুঁথি রইল পড়ে,
দূরের দেশে মন যে ওড়ে,
আশায় ভাষায় পুলক ঝরে—
বিষাদ হ'ল ক্ষীণ ;
দখিন্ হাওয়া ডাক দিয়েছে
এলো চাঁপার দিন।

সাত ঘোড়া রথ চলে সূর্য্যের

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

মেঘ-ফাটা রোদ্দুর
যায় চোখ যদ্দূর
কাচা কাপড়ের মত ছড়ানো,
তার শেষে গঙ্গার
বালি ভরা জঙ্ঘার
এক কোণে ভাঙ্গা ঘাট গড়ানো।

আশ-পাশে কাশবন,
ঝাউ-সার—বাঁশবন
একটুকু ছায়া কা'রে দেয় না ;
নিঃশ্বসি' ফোঁস-ফোঁস্
ঘুরে মরে গোরু মোষ,
প্রিয় ঘাস—তাও মুখে নেয় না !

ভরা বেলা দুপ'রে
আকাশের উপরে
সাত ঘোড়া রথ চলে সূর্য্যের,
তাপ ওঠে গন-গন্,
চাকা ছোটে বন্-বন্
পশ্চিম দিক্‌টায় খুব জোর।

গোরু মোষ তেষ্টায়
ঘাটে নামে শেষটায়,
জল খেয়ে প্রাণ করে রক্ষে ;
নিষ্ঠুর গ্রীষ্মের
খর তাপে বিশ্বের
বাঁচা দায় প্রাণীদের পক্ষে।

মেঘ-ফাটা রোদ্দুর
জলের সমুদ্দুর
মরীচিকা যেন করে সৃষ্টি ;
থেকে থেকে মাঠময়
ধূলো ওড়ে, বায়ু বয়,
বালিতে আগুন করে বৃষ্টি।

ছায়া নেই, মায়া নেই,
কোথা কারও কায়া নেই,
গাছের ডালেতে নেই পক্ষী ;
আকাশের ধূ ধূ পথে
সাত বাহনের রথে
এক শুধু সূর্য্যেরে লক্ষ্যি !

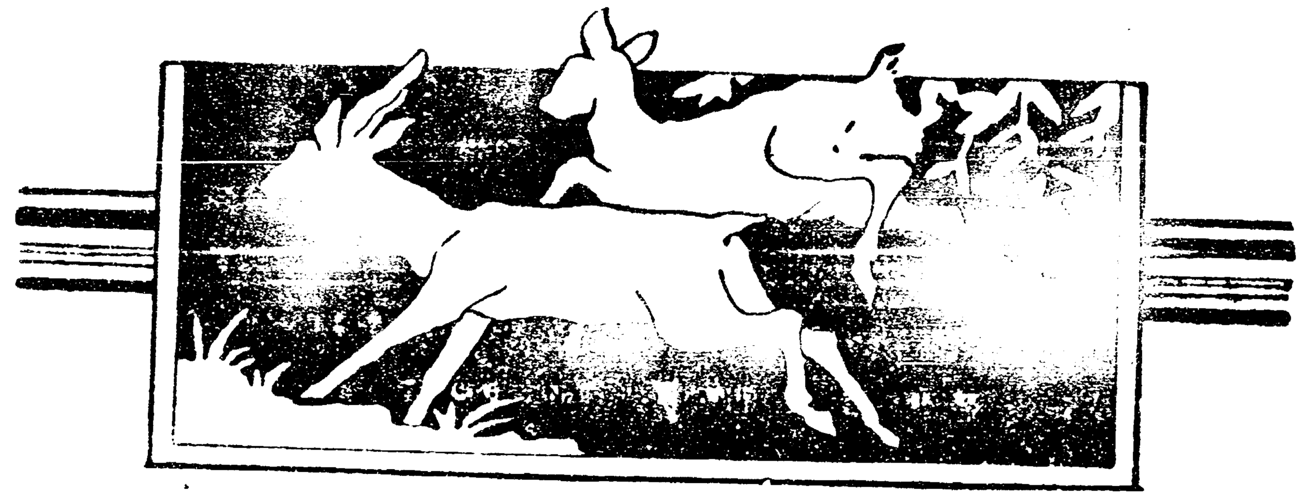

দক্ষিণেশ্বর

শ্রীগৌরী দেবী

আমাদের 'মনচিচি'র জন্ম কলকাতায় এবং জন্মের পর গত কুড়ি বছর সে কলকাতাতেই কাটিয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে নাকি দক্ষিণেশ্বর দেখে নি বা দেখার সুযোগ পায় নি! তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতায় থাক তারা কেউ কেউ হয়তো মুখ টিপে হাসছ, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখবে, মনচিচির মত আরও এমন অনেক ছেলেমেয়ে—এমন কি বয়স্ক লোকও আছে যারা বরাবর কলকাতায় থেকেও এই দর্শনীয় জায়গাটি আজ পর্য্যন্ত দেখে উঠতে পারে নি। ছুটীর দিনে তারা সাধারণতঃ সিনেমায় যায়, বড় জোর লেকে, ময়দানে বা চিড়িয়াখানায় ঘুরে আসে, কিন্তু কলকাতার এত কাছে যে এমন রমণীয় কোন জায়গা থাকতে পারে তা তাদের ধারণাই নেই। অথচ দক্ষিণেশ্বর যাওয়া আজকাল কত সহজ। মোটর থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। সহরের যে কোন জায়গা থেকে ট্রামে বা বাসে শ্যামবাজার যাও, সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বরের বাস্ ধরলেই হ'ল। এস্প্ল্যানেড থেকেও সোজা দক্ষিণেশ্বর বাস যাতায়াত করে, কোথাও বদলাতে হয় না। 'আর যারা বাসের ভিড় পোহাতে চাও না তারা অনায়াসেই শিয়ালদহ গিয়ে ট্রেন ধরতে পার। ট্রেন তোমাকে সোজা দক্ষিণেশ্বর ষ্টেশনই নামিয়ে দেবে।

এ তো গেল কলকাতাবাসীদের কথা। যারা কলকাতার বাইরে বাস কর তাদের কাছেও আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, কলকাতায় কখনও বেড়াতে এলে এর উপকণ্ঠের দক্ষিণেশ্বর নিশ্চয়ই একবার ঘুরে যেও। দেখবে, ঠকবে না একটুও।

দক্ষিণেশ্বরের কথা কে না জানে? দক্ষিণেশ্বর আজ হিন্দুদের অন্যতম মহাতীর্থ। পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি—সাধনপীঠ এই দক্ষিণেশ্বর। এখানেই তিনি বাস করতেন—এখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।

দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত কালীবাড়ী একটি দেখবার জিনিষ। এত বড়—এত সুন্দর মন্দির বাংলা দেশে খুব বেশী নেই। মন্দিরের সুউচ্চ ন'টি চুড়া—বহু দূর থেকে চোখে পড়ে। দেয়ালে

নানা রকম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। ভিতরে সহস্রদল রজত-পদ্মের উপর অপরূপ কালীপ্রতিমা। মন্দিরের সামনে সুপ্রশস্ত নাটমন্দির, আর তার পাশে বিরাট বাঁধানো প্রাঙ্গণ—লাল টালিতে ছাওয়া, ঝকঝকে তকতকে। এত বড় বাঁধানো প্রাঙ্গণ সচরাচর দেখা যায় না। হৈ-হল্লা নেই, হট্টগোল নেই, পাণ্ডার উৎপাত নেই। একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি সারা জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। প্রাঙ্গণ ঘিরে অতিথিশালা, তা ছাড়া কালীমন্দিরের উত্তরে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আর পশ্চিমে গঙ্গার ধার দিয়ে ঠিক এক রকম পর পর বারোটি শিবমন্দির। সে যে কি অপরূপ শোভা তা না দেখলে বোঝানো যায় না। প্রত্যেকটি মন্দিরের ভিতর একটি ক'রে কালো কষ্টিপাথরে বা গ্র্যানাইট পাথরে তৈরী শিবলিঙ্গ। শিবের কপালে রূপোর চাঁদ। —নাগেশ্বর, নকুলেশ্বর, কপিলেশ্বর, নন্দীশ্বর, জলেশ্বর, বাণেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, নির্জড়েশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন শিব। প্রত্যেকটি শিবমন্দিরের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকের ওপর গীতা, পুরাণ বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে সুন্দর সুন্দর উক্তি বাছাই করে লেখা রয়েছে। সঙ্গে বাংলা, হিন্দী, ইংরাজিতে অনুবাদও দেওয়া আছে। দেখলে প্রত্যেকটি ঘুরে ঘুরে পড়তে ইচ্ছে করবে। শিবমন্দিরের প্রায় গা ঘেঁষে বয়ে চলছে গঙ্গা—কাণায় কাণায় ভরা তার জল, আর সমুদ্রের কাছাকাছি এসে স্রোতও তার তেমনি দুর্ব্বার। পাশেই বিখ্যাত উইলিংডন্ সেতু, এপার ওপার চলে গেছে। ওপারে একটু দক্ষিণে বেলুড় মঠের মন্দির-চূড়াও সহজেই চোখে পড়ে।

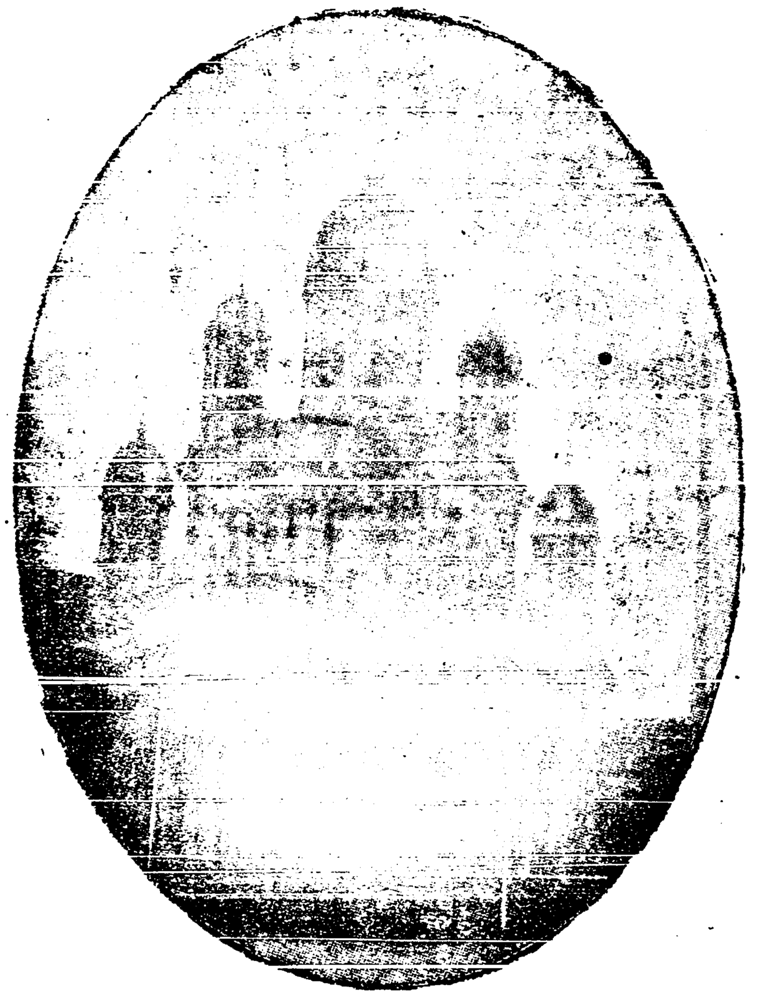

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

দক্ষিণেশ্বরের এই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জানবাজারের পুণ্যশীলা রাণী রাসমণি। আর এর পুজোর ভার ছিল পরমহংসদেবের ওপর। এইখানেই দেবার্চ্চনা করতে করতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে যেতেন।

মন্দির-প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে ছোট্ট একটি ঘরে পরমহংসদেব বাস করতেন। আজও সে ঘরটি তেমনি রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে শয্যায় শুতেন, যেখানে বসতেন, যে সব জিনিষ ব্যবহার করতেন আজও তা সেখানে সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালে ছোট-বড় নানা ছবি, ফটোগ্রাফ। ঘরে ঢুকলেই ফুলের আর ধূপের মিষ্টি গন্ধে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। মনে পড়ে এই ঘরে একদিন কত না ভক্ত—জ্ঞানী গুণী এসে পরমহংসদেবের সঙ্গে বসে ধর্ম্মালোচনা করে গেছেন—একত্র কীর্ত্তন গেয়েছেন! উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীদের মধ্যে

এখানে আসেন নি এমন কমই ছিলেন। এইখানেই একদিন ঘটেছিল বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনে পরম পরিবর্ত্তনের সূচনা। সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্য গৃহে ঢুকলে মাথা আপনিই নত হয়ে আসবে।

মন্দির-প্রাচীরের বাইরের দৃশ্যও চমৎকার। গঙ্গার তীরে তপোবন,—তপোবনের মতই প্রশান্ত। মধ্যে রয়েছে পঞ্চবটী—অশ্বত্থ, বেল, বট, অশোক আর আমলকী এক সঙ্গে; আর কোণে বেলতলী। পঞ্চবটীর তলাটা বাঁধানো। জায়গায় জায়গায় শান ফেটে গেছে। এই পঞ্চবটীর তলায় বসে পরমহংসদেব ভগবানের চিন্তা করতেন। দেখলে মনে হয় সাধনার উপযুক্ত জায়গাই বটে। বেলতলী পরমহংসদেবের সাধনার ক্ষেত্র—তন্ত্র-সাধনার। এখানে তিনি পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসে সাধনা করে গেছেন।

তা ছাড়া দেখবে এখানে ওখানে কীর্ত্তন হচ্ছে, কোথাও বা সাধুরা বসে ধর্ম্মকথা আলোচনা করছেন; আর ভ্রমণকারীর দল তো আছেই। নদীর ধারে ঘাসে ছাওয়া একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়। নদীর শীতল হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাবে, সহজে উঠতে ইচ্ছা করবে না। উত্তরে তাকালে দেখবে উইলিংডন্ ব্রীচ্ (ব্রীজ নয়)—সী-প্লেন অবতরণের জায়গা। যদি বরাত ভাল থাকে তবে ২।১টি সী-প্লেনের ওঠা-নামাও হয়তো চোখে পড়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া আশেপাশে আরও অনেক দেখবার জিনিষ আছে। সময় থাকলে সেগুলোও দেখে আসতে পার।

নানা যুগের নববর্ষ

আমাদের বাংলা নিয়মে ১লা বৈশাখ হচ্ছে নববর্ষ। যে সব ব্যবসায়ী দেশী প্রথায় হিসেব-পত্র রাখেন তাঁরা এই দিনটি থেকে নতুন ক'রে তাঁদের খাতাপত্র লিখতে সুরু করেন। তাই একে বলে "হালখাতা" অর্থাৎ নতুন বা বর্ত্তমান খাতা। হালখাতা উপলক্ষে দেবতার কাছে পূজো দেওয়া হয়—বন্ধুবান্ধব, ক্রেতাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবারও রেওয়াজ আছে। আজকাল শুধু ব্যবসায়ীদেরই নয়, সাধারণ লোকেও এই দিনটিকে পরম শুভদিন বলে পালন করছেন।

এ দিনে নানা সভাসমিতি, উৎসব, প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারী ভাবেও একে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। দিনটিকে সাধারণ ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু চিরকাল আমাদের দেশে ১লা বৈশাখ থেকে বছর গণনা করা হ'ত না। আগে বছর সুরু হ'ত অগ্রহায়ণ থেকে। 'অগ্রহায়ণ' শব্দটি থেকেই তা বোঝা যায়। অগ্র হ'ল গোড়া বা প্রথম, আর হায়ন মানে হচ্ছে বছর। ঐ সময়ে নতুন ধান কাটা হ'ত; ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব সুরু হয়ে যেত। সাধারণ লোকের নতুন বছরের আরম্ভ বুঝবার পক্ষে তাই ওটা ছিল প্রশস্ত সময়। অগ্রের অন্য অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, আর হায়ন বলতে ব্রীহিকেও (ধান, শস্য) বোঝায়। অর্থাৎ যে সময়ে শ্রেষ্ঠ শস্য উৎপন্ন হয় সেটাই হ'ল অগ্রহায়ণ। কবে, কোন্ সময় থেকে বৈশাখে বছর গণা সুরু হ'ল সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখনও একমত হতে পারেন নি; তবে কারণটা এই: সূর্য্য যখন এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সংক্রমণ করে অর্থাৎ পা দেয় তখনই নতুন মাস সুরু হয়। রাশিচক্রের প্রথম হচ্ছে মেষ রাশি। সূর্য্য চৈত্র সংক্রান্তির পর থেকে মেষ রাশিতে যায় বলে ঐ সময়ে অর্থাৎ ১লা বৈশাখ বছরের আরম্ভ ধরা হয়। রাশি কা'কে বলে নিশ্চয়ই জান? —আকাশের এক একটা নির্দ্দিষ্ট তারার ঝাঁক, যা দেখে সময় ঠিক করা হয়। রাশি সবশুদ্ধ ১২টি।

বৈদিক যুগে কিন্তু অগ্রহায়ণ থেকেও বছর ধরা হ'ত না, হ'ত আশ্বিন থেকে। বর্ষা কালে বছর শেষ হ'ত, তাই বছরের অপর নাম হ'ল বর্ষ।

ইংরেজীতে নববর্ষ গণনা করা হয় ১লা জানুয়ারী থেকে। কিন্তু ওদেশেও চিরকাল ও-নিয়ম ছিল না। ইয়োরোপের সমস্ত খৃষ্টান দেশেই আগে যীশুখৃষ্টের জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বর থেকে বছর গণনা করা হ'ত। তারপর ইংলণ্ডে তা বদলে ১লা জানুয়ারী করা হ'ল, কারণ ঐ দিনে 'উইলিয়াম দি কঙ্কারার'কে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অভিষেক করা হয়। এদিকে ১২শ শতাব্দীতে সারা ইয়োরোপে ২৫শে মার্চ থেকে বছর গণা সুরু হয়ে যায়, ক্রমে ইংলণ্ডেও সে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। তারপর ১৭শ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মানী, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি কতকগুলি দেশে আবার ১লা জানুয়ারী থেকে নববর্ষ ধরা হ'তে থাকে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেও পুনরায় এ নিয়ম প্রচলিত হয়। সেই থেকে সারা ইয়োরোপে এবং পৃথিবীর আরও অনেক অঞ্চলে ঐ নিয়মই চলে আসছে।

প্রাচীন কালে অন্যান্য দেশে কোন্ কোন্ তারিখ থেকে নববর্ষ গণনা করা হ'ত তাও এই সুযোগে শুনে রাখ। প্রাচীন মিশরী, ফিনিশিয়ান এবং পারসিকরা যে তারিখ থেকে নববর্ষ ধরত সেটা হচ্ছে এখনকার ২১শে সেপ্টেম্বর। গ্রীকরা যে তারিখ থেকে ধরত সেটা হচ্ছে ২১শে ডিসেম্বর। আর ইহুদীরা যে তারিখ থেকে নববর্ষ গণনা করত সেটা হচ্ছে ৬ই সেপ্টেম্বর।

হাসির গল্প

যে ছেলেটা রাতদিনই পেঁচার মত মুখ গোমড়া করে থাকে তাকে কি তোমরা পছন্দ কর? নিশ্চয়ই নয়। অন্ততঃ আমি তো করি না। হাসিখুসি লোককেই সবাই ভালবাসে,

বন্ধুমহলে তারই খাতির সব চেয়ে বেশী। প্রাণ খুলে হাসতে পারা ভাগ্যবানের লক্ষণ। মন ভাল না থাকলে কেউ হাসতে পারে না।

কথায় বলে হাসলে লোকে মোটা হয়, হাসিখুসি লোক দীর্ঘায়ু হয়। এমন কি যে বেশী হাসে সে খেতেও পারে বেশী। কথাটা শুধু প্রবাদই নয়, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে এর মধ্যে সত্যতাও আছে অনেকখানি। শরীর সুস্থ না থাকলে কেউ হাসে না, ভাল করে খেতেও পারে না। কাজেই হাসতে পারা মানেই হচ্ছে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে তবেই লোকে দীর্ঘায়ু হয়। শরীর অসুস্থ হ'লে মনও অসুস্থ হয়। দীর্ঘদিন রোগে ভুগলে মেজাজ কি রকম খিটখিটে হয়ে যায় তা হয়তো লক্ষ্য করেছ। খিটখিটে লোক কি কখনও হাসতে পারে?

হাসিখুসি

বিজ্ঞানীরা হাসির ব্যাপার নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁরা বলেন আমাদের শরীরে যে রক্তস্রোত বইছে হাসলে পরে তার গতিবেগ বেড়ে যায় অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তসঞ্চালন আরও ভাল ক'রে হ'তে থাকে, যা নাকি শরীর সুস্থ রাখার পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, হাসলে পরে অনেকেরই মুখ বা গাল লাল হয়ে ওঠে। খুব ফরসা লোক হ'লে এটা সহজেই চোখে পড়ে। এর কারণ আর কিছুই নয়, মুখে অতিরিক্ত রক্তসঞ্চালন। ভাল করে রক্তসঞ্চালন হ'লে দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকেও ঠিকমত রসক্ষরণ হ'তে থাকে, ফলে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজই সুষ্ঠু ভাবে চলতে থাকে। ঠিক এই কারণেই হাসিখুসি লোকের ক্ষিদে এবং হজম দুই-ই ভাল হয়। তোমরা হয়তো জান, খাবার হজম করবার সময়ে আমাদের পরিপাক-যন্ত্রের মধ্যে এক রকম রস নিঃসৃত হ'তে থাকে—যাকে বলে হজমী রস, ভাল কথায়—পাচক রস। এই হজমী বা পাচক রসই খাদ্যকে হজম করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, হাসলে শরীরে যে রক্ত সঞ্চালন হয় তার ফলে হজম-যন্ত্রে এই হজমী রস বেশী করে বেরিয়ে আসে, আর খাবারও তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়। ঠিকমত হজম হ'লে তবেই না ক্ষিদে হবে?

ঠিক এর উল্টো ব্যাপার হয় যদি মন-মেজাজ ভাল না থাকে। পরীক্ষার আগে অনেক

ছাত্রেরই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ইত্যাদি রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে মনের অস্বাচ্ছন্দ্য বা উদ্বেগ, যার ফলে পাচক রস ঠিক মত নিঃসৃত হতে পারে না। খাবারও তাই হজম হয় না, ক্ষিদেও পায় না; শরীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিন্তাগ্রস্ত লোক সহজে হাসে না। ভয় বা মানসিক আঘাত পেলে রক্ত সঞ্চালনের অভাবে মুখের রং কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায় হয়তো লক্ষ্য করেছ। জিভও কেমন শুকিয়ে আসে! দেহের গ্রন্থিগুলি ঠিকমত রসক্ষরণ করতে না পারাতেই অমনটা হয়।

আমাদের শরীর সুস্থ রাখবার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম দরকার। ব্যায়াম মানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এমন ভাবে চালানো যাতে সেগুলি সুস্থ ও সবল থাকতে পারে। শরীরের বাইরের দিক্‌টার যেমন ব্যায়াম দরকার, ভিতরের কলকব্জাগুলোরও সেই রকম ব্যায়াম দরকার। আমাদের বুক আর পেটের গহ্বরের মাঝখানে যে পাৎলা পর্দা আছে হাসলে সেটা অনবরত নড়াচড়া করতে থাকে। ফলে পাকস্থলী আর তার সলগ্ন হজম-যন্ত্রগুলির ওপরও বেশ দলাইমলাই চলতে থাকে,—সেগুলোও সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে এবং অধিকতর কার্য্যক্ষম হয়।

আগেকার দিনে রাজা-রাজড়াদের সভায় একজন করে বিদূষক থাকত। চলতি কথায় এদের বলা হ'ত ভাঁড়। এদের কাজ ছিল রাজামশাইদের হাসি-ঠাট্টা দিয়ে সর্ব্বদা উৎফুল্ল রাখা। এমন কি খাবার সময়েও বিদূষকেরা রাজার সঙ্গ ছাড়ত না। হাসি যে মানুষকে সুস্থ এবং কার্য্যক্ষম রাখতে কি রকম সাহায্য করে এ তথ্য তাঁরা হয়তো জানতেন আর তারই জন্য বোধ হয় এ পদটির সৃষ্টি হয়।

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা কর

(উত্তর পরপৃষ্ঠায় দেখ)

১। কোনটা ঠিক?—

(ক) মৎকুণ মানে (১) ছারপোকা (২) নারিকেল (৩) মাতাল (৪) মাকুন্দো (৫) বড় মাছ।

(খ) সমস্বরে বাজনা বাজলে সাধু ভাষায় তাকে বলে (১) ঐক্যতান (২) ঐকতান (৩) সমবাদ্য।

(গ) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে বলা হয় (১) অগ্নি (২) নৈঋত (৩) নৈর্ঋত (৪) নৈরীত (৫) বায়ু।

২। নীচের লাইনগুলি কোন্‌টা কার লেখা?—

(ক) "পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, ফিরে কি সে যায় কভু আপন বিবরে?"

(খ) "সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল, খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।"

(গ) "হেলায়ে মাথা দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি টানি
বলিতে আমি পারিব না তো ভদ্রতার বাণী।"

(ঘ) "তুমিও দাদা হচ্ছ কেমন ক্ষ্যাপাটে, চিমনি চাটা ভোঁপসা-মুখো ভ্যাঁপাটে।"

৩। শিখদের দশজন গুরুর নাম কি?

৪। দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের দশটি নাম কি কি?

৫। 'সোভিয়েৎ' কথাটির অর্থ কি?

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

১ (ক) (১), (২), (৪)—তিনটেই ঠিক। (খ) (২) ঠিক। (গ) (৩) ঠিক। ২। (ক) মাইকেল (খ) কাশীরাম দাস (গ) রবীন্দ্রনাথ (ঘ) সুকুমার রায়। (৩) নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জ্জুন, হরগোবিন্দ, হররায়, হরকিষেণ, তেগ বাহাদুর, গোবিন্দ সিং। ৪। গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর, তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী। ৫। শ্রমিক সমাজ। শ্রমিক সমাজের দ্বারা দেশ শাসন হয় বলে রাষ্ট্রের নামও ঐ হয়েছে।

বিশ্ব টেবল-টেনিস প্রতিযোগিতা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

চৈত্রের 'রামধনু'তে তোমরা সোয়েথলিং কাপের খেলার বিবরণ পড়েছ। এবার বলবো অন্যান্য খেলার বৃত্তান্ত।

সোয়েথলিং কাপের খেলা দেখে সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে বার্গম্যান (ইংলণ্ড) আর সাতোর (জাপান) মধ্যেই একজন এ বছর বিজয়ী হবেন। খেলা ক্রমে এগোতে থাকে। দ্বিতীয় দিনের পর থেকেই খেলা রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথম বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন প্রাক্তন ভারত-বিজয়ী খেলোয়াড় উত্তম চন্দ্রানা। হংকং-এর এক নম্বর খেলোয়াড় সুবিখ্যাত চুন্ চিন্-সিংকে তিনি ৩-১ গেমে পরাজিত করে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। অপর ভারতীর

খেলোয়াড়দের মধ্যে এক নম্বর খেলোয়াড় থিরুভেঙ্গড়ম্ চতুর্থ রাউণ্ডে উঠে ফ্রান্সের ল্যান্সকয়ের কাছে পরাজিত হ'ন (৩-১); কল্যাণ জয়ন্ত আমেরিকার কার্টল্যাণ্ডের কাছে পরাজিত হ'ন (৩-০), আর উত্তম চন্দ্রানা ফ্রান্সের আমুরেতির কাছে পরাজিত হ'ন (৩-১)। পরাজিত হ'লেও সকলেই বেশ ভাল খেলেছিলেন।

এ বছরের খেলায় সব থেকে ভাল ম্যাচ হয়েছিল তৃতীয় রাউণ্ডে ইংলণ্ডের বার্গম্যান ও জাপানের ফুজির মধ্যে। এ রকম উত্তেজনামূলক খেলা খুব কমই দেখা গেছে। প্রথম দু'টো গেম যখন বার্গম্যান জয় করেন তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে ফুজি শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করবেন? কিন্তু সমালোচকদের স্তব্ধ করে দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণমূলক খেলা খেলে দু' গেম হেরেও শেষের তিন গেম জয় করে ফুজি শেষ পর্য্যন্ত বার্গম্যানকে পরাজিত করলেন।

এই বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে-না-সামলাতেই আর এক পরম বিস্ময়! বার্গম্যানকে পরাজিত করবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফুজিকে চতুর্থ রাউণ্ডে ফ্রান্সের রুথফ্‌ট্-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। সকলে ধারণা করেছিলেন, ফুজির সামনে রুথফ্‌ট্ দাঁড়াতেই পারবেন না; কিন্তু সেই প্রায়-অসম্ভবই সম্ভব হ'ল। অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে ৩-১ গেমে ফুজিকে পরাজিত ক'রে রুথফ্‌ট্ কোয়ার্টার-ফাইনালে উন্নীত হলেন।

ওদিকে সাতো বিশেষ বাধা না পেয়ে কোয়ার্টার-ফাইন্যাল পর্য্যন্ত পৌঁছলেন। আর কোয়ার্টার ফাইন্যালে পৌঁছলেন ফ্রান্সের ল্যান্সকয়, রুথফ্‌ট্ আর আমুরেতি, হাঙ্গেরীর সিডো ও কক্‌জিয়ান, আমেরিকার কার্টল্যাণ্ড, আর পোর্ত্তুগালের ডাক্।

ফ্রান্সের তিন জনের মধ্যে রুথফ্‌ট্ আর আমুরেতি যথাক্রমে ডাক্ আর কার্টল্যাণ্ডকে সহজেই পরাজিত ক'রে সেমিফাইন্যালে উঠলেন, আর সেমিফাইন্যালে উঠলেন সিডোকে ৩-১ গেমে হারিয়ে দিয়ে সাতো, আর ল্যান্সকয়কে ষ্ট্রেট সেটে হারিয়ে দিয়ে কক্‌জিয়ান।

সেই দিনই সেমিফাইন্যাল খেলা। কক্‌জিয়ানের সঙ্গে আমুরেতি আর সাতোর সঙ্গে রুথফ্‌ট্। আশা করা গিয়েছিল কক্‌জিয়ান-আমুরেতির খেলাটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে; কিন্তু আসলে তেমন কিছু হয় নি। শুধু প্রথম গেমে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ভিন্ন আমুরেতি বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি: কক্‌জিয়ান ষ্ট্রেট সেটে জয়ী হ'ন। অপর সেমিফাইন্যালে সাতোর কাছে রুথফ্‌ট্ দাঁড়াতেই পারলেন না। সাতোর স্পিন প্রতিরোধ করা এবারের প্রতিযোগিতায়

একটা রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দু'টো সেমিফাইন্যালেই ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা ষ্ট্রেট সেটে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

পরদিন ফাইন্যাল। কক্জিয়ানের সমর্থকদের মনে যাও ক্ষীণ আশা ছিল তাও ধূলিসাৎ হ'তে সময় লাগল না। অতি সহজে, ষ্ট্রেট সেটে কক্জিয়ানকে পরাজিত ক'রে সাতো টেবল-টেনিসে এসিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মহিলাদের সিঙ্গল্‌স্ খেলায় গত কয়েক বছরের মত এবারেও হাঙ্গেরীর ফার্কাস আর রুমানিয়ার রোজীনুর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং এবারেও জয়ী হ'ন রোজীনু।

পুরুষদের ডাব্‌ল্‌সে জয়লাভ করেন জাপানের ফুজি ও হায়াষী। সেমি-ফাইন্যালে আমেরিকার কার্টল্যাণ্ড ও রেইস্‌ম্যানকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত ক'রে তাঁরা ফাইনালে ইংলণ্ডের বার্গম্যান ও লীচকেও অনায়াসে পরাস্ত ক'রে পৃথিবীর ডাবল্‌স্ বিজয়ী হন। মিক্‌স্‌ড্ ডাবল্‌সে জয়ী হ'ন হাঙ্গেরীর সিডো ও রুমানিয়ার রোজীনু। তাঁরা ফাইন্যালে ইংলণ্ডের জনি লীচ আর ডায়ানা রো-কে পরাজিত করেন।

মহিলাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা কর্ব্বিলন কাপের খেলায় জাপানের খেলোয়াড় নিশিমুরা আর নারাহারা শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হ'ন। এঁরা দু'জনেই একক ভাবে রোজীনু বা ফার্কাসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠেন নি, কিন্তু রুমানিয়া বা হাঙ্গেরীর অপর খেলোয়াড়ের খেলার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং ডাবল্‌সে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রতি খেলায় জয়লাভ করেন। মহিলাদের ডাবল্‌সেও নিশিমুরা ও নারাহারা শেষ পর্য্যন্ত সহজেই বিজয়ী হ'ন।

কর্বিলন কাপের খেলা সোয়েথলিং কাপের নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় না। এতে প্রথমে দু'টো সিঙ্গল্‌স্, তারপর একটা ডাবল্‌স্ এবং পরে (যদি প্রয়োজন হয়) আর দু'টো সিঙ্গল্‌স্ হয়। এই পাঁচটার মধ্যে যাঁরা তিনটি খেলায় জয়লাভ করেন তাঁরাই বিজয়ী হ'ন।

সুতরাং দেখা গেল, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত জাপান একাদিক্রমে পুরুষদের সিঙ্গল্‌স্, পুরুষদের ডাবল্‌স্, মহিলাদের ডাবল্‌স্ এবং কর্বিলন কাপ জয় ক'রে জাপানের প্রাধান্য প্রমাণ করেন। এসো এবার সবাই "নিপ্পন-কি জয়, এসিয়া কি জয়" বলে বিদায় নিই।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

সুপ্রভাত

শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্ব আকাশে নয়ন মেলিছে উষা,
হেরি' নিশীথিনী লাজে যায় ঐ সরি;
উতলা ধরণী ফেলি' তার বেশভূষা
গৌরবভরে নিতেছে তাহারে বরি'।

দিগ্বলয়ের ভাবনা-রঙীন কোণে
ঐ যে ফুটিল রবির প্রথম আলো;
হরষ জাগিল তরু-কুসুমের মনে,
সারা প্রকৃতি যে বাসিবে তাহারে ভালো!

মেঘলোক হ'তে বারতা আসিল নামি'
গৌরবময় নবীন সুপ্রভাতে,
ভাব-ঘন মনে জ্বলে দীপ আশাকামী
বহু কামনার আলোকদীপ্ত প্রাতে।

স্বাগত জানাই তোমারে আবগ ভরে,
হে সুপ্রভাত! ভালে পর জয়টিকা;
যে আশার বাণী আনিছে রবির করে
জ্বালুক সে বাণী মহামিলনের শিখা!

নূতন-বর্ষ

শ্রীঅঞ্জনকুমার দত্ত

এস হে নূতন বর্ষ, আত্মহারা গানে,
দাও হে হর্ষের স্পর্শ ব্যথিতের প্রাণে।
পঙ্কিলতা মুছে দাও আনন্দের স্রোতে,
ঘুচাও আলস্য-সুপ্তি উদার আলোতে।

কবির অন্তর মাঝে জাগাও জোয়ার,
মুছে দাও লুণ্ঠিতের তপ্ত অশ্রুধার।
নবীন চেতনা আন হতাশের প্রাণে,
এস হে নূতন বর্ষ, আত্মহারা গানে।

কর্ত্তব্য

কুমারী নমিতা রায়

দুম্ দুম দুম্ দুম্ দুম্!

তাঁবুর ভেতর থেকে অফিসার-ইন-চার্জ্জ প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার?"

জোসেফের মাথা ঘুরছিল। মাটিতে বসে পড়ে বল্‌ল,—"না স্যর, একটা ঘোড়া!"

তাঁবুর ভেতর থেকে আবার সেই রুক্ষ, কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন এলো,—"ঘোড়া? একটা সামান্য ঘোড়ার জন্য বন্দুক গর্জ্জনের কি প্রয়োজন?"

জোসেফের মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোল না, শুধু একবার অস্ফুট কণ্ঠে সে উচ্চারণ করলো,—"কর্ত্তব্য"। তার সেই মর্ম্মান্তিক বাণী যেন রাত্রির নিস্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ছড়িয়ে দিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ। পরাধীনতার নির্দ্দয় পাশ হ'তে মুক্ত হবার এক প্রবল উৎসাহে আমেরিকাবাসী আজ অনুপ্রাণিত। এদিকে ইংরেজও যুঝছে সমানে। আমেরিকাবাসীর স্বাধীনতা তারা স্বীকার করে নিতে পারবে না কোন মতেই।

জন ষ্টিভেনসন এক ইংরেজ সৈন্যদলের অধিনায়ক। সেদিন তিনি তাঁর যুদ্ধের সরঞ্জাম পরখ করে দেখছেন, এমন সময় তাঁর ১৫।১৬ বছরের ছেলে জোসেফ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালো তাঁর কাছে।—"বাবা! আমি আমেরিকান সৈন্যদলে নাম লেখাবো।"

"আমেরিকান্ দলে?"

"হাঁ বাবা, তুমিই তো শিক্ষা দিয়েছ সর্ব্বদা ন্যায়ের পথে চলতে।"

পিতা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর পুত্রের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, "বেশ; কিন্তু জীবনের চলার পথে কোনদিন কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ো না, যত বড় কঠিনই হোক না কেন সে কর্ত্তব্য!"

যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যদল জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। যোসেফও আমেরিকান্ সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য তারা প্রবল উৎসাহে যুঝছে—যুঝছে।

মধ্যরাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ—নিঃঝুম। চন্দ্রালোকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশে একটা আমেরিকান তাঁবু আর তার পাশে পাহারায় নিযুক্ত একজন আমেরিকান সৈন্য। সৈন্যটি আর কেউ নয়, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত জোসেফ। অকস্মাৎ পাহাড়ের উপর একটা ছায়া তার চোখে পড়লো। একটু এগিয়ে এসে জোসেফ ছায়াটাকে চন্দ্রালোকে আরো ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। না, ছায়া নয়, পাহাড়ের উপরিভাগে একজন ইংরেজ অশ্বারোহী অবিচল-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের তাঁবুটির দিকে, কি যেন দেখবার চেষ্টা করছে মনোযোগ সহকারে। জোসেফ চন্দ্রালোকে আরও একবার দেখে নিলো। শিউরে উঠলো সে, মনে হ'ল অশ্বারোহী তার চেনা। পরক্ষণেই পিতার সেই আশীর্ব্বাণী মনে পড়লো। আজ সত্যই কিশোর জোসেফের জীবনে তার সবচেয়ে কঠিন কর্ত্তব্য আপনা থেকেই এসে আত্মপ্রকাশ করলো।

বন্দুকটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো জোসেফ। হাতটা কেঁপে উঠলো একবার। দুম্ দুম্ দুম্ দুম্...

ইংরেজ অশ্বারোহীর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো ধরিত্রীর বুকে।

এই ইংরেজ অশ্বারোহী আর কেউ ন'ন—ইনি কর্ত্তব্যপরায়ণ জোসেফের কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণ পিতা। *

* বিদেশী গল্প থেকে।

ফাল্গুন (১৩৫৮) মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রাহক-গ্রাহিকার ভোটে পছন্দসই দেশগুলি পর পর এই রকম দাঁড়িয়েছে:—

(১) সুইট্জারল্যাণ্ড (২) রাশিয়া (৩) ইংলণ্ড (৪) ফ্রান্স (৫) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (৬) ইটালি (৭) জার্মেনী (৮) জাপান (৯) সুইডেন (১০) গ্রীস (১১) অষ্ট্রেলিয়া (১২) চীন ও নরওয়ে (১৪) মিশর (১৫) পারস্য ও ব্রেজিল (১৭) তুরস্ক (১৮) দক্ষিণ আফ্রিকা (১৯) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ (২০) আফগানিস্থান।

এই তালিকার সবচেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠানোয় পুরস্কার পেলেন শ্রীশিশিরকুমার রায় চৌধুরী (কলিকাতা-৭)

আর যাঁদের তালিকা মোটামুটি কাছাকাছি হয়েছে:—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সেন (কলিকাতা-১৯), শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ইম্ফল), শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী), শ্রীচিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা-৫), শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস (গৌহাটী), শ্রীঅঞ্জনকুমার দত্ত (কলিকাতা-৯), শ্রীসুহৃদ-রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া)।

আমার কাকা

(মোপাসাঁর গল্প থেকে)

শ্রীকৌটিল্য

আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীর অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। বাবা আপিসে সামান্য একটা চাকরী করতেন, যা আনতেন তাতে সংসারের অভাব পূরণ হ'ত না। কাজেই মায়ের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বাবার জীবনে একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। মা যখন চেঁচামেচি করতেন বাবা তখন শুধু নিজের কপালে হাত বুলোতেন, কথার জবাব দিতেন না কোনও।

যত দিকে যত রকম মিতব্যয়িতা করা যায় আমরা তার পরীক্ষা করতাম। কেউ নিমন্ত্রণ করলে কক্ষণো তা গ্রহণ করা হ'ত না, পাছে আবার উল্টে তাদের খাওয়াতে হয়। বাজার খুঁজে সব চেয়ে কম দামী জিনিষ বেছে বেছে আনা হ'ত বাড়ীতে,—তা সে খাবারই হোক আর পোষাকই হোক।

বিলাসিতার মধ্যে শুধু একটা ছিল আমাদের—প্রতি রবিবার সমুদ্রের ধারে জেটিতে বেড়াতে যাওয়া। সারা সপ্তাহ আমরা এই দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করতাম। সে ছিল এক মহা সমারোহের ব্যাপার। বাবা তাঁর বহুদিনের পুরোনো রাইডিং কোট, লম্বা টুপি আর দস্তানাটা পরে নিতেন। তার পর খুব ফিটফাট হবার চেষ্টা করতেন। যদিও ঠিক বেরোবার মুখে প্রত্যেক বারই একটা-না-একটা গোল বাধত। হয়তো কোটের গায়ে কোন অদৃশ্য দাগ আবিষ্কৃত হ'ত। তখন হৈ-হৈ পড়ে যেত সেটা শোধরাবার। মা চশমা এঁটে এক টুকরো নেকড়া বেনজিনে ভিজিয়ে অতি সন্তর্পণে দাগটা তুলে ফেলতে লেগে যেতেন আর বাবা সর্ব্বক্ষণ খালি শার্ট গায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধৈর্য্য ভাবে টুপি সামলাবার চেষ্টা করতেন। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত সবাই বেরিয়ে পড়তাম এবং বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে সুরু হ'ত পথ চলা। বোনেরা চলত আগে আগে, তারপর মা, তাঁর বাঁ দিকে আমি, আর ডান দিকে বাবা। শরীর সোজা রেখে, ঘাড় টান ক'রে, পায়ে পায়ে মিলিয়ে মার্চ্চ করার ভঙ্গীতে আমরা চলতাম—যাতে আমাদের দরিদ্র পরিবারের আভিজাত্য সম্বন্ধে কেউ কোন সন্দেহ না করতে পারে।

জাহাজঘাটে পৌঁছে হয়তো দেখতাম, বহুদূর থেকে কোন জাহাজ এসে জেটিতে ভিড়েছে। বাবা অভ্যাসমত বলতেন, "জুলস যদি এই জাহাজে থাকে তা হ'লে কি আশ্চর্য্যই না হবে আমাদের দেখে!" মা সায় দিতেন, আমরা ঘাড় নাড়তাম। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।

এইখানে ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। জুলস হচ্ছেন আমার কাকা—বাবার সহোদর ভাই। এক সময়ে আমাদের পরিবারের সকলে তাঁকে কুলের কলঙ্ক বলে মনে করতেন। এখন তিনিই হচ্ছেন আমাদের আশার আলো। এই কাকাকে আমি কখনও দেখি নি কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে এত শুনেছি যে তাঁর নাড়ীনক্ষত্র আমাদের চেনা হয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুব ডানপিটে এবং যাকে আমরা বলি "উড়নচণ্ডী"। পরিবারের বেশ কিছু টাকা

তিনি উড়িয়ে দেন এবং, বোধ হয় বলতে হবে না যে, দরিদ্রের সংসারে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর নেই। কাজেই কাকা সম্বন্ধে কিছু বলতে হলেই আমার আত্মীয়েরা এক কথায় বলতেন, "জুলস? ও তো কুলের কুলাঙ্গার!"

অবশেষে এই 'কুলাঙ্গারটিকে' একদিন জাহাজে করে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল সুদূর আমেরিকায়। দেশে তাঁর অনেক দেনা হয়ে গিয়েছিল, পাওনাদারের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় কাকাও তাই রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু এর পরেই ঘটল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমেরিকায় পৌঁছে কাকা কি একটা ব্যবসা ফেঁদে বসলেন, এবং অল্প দিনেই অনেক টাকা রোজগার করে ফেললেন। বাবাকে সে কথা জানিয়ে তিনি লিখলেন, আর কিছু টাকা হ'লেই তিনি দেশে এসে সমস্ত দেনা মিটিয়ে দিতে পারবেন, আর সংসারের যে টাকাটা উড়িয়ে দিয়েছেন সেটাও ফিরিয়ে দেবেন।

এই চিঠি পাবার পরমুহূর্ত্তেই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের এত দিনের ধারণা আমূল বদলে গেল। এক সময় যারা বলত—"জুলসকে বেচলে একটা কুকুরের গলার বকলেসের দাম ওঠে না" তারাই এখন বলতে লাগল—"জুলসের মত ছেলে হয় না। বংশের উপযুক্ত সন্তান সে।"

এর পর দু' বছর চুপচাপ কাটল। তার পর আবার একখানা চিঠি, কাকা লিখেছেন বাবাকে। লিখেছেন, তিনি খুব ভাল আছেন এবং বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষ্যে শীগ্‌গিরই দক্ষিণ আমেরিকা যাচ্ছেন। কাজেই আরও কিছু দিন হয়তো চিঠিপত্র দিতে পারবেন না। বাবা যেন সে জন্য ব্যস্ত না হ'ন। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তিনি সটান দেশে ফিরে আসবেন প্রচুর অর্থ নিয়ে। তখন আর আমাদের পরিবারে অভাব-দৈন্য কিছুই থাকবে না।

সেই থেকে সেই চিঠিখানা হয়ে দাঁড়াল আমাদের পরিবারের জপমন্ত্র। যখন তখন সেটা বার করে পড়া হ'ত। আমাদের এমন কোন আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব রইলেন না যিনি সেই চিঠির কথা জানতেন না। চিঠি খানা হয়ে রইল আমাদের পরিবারের মূল্যবান দলিলপত্রের অন্যতম।

এর পর দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেল, কিন্তু কাকার আর কোন খবর পাওয়া গেল না। বাবার আশা কিন্তু বেড়েই চলল!—মায়েরও। যখনই কোন আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়তাম আমরা, মা বলতেন, "জুলস এলে আর এ অবস্থা থাকবে না। তখন নির্ঝঞ্ঝাট হব আমরা। আহা, জুলসের মত ছেলে হয় না!"

কাকা এলে কি করা হবে তা নিয়ে হাজার রকম প্ল্যান চলত। সকলেরই ইচ্ছে, তাঁর টাকা দিয়ে পল্লীঅঞ্চলে একটা বাড়ী কেনা হয়। বাবা কয়েকজনের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্ত্তাও চালাচ্ছিলেন।

ইতিমধ্যে আমার ছোড়দি'র বিয়ে হয়ে গেল এবং সেই উপলক্ষ্যেই ঠিক হ'ল আমরা কয়েকদিনের জন্য সবাই মিলে জারসিতে বেড়িয়ে আসব। ওখানে গেলে সমুদ্রভ্রমণও হবে, অথচ খরচও বেশী লাগবে না।

অবশেষে একদিন সত্যি সত্যি জারসি যাবার জন্য আমরা জাহাজে উঠলাম। সেই আমাদের প্রথম সমুদ্রযাত্রা, কাজেই আমাদের মনের অবস্থা সহজেই বোঝা যাবে। সবুজ মার্বল পাথরে ছাওয়া প্রকাণ্ড একটা টেবিলের মত সমতল মনে হচ্ছিল সমুদ্রটাকে। বিস্ময়ে আমি

হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমটা বাবা বোধ হয় একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরই তিনি বুক টান করে দাঁড়ালেন, প্রতি রবিবার জাহাজঘাটে গিয়ে যেমন করতেন। তাঁর পরনে আজও সেই রাইডিং কোট। আজ সকালেই তা বেনজিন্ দিয়ে ভাল করে সাফ করা হয়েছিল। এখনও বাতাসে তার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

জাহাজ চলতে লাগল। হঠাৎ দেখা গেল, দু'জন হোমরা-চোমরা গোছের ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গের দু'টি মহিলাকে অয়ষ্টার খাওয়াচ্ছেন। একটা আধ-বুড়ো, ছেঁড়া, ময়লা কাপড় পরা খালাসী তাঁদেরকে অয়ষ্টার কেটে কেটে দিচ্ছে। মহিলা দু'টি অতি সন্তর্পণে, যাতে পোষাকে দাগ না লাগে এমনি ভাবে, গলা বাড়িয়ে একটা অপরূপ ভঙ্গী সহকারে সেগুলো মুখে ঢেলে দিচ্ছেন, তার পর ভিতরের তরল পদার্থটি খেয়ে খোলাটি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন সমুদ্রে। খানিক দেখে দেখে আমরা বুঝলুম, এভাবে জাহাজে বসে অয়ষ্টার বা শামুক খাওয়ার মধ্যে বেশ একটু আভিজাত্যের ছাপ আছে। কাজেই বাবার খুব সহজেই এই অভিজাত্য দেখাবার লোভ হ'ল। তিনি মা আর দিদিদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা খাবে নাকি?"

মা খরচের কথা ভেবে ইতস্ততঃ করছিলেন, কিন্তু দিদিরা এ সৌখীনতা দেখাবার সুযোগ ছাড়তে রাজী হ'ল না। তখন মা বললেন, "মেয়েরা খাক"; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও ছেলেমানুষ, ও না খেল। ওর আবার অসুখ করতে পারে।"

বাবা একটা অয়ষ্টার নিয়ে দিদিদের দেখাতে লাগলেন কি করে জল না ফেলে খেতে হয়। মহিলা দু'টির অনুকরণে সন্তর্পণে গলাটি বাড়িয়ে মুখে ঢালতে গেলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই সমস্ত তরল পদার্থ তাঁর রাইডিং কোটে পড়ে সব মাখামাখি হয়ে গেল। মা বকাবকি করতে লাগলেন, বাবা বেচারী থতমত খেয়ে অভ্যাস মত কপালে হাত বুলোতে লাগলেন।

হঠাৎ দেখি বাবা অবাক হয়ে সেই শামুকওয়ালা খালাসীটার দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছেন; তাঁর সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। একটু পরেই তিনি চুপি চুপি মায়ের কাছে এসে বল্লেন, "ঐ যে মাল্লাটা শামুক কেটে কেটে দিচ্ছে, ওর সঙ্গে জুলসের চেহারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রয়েছে।" মা ধমক দিয়ে বললেন, "ধ্যেৎ, কি যে বল!" তারপর কৌতূহল মেটাতে তিনিও এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তাঁরও মুখ বাবার মত হয়ে গেল।

এর পর বাবা-মা'র মধ্যে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি খানিকটা পরামর্শ হ'ল, তারপর দেখলাম বাবা গুটি গুটি জাহাজের ক্যাপটেনের কাছে যাচ্ছেন। আমিও তাঁর পিছু নিলাম।

বাবা ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন। খানিকক্ষণ এটা ওটা কথার পর বললেন, "আচ্ছা, আপনার জাহাজে ঐ যে বুড়ো খালাসীটি আছে ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর কোন পূর্ব্ব-ইতিহাস আছে। আপনি জানেন নাকি কিছু?"

"খুব জানি।" ক্যাপটেন অবজ্ঞা ভরে বললেন, "ওর নাম জুলস, হতভাগাকে আমি আমেরিকা থেকে কুড়িয়ে এনেছি। ওর বাড়ী অবশ্য এই ফ্রান্সেই। কিন্তু এখানে নাকি ওর এত দেনা যে কিছুতেই দেশে যাবার নামটি করে না। এই জাহাজেই বোধ হয় বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবার মতলব হতভাগার!"

বাবা তাড়াতাড়ি মা'র কাছে ফিরে এলেন। তিনি তখন থর থর করে কাঁপছেন। বললেন, "যা ভেবেছি ঠিক তা-ই। এখন কি করা?"

মা'র উপস্থিত-বুদ্ধি, মনে হ'ল, বাবার চেয়ে বেশী। তিনি চট্‌পট্ বললেন, "মেয়েদের তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনা দরকার। জামাই যেন কিছু না জানতে পারে। আর, ওর পাওনাটা খোকার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দাও; তুমি নিজে যেও না। শেষে ভিখিরীটা আমাদের চিনে ফেললে হয়তো ঘাড়ে চাপতে চাইবে।"

আমার ওপরই ভার পড়ল পাওনা মেটাবার। আমি এগিয়ে গেলাম। নোংরা, ছেঁড়া, তালি দেওয়া পোষাক পরা সেই লোকটি তখনও একটি একটি করে অয়ষ্টার কেটে যাত্রীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। মুখখানা দেখে মনে হ'ল, অনেক দুঃখ-কষ্ট, ঝড়-ঝাপ্টা তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। হাতের মোটা মোটা শিরাগুলি স্পষ্ট ঠেলে উঠেছে। মনে মনে শিউরে উঠলাম। এই তবে আমার সেই কাকা! এতদিন ধরে সংসারের আশার প্রদীপ মনে ক'রে যাঁর কথা আমরা জপ করে এসেছি!

একবার ইচ্ছে হ'ল 'কাকা' বলে একবার ডেকে নি। কিন্তু সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে শুধু জিজ্ঞেস করলাম, "কত দিতে হবে অয়ষ্টারের জন্য?"

"দু' ফ্রাঙ্ক।"

আমি তাঁকে দাম চুকিয়ে আরও কিছু বখশিস দিলাম। ঠিক ভিখারীরা ভিক্ষে পেলে যে ভাবে ধন্যবাদ দেয় সেই ভাবে তিনি বললেন, "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

ভাঙ্গানি পয়সাগুলি মায়ের হাতে দিতে তিনি বললেন, "এত নিল! ডাকাত নাকি লোকটা?"

"না, আমি তাকে দশ সেণ্ট বখশিস দিয়েছি।"

মা তেলে বেগুনে জলে উঠলেন, "পাগল হয়েছিস! একেবারে দশ সেণ্ট দান করে এলি ঐ হতভাগাটাকে?"

বাবা কি একটা ইঙ্গিত করতেই নতুন জামাই্এর দিকে তাকিয়ে তিনি থেমে গেলেন।

দেখতে দেখতে জারসি এসে গেল। নামবার আগে একবার আমার সাধ হ'ল আর একবারটি কাকাকে দেখে আসি, দু'টো মিষ্টি কথা বলে আসি তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তাঁকে আর খুঁজে পেলাম না। সম্ভবতঃ তিনি তখন জাহাজের অন্ধকার খোলের মধ্যে তাঁর নোংরা ঘরে চলে গিয়ে থাকবেন।

ফিরবার সময় আমরা ইচ্ছে করেই অন্য একটা জাহাজে উঠলাম। তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'লে এবং তিনি চিনতে পারলে হয়তো মুশকিলে পড়তে হবে এই জন্যেই ভেবে-চিন্তে ঐ ব্যবস্থা করা হ'ল।

তার পর অনেক দিন কেটে গেছে। আর তাঁর সঙ্গে কোন দিন দেখা হয় নি। কিন্তু সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত, আমার কেমন স্বভাব হয়ে গেছে, বুড়ো ভিখারী দেখলেই আমি তাকে কিছু না দিয়ে থাকতে পারি না।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আমাদের নববর্ষের প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ কর। এ বছরটি রামধনুর পক্ষে পরম স্মরণীয় বছর, —রামধনু এই সংখ্যার সঙ্গে ২৫ বছর অর্থাৎ রজত-জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল। গত সিকি শতাব্দী ধরে বাংলাভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে এই গৌরব বুকে নিয়ে আজ আবার সে নতুন করে যাত্রা সুরু করবে। তার এই কৃতিত্বের ভিতর তার অগণিত কচি সঙ্গীদের দানও যে নেহাৎ কম নয় এ কথাও তার অজানা নেই। তাই এই বিশেষ দিনটিতে সেই ছোট্ট বন্ধুদের কথাই বার বার মনে পড়ছে।

এই দীর্ঘ ২৫ বছর যে সব লেখক-লেখিকা রচনা দিয়ে, যে সব শিল্পী ছবি দিয়ে, যে সব বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং যে সব শুভানুধ্যায়ী আরও নানা ভাবে রামধনুকে গড়ে তুলতে—সাজিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন আজ তাঁদের কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতা না জানালে অন্যায় হবে।

আর মনে পড়ছে রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের কথা। রামধনুর জন্ম থেকে তিনিই ছিলেন রামধনুর প্রাণ। প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে—তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে রামধনু শিশুসাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ করে। মাত্র ১১টি বছর তিনি রামধনুকে দেখে যেতে পেরেছিলেন। আজ এই স্মরণীয় দিনে রামধনুকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখে তাঁর মত আনন্দ বোধ হয় কারও হ'ত না। অন্তরীক্ষ থেকে আজ নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রিয় রামধনুকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন।

আর আমার ছোট্ট বন্ধুরা, যারা আজও রামধনুর সঙ্গে জড়িয়ে আছ,—এবারের নববর্ষে—বিশেষ করে রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তোমাদের কাছ থেকেও এত চিঠি পেয়েছি যে ইচ্ছে হচ্ছিল এ সংখ্যায় আর কিছু না দিয়ে শুধু সেইগুলিই ছেপে দি। তোমাদের ভালবাসার কথা রামধনু কোন দিন ভুলবে না।

আমাদের ইচ্ছা থাকলেও এখনও আমরা রামধনুকে মনের মত ক'রে সাজিয়ে তুলতে পারি নি। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্তের আঁকা এবারের মলাটটি আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে। নতুন বছরের রামধনুকে সম্পূর্ণ নতুন হরফে ছাপিয়ে বার করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু

সে হরফ ছাপাখানায় যথা সময়ে এসে না পৌছানোয় এ সংখ্যায় তা সম্ভব হ'ল না। শীঘ্রই আমরা এ ত্রুটী সেরে নিতে পারব বলে আশা করি।

সুসাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি ২।১ মাসের মধ্যেই সুরু হবে। তারপর অন্য ধারাবাহিক উপন্যাসগুলির একখানি শেষ হ'লেই সুলেখিকা শ্রীলীলা মজুমদার তোমাদের জন্য একখানি নতুন মজার ধারাবাহিক উপন্যাস সুরু করবেন ব'লে ভরসা দিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব অপরূপ ভঙ্গীতে লেখা এই বইখানিও রামধনুর একটি বড় আকর্ষণ হবে সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিগত চিঠিগুলির জবাব আর এ সংখ্যায় দিলাম না, আগামী বারে সেগুলি নিয়ে বসবার ইচ্ছে রইল।

যাবার আগে আর একবার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ চিঠি শেষ করি।

ইতি—রাঃ সঃ

পরলোকে অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র

এ মাসের রামধনু যখন ছাপা শেষ হয়ে এসেছে তখন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে খবর এল—রামধনুর পরম সুহৃদ ও নিয়মিত লেখক অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আর ইহলোকে নেই। এই বিশেষ দিনে রামধনুর কাছে এ সংবাদটি যে কত বড় শোকাবহ তা বলবার নয়।

শিক্ষাব্রতী হিসাবে অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিলেন, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়। যাঁরা একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই এ কথা উপলব্ধি করেছেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে দীর্ঘকাল শরীর-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থেকে ১৯৩৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সেই থেকে সাহিত্যচর্চ্চাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত।

আগামী সংখ্যায় তাঁর পুণ্যজীবন-কথা তোমাদের শোনাবার ইচ্ছা রইল। ভগবান্ তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন—আজ শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি।

চিত্র-পরিচয়

২৩ পৃষ্ঠায় বাঁ দিকের ছবিতে দেখান হয়েছে—প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য ঘুড়ী ওড়াচ্ছেন। ডান দিকের ছবিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মশাইকে উপহার দেবার জন্য জনৈক সাঁওতাল একটি মুরগী নিয়ে এসেছে।

নিত্যকার জীবনে বিজ্ঞান

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রবিবার সকালবেলায় চায়ের পেয়ালাটি মুখের কাছে ধরেছি, এমন সময় আমার ছোট ভাইপো এসে বল্ল, "কাকা, আজকের কাগজ দেখেছ? খুব ভাল খবর আছে। কাপড়ের দর হু-হু করে কমছে।"

অবাক্ হয়ে বললাম, "বলিস কি রে! তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, এই দেখ না। চট্‌পট চা-টা খেয়ে নাও। আজই কতকগুলি জামার অর্ডার দিয়ে আসি। আবার হয়তো দাম চড়তে আরম্ভ করবে।"

আমার এই ভাইপোটি বরাবরই একটু সৌখীন। কিন্তু বেচারা এমন দিনেই জন্মেছে যখন সখ মেটাবার প্রায় সব কিছুই বাজার থেকে হাওয়া। আজ প্রথম সুযোগেই তার সৌখীন মন তাই চাড়া দিয়ে উঠেছে, সুতরাং আজ আর সে সহজে ছাড়বে না।

অগত্যা চা খেয়ে দলবল সহ বেরিয়ে পড়তে হ'ল। কাপড়ের দাম পড়ায় সব দোকানদারই যে পুলকিত হয়েছে এমন মনে হ'ল না। যাই হোক, শার্টের কাপড় বাছাই চলল।

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, "সুতীর কাপড়ই নেবেন, না সিল্ক দেব?"

ভাইপোই চটপট জবাব দিল, "না না, সিল্কের অনেক দাম, সুতীই ভাল।"

দোকানদার বল্ল, "কম দামের সিল্কও আছে আমাদের—সুতোর চেয়ে অল্প বেশী দাম। এই দেখুন মার্সিরাইজ্‌ড সিল্ক। কেমন, পছন্দ হয়?"

বাস্তবিক কাপড়টি দেখতে খাসা। লম্বা লম্বা ডোরা কাটা—সিল্কের মতই জ্বল্ জ্বল্ করছে। হাতেও বেশ নরম। ভাইপোর পছন্দ হ'তে এক মুহূর্ত্তও দেরী লাগল না।

"কি বল, কাকা, এইটেই নেওয়া যাক্। সুতীর দামে যখন সিল্ক পাচ্ছি..."

গম্ভীর ভাবে বললাম. "নিতে পার, পছন্দ হ'লে আপত্তি কি? তবে ওটা কিন্তু সিল্ক নয় মোটেই। আসলে সুতীরই কাপড় ওটা, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সিল্কের জৌলুষ দেওয়া হয়েছে এই যা।"

ভাইপো সমেত আমার দলবল আর দোকানদার সকলেই অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকাল। তখন তাদের সংক্ষেপে যে রহস্যটা প্রকাশ করতে হ'ল তোমাদের এই সুযোগে সেটা বলে নি।

অনেক দিন আগে,—একশ' বছরেরও আগে জার্মেনীতে জন্ মার্সার নামে এক বিজ্ঞানী ছিলেন। সুতো নিয়ে তিনি নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতেন। সুতোর ওপর বিভিন্ন রাসায়ানিক দ্রব্য বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করলে কি কি পরিবর্ত্তন হয় দেখতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, একটা নির্দ্দিষ্ট তাপে কষ্ঠিক সোডা প্রয়োগ করলে সুতোগুলো ফেঁপে ফুলে ওঠে, আর লম্বায় ছোট হয়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা কাণ্ড হয়,—সুতোগুলো অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে পড়ে। এত চক্‌চকে হয় যে তখন আর তাকে সুতো ব'লে মনে হয় না—রেশম বলেই ভুল হয়। শুধু তাই নয়, ঐ সুতোয় বোনা কাপড় ধুলে পরে চক্‌চকে ভাবটা একটু কমলেও তা অনেক বেশী ঘন দেখায়, মজবুতও হয় অনেক বেশী।

মার্সার আরও দেখালেন, এই প্রক্রিয়ার পর সে সুতো সাধারণ সুতোর চাইতে অনেক সহজে রং করা চলে।

এর পর প্রায় ৫০ বছর কেটে গেল। তারপর লো নামে আর এক ভদ্রলোক মার্সারের আবিষ্কারটি কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। তার কয়েক বছর পরে টমাস্ ও প্রেভোষ্ট নামে আরও দু'জন বিজ্ঞানী এ কাজে নামলেন। কিন্তু তাঁরা এক নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। আগেই বলেছি, তরল কষ্টিক সোডা সুতোর ওপর ঢাললে সে সুতো ফেঁপে ছোট হয়ে যায়। আসলে সুতো হচ্ছে তুলোর ফাঁপা নল, তাই এই রকম হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেই, সুতোর এ রূপ ধরা পড়ে। এই বিজ্ঞানীরা করলেন কি, সুতোর ওপর তরল কষ্টিক্ সোডা ঢালবার সময়ে সেগুলোকে যন্ত্রের সাহায্যে এমন করে টেনে রাখলেন যে সেগুলো আর কুঁচকে ছোট হ'তে পারল না। তারপর সেগুলোকে ধুয়ে আরও কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর চমৎকার চক্‌চকে সুতো পাওয়া গেল। তা দিয়ে কাপড় বুনলে সহজেই লোকে তাকে রেশমী কাপড় বলে ভুল করতে লাগল। মার্সার সাহেবের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে এই প্রক্রিয়া সম্ভব হ'ল ব'লে তাঁর নাম থেকে ঐ প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হ'ল "মার্সারিজেশন" বা "মার্সিরিজেশন্" (বাংলার মার্সিরিকরণ বলা যেতে পারে), আর ঐ ভাবে তৈরী কাপড়ের নাম দেওয়া হ'ল মার্সিরাইজ্‌ড্ সিল্ক। এই হ'ল এই নকল সিল্কের রহস্য।

আজও ঐ নিয়মেই কাপড় চক্‌চকে করার পদ্ধতি চলে আসছে। আমাদের দেশেও অনেক মিলে এর প্রবর্ত্তন হয়েছে। দেখতে সিল্কের মত অথচ দাম সিল্কের চেয়ে কম ব'লে স্বভাবতঃই এর আদর খুব। সিল্কের মত টেকসই না হ'লেও সুতীর কাপড়ের তুলনায় এগুলি কম মজবুত নয়। তবে এ তৈরীর একটা প্রধান অসুবিধা

হচ্ছে প্রক্রিয়ার সময় সূতোগুলোকে টান করে রাখতে হয়। এজন্য অবশ্যি নানা রকম যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে। তবে সেগুলো বাদ দেওয়া যায় কিনা, অর্থাৎ না টেনে সূতোর জৌলুষ রেখে সূতোর স্বাভাবিক আকার রক্ষা করা যায় কিনা,—সে নিয়েও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। তা যদি সম্ভব হয় তবে প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই।

অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় ফুটবল দল

এ বছর হেলসিঙ্কিতে যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হচ্ছে তার জন্য ভারত থেকে একটি বাছাই-করা ফুটবল দল পাঠানো হচ্ছে। দলে নির্ব্বাচিত হয়েছেন ১৮ জন খেলোয়াড়, তার মধ্যে ১৪ জনই বাংলা থেকে। মোহন বাগানের সুবিখ্যাত ব্যাক্ এস্. মান্না এই দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড যাত্রা

ইংলণ্ডের এম্. সি. সি. দল ভারত ভ্রমণ ক'রে চলে যাবার পর এবার ভারতীয় দলের ইংলণ্ড পরিভ্রমণের পালা। সম্প্রতি ১৭ জন ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়কে, এজন্য বাছাই করা হয়েছে এবং তাঁরা ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডে পৌঁছে গেছেন। দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন বিজয় হাজারে। বাংলা থেকে গেছেন তিনজন খেলোয়াড়—ব্যাট্স্ম্যান পি. রায়, বোলার এন্. চৌধুরী এবং উইকেট-কীপার পি. সেন।

হকির খবর

কলকাতায় হকি মরশুম পূরোদমে চলেছে। গত বারের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ মোহনবাগান দল এবারেও সকলের ওপরের স্থান দখল করে আছে। মোহনবাগানের ঠিক পরেই আছে কাষ্টমস্ দল।

ওদিকে বোম্বাইএ বিখ্যাত আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতাও শেষ হ'ল। এবারেও

ফাইনালে টাটা স্পোর্টস্ দল বিজয়ী হয়েছে—লুসিটানিয়ান্স দলকে পরাজিত করে। টাটা দল এই নিয়ে পর পর তিনবার এই কাপ্ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করল।

এর কিছুদিন আগে কলকাতায় জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা হয়ে গেল—বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে। তাতে বাংলা দল ফাইনালে শক্তিশালী পাঞ্জাব দলকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। পাঞ্জাব এর আগের তিন বছরই এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিল।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ

বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এতদিন রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। আসবার আগে রাশিয়ার সর্ব্বাধিনায়ক ষ্টালিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করায় ইয়োরোপ-আমেরিকার সাংবাদিক-মহলে খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে এবং এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে ; কারণ ষ্টালিন সাধরণতঃ কোন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেই দেখা করেন না। অবশ্যি রাধাকৃষ্ণণের কাজে যোগ দেবার সময়েও ষ্টালিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ অবসর নিয়ে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য দাঁড়িয়েছেন।

টুকরো খবর

অনেক দিন পরে কলকাতা কর্পোরেশনে আবার কাউন্সিলর নির্ব্বাচন হয়ে গেল। এই নির্ব্বাচনেও অধিকাংশ আসন দখল করেছে কংগ্রেস।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে একটী ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন চীনে রওনা হচ্ছেন। এই দলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ১৪ জন লোক থাকবেন। কয়েকটি মহিলাও যাচ্ছেন।

এতদিন পরে ভারতের সঙ্গে জাপানের রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ২৮শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিক ভাবে দুই রাষ্ট্রে এই দপ্তর খোলা হবে।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রাজনীতিক স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্ সম্প্রতি ৬৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী সেনানায়কের মৃত্যুতে তাঁরই বড় ছেলে প্রধান মন্ত্রীর পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ব্যাপারটি অভিনব সন্দেহ নেই।

বৈশাখে

১লা—নতুন বছর সুরু হ'ল।

১৪ই—অক্ষয় তৃতীয়া।

২৫শে—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

২৬শে—বুদ্ধ পূর্ণিমা।

২৭শে—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

৮৫ জন

উত্তরদাতাদের নাম :—অহীন্দ্রশেখর নায়েক (বোলপুর) ; গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ইম্ফল) ; অসীমা, অনু, রুবি, নন্দন, শান্তনু, দিদিমণি, মেজদি, (করিমগঞ্জ) ; ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান) ; মালবিকা দত্ত, রমা, সুধী, শুক্লা, সেজদা, 'সেন' (করিমগঞ্জ) ; চন্দন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা—বীরভূম) ; সঞ্জীবকুমার গাঙ্গুলী (কলিকাতা-২৮), দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-৪) ; দিলীপ, গৌতম, বাসুদেব (কলিকাতা-৭) ; অচিন্ত্যালোকাশোক চৌধুরী (নবদ্বীপ) ; বিজলী সরকার (বজ্‌বজ্‌) ; মুকুলরাণী মণ্ডল (কশাড়িয়া)।

নূতন ধাঁধা

(১)

ডাক্তার বাবু বললেন, রোগীর বাড়াবাড়ি দেখলে আমায় টেলিফোন করবেন। আমার ফোন্ নম্বর মনে রাখতে কোন অসুবিধা হবে না। আমার বাড়ীর নম্বর জানেন তো, সেই নম্বরকে সেই নম্বর দিয়েই গুণ করলে ফোন্ নম্বর পাবেন। আর একটা কথা মনে রাখলেও সুবিধা হবে। আমার ফোন্ নম্বরটি হচ্ছে ৪ সংখ্যার, আর তার শেষ দু'টো সংখ্যা হচ্ছে আমার বাড়ীর নম্বর।

তোমরা বলতে পার ডাক্তার বাবুর টেলিফোন নম্বর কত?

শ্রীসন্ধ্যা রায়

(২)

ত্রি-অক্ষরে নাম তাঁর রাজ্য-রাজধানী, অন্তহীন হ'লে পাবে কৃষিক্ষেত্রে জানি!
উদর কাটিলে তার জলে জন্ম হয়, প্রথমাংশ হারাইলে কোন কিছু নয়।

শ্রীজগদানন্দ সাহা

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

নীচে কতকগুলি সহরের নাম দেওয়া হ'ল। এর কোনটায় যদি তোমাকে বরাবরের জন্য গিয়ে থাকতে হয় তবে তুমি কোন্ সহরটি পছন্দ করবে? তোমার পছন্দ মত সহরগুলি পর পর ১নং, ২নং এইভাবে লিখে পাঠাও। সকলের ভোট নিয়ে আমরা একটা তালিকা তৈরী করব এবং যার উত্তর ঐ তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি হবে সে-ই পাবে পুরস্কার। যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেকটি উত্তরের সাথে সঙ্গের কুপনটি কেটে পূর্ণ করে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। লেখা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে। সহরগুলির নাম :—কলকাতা, ঢাকা, দার্জিলীং, চট্টগ্রাম, করাচী, শিলং, পাটনা, রাঁচি, পুরী, কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, সিমলা, অমৃতসর, জয়পুর, নাগপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, শ্রীনগর।

রামধনু

পুঃ প্রঃ বৈঃ ৫৯

নাম—
ঠিকানা—
বয়স— নিজে গ্রাহক কিনা—

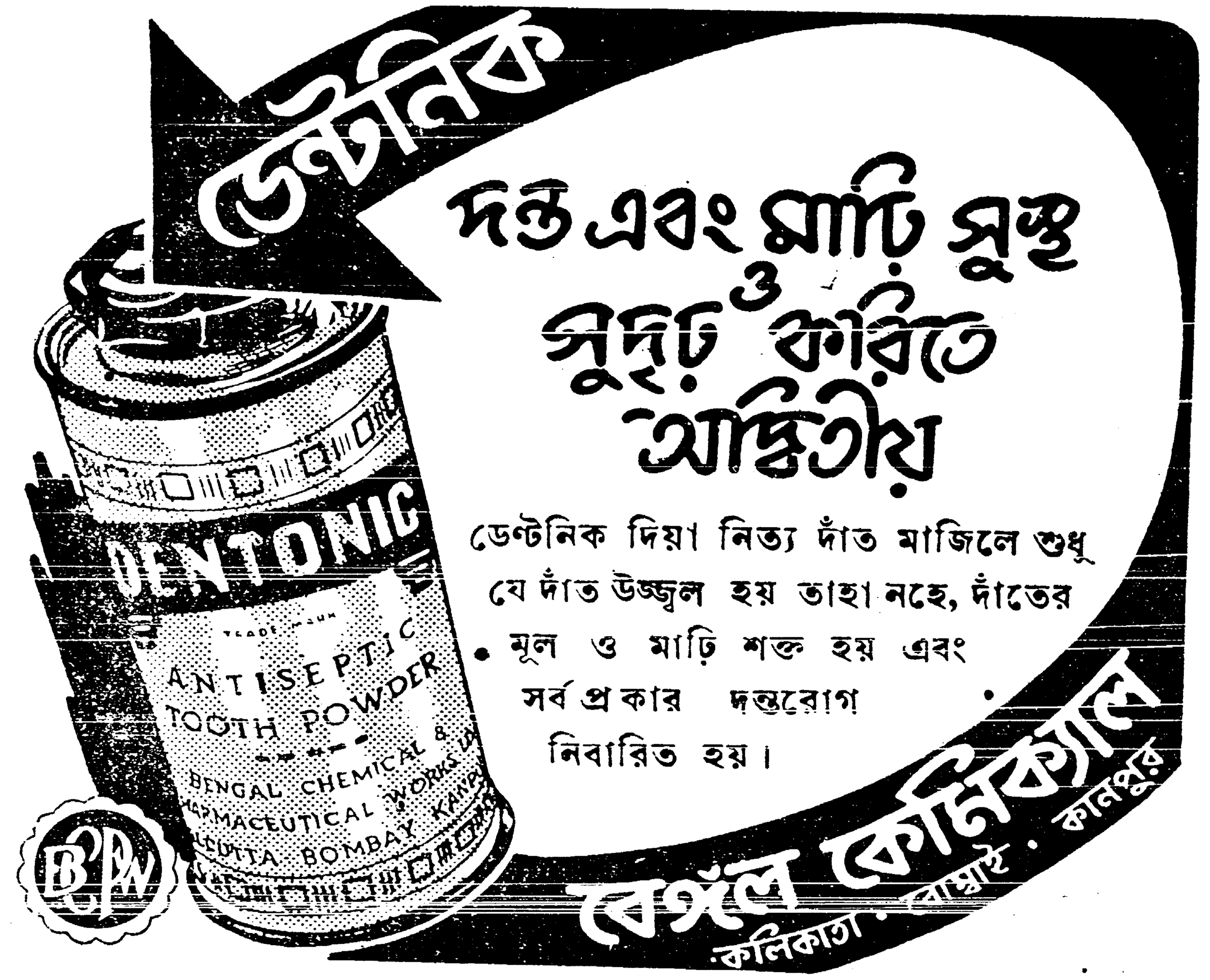

মাসিক

উষা

এই বৈশাখে ৭ম বর্ষে পদার্পণ করিল।

বৈশাখে বর্ষারম্ভ, যে কোন মাসেই গ্রাহক হওয়া যায়।

সম্পাদক { শ্রীসুধীর সরকার
শ্রীবিশ্বেশ্বর নন্দী, এম-এ

বাৎসরিক চাঁদা ৪৷৷০, ষাণ্মাসিক ২।০
ত্রৈমাসিক ১৶০, প্রতি সংখ্যা ।৶০

কার্য্যালয় :—৩৩ বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

কোষ্ঠি বিচারে ও

হাত দেখায়

বিশেষ পারদর্শী

শ্রীশশাঙ্কমোহন মজুমদার

১৫নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

নতুন বছরের শ্রেষ্ঠ বই

সুকুমার দে সরকার প্রণীত	শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত	অশোক শাস্ত্রী প্রণীত
হানাবাড়ী ১৷৹	রঘু সর্দ্দার ১৷৹	স্বর্গে থিয়েটার ১৲

ছোটদের পদ্মাপুরাণ—সুনির্ম্মল বসু প্রণীত মূল্য ২৲ টাকা

শিশু নাটক
[স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত]

এই নাটকগুলি অনেক স্কুলেই অভিনীত হইয়াছে

কেদার রায় (দীপনারায়ণ মুখো)	৷৵৹	বীর শিবাজী (সুধীন রাহা)	৷৵৹
জাগোরে ধীরে (বিধায়ক ভট্টাচার্য্য)	৷৵৹	স্বাধীনতা জাগলো (যোগেশ বন্দ্যোঃ)	৷৹
স্বামীজী (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	৷৵৹		
বন্দীবীর (সুনির্ম্মল বসু)	৷৹	উৎসব (গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়)	৷৹
চন্দ্রগুপ্ত (কেশবচন্দ্র সেন)	৷৹	মুক্তিপথে (ঐ)	৷৹
কর্ণার্জ্জুন (ঐ)	৷৹	কুশধ্বজ (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৷৹
বিজয়সিংহ (ঐ)	৷৹	বিদ্রোহী (ঐ)	৷৹
গুরুদক্ষিণা (প্রভাসচন্দ্র ঘোষ)	৷৹	সিরাজের স্বপ্ন (বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত)	৷৵৹
বীর মোহনলাল (সুধীন রাহা)	৷৵৹	প্রতাপসিংহ (ঐ)	৷৵৹

অখিল নিয়োগী 'বাণী'—৷৵৹ (পুরুষ-ভূমিকা বর্জ্জিত)

অখিল নিয়োগী 'শিশুনাটিকা'—৷৵৹ (ছেলেমেয়েদের জন্য)

য়্যাডভেঞ্চার ও ভয়াবহ কাহিনী-পরিপূর্ণ শিশু-উপন্যাস

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত		নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত		অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত	
আবার যখের ধন	১৷৹	নিশির ডাক	১৲	দুই ভাই	১৷৷৹
আধুনিক রবিন হুড	১৷৹	রক্তমুখী ড্রাগন	১৲	সুনির্ম্মল বসু প্রণীত	
হিমালয়ের ভয়ঙ্কর	১৷৹	বিষের তীর	১৲	মরণের ডাক	১৷৹

—বিস্তারিত তালিকার জন্য পত্র লিখুন—

দেব-সাহিত্য-কুটীর ২২।৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯

চন্দ্রকুমার
জ্যোতিষ-গণনালয়

৯৭, হাজরা রোড,
কলিকাতা—২৬

হস্তরেখা বিশারদ, বাংলা ও হিন্দিতে নির্ভুল কুষ্ঠী, ঠিকুজী এবং তান্ত্রিক মতে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ কবচ প্রস্তুতকারক

পণ্ডিত—**শ্রীঅধীর রঞ্জন ভট্টাচার্য্য**
তান্ত্রিকাচার্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী

এজেণ্ট চাই

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য বাংলা ও ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে এজেণ্ট চাই।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার, রামধনু
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা—২৫

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের		অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের	
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲	ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১৷৹
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲	পদ্মরাগ	১৷৷৹
আকাশের গল্প	১৷৹	সোনার হরিণ	১৷৷৹
আবিষ্কারের গল্প	৸৹	নূতন পুরাণ	৸৵৹
ধূমকেতু	৸৹	হাস্য ও রহস্য	৸৵৹
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	৷৹	চায়ের ধোঁয়া	৸৹
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের			
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲	দমাদম্ দামোদর (নাটক)	৷৵৹
শ্রীঅমলেন্দু সেনের		শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত	
দি লাষ্ট্ অব্ দি মোহিকান্স্	৷৷৵৹	অলিভার টুইষ্ট	৷৷৵৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড; কলিকাতা ২৫

দৈনন্দিন প্রয়োজনে....

ক্যালকেমিকোর এই প্রসাধন সম্ভার
সকল বয়সের নরনারীর দেহে মনে
নব অনুরাগ সঞ্চার করে।

মলয় চন্দন সাবান
ক্যাষ্টরল সুগন্ধি ক্যাষ্টর অয়েল
ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার
য়ুডিকোলন
লাইজু লাইমক্রীম গ্লিসারিণ

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

ভবিষ্যৎ

যদি মনে হয় সময়টা ভাল যাচ্ছে না, নানা অসুবিধা। কোষ্ঠি বা হাতটা দেখাবার ইচ্ছে মনে জাগে, আমার নিকট আসতে পারেন। তবে আসবার পূর্ব্বে পত্র লিখে দিন ঠিক করে আসা ভালো—সকাল-১০টা হইতে ১১টা—অথবা সন্ধ্যা-৬টা হইতে ৯টা। রবিবার বেলা-১০টা হইতে ১টা।

শ্রীঅনিল মজুমদার
১, কালী ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬
(ছাতুবাবুর বাজারের নিকট)

আসিবার সময় এই পত্রিকাটি সঙ্গে আনিবেন।

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ

স্কুল-কলেজের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক এখানে পাওয়া যায়।

ফরোয়ার্ড পাবলিশার্স

১৪১।১বি, রসা রোড (হাজরা পার্কের বিপরীত দিকে)
কলিকাতা-২৬

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিত্বায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

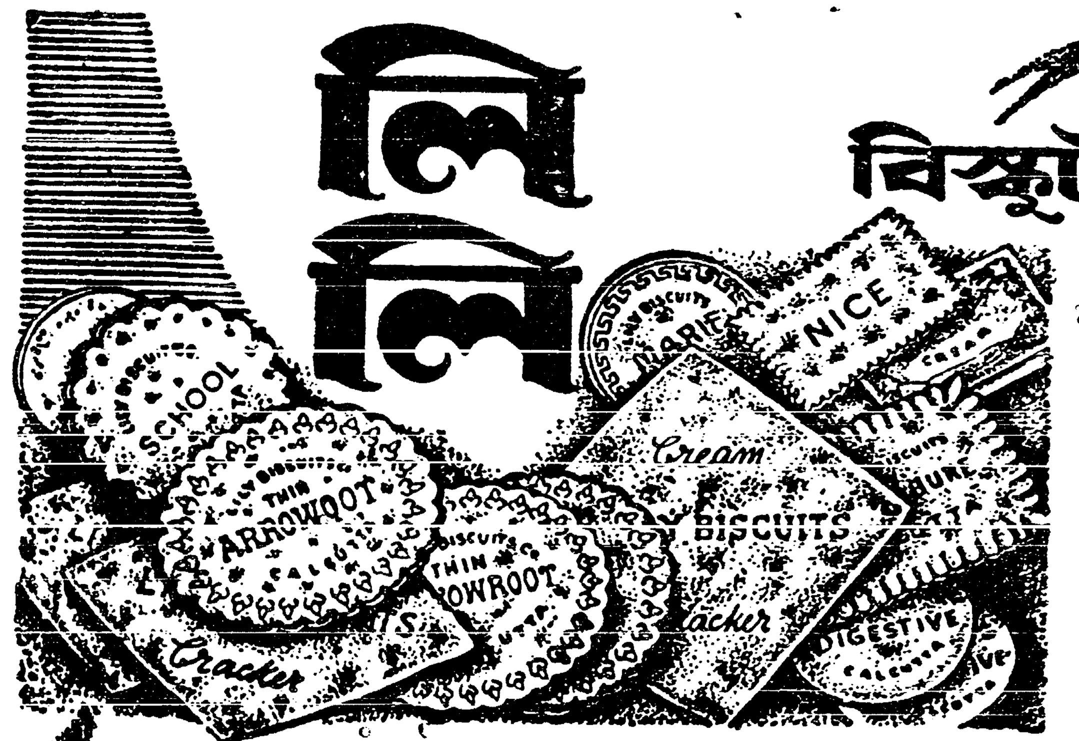

লিলি বিস্কুট

কয়েকটী মনোরম
ও
স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

রজত জয়ন্তী বর্ষ

সম্পাদক — শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম.এস.সি

সলোমন এণ্ড কোং

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড (মোহতা হাউস) কলিকাতা-১

নানা প্রকার ডিজেল—কেরোসিন—পেট্রোল-
ইঞ্জিন, হ্যাণ্ড ও পাওয়ার-পাম্প—গ্যালভানাইজ্‌ড
টিউব প্রভৃতি আমদানী ও প্রস্তুতকারক।

সোল প্রোপ্রাইটার : নৃপেন ভট্টাচার্য্য

GRAM : 'AGRASTONS' • • • PHONE : BANK 4497

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুষ্টু

শ্রীযুক্ত বিবেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ | ২য় সংখ্যা

রজত জয়ন্তী

বন্দে আলী মিয়া

চলিছে কালের রথ—
চলিতেছে নিশি দিন
সুমুখেতে অন্তহীন পথ।
পথের দু'পাশে ফোটে নামহারা ফুল,
কিছু তার থাকে মনে—কিছু হয় ভুল ;
জীবনের বৃন্ত হতে ঝরে যায় আয়ুর প্রহর
এমনি করিয়া আজ পঁচিশ বছর।
আজিকার দিন
হাসি আর প্রীতি দিয়ে হউক রঙিন।

বিসর্জন

জনৈক পুরবাসী

শুনছি কেউ কেউ বলছে, "পুরবাসীটি ভারী সেয়ানা, নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও বল্‌ছে না।" নিজের সম্বন্ধে দু'রকমের কথা বলা চলে—প্রশংসা ও নিন্দা। কিন্তু আমি যে কোন কিস্তিতে আত্মপ্রশংসা করেছি এমন তো মনে হয় না, বরং নিজেকে নিন্দা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবে তা কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ, মারের মতো প্রচণ্ড, গালের মতো তীব্র হয়ে ওঠে নি। হয়ে যে ওঠে নি তার কারণ, নিজের দোষ কেউই দেখতে পায় না, দেখে না, দেখায়ও না।

এ কথাও শুনছি, "এক একজনকে নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে।" কিন্তু বড় গাছেই ঝড়ের ধাক্কা বেশী লাগে। বাড় বাড়বে অথচ ঝড় লাগবে না এ কি হয়? যারা বা যে ও কথা বলছে তারা বা সে যদি বলে, আমি যা বলছি তা গল্প হলেও সত্যি নয় তা হ'লে আমি এ কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলবো, যে, যা বলছি তা সত্যি হলেও গল্প। আর এই কিস্তি থেকে আমি নিজেরই নিন্দা করবো এবং অপরের সম্বন্ধে সত্যিই যা ঘটেছিল বলবো কেবল তাই-ই। তা থেকে একচুলও এদিক্‌-ওদিক যাব না, কারণ এর আগেও যাই নি।

প্রথমেই বলি, কেউ যদি ঠিক সময়ে না আসে এবং অর্ধেক রিহার্শাল দিয়ে চলে যায়, রিহার্শালের সময়ে হাসাহাসি করে, "ইম্‌পরট্যান্‌ট" কথা বলে, তা হ'লে আমার রাগ হয়। আবার যদি আমাকে সকলের আগে এসে বসে থাকতে হয়, কেউ যদি একেবারেই ডুব দেয় এবং দু'-একদিন হঠাৎ ভেসে উঠে ফোঁসফোঁস করে আবার তলিয়ে যায় তা হ'লেও আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। কিংবা কেউ যদি রিহার্শাল দিতে দিতে দর বাড়াবার উদ্দেশ্যে মোচড় খায় তা হ'লে আমি খুব রেগে উঠি। আবার কেউ যদি কথা ঠিক না রাখে তা হ'লে আমি যে কি করবো ভেবে পাই নে। আমার চারধারে সকলেরই ছিল মধুমাখা স্বভাব। তবুও আমার স্বভাবের ঝাল একটুও কমতো না। বলবে, জোঁদা টকে ঝাল মরে। কিন্তু টকত্ব আমাদের দলের ত্রিসীমানায় ছিল না, সবই ছিল আঙুরের মতো মিষ্টি, বোম্বাই আমের মতো রসালো, মাখনের মতো মোলায়েম। তাই সম্মেলন-কক্ষের বারান্দায় বা মাঠে অথবা কক্ষমধ্যে বসে থাকতে থাকতে এক একদিন মনে খেদের উদয় হ'ত—

'দীর্ঘ জীবনের দিন গণিয়া গণিয়া
কাঁটার না দেখি অবসান !"

রিহার্শাল কোনদিন হ'ত সকালের দিকে, কোন দিন বা সন্ধ্যায়। মহারাণী আসতেন সংসারের কাজ চুকিয়ে। তাই যখন সভায় পৌঁছতেন তখন রাজামশাই ছত্রদণ্ড এবং পুরুতঠাকুর

বেত্রদণ্ড ধরি ধরি বা ধরে উঠি উঠি করছেন। তবুও রাণীর সম্মানার্থে কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করতেই হ'ত। কারণ তিনি সংসারের যে কর্মতালিকা পেশ করতেন তা শুনে অতি বলিষ্ঠ হৃদয়ও সংসারার্ণব পার হতে সঙ্কুচিত হয়ে উঠতো।

কিন্তু এ কথা একশ' বার বলবো যে অভিনয়ের তারিখ যত নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌ল অনেকরই উৎসাহ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। আর আমার বুকের মধ্যে ঢোলক বাজতে লাগলো। (পাঠক-পাঠিকা, আমার আত্মনিন্দার হিসেব রেখো।) তবুও কোনদিন নেপাল, কোনদিন বা অক্রূর আসে না। মন্ত্রী তো বরাবরই নেপথ্যে। এই বিপদ্‌ থেকে মাঝে মাঝে বিশুবাবু এসে উদ্ধার করেন। তিনি একাই তিন পদে অভিনয় করে বিশেষ করে আমাকে মুগ্ধ করেন। অবশ্য তিনি আসতেন সকালের দিকে, সন্ধ্যায় আসা সম্ভব হ'ত না, কারণ তিনি খুব কাজের মানুষ। "থিয়েটার করা" আমাদেরই মতো নিষ্কর্মাদেরই সাজে। তার ওপর তখন বর্ষা আসন্ন। প্রদোষে মাঝে মাঝে আকাশ ঘনমেঘে মসীময় হয়ে দু'-এক পশলা বর্ষণ হ'ত; গ্যাসকর্মীদের ধর্মঘটের ফলে শহরের পথের ধারে গ্যাস জ্বলতো না, মেঘের ছায়াও রাতের অন্ধকার মাখা, পিচঢালা কালো সিক্ত পথে পথিকের চলাচল ছিল অল্প। যে অঞ্চলে আমাদের রিহার্শাল হ'ত সেটি কতকটা জনবিরল ও বৃক্ষলতাবহুল। তাই বর্ষামুখর সন্ধ্যায় মনে হ'ত বড় নির্জন ও এর কোথায় যেন একটু শঙ্কা লুকানো। কিন্তু আমাদের—অন্ততঃ আমার (২নং নিন্দা) পকেট বরাবরই নিদাঘে পশ্চিমাঞ্চলের শুষ্ক কূপের মতো; তলদেশে আর্দ্রপঙ্কও অর্থাৎ দু'-চারটি সছিদ্র পয়সাও থাকে না। তবুও কেমন যেন মনে হ'ত। কবিত্ব করবো না, কারণ ওটা আমার ধাতে নেই, তবুও বলবো পথের পাশে উদ্যানস্থিত বর্ষাধৌত অচেনা কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভে অন্তর ভরে তুলে সব শঙ্কা দূর করে মনে শক্তি এনে দিত। সম্মেলন-কক্ষের কামিনী গাছ দু'টি ও তার তলাও ফুল ও পাপড়িতে সাদা ও সুরভিময় হয়ে থাকতো। সন্ধ্যাটিকে লাগতো সরস।

দিন কয়েক বেশ চল্‌লো। এক একদিন ফর্সা পাঞ্জাবী পরে আসতাম। এমনিতেই আমার মেজাজ ভাল নয় (৩ নং)। তার উপর যে অংশটি নিয়েছিলাম তার স্থানে স্থানে অভিনয়চ্ছলে উত্তেজনা প্রকাশ করবার কথা। অক্রূরকেও তৎপ্রসঙ্গে আমায় শান্ত করা দরকার। সেও তাই করতো এবং 'আহাহা—আহাহা—আহা-হা' বলতে বলতে আমার গায়ে এমন ভাবে হাত বুলাতো যে পাঞ্জাবীটার জন্য দুঃখ না করে থাকা যেত না। একদিন সে কথা তাকে বলতে সে খু—ব ঠাণ্ডা মেজাজে বললে, "যাক। আমি আর তোমার গায়ে হাত দেবো না।" সত্যিই তার পর থেকে সে হাত দু'খানিকে স্ববশে রেখেছিল, এ কথা বলবোই।

এর পর কি যেন কোথায় হ'ল। মানে—

"সোনার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।"

এবং একদিন হঠাৎ খাঁচা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'ল।

পুরুত ঠাকুর আর এলেন না। ফলে সকলের মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। রাজামশাই স্বভাবতঃই ধীর। তিনিও বিচলিত না হয়ে পারলেন না। রাজা না হয়েও তখন উপলব্ধি করলাম,

"ওয়েরি লাইজ দি হেড ছাট ওয়্যারস্ দি ক্রাউন।" ঠিক তখনই চলছিল পরিষদের পক্ষ থেকে কবি সুকুমার রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের আয়োজন। তাতে সুকুমার রায়ের "অবাক্ জলপান" নাটিকাটি অভিনয়ের ও তাঁর রচিত কতকগুলি কবিতা আবৃত্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের আশৈশব নট জয়সিংহের ওপর কার্যভার দেওয়া হ'ল। জয়সিংহ সাহসী, জয়সিংহ উদাসী, জয়সিংহ বাক্যবীরত্বে অদ্বিতীয়, মুষ্টিযুদ্ধে সে জো লুইকেও লজ্জা দিতে পারে। কাজেই কার্যসিদ্ধি বিষয়ে নিশ্চিন্ত রইলাম। যা কিছু দুশ্চিন্তা মন যুড়ে রইলো পুরুত ঠাকুরের অভাবে।

এমন সময় একদিন দেখা গেল শ্রীঅখিল এসেছেন রিহার্শালে। আমার বুদ্ধি বরাবরই কম (৪ নং), তাই খটকা লাগলো এবং যখন দেখলাম, রাজামশাই, জয়সিংহ ও আমাদের কানু তাঁকে সাদরে পৌরোহিত্যে বরণ করেছেন তখন রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল।

পুরুত ঠাকুরের অংশ তাঁর মুখস্থ ছিল না, কিন্তু অভিনয়কৌশল তাঁর স্বভাবগত। পাঠক-পাঠিকাগণের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, রিহার্শাল চলছিল সম্মেলন-কক্ষের বাঁধা নাট্যমঞ্চে। যেমন সকলকে প্রম্প্‌ট্ করা হচ্ছিল, তাঁকেও তেমনি করা হতে লাগলো। আকারে কেউ দীর্ঘ, কেউ খর্ব, কেউ বা হয় নাতিদীর্ঘ; অবশ্য বামনও হয়। এতে মানুষের হাত নেই। কণ্ঠস্বরের স্থূলতা, ক্ষীণতা, সূক্ষ্মতাও প্রকৃতির দান। কিন্তু অভিনয়-কৌশল আয়ত্তে আনা একেবারে নিজস্ব ব্যাপার। তাই রিহার্শাল শুনতে শুনতে, নাটকীয় অঙ্গভঙ্গী দেখতে দেখতে মনে প্রশ্নের উদয় হতে লাগলো এ কি শিশির বাবু? কথা বলতে বলতে পশ্চাদ্দেশে হাত দিয়ে লাট্টুর মতো বাঁই করে ঘুরে দাঁড়ানো, ছোটখাটো দেহটিকে সমুখে নত ও সংকুচিত করে কয়েক পা এগিয়ে ও কয়েক পা পিছিয়ে এসে আবার সতেজে অগ্রসর হয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়া, ব্যঙ্গ ও বীরত্ব প্রকাশ—বক্ষপ্রসারণ সবই যে হুবহু মিলে যাচ্ছে! এঁর সামনে রাজামশাইয়ের দীর্ঘ বিপুল দেহ, জয়সিংহের ব্যায়াম-করা পেশীবহুল শরীরও মনে হচ্ছিল কত ক্ষুদ্র! কত তুচ্ছ! মহারাণীকে মনে হচ্ছে মহাবালিকা। আর আমরা তো নস্যি! হায় আমাদের অনুপস্থিত পুরুতঠাকুর! আপনার শাল্মলীতরু সদৃশ দেহ, ভরাট ও অনুজ্ঞাপ্রকাশী কণ্ঠস্বর, কঠিন বা দৃঢ় দৃষ্টি এর তুলনায় কত নগণ্য! লোকে বলে নাট্যমঞ্চও আপনার পদস্পর্শে মর্যাদামণ্ডিত হয়, এবং আপনার পাশে দাঁড়িয়ে জনতার বিদ্রূপ ভোজেও তৃপ্তি আছে। কিন্তু এঁর তুলনায় সে সবও হয়তো উপেক্ষণীয়।

টাকায় কতটা খাদ, কতটা নিকেল, কতটা রূপো আছে জানি না, কিন্তু মেকি না হ'লে রাজাজ্ঞায় তাতে যে পুরো ষোল আনা পাওয়া যায় এটার প্রমাণ প্রত্যহ পাই। ছাপহীন টাকার পরিবর্তে কতটা পাওয়া যাবে, পোদ্দাররাই বলতে পারে। তবুও রাজদ্রোহিতার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। ভাবলাম, আমাদের শ্রদ্ধেয় পুরুত ঠাকুর যদি একান্তই আর না আসেন তো রাজকীয় চালকে বানচাল করে উপেন মানে আমাদের নেপালকে তাঁর আসন দেবার চেষ্টা করব। তিনকড়ি বাবু যে ওকে "বরন অ্যাকটর" বলেছিলেন সে কথা একবার নয়, বার বার ঠিক। ও অভিনয় করতে পারে না, এমন কোন পুরুষ ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু যেখানে রাজামশাই, জয়সিংহ, কানু এবং তাঁদের অনুগতবৃন্দ নতুন পুরুতের পক্ষে জোট বেঁধেছেন সেখানে একা আমি কি করতে পারি? তা ছাড়া অনেকেই বললেন, ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হবে। তবে পুরোনো পুরুত ঠাকুর ফিরে এলে সে অন্য কথা।

উপেনও হাওয়ার গতি দেখে এমন ডুব দিল যে মনে হতে লাগলো, সে হয় হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে অথবা আফ্রিকার গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করেছে।

শুনেছি যেখানে রাজদরবারে কাজ হয় না সেখানে রাজ-অন্তঃপুরের শরণ নিয়ে অনেক সময় কার্যোদ্ধার করা সম্ভব। এই শোনা কথার ওপর নির্ভর করে মহারাণী, অপর্ণা, চাঁদপাল ও সেনাপতিকে নিয়ে পুরুত ঠাকুরের দরজায় গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম। আমাদের কাতর নিবেদন, করুণ মূর্ত্তি ও ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে তিনি বিচলিত না হয়ে থাকতে পারলেন না। বললেন, "আচ্ছা যাব।" এবং এলেনও। সকলেরই তো চাক্ষুষ দেখা আছে এক বনে দু'টি বাঘ থাকতে পারে না। কাজেই বন ফাঁকা করে একটি ব্যাঘ্রই রয়ে গেল।

অতঃপর আরও কিছুদিন রিহার্শাল দেওয়ার পর সকলে অভিনয়ের দিন-ক্ষণ স্থির করে প্রচারের জন্য শ্রীশ্রীহরির শরণাপন্ন হলাম। তখন সকলেরই মনে এক চিন্তা, "যা করেন শ্রীশ্রীহরি।" তিনি না পারেন কি? যে সভায় একশ' জন শ্রোতাও হয় না, তাঁর কৃপায় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চড়ে দশ সহস্র জন! কৃপা থাকলে সবই সম্ভব। কৃপার অভাবে কত কি যে চাপা পড়ে তা ভুক্তভোগীর অজ্ঞাত নয়। (আগামী বারে শেষ হবে।)

ভাগবতের গল্প

শ্রীজয়দেব রায়, এম্. এ, বি. কম্

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এর আগে তোমাদের অনেকগুলো গল্প বলেছি। তার মধ্যে সবগুলোই মৌলিক রচনা, অর্থাৎ সেগুলো লেখকদের নিজেরই পরিকল্পিত।

এ ছাড়া আছে অনূদিত সাহিত্য—সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করে লেখা বই। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত আর ভাগবত হচ্ছে হিন্দুদের অতি পবিত্র ধর্ম্মসাহিত্য। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা তো আমাদের দেশের অজ্ঞ অশিক্ষিত জনগণ বুঝতো না, তাই তখনকার বাঙ্গালী কবিরা সেগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে একসঙ্গে সাধারণ লোকের ধর্ম্মতৃষ্ণা ও সাহিত্যবোধ মেটাতে চাইলেন। কাশীরাম দাস, সঞ্জয় প্রভৃতি কবিরা করলেন মহাভারতের অনুবাদ, কৃত্তিবাস, কবিচন্দ্র প্রভৃতি কবিরা করলেন রামায়ণের অনুবাদ, আর মালাধর বসু করলেন ভাগবতের বঙ্গানুবাদ। সেই ভাগবতের গল্প আজ তোমাদের শোনাব।

মালাধর বসু তাঁর ভাগবতের নাম দিয়েছেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', অর্থাৎ ভগবান্ কৃষ্ণের জয়যাত্রা ও জীবনকাহিনী। মালাধর ছাড়া তাঁর পরে আরো অনেকে ভাগবতের বিষয় নিয়ে লিখেছেন, অন্য নামে। যেমন রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', কৃষ্ণদাসের 'কৃষ্ণমঙ্গল', কবিশেখরের 'গোপালবিজয়', কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গল' প্রভৃতি।

সংস্কৃত শ্রীমদ্‌ভাগবত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান; আমাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম এক রকম এই ভাগবতকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য দেব তাঁর জীবনাদর্শ এই ভাগবত থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। কাজেই আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মালাধরের দান অনেকখানিই বলতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় বইখানিতে মালাধরের কবিনাম পাওয়া যায় 'গুণরাজ খান'।

"এক চিত্তে শুন নর সংসার তারণে।
গুণরাজ খান বলে বন্দিয়া নারায়ণে॥"

গৌড়ের সুলতান মালাধরের কবিপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে ঐ নাম দিয়েছিলেন। বইখানিতে কবি তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে—

"কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যার পুণ্য হইতে মোর নারায়ণে মতি॥
গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥"

মালাধরের সময় কিন্তু ঠিক ধরা যায় না, তবে তাঁর পৌত্র রামানন্দ বসু ছিলেন শ্রীচৈতন্যের শিষ্য; কাজেই তা থেকে তাঁর সময় খানিকটা অনুমান করা

যায়। মহাপ্রভু নিজে যে কবিকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁর উক্তি থেকেই বোঝা যায়—

"তোমায় কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥"

মহাপ্রভু মালাধরের নাতিকে বল্‌ছেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন তাঁর প্রাণনাথ, তাঁর গ্রামের অতি নগণ্য লোকও শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। বর্দ্ধমান জেলার কুলীন গ্রাম আজও তাই বৈষ্ণবতীর্থ হয়ে রয়েছে।

এখন শোন খুব সংক্ষেপে গল্পটি বলি। তবে মনে হয় এ গল্প তোমরা সবাই জানো। কংস এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের অত্যাচারে সমস্ত পৃথিবী টলমল, তখন ভগবান্ গোকুলে ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হলেন। কংসের ভয়ে তাঁর পিতা বসুদেব নবজাতককে লুকিয়ে বৃন্দাবনে নন্দ ও যশোদার কোলে দিয়ে এলেন। শিশুকে হত্যা করার জন্য কংস একে একে বহু অনুচর অসুরকে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রত্যেককেই অতি সহজে হত্যা করলেন। এই নিয়ে বহু গল্প এ বইটিতে পাবে। তারপর আরো একটু বড় হয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম কংসকে হত্যা করে দ্বারকার সিংহাসন নিলেন; একে একে বহু রাজ্য জয় করলেন, আর প্রতি রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন।

তারপর এলো কথাপ্রসঙ্গে কুরুপাণ্ডবের গল্প, অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব, জরাসন্ধ বধ, শিশুপালের কাহিনী, সুভদ্রাহরণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রভৃতি কত না কাহিনী! কেবল শ্রীকৃষ্ণের দিগ্বিজয়ের গল্পই নয়, তাঁর পুত্র-পৌত্রের অভিযানের গল্পও এতে আছে। শেষে লীলাবসানে তাঁর স্বর্গগমনের গল্প বলে কবি তাঁর পুঁথি শেষ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় মহাভারত-রামায়ণের মত আগাগোড়া পয়ার ছন্দে লেখা। প্রতিটি লাইনে ১৪টি অক্ষর এবং শেষ দুই অক্ষরে মিল। যেমন—

"শুনহ সকল লোক বলি বারে বারে।
গুনরাজ খান বলে কৃষ্ণ অবতারে॥"

মঙ্গলকাব্যগুলির মত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সুরে বাঁধা, নানা রাগ-রাগিণীর নাম প্রত্যেক পাতায় লেখা আছে। কবি তাঁর দলবল নিয়ে আসরে কীর্ত্তনের মত পালা করে এগুলি গাইতেন।

"মোর ঘরেতে—"

(একাঙ্কিকা)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

[একখানি বাড়ীর রোয়াক। সময় সকাল। কিছুদূরে একটি বাড়ীতে রেডিও বাজছে—"মোর মালঞ্চে বসন্ত নাই রে, নাই।" রোয়াকে সতীশ এসে বসলো, রেডিওর সুরে সুর মিলিয়ে গুণ্ গুণ্ করে গাইতে লাগলো। তার পরনে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে হাতকাটা শার্ট—দু'টিই আধময়লা। খালি পা; মাথার চুল উল্টে আঁচ্ড়ানো।]

সতীশ। (তেমনি গুণ্ গুণ্ সুরে গাইতে গাইতে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে হাতছানি দিয়ে) দাদা, ও দাদা! এই যে। হাঁ—হাঁ—আপনি। শুনুন—শুনে যান।

অরুণ। (হাতে একটি র‍্যাশন ব্যাগ, পরনে আধময়লা হাফপ্যাণ্ট, গায়ে হাফশার্ট, পায়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডাল। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো।) কি?

সতীশ। আপনারা ঐ মোড়ের বাড়ীটাতে এয়েছেন না?

অরুণ। হাঁ। কেন বলুন তো?

সতীশ। পাড়ায় এলেন, একটু আলাপ করা উচিত তো? বসুন না, বসুন।

অরুণ। এখন বসতে পারবো না।

সতীশ। ও! বাজারে যাচ্ছেন? তা এত সকালে কেন? এ অঞ্চলের বাজার এত সকালে বসে না। এখন গিয়ে দেখবেন, ধাঙড়রা ঝাঁট দিচ্ছে, দোকানিরা হাই তুলছে আলুওলা দাঁতন করতে করতে লোটায় জল ভরছে—

অরুণ। ঠিক বাজারে যাচ্ছি না।

সতীশ। হাটে? শ্যালদার হাটে? কিন্তু আজ তো রবিবার। হাট তো শুক্কুরবারে।

অরুণ। হাটেও নয়।

সতীশ। হাটেও নয়, বাজারেও নয়. তবে বুঝি গঙ্গার ঘাটে? অ্যাঁ?

অরুণ। (একটু রাগতঃ) যা বলবার বলুন। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না।

সতীশ। সেই জন্যেই তো বসতে বলছি। বেশিক্ষণ দাঁড়ালে পা ধরে যায় এ কে না জানে? নিন, বসুন—এই যে আসুন, (রোয়াকে ফুঁ দিয়ে হাত দিয়ে ধুলো মুছে) বসুন।

অরুণ। [তেমনি রাগতঃ] কি বলতে চান, বলুন না?

সতীশ। বলছি, পাড়ায় এসে পাড়ার লোকদের সঙ্গে যদি ভাব না করেন তো টিকবেন কি করে? আগে কোন পাড়ায় ছিলেন?

অরুণ। টালিগঞ্জে।

সতীশ। ও বাবা!! ফ্রম্ টালি টু টালা! এর মধ্যে কলকাতার শহরে আর বাড়ি পেলেন না?

অরুণ। এ পাড়ায় আসাতে আপনার ক্ষতিটা কি হয়েছে?

সতীশ। আহা! চটেন কেন? ভাল কথাই তো জিজ্ঞেস করছি। এই ধরুন না আমার কথা। শুনেছি ঐ টালিগঞ্জে লিচু, জাম আর গোলাপখাস আমের বড় বড় বাগান আছে। কেউ যদি অমায় বলে, টালিগঞ্জে গিয়ে থাক গে, তা হ'লেও আমি যাবো না। বলুন তো মশাই. গোলাপখাস আম বড়, না বন্ধুবান্ধব বড়?

অরুণ। (সহাস্যে) তা ঠিক। আমারও এখানে ভাল লাগছে না।

সতীশ। তবেই দেখুন, যা বলছি তা ঠিক কিনা? এখন বলুন দেখি, এত পাড়া থাকতে এই পাড়াটিতে কেন এলেন?

অরুণ। আমার গার্জেনের ইচ্ছে।

সতীশ। আপনার গার্জেনের তো ভারী বেয়াড়া ইচ্ছে! "ফ্রম্ টালি টু টালা। জাষ্ট্ লাইক্ দি ব্যাট্‌ল্ অব্ উদয়নালা।"

অরুণ। মশাই, আমার গার্জেনকে ইনসাল্ট করবেন না।

সতীশ। আরে: গার্জেন-ফার্জেনকে ইনসাল্ট করবার মতো ছোটলোক এ পাড়ার ছেলেরা নয়। খবরের কাগজ পড়েন?

অরুণ। আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলবার সময় আমার নেই।

সতীশ। পরশুর কাগজে ঐ মোড়ের বাড়ির, মানে আপনাদের বাড়ির যে লোমহর্ষক সংবাদ বেরিয়েছিল, পড়েছেন কি?

অরুণ। (রোয়াকে বসে পড়ে) কি! কি খবর? পরশু থেকে কাগজ পড়বার সময় হয় নি। বলুন—বলুন—

সতীশ। (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলি এমন সময় আমার একমুহূর্ত্তও নেই। আপনি বসুন। চললুম।

অরুণ। আপনি তো বেশ লোক! পাড়-পড়শীর উবগার করতে চান না! টালিগঞ্জের লোকের তো—

সতীশ। তবে আবার টালিগঞ্জে ফিরে যান। সেখানে যে বাড়ীতে ছিলেন সেখানে তো রাত দু'টোয় ছাদের আলসের—

অরুণ। কি? কি?

সতীশ। কিছু না। নমস্কার। চললুম।

অরুণ। ও মশাই, শুনুন না। (হাত ধরে) বসুন—বসুন।

সতীশ। কি? যা বলবার চটপট বলে ফেলুন।

অরুণ। বাড়ির কথা কি বলছিলেন?

সতীশ। বলছিলুম—না, আপনারা পাড়ায় এয়েছেন, আপনাদের ভয় দেখানো উচিত নয়। ও কিছু না; আর যদিই কিছু হয় তো আমরা আছি কি করতে? ভূত হোক, ডাকাত হোক, গুঁড়িয়ে ভুষি করে দেব না? এখন বলুন তো কোথায় যাচ্ছেন?

অরুণ। চাল কিনতে। কিন্তু বাড়ির কথা—

সতীশ। বলেছি তো ভয়ের কিছু থাকলেও ভয় করবেন না। আমরা রয়েছি কি করতে? আপনাদের বাড়িওলার এ পাড়ায় টঁ্যা-ফোঁ করবার যোটি নেই। তবে তার পিসী যে ঐ বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে—

অরুণ। অঁ্যা! (উঠে দাঁড়িয়ে) গলায় দড়ি—

সতীশ। ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বসুন, বসুন। কলকাতার কোন্ বাড়িতে লোক মরে নি বলতে পারেন?

অরুণ। কিন্তু গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে এমন বাড়ি তো বেশী নেই।

সতীশ। আপনি বুঝি চান, প্রত্যেক বাড়িতেই একজন করে গলায় দড়ি দিয়ে মরুক? তবে যা দিন-কাল পড়েছে তাই-ই হবে। এই যে আপনি চাল কিনতে যাচ্ছেন, যদি চাল না পান, কি চাল কেনবার পয়সাই যোগাড় করতে না পারেন তো গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে হবেই। হবে না বলতে চান?

অরুণ। দেখুন, আপনার সঙ্গে পরে এ সম্বন্ধে আলাপ করবো।

সতীশ। গলায় দড়ি দিয়ে মরা সম্বন্ধে? এখন সময় নেই? আচ্ছা যান। কিন্তু ঐ দেখছেন? ঐ যে একটি লোক বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে আপনাকে লক্ষ্য করছে, দেখছেন? ও আপনার পিছু পিছু গিয়ে দেখবে, কোথায় ব্ল্যাক মার্কেট হচ্ছে। আপনি যখন চাল কিনছেন ঠিক তখনই আপনাদের ধরবে। এই পাড়ায় দশ জন করে লোক সপ্তাহে ধরা পড়ে। আজকাল পুলিশ ভারী অনেস্ট হ'য়ে উঠেছে। যা কিছু ব্ল্যাক এণ্ড রেড—

অরুণ। কিন্তু এ সপ্তাহে এতগুলো লোক ধরা পড়লে কি জানতে পারতাম না?

সতীশ। পারবেন, পারবেন। এ সপ্তাহে আপনি থেকেই ধর-পাকড় শুরু হবে।

অরুণ। দেখুন, এ পাড়ায় আমরা নতুন। সত্যি কথা বলতে কি, কোথায় চাল পাওয়া যায়, জানি নে। র‍্যাশনে-যে চাল পাই সপ্তাহে মোটে পাঁচ দিন কোন রকমে চলে। বাকি দু'দিনের চাল কিনতে হয়। আজ যদি চাল না পাই তো দু' বেলাই রুটি খেয়ে কাটাতে হবে। তা হ'লে কাল আটাতেও টান পড়বে।

সতীশ। আপনারা বড্ড ভাত খান মশাই! রুটি কি খারাপ? দেশে যখন চাল নেই তখন চারখানি রুটি বা এক মুঠো ভাতের সঙ্গে মাংস, মাছ, ডিম, নারকেল, কিসমিস দিয়ে ছোলার ডাল, পান্তুয়া, সন্দেশ, দুধ, রাবড়ি, দই, পায়েস, কলা—

অরুণ। থাক—থাক—

সতীশ। আচ্ছা, ও সব যাক্। ও সব ছাড়াও খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভেজে কাঁচকলার, ঝিঙের, ধুঁধুলের খোসার বড়া, ছোলাভিজে দিয়ে কচি দূর্ব্বো ঘাসের ঘণ্ট—

অরুণ। কিন্তু এ সব খাবার তো মশাই আমি কখনও খাই নি!

সতীশ। খাবেন, খাবেন। কচুরিপানার পাতা ভেজে কচুরি খাওয়ার শখ মেটাতে হবে।

অরুণ। কিন্তু চোরাবাজারে চাল আসে কোথা থেকে?

সতীশ। চোরাবাজার তো দেশ নয়। ওটা আছে পরলোকের মতো অন্ধকারলোকে।

তাই তো ওটাকে টেনে বার করে দেশের সঙ্গে সমান করে ফেলবার এত চেষ্টা চলছে। আচ্ছা, আপনি এখন আসুন। নমস্কার। (উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেল।)

অরুণ। দাদা, যাবেন না। শুনুন, শুনুন।

সতীশ। (ফিরে দাঁড়িয়ে) কি বলুন?

অরুণ। বলুন না এখানে কোথায় চাল পাওয়া যায়?

সতীশ। মশাই পুলিসের লোক ন'ন তো? আজকাল কাউকেই বিশ্বাস নেই। বলি আর অ্যারেষ্ট করুন।

অরুণ। না, না, কি যে বলেন! আমাদের বাড়ির কেউই ও কাজ করে না। সত্যি, চাল না পেলে—

সতীশ। আপনি আচ্ছা লোক! একটু আগেই তো একাই যাচ্ছিলেন। এখন আবার আমায় জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি ইন্‌ফরমার, না ইনফরমেশন সার্ভিস্? বাড়িতেও জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁরে, চাল কোথায় পাওয়া যায়", "চিনি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে", আটা কোথায় বিক্রী হয়", "কাপড় কোথায় দেওয়া হচ্ছে"—এমনি সৃষ্টির খবর। কেবল খবর রাখলেই হবে না, এনেও দিতে হবে। অবিশ্যি পয়সা থাকলে। রক্ষে যে বেশীর ভাগ সময়েই ট্রেজারি এম্প্‌টি থাকে। আপনিও দেখছি চালের খবর জিজ্ঞেস করতে সুরু করেছেন। কে জানে আমার মামার বাড়ির সঙ্গে আপনার কোন দূরসম্পর্ক আছে কি না। আপনার নামটা কি বলুন তো?

অরুণ। অরুণকুমার দত্ত।

সতীশ। তা হ'লে হল না। আমার নাম সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তবে আপনি আমার মামার বাড়ির দেশের লোক হতে পারেন। আপনার দেশ?

অরুণ। ঢাকা।

সতীশ। কে বলবে, আমার মামারা সিরাজউদ্দৌল্লার সময়ে রাজা রাজা রাজবল্লভের ছেলের সঙ্গে ঢাকা থেকে কলকাতায় পালিয়ে এসে আস্তানা গেড়েছিল কিনা। সবই সম্ভব, মশাই, সবই সম্ভব! হালফিল পাকিস্তানই তার প্রমাণ। এখনও যদি যুধিষ্ঠিরের বংশধরদের, বভ্রুবাহনের নাতির নাতিদের হিসেব পাওয়া যায় তো সিরাজউদ্দৌল্লার আমলের লোকদের বংশের দু'-চারটে চারার খোঁজ এদিকে-সেদিকে পাওয়া যাবে না কেন? এ তো কালকের কথা।

অরুণ। (উঠে দাঁড়িয়ে) বেলা হ'ল, যাই। যদি বলতেন বড্ডই উপকার হ'ত। চাল না পেলে আজ না খেয়ে থাকতে হবে, কাল না খেয়েই স্কুলে যেতে হবে।

সতীশ। আপনি ইস্কুলে পড়েন! ভাল—ভাল। আমি পড়তাম।

অরুণ। ছাড়লেন কেন? ম্যাট্রিক পাস করেছেন বুঝি?

সতীশ। ছাড়ি নি, ছাড়িয়ে দিয়েছে। ছাত্রজীবনের চেয়ে সুখের আর কিছু আছে? এখন চাকরি খুঁজছি। চাকরি করতে করতে পড়বো।

অরুণ। বুঝলাম। দেখুন, আমাকেও বাড়ি থেকে বলছে পড়তে পড়তে যদি দু' পয়সা আয় করতে পারি, তা হ'লে—

সতীশ। আমারও বুঝতে বাকী নেই। চোরাবাজারের মতো চোরা কষ্টে দেশ ছেয়ে গেছে। তবে ওটাও আছে গোপনে, কেউ কাউকে বলে না।

অরুণ। কিন্তু কষ্ট পেলে লোকে তা দূর করবার চেষ্টা করে।

সতীশ। বলবেন না ও কথা। কষ্ট সয়ে থাকুন। সবাই মিলে কষ্ট দূর করতে যাওয়া তো দূরের কথা, চেঁচিয়ে বলেছেন কি বিষম ফ্যাসাদে পড়েছেন। দাঁড়ান, আমিও বাড়ি থেকে জেনে আসি বাজারে যেতে হবে কিনা। ক্ষিদেয় পেটের মধ্যে এক কুড়ি শালিখছানা কিচির-মিচির করচে। বাজারে গেলে ক্ষিদেটা একটু মর মর হয়।

অরুণ। আমারও তাই। কিন্তু মশায়, চাল না আনলে আর ঐ বাড়ির কথা—

সতীশ। হবে—হবে। (দ্রুত প্রস্থান। থলি হাতে ক্ষণপরে পুনঃপ্রবেশ) চলুন, চলুন। আমরাও আজ বেচাল। আচ্ছা, আপনি রেডিওর সেই গানটা জানেন—"মোর মালঞ্চে বসন্ত নাই রে, নাই ?" জানেন না ?—তবে শুনুন "মোর ঘরেতে চাল বাড়ন্ত ভাই রে, ভাই।"

(গাইতে গাইতে অরুণের সঙ্গে প্রস্থান।)

—যবনিকা—

প্রকৃতির খেয়াল

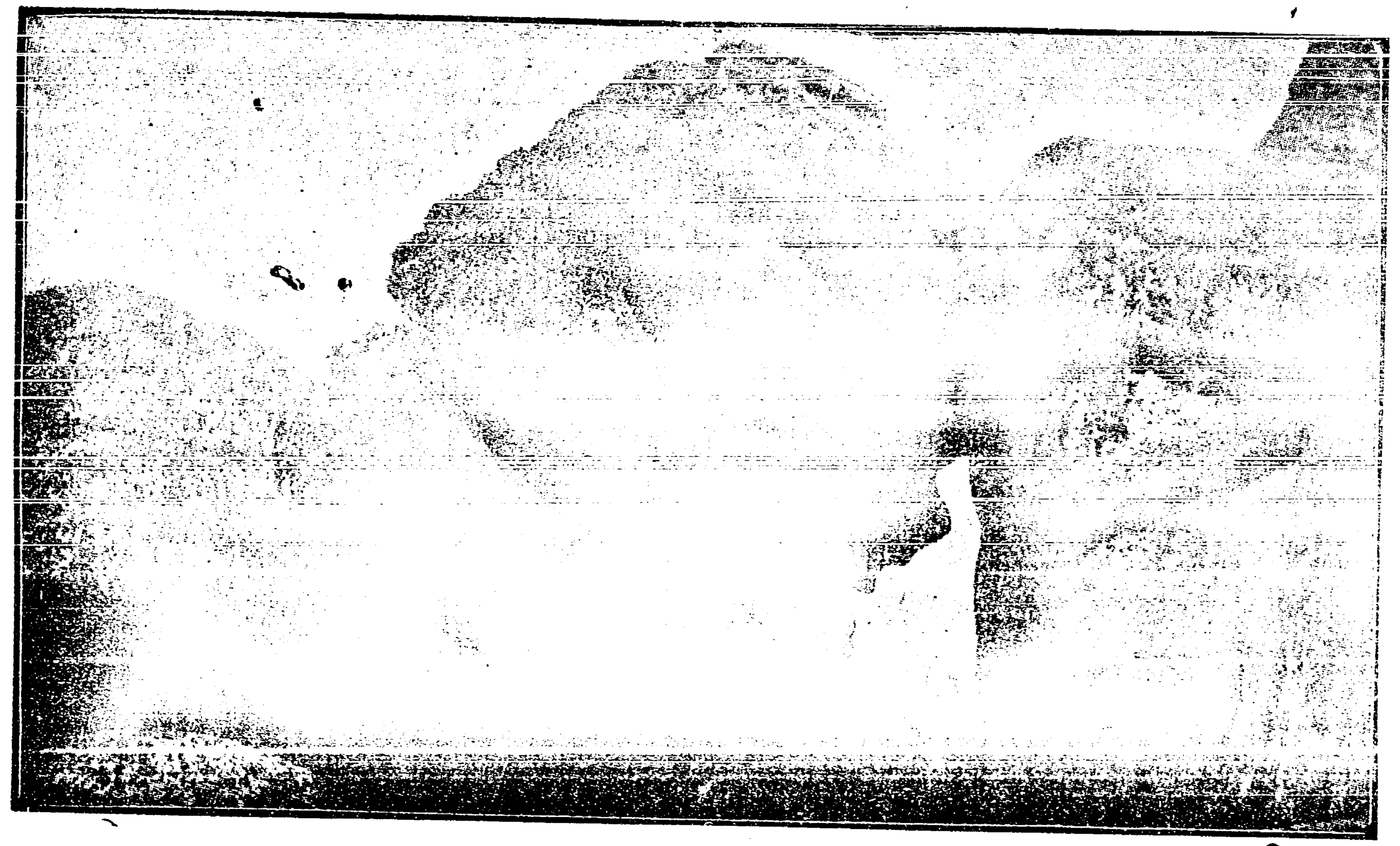

উপরে যে পাথরে গড়া মানুষের মাথাটি দেখছ ওটি কিন্তু কোনও কারিগরের হাতে গড়া নয়। হাজার হাজার বছর ধরে বৃষ্টির জল আর ঝড়ে উড়ে-আসা বালির ঘষা লেগে লেগে ওটির আজ ঐ অদ্ভুত চেহারা হয়েছে। এই পাথরটি আছে ইংল্যাণ্ডের কর্ণওয়ালে।

সোনার বালুচরে

—আট—

শ্রীঅশোক সেন, এম্. এ

"কাগজের গায়ে খুলির ছবি দেখে প্রথমটা এত অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম যে আমার চিন্তা করবার শক্তি ছিল না। আমি জানতুম, আমার আঁকা নক্শাটা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ছিল, খুলির সঙ্গে হয়তো মোটামুটি একটা মিল থাকতে পারে। তখনই মোমবাতি নিয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসলুম; পার্চমেণ্টটা ভাল করে দেখতে লাগলুম—উল্‌টিয়ে দেখলুম, আমার নক্শাটা সেদিকে ঠিকই আছে—ঠিক যেমন ভাবে এঁকেছিলুম। এ দু'টো জিনিসের মিল দেখে সত্যি খুব অবাক্ হলুম। পোকাটার নক্শা আঁকবার সময় খুলির কথা কিছুই জানতুম না—অথচ আমার আঁকা নক্শার সঙ্গে খুলিটার কি আশ্চর্য মিল! রেখা ও আকারে! তখন হঠাৎ একটা কথা আমার মনে খেলে গেল—তাতে আরো বেশী চমকে উঠলুম। নক্শাটা আঁকবার সময় পার্চমেণ্টের উপর কোন আঁকা ছিল না, আমার বেশ মনে আছে। আর এও মনে আছে, আঁকবার আগে ওটার দু'টো দিক্‌ই ভাল করে দেখে নিয়েছিলুম। খুলির নক্শা যদি ওটাতে থাকত তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার চোখে পড়ত। এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড!

"তারপর তুমি চলে গেলে; জুপিটারও অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। এইবার সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া চিন্তা করতে বসলুম। প্রথমে ভাবলুম, পার্চমেণ্টখানা আমার হাতে এল কি করে? সমুদ্রতীরে—বোধ করি দ্বীপ থেকে প্রায় এক মাইল পূব দিকে হবে—সেই সোনালী পোকাটাকে পেয়েছিলুম। ওটাকে ধরতেই আমায় এমন ভাবে কামড়ে দেয় যে পোকাটা আমার হাত থেকে পড়ে যায়। জুপিটার তখন ওটাকে ধরবার জন্যে একটা পাতা বা সে রকম কোন জিনিস খুঁজতে লাগল। ঠিক এই সময়ে আমরা দু'জনেই দেখতে পেলুম পার্চমেণ্টটা—তখন অবশ্য সেটাকে কাগজ ভেবেছিলুম। বালির মধ্যে ওটা গোঁজা ছিল, শুধু একটা কোণা বেরিয়েছিল। যেখানে ওটা পেয়েছিলুম তার কাছেই জাহাজের লম্বা

নৌকোর একটা খোলের ভগ্নাবশেষ পড়ে ছিল। অনেক দিন ধরেই সেটা ওখানে পড়ে রয়েছে বলে বোধ হ'ল, কারণ নৌকোর কাঠ বলে ভাল করে বোঝাই যায় না।

"তারপর জুপিটার পার্চমেণ্টটা তুলে সেটা দিয়ে পোকাটাকে মুড়ে আমার হাতে দিলে। তখনই আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। পথে দেখা হ'ল সেই লেফ্‌টেনাণ্টের সাথে। তিনি পোকাটাকে দেখে সেটাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি রাজী হতেই তিনি ওটাকে তাঁর ওয়েষ্টকোটের পকেটে পূরলেন। কিন্তু পার্চমেণ্টখানা তখনো আমার হাতেই রয়ে গেছে। পাছে আমি মত বদলাই বোধ করি সেই ভয়েই উনি ওটাকে তাড়াতাড়ি পকেটে রাখলেন। জানই তো, এ সব বিষয়ে ওঁর কি আগ্রহ। সেই সময়ে আমিও হয়তো অলক্ষ্যে পার্চমেণ্টখানা পকেটে রেখে দিয়েছিলুম।

"তোমার হয়তো মনে আছে, সে দিন সন্ধ্যায় পোকার নক্‌শা আঁকবার জন্যে টেবিলের কাছে গেলুম। সেখানে কোন কাগজ পেলুম না, দেরাজের ভিতর খুঁজলুম, সেখানেও কিছু পেলুম না। পুরোনো কাগজপত্র পকেটে থাকতে পারে ভেবে পকেটে হাত দিয়ে পেলুম সেই পার্চমেণ্টখানা। তা হ'লে বুঝতে পারছ, ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। দু'টো জিনিস আমার কাছে বেশ অর্থপূর্ণ বলে মনে হ'ল। সমুদ্রের ধারে একটা নৌকোর খোল পড়ে ছিল, আর তারই কাছাকাছি পাওয়া গেল ঐ পার্চমেণ্ট—কাগজ নয়, তার উপরে আঁকা রয়েছে খুলি। তুমি হয়তো বলবে এ দু'টোর মধ্যে সম্বন্ধ কোথায়? আমি বলব, খুব সহজ সম্বন্ধ; খুলির ছবি যে জলদস্যুদের নিশানা এ কথা সকলেই জানে। ওদের যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে খুলি-আঁকা পতাকা ওড়ানো হয়ে থাকে।

"আগেই বলেছি, সেই টুকরোটা কাগজ নয়, পার্চমেণ্ট। ও জিনিষ বহুদিন স্থায়ী হয়, সহজে নষ্ট হয় না। লেখা বা আঁকার কাজে ওটাতে কাগজের মত সুবিধা হয় না। এ থেকে খুলির একটা বিশেষ অর্থ আছে বুঝলুম।

"পার্চমেণ্টখানার আকার লক্ষ্য করতেও ভুলি নি। যদিও ওর একটা কোণ ছেঁড়া ছিল, তা হ'লেও বোঝা যায় ওটা আয়তাকার ছিল। অর্থাৎ ওটা এমন ধরণের জিনিস যাতে করে দরকারী কথা অনেক দিনের মত লিখে রাখা যায়।"

আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"কিন্তু আপনি তো বলছেন, আপনি যখন পোকার নক্‌শা আঁকেন তখন খুলির কোন চিহ্নই পার্চমেণ্টের উপর ছিল না। তা হ'লে আপনি নৌকো ও খুলির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পান কি করে? আপনার নক্‌শাটা

আঁকবার পর খুলিটা আঁকা হয়েছে।" (কেমন করে, কে এঁকেছে তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন!)

"সব রহস্যের মূল ঠিক এখানে, যদিও সেটা বুঝতে আমার খুব অসুবিধা হয় নি। অনেক ভেবে-চিন্তে মাত্র একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। মনে মনে অনেকটা এইভাবে আলোচনা করেছিলুম: পোকাটার নক্‌শা আঁকবার সময়ে পার্চমেণ্টের উপরে খুলির কোন চিহ্ন ছিল না—সে কথা ঠিক। নক্‌শাটা এঁকে ওটা তোমার হাতে দিলুম। তুমিও তা হ'লে খুলিটা আঁক নি, আর সে সময়ে অন্য কেউই উপস্থিত ছিল না। তা হ'লে কোন মানুষ ওটা আঁকে নি! কিন্তু ওটা যে আঁকা ছিল সে কথাও সত্যি।

"এই সময়ে একটা কথা আমার খুব পরিষ্কার ভাবে মনে পড়ল। সেদিনটা খুব কনকনে ঠাণ্ডা ছিল, ঘরে চিমনির আগুন বেশ জ্বলছিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর আমার গরম লাগছিল বলে আমি আগুন থেকে খানিকটা দূরে টেবিলের কাছে গিয়ে বসলুম। তুমি চিমনির খুব কাছে চেয়ারে বসেছিলে। যে মুহূর্তে তোমায় পার্চমেণ্টখানা দিলুম সেই মুহূর্তে আমার কুকুরটা ঘরে ঢুকে তোমার কাঁধের উপর লাফিয়ে উঠল। মনে আছে, তুমি তখন বাঁ হাত দিয়ে ওকে আদর করতে লাগলে, আর ডান হাত থেকে পার্চমেণ্টখানা তোমার হাঁটুর উপরে পড়ে গেল,—চিমনির খুব কাছেই পড়ল। একবার ভাবলুম, বুঝি বা ওটায় আগুন ধরে গেল; তোমায় সাবধান করতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই তুমি ওটাকে হাতে তুলে নিয়ে আবার দেখতে সুরু করলে। যখন এ সব খুঁটিনাটি ঘটনাগুলি পর পর মনে পড়ল, তখন আমার কোন সন্দেহ রইল না যে উত্তাপের ফলেই পার্চমেণ্টে আঁকা খুলির মূর্তিটা জেগে উঠেছে। তুমি জান, এমন সব রাসায়নিক জিনিষ আছে যা দিয়ে কাগজ বা পার্চমেণ্টের উপর লিখলে চোখে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু গরম করলেই সে লেখা বা রেখা ফুটে ওঠে। সে রকম রাসায়নিক জিনিষের সঙ্গে জল কিংবা স্পিরিট মিশিয়ে সবুজ ও লাল রংএর কালি তৈরী করা যায়। ঠাণ্ডা জিনিসের উপর লিখলে কখনো বা বেশী, কখনো বা কম সময়ের মধ্যে রং উঠে যায়, কিন্তু উত্তাপ দিলে আবার সেই রং দেখা যায়।

"এরপর আমি খুলিটাকে ভাল করে পরীক্ষা করতে বসলুম। পার্চমেণ্টের ধার দিয়ে খুলির যে রেখাটা গেছে সেটা ভিতরের অন্য রেখার চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট। তা হ'লে বোঝা যায়, উত্তাপটা রেখার সব জায়গায় সমান ভাবে পড়ে নি। তখনই একটা বাতি জ্বালিয়ে সবটা পার্চমেণ্টেই খুব বেশী করে উত্তাপ দিলুম।

তাতে অস্পষ্ট রেখাগুলি আরও স্পষ্ট হ'ল, আর পার্চমেণ্টের কোণে খুলির রেখার ঠিক উল্টো দিকে আর একটা নক্শা দেখতে পেলুম; প্রথমে সেটাকে ছাগল বলে মনে করেছিলুম, কিন্তু ভাল করে দেখে বুঝলুম ওটা ছাগল নয়—ছাগলের বাচ্চা, যাকে ইংরেজীতে বলে 'কিড্'।

(ক্রমশঃ)

সাজের ঘটা

নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে কে না চায়? তবে তার রকমফের আছে। নীচে এই রকম একটি ভদ্রলোক ও একটি ভদ্রমহিলার ছবি দেওয়া হ'ল। ভদ্রলোকটির বাড়ী অষ্ট্রেলিয়া। ইনি সারা অঙ্গে সূচ বিঁধিয়ে এমন ভাবে উল্কী পরেছেন যে কোথাও আর ফাঁক নেই একটুও। ভদ্রমহিলাটির বাড়ী বুলগেরিয়ার এক গাঁয়ে। এটি তাঁর বিবাহের সাজ। মাথায় মুকুট তো আছেই, তা ছাড়া সারা মুখখানাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে মোহর দিয়ে। যাকে বলে "সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া"—তাই আর কি!

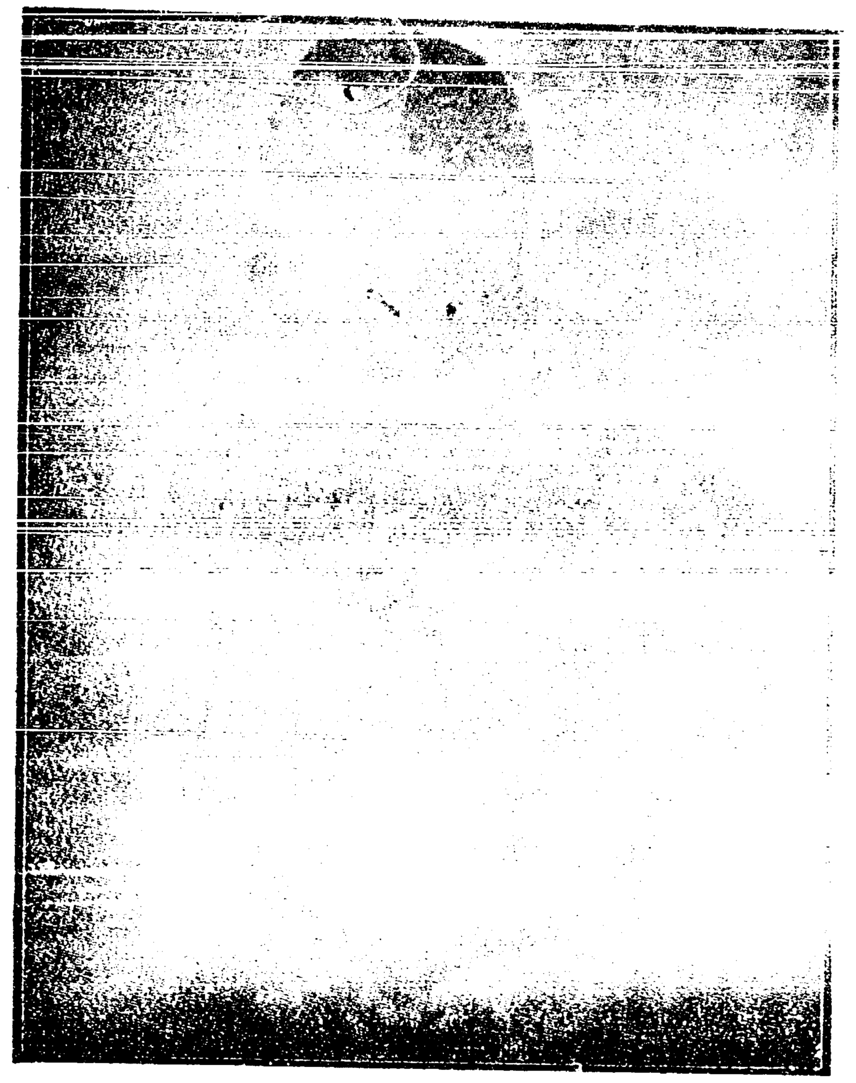

অষ্ট্রেলিয়ার উল্কীধারী পুরুষ

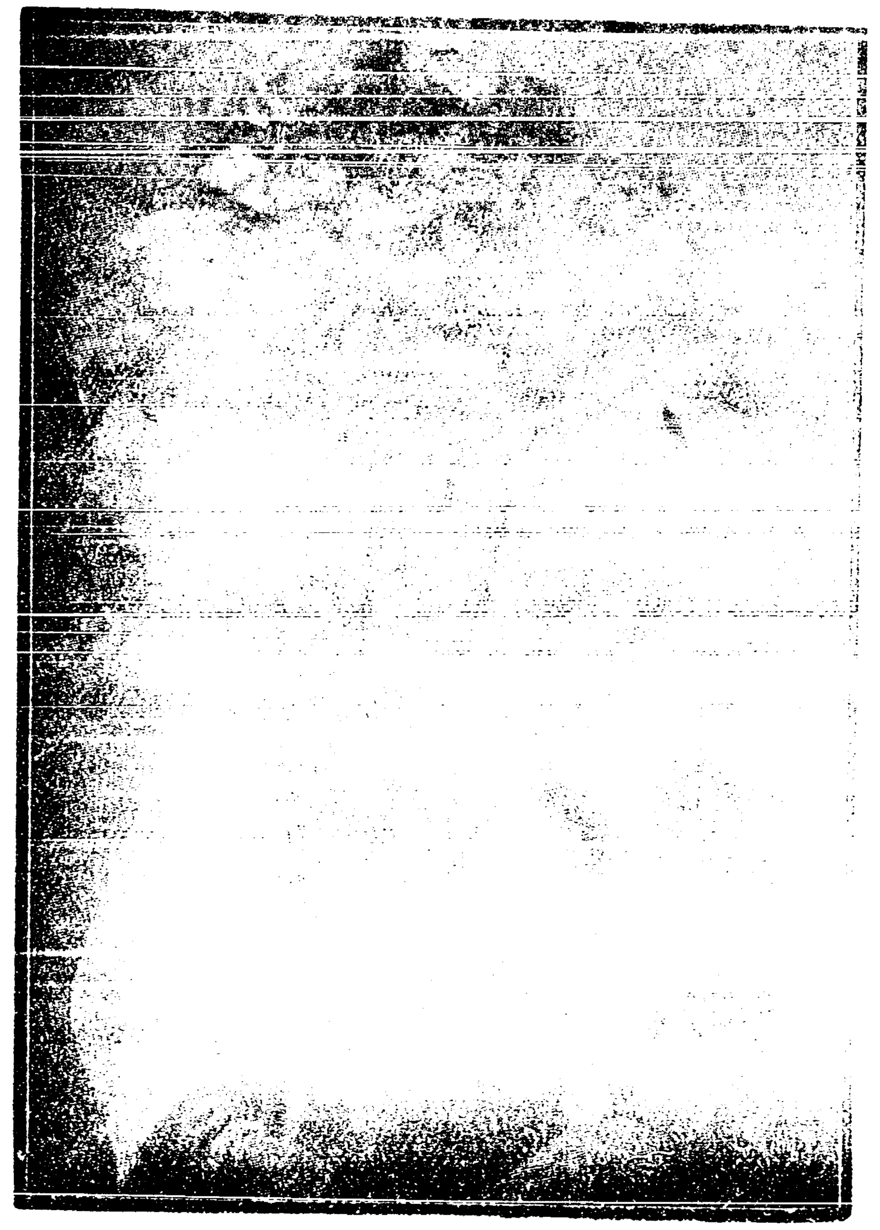

বুলগেরিয়ার গ্রাম্য কনে

মহাকালের পূজারী

[অতীত যুগের এক বিস্মৃত কাহিনী]

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—এক—

ভগবান্ তথাগত বুদ্ধের মৃত্যুর পর প্রায় দু'শো বছর অতীত হ'য়ে গেছে। শতধা বিচ্ছিন্ন উত্তরাপথের ছোট ছোট রাজারা পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম করে রাজ্যবৃদ্ধি ও রাজ্যলোপ করেছে। বৃজ্জি ও শাক্যজাতির আধিপত্য লুপ্ত হয়েছে, অবন্তী (মালব প্রদেশ) ও বৎস (এলাহাবাদের সন্নিকটস্থ প্রদেশ) রাজ্যের প্রাধান্য নষ্ট হয়েছে, কোশলের (অযোধ্যা প্রদেশ) সূর্য্য অস্তমিত-প্রায়, মগধ (দক্ষিণ বিহার) ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছে। কোশলকে পরাজিত করে মগধই হয়েছে এখন উত্তরাপথের সর্বপ্রধান।

রাজগৃহ মগধের রাজধানী। বিম্বিসার অঙ্গদেশ (পূর্ব বিহার) জয় করে রাজগীরে রাজধানী করেছেন। স্থানটি মনোরম। চারিপাশে পাহাড়ের পর পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, রাজধানী রক্ষার জন্য নতুন করে কোন প্রাকার গড়তে হয় নি। চারিপাশে পাঁচটা পাহাড়ের পাঁচীল তুলে প্রকৃতিদেবীই যেন এই স্থানটিকে রাজধানী করার জন্যই তৈরী করেছেন। প্রাচীন কাল থেকে জরাসন্ধ প্রভৃতি অনেক শক্তিমান্ রাজাই এখানে বাস করে গেছেন কিন্তু বিম্বিসারের সময় এর সমৃদ্ধি শিখরে গিয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব ও মহাবীর বহু বছর গৃধ্রকূট ও বিপুল গিরির চূড়ায় অবস্থান করে রাজগীরের নগরবাসীদের ধর্ম উপদেশ দেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু হিমালয় থেকে ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন।

কিন্তু এত সমৃদ্ধি স্থায়ী হ'ল না। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ীভদ্র রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেল কয়েক ক্রোশ দূরে গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থল পাটলিপুত্রে। রাজগীরের সমৃদ্ধি ও জন-বাহুল্যও ক্রমে ক্রমে স্থানান্তরিত হ'ল পাটলিপুত্রে। নগরোপকণ্ঠে অজাতশত্রুর দুর্ভেদ্য দুর্গের পিছনে যে বেণুবনে বুদ্ধদেব শত শত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে কত বিশ্রামরজনী যাপন করেছেন, যে অম্রকাননে একদিন কত বসন্ত-উৎসবের সমারোহ হয়েছে তা ক্রমে আগাছার জঙ্গলে আকীর্ণ হয়ে গেছে। যে উদ্যান একদিন প্রমোদ-কানন ছিল, যার পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত পথ এক সময় শ্রেষ্ঠী ও নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য-পদক্ষেপে মসৃণ হয়ে উঠেছিল, তা এই দুই শত বৎসরে দুর্গম, বন্ধুর ও জীর্ণ হয়ে গেছে। এখন এই পথ একাকী অতিক্রম করতে পথিকের শঙ্কা জাগে।

মাঝে মাঝে মগধ-সম্রাট পাটলিপুত্র থেকে রাজগৃহে আসেন এবং পার্ষদদের সঙ্গে এই বনে আসেন মৃগয়া করতে। মগধ-সম্রাট কাকবর্ণী মহানন্দীও সেদিন এই বনে মৃগয়া করতে এসে বিপন্ন হয়ে পড়লেন।

কয়েকজন অন্তরঙ্গ অনুচর নিয়ে সম্রাট বনে প্রবেশ করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যার আগেই মৃগয়া শেষ করে ফিরে আসবেন। কিন্তু একটি বন্য বরাহ বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি এতই

উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে পূরো তিন দণ্ড কাল দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে তিনি বরাহটীর পিছনে ছুটাছুটি করে যখন বরাহটিকে শরবিদ্ধ করলেন তখন গভীর অরণ্যে তিনি দিক্‌হারা। সঙ্গীদের মধ্যে একক পার্শ্বচর রাঘবদাস ছাড়া সঙ্গে আর কেউ নেই। সঙ্গীরা কে কোথায় হারিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে আকাশে কালবৈশাখীর মেঘ জমা হয়েছে, মহীরুহের বিপুল পত্রসন্নিবেশের অন্তরাল থেকে কেউই তা জানতে পারে নি। সহসা চারিপাশ অন্ধকার করে শন্ শন্ শব্দে বাতাস বইতে সুরু করলো, সম্রাট বিপন্ন বোধ করলেন। রাঘবদাস বললো—ভয় নেই প্রভু, আমি পথ বের করছি, কাছেই মহাকালের মন্দির আছে, আম্রলতিকা* নামে একটি ভগ্নগৃহও আছে, বুদ্ধদেব একসময় সেই গৃহে বাস করতেন।

রাঘবদাস জঙ্গলের মধ্যে পথ নির্ণয় করার চেষ্টা করলো।

এদিকে চারিপাশ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বার দুয়েক বাজ পড়লো। তারপরই প্রচণ্ডবেগে নামলো বৃষ্টি। সেই দুর্য্যোগের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু রাঘবদাস সহজে হতাশ হবার মানুষ নয়, ঘোড়ার রাশ ছেড়ে পিঠ চাপড়ে বললো—চল্, বেটা চল্, তোর যেখানে খুসি!

অশ্ব প্রভুর সেই ভাষা বুঝলো কিনা কে জানে, হ্রেষাধ্বনি করে সাড়া দিল, তারপর ঝড়-জল উপেক্ষা করে আপন মনেই এগিয়ে চললো। সেই জল-ঝড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ চলার পর অশ্বটি থামলো। বিদ্যুৎ চমকালো, সেই আলোয় চোখে পড়লো একটি পথের উপর তারা এসে দাঁড়িয়েছে, পথের মাথায় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে একটি টিলা। রাঘবদাস বললো—এসে গেছি প্রভু, ওই আম্রলট্‌ঠিকা দেখা যাচ্ছে, ওখানে পৌছাতে পারলে এই ঝড়-জলের মধ্যে উপস্থিতের মত আশ্রয় মিলবে।

দু'জনে দ্রুত এসে পড়লো সেই টিলার সামনে। দূর থেকে টিলা মনে হ'লেও সেটি আসলে টিলা নয়, একটি জীর্ণ অট্টালিকা। তার সর্বত্র নানা আগাছা জন্মেছে, তোরণের সঙ্গে খানিকটা অংশ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এখনও; বাকীটুকু শুধু জঞ্জালের একটা ঢিবি, আর কিছু নয়। আজকের এই জীর্ণ ভগ্ন অট্টালিকা দেখে কেউ বলবে না যে দু'শো বছর আগে এইটি মগধ-সম্রাট্ বিম্বিসারের প্রমোদ-ভবন ছিল, তথাগত বুদ্ধ যখন শিষ্যদের নিয়ে এই গৃহে বাস করতেন তখন রাজ্যের যত জ্ঞানী, গুণী ও বিত্তবানের পদস্পর্শে এই গৃহটি ধন্য হয়েছিল।

দু'জনে তোরণের নীচে এসে ঘোড়া থেকে নামলেন। প্রশস্ত খিলানের নীচে এসে দাঁড়ালেন, বৃষ্টিধারা থেকে উপস্থিতের জন্য রক্ষা পেলেন।

রাঘবদাস বললে—প্রভু, আপনার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, উষ্ণীষ খুলে দেবো, হাত পা মুছবেন?

—না না, রাঘবদাস, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, সামান্য বহির্বাস ভিজেছে, এতে কোন ক্ষতি হবে না।

---

* দীঘনিকায় নামক পালি গ্রন্থ হতে জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধ কখনও কখনও রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী নালন্দা গ্রামের সন্নিকটস্থ পাবারিক আম্রকাননে আম্রলট্‌ঠিকা নামক বাসগৃহে অবস্থান করতেন। —শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়, বি. এ প্রণীত 'নালন্দা' দ্রষ্টব্য।

বিদ্যুৎ চমকালো। চোখে পড়লো সামনের ঝোপঝাপের অন্তরালে কয়েকটি মানুষের কালো ছায়া। অনুচরদের কেউ হবে মনে করে সম্রাট্ ডাক দিলেন—কে ওখানে?

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সম্রাট্ আবার বললেন—কে ওখানে? তথাপি কোন উত্তর নেই। শুধু পাতার অন্তরালে খস্‌খস্ করে একটা শব্দ হ'ল।

সম্রাট্ তরবারিতে হাত দিলেন, বললেন—রাঘব, কয়েকজন লোকের যেন ছায়া দেখলাম বলে মনে হ'ল!

আমিও দেখেছি প্রভু!

তবে সাড়া দিল না যে?

কিছু তো বুঝতে পারছি না প্রভু!

আবার খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল, মনে হ'ল কারা যেন কথা বলছে। সম্রাট্ এবার আগের চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন—ওখানে কে?

এবার সাড়া পাওয়া গেল—আমরা আপানার একান্ত অনুগত প্রজা, সম্রাট্! এতক্ষণ আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

চকিতে কয়েকজন লোক সম্রাট্ ও রাঘবদাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, অল্প আয়াসেই দু'জনকে নিরস্ত্র করে বেঁধে ফেললো। তারপর দু'জনকে ঘোড়া দু'টির পিঠে চাপিয়ে ঘোড়ার রাশ ধরে অগ্রসর হ'ল বনপথে।

—দুই—

অম্রলট্‌ঠিকার অদূরেই মহাকালের মন্দির।

দ্বার রুদ্ধ। দ্বারের ফাটল দিয়ে দেখা গেল ভিতরে আলো জ্বলছে। আগন্তকের দল দ্বারে আঘাত করলো। ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল—কে?

দ্বার খুলুন।

দ্বার খুলে সামনে এসে দাঁড়ালো এক অতীত-যৌবন ব্রাহ্মণ। বয়স প্রায় বছর চল্লিশের কাছাকাছি, গৌরবর্ণের উপর এক গোছা শাদা পৈতা ধব্‌ধব্ করছে।

আগন্তক দলের একজন এগিয়ে এসে বললো—আচার্য্য আছেন ত'?

—হ্যাঁ, শুয়ে আছেন, গত তিন দিন ধরে তিনি অসুস্থ।

—উত্তম, আপনিই তা হ'লে মহাকালের পূজার আয়োজন করুন, পূজার উপকরণ আমি এনেছি।

আগন্তক ভিতরে প্রবেশ করলো, পিছন পানে তাকিয়ে অনুচরদের আহ্বান করলো—সবাই ভিতরে এসো!

মন্দির-মধ্যে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ, পাশেই একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে। বাহিরের

দমকা হাওয়ায় প্রদীপটা কেঁপে উঠলো। আগন্তুকের দল ভিতরে এলো, ছু'টি ভারী বোঝা নামিয়ে রাখলো এক পাশে।

ব্রাহ্মণ দ্বার খুলে দিয়ে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, বোঝা ছু'টির পানে তাকিয়ে এবার সে বিস্মিত হ'ল, অস্ফুট স্বরে বললো—মগধ-সম্রাট্ না?

—হ্যাঁ, উনি মগধের সম্রাট্ কাকবর্ণী মহানন্দী। ওঁকে আমি বন্দী করেছি। কাল থেকে আমিই হব মগধের সম্রাট। এতদিনে আচার্য্যদেবের ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হ'ল।

চারিপাশ বন্ধ গর্ভগৃহের মধ্যে আগন্তুকের স্বর গম্ গম্ করে উঠলো।

মন্দিরের গর্ভগৃহের সংশ্লিষ্ট একটি ছোট প্রকোষ্ঠ ছিল, সেই ঘরের ভিতর থেকে এবার সাড়া পাওয়া গেল—কে, উগ্রসেন এসেছ?

আগন্তুক প্রকোষ্ঠের দ্বারের কাছে এগিয়ে গেল, বললো—আচার্য্যদেব, আজ মহা-উপচারে মহাকালের পূজা করবো, এতদিনে আপনার ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হ'ল।

—কিছু তো বুঝতে পারলাম না!

যিনি দ্বার খুলেছিলেন তিনি এবার উগ্রসেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—এরা মগধ-সম্রাট্কে বন্দী করে এনেছে।

—মগধ-সম্রাট্কে বন্দী করে এনেছ, এই মন্দির-মধ্যে! কেন উগ্রসেন?

—আপনার ভবিষ্যৎবাণী এতদিনে সফল হ'ল, এবার আমি সত্যই রাজা হব।

—সে জন্য মগধ-সম্রাট্কে বন্দী করেছ কেন?

—আমি যে মগধেরই সিংহাসনে বসবো বলে ঠিক করেছি।

—তোমার কথা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না!

—মগধ-সম্রাট্ কাকবর্ণী মগধের সিংহাসন থেকে অপসারিত হবেন এবং সেই সিংহাসনে বসবেন মহানায়ক উগ্রসেন।

—তুমি কি সম্রাট্কে হত্যা করবে বলে এই মন্দিরে এনেছ?

—হত্যা নয়, আচার্য্যদেব, মহাকালের চরণে ষোড়শোপচারে মগধ-সম্রাট্কে উৎসর্গ করবো। আপনি পূজার আয়োজন করতে বলুন।

—না না, উগ্রসেন, মন্দিরমধ্যে রক্তপাত করা চলবে না।

—রক্তপাত নয়, দেবতার পূজা।

—পূজা এবং হত্যা এক কথা নয় উগ্রসেন! তুমি মগধ-সম্রাট্কে হত্যা করতে চাও, মন্দিরের বাহিরে যাও, মহাকালের মন্দিরে আমি কোনরূপ রক্তপাত হতে দেব না।

—মহাকাল সংহারের দেবতা, তিনি স্বপ্নে আমার কাছ থেকে রাজরক্ত চেয়ে ছিলেন।

—আমি খুনী দস্যুর কথা বিশ্বাস করি না। উগ্রসেন, তুমি মন্দির থেকে বাহির হয়ে যাও!

—আমার হাতে যতক্ষণ অস্ত্র আছে ততক্ষণ এই মন্দির থেকে আমাকে কেউ বাহির করতে পারবে না। আপনি পূজা না করেন আমি পূজা করবো!

—কী! আমার মন্দিরে একজন দস্যু আমার চোখের সামনে আমার দেবতার অপমান করবে!

আচার্য্য উত্তেজিত হয়ে খাটিয়া থেকে নেমে পড়লেন। ঘরের কোণে একটি ত্রিশূল ছিল, সেটি তুলে নিয়ে আক্রমণ করলেন উগ্রসেনকে। উগ্রসেন এজন্য প্রস্তুত ছিল, এক পা পিছু হটে গিয়ে তলোয়ার বার করে আচার্য্যের হাতে আঘাত করলো। আচার্য্যের হাত থেকে সশব্দে ত্রিশূল খসে পড়লো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। উগ্রসেন সেদিকে দৃক্পাত করলো না, বললো—ভর্তু, এদের ছু'জনকে এই মুহূর্তে মন্দির থেকে বের করে দাও।

উগ্রসেনের কয়েকজন অনুচর এসে আচার্য্য ও তার শিষ্যকে ধরে মন্দির থেকে বাহির করে দিল। আচার্য্য তখন ক্রোধে কাঁপছিলেন। বাহির হবার আগে তিনি উগ্রসেনকে লক্ষ্য করে বললেন—আমার দেবতার সামনে তুমি আমায় অপমান করলে, ব্রাহ্মণের রক্তপাত করলে। আমি অভিশাপ দিচ্ছি—এই ব্রাহ্মণই একদিন তোমাকে নির্বংশ করবে!

উগ্রসেন হা-হা করে হেসে উঠলো। ভর্তু ছু'জনকে ধাক্কা দিয়ে বাহির করে দিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে দিল।

(ক্রমশঃ)

বারেক থামাও নাও

শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিক

নাওখানি বেয়ে বেয়ে কোথা তুমি যাও?
ভাই, আমাকেও সাথে ক'রে নাও মাঝি, নাও।
ছল ছল জলভরা অতল নদীর
বুকে হৃদয় তোমার দেখি আকুল অধীর;
যেন কি এক মায়ার সুরে গানখানি গাও!
মাঝি বারেক থামাও নাও, থামাও থামাও।

যাও কি কোথাও কোনো অচিন্ পাড়ায়—
তা'র পরিচয় পেতে জাগো বিপুল সাড়ায়।
হাজার কাজের মাঝে জীবন যেথায়
জাগে নবীন আশায়,—তুমি যাও কি সেথায় ?
ভাই, আমারো যে জাগে হিয়া তারি ইসারায়।
মাঝি, বারেক থামাও নাও, থামাও থামাও।

জানি না নদীর ধারে কোথা তব ঘর—
আজ আগুন লেগেছে সেথা, জ্ব'লে গেছে চর।
চ'লে গেছে সাথী যত আপনার জন,
তাই একেলা চ'লেছো বুঝি ছিন্ন বাঁধন ?
ভাই, ক্ষণেক থামাও, আমি নই তব পর ;
মাঝি, বারেক থামাও নাও, থামাও থামাও।

আঁধার ঘনায় ঘন বন-বীথিকায়,
ভানু শেষের আলোক জ্বালে আগুন-শিখায়।
আমার মনের কোণে জাগায় স্বপন—
কোনো নতুন প্রভাতে আলো জ্বালিয়া তপন
প্রাণে লিখে দেয় গানখানি শোণিত লিখায় !
মাঝি, বারেক থামাও নাও, থামাও-থামাও।

স্বাগত

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

স্বাগত স্বাগত হে সুধীবৃন্দ, দীন অঙ্গনে মম,
তোমাদের প্রীতিমধুর পরশ করুক্ ধন্যতম
পর্ণ কুটীর। স্বর্ণ-আলোক ঢেকেছে অকাল মেঘে ;
দখিনা পবন ভুলিয়াছে দিশা পূবালী বাতাস লেগে।
বসন্তদিন দুঃখবিহীন করো সুসঙ্গে তব ;
আমার পল্লীভবনে সবারে আপন করিয়া লব।

বন্ধু, আমরা পথিক সকলে পুরাতন পথপরে ;
কেহ আগে কেহ পশ্চাতে চলে, তবু চিরদিন তরে
লক্ষ্য সবার এক, সকলের অঞ্জলি একভাবে,
এক মন্দিরে করি পূজারতি ; এমনি জীবন যাবে।
একটি দিনের অবকাশে মোরা মিলিয়াছি একসনে,
আজিকার প্রীতি-উৎসবস্মৃতি রহিবে সবার মনে।

নূতন প্রভাতে নব উৎসাহে চলিতে নূতন ব্রতে,
নবীন প্রেরণা লভিব বন্ধু, তোমার আনন হ'তে।
তোমার চোখের কোমল দৃষ্টি, মুখের স্নিগ্ধ হাসি
এ অপরাহ্নে অপরূপ রূপে উঠিল যে উদ্ভাসি'।
সে পাথেয় থাক্ সঞ্চিত হ'য়ে দুর্লভ মণি সম,
স্বাগত স্বাগত হে সুধীবৃন্দ, দীন অঙ্গনে মম। *

* লেখকের 'পল্লীচিত্র' ভবনে (আমতলাহাট) শিশুসাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণের প্রীতিসম্মেলন উপলক্ষে রচিত।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—বারো—

মুখে-চোখে রোমশ পশুর ছোঁয়া লাগার মত এক অস্বস্তিকর অনুভূতির মধ্যে ডিকের জ্ঞান হ'লো। নেকড়ের ভয়ে আতঙ্কিত হ'য়ে সে ঐ অবস্থাতেও লাফিয়ে উঠলো। নেকড়ের

বদলে যখন সে দেখলো ক্রুসো,—তার অতি আদরের ক্রুসো নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তখন ডিকের আনন্দ দেখে কে?

ক্রুসো কি ভাবে রেড ইণ্ডিয়ানদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এলো, নিশ্চয়ই তোমরা তা' জানবার জন্য উৎসুক হ'য়ে আছো। ক্রুসোকে ল্যাসোয় আট্‌কে ওরা কয়েকজন মিলে ওর চার পা আর মুখ খুব শক্ত করে বাঁধলো। এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় ক্রুসো এর আগে কখনো পড়ে নি। না পারে বাধা দিতে, না পারে ঘেউ ঘেউ করে ডিককে তার দুরবস্থার কথা জানিয়ে দিতে। যা-ই হোক, ওরা তো ক্রুসোকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চললো। তাঁবুতে গিয়ে এক বুড়ীর জিম্মায় ক্রুসোকে রেখে ওরা আমোদ-আহ্লাদ ক'রতে লাগলো।

মুক্তির কিছুমাত্র আশা না দেখতে পেয়ে ক্রুসো হতাশ হয়ে চুপ ক'রে পড়ে রইল। ক্রমে রাত হ'লো, অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। যে বুড়ীর তত্ত্বাবধানে ক্রুসোকে রাখা হয়েছিল, কতকগুলো মাংসের হাড় নিয়ে এসে সে ক্রুসোর মুখের বাঁধন খুলে দিলো। মুক্তি পাবার এই একমাত্র সুযোগের ক্রুসো সদ্ব্যবহার ক'রতে ভুললো না। মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া সত্ত্বেও সে চোখ-মুখ বুজে নির্জ্জীবের মতো পড়ে রইলো। কুকুরটা অজ্ঞান হ'য়ে গেছে মনে ক'রে বুড়ী মাংসের হাড়গুলো সেখানে ফেলে তার মুখের বাঁধন খোলা রেখেই চলে গেল। চোখ পিটপিট ক'রে ক্রুসো বুড়ীর কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করছিল; বুড়ী দূরে চলে যেতেই সে প্রাণপণে তার পায়ের বাঁধন কাটতে চেষ্টা করলো। প্রায় দশ মিনিট কামড়াবার পর সে বন্ধনমুক্ত হ'লো। একবার গা ঝাড়া দিয়ে বার দুই ডন দিয়ে হাড় ক'খানা কোনরকমে উদরস্থ করেই ক্রুসো ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো। যেখানে ধরা পড়েছিলো সেখানে এসে আস্তে আস্তে নদী পার হ'য়ে ডিকের গন্ধ লক্ষ্য করে পথ চিনতে তার বেশী কষ্ট হয় নি।

এদিকে তৃষ্ণায় ডিকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো। ধীরে ধীরে মাথা তুলে চারিদিকে তাকাতে লাগলো সে। তখন ভোর হয়েছে; প্রথম সূর্য্যের আলোয় ডিক দেখলো, মাত্র একশো গজ দূরে একটা ছোট নদীর মত রয়েছে। সারা দেহে অসহ্য বেদনা। ক্লান্ত দেহটাকে কোন রকমে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে ডিক আঁজলা ভরে জল নিয়ে মুখে দিলো।

উঃ, কী অসম্ভব লোনা জল! ডিকের তখনকার অবস্থা কথায় প্রকাশ করা যায় না। জল থেকে কয়েক গজ দূরে পরিশ্রান্ত দেহটাকে কোন রকমে টেনে এনে ডিক বালি তুলে গর্ত্ত খুঁড়তে লাগলো। মাত্র দু' মিনিট সে বালি তুলেছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার ক্লান্ত দেহ সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়লো। ক্রুসোকে তার খোঁড়া গর্ত্তটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে ডিক ক্ষীণস্বরে বললো, "খুঁড়ে বের কর্, ক্রুসো!"

"খুঁড়ে বের করা" ক্রুসোর কাছে নতুন হুকুম নয়। কতবার যে সে ডিকের হুকুমে গর্ত্ত থেকে খরগোস খুঁড়ে বের করেছে তার ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে মহা উৎসাহে খুঁড়তে লাগলো,—প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করতে লাগলো, এই বুঝি খরগোস বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু খরগোস বেরোল না, বেরোল জল। সেই জল মুখে দিয়ে ডিক দেখলো, লবণাক্ত হলেও কোন রকমে পান করা চলে। অঞ্জলি ভরে সেই জল পান করে ডিক যেন শরীরে একটু বল পেলো। এতক্ষণে তার ঘোড়ার কথা মনে পড়লো। তাড়াতাড়ি সে যেখানে ঘোড়া

থেকে পড়ে গিয়েছিলো সেই জায়গায় গিয়ে দেখলো, ঘোড়াটা মরে শক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রভুভক্ত ঘোড়া নিজের জীবন দিয়ে প্রভুর প্রাণ রক্ষা করলো। অবিরল অশ্রুধারা ডিকের দু' গাল বেয়ে নেমে এলো।

—তেরো—

ডিক আর ক্রুসো এখানেই কাটিয়ে দিলো কয়েকটা দিন। দিনে শিকার, আর রাতে নিদ্রা, এ ভাবে কয়েকটা দিন যাবার পর ডিক তার হারানো শক্তি ফিরে পেলো। এবার সে বন্ধুদের সন্ধানে যাবে। কিন্তু ঘোড়া না হ'লে কি করে তা সম্ভব?

প্রান্তরের বুকে চলতে চলতে ডিক মাস্তাং ঘোড়াদের দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গী অনেকবার দেখেছে। মাস্তাং ঘোড়ারা একসঙ্গে দল বেঁধে চলে, পায়ে তাদের বিদ্যুতের গতি। একটা মাস্তাং ঘোড়া যদি সে কোনো রকমে বশে আনতে পারে! মাস্তাংদের মাথায় একটা দুর্ব্বল জায়গা আছে, সেখানে গুলি লাগলে ওরা তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে, অথচ আঘাতটা গুরুতর কিছু হয় না। মাস্তাং ঘোড়া বশ করতে হ'লে সব থেকে সহজ উপায় হ'লো তাকে এ ভাবে কাবু করা।

একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগও মিলে গেলো। এক সবুজ ঘাসে ছাওয়া সমতলভূমির উপরে একদল মাস্তাংকে চরতে দেখে ডিক তখনি তার মন স্থির ক'রে ফেললো। একটা খুব শক্ত গোছের গাছের ছাল দিয়ে বেশ লম্বা দড়ি তৈরী ক'রে নিলো সে। দড়িটার একদিকে একটা ফাঁস মত ক'রে সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো। আরো দুয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে ডিক খুব সন্তর্পণে মাস্তাংদের চারণভূমির দিকে এগিয়ে গেলো।

অনেকটা কাছে আসবার পর ডিক শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে কিছু দূর পর্য্যন্ত গেলো। মাস্তাংরা এখনো তার অস্তিত্ব টের পায় নি। ক্রুসোকে সেখানে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে নির্দ্দেশ দিয়ে ডিক আরো একটু এগিয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে ডিক তার ঘোড়া বেছে নিয়েছে। হ্যাঁ, ঘোড়া বটে! দলের সেরা ঘোড়া ওটা। সন্তর্পণে লক্ষ্য স্থির ক'রে ডিক রাইফেল ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে মহাচীৎকার তুলে সমস্ত দলটা পাগলের মত প্রাণভয়ে ছুটে পালালো। প্রান্তর যুড়ে একটা ঝড় বয়ে গেলো যেন! তার লক্ষ্যের ঘোড়াটা কিন্তু গুলি লাগামাত্র পড়ে গিয়েছিল; মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে ডিক আর ক্রুসো তার কাছে ছুটে গেলো। ডিক তার সামনের পা দু'টোর মধ্যে একটা ছোট দড়ি বেঁধে দিলো, যাতে সে বড় বড় পা ফেলে ছুটতে না পারে। তারপর পেছনের পা দু'টোও সেইভাবে বেঁধে ফেলে ছোট দড়িটা তার চোয়ালে বেঁধে ফেললো। এইবার বড় দড়ির ফাঁসটা গলায় পরাতে আর কি! সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে দু'মিনিটও সময় লেগেছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু ইতিমধ্যেই ঘোড়াটার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

তারপর শুরু হ'লো এক তাণ্ডব দৃশ্য। বুনো ঘোড়াকে কি ভাবে ধরতে হয় ডিকের তা' জানা ছিলো। টানাটানির ফলে ফাঁসের দড়িটা ঘোড়ার গলায় সজোরে ব'সে যেতে সে নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে এবং তখন তাকে আয়ত্তে আনবার জন্য অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রতে হয়। কিন্তু এ ঘোড়ার গলায় যেন ফাঁসটা একটুও চেপে বসছে না,—হয় ওর গলার মাংসপেশীগুলো খুব

অসাধারণ শক্ত কিংবা ফাঁস লাগানোর ব্যাপারে কোথাও কোনো গলদ হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো। কত বার যে ঘোড়াটা ডিককে শুদ্ধ টেনে হিঁচড়ে সারা প্রান্তরময় লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো তার ঠিক নেই। তার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে, অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বালা ক'রছে হাত দু'টো, দম ফুরিয়ে এসেছে; কিন্তু তবুও ডিক দড়ি দু'টো প্রাণপণে ধ'রে রাখলো।

(ক্রমশঃ)

নানা প্রসঙ্গ

সমুদ্রে যারা পাহারা দেয়

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

সেদিন কাগজে একটা জাহাজ ডুবির খবর পড়লাম। অন্ধকার রাত, হঠাৎ সমুদ্রে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে জাহাজ আর দিক্ ঠিক রাখতে পারল না এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পড়ল গিয়ে একটা ডুবো-পাহাড়ের ওপর। ফলে যা হবার তা-ই হ'ল। জাহাজ চুরমার হয়ে আরোহী সহ তলিয়ে গেল সমুদ্রের অতল তলে।

সমুদ্রে চলতে গেলে এই ধরণের বিপদ্ অনেক সময়েই হ'তে পারে। বিশেষতঃ তীরের কাছাকাছি বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশী। কোথাও হয়তো তীর ঘেঁষে রয়েছে রুক্ষ পাহাড়ের দেয়াল; অন্ধকারে আচমকা তার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে আর কথাটি নেই। কোথাও বা জলের নীচেই রয়েছে চোরাবালির আস্তরণ, জাহাজ কোন রকমে তার ওপর গিয়ে পড়লে এমন ভাবে আটকে যাবে যে তাকে টেনে তোলাই হবে দায়। এখানে-সেখানে ছড়ানো ডুবো বা চোরা-পাহাড়ের কথা তো আগেই বলেছি।

এই কারণে প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সমুদ্রে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করে আসছে। সমুদ্রের ধারে রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে, বালির ওপর, এমন কি সমুদ্রের মাঝখানে ডুবো-পাহাড়ের ওপর বড় বড় আলোকস্তম্ভ—যাকে ইংরেজিতে বলে 'লাইট হাউস'—তৈরী ক'রে সমুদ্রগামী

জাহাজকে পথ দেখিয়ে সতর্ক ক'রে দেবার ব্যবস্থা করেছে। পৃথিবীর নানা জায়গায় এই রকম আলোকস্তম্ভ আছে, এবং তার কোন কোনটা বহুদিনের পুরোনো।

অবশ্য আরও আগে, যীশুখৃষ্টের জন্মাবারও আগে থেকে এই রকম আলোকস্তম্ভ তৈরীর রেওয়াজ ছিল। প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে ফেরোস্ দ্বীপের আলোকস্তম্ভের গল্প তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। বিখ্যাত আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরের কাছাকাছি ছিল এই দ্বীপ। খৃষ্টজন্মের প্রায় ২৫০ বছর আগে এটি তৈরী হয়। আলোকস্তম্ভটি নাকি ছিল ৪৫০ ফুট উঁচু আর বারোতলা। মজবুত পাথরে তৈরী এই স্তম্ভের ওপর যে আলো জ্বলত তা নাকি ১০০ মাইল দূর থেকেও চোখে পড়ত। এ ছাড়া রোডস্-এর বিখ্যাত পিতলের মূর্ত্তির ছবিও তোমাদের কাছে বোধ হয় অপরিচিত নয়। এটিও আলোকস্তম্ভ হিসাবেই তৈরী করা হয়েছিল। মূর্ত্তির হাতে জ্বলত আলো। দুঃখের বিষয়, খুব প্রাচীন আমলের কোন আলোকস্তম্ভই এখন আর টিকে নেই।

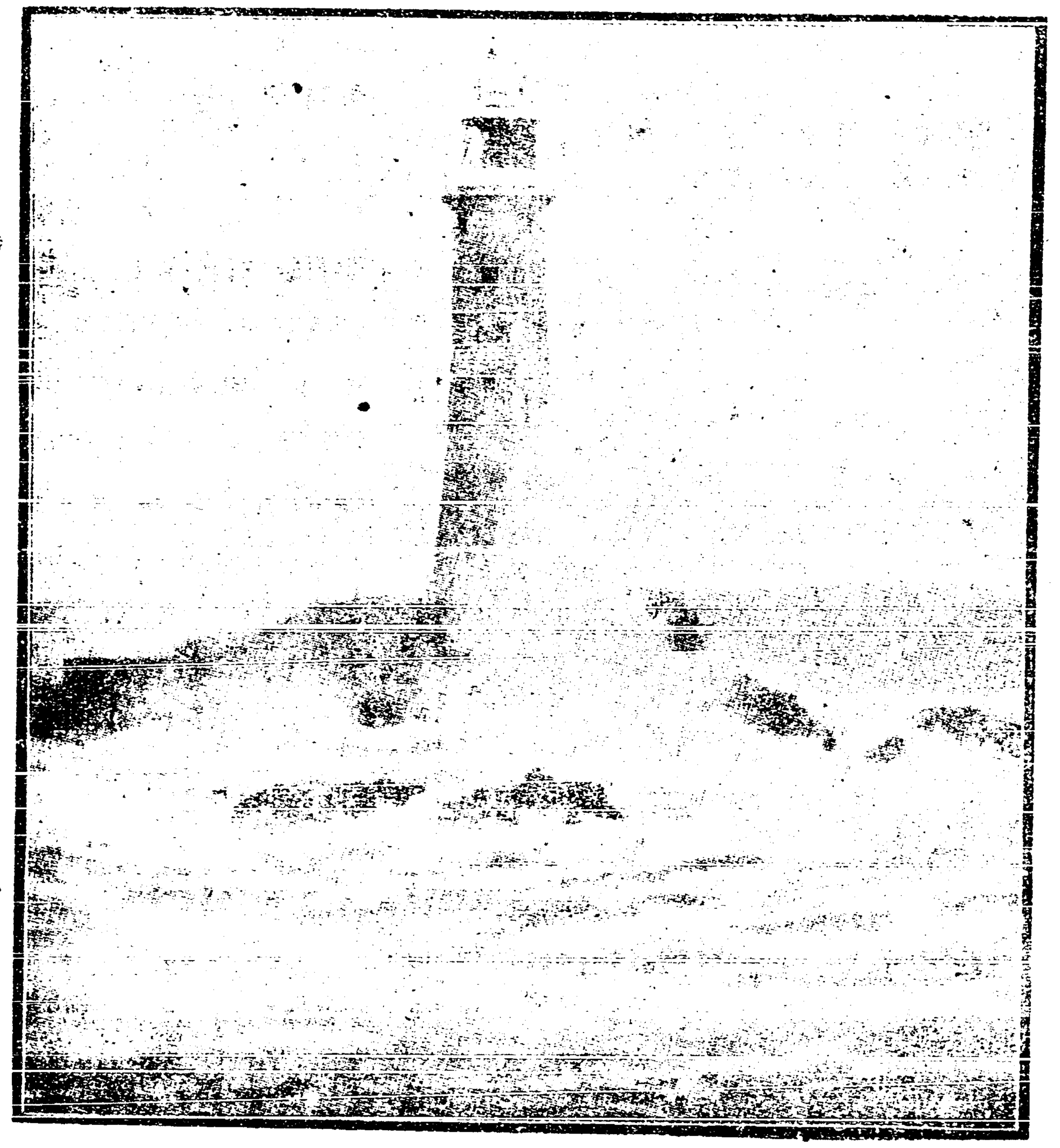

সমুদ্রের বুকে আলোকস্তম্ভ

আলোকস্তম্ভগুলি দেখতে বেশীর ভাগই অনেকটা উঁচু মিনার বা টাওয়ারের মত। তার ভিতরে লোক বাস করার মত ঘরদোরের ব্যবস্থা থাকে আর মাথার ওপর থাকে খুব বড় একটা আলো জ্বালবার বন্দোবস্ত,—যাতে ক'রে বহুদূর থেকে সে আলো চোখে পড়ে। অবশ্যি এমন অনেক আলোকস্তম্ভও আছে যেগুলো চেহারায় কোনটা বা বাড়ীর মত, কোনটা বা দুর্গের মত। তবে আলো জ্বালাবার জন্য উঁচু স্তম্ভ বা থাম তার সবের সঙ্গেই থাকে।

এই সব আলোকস্তম্ভ তৈরী করা কিন্তু নেহাৎ সহজ ব্যাপার নয়। অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল কাজ এটি, এমন কি প্রাণ হাতে নিয়ে তবেই এ কাজে নামতে হয়। আজ পর্য্যন্ত আলোকস্তম্ভ তৈরী করতে গিয়ে কত লোক যে প্রাণ হারিয়েছে তার ঠিক নেই। সাহসী এবং বীর

হিসাবে তাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। শুধু যে তৈরী করতে গিয়েই লোকে প্রাণ হারিয়েছে তা নয়, আলোকস্তম্ভ তৈরী হবার পরই ক্রুদ্ধ সমুদ্র তাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রাস করে ফেলেছে লোকজন সমেত, এমন ঘটনাও বহুবার ঘটেছে।

তবে তৈরী করার সময়কার বিপদ্ ই খুব বেশী। ডাঙ্গায় পাহাড়ের ওপর বা সমুদ্রের কিনারায় বালির ওপর যে আলোকস্তম্ভ তৈরী করা হয়, খুব মেহনতের হ'লেও সেগুলির বিপদের কথা আমি বলছি না; আমি বলছি সেই সব আলোকস্তম্ভের কথা যেগুলি মাঝ-সমুদ্রে ডুবো-পাহাড় বা একটুখানি-মাথা-উঁচু-করা পাহাড়ের চূড়োর ওপর তৈরী করতে হয়। অনেক সময় এমন দেখা গেছে যে কাজ করা দূরে থাক, যেখানে আলোকস্তম্ভ হবে তার ধারে-কাছে ঘেঁষাই এক সমস্যার ব্যাপার। একমাত্র ভাঁটার সময়ে, যখন সমুদ্রের জল একটু কমে যায়, শুধু তখনই হয়তো তার কাছে এগুনো সম্ভব। একবার এই রকম একটি আলোক-স্তম্ভ তৈরী করতে গিয়ে লোকেরা পূরো এক

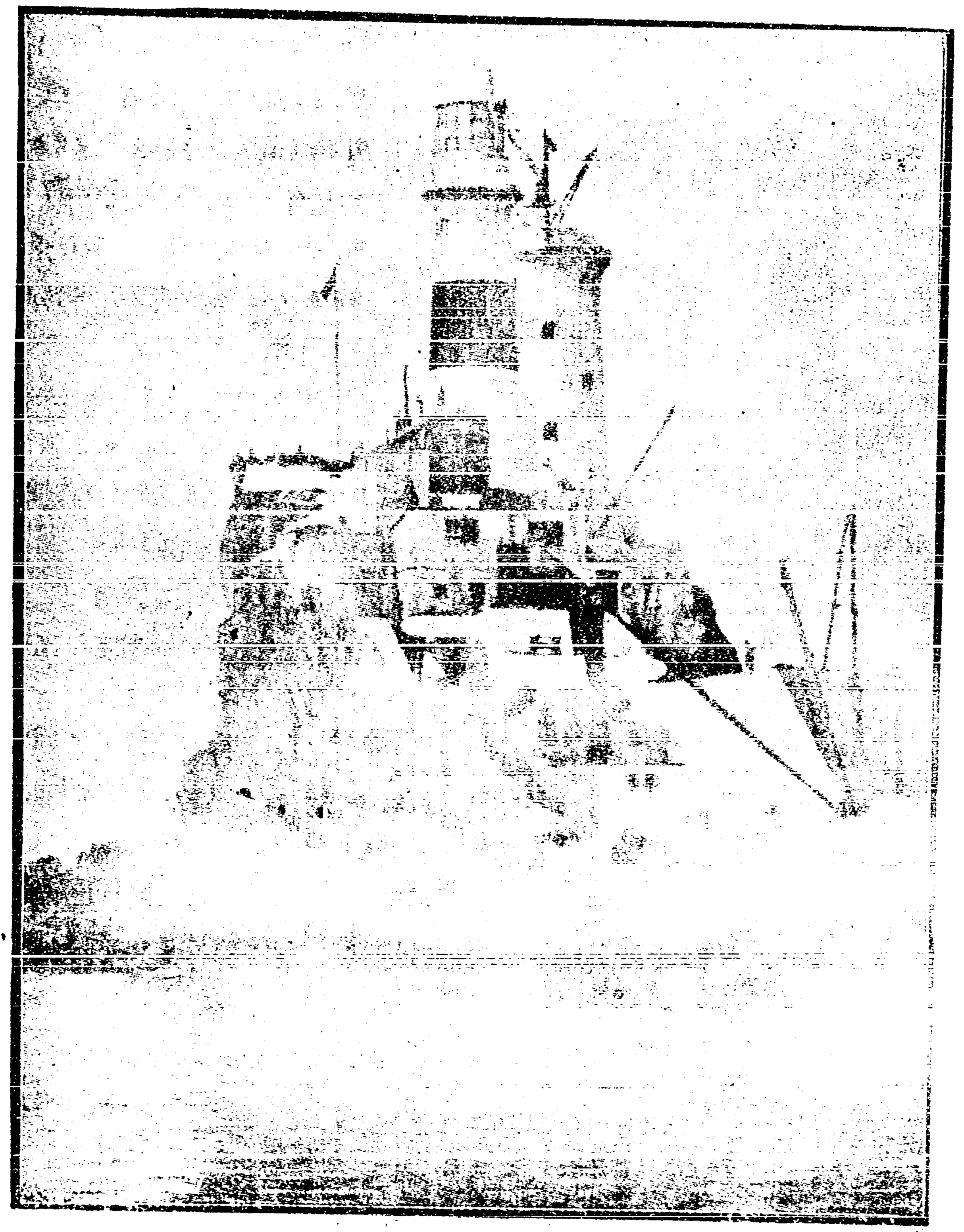

আয়ার্ল্যাণ্ডের সমুদ্রোপকূলের একটি আলোকস্তম্ভ

বছরে মাত্র ত্রিশ ঘণ্টা কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই এই রকম একটা আলোকস্তম্ভ শেষ করতে যে বছরের পর বছর কেটে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি।

আর একবার একটা আলোকস্তম্ভ তৈরী করতে গিয়ে কারিগরেরা কি রকম ফ্যাসাদে

পড়েছিল শুনলে বিশ্বাস করতে চাইবে না। যে পাহাড়টার গায়ে আলোকস্তম্ভ বসাতে হবে সেখানে জায়গা এত কম ছিল যে একসঙ্গে দু'টির বেশী লোক দাঁড়িয়ে কাজ করবার উপায় ছিল না। তার ওপর পাহাড়টার ওপর সামুদ্রিক শেওলা জমে জমে সেটা এমন পিছল হয়ে ছিল যে সেটা চেঁছে তার গায়ে খুঁটি বসাবার গর্ত্ত তৈরী করতেই দিনের পর দিন কেটে গেল। সে কি সহজ ব্যাপার? এই হয়তো একটু কাজ সুরু করেছে অমনি প্রচণ্ড বেগে ক্রুদ্ধ সমুদ্রের ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। কাজ করবে কি, তখন প্রাণ নিয়ে টিকে থাকাই দায়। কোন রকমে উপুড় হয়ে শুয়ে প'ড়ে, প্রাণপণে সামুদ্রিক আগাছাগুলিকে জাপটে ধরে পড়ে থাকতে হ'ত যতক্ষণ না ঢেউটা চলে যায়। খানিকটা পর পরই এই রকম ভাবে চলতে লাগল।

শুধু কাজ করাই নয়, মালমশল্লা নিয়ে যাওয়াও কম লেঠা নয়। কোন কোন জায়গায় সমুদ্র এত উত্তাল যে কোন নৌকো নিয়ে তার ওপর দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইংলণ্ডের কাছাকাছি এক জায়গায় খুব খাড়া পাহাড়ের ওপর একটা আলোকস্তম্ভ ছিল। কিন্তু সেটা এত উঁচুতে ছিল যে নাবিকেরা প্রায়ই তার আলো দেখতে পেত না—কুয়াসার দিনে তো নয়ই। তাই ঠিক হ'ল পাহাড়ের নীচে জলের মাঝখানে একটা আলোকস্তম্ভ তৈরী করতে হবে। জলের নীচে খড়িমাটীর আস্তরণ। প্রথমে ভাঁটার সময় তার ওপর একটা গর্ত্ত করে নিয়ে আশপাশে দেয়াল তুলে জায়গাটা ঘিরে নেওয়া হ'ল, যাতে বাইরের জল তার ভিতরে না ঢুকতে পারে। সেইখানে, সেই দেয়াল-ঘেরা গর্ত্তে বসে, তৈরী হ'ল আলোকস্তম্ভের ভিত। তার পর তার পাশে জলের ওপর লোহার মাচা বসিয়ে তার ওপর সাজসরঞ্জাম হাজির করা হ'ল। নৌকো ক'রে নয়—সমস্ত সরঞ্জাম আনা হ'ল তারে ঝুলিয়ে। পাহাড়ের ওপর থেকে লম্বা তারের দড়ি ঝুলিয়ে সেই দড়ি লোহার মাচায় আটকে একটা 'রোপ্ ওয়ে' তৈরী করা হ'ল। মাল-মশল্লা, মানুষ-জন সবাই মাঝ-সমুদ্রের মাথার ওপর আকাশে ঝুলতে ঝুলতে প্রত্যহ সেই তারের দড়ি বেয়ে হাজির হ'ত কর্ম্মস্থানে। এই ভাবে বহু মেহনতের পর তৈরী হ'ল জলের মাঝখানে সেই বাতিঘর। আজও সেই বাতিঘর ইংলণ্ডের উপকূলে জলের ভিতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সতর্ক প্রহরীর মত আগন্তুক জাহাজদের সাবধান করে দিচ্ছে।

আজকালকার দিনেও আলোকস্তম্ভ বা বাতিঘরের প্রয়োজনীয়তা কিছু মাত্র কমে নি। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরা যেতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে সেখানকার সামুদ্রিক উপকূল একত্র ধরলে কম করে চল্লিশ হাজার মাইল জায়গা দখল করবে। এই বিরাট উপকূল ভাগের নানা জায়গায় নানা রকম বাধাবিঘ্ন রয়েছে, অথচ প্রত্যহ বহু জাহাজকে নানা কাজে এখানে আনাগোনা করতে হয়। অন্ধকার রাত্রে বা ঘন কুয়াসার মধ্যে এদেরকে রক্ষা করা বা ঠিক পথে চালিত করা বেশ কঠিন ব্যাপার। এজন্য নানা জায়গায় আলোকস্তম্ভ বা বাতিঘর বসানো আছে। এর কোন কোনটা অনেক দিনের পুরোনো।

আলোকস্তম্ভ বা বাতিঘর আমাদের দেশেও অনেক আছে, জানি না তোমাদের চোখে পড়েছে কিনা।

এই সব আলোকস্তম্ভের চূড়ায় যে আলো জ্বালানো হয় আগে তার জন্য তিমির চর্ব্বি

ব্যবহার করা হ'ত। তার পর সুরু হ'ল কেরোসিন। আজকাল অবশ্যি বৈদ্যুতিক আলোর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য আলোর কথা আর ওঠে না। কোন কোন আলোকস্তম্ভে এত তীব্র আলো ব্যবহার করা হয় যা শুনলে বিশ্বাস করতে চাইবে না। নাভেসিঙ্ক বাতিঘরে যে আলোটি জ্বলে সেটির ঔজ্জ্বল্য ৯০ লক্ষ মোমবাতির সমান।

শুধু আলোই নয়, ঘন কুয়াসার মধ্যে যখন আলো দেখা যায় না তখন নানা রকম সাঙ্কেতিক শব্দ ক'রে জাহাজকে সতর্ক করবারও ব্যবস্থা রয়েছে অনেক জায়গায়। এজন্য আধুনিক যন্ত্রপাতিও বসানো হয়েছে। তোমরা হয়তো জান আলোর গতি হচ্ছে সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, আর সাধারণ শব্দের এক মাইল যেতেই ৫ সেকেণ্ড লেগে যায়। কাজেই কোন জায়গা থেকে এক সঙ্গে আলো আর শব্দ এলে তা দেখবার আর শুনবার মাঝখানকার সময়টা হিসেব করে জায়গাটার দূরত্ব বার করা যায়। সম্প্রতি আবার অনেক আলোকস্তম্ভে বেতার-যন্ত্র বসানো হয়েছে। এই বেতারের সাহায্যে খুব চট্ করে এবং নির্ভুল ভাবে বন্দরের কাছাকাছি জাহাজদের সঙ্কেত জানিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়,—পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়। মাঝ সমুদ্রের জাহাজের সঙ্গেও সংবাদ আদান-প্রদান করা চলে।

যেখানে বাতিঘর বসানো অসুবিধা সেখানে অনেক সময় বাতি-জাহাজ (লাইট শিপ) বসানোরও রেওয়াজ আছে। এগুলো চলাফেরা করে না, জলে স্থির হয়ে থাকে এবং এর মাস্তুলের ওপর আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা থাকে। অবশ্যি দরকার হ'লে এ জাহাজ এদিক্ ওদিক্ চালিয়ে নিতেও কোন বাধা নেই।

এ ছাড়া আছে জলে ভাসমান বয়া। এগুলোকে আলোকস্তম্ভের ক্ষুদে সংস্করণ বলতে পার। কলকাতার গঙ্গায়ও এ রকম অনেক বয়া তোমরা দেখে থাকবে। রাত্রে এর কোন কোনটার ওপর আলো জ্বলে, বাঁশীর মত আওয়াজও বেরোয়। বয়ার একটা মস্ত সুবিধে, জলের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গা বোঝাবার পক্ষে এগুলি চমৎকার। বন্দরে ভাসমান বয়ার সঙ্কেত লক্ষ্য করে নাবিকেরা খুব সহজেই তাদের নিরাপদ রাস্তা খুঁজে নিতে পারে। আগেকার দিনে এই সব বয়া কাঠ দিয়ে তৈরী করা হ'ত, আজকাল নানান্ ধাতু—বিশেষতঃ ইস্পাতে তৈরী বয়ার রেওয়াজ-ই বেশী। তা ছাড়া অনেক বয়ার মধ্যে যান্ত্রিক কারিকুরিও থাকে প্রচুর।

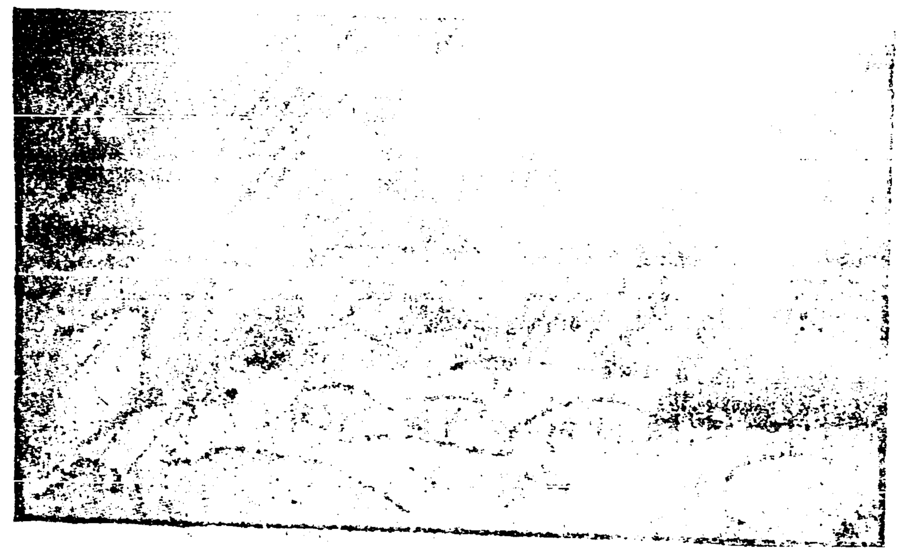

ডায়রি

শ্রীলীলা মজুমদার এম্. এ

মিথ্যা কথা বলা যে এমন কিছু অন্যায় এ আমি বিশ্বাস করি না, এমন কি মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলার দরকার হয়। আমি ত' প্রায়ই মিথ্যা কথা বলি। আরও কত কি করি! বড়দের পিছন থেকে ভ্যাংচাই, কলা দেখাই, বক দেখাই। মাষ্টারমশাইদের কথা শুনি না, মুখোমুখি জবাব দিই, পড়া ভালো ক'রে তৈরী করি না। এর জন্য যদি কেউ আমার নিন্দা করে ত' আমি থোড়াই কেয়ার করি।

ভালো ছেলেদের ত' আমি ভীতু মনে করি, খোসামুদে মনে করি। পাছে বকুনি খায় তাই তা'রা ভয়েই আধ-মরা, বড়দের কোনও রকমে খুসি করতে পারলে আহ্লাদে আটখানা। এ রাম, ছিঃ! আমাকে দেখ। দিব্যি আছি, খাই দাই, ঘুরে বেড়াই, যা খুসি তাই বলি, যা ইচ্ছে করি, কে আমার কি করতে পারে? বড়দের কথা আমার ঢের ঢের জানা আছে। তারা নিজেরা যথেষ্ট দোষ করে; আবার আমাদের বল্‌তে আসে! ওসব চালাকি আমার কাছে চল্‌বে না।

বেশ আছি খাসা আছি দিদিমার কাছে থাকি, দিদিমা আমাকে সোনামণি বলে ডাকেন, ভাবেন আমার মত চাঁদের টুক্‌রো আর হয় না; কেউ কিছু বল্‌লেও বিশ্বাস করেন না। এর থেকেই ত' বড়দের বুদ্ধির দৌড় বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক্, বেশ ছিলাম, এমন সময় সেই বাঁদরের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম। চোখ বুজলেই বাঁদর। হাড় জ্বালাতন হয়ে গেলাম। ঘুমোতে যেতে ইচ্ছা করত না। হয় বাঁদরটা ফল চুরি ক'রে খাচ্ছে, নয় ত' কাগজপত্র ছিঁড়ে একাকার করছে, নয় কাউকে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে খিমচোচ্ছে, নয় ভেংচি কাটছে, দাঁত খিঁচোচ্ছে। মোট কথা, এমন পাজী বাঁদর আমি জন্মে দেখি নি। অথচ রোজ রাত্রে চোখ বুঁজেছি কি বাঁদর এসে হাজির! কাউকে বলতেও বাধ বাধ ঠেক্‌তে লাগল। মা-বাবাকে চিঠি লিখে কি আর এ সব বলা যায়? দিদিমা ত' শুন্‌লে অবাক্ হয়ে যাবেন, হয় ত' ফলে আমাকে জোলাপ খেতে হবে।

তারপর বাঁদরটা ভীষণ বাড়াবাড়ি সুরু ক'রে দিল। জাগা অবস্থাতেও এসে হাজির হ'ত। স্কুল থেকে ফিরছি, বইগুলো শূন্যে ছুঁড়ছি আবার ধরছি, মাঝে মাঝে পারছি না, পড়ে যাচ্ছে, মলাট খুলে যাচ্ছে। চীনাবাদাম কিন্‌লাম, পান

কিনলাম, পা দিয়ে খুব খানিকটা ধুলো উড়োলাম। ও পাড়ার গোবিন্দ বাবু সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, ভারী বিরক্ত হ'লেন। আমিও তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য কানের কাছে এইসা সিটি দিলাম যে ভদ্রলোকের পিলে চমকে উঠ্ল।

হঠাৎ দেখি আমবাগানের তলায় বাঁদরটা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, নিজের পিঠ চাপ্ড়াচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে, নিজের ল্যাজ ধরে নিজেই নাচ্ছে কুঁদছে। ভাবখানা যেন ওর সঙ্গে আমার একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গোবিন্দ বাবুও তাই দেখে হেসে বল্লেন, "বাঃ বাঃ, তোর মাস্তুত ভাইও এসে হাজির হয়েছে যে!" মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে তাঁকে কিছুই বল্লাম না, ভাব্তে পার?

বাড়ি এসে দেখি আমার মাসিমা এসেছেন, তাঁর ননীর পুতুল মেয়ে ময়নাকে নিয়ে। মেয়েটি নরম, কচি, হাঁদার একশেষ। প্রথমটা একটু মাকড়সা-টাকড়সা দিয়ে ভয় দেখিয়েছিলাম তা' সে আবার দাদা দাদা করে আমাকেই জাপ্টে ধরল। কী আর করি, শেষটা মাকড়সাটাকে তাড়িয়ে দিতে হ'ল। মেরেই ফেল্তাম, কিন্তু ময়নাটা মাকড়সা মরে যাবে শুনে কেঁদেই সাড়া, অগত্যা জলের ছিটে দিয়ে তাড়ালাম। মাসিমাটি আমার আবার বেশ আছেন। ঘরে এসেই দেয়ালে জল ঢালার জন্য চেঁচামেচি লাগিয়েছেন! ময়না তখন বল্ল, "না মা, দাদাকে ব'ক না, ও মাকড়সা তাড়িয়েছে।" রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম বাঁদরটা একজন মোটা পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে কুস্তী লড়ছে, পারছে না, আমাকে ডাকছে। আঁৎকে জেগে গেলাম।

পরদিন ছুটি ছিল, ময়নাকে কয়েকটা আম-টাম পেড়ে দিয়েছিলাম, অবিশ্যি হেডমাষ্টার মশাইএর বাগান থেকে চুরি ক'রে। রাত্রে চোখ বুঁজ্তে না বুঁজতে বাঁদর আর পাদ্রী দু'জনে এসে উপস্থিত। দেখ্লাম পাশাপাশি হাঁটছে, এ ওর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে।

আমার শরীর খারাপ হ'য়ে যেতে লাগ্ল, যখন তখন বাঁদর দেখ্তে লাগলাম, যেখানে সেখানে পাদ্রী সাহেব মনে হ'তে লাগ্ল। স্কুলে আমার দস্তুর মত নাম খারাপ হয়ে গেল। এক সপ্তাহ কোনও ক্লাশে কোনও গোলমাল করলাম না, অবিশ্যি পড়াশুনোও করলাম না। বাঁদরটারও যেন কেমন মন খারাপ মনে হ'তে লাগ্ল। একদিন বাড়ি ফেরবার পথে দেখলাম আমগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে হাঁড়িপানা মুখটি ক'রে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে দেখ্লাম একজন পাদ্রী সাহেব হাসি হাসি মুখ ক'রে যাচ্ছেন। কি যেন

মনে হ'ল, একটা ঢিল তুলে পাদ্রী সাহেবের দিকে ছুঁড়ে মারলাম। অমনি বাঁদরটা ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্ল।

সেদিন অনেকগুলো অন্যায় ক'রে ফেল্লাম, সবগুলো অবিশ্যি ঠিক আমার দোষ নয়। পেয়ালা ভাঙ্লাম, মিছিমিছি বল্লাম ময়না ভেঙ্গেছে; ময়নার টিকি টেনে বগ্ দেখিয়ে, কাঁদিয়ে-টাঁদিয়ে, কলা দেখিয়ে, বেরিয়ে গেলাম।

পাড়ার কতকগুলো ছেলের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় হৈ-চৈ ক'রে বেড়ালাম; কত লোকের জানালার কাচ ভাঙ্গলাম, কুকুর তাড়া করলাম, গোবিন্দ বাবুর টিয়া পাখীটাকে ছেড়ে দিলাম, আরও কত কি যে করলাম তার ঠিক নেই! রাত্রে বাড়ি ফিরলাম দেরী করে, খেতে বসে গোলমাল করলাম—এ খাব না, ও খাব না। দিদিমা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্লেন; মাসিমা বল্লেন, "দু'টো কষে চড় লাগালে ছেলে সিধে হয়ে যাবে।" বল্লাম, "তোমার ছেলেকে চড় লাগিও, খবরদার, আমার কাছে এসো না।" ব'লে উঠে দে দৌড়! সিঁড়িতে মনে হ'ল সারি সারি বাঁদর দাঁড়িয়ে আছে। বাগানে বেরিয়ে গেলাম। গেটের পাশে আমার বন্ধু ন'টে দাঁড়িয়ে। "কেন রে? কী হয়েছে?" "বটু, তুই টিয়াপাখী ছেড়ে দিলি আর গোবিন্দ বাবু হেডমাষ্টার মশাইএর কাছে নালিশ করেছেন যে আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাবা শুনলে ত' আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবেন।" বল্লাম, "চল্, হেডমাষ্টার মশাইএর বাড়ি।"

পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম, "ন'টে, পিছন দিকে তাকিয়ে দেখ্ ত' কেউ ফলো করছে কি না।" ন'টে বল্লে, "না ত'।" "একজন পাদ্রী সাহেব কি একটা বাঁদর নেই বলতে চাস্?" ন'টে বল্লে—"কই, না ত'! তবে ঐ গাছটাতে বাঁদর থাক্তেও পারে। কেন রে?" কিছু বললাম না, হেডমাষ্টার মশাইএর বাড়ি এসে গেলাম। তারপর তাঁকে বল রে, গোবিন্দ বাবুকে ডাক রে, অপমানের একশেষ, জরিমানা ইত্যাদি—সে আর ব'লে কাজ নেই।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাদ্রী সাহেব আর বাঁদর কোলাকুলি করছে। ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলাম বাঁদরটা কোলাকুলি করছে বটে কিন্তু হাত বাড়িয়ে পাদ্রী সাহেবের পিছনে চিম্টি কাটতে চেষ্টা করছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারপরই জ্বরটর হয়ে মা-বাবার কাছে চলে গিয়েছিলাম, আর পাদ্রী সাহেবকে বা বাঁদরটাকে দেখি নি। মাঝে মাঝে খট্কা লাগে।

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ, বি. এল্

গত মাসের রামধনু ছাপা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন একটা দুঃসংবাদ এসে পৌঁছায়—সে খবর তোমরা আগেই পেয়েছ। অধ্যাপক নিবারণচন্দ্রের আকস্মিক পরলোক গমনের খবর। রামধনুর সম্পাদক মশাই তাঁকে 'রামধনুর পরম সুহৃদ্' ব'লে লিখেছেন। বাস্তবিক রামধনুর প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অগাধ। গত ১৬।১৭ বছর ধরে এমন মাস বোধ হয় খুব কমই গেছে যে মাসে তাঁর লেখা কোন-না-কোন বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধে বা গল্পে রামধনুর পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ হয় নি।

প্রায় ৬৯ বছর আগে নদীয়া জেলার বহিরগাছি গ্রামের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশে নিবারণ-চন্দ্রের জন্ম হয়। এঁরা ছিলেন নদীয়ার রাজবংশের কুলগুরু। নিবারণচন্দ্রের মাতামহও বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ছেলে অর্থাৎ নিবারণচন্দ্রের মামা পণ্ডিত ভূদেব কবিরত্ন সাংখ্যতীর্থও সে আমলে বড় পণ্ডিত, লেখক ও বক্তা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

নিবারণচন্দ্রের বাবা জগদীশচন্দ্র জমিদারী ষ্টেটের চাকুরী নিয়ে সুদূর আসামে চলে যান। তখনকার দিনে পথঘাট এত সহজ ছিল না, যাতায়াত খুবই কষ্টকর ছিল; তাই নিবারণচন্দ্র তাঁর মামাবাড়ীতে রয়ে গেলেন। তাঁর মামাবাড়ী ছিল আমুখাল, বর্দ্ধমান জেলার কালনা থেকে চার মাইল। অত্যন্ত বৈষ্ণবপ্রধান জায়গা। আমুখালে তাঁর মামাবাড়ীতে একটি ছোট গ্রন্থাগার ছিল। এইখানে বালক নিবারণচন্দ্র এমন কতকগুলি বই পড়বার সুযোগ পান যা তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করে। এর দু'খানি হচ্ছে দামোদর মুখোপাধ্যায় ও রামগতি ন্যায়রত্নের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস, আর একটি হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। বড় হয়ে নিবারণচন্দ্র বলতেন, তাঁর জীবনের স্বদেশহিতৈষণার অনুপ্রেরণা তিনি এই বই ক'খানা থেকেই প্রথম পান। এ ছাড়া মামা ভূদেবের প্রভাবও বড় কম ছিল না।

একটু বড় হয়ে নিবারণচন্দ্র কলকাতায় চলে এলেন এবং খেলতচন্দ্র ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হলেন। এইখানেই তাঁর জীবনের একটা বড় অধ্যায় সুরু হ'ল। ঐ স্কুলটা ছিল বাঙ্গালী আর ফিরিঙ্গীপাড়ার মাঝামাঝি। ফিরিঙ্গী ছেলেরা এসে সামান্য কারণে বাঙ্গালীদের ওপর অত্যাচার করত। রাজার জাত ভেবে কেউ তাদের বিপক্ষে কিছু বলতে সাহস পেত না। বললেও

সে আমলের পুলিশ এবং আদালত ছিল তাদের পক্ষে। সাহেবে 'নেটিভে' মামলা হ'লে তার ফল কি হবে তা সকলেই আগে থেকে জানত।

বালক নিবারণচন্দ্র যে খুব পালোয়ান ছিলেন তা নয়, বরঞ্চ তার উল্টো বললেই ঠিক হবে। কিন্তু মনে ছিল তাঁর অসম্ভব তেজ আর সাহস। তাঁর কয়েকটি বন্ধু জুটল, তাঁরাও প্রায় তাঁরই মত। মাঝে মাঝে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচার দেখলে তাঁরা উল্টে তাদের ঘা কতক দিতে কসুর করতেন না। অবশ্যি এর ফলে তাঁদেরও মাঝে মাঝে বেশ প্রহার খেয়ে ফিরতে হ'ত। এই থেকেই তাঁরা ব্যায়াম চর্চ্চা, বক্সিং শেখা, লাঠি খেলা ইত্যাদির প্রয়োজন অনুভব করতে লাগলেন।

স্বর্গীয় অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

খেলতচন্দ্র ইনষ্টিটিউশনকে কেন্দ্র ক'রে একটি ছোট সমিতি গড়ে উঠলো,—আত্মোন্নতি সমিতি। নিবারণচন্দ্রই ছিলেন এর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। নামটাও তাঁরই দেওয়া, অবশ্যি ইংরেজি 'সেল্ফ কাল্চার' থেকে তরজমা। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—"মানুষের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণগুলির উৎকর্ষ বিধান করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" আত্মোন্নতি, সমিতির আদর্শও হ'ল তাই। তার পর ক্রমে ক্রমে এই সমিতি কি ভাবে বড় হ'তে হ'তে পরবর্ত্তী কালে গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতিতে পরিণত হয় এবং দেশের বিপ্লবী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের সহানুভূতি অর্জ্জন করে সে কাহিনী নিবারণচন্দ্রই লিখে গেছেন তাঁর "আত্মোন্নতি সমিতির গল্পে"। রামধনুতে তোমরা অনেকেই তা পড়ে থাকবে। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অনেক অজানা তথ্য এতে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে এম্.এ পাশ ক'রে নিবারণচন্দ্র ঐ কলেজে ডিমনষ্ট্রেটরের পদে নিযুক্ত হন। এর আগে অল্প কিছুদিন তিনি শালিমার পেণ্টস্ কোম্পানীতে কেমিষ্টের কাজও করেছিলেন। এর পর ঐ কলেজে শারীর বিজ্ঞান (ফিজিওলজি) বিভাগ খোলা হ'লে তিনি ঐ বিভাগে অধ্যাপক হ'ন এবং ক্রমে প্রধান অধ্যাপকের পদে উন্নীত হ'ন। প্রায় ত্রিশ বছর ঐ কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৩৯ সনে তিনি সরকারী কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আত্মোন্নতি সমিতির সদস্য হিসাবে তিনি পদে পদে লক্ষ্য করেন, বাঙ্গালীর অনেক কিছুই আছে কিন্তু স্বাস্থ্য বা পুষ্টির অভাব বড় বেশী। তাই শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ে তিনি এই

পুষ্টিবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। বৈজ্ঞানিক নিবারণচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণা সুরু ক'রে দিলেন। সাধারণ বাঙ্গালী—মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙ্গালী কি ভাবে তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং স্বল্প আয়ের মধ্যেও পুষ্টিকর খাদ্যের সন্ধান পায়, শরীরকে সুস্থ, নীরোগ এবং কর্ম্মক্ষম রাখতে হ'লে তাদের কি রকম খাদ্যের প্রয়োজন—এই নিয়ে চলল তাঁর গবেষণা। শারীর-বিজ্ঞানীদের কাছে এ যে কত বড় মূল্যবান্ গবেষণা তা হয়তো তোমরা আন্দাজ করতে পার। এই সম্পর্কে লেখা তাঁর 'বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি' গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় একটি অতি মূল্যবান্ দান সন্দেহ নেই। ১৯৩৫ সনে কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিসাবে তিনি এ সম্বন্ধে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তাও বিশেষজ্ঞেরা পরম মূল্যবান্ বলে মনে করেন।

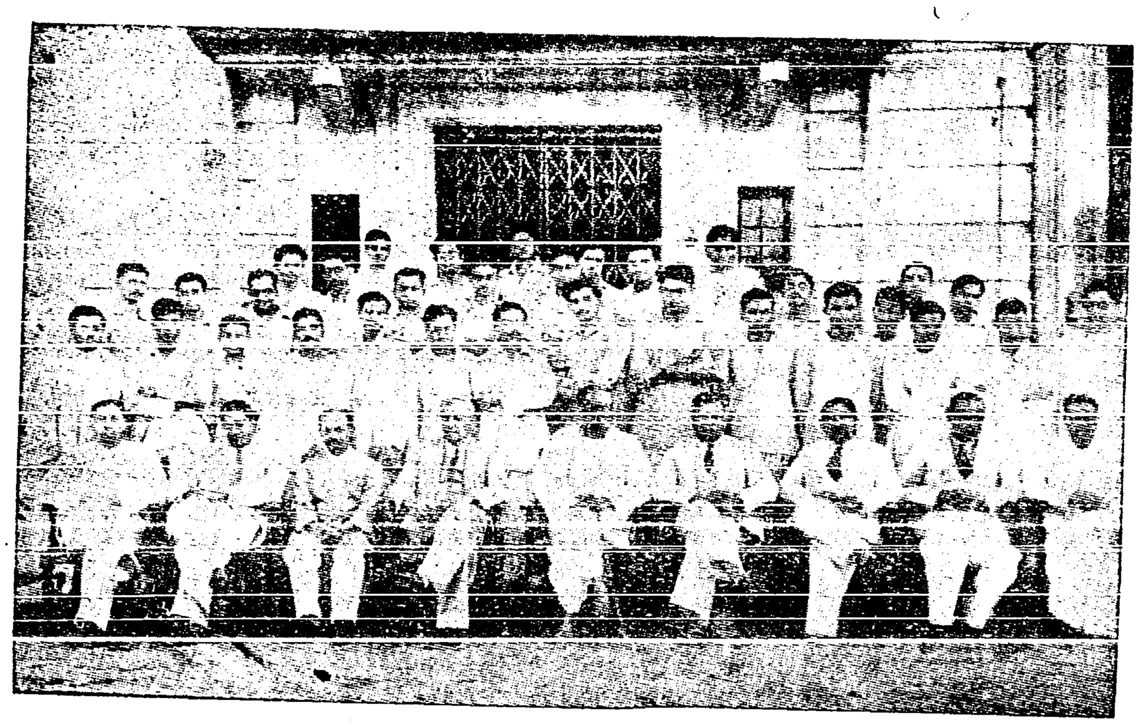

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে বিদায়-অভিনন্দন-সভায় অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র (সম্মুখ সারির ঠিক মাঝখানে)

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নিয়েও নিবারণচন্দ্র মা সরস্বতীর কাছ থেকে ছুটী নিতে পারলেন না, বাকী জীবনটা সাহিত্যসাধনা এবং জ্ঞানার্জ্জনেই কাটাতে লাগলেন। অল্প বয়স থেকেই সুলেখক হিসাবে তাঁর নাম ছিল, সেকালকার নানা সাময়িক পত্রে তাঁর চিন্তাপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হ'ত। এখন পরিণত বয়সে আবার সুরু হ'ল তাঁর সেই সাধনা। এবার বিশেষ ক'রে তিনি কলম ধরলেন ছোটদের জন্য। অবশ্যি সেই সঙ্গে 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি বড়দের পত্রিকাতেও নিয়মিত তাঁর লেখা বেরোতে লাগল। তিনি গল্প তেমন লিখতেন না, কিন্তু তাঁর প্রবন্ধগুলি এমন সরস—এমন নূতনত্বে পূর্ণ থাকত যে ছেলেবুড়ো সকলেই খুব আগ্রহের সঙ্গে তা পড়ত। রামধনুর পাঠকেরা তাদের সম্পাদক মশাইকে বহুবার বহু চিঠি লিখে এ বিষয়ে তাদের অভিমত জানিয়েছে। তাঁর লেখার সরসতা সম্বন্ধে একটা ছোট গল্প শোন :

নিবারণচন্দ্রের সঙ্গে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এক সময়ে আচার্য্য রায় অন্তরঙ্গদের নিয়ে গড়ের মাঠে যে সান্ধ্য সমিতি বসাতেন নিবারণচন্দ্রও তার একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন। আচার্য্য রায় অনেক সময় তাঁর ছাত্র বা শিষ্যদের দিয়ে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে নিতেন, এবং আচার্য্য রায়ের নামেই তা প্রকাশিত হ'ত। আচার্য্য রায়ই এ কথা সবাইকে বলতেন। একবার তাঁর ঐ রকম একটি লেখা বেরোতে চারিদিকে খুব সুখ্যাতি বেরোল। প্রেসিডেন্সী কলেজের তখনকার শারীর বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র

মহলানবীশ লেখাটি পড়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে বললেন, "অমুক কাগজে আপনার অমুক লেখাটি পড়লাম। খুব চমৎকার লাগল।" প্রফুল্লচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, "হুঁ, কেমন পরের লেখা নিজের বলে চালিয়ে নাম করছি। কিন্তু তুমি কেমন লোক হে, নিজের দলের লোকের লেখা পড়ে চিনতে পারলে না? ওটা যে আমাদের নিবারণের লেখা—তোমাদের ফিজিওলজির নিবারণ!"

শুধু লেখা নয়, অধ্যাপক নিবারণচন্দ্রের মত অমন পড়াশোনা করার অভ্যাস খুব কম লোকেরই দেখেছি—বিশেষতঃ 'রিটায়ার' করার পরেও। কোন রকম বই-ই তিনি পড়তে বাকী রাখেন নি। শিশুসাহিত্য থেকে সুরু ক'রে গল্প, উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কবিতা, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সংস্কৃত পুরাণ, বেদ, উপনিষদ্, এমন কি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রও তিনি নিয়মিত পড়তেন। গীতা এবং ভাগবত ছিল তাঁর কাছে আদর্শ গ্রন্থ। জীবনকে তিনি সেই ভাবে চালিত করতে চেষ্টা করতেন। এ ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে তিনি হিন্দীরও চর্চ্চা সুরু করেন। তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল। হাসপাতালে যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তখনও সেটি ছিল তাঁর নিত্য সাথী। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি খুব বড় কবি বলে মনে করতেন। হেমচন্দ্রের কবিতায় স্বদেশপ্রেম তাঁকে খুব মুগ্ধ করত। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' তাঁর একখানি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। আর পছন্দ করতেন তিনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস—বিশেষ করে তার ভাষার জন্য। বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে বার্নার্ড শ'র লেখা তাঁর অসম্ভব রকম প্রিয় ছিল। হুইটম্যানের কবিতা, এমার্সনের প্রবন্ধ, ডি-কুইনসির বিদ্রূপ-রচনা—এগুলোরও তিনি খুব পক্ষপাতী ছিলেন। রামধনুরও প্রত্যেকটি লেখা তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন। তাঁর একটা অভ্যাস ছিল, যখনই কোন বই পড়তেন বিশেষ বিশেষ শব্দের নীচে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে পড়তেন—যেমন ছাত্রেরা পড়ে। তা সে উপন্যাসই হোক আর কবিতার বই-ই হোক, কিংবা কোন গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বই-ই হোক। ঐ সব শব্দ বা তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করতেও ভালবাসতেন তিনি।

মানুষ হিসাবে নিবারণচন্দ্র ছিলেন খাঁটি মানুষ। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, অথচ যুক্তিহীন গোঁড়ামি নেই; প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অথচ নেই কোন অহঙ্কার। যে একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সে-ই তাঁর মধুর ব্যবহারের কথা ভুলতে পারত না। ছাত্রেরা তাঁকে শুধু ভক্তিই করত না, ভালও বাসত পিতার মত—বড় ভাইয়ের মত। তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সেই প্রাচীন যুগের গুরু-শিষ্যদের কথা মনে করিয়ে দিত। বন্ধুবৎসল হিসাবে তাঁর তুলনা ছিল না। বালীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর বাড়ীটি ছিল বিদ্বান্ ও গুণী-জনের একটি মিলন-ক্ষেত্র। তাঁর বাড়ীর সামনে ছিল প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। তারই মাঝখানে খড়ে ছাওয়া একটি সুদৃশ্য আটচালা—বিশ্রাম-গৃহ। প্রতি রবিবার ও ছুটীর দিনে অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি কত লোক এসে সেখানে জড় হতেন। চলত নানা আলোচনা, গল্প, তর্ক, আর সেই সঙ্গে চলত দাবা খেলা। শেষ বয়সে দাবা খেলায় নিবারণচন্দ্রের ছিল ভারী ঝোঁক। আর এতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তোমাদের রামধনুর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, রসায়নের পালিত অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়, সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্র মিত্র, ক্যালকাটা কেমিক্যালের অন্যতম পরিচালক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীচারুচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সময় সময় অল্পবয়সী কেউ কেউ এসেও তাতে যোগ দিতেন। অতিথি-সৎকারে নিবারণচন্দ্র ছিলেন মুক্তহস্ত। কাজেই প্রতি ছুটীর দিনে তাঁর বাড়ীতে যে কত পেয়ালা চা তৈরী হ'ত আর তার অনুপান হিসাবে কত রকম বিচিত্র ভোজ্যদ্রব্যের যে আমদানী হ'ত শুনলে তোমাদের জিভে জল আসবে। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পরও অনেক বন্ধু আসতেন। তখন আর আটচালার নীচে নয়, উন্মুক্ত বাগানে, লোহার বেঞ্চে বসে চলত আলোচনা। কত রকম আলোচনা! সেখানে ভেসে আসত মিষ্টি ফুলের গন্ধ, আর সেই সঙ্গে বালীগঞ্জের মিষ্টি দখিন হাওয়া।

ফুলের সখ—বাগান করার সখ নিবারণচন্দ্রের বহুদিনের। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকায় এ বিষয়ে তাঁর যুড়ি মেলা ভার ছিল। তাঁর বাড়ীর বিরাট কম্পাউণ্ডের সামনের দিকটায় ছিল ফুল-বাগান। কত রকম দেশী, বিদেশী দুষ্প্রাপ্য ফুলের সংগ্রহ সেখানে। ভিতর দিকে ছিল সবজী-বাগান, কিছু ফল-ফলারির গাছ। কলকাতা সহরের বুকে এ যে কত বড় ঐশ্বর্য্য তা বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন। বাগানের এই সব গাছাপালার সঙ্গে নিবারণচন্দ্রের ছিল যেন নাড়ীর যোগ। প্রত্যেক দিন তিনি নিজে এই সব গাছের পরিচর্য্যা করতেন। নিজের হাতে মাটী কোপাতেন, জঙ্গল সাফ করতেন, সার দিতেন, সে সারও অনেক সময় নিজের হাতে তৈরী করতেন। ঘাস-কাটা কল দিয়ে নিজের হাতে বাগানে ঘাস কাটতে দেখেছি তাঁকে। কোন কাজই হেয় নয়, আত্মসম্মানের হানিকর নয়—গান্ধীজীর মত এ সত্য তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন, এবং শুধু মুখের কথায় নয়, কাজে ক'রে তা দেখাতেন। সরকারী উচ্চপদে উচ্চ বেতনে যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত তখনও তাঁকে নিজের হাতে গরুর সেবা করতে দেখেছি।

নিবারণচন্দ্র সম্বন্ধে আর কয়েকটি ছোট গল্প বলে আজ প্রবন্ধ শেষ করব। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক। সমস্ত কলকাতা সহরে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। নিবারণচন্দ্র ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি কলেজের ছাত্র। হঠাৎ দেখলেন, কয়েকজন ফিরিঙ্গী, বোধ হয় মত্ত অবস্থায়, একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে বিনা কারণে অপমান করছে। নিবারণচন্দ্র এ অন্যায় সহ্য করতে পারলেন না। রাজার জাত সুতরাং সাত খুন মাপ এ সত্য জেনেও উদ্ধত ফিরিঙ্গীর কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন। উত্তরে সে তাঁকে মারতে এল। নিবারণও সজোরে তাকে এক ঘুঁষি দিয়ে সায়েস্তা করলেন। অবশ্যি এর পরই ফিরিঙ্গীদের সম্মিলিত আক্রমণ তাঁকে সহ্য করতে হ'ল—এবং যেমন হয়, পুলিশের ভয়ে স্বদেশবাসীরা কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এল না। চোখে কালশিরা নিয়ে নিবারণচন্দ্র বাড়ী ফিরলেন।

পরদিন কলেজে জ্যাকসন সাহেবের ক্লাস। সাহেব তাঁর চোখের কালশিরা দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার?" নিবারণ জবাব দিলেন, "ও কিছু না, একটু মারামারি হয়েছিল।" "বল কি! তুমি ঘুঁষি লড়তে জান?" সাহেব খুব তারিফ করে চলে গেলেন। সেই থেকে তিনি হয়ে গেলেন জ্যাকসন সাহেবের প্রিয় পাত্র। সংসারে মাতাল ফিরিঙ্গী যেমন আছে, তেমনি ভদ্র এবং তেজস্বী ইংরেজেরও অভাব নেই। পরবর্ত্তী কালে এই সাহেব অধ্যাপক এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে তিনি যে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলেন তা ভুলবার নয়। অনেক

দিন পরে, তখন তিনিও প্রফেসারি করছেন, নিবারণচন্দ্র তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে গেলেন পরেশনাথ পাহাড়ে। নামবার পথে বেলা পড়ে এল। পাহাড়ের ওপরে ছিল এক বাংলো। সেই সাহেব অধ্যাপক এবং তাঁর স্ত্রী তখন সেখানে বাস করছিলেন। পুরোনো ছাত্রকে দেখে সাহেবের খুব আনন্দ হ'ল। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখা গেল যখন তিনি বললেন, পথে বাঘের ভয় আছে, এই ঘনায়মান অন্ধকারে তিনি তাঁদের কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারেন না। মেম সাহেবও সায় দিলেন। সে রাত্রে সেই বাংলোতে তাঁদের সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করতে হ'ল। শুধু তাই নয়, খাওয়াদাওয়ার পর মেম সাহেব নিজেদের বিছানা-কম্বল নিজের হাত পেতে তাঁদের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বিদেশী অধ্যাপকের কাছ থেকে এক রকম স্নেহ অর্জ্জন বড় সহজ কথা নয়।

এর অনেক দিন পরের কথা, নিবারণচন্দ্র তখন বৃদ্ধ, কর্ম্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর অভ্যাস ছিল সন্ধ্যাবেলা অনেকখানি ক'রে বেড়ান। প্রায়ই তিনি একা একা লেকের ধারে বেড়াতে যেতেন, লোকের ভিড় ছেড়ে নিরিবিলি দিকটায় বেড়াতেই ভাল বাসতেন। একদিন ঐ রকম যাচ্ছেন, দেখলেন সামনে গুটি দুই ভদ্র মহিলা, আর তার অনতিদূরে কয়েকটি ভদ্রবেশী ছোকরা চলেছে। ছোকরা ক'টি মহিলাদের অসম্মান করে নানা রকম ব্যঙ্গোক্তি করতে করতে চলেছে। নিবারণচন্দ্র এ বেয়াদপি সহ্য করতে পারলেন না, বয়সের কথা ভুলে দৌড়ে গিয়ে হাতের লাঠি দিয়ে সেই ছোকরাদের একটিকে উত্তম মধ্যম কষিয়ে দিলেন। ছোকরারা দলে বেশ ভারী ছিল, আর তিনি একা, তায় বৃদ্ধ, কাজেই বিপদের আশঙ্কা ছিল খুবই। কিন্তু বৃদ্ধের হাতে এ রকম লাঞ্ছনার কথা বোধ হয় তারা কল্পনা করতে পারে নি। তারা থতমত খেয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। ততক্ষণে অবশ্যি আরও লোক এসে জুটেছে, কাজেই আর গোলমাল হ'ল না। নিবারণচন্দ্র মহিলা ক'টিকেও মিষ্টি করে শুনিয়ে দিতে ভুললেন না—এ রকম অরক্ষিত ভাবে পথে বেরোবার জন্য।

এর অল্প কিছু দিন আগে ঠিক এমনি ভাবে তিনি এক উদ্ধত পাঞ্জাবী ট্যাক্সি-ড্রাইভারের হাত থেকে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোককে রক্ষা করেছিলেন। ড্রাইভারটি তাঁর লাঠি খেয়ে পালাবার পথ পায় নি। সে চলে গেলে ভদ্রলোকটিকেও তিনি যথেষ্ট তিরস্কার করতে ছাড়েন নি।

আর একদিন। সেদিনও তিনি লেকের ধারে বেড়াচ্ছেন। লেকের এলাকার চারদিকে লোহার রেলিং। একটি মুসলমান যুবক তার সাইকেলটি নিয়ে বাইরে আসবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সাইকেলটি ভারী, এবং রেলিংটাও বেশ উঁচু, একা তার পক্ষে সাধ্যে কুলোচ্ছিল না। কাছেই আরও কয়েকটি যুবক ঘুরছিল, কয়েকজন ঘাসের ওপর বসে গল্পও করছিল কিন্তু কেউই যুবকটিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসা আবশ্যক মনে করছিল না। নিবারণচন্দ্র ব্যাপারটা দেখেই এগিয়ে গেলেন। দু'হাত দিয়ে সাইকেলটি ধরে রেলিং পার করে দিলেন। মুসলমান যুবকটি অবাক্। কোন ভদ্রবংশীয় লোক—তার ওপর এমন বৃদ্ধ লোক যে তাকে এ রকম ব্যাপারে শারীরিক সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতে পারে তা তার কাছে একেবারেই অসম্ভব মনে হচ্ছিল। তার থতমত ভাব দেখে নিবারণচন্দ্র বললেন, "তোমার লজ্জা পাবার কি আছে? এটুকু

সামান্য ব্যাপারেও যদি কেউ কাউকে সাহায্য না করে তা হলে মানুষ হয়ে লাভ কি? আমারও তো একদিন এ রকম সাহায্যের দরকার হ'তে পারে!"

পুত্রদের বিবাহের সময় পাত্রী পছন্দ করতে গিয়ে তিনি একবার যাকে দেখতেন তাকেই পছন্দ করে আসতেন। বলতেন, "মেয়ে দেখা ওদের পক্ষে দস্তুর মত একটা 'টর্চার'। অপছন্দ করলে ওদের মনের অবস্থা কেমন হয় বল তো! কাজেই বাছাবাছি না করাই ভাল।"

১৯০৫ সালের স্বদেশযুগের যুবক নিবারণচন্দ্রের আদর্শ ছিল মহান্। আর প্রতিটি আদর্শ পালন করবার জন্য একপাও পিছুবার লোক ছিলেন না এঁরা। ফলে মাঝে মাঝে মতবাদ কাজে দেখাতে যাওয়ায় বিপদ্‌গ্রস্তও হতেন। একবার তিনি সাবাইকে বললেন, পশমী জামা বাদেও কাজ চলে—যেমন গোটা দুই তিন গেঞ্জী পর পর চাপালেই শীত কাটান সম্ভব। গেঞ্জীর ভাঁজে ভাঁজে যে বাতাসের স্তর থাকে তাতেই শরীর গরম রাখে। কথাটা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করবার জন্য সেবার মাঘ মাসে তিনি নিজে সে রকম পর পর কয়েকটা সূতীর গেঞ্জী প'রে লেক ভ্রমণ করতে গেলেন। ফলে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ক'দিন তাঁকে শয্যায় আশ্রয় নিতে হ'ল এবং সেই সঙ্গে পুত্রদেরও হ'ল কিঞ্চিৎ চিন্তার উৎপাদন।

নিবারণচন্দ্র বাংলা দেশের এমন একটি মানুষ যাঁর জীবন নিঃসন্দেহে ছাত্রসম্প্রদায়ের কাছে আদর্শ স্থানীয় বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি

প্রধানতঃ যে সব সাহিত্যিক বাংলা শিশুসাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে একটি বর্ণানুক্রমিক তথ্যপঞ্জী আমার সম্পাদনায় রামধনুতে প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। তথ্যপঞ্জীটি যাতে নির্ভুল ও সম্পূর্ণ হয় সেজন্য সকলকার—বিশেষতঃ শিশুসাহিত্যিকদের সহযোগিতা বিশেষ ভাবে কাম্য। এ বিষয়ে তাঁদের নিজেদের এবং তা ছাড়া আর যাঁদের বিষয় তাঁদের জানা আছে (লেখকের নাম, জন্মস্থান, জন্মতারিখ, ছাত্রজীবন, কর্ম্মজীবন ও সাহিত্যিক জীবন, প্রকাশের ক্রমানুসারে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা এবং বিশেষ বক্তব্য কিছু থাকলে তা) লিখে রামধনু-সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলে অনুগৃহীত ও আনন্দিত হব।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

গত বারের প্রতিশ্রুতি মত এবারে তোমাদের চিঠির তাড়া নিয়ে বসা গেল।

শ্রীদীপককুমার বসু (কলিকাতা-২৯) তোমার দীর্ঘ চিঠিখানির মধ্যে সহজ সুরটি বেশ ভাল লাগল। ইংরেজীনবীশদের সম্বন্ধে আমারও তোমার মত মজার মজার অভিজ্ঞতা আছে। 'রামধনু'র অর্থ নিয়ে তুমি যা লিখেছ সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'রামধনু' কথাটি সংস্কৃত নয়, দেশজ। বৃহৎ এই অর্থে রাম শব্দটির প্রচলন থাকলেও রামের আরও অর্থ আছে। যেমন ধর—সুন্দর, সাদা ইত্যাদি। রাম যে ধনুক ব্যবহার করতেন তাকেও 'রামের ধনু' এই অর্থে রামধনু বললে ভুল হবে কেন? বিশেষতঃ এই অর্থ যখন সমধিক প্রচলিত? ফটো সম্বন্ধেই তো মুশকিলে ফেললে। ও কি আছে? দেখব খুঁজে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন)—রজত জয়ন্তী সংখ্যা সম্বন্ধে আগেই জেনেছ। সম্মেলন সম্বন্ধে বিবেচনা চলছে। শ্রীশরদিন্দুবিকাশ দাশ (গৌহাটী)—পরশমণি ঠিকমত বেরুচ্ছে জেনে খুসী হলাম। হারানো লেখা আবার সুবিধা মত পাঠাব। কবিতাটা কিন্তু কাঁচা হয়েছে। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ইম্ফল) সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পুস্তক সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের মত বিভিন্ন, সকলের রুচি তো সমান নয়। তা ছাড়া চট করে বলাও কঠিন। সবচেয়ে ভাল না হ'লেও কয়েকখানি ক'রে ভাল বইএর নাম তোমাকে জানাব। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সেন (বালিগঞ্জ)—রামধনুর আগে আরও দু'খানি শিশুপত্রিকার রজত জয়ন্তী হয়ে গেছে। শ্রীঅশোক চৌধুরী (নবদ্বীপ)—রামধনুর জন্য তুমি খুব ভাব লিখেছ, এ তো খুবই সুখের কথা। তোমার দাদুর কথা আরও লিখ। শ্রীঅসীমা পাল (করিমগঞ্জ)—লেখনীবন্ধুর গল্প পড়ার পরও যে তোমার লেখনীবন্ধু হবার সাধ হয়েছে এতে তোমার সৎসাহসের পরিচয় পেলাম। নাম পাঠাবো। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল (মহেশ্বরা)—প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু যত বৈচিত্র্যময় হয় ততই ভাল নয় কি? তা ছাড়া মাঝে মাঝে এমন প্রতিযোগিতাও দেওয়া উচিত যাতে ছোট-বড় প্রত্যেকেই যোগদান করবার সুযোগ পায়। মতামতের মূল্য প্রত্যেকেরই আছে। রচনা বা কবিতা-প্রতিযোগিতাও তো যথেষ্ট দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে মুখ বদলানোও দরকার—বিশেষতঃ এটি যখন রামধনুর প্রতি মাসের বৈশিষ্ট্য! শ্রীঅখিল সরকার (কৃষ্ণনগর)—শুকতারার প্রতিযোগিতায় তোমার পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরে সত্যি খুসী হলাম। সেই সঙ্গে আরও খুসী হলাম তোমার বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার উপর গভীর ভালবাসার পরিচয় পেয়ে। শ্রীমুকুলরাণী মণ্ডল (কশাড়িয়া)—স্থানীয় ডাকঘরে একটা চিঠি দিয়ে রামধনু সম্পর্কে জানিয়ে দিও। প্রার্থিত ঠিকানা পাঠান হবে। 'শ' আর 'ন্দ্র' এর ভুল তোমার এখনও ঘুচল না। শ্রীনমিতা দাম (গৌহাটী)—তোমার চিঠির মধ্যে যে আন্তরিকতার আভাস রয়েছে তা খুব ভাল লাগল। দেরী একবার হ'লে তা শুধরে নিতে একটু সময় লাগবেই।

রামধনুর রজত জয়ন্তী বর্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে তোমাদের কাছ থেকে অজস্র চিঠি পেয়েছি। এই সুযোগে তার জন্য তোমাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, পৃথক জবাব আর দিলাম না। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ।—ইতি রাঃ সঃ

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

ছাড়ার ছড়া

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য্য

হাঁক ছেড়েছেন ওস্তাদজী,
গলা ছেড়ে গাও না গান,
কাজ ছেড়েছেন গদ্দু বাবু,
বাড়ী ছেড়ে বিদেশ যান।
যাবার আগেই ট্রেন ছেড়েছে,
ধোঁয়া ছেড়ে যায় ছুটি',
দম ছেড়েছে ছুটতে গিয়ে,
হাল ছেড়েছে ভাই দু'টি।
পুকুরেতে মাছ ছাড় গো,
বোল্‌চাল সব দাও ছাড়ি,

শীতের বাতাস ছাড়লে পরে
ইচ্ছা না হয় লেপ ছাড়ি।
ঘুষ খেয়ে সে চোর ছেড়েছে,
ছোট্ট ডিঙি দাও ছেড়ে,
ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে,
উড়ল পাখী নীড় ছেড়ে।
ছাড়ল সবায় গেট্‌কীপারে,
ছাড়'ল হাউই ঐ ভোলা,
ব্যবসায়ীরা মাল ছেড়েছে,
ছাড়ছে কামান আজ গোলা।

নতুন বই

পাটনের প্রভুত্ব: শ্রী কে. এম্‌. মুন্সী। প্রকাশক—শ্রীসব্যসাচী ভৌমিক, ইণ্টারন্যাশনাল প্রোজেক্ট্‌স্ এ্যাণ্ড এণ্টারপ্রাইজেস্ লিঃ, ৫, মিশন রো, কলিকাতা। দাম ৪৲

এই বইটি গুজরাটের প্রাচীন ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত একটি উপন্যাস। পাটন গুজরাটের একটি সামন্ত রাজ্য। এই গ্রন্থটিতে পাটনের সোলাঙ্কি রাজবংশের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী উপন্যাসের আকারে লেখা হয়েছে। উপন্যাস যেমন ইতিহাস নয়, তেমনি ইতিহাসও উপন্যাস হ'তে পারে না। এই জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাহিত্য-রস পরিবেশন করা অত্যন্ত কঠিন। আলোচ্য গ্রন্থটিও তাই অনেক জায়গায় এই ত্রুটী থেকে রক্ষা পায় নি। বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে, কিন্তু ভাষা তেমন সরল ও সাবলীল না হওয়ায় রসগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মায়। তবে গল্পাংশটি মোটের ওপর সুন্দর এবং পড়তে বসলে আগাগোড়া একটা কৌতূহলও জেগে থাকে। এটি মুন্সীজীর মুন্সিয়ানার পরিচায়ক সন্দেহ নেই। যাই হোক, প্রাচীন ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনার নিশ্চয়ই সার্থকতা আছে। ভারতের অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকরাও যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তা হ'লে ভারতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হবে সন্দেহ নেই। ছাপা ও বাঁধাই ভাল, তবে দামটা একটু কম হ'লেই ভাল হ'ত।

শ্রীনিরুপমা সেনগুপ্তা

আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ

কবির জন্মদিনে

"রাজার পূজা আপন রাজ্যে—কবির পূজা সব দেশে।" ২৫শে বৈশাখ সমস্ত ভারত যুড়ে নানা স্থানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি পালিত হয়েছে। তার দু সপ্তাহ আগে ইংলণ্ডের ষ্ট্র্যাটফোর্ড অন্-য়্যাভন্'এ মহাকবি শেক্সপীয়ারের ৩৮৮ তম জন্মোৎসব পালিত হ'ল মহা সমারোহে। এই উপলক্ষে পৃথিবীর ৮১টি রাষ্ট্র একসঙ্গে সেখানে তাদের জাতীয় পতাকা তুলে কবিকে সম্মান জানিয়েছে।

রবীন্দ্র-পুরস্কার

পশ্চিম বাংলা সরকার থেকে এ বছর রবীন্দ্র-পুরস্কার পেলেন—সাহিত্যের জন্য "বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস", "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা" প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজ্ঞানের জন্য "ভারতের বনৌষধি রচয়িতা ডাঃ কালীপদ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত এককড়ি ঘোষ (যুক্ত ভাবে)।

নতুন মন্ত্রিসভা

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারে এবং কয়েকটি রাজ্য সরকারে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কিছু কিছু রদবদল হয়েছে। শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী, সর্দার শরণ সিং প্রভৃতি কয়েকজন নতুন মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস আইন-মন্ত্রী হয়েছেন। সর্দার বলদেব সিং, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব প্রভৃতি আর মন্ত্রিসভায় নেই। বারে বারে অবসর নিয়েও মাদ্রাজে আবার রাজাজীর ডাক পড়েছে। পশ্চিম বাংলায় এখনও পুরোনো দলই কাজ চালাচ্ছেন।

হকীর মরশুম শেষ হ'ল

কলকাতায় হকীর মরশুম শেষ হয়েছে। ১ম বিভাগে গত বারের বিজয়ী মোহনবাগান দল এবারেও লীগ্‌ চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে। লীগের কোন খেলাতেই তারা কারো কাছে হারে নি। লীগের পর বিখ্যাত বাইটন্ কাপ। তাতেও এবারে বিজয়ী হয়েছে মোহনবাগান। সেমি-ফাইনালে আগা খাঁ কাপ্‌ বিজয়ী শক্তিশালী টাটা স্পোর্ট্‌স্ ক্লাবকে এবং ফাইনালে গত বারের চ্যাম্পিয়ন্ হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ্‌ট্‌ দলকে হারিয়ে তারা এই সম্মান অর্জ্জন করেছে।

ভিয়েনায় আন্তর্জ্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলন

সম্প্রতি ভিয়েনায় এই আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভারত থেকে বিখ্যাত শিশুচিকিৎসক ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে এতে যোগদান করেন এবং সভাপতিমণ্ডলীতে নির্ব্বাচিত হন। শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে রামধনুর বিশিষ্ট বন্ধু, যুগান্তরের ছোটদের পাততাড়ি বিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীও এতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন দেশে ঘুরে শিশু ও কিশোর প্রতিষ্ঠানগুলি দেখে এসেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের বিশেষ উপকারে লাগবে বলেই আমাদের ধারণা। আমরা অখিল বাবুকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মনোরঞ্জন স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

(চৈত্র, ১৩৫৮)

সব চেয়ে ভালো লেখার জন্য রৌপ্য পদক পেলেন—শ্রীপারিজাত চৌধুরী (কলিকাতা-২৯)। আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে :—শ্রীকানাইলাল মণ্ডল (বাবলা), শ্রীগোপীনাথ দত্ত (মেদিনীপুর), শ্রীমেনকা দেবী (এলাহাবাদ), শ্রীশোভা সিংহ (কলিকাতা-৭), শ্রীপুষ্পিতা বসু (ভবানীপুর)।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

[১] ৫৭৭৬ [২] পাটনা।

উত্তরদাতাদের নাম : নির্ভুল : :—দেবী, শুভাই, গোতন (বেলগাছিয়া) ;; দিলীপ ও কল্যাণ সমাজদার (কলিকাতা-৪) ; টাটা, টুটু, টিটি, টিটো টোটা, টৈটু (জামসেদপুর) দীপঙ্কর, মালবিকা, নন্দিতা, অনামিকা ঘোষ (বিষ্ণুপুর) ; বিভাসবিহারী বসু (পাটনা) ; কৈলাসচন্দ্র তালুকদার, অজিতকুমার ও অনুপমা তামুলী (গুবাহাটি), চন্দন, শুভা, শুক্লা, শামু, বিশু (নাকড়া-কোন্দা) ; রণেশচন্দ্র দাস (কলিকাতা-১৪) ; রামকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ দাস, ধ্রুবকুমার পাল (পাটনা) ; বেলা, মঞ্জুলিকা, সুজিত, সুমিত্রা, বন্দনা, সুচিত্রা দাশগুপ্ত (কলিকাতা-২৬) ; নিবেদিতা সেন (কলিকাতা) ; মেজদা, জিতেন, নির্ম্মলেন্দু (ভাগলপুর) ; মঞ্জু ঘোষ (ভবানীপুর), অশোকা-চিন্ত্যালোক চৌধুরী (নবদ্বীপ), তাপসকুমার, মানসকুমার, ও সুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী (মাধিপুরা) ; ইন্দ্রাণী গোস্বামী (লেডু) ; মধুসূদন নসীপুরী (জিয়াগঞ্জ) ; অখিল সরকার (কৃষ্ণনগর) ; কৃষ্ণা

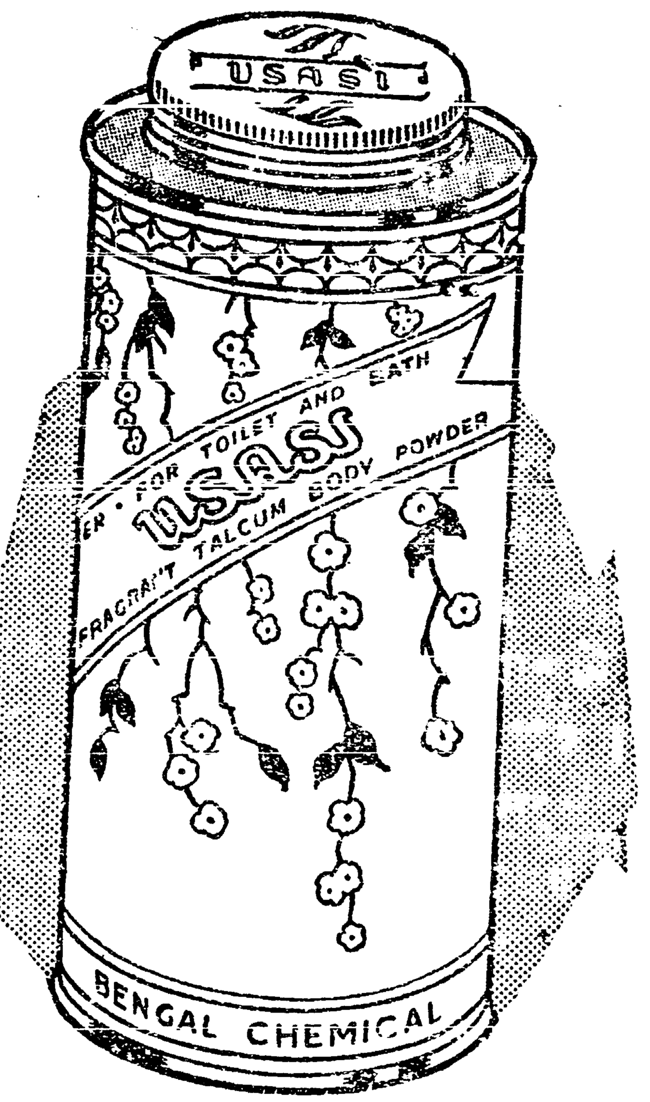

ঊষসী

অভিজাত প্রসাধন-রেণু

লুপ্ত ও সুপ্ত
দেহ সৌন্দর্যকে জাগ্রত করে
শিশুর কোমল অঙ্গেও নির্ভয়ে
ব্যবহার চলে

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

সুর (কলিকাতা-৪) ; অসীমা, মিহিরদা, গৌতমদা, বৌদি, তরুণ ভাই, বেণু, রাণা ভাই ও মেজদি (করিমগঞ্জ), মালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ) ; অজিত ও রণজিত মণ্ডল, অনিলদা, গুণেনদা, দীপু, আনন্দময়ী, গীতা, শ্যাম, (বামনাবাদ)। একটির ভুল :—হেমেন্দ্রনাথ সেন (বালিগঞ্জ) ; অমলকুমার মিত্র (গৌহাটী), চন্দ্রিমা মুখোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী) ; মুকুলরাণী মণ্ডল (কশাড়িয়া)।

নূতন ধাঁধা

অঙ্কের মাষ্টার মশাই নিমাই বাবুর মাথায় একটু ছিট আছে। সেদিন ক্লাসে এসে বল্লেন, "বল তো ৫৮ × ২ — কত ?" ছেলেরা সমস্বরে বল্‌ল "১১৬"। তিনি বল্লেন, "হ'ল না, হ'ল না, উত্তর হবে ৫৫৫।" "সে কি স্যর!"—ছেলেরা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করল। "আরে আমি কি আর ৫ কে ৫ ধরেছি ? প্রত্যেকটি সংখ্যার বদলে আমি আর একটা সংখ্যা বসিয়েছি। তোমরা যেটাকে বল ১, আমি সেটাকে বলি ৪ ; তোমরা যেটাকে বল ৪, আমি সেটাকে বলি ৬। কাজেই ৫, ৮, ২—এগুলোও আসলে অন্য সংখ্যার বদলে বসিয়েছি। কোন্ কোন সংখ্যার বদলে কোন্ কোন্ সংখ্যা বসানো হয়েছে বার করতে পারলেই আমার উত্তর মিলবে।"

তোমরা বার করতে পার ? [ধাঁধার উত্তর ৩১শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে পাঠাতে হবে।]

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এ মাসের প্রতিযোগিতার বিষয় হচ্ছে—"সমস্যা পূরণ"। নীচে দু'টি কবিতার শেষ লাইন দু'টি আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এর সঙ্গে মিলিয়ে, অর্থ এবং ছন্দ ঠিক রেখে, আগের এক বা একাধিক লাইন তৈরী করে দিতে হবে। আমাদের বিবেচনায় যারটা সব চেয়ে ভাল হবে সেই পুরস্কার পাবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে পূর্ণ করে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। লেখা ১৪ই আষাঢ়ের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

লাইনগুলি হচ্ছে : [১] এ কি কাণ্ড, আকাশেতে শেয়ালের ডাক!
[২] মাসতুত ভাই আমরা দু'জনা।

২ রামধনু
পুঃ জঃ ৫৯

নাম—
ঠিকানা—
বয়স—　　গ্রাহক কিনা—

নতুন বছরের শ্রেষ্ঠ বই

স্কুমার দে সরকার প্রণীত
হানাবাড়ী ১॥০

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত
রঘু সর্দ্দার ১॥০

অশোক শাস্ত্রী প্রণীত
স্বর্গে থিয়েটার ১৲

ছোটদের পদ্মাপুরাণ—স্থনির্ম্মল বসু প্রণীত মূল্য ২৲ টাকা

শিশু নাটক

[স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত]

এই নাটকগুলি অনেক স্কুলেই অভিনীত হইয়াছে

কেদার রায় (দীপনারায়ণ মুখো) ॥৵০
বীর শিবাজী (সুধীন রাহা) ॥৵০
জাগোরে ধীরে (বিধায়ক ভট্টাচার্য্য) ॥৵০
স্বাধীনতা জাগলো (যোগেশ বন্দ্যোঃ) ॥০
স্বামীজী (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) ॥৵০
বন্দীবীর (সুনির্ম্মল বসু) ॥০
উৎসব (গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়) ॥০
চন্দ্রগুপ্ত (কেশবচন্দ্র সেন) ॥০
মুক্তিপথে (ঐ) ॥০
কর্ণার্জ্জুন (ঐ) ॥০
কুশধ্বজ (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০
বিজয়সিংহ (ঐ) ॥০
বিদ্রোহী (ঐ) ॥০
গুরুদক্ষিণা (প্রভাসচন্দ্র ঘোষ) ॥০
সিরাজের স্বপ্ন (বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত) ॥৵০
বীর মোহনলাল (সুধীন রাহা) ॥৵০
প্রতাপসিংহ (ঐ) ॥৵০

অখিল নিয়োগী 'বাণী'—॥৵০ (পুরুষ-ভূমিকা বর্জ্জিত)
অখিল নিয়োগী 'শিশুনাটিকা'—॥৵০ (ছেলেমেয়েদের জন্য)

য়্যাডভেঞ্চার ও ভয়াবহ কাহিনী পরিপূর্ণ শিশু-উপন্যাস

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
আবার যখের ধন ১।০
আধুনিক রবিন হুড ১।০
হিমালয়ের ভয়ঙ্কর ১।০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত
নিশির ডাক ১৲
রক্তমুখী ড্রাগন ১৲
বিষের তীর ১৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত
দুই ভাই ১॥০

সুনির্ম্মল বসু প্রণীত
মরণের ডাক ১।০

—বিস্তারিত তালিকার জন্য পত্র লিখুন—

দেব-সাহিত্য কুটীর ২২৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

এজেন্ট চাই

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য বাংলা ও ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে এজেন্ট চাই।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য
নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার, রামধনু
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা—২৫

বাহির হইয়াছে! বাহির হইয়াছে!

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের

কিশোর গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) ২৲

দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস: 'নীল নায়ের মাঝি' ও 'হে বীর প্রণাম করি' একত্রে

কিশোর গ্রন্থাবলী (২য় খণ্ড) ১।০

দুখানি এডভেঞ্চার উপন্যাস: 'যকের জঙ্গলে' ও 'আঁধার রাতের আর্ত্তনাদ' একত্রে

কিশোর গ্রন্থাবলী (৩য় খণ্ড) ২॥০

দুখানি যুদ্ধ উপন্যাস: 'কামানের মুখে নানকিঙ' ও 'প্রলয়ের পথিক' একত্রে

শিশুসাহিত্যে এই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম।

কমলা বুক ডিপো
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

সুকুমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

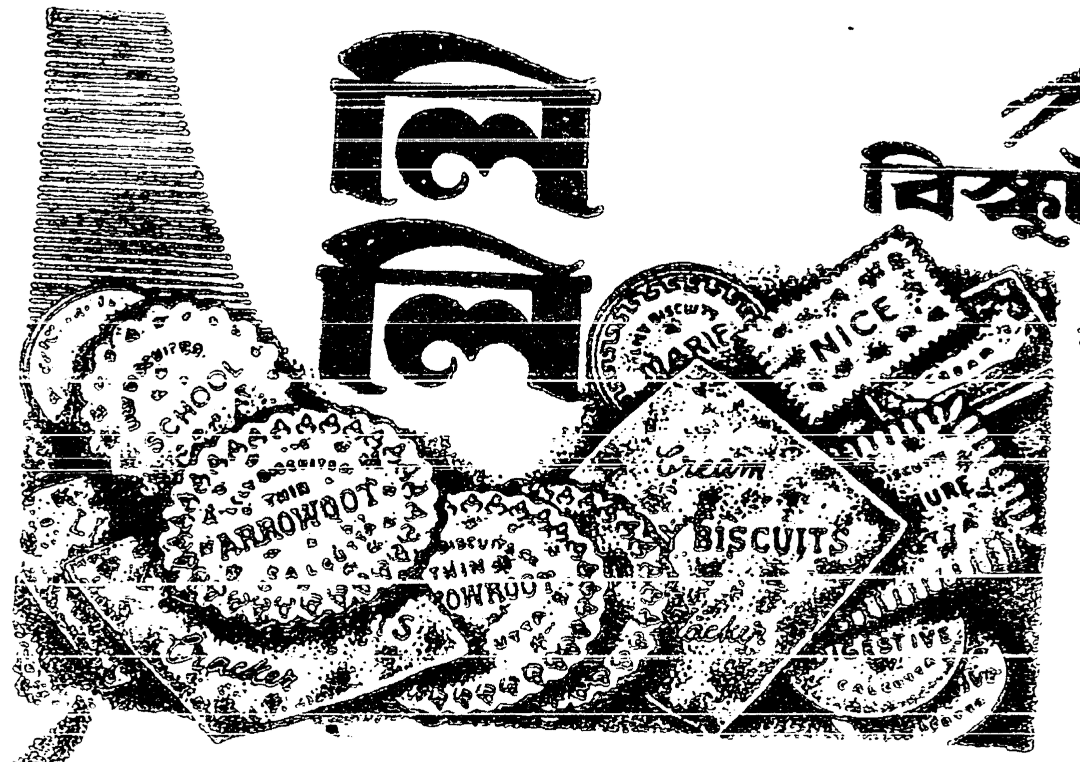

কয়েকটী মনোরম
ও
স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোস্টন ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

রজত জয়ন্তী বর্ষ

সম্পাদক — শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম, এস, সি

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

সলোমন এণ্ড কোং

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড (মোহতা হাউস) কলিকাতা-১

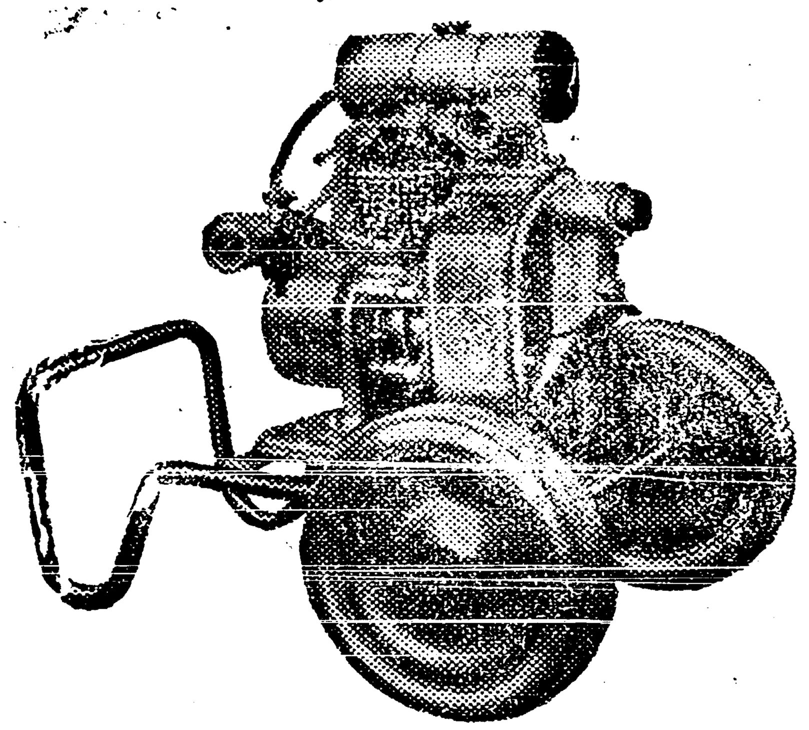

নানা প্রকার ডিজেল—কেরোসিন—পেট্রোল ইঞ্জিন, হ্যাণ্ড ও পাওয়ার-পাম্প—গ্যালভানাইজ্‌ড টিউব প্রভৃতি আমদানী ও প্রস্তুতকারক।

সোল প্রোপ্রাইটার : নৃপেন ভট্টাচার্য্য

GRAM : 'AGRASTONS' • • • PHONE : BANK 4497

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফকির

শিল্পী :—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৫৯ { ৩য় সংখ্যা

শ্যামসুন্দর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

চরণ তোমার রাঙা হ'লো
আমার প্রণামে,—
ঢেলে দিলাম ব্যথাই শুধু
সুমধুর নামে।
সবাই করে পূজা ও উৎসব,
আমার শুধু সদাই উপদ্রব,
দয়াল তোমার ভিক্ষা মাগি
ডাইনে ও বামে।

স্বষ্টিছাড়া স্বষ্টি আমি,
লজ্জাতে মরি,
জীবন ধরে তোমায় করি
বিরক্ত হরি।
কেবল আমি নই দরিদ্র দীন,
একেবারে চক্ষুলজ্জা-হীন,
যা দিই তোমায় নয়ন-জলে
অভিষেক করি।

এই ধরণীর সব যাতনা
সকল হুলুস্থূল,
সকল দোষই দিই তোমাকে,
তুমিই সবার মূল।
বুঝতে নারি তোমার মহিমা,
প্রগল্‌ভতার নাই মম সীমা,
তবু তোমার নামে যে হয়
অন্তর আকুল।

বিসর্জন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জনৈক পুরবাসী

বড় দুঃখ হচ্ছে যে ডায়েরি লেখার অভ্যাস করি নি। তা হলে সব কথা গুছিয়ে, সাজিয়ে লিখতে পারতাম। তাতে পাঠক-পাঠিকাগণ ডায়েরি পাঠের আনন্দ তো লাভ করতোই, সেই সঙ্গে তাদের মনে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কোন সংশয়েরই উদয় হত না। কিন্তু যা হয় নি তা নিয়ে আর দুঃখ বা উষ্মা প্রকাশে লাভ কি? সবাই কি সব কিছুতে আনন্দরসের স্বষ্টি করতে পারে?

যতটা মনে অছে এবং এই লিখবার সময় কলমের আগায় যতটুকু এগিয়ে আসচে, তা থেকে বল্‌তে পারি অতঃপর শ্রীশ্রীহরি একখানি পুস্তিকা রচনা করে তার পাতায় পাতায় আমাদের ও তার নিজেরও সুন্দর প্রতিকৃতিগুলি মুদ্রিত করে আমাদের এমন উৎসাহিত ও পুলকিত করে তুললো যে, আমার প্রতিকৃতি সম্বন্ধে দু-একজন বিরূপ মন্তব্য করতেই আমার স্বাভাবিক রুক্ষ মেজাজ রুক্ষতর হয়ে উঠলো। তাই দেখে তারা শুধরে নিয়ে বললে, "শ্রীশ্রীহরি ইচ্ছে করেই আপনার ছবি ঐ রকম করে তুলেচে।" কথাটার মধ্যে অবিশ্বাসের কিছু খুঁজে পেলাম না। কারণ ছবিখানি দেখা মাত্র কে যেন বলে উঠলো, আমাদের হারু যেন জনতাকে উদ্দেশ করে বলচে—"ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড খমরেড্‌স্!" আপনি যে জননেতা। কাজেই পোজ্‌টা

ঐ রকমই হওয়া দরকার। এবং নিজের নিজের প্রতিকৃতি দৃষ্টে প্রত্যেকেই এমন ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন যেন বলতে চান "আরও ভাল হতে পারতো।" কথাটি অবশ্য যথার্থ। কারণ চেহারা তো কারোই খারাপ নয়। যাক্, পরের চেহারা নিয়ে বেশি আলোচনা অনুচিত। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনই বুদ্ধিমানের কাজ।

এবার বলতে বাধা নেই এবং পূর্বেই বলেচি, প্রথম দিনের অভিনয় হ'ল ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজের সম্মেলন-কক্ষে।

মঞ্চাদির ও অভিনয়ের সাজসজ্জার জন্য যাকে নিযুক্ত করা হ'ল, তার নাম শুনে প্রথমটা কেমন যেন হয়ে গেলাম। শুনলাম, তখনও তাকে চোখে দেখি নি, তার নাম রাজাগোপাল আচারিয়া! জানতে চেষ্টা করতে লাগলাম লোকটির নামের আগে চক্রবর্তী শব্দটি আছে কিনা। কিন্তু কেউই সে কথা বলে না, কারণ কেউই তাকে দেখে নি। যিনি তাকে দেখেছেন, তার সঙ্গে কথা বলেচেন, তার সঙ্গে ব্যবস্থা করেছেন তিনি হলেন শ্রীক্ষেত্রপালদাস ঘোষ। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষেত্র বাবু সে ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। কাজেই নানা কথা মনে উদিত হতে লাগলো। ভাবলাম, রাজাগোপালকে তো ১৯২১ সাল থেকে নানা সাজে দেখেচি। তিনি অবশেষে অপরকে সাজ ভাড়া দিচ্ছেন! কালের গতি কি বিচিত্র! তবুও মন স্থির হ'ল না। কিন্তু সত্য আগুনের মতো, চাপা থাকতে পারে না,—যেমন অশ্বত্থামা নামক হস্তীর মৃত্যুর সংবাদটি। যুধিষ্ঠিরের মতো স্থিতপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিও তা চেপে রাখতে পারেন নি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। এ রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ জগতের প্রাচীন ও আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে বর্তমান। বেশি কথা কি, হালে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জেলায় যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সে সত্যটাও চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও চাপান দেওয়ার চেষ্টাটা বেশ জবরদস্ত। কারণ দেশে এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়েচে যারা ঘোরতর নাস্তিক। আমাদের সোনার ভারত যোগীর দেশ। স্বয়ং আলডুস্ হাক্‌শ্লে এক সময়ে এখানে এসে যোগশিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে শুনেছি। মনে হয়, অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে যদি স্কুল-কলেজগুলোতে পাইকিরি হারে যোগশিক্ষা দেওয়া যেত তা হ'লে ব্যাঙের মতো অন্ততঃ মাস দুই তারা কুম্ভকাসনে বসে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারতো; খাবার নামও করতো না। ফলে শান্তিতে রাজত্ব করা যেত, নাস্তিকগুলোরও ভগবানে মতি ফিরতো, তারা "কাছিম বাবা", "দাদুরী মাতাজী" বনে যেত, আর বালকবালিকাগণ হয়ে যেত ঋষিকুমার ও কুমারী।

কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়লাম। পাঠকপাঠিকাগণ তো জানই আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। সামলে নিয়ে এখন যে সমস্যায় পড়েছিলাম আবার তাতেই ফিরে যাই। শেষে জানা গেল, লোকটি রাজাও নয়, ধনও নয়, কৃষ্ণ তো নয়ই, রামও নয়, প্রাণও নয়, মানে তার নামের আগে কোন সামগ্রী, দেবতা বা ব্যক্তিই নেই—সে শুধু গোপাল—গোপাল আচারিয়া। মাদ্রাজের লোক, কিন্তু একদম বাঙালি বনে গেছে, বসবাস করচে বাঁকুড়া জেলায়। সেই দিনই তাকে চাক্ষুষ দেখলাম—গায়ের রঙ গোপালেরই মতো, দেহ শীর্ণ—খর্ব, বাঙলা বলে খাস বাঁকুড়া জেলার, তাতে সামান্য উড়িয়া টান। পোশাক দেখলে কেউই খোট্টা বা মাদ্রাজী বলে ভুল করবে না। লোকটি ভারী চতুর। মাদ্রাজের কে বা নয়? সে এসেই বুঝতে পারলো পাঁউরুটির কোন্ দিকে মাখন মাখানো। মঞ্চসজ্জা সেরে সে সদলবলে যথা সময়ে কুশীলবগণকে সাজাতে লাগলো। রাজামশাই, পুরুতঠাকুর, জয়সিংহ, চাঁদপাল, সেনাপতি ও রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে পাউডার ও রঙ মাখিয়ে, কাজল টেনে, পরচুলো পরিয়ে, সাজ এঁটে এমন করে দিল যে আমরা, পুরবাসীরা, ভয়ে ভয়ে এদিক্ ওদিক্ সরে যেতে লাগলাম। আর আমাদের সামনে ধোপার বাড়ির পোঁটলার মতো গোটা কয়েক কাপড়ের পোঁটলা ফেলে দিয়ে বললে, "বার করে নিয়ে পরুন।" ওদিকে ঠিক তখনই রাণীমহলে কি হচ্ছিল বুঝতে পারলাম না, তবে কলরব কানে এল। বুঝতে না পারবার কারণ বার-মহলে আমাদের শুধু গোপালের মন্ত্রীকে নিয়ে ভারী মুশকিলে পড়া।

সবাই বলছিল,—দোহাই কাকাবাবু, আমরা কেউ কিছু বলি নি—"মন্ত্রীর চুল, ভ্রূ, গালপাট্টা সব সাদা হবে"। কিন্তু মন্ত্রী, মানে বিশ্বকাকা শ্রীপ্রভাতকিরণ, বলছিলেন, "আমি কিছুতেই বুড়ো সাজবো না।" কথাটা তিনি অস্বাভাবিক কিছু বলেন নি। কারণ শৈশবে ইচ্ছা হয়, বুড়ো সাজবার, বুড়োমী করবার। বয়সটা তাড়াতাড়ি বাড়ছে না এবং গোঁফ-দাড়ি গজাচ্ছে না কেন, এ জন্য মনে খেদেরও উদয় হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি অধিক বয়সে সাজসজ্জায় ও কাজকর্মে তারুণ্য প্রকাশের নবীনাকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগ্রত হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, তিনি বিশ্বকাকা—সকলের পিতার কনিষ্ঠ। বৃদ্ধ সাজলে বিশ্বজ্যাঠার পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ষোল আনা আশঙ্কা। কারণ, একালের ছেলেমেয়েরা কি থেকে কাকে কি বলে ডাকে ঠিক কি? হয়তো "জ্যাঠাবাবু" বলেই চিঠি লিখতে শুরু করবে। পরিশেষে তাঁরই জয় হ'ল। তিনি তরুণ মন্ত্রী সেজে অধরে মৃদু হাস্য মেখে সাজঘর থেকে

বেরিয়ে এলেন। তাঁর একটু পরে এলেন আমাদের পুরুত ঠাকুর। কাপালিক কোন দিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না, কিন্তু সেই সন্ধ্যায় দেখলাম। মন স্বতঃই উদ্বেল হয়ে উঠলো। আর সেই উদ্বেল মন-তরঙ্গিণীর বক্ষ থেকে একটি মাত্র ধ্বনি উত্থিত হল—"জ'য় মা!" প্রকাশ্যে বললাম, "দাদা, সত্যিই ভীষণতার মধ্যে সৌন্দর্য আছে, আপনার এত রূপ?" দাদা খুশি হয়ে গম্ভীর হাস্য করলেন।

অতঃপর আমরা, পুরবাসীরা, ছাতা-ধরা, তেলচিটে গন্ধভরা বিচিত্র পোশাক পরে দাঁড়ালাম। পাউডার, রঙ ও কাজলের বালাই নেই, আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল গোঁফ বা গোঁফ-দাড়ি। এমন মুখ করেছি যে তাও এঁটে থাকে না, খুলে যায়। অগত্যা হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে রইলাম। কিন্তু গোঁফের বোটকা গন্ধ এবং আঠার গন্ধ ও কামড়ানিতে মনে হতে লাগলো, দরকার নেই গোঁফের। গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি না তো যে ছদ্মবেশ পরতে হবে। শেষ অবধি গোঁফ আর খোলাই হ'ল না।

এমন সময় দেখলাম, একপাল মেয়ে সেজে এল। মেয়েগুলি অবশ্য ওপরওয়ালাদের কারো কন্যা, কারো দৌহিত্রী, কারো ভগিনী। শুনলাম, তারা মেলার দৃশ্যে মঞ্চে প্রবেশ করে জৌলুস দেখাবে। এমন সময় বেরিয়ে এল ভিখারিণী অপর্ণা—পরনে রেশমী শাড়ী ও কোমরে কতকগুলি পাতা গোঁজা (বোধ হয় তার নিহত ছাগশিশুটির জন্য! অবশ্য নাটকখানি অনেকদিন আগের রচনা এবং মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যও বহুকাল স্বর্গারোহণ করেচেন। তারপর দুটো মহাযুদ্ধ, দুটো বিপ্লব ঘটেছে, কাজেই সেকালের ভিখারিণী বালিকার যে বেশ ছিল একালের ভিখারিণীর সে বেশ "ইডিওলজির" দিক্ দিয়েই যে হতে পারে না! তার ওপর অপর্ণাকে সাজিয়েচেন শ্রীবাণী রায়, এম-এ (ক্যাল)। অপর্ণাও এম-এ পাশ। সে কারণ ভিখারিণীর বেশ-ভূষায় আধুনিকতা থাকাই স্বাভাবিক এবং সকলেরই তা মেনে নেওয়া উচিত। সোডা ফাউনটেন ও রেস্তোরাঁর ধারে অনেক ভিখারিণীই চোখে পড়ে। যারা না মানবে তাদের নিতান্ত সেকেলে বলা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথই বা কি? সেকালটাকে যদি ঝাড়ে-বংশে ঝেঁটিয়ে সাগরজলে ফেলে দেওয়া যেত তা হ'লে কি সুখেই যে দিন-রাত্রি কাট্তো তা বলে শেষ করা যায় না।

তারপর এলেন মহারাণী। দেখেই এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। ছবিতেই দেশী রাজা-রাণী দেখে পুণ্য সঞ্চয় করে এসেছিলাম, সেই সন্ধ্যায় জীবন্ত রাণী দেখে ভয়বিহ্বল চিত্তে ত্রিপুরেশ্বরীর নাম জপ করতে লাগলাম। এমন সময় সেজে এল দু'জন প্রহরী।

তারা গোঁফে চাড়া দিয়ে বর্শা হাতে বুক ফুলিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "কি রকম মানিয়েছে ?"

বললাম, "সত্যিকারের প্রহরীকেও এত স্বাভাবিক দেখায় না।" দু'জনেই খুব খুশি হয়ে চলে গেল।

তারপর সকলে গিয়ে মঞ্চের পাশে যথাস্থানে দাঁড়ালাম। ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা উঠলো।

অভিনয় শুরু হ'ল রসিক জনগণের সম্মুখে। কেমন অভিনয় হতে লাগলো সে কথা আর কি করে বলি ?

আমি এত ভাল অভিনয় করতে লাগলাম যে মাথার পাগড়ি ও গোঁফের একপাশ গেল খুলে। তৎক্ষণাৎ টান মেরে অবশিষ্টটুকু নির্মূল করে পাগড়িটা মাথায় বাঁধলাম কষে। যাঁরা "বিসর্জন" পড়েছিলেন তাঁরা বিদ্রূপের হাসি হাসলেন এবং যাঁরা পড়েন নি তাঁরা মনে করলেন, এই ব্যাপারটি বোধ হয় বইয়ে আছে, তাই খুব হাততালি দিয়ে আমায় উৎসাহিত করলেন। আমার দ্বিতীয় গোঁফ থাকলে তাঁদের খুসি করতে যে তৎক্ষণাৎ টেনে ছিঁড়তাম এতে আর সংশয় নেই। ওদিকে পুরুত ঠাকুরের অঙ্গের পট্টবস্ত্র গৌরবের ভার সইতে না পেরে গেল ছিঁড়ে। তিনি সাজ-কর্তাকে "স্টুপিড, ফুল" বলে ধমক দিয়ে মন্দির-সোপানে বসে পড়ে বললেন, "শীগ্গির জোড়া দিয়ে দাও।" সেও অমনি "আজ্ঞে—তা —এই যে" বলতে বলতে দু'টি ছিন্ন প্রান্ত এক করে গ্রন্থি বেঁধে দিল। চললো অভিনয়।

রাজা, রাণী, জয়সিংহ, অপর্ণা, সেনাপতি, নক্ষত্ররায়, চাঁদপাল, খেঁদী, বুঁচী, চাঁদী, ঘেঁচি, এমন কি প্রহরীদ্বয় পর্যন্ত—এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। দর্শকগণ কাকে যে দেখবে, কার কথা যে শুনবে, কাকে যে হাততালি দেবে, ঠিক পায় না। আমাদের গণেশ মানে শ্রীশ্রীহরি তো দর্শকগণের এমন প্রিয় হয়ে উঠলো যে দ্বিতীয় বার মঞ্চে প্রবেশ করতে তাকে দেখেই সবাই হি হি করে হেসে সারা, তার কথা শোনা তো পরের !

উত্তেজনা, প্রশংসা ও হাস্যরোলের মধ্য দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হ'ল। তবে দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা-পাত এমন জায়গায় হ'ল যে তখনও অপর্ণা তার বক্তব্য শেষ করে নি। এজন্য সে একটুও দায়ী নয়। সে যবনিকান্তরালবর্তিনী হয়েও তার বক্তব্য পরিষ্কার বলে গেল। যাঁরা বিসর্জন পড়েন নি তাঁদের এতে

অসুবিধা হ'ল না, যাঁরা পড়েছিলেন তাঁদের এবং রসিক জনকে নিয়েই যত গোল। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হতে, পুরবাসিগণের ভূমিকারও অবসান ঘটলো। সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে-মুছে, ভিজে চুলে টেরি বাগিয়ে জামা-কাপড়-জুতো পরে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, কেউ কেউ চলে যাচ্ছেন। মনে করলাম, বোধ হয় টিফিন খেতে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে চেনা-অচেনা ছিলেন। অচেনা লোক সামনে এসে নমস্কার করে আমার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করলেন তা না বলাই ভাল। চেনা লোকের মধ্যে কয়েকজন বললেন, "যা দেখবার ছিল তা দেখে গেলাম। পরে তো আর আপনার ভূমিকা নেই।"

"কিন্তু—"

"আচ্ছা, নমস্কার। পরে আবার দেখা হবে।"

এমন সময় এলেন "মৌচাকের" শ্রীসুব্রত সরকার। তিনি এসেছিলেন সপরিবারে। ফটকে দেখা হতেই বললাম, "তোমরা চলে যাচ্ছ ? সুধীর বাবু এলেন না কেন ?"

সে বললে, "বিশেষ কার্জ আছে বলে আমরা থাকতে পারলাম না, বাবাও আসতে পারলেন না। সুন্দর অভিনয় হয়েচে। আমি তো ওখানে কাউকেই চিনি না। সু-অভিনয়ের জন্য মৌচাকের তরফ থেকে চারখানি রূপোর মেডেল দিতে চাই। আপনি যদি ঘোষণা করে দেন।"

বললাম, "কাকে কাকে দিতে চাইচো ?"

সে বললে, "যোগেন গুপ্ত, নরেন দেব, অপর্ণা আর আপনাকে—আপনি বলে দেবেন কিন্তু। আচ্ছা, নমস্কার। আমরা আসি।"

তখন এত আনন্দ হ'ল যে প্রায় ছুট্তে ছুট্তে এসে পরিষদের সভাপতি শ্রীক্ষেত্রপালদাস ঘোষকে সংবাদটি ঘোষণা করে দিতে অনুরোধ জানালাম। ঘোষ মহাশয় নামগুলি শুনে প্রসন্ন হলেন কি না বোঝা গেল না তবে তখনও তাঁর মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশ করলেন না। হয়তো একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই উঠে গিয়ে মঞ্চ থেকে প্রথমে শ্রীনরেন্দ্র দেব, তারপর শ্রীযোগেন্দ্র গুপ্ত, তারপর "শ্রীঅপর্ণা"র—মানে শ্রীমীরা রায়চৌধুরীর—নাম ঘোষণা করে, শেষের নামটি ভুলে গেলেন। ওঁদের পরিচয় দিলেন, "বঙ্গীয় শিশুসাহিত্য-পরিষদের সদস্য" বলে। আমিও ওঁদের দলভুক্ত (তবে কে জানে অনেক দিন চাঁদা দিই নি বলে খাতা থেকে বর্ত্তমানে নাম কেটে দিয়েচে কিনা)। শেষে আমার অপ্রিয় নামটি তাঁর স্মৃতিপটে উজ্জ্বল

হয়ে উঠলো। বললেন, "আর আমাদের বন্ধু শ্রী...কে একটি পদক দিয়েচেন।" পূর্বের তিন জনের বেলায় দর্শকগণ যেমন খুশি হয়েছিলেন আমার বেলায়ও সেই রকম আনন্দ প্রকাশ করলেন। জনতার প্রশংসা ও শ্রদ্ধাকে আমি জীবনের একটি পরম লাভ বলে মানি। খুশি মনে সাজঘরে এসে দেখি, সেনাপতি মাথার পাগড়ি খুলে ফেলে পরচুলোও খোলবার উপক্রম করচে। তার চোখ ছ'টি রক্তিম। তার অবস্থায় উদ্বিগ্ন হয়ে অন্যের কাছে প্রশ্ন করে জানলাম, "ও নাকি বলচে, আমায় যদি মেডেল না দেওয়া হয় আমি আর প্লে করবো না।" তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। এখন উপায়? এসে দেখি, মহারাণীর মুখখানি দীর্ঘ ও গম্ভীর; তিনি চেয়ারে এলিয়ে পড়েচেন। তখন নক্ষত্ররায়ের কথা মনে পড়লো,—"তাই তো এ কি হ'ল!" সংবাদটি বেতারে প্রেক্ষাকক্ষে ছড়িয়ে গেল। সংসারে সর্বত্রই বদান্য ও রসিক জন আছেন। তারপরই চারধার থেকে একাধিক পদক ঝপাঝপ্ বর্ষিত হয়ে কুশীলবগণের শূন্য কণ্ঠকে উত্তেজিত করে শূন্য হয়ে ঝুলতে লাগলো। এক জায়গায় গুটি কয়েক কিশোর বসেছিল। তারাও বললে, "চল্ রে, আমরাও কয়েকটা মেডেল দিই। আর ক'জনই বা বাকি থাকে কেন?" এমনি করে কেউ ছ'টি, কেউ চারটি, কেউ আটটি, কেউ বা ছ'টি পদক লাভ করে বাকিটুকু অভিনয় করলেন। আমিও একাধিক পদক লাভ করে ভাবাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু মৌচাকের মধু-বিন্দু ছাড়া বাস্তব হয়ে এ পর্যন্ত আর একটিও হাতে আসে নি। আসবার কথাও নয়। কারণ সভায় ঘোষিত পদকের উৎপত্তি ও লয় সভাতেই। দাতা ও গ্রহীতার লাভ নামের অস্থায়ী বিজ্ঞাপনটুকু। বিনা পয়সায় এমন চমৎকার বিজ্ঞাপন আর কিছুতেই হয় না।

যথারীতি বাকিটুকুও শেষ হ'ল। জয়সিংহ নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে ত্রিপুরেশ্বরীর সম্মুখে লুটিয়ে পড়ল। পুরুত ঠাকুর "এ কি করিলি রে!" বলে তার ওপর পড়লেন। আর অপর্ণা জয়সিংহকে খুঁজতে এসে ঐ ভীষণ কাণ্ড দেখে অনেক ভেবেচিন্তে এক পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। এ তার মূর্ছা কি মায়া দর্শকগণই বলতে পারেন। এইখানেই যবনিকা পাত হ'ল। দর্শকগণ যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

এই অবসরে বলে নি, তারপর কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে ভারতের এক নাম-করা নাট্যসংঘের বিসর্জন নাটক অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁদের অভিনয়ের সমালোচনা করবো না; কারণ তাঁরা বিখ্যাত শিল্পী হলেও

"বিসর্জনের" অভিনয়ে যশ অর্জনে সক্ষম হন নি। কিন্তু আমাদের রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য, নক্ষত্ররায়, সেনাপতি, মহারাণী, অপর্ণা ও জয়সিংহকে শখের কোন দলই এ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারলো না। আর জনতার দৃশ্য? ওর উল্লেখ যত না করা যায় ততই ভাল। কারণ সেই বিখ্যাত নাট্য-সংঘ তো অনাবশ্যক বোধে ওটাকে বাদই দিয়েছিলেন। অথচ তাঁরা সাধারণের শিল্পী! এবং সমস্ত ঘটনার মধ্যে ওটারও মস্ত স্থান। অন্যান্য জায়গায় ওটা হয়ে দাঁড়ায় ছ্যাবলামি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনীকে এই দোষ কোনদিন স্পর্শও করতে পারে নি।

পরিশেষে মার্জনা ভিক্ষা করি বিশেষ করে আমার সহকর্মিগণের কাছে। তাঁরা বরাবরই আমার প্রতি স্নেহশীল। স্নেহবশে তাঁরা আমার দোষ-ত্রুটি এতটা উপেক্ষা করে এসেচেন যে এই রচনায় তাঁদের নিয়ে হাস্য-পরিহাস করবার মতো ধৃষ্টতাও আমার ঘটেচে। ভরসা আছে, অতঃপর তাঁদের সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, শীতল স্নেহধারা সমভাবেই আমার প্রতি বর্ষিত হবে। আর পাঠকপাঠিকাগণ যে আমার রচনাটি পাঠে আনন্দলাভ করচেন এবং সে কথা অনেকেই পত্রযোগে সম্পাদক মশাইকে জানিয়েচেন, এজন্য যে আমি কতটা উৎসাহিত, আনন্দিত ও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ তা লিখে প্রকাশ করতে পারবো না।

এইখানে সকলকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে দর্শকগণের সঙ্গে আমিও নিষ্ক্রান্ত হলাম।

—শেষ—

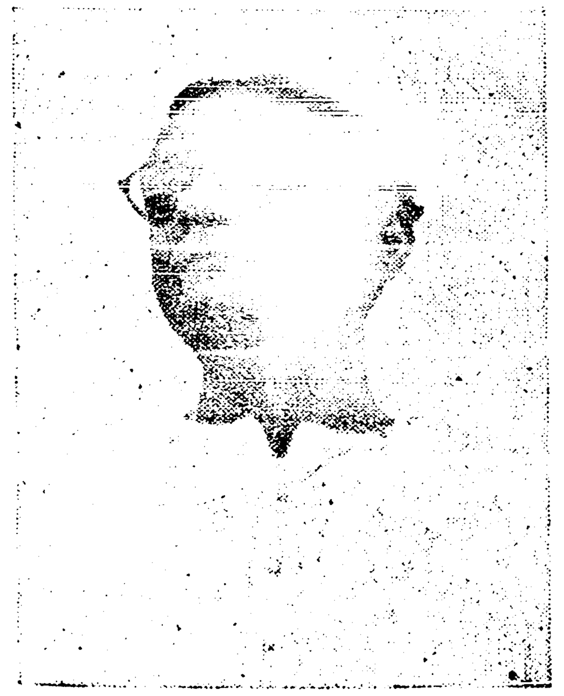

"জনৈক পুরবাসী"—তাঁর আত্মপরিচয় গোপন ক'রে এতদিন 'বিসর্জনের' অন্দর-মহলের কাহিনী শুনিয়েছেন। লেখাটি পড়ে পাঠকপাঠিকাদের অনেকেই তাঁর পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করায় লেখাটি শেষ হ'লে তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে রাজী করানো গিয়েছিল। প্রতিশ্রুতি মত এবারে তাই তাঁর আসল নামই শুধু নয়, পাশে আসল ছবিও প্রকাশ করা হ'ল। ইনি রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিত, শিশুসাহিত্যের বিখ্যাত লেখক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

রাসায়নিক ভূত

অধ্যাপক শ্রীস্বুবর্ণকমল রায়

সে বহুদিনের কথা নয়, একবার একটি সভ্য প্রস্তুত জার্ম্মান জাহাজ বহু যাত্রী সহ আটলাণ্টিক সাগর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। যাত্রীরা আনন্দে উৎফুল্ল। জাহাজটি যেমন সম্পূর্ণ নূতন, তেমনি আধুনিক আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। কোথাও একবিন্দু ত্রুটি নাই। দুইদিন জলযানটি পূর্ণবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তৃতীয় দিনে হঠাৎ একটা ভীষণ আওয়াজ হইল। যাত্রীরা ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল। কোন বিপদ্ ঘটিল কি? হ্যাঁ, বিরাট বয়লার ফাটিয়া গিয়াছে, জাহাজ আর রক্ষা পাইবে না। দেখিতে দেখিতে যাত্রী ও কর্ম্মচারী সহ জাহাজখানি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল।

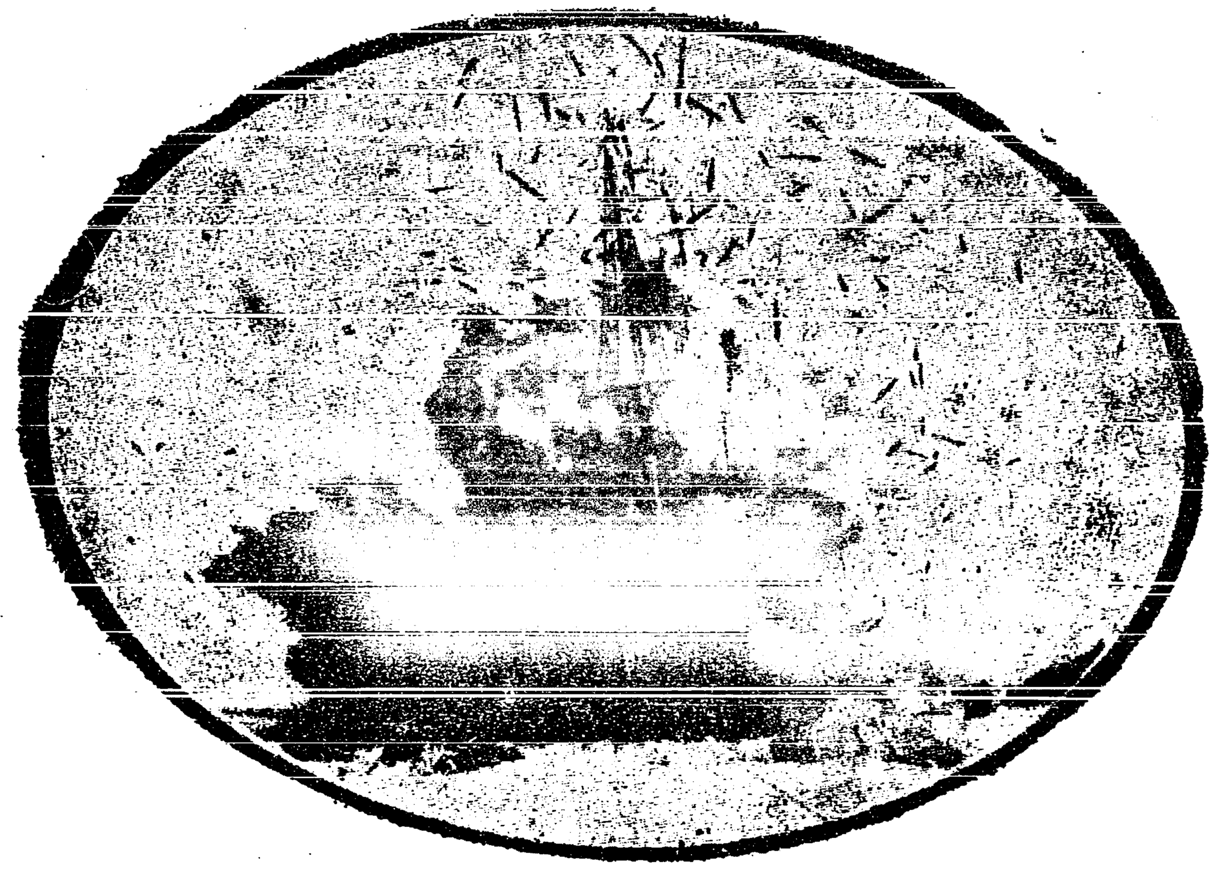

জাহাজে যখন বিস্ফোরণ হয়......

এদিকে বার্লিনে হুলস্থুল আরম্ভ হইয়াছে। যাত্রীদের আত্মীয়স্বজন এই অসম্ভব পরিণতিতে মর্ম্মাহত হইয়া সরকারের দ্বারস্থ হইলেন। সরকার জাহাজ-ডুবির কারণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন এবং জাহাজটিকে উদ্ধার করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। বহু চেষ্টার পর ইহাকে উদ্ধার করিয়া দেশে আনা হইল এবং বহু এঞ্জিনিয়ার ও যান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ ইহার দোষ-ত্রুটি বিচারে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু কেহই জাহাজ-ডুবির কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। এরূপ নিখুঁত জাহাজ, কোথাও কোন ত্রুটি নাই, কেন এরূপ হইল সকলে ভাবিয়া ক্লান্ত। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন ছিলেন রসায়নী—কেমিষ্ট। ইনি চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বয়লারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল বয়লারের এক কোণে কয়েক টুকরা দস্তা পড়িয়া আছে। রসায়নী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ঐ দস্তাই এই বীভৎস কাণ্ড ঘটাইয়াছে। দস্তা উত্তপ্ত জলসংযোগে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী করিয়াছে, এবং দুইদিনের সঞ্চিত এই

হাইড্রোজেন গ্যাসই বায়ু ও উত্তাপ সংযোগে বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। অনুসন্ধান-সভা এতদিনে জাহাজ-ডুবির কারণ খুঁজিয়া পাইলেন। পরে জানা গেল জাহাজের মিস্ত্রিগণ বয়লারের ভিতরে কাজ করিবার সময় ভুলক্রমে কয়েক টুকরা দস্তা ভিতরে ফেলিয়া গিয়াছিল।

এরূপ বহু আশ্চর্য্য দুর্ঘটনার কারণ রসায়নী উদ্ধার করিয়াছেন। বিলাতের কোনও একটি রাসায়নিক কারখানার একটি ঘটনা। একদিন দিনের শেষে কারখানা যখন বন্ধ হয় তখন দেখা গেল একটি লোকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সমস্ত কারখানা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, কোথাও তাহার চিহ্ন নাই! দরোয়ানেরা সাক্ষ্য দিল তাহারা তাহাকে বাহিরে যাইতে দেখে নাই। লোকটি একত্র কারখানায় ঢুকিয়াছে, কিছুক্ষণ একত্র কাজও করিয়াছে, তবে শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গেল? এ যে ভৌতিক কাণ্ড! তখন কর্ত্তৃপক্ষ উঁহার কাজের সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সন্ধান করিতে করিতে একটি মইএর নিকট আসিয়া তাঁহারা থামিয়া গেলেন। ঐ মই বাহিয়া উপরে

একটি আধুনিক বিরাট রাসায়নিক কারখানা :—দুর্ঘটনা এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার

উঠিলে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা বা ভাণ্ডের পাশে পৌঁছান যায়। ঐ ভাণ্ডে ফুটন্ত সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড থাকে। লোকটি এই মই বাহিয়া উপরে উঠিয়াছিল বলিয়া জানা গেল। তারপর আর তাহাকে কেহ দেখে নাই। প্রধান রসায়নী সঙ্গে ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, লোকটি ঐ এসিডের মধ্যে পড়িয়া যায় নাই ত'? যদি তাহাই হয় তবে তো নিশ্চিহ্ন হওয়ারই সম্ভাবনা। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসায়নিক বিশ্লেষকগণকে ডাকিয়া ঐ এসিড পরীক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ ভদ্রলোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিল না। গোটা মানুষটা এরূপ ভাবে অদৃশ্য হয়—তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। বিষম সমস্যা! ভদ্রলোকটি ত' গেলই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত সঞ্চিত অর্থও যাওয়ার মধ্যে। রসায়নী কিন্তু ছাড়িবার পাত্র ন'ন, তিনি দিবারাত্র বিশ্লেষণ চালাইলেন। অবশেষে দেখা গেল ফুটন্ত এসিডের মধ্যে মোটামুটি একটি পূর্ণ মনুষ্যদেহের যাবতীয় উপাদান বর্ত্তমান আছে। ইন্-

সিওরেন্স কোম্পনীর আর এবার আপত্তি করার সাধ্য রহিল না। রসায়নীয় চেষ্টায় ভদ্রলোকের পরিবার রক্ষা পাইল।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা আরও যে কত প্রকার বিপর্য্যয় হইতে পারে তাহা কল্পনাতীত। বিলাতের কোনও এক পটাসিয়াম ক্লোরেট প্রস্তুতির কারখানায় একবার একটা ভীষণ বিস্ফোরণ হইয়া কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমতঃ সকলেই বিফলমনোরথ হন। হাজার হাজার থলিয়া ভর্ত্তি করিয়া পটাসিয়াম ক্লোরেট্ সদাসর্ব্বদা একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় জমা থাকিত। কোন দিন কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বদাই অতি সতর্কতার সহিত সেখানে যাতায়াত করিত। কি করিয়া এরূপ অসম্ভব ব্যাপার ঘটিল? বহুদিন চেষ্টার পর রসায়নী ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিলেন। একস্থানে কতকগুলি থলিয়া অনেক দিন পড়িয়া থাকাতে ক্রমশঃ একটু ভিজা সেঁতসেঁতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সেখানে পচন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাধারণতঃ তাপবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই তাপ একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া পটাসিয়াম ক্লোরেটে সংক্রমিত হয়, এবং তাহাতেই ভীষণ বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। হাজার হাজার টন ক্লোরেটে অগ্নিসংযোগ হইলে কি বীভৎস কাণ্ড হইতে পারে তাহা একমাত্র রসায়নীই কল্পনা করিতে পারেন। বিশাল বিশাল অট্টালিকাগুলি শূন্যগর্ভে উড়িয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা।

১৯২১ সনে জার্ম্মানীতে এরূপ একটি দুর্ঘটনা ঘটে। হাজার হাজার টন এমোনিয়াম নাইট্রেট্-পূর্ণ একটি গুদাম হঠাৎ ভীষণ শব্দ করিয়া শূন্যগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। শুনা যায় ইহাতে ১০০ মাইল ব্যাপী ধ্বংসলীলা মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। প্রায় ৫০০ মানুষ ও ১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়।

রাসায়নিক ভৌতিক কাণ্ড আমাদের দেশেও অনেক ঘটিয়া থাকে। শীতের দিনে অনেক সময় আঁতুড় ঘরে দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। প্রসূতি অগ্নি জ্বালাইয়া শিশুসন্তান সহ ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া আছেন; পরদিন দেখা গেল শিশুটি মরিয়া আছে। মা কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন দৈবের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া জননীকে সান্ত্বনা দিলেন। ঘটনার পেছনে যে একটি রাসায়নিক চক্রান্ত বর্ত্তমান তাহা আমাদের জানা নাই। আমরা সবই দেবতার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বসিয়া আছি। মানুষের চেষ্টা বা সাধনায় যে দেবতাও পরাস্ত হন ইহা আমরা কবে বুঝিব? মানুষ অক্সিজেন গ্যাস ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না। দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘরে শুইলে—বিশেষতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শুইলে, সেই অক্সিজেনকে অতি সত্বর বনবাস দেওয়া হয়। উপরন্তু কার্বন মন্অক্সাইড নামক বিষাক্ত গ্যাস তৈরী করা হয়। কাজেই দুর্ঘটনা স্বাভাবিক।

যাভা দ্বীপে মৃত্যু-উপত্যকা নামে একটি উপত্যকা আছে। জঙ্গলময় বিরাট পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকাটি আজও বিরাজমান। সেখানে বিবিধ প্রাণী—বাঘ, ভালুক, পাখী—এমন কি মনুষ্য-কঙ্কালও পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ঐ উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই, অমনি দম বন্ধ হইয়া মৃত্যু। পার্ব্বত্য জাতি এই ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়া ঐ দিকে যায় না। আজ কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে উক্ত মৃত্যুবাণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কোনও অজ্ঞাত সূত্র

ধরিয়া বহুদিন যাবৎ উক্ত উপত্যকার মধ্যে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড আসিয়া জমিয়া আছে। ইহা অক্সিজেন হইতে বহু ভারি, কাজেই গর্ত্ত পাইলে অক্সিজেনকে তাড়াইয়া দিয়া সেখানে বসবাস করে। মৃত্যু-উপত্যকাতেও উক্ত গ্যাসেরই খেলা।

উক্ত গ্যাসটি বায়ু হইতেও অনেক ভারী এবং এজন্য ইহা যে পৃথিবীর নিম্নস্তরে বাস করে তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। এই নিম্নভূমিতে বাস হেতু ভৌতিক কাণ্ডের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইটালিতে নেপল্স্ নগরের নিকটে একটি স্থান আছে। সেখানে ২-৩ ফুট উচ্চতার অতিরিক্ত উচ্চতাবিশিষ্ট প্রাণীরা অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু বিড়াল, কুকুর জাতীয় ক্ষুদ্রাকার প্রাণীরা ঐ স্থানে যাওয়া মাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ স্থানের তিন ফুট্ উচ্চ পর্য্যন্ত হাওয়াটা একমাত্র কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডের হাওয়া। কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে উহা ওখানে আসিয়া জমা হইয়াছে। এ যাত্রা মানুষ রক্ষা পাইয়াছে, ভূতগুলির দৃষ্টি যেন একমাত্র পশুদের উপরই পড়িয়াছে! শুষ্ক কূপ, পরিত্যক্ত বাড়ী প্রভৃতি অনেক স্থানে এরূপ অঙ্গার-গ্যাসের লীলার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা ছেলেবেলা হইতে আলেয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছি। মাঠে ঘাটে রাত্রিতে ইহা প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে। সাধারণ মানুষ ইহাকে আজও ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে করে। আলেয়াও যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। গাছপালা, লতাপাতা পচিয়া একপ্রকার গ্যাস উৎপন্ন হয়, উহা সাধারণ তাপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দান করে। রাত্রিতে উহাই আমাদের নিকট ভীতিপ্রদ আলেয়া।

ভূত আছে কি নাই আমি জানি না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ মানুষের পক্ষে সবই ভূতের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া উচিত নয়।

মহাকালের পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—তিন—

অসুস্থ আচার্য্য ভর্তৃর সবল ধাক্কা সামলাতে পারলেন না; তার উপর বৃষ্টিতে পাথর-বাঁধানো চত্বর পিচ্ছিল হয়ে ছিল, একেবারে সটান্ পড়ে গেলেন। শিষ্য তাড়াতাড়ি এসে ধরলো। গায়ে হাত দিয়েই বললো—ইস্, গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

আচার্য্য ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, বললেন,—আমার কাল সমাগত কাত্যায়ন, আজ আমার অশীতি বৎসর হ'ল।

কাত্যায়ন সে কথা কানে তুললো না, বললো,—আপনি আমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্থন, সামনের ওই বটগাছটার তলায় গিয়ে আমরা আশ্রয় নিই।

তখনও ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, কাত্যায়নের কাঁধে ভর দিয়ে আচার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। সামনে বটগাছটি পর্য্যন্ত পৌঁছতে তাঁদের সর্বাঙ্গ সিক্ত হয়ে গেল।

আচার্য্যকে গাছতলায় বসিয়ে কাত্যায়ন উত্তরীয় ছিঁড়ে তাঁর বাহুর ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। উত্তরীয় দিয়ে তাঁর গা মুছিয়ে দিল। আচার্য্য একটু সুস্থ বোধ করলেন। কাত্যায়ন বললো—উগ্রসেনের মধ্যে কিছুটা মনুষ্যত্ব আছে বলে মনে করতাম, কিন্তু···

আচার্য্য হাসলেন, বললেন,—মাতা ক্ষত্রিয়, পিতা ক্ষৌরকার, জাতিতে সঙ্কর, তার উপর সারাটা জীবন যে দস্যুবৃত্তি করে কাটালো তার কাছ থেকে আর কি মনুষ্যত্ব আশা করবে কাত্যায়ন? তবে এই মানুষটির সঙ্গে তোমার ভাগ্যও জড়িত, এ কথা তুমি মনে রেখো, এই তোমার বিধিলিপি।

—তা হলে আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে বলুন?

—সে তোমার অদৃষ্ট কাত্যায়ন! তবে যদি সত্যই কোন দিন তেমন সঙ্কটে পড় আমার এই কবচটি রেখো, এর ভিতরে ভূর্জপত্রে রক্ষামন্ত্র আছে, সেই সময় এই মন্ত্র খুলে পাঠ ক'রো, রক্ষা পাবে।

আচার্য্য নিজের বাহু থেকে একটি কবচ খুলে কাত্যায়নের বাহুতে পরিয়ে দিলেন।

কাত্যায়ন বললো—আমরা কি সম্রাট্‌কে রক্ষা করতে পারি না?

—না। এ বিধির নির্বন্ধ। উগ্রসেন মগধের সিংহাসনে বসবে। এ কথা ভেবে দুঃখ করে কোন লাভ নেই কাত্যায়ন!

মুষল ধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে। আচার্য্যদেব চুপ করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবেন, তারপর বলেন,—এখানে আর কালক্ষেপ করা তোমার পক্ষে অনুচিত কাত্যায়ন! তোমার একটা বড় কর্ত্তব্য আছে, প্রাসাদ থেকে যুবরাজকে সরিয়ে আনতে হবে, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার।

—প্রাসাদ থেকে যুবরাজকে সরিয়ে আনবো!

—হ্যাঁ, এ কাজ তোমাকেই করতে হবে, তুমিই পারবে! এখনি তুমি যাত্রা কর।

—আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে···

—আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমার অশীতি বৎসর পূর্ণ হবে, তারপর আর আমার পরমায়ু নেই। কিন্তু সেই সময় পর্য্যন্ত তুমি যদি এখানে অপেক্ষা কর, তা হলে রাজকুমারের জীবন রক্ষা করতে তুমি পারবে না, উগ্রসেন তোমাকে অশেষ-বিশেষ ভাবে পীড়ন করবে, আমার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। তুমি যাও।

কাত্যায়ন ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

আচার্য্য বললেন,—মনে রেখো, মগধে আমার সমকক্ষ জ্যোতিষী একজনও নেই, আমার গণনায় ভুল হয় না। তুমি যাও, আর বিলম্ব করো না।

—কিন্তু

—আমার আদেশ, তুমি যাও···

গুরুর আদেশ। কাত্যায়ন আচার্য্যকে প্রণাম করলো। আচার্য্য বললেন,—শীঘ্র এখানে আসার আর চেষ্টা ক'রো না, আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না। আমার শেষ আশীষ রইল তোমার উপর। জয়স্তু! ভগবান্ তোমার কল্যাণ করুন।

আচার্য্যকে আবার প্রণাম করে কাত্যায়ন সেই দুর্য্যোগের মাঝে যাত্রা সুরু করলো।

আচার্য্য গাছতলায় বসে ছিলেন। বৃষ্টির জলধারা তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। জলধারার স্নিগ্ধতা তাঁর দেহ কিছুটা যেন শক্তিমান্ করে তুললো। কিছুক্ষণ মন্দিরের পানে তাকিয়ে তিনি কি যেন ভাবলেন, তারপর উঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন মন্দিরের পানে।

মন্দির-দ্বার ভেজানো ছিল, আচার্য্য দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ভিতর থেকে উগ্রসেনের স্বর তাঁর কানে এলো। সম্রাটের সঙ্গে তার কথা হচ্ছে।

উগ্রসেন বললো,—আমি চাই মগধের সিংহাসন। মগধের রাজকন্যা এক ক্ষৌরকারকে বিবাহ করেছিল, সেই অপরাধে তাঁকে সারাজীবন কম লাঞ্ছনা সইতে হয় নি। তাঁর পুত্রকেও মগধসম্রাট্ মানুষের সাধারণ অধিকারটুকুও দেয় নি,

জীবিকা অর্জনের জন্য তাকে হতে হয়েছে দস্যু। সেই দস্যু মহাপদ্ম আজ প্রমাণ করে দেবে যে ক্ষত্রিয় ও ক্ষৌরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—রাজ্য পরিচালনায় জন্ম কোন কাজে লাগে না।

সম্রাট্ বললেন,—পিতা যা করেছিলেন পুত্র কি তার জন্য দায়ী হবে?

—পিতার রাজ্য পুত্র গ্রহণ করে, পিতার বংশগৌরব পুত্র পায়, পিতার কুষ্ঠ রোগ পুত্রে বর্তায়, তা হ'লে পিতার কৃত কর্মের জন্য পুত্র প্রায়শ্চিত্ত করবে না কেন?

—তোমাকে যদি দশ লক্ষ স্বুবর্ণ দিই?

—কোটি স্বুবর্ণ দিলেও না। যে ক্ষৌরকারের শিল্প-প্রতিভা সমগ্র মগধের জনগণের মাঝে একদিন খ্যাতিলাভ করেছিল, মগধসম্রাটের এক নির্দেশে তরুণ বয়সেই তাঁকে নির্জন বনবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। দশ লক্ষ স্বুবর্ণ দিলে সেই শিল্পীকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে? যে রাজকন্যা বিলাসী রাজপুত্রের চেয়ে প্রতিভাবান্ শিল্পীকে বড় বলে মনে করেছিলেন, শিল্পীর গলায় বরমাল্য দেওয়ার জন্য অপমান ও দারিদ্র্যের মাঝে বনবাসে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, দশ লক্ষ মুদ্রা দিয়ে তাঁকে কি আবার ফিরে পাওয়া যাবে?

—আমি যদি তোমাকে মগধের মহামাত্য করি?

—না, অমি ক্ষত্রিয়ের সেবক হব না, সম্রাট্ হয়ে আমি ক্ষত্রিয়কে সেবক নিযুক্ত করবো।

—তুমি শাস্ত্র ও সংহিতাকে উপেক্ষা করে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করতে চাও, কিন্তু এর ফল তো শুভ হবে না।

—উপস্থিত আমার পক্ষে অশুভ তো কিছু চোখে পড়ছে না। তবে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে বিশেষ অশুভ বটে। ক্ষৌরকারপুত্র মগধের সিংহাসনে বসলে ক্ষত্রিয় সামন্তদের জাত্যাভিমানে আঘাত পড়বে।

— সমস্ত ক্ষত্রিয় সামন্তেরা বিদ্রোহ করলে তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে?

— না পারি যুদ্ধ করে মরতে তো পারবো।

—সিংহাসনের লোভে অনিবার্য্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সিংহাসনের ছায়ায় নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে জীবনটাকে ভোগ করাই কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়?

—না, ভোগ করলে শ্রেষ্ঠ ভোগ করাই উচিত। যে ভোগের মধ্যে বিপদ নেই, সে ভোগের মধ্যে আনন্দও নেই।

কয়েক মুহূর্ত্ত সব চুপচাপ।

আবার উগ্রসেনের গলা শোনা গেল,—ভর্তু!

—একটু মধু খেয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নিলাম সর্দার!

— এখানে আর তো বিলম্ব করা চলে না।

— সব প্রস্তুত সর্দার, শুধু মহারাজকে স্নান করিয়ে আনলেই হয়।

— যা করবে সত্বর কর।

আচার্য্য আর সেখানে দাঁড়ালেন না, নিঃশব্দে মন্দিরের চত্বর থেকে নেমে এসে কূপের পাশে একটি গাছতলায় এসে দাঁড়ালেন। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, আচার্য্যের সর্বদেহ সিক্ত। কিন্তু নিজের অসুস্থতার কথা তিনি তখন ভুলে গেছেন, কি করে সম্রাট্কে রক্ষা করা যায় সেই কথাই তিনি চিন্তা করছেন।

ভর্তু আরো দু'জনের সঙ্গে মগধ-সম্রাট্কে নিয়ে বাহির হয়ে এলো। সম্রাটের হাত দু'টি পিছ-মোড়া করে বাঁধা। কূয়াতলায় এসে ছুরিকা দিয়ে একজন দস্যু তাঁর দেহ থেকে রাজপোষাক কেটে ফেলে দিল, তার পর কূয়া থেকে জল তুলে তাঁকে স্নান করাতে স্বুরু করলো।

আচার্য্যদেব কত কি ভাবছিলেন, সহসা গাছতলায় একটি পাথর পড়ে থাকতে দেখে তিনি যেন একটা পথ খুঁজে পেলেন। ভর্তু স্নানশেষে মহারাজের গা মুছিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় আচার্য্য গাছতলা থেকে সেই পাথরখানি তুলে নিয়ে ভর্তুর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। পাথরখানির ওজন বড় কম ছিল না, ভর্তুর পিঠের উপর প্রকাণ্ড পাথরখানি পড়তেই ভর্তু 'আক্' করে ঘুরে পড়ে গেল, তার সঙ্গীরা চমকে উঠলো। আচার্য্যদেব গাছতলা থেকে বাহির হয়ে এসে সাড়া তুললেন—আঁ আঁ আঁ—ভুঁখা হুঁম্ হুঁম্!

—ভূত!—ভর্তুর সঙ্গীরা ছিটকে সরে গেল।

ছুরিকাখানি ভর্তুর কোমরবন্ধে ঝুলছিল, আচার্য্যদেব সেটি টেনে নিলেন, সম্রাটের হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে বললেন—যান সম্রাট্, আপনি মুক্ত!

ছুরিকাখানি সম্রাটের হাতে তিনি তুলে দিলেন।

ভর্তুর সঙ্গী দু'জন একটু তফাতে সরে গিয়েছিল, এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, তেড়ে এলো তাঁদের দিকে। সম্রাট্ আর অপেক্ষা করলেন না, ছিটকে পড়লেন অন্ধকারে।

ভর্তুর সঙ্গী দু'জন চীৎকার করে উঠলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো আচার্য্যদেবের উপর। আচার্য্যদেব অসুস্থ দেহে এতক্ষণ শুধু একটা উত্তেজনার প্রাবল্যে কাজ করছিলেন, ভর্তুর সঙ্গীদের ধাক্কা খেয়ে তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন; আর উঠলেন না।

চীৎকার শুনে মন্দিরের ভিতর থেকে উগ্রসেন বাহির হয়ে এলো। পিছনে ছুটে এল তার অনুচরেরা। * (ক্রমশঃ)

* গ্রীক বিবরণ, জৈন ও বৌদ্ধ কাহিনী হতে জানা যায় যে উগ্রসেন নন্দের পিতা ছিলেন একজন ক্ষৌরকার। মগধসম্রাট্ কাকবর্ণ মহানন্দীকে হত্যা করে তিনি মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু পুরাণ এ কথা বলে না। অনেকের মতে নন্দের শত্রুর অভাব ছিল না, তারাই নন্দের সম্পর্কে এইসব কুৎসা রটনা করে—নন্দ মহানন্দীকে হত্যা করে নি। এই সম্পর্কে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য এণ্ড হিজ টাইম্‌স্' ও শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুর 'পুরাণ প্রবেশ' পঠিতব্য। —লেখক।

সোনার বালুচরে

শ্রীঅশোক সেন, এম্. এ

—নয়—

উইলের কথা শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠলুম।—"এখন আর আপনাকে ঠাট্টা করতে পারি নে। সত্যি, লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয়। কিন্তু ছাগলের সঙ্গে জলদস্যুর কোন সম্বন্ধ আছে এ কথা আপনিও বলতে পারবেন না।"

"কিন্তু তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি ওটা ছাগলের নক্সা নয়।"

"ছাগলের না হোক, ছাগলের বাচ্চার তো?—ও একই কথা।"

উইল জবাব দিলেন—"না, ঠিক এক নয়। বিখ্যাত জলদস্যু কাপ্তেন কিডের নাম শুনেছ তো? তখুনি বুঝলুম, জন্তুটাকে কাপ্তেন কিডের সইয়ের সাংকেতিক মূর্ত্তি বলে ধরা হয়েছে। ওটা যে সই তাতে কোন ভুল নেই। যে জায়গায় ওটা রয়েছে তা থেকে তাই মনে হয়। উল্টোদিকে কোণে খুলিটা ঠিক একই কারণে স্ট্যাম্প বা সীল বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু ভিতরে আর কিছু লেখা না দেখে আমি দমে গেলুম। ভিতরের লেখা বের করতে না পারলে সে দলিলের গোপন কথাই তো জানা সম্ভব হবে না।

"কাপ্তেন কিড্ ও তাঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে হাজারো গল্প ও গুজব শুনে থাকবে। তারা অতলান্তিকের তীরে কোন জায়গায় ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত—সে কথা তো এদিকে সবাই জানে। এ সম্বন্ধে যে-সব গল্প আছে তাতে কিছুটা সত্য আছে বলে আমার মনে হয়েছিল। তা ছাড়া এতদিন ধরে এ সব গল্প লোকের মুখে মুখে আজ পর্য্যন্তও চলে আসছে; এ-থেকে আমি অনুমান করলুম, সে সব ধনরত্ন এখনো হয়তো মাটির নীচেই রয়ে গেছে। কিড্ যদি তাঁর ধনদৌলত কিছুদিনের জন্যে লুকিয়ে রেখে পরে তা তুলে নিয়ে যেতেন তা হলে তাঁর সম্বন্ধে গল্পগুলি ঠিক একভাবে এতদিন ধরে চলে আসত না। একটা কথা ভেবে দেখো, যারা সেই গুপ্তধনের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে—তাদের কথা নিয়েই গল্পগুলি চলতি ছিল। কিন্তু সে-ধন খুঁজে পাবার কথা কিন্তু কখনো শোনা যায় নি। আমার মনে হয়, কোন দুর্ঘটনার ফলে কিড্ তাঁর ধনদৌলত উদ্ধার করতে পারেন নি। এমনও তো হতে পারে, পার্চমেণ্টখানা হারিয়ে যাওয়াতে সে জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারেন নি! কাজেই, প্রায় অসম্ভব হলেও, একটা অদ্ভুত দুরাশা আমার মনে জেগে উঠল। পার্চমেণ্টের ভিতরকার রহস্য বার করতেই হবে।

"আবার আমি পার্চমেণ্টখানা আগুনের সামনে ধরলুম, উত্তাপও বাড়িয়ে দিলুম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। তখন ভাবলুম ময়লার জন্যে হয়তো এ রকম হচ্ছে। পার্চমেণ্টখানাকে সামান্য গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিলুম; তারপর খুলির দিকটা উপুর করে সেটা একটা টিনের পাত্রের ভিতরে রেখে জলন্ত উনুনের উপর চাপিয়ে দিলুম। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাত্রটা খুব গরম হ'ল,—তারপর পার্চমেণ্টখানা উঠিয়ে যা দেখলুম তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। সমস্ত লেখাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কি লেখা আছে তা তোমায় এখুনি দেখাচ্ছি।"

উইল পার্চমেণ্টখানাকে নিয়ে এলেন, তারপর সেটায় আবার উত্তাপ দিয়ে আমায় দেখতে দিলেন। দেখলুম, নীচের চিহ্ন ও সংখ্যাগুলি খুলি ও ছাগলের মাঝখানে সাজানো রয়েছে :—

53‡‡†305))6*; 4826)4‡.
)4‡);80t*;48†8¶60))85
;1‡(;:‡*8†83(88)5*†;46
(;88*96*?;8)*‡(;485);5
†2:‡(;4956*2(5*—4)8¶
8*;4069285);)6†8)4‡‡;1
(‡9;48081;8:8‡1;48†85
;4)485†528806*81(‡9;48

;(88;4(‡?34;48)4‡;161
;:188;‡?;

আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে সেটা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লুম—"আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমায় যদি কেউ বলে, এই হেঁয়ালির অর্থ খুঁজে বের করতে পারলে গোলকুণ্ডার সমস্ত মণিমুক্তা আমায় পুরস্কার দেওয়া হবে, বেশ বুঝতে পারছি, তা হ'লেও আমার ভাগ্যে সে ধন জুটবে না।"

"হঠাৎ দেখলে লেখাটা যতটা শক্ত বলে মনে হয় আসলে তা নয়। বুঝতেই পারছ, সংখ্যা ও চিহ্নগুলি কতকগুলি কথার সংকেত। কাপ্তেন কিড্ সম্বন্ধে আমি যতটা জানি, খুব বেশী জটিল সাংকেতিক লেখা তৈরী করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বুঝলুম, এ-লেখা সহজই হবে। অশিক্ষিত নাবিকদের কাছ থেকে গোপন রাখবার জন্য যতটা জটিল করা দরকার তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।"

"তা হ'লে আপনি ওটা পড়তে পেরেছেন?"

"তখুনি পেরেছি; এর চেয়ে ঢের বেশী জটিল হেঁয়ালির সমাধান আমি করেছি। বরাবরই আমার এ সব দিকে একটু ঝোঁক আছে, আর তা ছাড়া মানুষ যে হেঁয়ালি তৈরী করেছে, মানুষের বুদ্ধি দিয়ে তার সমাধান করা যাবে না—এ হতে পারে না; অবশ্য সে জন্যে যথেষ্ট ধৈর্য্য ও চেষ্টা চাই। লেখাটি যখন একবার পড়তে পেরেছি, তখন তার অর্থ বের করা যে কঠিন হবে না, তা বোঝা যায়।

"এ সব সাংকেতিক লেখা পড়তে হলে প্রথমেই বের করতে হবে সেটা কোন্ ভাষায় লেখা আছে, কেননা হেঁয়ালির, বিশেষ করে সহজ ধরণের হেঁয়ালির সমাধান করা অনেকখানি নির্ভর করে সেই ভাষার উপর। যতগুলি ভাষা জানা আছে তার সাহায্যে আন্দাজ করেই সেটা বের করতে হবে। তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ চিঠিখানা কোন্ ভাষায় লেখা নীচের সই থেকে তা অনুমান করা সহজ। ছাগ-শিশুর ইংরেজি হ'ল কিড্। এ থেকে আমার বুঝতে দেরী হ'ল না ওটা কিড্ নামের সংকেত। ইংরেজি ভাষাতেই "কিড্" কথাটা ঐ রকম দুই ভাবে ব্যবহার করবার অর্থ বোঝা যায়। কাজেই ধরে নিলুম চিঠিখানি ইংরেজিতে লেখা।

"একটা জিনিষ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, বিভিন্ন শব্দের মধ্যে কোন ফাঁক নেই। তা যদি থাকত, আমাদের কাজ আরও সহজ হ'ত। তা হ'লে ছোট শব্দগুলি একত্রে রেখে, মিলিয়ে ও বিশ্লেষণ করে শুরু করতে পারতুম। আর যদি এক অক্ষরের কোন শব্দ পেতুম—যা থাকবার খুব সম্ভাবনা (যেমন, A কিংবা I), তা হ'লে তো কথাই ছিল না। কিন্তু শব্দের মাঝখানে ফাঁক না থাকায় আমার প্রথম কাজ হ'ল সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত অক্ষরগুলি খুঁজে বের করা। গুণবার পর তালিকাটি অনেকটা এই রকম দাঁড়াল:—

8	আছে	৩৩ বার
;	"	২৬ "
4	"	১৯ "

‡)	"	১৬ "
*	"	১৩ "
5	"	১২ "
6	"	১১ "
(	"	১০ "
† 1	"	৮ "
0	"	৬ "
9 2	"	৫ "
: 3	"	৪ "
?	"	৩ "
¶	"	২ "
— .	"	১ "

এর থেকেই আমাকে বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করতে হবে। কি ভাবে এবারে বলি।"

(ক্রমশঃ)

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—চৌদ্দ—

এবারে আবার ক্রুসোর পালা। সমস্ত শক্তি একত্রিত ক'রে ক্রুসোও দড়ির শেষ প্রান্তটা ধরে সজোরে টান লাগালো। ডিক এবার ছোট দড়িটা ছেড়ে দিয়ে

বড় দড়িটা ধ'রে টানতে শুরু করলো। এতে ফল হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁসটা ঘোড়ার গলায় চেপে বসলো এবং সে দম আটকে নির্জ্জীবের মতো প'ড়ে গেলো।

তখন ডিক একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে ঘোড়াটার পায়ের বাঁধন খুলে দিলো। তারপর তার পিঠে চেপে বসে তার চোয়ালে বাঁধা ছোট দড়িটা লাগামের মত ক'রে বাগিয়ে ধরলো। তারপর ক্রুসোকে বড় দড়িটা ছেড়ে দিতে আদেশ দিয়ে আলগা করে দিলো ফাঁসটা। ফাঁসটা আর কিছুক্ষণ গলায় থাকলে ঘোড়াটার শ্বাসরোধ হ'তো।

দু'য়েকটা লম্বা নিঃশ্বাস নিতেই ঘোড়াটা সুস্থ হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একলাফে উঠে দাঁড়ালো। ডিকও বেশ শক্ত হয়ে ওর পিঠে চেপে বসলো।

তারপর যা শুরু হলো তা' বর্ণনার অতীত। বনের স্বচ্ছন্দগতি, স্বাধীনচেতা ঘোড়ার পক্ষে পিঠে এ রকম বোঝা বহন করা অসহ্য। ডিককে ফেলে দেবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ডিকও নাছোড়বান্দা। শেষ শক্তি পর্য্যন্ত নিয়োজিত করে সে ঘোড়ার পিঠ আঁকড়ে ব'সে রইল। ঘোড়াটা কখনো পেছনের দু'পায়ে ভর ক'রে সোজা দাঁড়িয়ে উঠলো, কখনো বা সামনের দু'পায়ে ভর ক'রে উঠে ডিককে ফেলে দেবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো। তাতেও সফল না হয়ে সে পাগলের মত লাফাতে লাফাতে চীৎকার করে উঠলো। তারপর প্রায় আধঘন্টা ধ'রে বাতাসের বেগে ধেয়ে চললো। তার কষ বেয়ে সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

এতক্ষণে যেন ঘোড়াটার শক্তি একটু ক'মে আসছে। আরো প্রায় ঘণ্টা দুই ধ্বস্তাধ্বস্তির পর এক সময়ে থেমে দাঁড়ালো ঘোড়াটা। তখন ডিক ক্রুসোকে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে ইঙ্গিত করলো, যাতে ঘোড়াটা তাকে দেখে ভয় পেয়ে না যায়। তখন সে তার পিঠ থেকে নামলো। ঘোড়াটার মাথা চাপড়ে তার কানে কানে ফিসফিস ক'রে কথা বললো। তারপর তাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে খুব খানিকক্ষণ ধ'রে দলাই-মলাই করলো। তারপর ঘোড়াটাকে সেখানে চরবার জন্য ছেড়ে দিয়ে ক্রুসোর কাছে ফিরে গেলো।

খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে ডিক বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লো। এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘোড়াটাকে যে বশে আনতে পেরেছে এই আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো সে।

মাস্তাং উপত্যকার এক বন্ধুর নাম অনুসারে ডিক ঘোড়াটার নাম রাখলো, চার্লি। এবার ডিক চার্লির শিক্ষায় মন দিলো। অসীম ধৈর্য্যে দিনের পর দিন

অক্লান্ত পরিশ্রমের পর চার্লি পোষ মানলো, তার শিক্ষাও হ'লো সম্পূর্ণ। এবারে ডিক ঠিক করলো, বন্ধুদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে।

জো আর হেনরির চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে ডিক পথ চলতে লাগলো। বেশ কয়েকদিন এইভাবে চলার পর একদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে ডিক দেখে চারিদিক্ তুষারে ছেয়ে গেছে। সেই তুষারের দেশে বন্ধুদের কোনো চিহ্নই আবিষ্কার করা সম্ভব হ'লো না। হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো ডিক। ক্রুসোর ঘ্রাণশক্তিও তাকে কোনো পথের সন্ধান দিতে পারলো না। তখন ডিক বাধ্য হয়ে ঠিক করলো, তুষারপাত শেষ হ'য়ে যতদিন না আবার ঘাস দেখা যায়, ততদিন সেখানেই কাটাবে।

চার্লিকে একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে ডিক শিকারে বেরিয়ে পড়লো। কিছু দূর যাবার পর একটা বড় পাথরের স্তূপ অতিক্রম কববার সঙ্গে সঙ্গে সে যা দেখলো তাতে তার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে গেলো। সেখান থেকে মাত্র ত্রিশ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড গ্রিজলি ভালুক তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

যে ভালুক শিকারের স্বপ্ন সে ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছে, এমন আচমকা নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার মুখোমুখি পড়ে ডিক প্রথমটা ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু নিঃসঙ্গ তো নয়! তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্রুসো,—তার সর্ব্বশরীরের লোম খাড়া হ'য়ে উঠেছে, ধারাল দাঁতগুলো বের ক'রে সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো ভালুকটার দিকে।

বেচারা ক্রুসো! ভালুকের এক থাবায় তার যে কি অবস্থা হ'তে পারে এ কথা যদি সে জানত!

গ্রিজ্লি ভালুকের মত ভীষণ জন্তু ওদেশে আর নেই। যেমন বিরাট, বলিষ্ঠ আকৃতি, তেমনি ভীষণ তার স্বভাব। একা গ্রিজ্লি ভালুকের সম্মুখীন হওয়া ওদেশী শিকারীরা কখনো কল্পনাও ক'রতে পারে না, এবং প্রথম শ্রেণীর শিকারী ভিন্ন এ পর্য্যন্ত কেউ গ্রিজ্লির সামনে প'ড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে নি।

অনেকটা ইয়োরোপের তামাটে ভালুকের মত দেখতে হলেও গ্রিজলির আকৃতি তার থেকে অনেক বড়, লম্বায় কখনো কখনো ন' ফুটের থেকেও বেশী হয়। তাদের গায়ের লোম আরো লম্বা এবং লোমের আগার দিক্টা কতকটা ফ্যাকাশে। থাবাগুলো সাদা, ময়লাটে, যেমন বড় তেমনি শক্ত, আর ধারালো। বেড়ালের মত এদের নখ থাবার মধ্যে লুকোনো থাকে না এবং তার ফলে এদের পাগুলো একটু বেয়াড়া দেখায়। এই কারণে ওরা কালো বা তামাটে ভালুকের

মত স্বচ্ছন্দে গাছে উঠতে পারে না। ওদের এই দুর্ব্বলতার জন্যেই অনেক বার অনেক শিকারী ওদের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। মাংসাশী হলেও গ্রিজলি মাঝে মাঝে নিরামিষ খেতে ভালোবাসে। "মিষ্টি দাঁত" থাকার জন্য মধু তার এক বিশেষ প্রিয় খাদ্য।

ডিককে দেখা মাত্র ভালুকটা তার পেছনের পায়ে ভর করে সিধে দাঁড়িয়ে উঠে এক গম্ভীর গর্জ্জন করে উঠলো। ক্রুসোও পিছিয়ে পড়বার নয়, দাঁত খিচিয়ে সেও তার ক্রোধ প্রকাশ করলো,—দু' সারি দাঁতের একটাও দেখাতে বাকী রাখলো না। আশু বিপদের সম্ভাবনায় ডিকেরও জড়তা কেটে গেছে, রাইফেল উদ্যত ক'রে সে লক্ষ্য স্থির করলো। ডিক জানতো, গ্রিজলির কাছ থেকে ছুটে পালানোর চেষ্টা আর সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করা একই কথা। তাই সে চিন্তাকে মনে কিছু মাত্র স্থান না দিয়ে ওর বুক লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপে দিলো।

কিন্তু সে গুলিতে কোনই ফল হ'ল না। উপরন্তু সঙ্গে সঙ্গে চার পায়ে ভর করে ভালুকটা তাকে আক্রমণ করলো।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বাস

শ্রীরেণুকা দেবী

মুকুলদের বাড়ী, অবশ্য বাড়ী বল্লে ভুলই হবে, ঘরটা, একেবারে রাস্তার ধারে। আইসক্রীম-ওয়ালা তার হলদে রংএর বাক্স-গাড়ীটা ঠেলতে ঠেলতে এনে যেখানটায় রাখে, মুকুলদের ঘর থেকে ঠিক সোজা দেখতে পাওয়া যায়। "আ—ইস্‌ক্রীম···" ব'লে আ-এর উপর একটা অদ্ভুত জোর দিয়ে আইস্‌ক্রীমওলা যখন চেঁচিয়ে ওঠে, মুকুল তখনি ছুটে বেরিয়ে আসে ঐ হলদে বাক্সটার কাছে। অবশ্য কিনতে পারে না, আর সবাই যে কেনে তাও নয়। কেউ কেনে, কেউ কেনে না, কিন্তু জড় হয় সকলেই,—মানে ঐ রাস্তাটুকুর মধ্যে ওরই সমসাথীরা। এবারে গরমের এই মরসুমে আইস্‌ক্রীম্‌ওলা আসার পর থেকে মুকুল একদিনও কেনে নি। ছেলেদের বলতে শুনেছে—এই "হ্যাপি বয়" নাকি খেতে খুব ভাল।

বাবার কাছ থেকে মুকুল মাঝে মাঝে পয়সা চেয়ে নেয়। তা কিন্তু একটার বেশী হয় না, বড় জোর দু'টো। তাকে পয়সা দিলেই, মা বলেন ওঠেন, "খুব তো আদর হচ্ছে, পয়সা দিয়ে, আসার সময়ে বুঝি হেঁটেই আসা হবে?"

ছোট হলেও মুকুল জানে তার বাবার কাছে একটাও বেশী পয়সা থাকে না। মাসের প্রথমেই মাইনেটা এনে তার মার কাছে দিতে হয়, আর ঠিক খরচ ছাড়া একটা পয়সাও তিনি বেশী দেন না। মুকুলের মা, মুকুলের বিমাতা। বিমাতা হলেও মুকুলকে তিনি খুব অযত্ন করেন না। সময়ে খাওয়া, জলখাবার যেদিন যেমন হয়, জমা-কাপড় ফর্সা করে দেওয়া—সবই তিনি দেন, কিন্তু পয়সা চাইলে যে তিনি দেবেন না এ জ্ঞান মুকুলের ভালো করেই হয়েছে।

সে দিন ওর বাবা অফিসে বেরোবার সময়ে অনেক সাহস ক'রেই মুকুল পয়সা চাইলো। ওর বাবা পকেট থেকে একটা ডবল পয়সা বের করে ওকে দিতে গেলে ও বল্লে, "বাবা, আজ আমি একটা আইস্‌ক্রীম্ খাব।" ওর মা বলে ওঠেন, "আইস্‌ক্রীম্ খাব! আইস্‌ক্রীম্ খাবার মতই অবস্থা কিনা আমাদের!" ওর সেই ছলছলে মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বাবা আরও একটা ডবল পয়সা ওর হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি জুতো পরতে থাকেন, আর ওর মাও ছোটদের হাতে পয়সা দেওয়া কত খারাপ তাই বলতে থাকেন।

সে দিন আইস্‌ক্রীম্‌ওলা এলেই মুকুল খুব উৎসাহের সঙ্গে গিয়ে হলদে বাক্সটার উপরকার ছোট ঢাকনাটা খুলে ফেল্ল, আর একটা আইস্‌ক্রীম্ চাইলো। আইস্‌ক্রীম্‌টা নিয়েই মুকুল বেশ মুরুব্বির চালে যেই পয়সা দিতে গেল, লোকটা বল্লে, "ওটা দু' আনার।" একটু ভেবে মুকুল বলে, "আমাকে চার পয়সা-ওলা দাও।" সে বলে, তার কাছে চার পয়সা-ওলা থাকে না।—"যাও, বাড়ী থেকে পয়সা নিয়ে এস।" পাশের থেকে দুলু বলে ওঠে, "হ্যাঁ, ওর বাবা তো অফিসে, ওর মা ওকে পয়সা দেবে কিনা!" মুকুল আস্তে আস্তে আইস্‌ক্রীম্‌টি ফিরিয়ে দিতে যায়। রোজই ছেলেটির লুব্ধ মুখটা দেখে দেখে আইস্‌ক্রীম্-ওলার চেনা হয়ে গিয়েছিল. আর আজ সেই জিনিষ হাতে পেয়ে ফেরৎ দেবার সময় মুকুলের মুখের ভাব এমন হয়েছিল যে আইস্‌ক্রীম-ওলাও ফেরৎ নিতে পারলো না। যদিও তার নিজের জিনিষ নয় তবু সে বল্লে, "তুমি খাও, কাল আমাকে দাম দিও।" যতই হোক. ছেলে মানুষ তো, একটু ভয় ও আনন্দের সঙ্গে মুকুল আইস্‌ক্রীম্‌টা খেয়ে ফেল্লে।

পরের দিন কিন্তু মুকুল তার বাবার কাছে পয়সা চাইতে পারলো না। পর পর দু'দিন চার পয়সা চাইবার সাহস তার হ'ল না। আবার তার পর দিন ওর বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া আরম্ভ হওয়ায় সে দিনও মুকুল চাইতে পারলো না। এ দু'টো দিন মুকুল লুকিয়ে লুকিয়ে রইলো। দ্বিতীয় দিন সে আড়াল থেকে দেখলো আইস্‌ক্রীম্‌ওলা দু'-এক বার তাদের বাড়ীর দিকে তাকালো, একটু এগিয়ে এল, আবার কিছু না বলে ফিরে গেল।

পরের দিন সকালবেলা তার বন্ধু দুলুকে কথাটা বলতেই, দুলু বল্লে, "ভাবছিস্ কেন, পয়সা দেওয়ার দরকার নেই। চাইলে বলবি, আমি তো দু' আনাই দিয়েছি!'

মুকুল বলে, "যদি বাড়ীতে আসে?"

"আসে, বলবি, 'আমি তোমার কাছে কিনিই নি'।"

কত বার মুকুলের মনে হয়েছে, গিয়ে বলে আসে, "তোমার পয়সা আমি ঠিক দিয়ে দেব,

ক'দিন পরেই।" দু'-একদিনের মধ্যে সে চাইবে বাবার কাছে, কিন্তু এমনি করেই সাত-আট দিন হয়ে গেল, মুকুলেরও পয়সা ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছেটা যেন কমে আসতে লাগলো।

হঠাৎ সেদিন বেলা দু'টোর সময়ে মুকুলের বাবাকে তাঁর অফিসের লোকেরা একটা ট্যাক্সি করে বাড়ী দিয়ে গেল। খুব জ্বর একেবারে অজ্ঞান। মুকুলের বাবার মেনিন্‌জাইটীস' হয়েছে। ওদের সাধ্য মত চিকিৎসা হতে লাগলো। পরের দিন তুলু বল্লে, "জানিস্, তোর বাবা বাঁচবে না। পিসি বলছিল তোর মার পাপেই তোর বাবার এই অসুখ করেছে। এক পো তেল ধার নিলে আধ পো ফেরৎ দেয়, টুলীর মার কাছ থেকে আধ সের আটা নিয়ে আর দিলেই না; বল্লে 'নিই নি'। যার কাছে যা নেয় কখনও ঠিক মত দেয় না। পিসী বলে, 'পরকে ফাঁকী দিলে নিজেই ফাঁকে পড়তে হয়'।"

হঠাৎ মুকুলের মনে হয় সেও তো আইস্‌ক্রীম্‌ওলাকে ফাঁকী দিয়েছে। কই, এতদিন তো ওর বাবার কিচ্ছু হয় নি! মুকুলের মনে সাহস হয়, যে করেই হোক সে আইস্‌ক্রীম্‌ওলাকে পয়সা ফিরিয়ে দেবে। ভিক্ষে করে হয় তাই করবে। রাস্তায় ওর মত কত ছেলেকেই তো ভিক্ষে করতে দেখেছে। মুকুল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়; বড় রাস্তায়, ঠিক যেখানে এসে বাস্ থামে, সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে, একজন সুসজ্জিতা ভদ্রমহিলা, হাতে একটা লম্বা থলির মত ঝোলান, বাসের অপেক্ষা করছেন। মুকুল দু'-তিন বার তাঁর মুখের দিকে তাকালো। তিনি ওর মুখের দিকে তাকাতেই মুকুল মরিয়া হয়ে বল্ল, "আমাকে চারটে পয়সা দেবেন?" মা এ ক'দিন জামা-কাপড় কেচে দিতে পারেন নি; ময়লা বেশে আর ভাবনা-চিন্তায় তার চেহারাটাও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রমহিলাও তাকে ভিখারী বলেই মনে করলেন বল্লেন, "এই বয়সেই ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছ?"

মুকুল বলে, "না, আমি ভিখারী নই, আমি আবার আপনাকে দিয়ে দেবো।"

"—দিয়ে দেবে! বাঃ, তুমি তো দেখছি বেশ পাকা ভিখিরী হয়ে উঠেছ!" বাস্ এসে পড়ে, ক্রূর ভ্রূকুটী করে ভদ্রমহিলা বাসে উঠে পড়েন।

আর মুকুল, সেই চলমান বাসের দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঠিক কাছেই একটা ছেঁড়া চট বিছিয়ে একটা বুড়ো মুচী জুতো সেলাই করছিল, হাতের ইসারায় সে মুকুলকে ডাকলো। মুকুল যেতেই, একটা আনি তুলে বল্ল, "নেও খোকাবাবু!"

মুকুল অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে আর আপনা থেকেই দু' ফোঁটা জল তার চোখ থেকে ঝরে পড়ে। বুড়ো ফের বলে, "যাও, ঘর যাও।"

মুকুল সেই দিনই আইস্‌ক্রীম্‌ওলাকে পয়সা দিয়ে দিল।

আশ্চর্য, সে দিন থেকেই ওর বাবার অসুখটা একটু কমতে লাগলো। আর কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি একেবারে সেরে উঠলেন। মুকুল ডাক্তারকে পর্যন্ত বলতে শুনেছে, এ রকম অবস্থা নাকি খুব কমই ভাল হয়! এর পর একদিন সে বাবার কাছ থেকে চারটা পয়সা চেয়ে নিল, কিন্তু সেখানে সেই বুড়ো মুচীটাকে আর একদিনও দেখতে পেল না। মুকুল সেই থেকে পয়সাটা সব সময়ে ওর কাছে কাছে রাখতো।

ওর বাবার অসুখ সারাতে ওর মা-বাবা দু'জনেরই মন খুব ভালো; একদিন তাই ওরা সবাই মিলে সিনেমা দেখতে গেল। রূপালী সিনেমা, আর সেখানে ফুটপাথের উপর সেই বুড়ো মুচীটা জুতো সেলাই করছে। মুকুল তাড়াতাড়ি গিয়ে পয়সা চারটে তাকে দিল। বুড়ো একটু অবাক্ হয়ে ওর দিকে তাকালো, তারপর চিনতে পেরে আধা হিন্দি, আধা বাংলা মিশিয়ে যা বল্ল তার অর্থ হচ্ছে, "নিজে খাঁটী থাক, আর নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, বিনা কষ্টে দিন চলে যাবে।"

বাদলা বেলার চিঠি

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সবুজ পাতার চিঠি পেলাম
বকুল-ফুলের বনে,
অঝোর ঝরণ আষাঢ়-ভোরের
বাদল-ঝরা ক্ষণে।
মেঘলা দেশের দুষ্টু মেয়ে
নাম তার না জানি,
পাঠিয়ে দিলে ফুলের আখর—
লেখা চিঠিখানি।

ভাব করেছি আজকে আবার
নীল পুতুলের সাথে,
ভাব করেছি ভাইবোনেতে
ঘরের নিরালাতে।
ভাব করেছি—অনেক দূরের
আকাশ পানে চেয়ে
সকাল সাঁঝে হাসে যখন
ছোট্ট তারার মেয়ে।

ভোরের আলোর পরশ নিয়ে
আসে সে মোর ঘরে,
নিঝুম রাতে স্নেহটি তার
জ্যোৎস্না হয়ে ঝরে।

ভাব করেছি আজ মাগো সেই
দূরের সাথীর সনে,
ফুলের চিঠি পাঠিয়েছে সে
বাদল-ঝরা ক্ষণে!

বরষায়

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

বরষা উতল হ'ল আজিকে দেখি,
ভরসা হৃদয়ে পাই তাহা নিরখি'।
ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্
শাল বনে মর্মর,
গ্রামের কিনারে জল আসিল এ কি!
বাদলে তোমরা বল করিবে কে কি?

মেঘপরী উড়ে যায় কোন্ বিদেশে,
কামিনী যূথীর মালা জড়ায়ে কেশে।
পায়ে শোভে বনফুল,
কর্ণে হেনার দুল,
হেলে দুলে চলে যায় মুচকি হেসে;
বাতাসে চলার রব আসিছে ভেসে।

কাগজের নৌকা কে ভাসাবে জলে?
গল্প শুনিবে কে-বা কৌতূহলে?
কে খাবে কড়াই ভাজা,
পাঁঠার ঘুগনি তাজা,
খেলিবে কে কানামাছি সদলবলে?
সাবধান, ওই নভে বিজলী ঝলে।

দাদুরী ডাকিছে সুখে খানা ডোবাতে,
সেই সুরে ঘুম আসে আঁখির পাতে।
আয় ঘুম, ঘুম আয়,
খোকা খুকু ঘুমু যায়,
ঘুম-পরী নামিল কি বরষা রাতে—
রূম ঝুম রূম ঝুম ধ্বনির সাথে!

ছোট্ট মেয়ে মিণ্টুরাণী

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

ছোট্ট মেয়ে মিণ্টুরাণী
চার বছরে পড়লো জানি,—এই আষাঢ়ের তিন তারিখে সবে,
মগজ ভরা দুষ্টুমিতে
হর্‌রা হাসি নৃত্যে গীতে—অঙ্গনে ঐ ফিরছে কলরবে।

একটুখানি নরম ঠোঁটে
লক্ষ কথার ফুল্‌কি ফোটে—জানি নে তার কেমনতরো মানে,
হঠাৎ এসে চেয়ার নাড়ে,
হাতের থেকে কলম কাড়ে—চুরি-করা আমের আচার আনে।
সোনামণি পুতুলটারে
সাজায় নানান্ উপহারে—হাওয়াই গাড়ী চড়ে দুপুর বেলা,
পাতা ছিঁড়ে ডাইরি থেকে
হিজিবিজি নক্সা লেখে—মাঝ পুকুরে দেয় ভাসিয়ে ভেলা।
খোকার গালে চিম্‌টি দিয়ে,
ঠানদি'কে বা বক দেখিয়ে—ছুট্টে পালায় বকম্ বকম্ করে,
মায়ের কাছে সং বনে যায়,
উল্টে ওদের বক্‌নি খাওয়ায়—ক্ষুদে পেটে বুদ্ধি এতো ধরে!
অয় অজগর সাপটাকে সে
মিথ্যে বলে উড়ায় হেসে—বাঘ-শেয়ালের গল্পে বড়ো ভয়,
লাঙুল-কাটা শেয়াল মামুর
দুঃখ দেখে হাসবে প্রচুর—এক্কেবারে বিচ্ছু মেয়ে, নয়?
দিনরাত্তির হৈ-হল্লায়
বেজার হয়ে দস্যিপনায়—রেগে উঠে হঠাৎ তেড়ে আসি,
রাগ থামতে পরক্ষণে
একটুখানি অদর্শনে—মিনুর তরে চোখের জলে ভাসি।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি

কিডের রত্নগুহা

রামধনুতে "সোনার বালুচরে" এই নামে যে উপন্যাসখানি বেরুচ্ছে তাতে তোমরা এ মাসেই বিখ্যাত জলদস্যু কিডের কথা পড়েছ। কিড্ কিন্তু কোন কল্পিত ব্যক্তির নাম নয়,—স্কট্ল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত জলদস্যুর নাম। সে ছিল বৃটীশ নৌবিভাগের একজন সৈনিক। তখন ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের জোর লড়াই চলছে, কিড্ এই রকম কতকগুলি যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়ে অবশেষে একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদ লাভ করে। তার পর তার ওপর ভার পড়ে—পূর্ব্বসমুদ্রে গিয়ে জলদস্যুদের শায়েস্তা করার। ও অঞ্চলে তখন জলদস্যুদের খুবই উৎপাত চলছিল।

কিন্তু ফল হল বিপরীত। বছর দুই যেতে না যেতে দেখা গেল, কিড্ দস্যুদের ধরবে কি, নিজেই সে একজন পাকা জলদস্যুতে পরিণত হয়েছে। নিজের জাহাজ নিয়ে সে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়, আর সুবিধা পেলেই জাহাজ মেরে, লুঠ ক'রে লোকের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়। দেখতে দেখতে পূর্ব্ব সমুদ্রে সে হয়ে উঠল মহা আতঙ্ক।

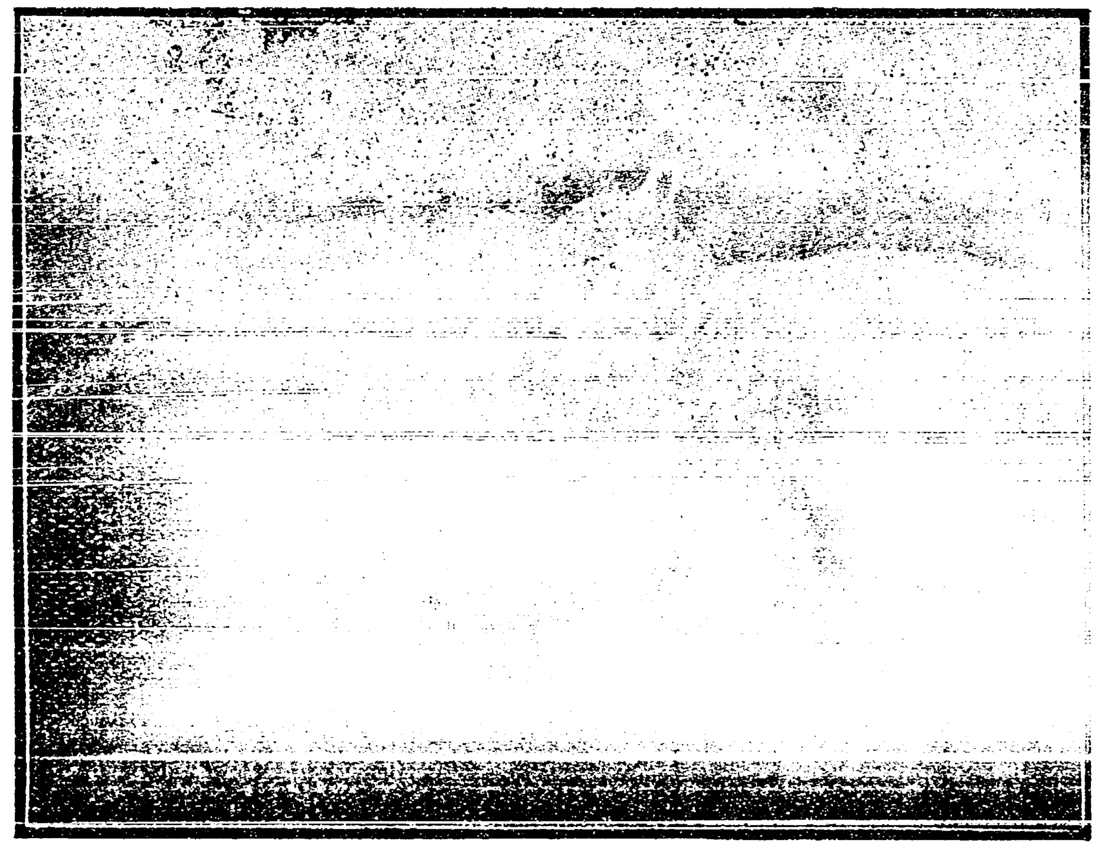

কুকুরের বন্ধু ভেড়ার ছানা

অবশ্যি শেষ পর্য্যন্ত একদিন তাকে ধরা পড়তে হ'ল। তার লুণ্ঠিত কুবেরের সম্পত্তিও শেষ পর্য্যন্ত তাকে রক্ষা করতে পারল না। লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে তার বিচার হ'ল—শাস্তি দেওয়া হ'ল প্রাণদণ্ড। ১৭০১ সনে লণ্ডন সহরেই তার ফাঁসী হয়।

কিন্তু কিডের বিপুল ধনসম্পত্তির কি হ'ল? কেউ তার সন্ধান পেল না। অবশ্যি ও সম্বন্ধে নানা রকম গল্প-কাহিনী সমানে চলতে লাগল লোকের মুখে মুখে। তার একটি তো তোমরা রামধনুতেই পড়ছ। লোকে বলে কিড্ তার সমস্ত লুণ্ঠিত ধনরত্ন পূর্ব্বসমুদ্রেরই এক অজানা দ্বীপে গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখে গেছে।

সম্প্রতি কয়েক দিন হয় একখানি জাপানী সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর খবর বেরিয়েছে। কিডের গুপ্তধনের নাকি সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং সে সন্ধান পেয়েছেন জাপানের একটা অভিযানকারীর দল। এই দলের নেতা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত নাগাশিমা। জাপানের মূল ভূভাগ থেকে দু'শ' মাইল দক্ষিণে য়োকোয়াটে নামক ছোট্ট একটি নির্জন দ্বীপের এক গুহার মধ্যে নাকি এই সব ধনরত্ন পোঁতা আছে। ঐ দ্বীপে এক সময় লোকের বসতি ছিল, কিন্তু বহুদিন থেকে এটি পরিত্যক্ত হয়ে আছে। ঐ গুহার মধ্যে নাকি বড় বড় অনেকগুলি লোহার সিন্দুক পাওয়া গেছে। ঐ সব সিন্দুক ভর্ত্তি আছে রূপোর পাত আর সেকেলে নানা রকম মুদ্রা। ঐ গুপ্তধনের পরিমাণ আমাদের হিসাবে প্রায় দেড়শ' কোটি টাকা। অভিযানকারীরা ঐ সবের কিছু কিছু নমুনা নিয়ে এসেছেন। শীগ্গিরই তাঁরা নাকি আবার সাজ-সরঞ্জাম সহ রওনা হবেন ওগুলো উদ্ধার করে আনতে। নাগাশিমা জানিয়েছেন, গুপ্তধন এনে তাঁরা তার সবটাই জাপান সরকারে জমা দেবেন।

টিয়ার বন্ধু বিড়াল

গুপ্তধনের সন্ধান কি করে পেলেন সে কাহিনীও বেশ কৌতুককর। অভিযানকারীরা ঘুরতে ঘুরতে একদিন শুনতে পেলেন অনেক—অনেক বছর আগে একবার নাকি তিনখানা বৃটীশ জাহাজ এসে ঐ ছোট্ট দ্বীপে হাজির হয়। জাহাজের কয়েকজন যাত্রী এসে স্থানীয় সর্দ্দারকে

বলেন, "আমাদের কয়েকজন সঙ্গী মারা গেছে, তাদের আমরা ডাঙ্গায় কবর দিতে চাই। এই সব লোহার সিন্ধুকে সেই মৃতদেহগুলি আছে। আমরা তোমাদের সাহায্য চাই।" সর্দ্দার বিশ্বাস ক'রে লোকজন নিয়ে তাদের সাহায্য করে, তারাও সিন্ধুকগুলো পাহাড়ের গুহায় পুঁতে রেখে যায়। তারপর আর তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। এই কাহিনী শুনেই নাকি অভিযানকারীদের মনে সন্দেহ জাগে, এবং অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁরা ঐ অজানা দ্বীপ খুঁড়ে রত্নগুহার সন্ধান পান।

ভারী ভাব

জানোয়ারের বন্ধুত্ব

মানুষে মানুষে যেমন গভীর বন্ধুত্বের নানা গল্প শোনা যায় জীবজগতেও তেমনি বন্ধুত্বের অভাব নেই। স্বজাতির মধ্যে তো বটেই, বিভিন্ন জাতের জীবের মধ্যেও অনেক সময় আশ্চর্য্য 'ভাব' হতে দেখা গেছে। বিড়াল পাখী পেলেই তাকে মেরে খাবার চেষ্টা করে এই আমরা জানি, কিন্তু বিড়ালও যে পাখীর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব পাতাতে পারে তার নমুনা সঙ্গের ছবিতে দেখ। এই রকম বিড়ালে ইঁদুরে বন্ধুত্বেরও খোঁজ পাওয়া গেছে।

অপরিচিত জীব দেখলেই তাকে তেড়ে যাওয়া কুকুরের একটি বদ্ (?) স্বভাব। কিন্তু সেই কুকুরও সময় সময় দুর্ব্বল প্রাণীদের সঙ্গে কেমন করে ভাব জমাতে পারে তার নমুনা স্বরূপ আর একটি ছবি দেওয়া হ'ল।

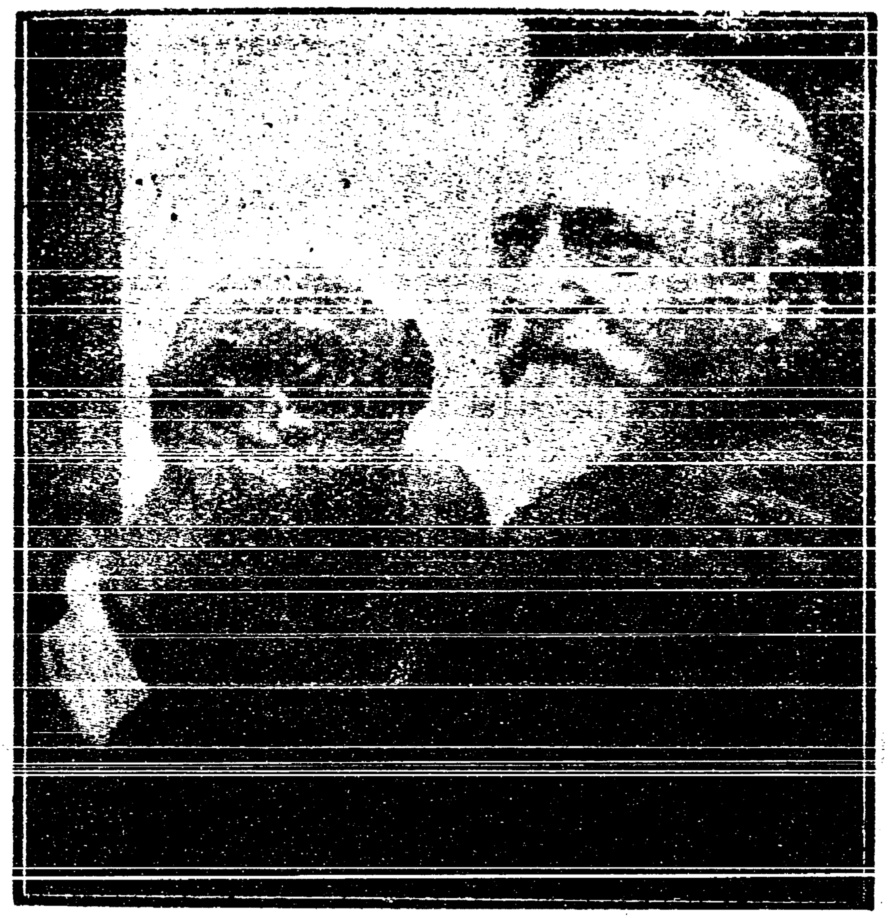

গরিলা-ছানার বন্ধু

মানুষের সঙ্গে পোষা জীবজন্তুর গভীর অন্তরঙ্গতার এত গল্প আছে যে বলে শেষ করা যায় না। কুকুর তো বটেই, হাতী ঘোড়া, উট, বিড়াল, ভেড়া, হরিণ, উটপাখী, বানর, বেজী, কাঠবিড়ালী—এরাও সময় সময় মানুষের সঙ্গে এত খাতির জমিয়ে ফেলে যা শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না। এই সব পোষা পশুপক্ষীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও কত বার যে প্রিয়-জনের প্রাণ রক্ষা করেছে তারও গল্প কিছু কিছু তোমরা শুনে থাকবে।

স্বভাবতঃ-হিংস্র জন্তুদেরও ভালবাসা দিয়ে জয় করা সম্ভব। সে রকম একটি ছবিও এখানে দেওয়া গেল।—গরিলার ছানার সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের ছবি।

বৈশাখ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রতিযোগীদের পছন্দমত ভোটে সহরগুলির নাম এই রকম দাঁড়িয়েছে: (১) কলকাতা (২) শ্রীনগর (৩) বোম্বাই (৪) দিল্লী (৫) মাদ্রাজ (৬ শিলং (৭) দার্জিলীং (৮) বাঙ্গালোর (৯) রাঁচী (১০) পুরী (১১) লক্ষ্ণৌ (১২) সিমলা (১৩) কাশী (১৪) জয়পুর (১৫) নাগপুর (১৬ পাটনা (১৭) ঢাকা (১৮) অমৃতসর (১৯) চট্টগ্রাম (২০) করাচী।

এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠানোয় পুরস্কার পেলেন—শ্রীপ্রণবকুমার হালদার (বয়স ১৫)—কালীঘাট। আর যাঁদের তালিকা কাছাকাছি হয়েছে—শ্রীকিরণকুমার দত্ত (ভাগলপুর), শ্রীদীপ্তি চৌধুরী (বাঁকুড়া), শ্রীমোহনলাল বাগচী (কলিকাতা-৭)।

এক দুর্য্যোগের রাতে

শ্রীকৌটিল্য

ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বভাবটা একটু ভবঘুরে গোছের। বেশী দিন কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারি না আমি। ভারতের নাম-করা কোন জায়গাই বেড়াতে বাকি রাখি নি। কিন্তু, বলতে লজ্জা করে, আমার নিজের বাংলা দেশটা আমার এখনও তেমন ভাল ক'রে দেখা হয় নি।

অবশ্যি এর একটা বড় কারণও যে নেই তা নয়। বাংলা দেশে পথঘাট বড় কম। রেলে সর্ব্বত্র যাওয়া যায় না, পশ্চিম বাংলায় তেমনি নৌকোতেও সব জায়গায় যাওয়ার উপায় নেই। মোটর যাবার রাস্তা তো দু'টো-একটা ছাড়া নেই বললেই চলে।

কিন্তু নেই তা কি করা যাবে? তাই বলে নিজের দেশ ঘুরে দেখব না? তাই ঠিক করলাম, কাঁধে একটা ঝুলি ফেলে পায়ে হেঁটেই যতটা সম্ভব ঘুরে বেড়াব।

ঘুরতে ঘুরতে চলেছি। এ গ্রাম সে-গ্রাম করতে করতে কত গ্রাম পার হয়ে এলাম। পল্লী-বাংলার সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হচ্ছে গ্রামবাসীর সরল জীবন-যাত্রা ততই যেন মুগ্ধ করছে আমায়। সময় সময় অপরিচিত লোকের বাড়ী অতিথি হই, মোটা চালের ভাত, গাছের শাকপাতা দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়, কিন্তু তারই মধ্যে যে প্রাণের পরিচয় পাই তার তুলনা কোথায়?

সেদিনও এমনিধারা চলেছি। এ অঞ্চলটায় খুবই জঙ্গল—লোকের বসতি নেই বললেই হয়। চলতে চলতে প্রকৃতির কোমল স্পর্শ পদে পদে অনুভব করছিলাম। এদিকে কখন যে আকাশ কালো করে মেঘ জমে এসেছে সেদিকে খেয়াল নেই।

দেখতে দেখতে সুরু হ'ল মুষল ধারে বৃষ্টি। ওঃ, সে কি বৃষ্টি! আর তেমনি বাতাস। একেবারে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি আশ্রয়ের আশায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে সুরু করে দিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল দূরে যেন একটা খোড়ো ঘরের মত দেখা যাচ্ছে। আরও কাছে গিয়ে দেখি সত্যি একটা বড়সড় খড়ের ঘর। তবে বহুদিনের পরিত্যক্ত। সামনে ঝোপঝাড় আর আগাছার জঙ্গল, কোন রকমে ঠেলে দাওয়ায় উঠে পড়লাম। চাল খড়ের হ'লেও দেয়াল পাকা, তবে চূণ-বালি বহুদিন খসে গেছে। দরজা-জানলাগুলোও যাওয়ার দশা।

ভাবলাম এ অঞ্চলে এক সময়ে মিলিটারীর লোকেরা ছাউনি ফেলেছিল, হয়তো তারাই এটি তৈরী করে গেছে। এখনও কেউ দখল করে নি। কিন্তু মনে

হ'ল ঘরটা যেন আরও বহুদিনের পুরোনো। পাশে একটা দীঘিও দেখা যাচ্ছে। বেশ বড়, কিন্তু পানায় ভর্ত্তি।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই একটা সরু বারান্দা পেলাম, সেটা পেরোতেই একটা বড় ঘর।

তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। পকেট থেকে দেশলাই জ্বালতেই ঘরের চেহারা দেখতে পেলাম। দেয়াল, ছাদ ভর্ত্তি ঝুল আর মাকড়ষা। কয়েকটা চামচিকেও উড়ে বেরিয়ে গেল। ঘরের এক কোণে কতগুলো কাঠকুটো পড়ে আছে, ইট দিয়ে একটা কাঁচা উনুনও কে তৈরী করে রেখেছে। বোধ হয় আমারই মত কেউ এসে এখানে কোন দিন আশ্রয় নিয়েছিল এবং এইগুলো ফেলে গেছে।

যাক্, শরীরটাকে একটু গরম করে নেওয়া যাবে, কাপড়-জামাগুলোও শুকিয়ে নেওয়া যাবে। ভাঙ্গা কপাটের ফাঁকে হু-হু করে হাওয়া আসছিল, বাইরে এসে সদর দরজার হুড়কোটা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে আগুন জ্বালানো গেল। বৃষ্টি আর সহজে থামবে বলে মনে হয় না, রাতটা হয়তো এখানেই কাটাতে হবে। শরীরটা একটু চাঙ্গা হতেই মেঝেতে কাপড়টা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। আগুনটা জ্বলতে লাগলো।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরে চলেছে। শুয়ে শুয়ে একটু তন্দ্রা মত আসছিল, হঠাৎ মনে হ'ল, বারান্দায় যেন কার পায়ের শব্দ। সদর দরজা তো বন্ধ করে এসেছি, তবে আবার কে আসবে? তবে কি বাতাসে পুরোনো হুড়কো খুলে গেছে, না ভেঙ্গে গেছে?

পায়ের শব্দটা এগিয়ে আসতে আসতে আমার ঘরের পাশে এসে থামল। আগুনের স্বল্পালোকে দেখলাম, আমারই মত আর একটি লোক এসে ঘরে ঢুকল! লোকটি ভীষণ রকম ভিজেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে টস্ টস্ করে জল ঝরছে, সে জলে সারা ঘর যেন ভেসে গেল।

লোকটি বোধ হয় আমাকে দেখতে পায় নি। আগুন দেখে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। শীতে তখন সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

প্রথমটা আমিও কোন কথা বললাম না। প্রায় পাঁচ মিনিট চুপচাপ কেটে যাবার পর সাড়া দিয়ে বললাম, "খুব ভিজেছেন দেখছি! আমারও আপনার মত অবস্থা হয়েছিল, তবে অতটা নয়। ভাগ্যিস এই জঙ্গলের মধ্যে খালি ঘরটা পেয়েছিলাম।"

লোকটি ফিরে তাকাল। এই বার তার মুখটা দেখতে পেলাম ভাল করে।

বয়স বছর তিরিশেক হবে। গালে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—৩০।৪০ বছর আগে নব্য যুবকদের যেমন রেওয়াজ ছিল। মুখখানা ফ্যাকাশে, যেন রক্তশূন্যতা রোগে ভুগছে। আগুনের পাশে বসে বসেই বল্‌ল, "আপনাকে তো আমি দেখতেই পাই নি। কতক্ষণ এসেছেন?"

"তা সন্ধ্যার একটু আগেই হবে।"

"আপনাকে এদিকে নতুন দেখছি। বিদেশ থেকে এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, তাই বটে। এ ঘরটা বোধ হয় মিলিটারীরা তৈরী করে ছেড়ে গেছে?"

"না না, আপনি বিদেশী, খবর রাখবেন কি করে? এটা একটা প'ড়ো বাড়ী। বছর চল্লিশেক আগে এ অঞ্চলে লোকের বসতি ছিল, এ বাড়ীতেও লোকে বাস করত। তখন এর এ হাল ছিল না। তখন কেউ বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবে নি এর আজ এ অবস্থা হবে;—আপনার-আমাদের মত লোকের জন্যই শেষ পর্য্যন্ত এটি নির্দ্দিষ্ট থাকবে।"

লোকটি একটু থেমে আমার মুখের দিকে তাকাল। বল্‌ল, "আপনি জানবেনই বা কি করে, বিদেশী লোক! সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। এ বাড়ীর মালিকের বয়স তখন তিরিশও হবে কিনা সন্দেহ। সেই তরুণ বয়সে, কেন নাই বা বললাম, হঠাৎ একদিন সে আত্মহত্যা ক'রে বসে। এই যে পাশে দীঘিটা রয়েছে—তখন এ রকম পানা ছিল না, ওর জল ছিল টলটলে,—এই দীঘিতে সে ডুবে মরে। পূরো দু' দিন কেউ জানতে পারে নি, তার পর যখন তার দেহ ফুলে ভেসে উঠল তখন পুলিশ এসে তাকে তুলল। সারা গায়ে জল ঝরছে টস্ টস্ করে—মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, রক্তের চিহ্ন নেই তার মধ্যে—

"কিন্তু চলে গেলেও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। পাড়া-প্রতিবেশী প্রায়ই আবছা আলোয় সন্ধ্যার আঁধারে তাকে দেখতে পেত তার ঘরের আনাচে-কানাচে। ফলে কেউ আর এ বাড়ীর পাশে ঘেঁষত না, বাড়ীটা আস্তে আস্তে হয়ে দাঁড়াল প'ড়ো বাড়ী। ক্রমে লোকে ভয়ে এ পাড়া ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বাসা বাঁধল। দেখা দিল জঙ্গল আর আগাছা।"

লোকটি আবার চুপ করল। তার পর আগুনের কাছে আরও এগিয়ে গিয়ে জামার জল শুকুতে বসল। কিন্তু দেখলাম, তখনও তার সারা গা তেমনি ভিজে চপ্ চপ্ করছে, তখনও জামা বেয়ে জল ঝরছে টস্ টস্ ক'রে।

অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলাম, "আপনি যে এখনও ভিজে ঢোল হয়ে আছেন! আগুনের এত পাশে বসেও এতক্ষণে আপনি একটুও শুকুতে পারলেন না?"

"কি ক'রে শুকোই? জানেন তো এ আপনার বৃষ্টির জল নয়—এ হচ্ছে দীঘির কালো জল, জানি না কত দিনে শুকোবে!—আজ চল্লিশ বছরেও—" বলতে বলতে লোকটি তার জল-ভরা হাতটা অবলীলাক্রমে ঢুকিয়ে দিল্ আগুনের মধ্যে।

এর পরেও কি আর সে ঘরে থাকা যায়? আমি তখন মরি-বাঁচি হয়ে সেই ঝড়-জল মাথায় করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটছি।*

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে।

ইংল্যাণ্ডে টেষ্ট ম্যাচ্

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১ম ও ২য় টেষ্ট ম্যাচ্ পর পর হয়ে গেল। ভারতীয় দল দু' বারেই পরাজিত হয়েছে—১মটায় ৭ উইকেটে, ২য়টায় ৮ উইকেটে। ১ম টেষ্টের ১ম ইনিংস্‌এ ভারতীয় দলের উল্লেখ-যোগ্য খবর হচ্ছে তরুণ খেলোয়াড় মঞ্জরেকারের ১৩৩ রান্, আর ২য় ইনিংস্‌এর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে একটিও রান্ না করে ভারতীয় দলের চার চারটে উইকেটের পতন—বোধ হয় টেষ্ট ম্যাচের রেকর্ড। ২য় টেষ্টের উল্লেখযোগ্য সংবাদ হচ্ছে মানকড়ের অদ্ভুত খেলা। ধরতে গেলে তিনি একাই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলেছেন। প্রথম ইনিংস্‌এ ওপনিং ব্যাট্‌স্‌ম্যান হিসাবে নেমে তিনি করলেন ৭২ রান্। তারপর ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটানা ৭৩ ওভার বল্ দিয়ে ১৯৫ রানে ৫টি উইকেট নিলেন। ২য় ইনিংস্‌এও তিনি রান্ তুললেন ১৮৪। খেলায় ভারত পরাজিত হলেও মানকড়ের নাম সকলের মুখে। ২য় টেষ্টে ইংল্যাণ্ড দলের ক্যাপটেন হাটন্ ১৫০ ও ইভান্‌স্ ১০৪ রান্ করে দলের জয়ের পথ সুগম করেন।

উইম্বলডেনে বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতা

টেনিসে বিশ্ববিখ্যাত উইম্বলডেন প্রতি-যোগিতা এ বছরের মত শেষ হ'ল। এবারে

সব চেয়ে বাহাদুরী দেখিয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ান্ খেলোয়াড় ফ্রাঙ্ক সেজ্ম্যান। তিনি পুরুষদের সিংগ্ল্স্, ডাবল্স্ ও মিক্স্ড্ ডাবল্স্ তিনটেতেই চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছেন। ইতিপূর্ব্বে এ সম্মান অর্জ্জন করেছিলেন ১৯৩৯ সালে আমেরিকার রিগস্, আর ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ্।

মেয়েদের সিংগ্ল্স্‌এ বিজয়িনী হয়েছেন আমেরিকার ১৭ বৎসর বয়স্কা মহিলা খেলোয়াড় মিস্ মোরিল কোনলী। মেয়েদের জুনিয়ার প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড় মিস্ রিতা ভাঙ্গার রানার্স্ আপ্ হয়েছেন।

কলকাতার ফুটবল লীগ

কলকাতার ভাল ভাল ফুটবল খেলোয়াড়েরা হেলসিঙ্কিতে অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চলে যাওয়ায় কলকাতার লীগ্ খেলা এবারে অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে,—বিশেষতঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধে। এখন পর্য্যন্ত ইষ্ট বেঙ্গল দলই লীগের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে আছে এবং খুব সম্ভবতঃ তারাই এবারে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে। শেষের দিকে ইষ্ট বেঙ্গল দল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৩ জন খেলোয়াড় আমদানী করে আনায় ক্রীড়ামোদী-মহলে বেশ একটু বিরূপ সমালোচনাও হয়েছে। অন্যান্য দলের, মায় মোহনবাগানের, খেলা হচ্ছে একেবারেই অনিশ্চিত। কে কার কাছে জেতে বা হারে কিছুরই ঠিক নেই। তবে তালিকার সর্ব্বনিম্নে ক্যালকাটা গ্যারিস্‌ন দলের স্থান প্রায় বাঁধা।

পশ্চিম বাংলার নতুন মন্ত্রিসভা

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় নতুন করে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। মূল মন্ত্রীদের সঙ্গে এবারে অনেকগুলি উপমন্ত্রীর পদও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই সব মন্ত্রীদের সংখ্যা ছোট্ট রাজ্য পশ্চিম বাংলার পক্ষে অত্যন্ত বেশী হওয়ায় নানা জায়গায় প্রতিকূল সমালোচনা হচ্ছে। বেশীর ভাগ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার কিন্তু নিয়েছেন প্রধান মন্ত্রী নিজে। মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর পদে এবারে দু'টি মহিলাও আছেন—শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় ও শ্রীযুক্তা পূরবী মুখোপাধ্যায়। বিধান সভা ও বিধান পরিষদে নতুন সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা কিরীট এডভার্টাইজিং এজেন্সী (৭২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯) প্রকাশিত ২ খানি ডাইরী (ছোট ও বড়) এবং দু'খানি দেয়ালপঞ্জী (ইংরেজী ও বাংলা বছরের) উপহার পেয়েছি। ডাইরি দু'টি সুদৃশ্য এবং তথ্যবহুল এবং দেয়ালপঞ্জী দু'টিও দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখবার মত।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রাবণ সংখ্যা রামধনু শ্রাবণের শেষ দিকে ও ভাদ্র সংখ্যা ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। আশ্বিন সংখ্যা পূজা-সংখ্যা রূপে আশ্বিন মাসের প্রথমে বাহির হইবে।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আজ তিন দিন ধরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে, আর আমার সামনে রয়েছে গোছা গোছা কবিতার বই—রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাস, শেলী আর কীট্স্‌এর বই। এখন কি আর কলম নিয়ে বসতে ইচ্ছে করে? তাই শুধু চিঠির জবাবই দেব এবার, আর কিছু নয়।

শ্রীঅখিল সরকার (কৃষ্ণনগর)—তোমার আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠিখানি ভাল করে পড়লাম। ব্যঙ্গচিত্র শীঘ্রই সুরু করবার ইচ্ছা আছে। শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ (রাজলি)—চিঠিপত্র বিভাগে আগে প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই দেওয়া হ'ত। বেশী চিঠির জবাব দিতে সুবিধা হয় বলে 'প্রশ্ন' আর দেওয়া হয় না, কিন্তু এমন ভাবে জবাব দেওয়া হয় যাতে প্রশ্ন বুঝতে কোন অসুবিধা না হয়। তোমার গল্পের যাতে রসভঙ্গ না হয় সে দায়িত্ব তো আমাদেরও! শ্রীঅমিয়কান্তি সামন্ত (বীরসিংহ)—নিয়মাবলী রামধনুতে মাঝে মাঝে দেওয়া হয়। পৃথক্ ভাবেও পাঠানো হ'ল। তোমাদের ওখানে বিদ্যাসাগর মশাইএর স্মৃতিচিহ্ন কি আছে লিখে জানালে খুসী হব শ্রীসুমেধা বসু (কাশী)—১৩৫৮র বার্ষিক সূচী পৃথক্ ভাবে ছাপা হচ্ছে, শীঘ্রই রামধনুতে বেরোবে। যাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন তাঁদেরটাও আলাদা ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী)—চিঠির জবাব আশা করি আগেই পেয়েছ। খেলাধূলার লেখাগুলি বেশীর ভাগই মনোনীত হয়ে আছে। যেগুলির সময় উত্তীর্ণ হয় নি সেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা হবে। রামধনুর প্রতি তোমার প্রীতির পরিচয় বিশেষ ভাবে অনুভব করছি। "বিতর্ক সভা"য় তেমন সাড়া আসছে কই? আসছে বারে আবার ও প্রসঙ্গের অবতারণা করব ভাবছি। শ্রীগৌরকিশোর চৌধুরী (মণিনাথপুর)—লেখা রামধনুর উপযোগী হলে কেন বেরোবে না? তবে সঙ্গে সঙ্গে কি আর হয়? ধৈর্য্য ধরতে হয়। ফটো ছাপার উপযোগী 'আইভরি ফিনিশ' কাগজ এখনও অনেকটা দুর্ল্লভ। তাই আপাততঃ গ্রাহকদের তোলা ফটো চাওয়া হচ্ছে না। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই নেওয়া হবে। শ্রীনির্ম্মলেন্দু সরকার

(ভাগলপুর)— তোমার সুস্থ হওয়ার খবরে আনন্দিত হলাম। পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা ছোট হলে প্রকাশ করা হয়। শ্রীবিজলী সরকার (বজ্‌বজ্‌)—অন্য কাগজের উপর তো আমার কোন হাত নেই! তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেখতে পার। উপযুক্ত হলে কেন ছাপা হবে না? ঠিকানা না জানা থাকলে আমাদের কাছে পাঠিও, আমরা রি-ডাইরেক্ট করে দেব। শ্রীসুস্মিতা বসু (ভবানীপুর)—তুমি ৬০ জনের মধ্যে সকলের ওপরে? বাঃ! ধাঁধাটি কিন্তু ধরতে পার নি। শ্রীবেণু ঘোষ (কাটিহার)—তিন জনকে এক এক করে গ্রাহক করতে বাধা নেই তবে এই বছরের মধ্যে হওয়া দরকার। দিল্লী থেকে কোন চাঁদা আসে নি তো! কাটিহার থেকে ভি, পি, রাখা হয়েছে বটে। শ্রীমুকুলরাণী মণ্ডল (কশাড়িয়া)—পুরস্কার-প্রতিযোগিতার লেখা, ধাঁধার উত্তর এবং ব্যক্তিগত চিঠি পৃথক্ কাগজে না দিলে গোলমাল হওয়াই স্বাভাবিক। বিভাগ যে সব আলাদা! পোষ্টকার্ডে লিখলেও এমন ভাবে দিতে হবে যাতে কেটে আলাদা করে নেওয়া যায়। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ শেষ করি।

জয় হিন্দ্‌।—ইতি রাঃ সঃ

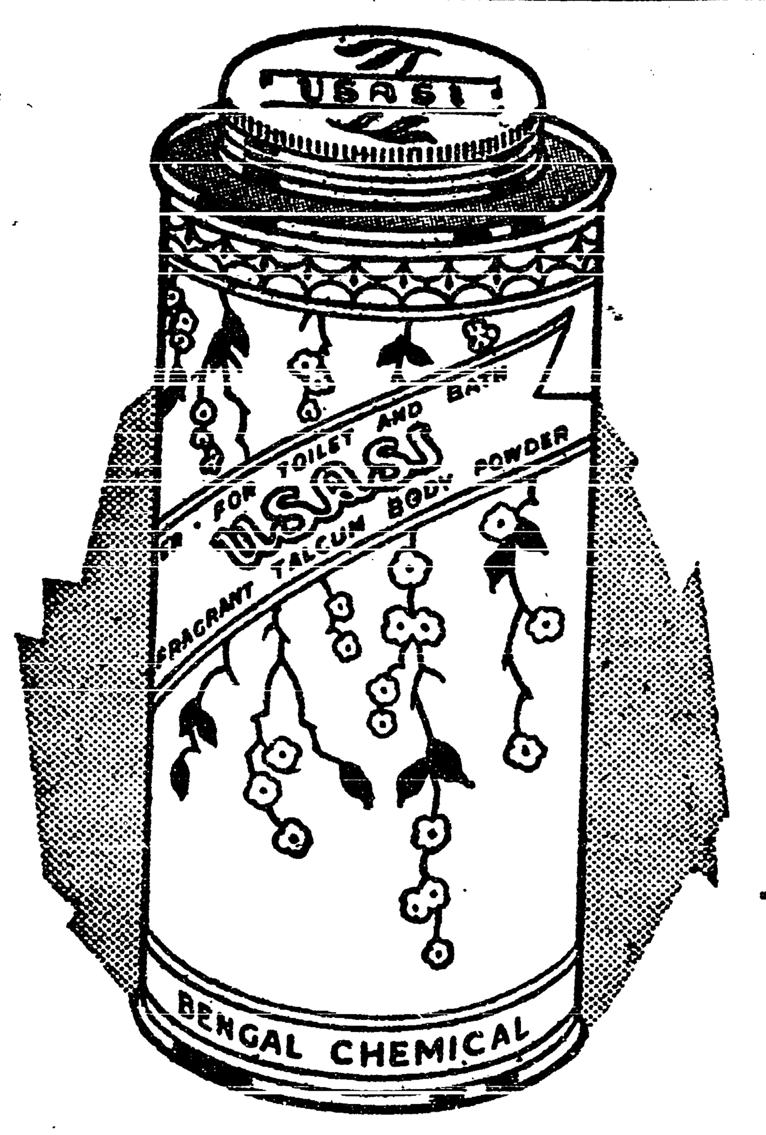

উষসী

অভিজাত প্রসাধন-রেণু

লুপ্ত ও সুপ্ত
দেহ সৌন্দর্যকে জাগ্রত করে
শিশুর কোমল অঙ্গেও নির্ভয়ে
ব্যবহার চলে

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

৫ = ৩, ৮ = ৭, ২ = ৯। তা হলে ৫৮ × ২ = ৩৭ × ৯ = ৩৩৩

উত্তরদাতাদের নাম :— রবি মজুমদার (দিল্লী) ; নিবেদিতা সেন (কলিকাতা-২৯); মণ্টু, নাটি, অঞ্জু, অর্চ্চনা, ডলি, পুতু, তাপু, মানু সিংহ (মুজঃফরপুর) ; নির্ম্মলেন্দু, বিমলেন্দু, ছোড়দা, ছোড়দি, খোকন, খুকু (চাইবাসা) ; টাটা, টুটু, টিটি, টিটো, টোটা, টৈটু (জামসেদপুর) ; খুকু, কুটু, তুতু, ধীরা, সুনুয়া, নান্টু (জলপাইগুড়ি) ; চন্দন, শুভা, শুক্লা, পূর্ণিমা, বিশু (নাকড়াকোন্দা) ; ধরিত্রী ভট্টাচার্য্য (এলাহাবাদ) ; বেণু ঘোষ (কাটিহার)।

নূতন ধাঁধা

ছোটমামা ২০টা লিচু এনে ৫টা ভাগে সাজিয়ে রাখলেন—সব ভাগ অবশ্য সমান নয়। তারপর মিনু, টুনু, অনু, কুনু আর তনু—পাঁচ ভাইবোনকে ডেকে তাদের বয়স আন্দাজ প্রত্যেককে একভাগ দিয়ে বললেন, "তোমাদের প্রত্যেককে আরও ২টো ক'রে লিচু দেব যদি কেউ ঠিক দু' মিনিটের মধ্যে বলতে পার ঐ দু'টো করে লিচু দেবার পর এই নতুন পাঁচ ভাগের গুণফল আগেকার পাঁচ ভাগের গুণফলের কত গুণ।"

সবাই ভাবতে বসে গেল, তারপর সবাই প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—"১৮ গুণ।"

ছোটমামা খুসী হয়ে আরও ২টো করে লিচু প্রত্যেককে দিয়ে দিলেন।

তোমরা বলতে পার তিনি প্রথমে কি ভাবে লিচুগুলো ভাগ করেছিলেন?

(ধাঁধার উত্তর ১৫ই শ্রাবণের মধ্যে পাঠাতে হবে।)

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

"বর্ষার দিনে কি ভাল লাগে"—এই বিষয়ে একটি সরস রচনা লিখে পাঠাতে হবে। রচনাটি বেশী বড় হবে না—১০০০ শব্দের মধ্যে রাখতে হবে। আমাদের বিচারে যার রচনা সব চেয়ে ভাল হবে সে-ই পুরস্কার পাবে। প্রতিযোগিতায় যে কেউ যোগ দিতে পারবে, তবে প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচেকার কুপনটি কেটে পূর্ণ করে আঠা বা পিন দিয়ে যুড়ে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। রচনা ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

কুপন
রামধনু
পুঃ আঃ ৫৯

নাম—
ঠিকানা—
বয়স—
নিজে গ্রাহক কিনা—

নতুন বছরের শ্রেষ্ঠ বই

সুকুমার দে সরকার প্রণীত	শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত	অশোক শাস্ত্রী প্রণীত
হানাবাড়ী ১॥০	রঘু সর্দ্দার ১॥০	স্বর্গে থিয়েটার ১৲

ছোটদের পদ্মাপুরাণ—সুনির্ম্মল বসু প্রণীত মূল্য ২৲ টাকা

শিশু নাটক
[স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত]

এই নাটকগুলি অনেক স্কুলেই অভিনীত হইয়াছে

কেদার রায় (দীপনারায়ণ মুখো)	॥৵০	বীর শিবাজী (সুধীন রাহা)	॥৵০
জাগোরে ধীরে (বিধায়ক ভট্টাচার্য্য)	॥৵০	স্বাধীনতা জাগলো (যোগেশ বন্দ্যোঃ)	॥০
স্বামীজী (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	॥৵০		
বন্দীবীর (সুনির্ম্মল বসু)	॥০	উৎসব (গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়)	॥০
চন্দ্রগুপ্ত (কেশবচন্দ্র সেন)	॥০	মুক্তিপথে (ঐ)	॥০
কর্ণার্জ্জুন (ঐ)	॥০	কুশধ্বজ (যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০
বিজয়সিংহ (ঐ)	॥০	বিদ্রোহী (ঐ)	॥০
গুরুদক্ষিণা (প্রভাসচন্দ্র ঘোষ)	॥০	সিরাজের স্বপ্ন (বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত)	॥৵০
বীর মোহনলাল (সুধীন রাহা)	॥৵০	প্রতাপসিংহ (ঐ)	॥৵০

অখিল নিয়োগী 'বাণী'—॥৵০ (পুরুষ-ভূমিকা বর্জ্জিত)

অখিল নিয়োগী 'শিশুনাটিকা'—॥৵০ (ছেলেমেয়েদের জন্য)

য়্যাডভেঞ্চার ও ভয়াবহ কাহিনী-পরিপূর্ণ শিশু-উপন্যাস

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত		নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত		অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত	
আবার যখের ধন	১।০	নিশির ডাক	১৲	দুই ভাই	১॥০
আধুনিক রবিন হুড	১।০	রক্তমুখী ড্রাগন	১৲	সুনির্ম্মল বসু প্রণীত	
হিমালয়ের ভয়ঙ্কর	১।০	বিষের তীর	১৲	মরণের ডাক	১।০

বিস্তারিত তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব-সাহিত্য কুটীর ২২।৫। বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯

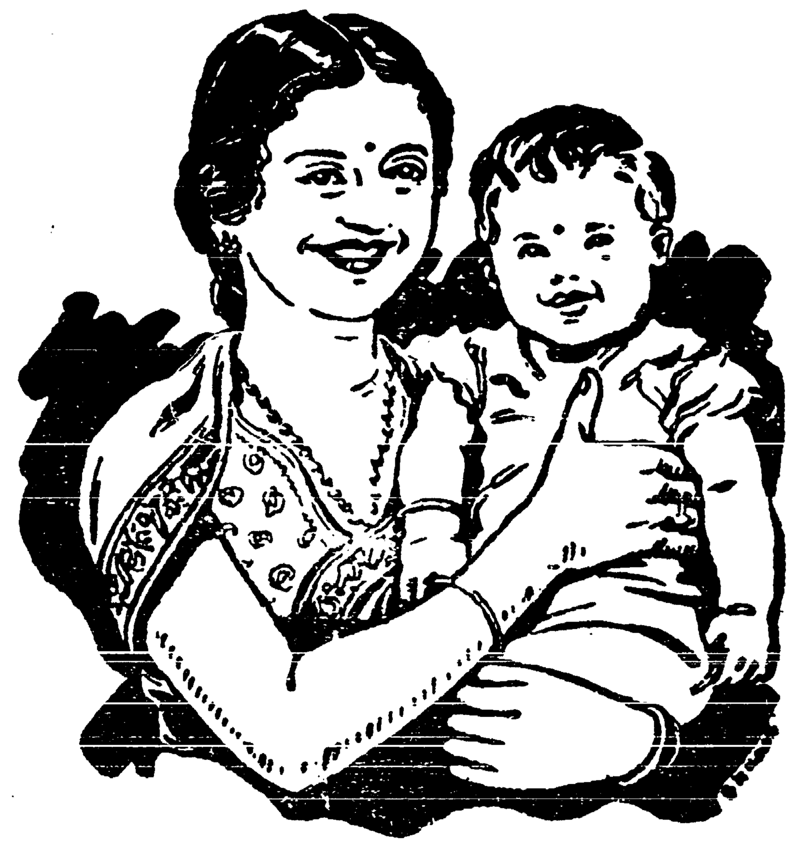

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই
[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাল এজুকেশন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত]

১।	মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু	...	৪৸০
*২।	গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১॥০
*৩।	মাঞ্চুসেনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার— „	...	৸০
*৪।	ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস	...	১।০
*৫।	„ আইনষ্টাইন— „	...	১।০
৬।	„ মার্কনি— „	...	১।০
*৭।	দেশবিদেশের লেখা ...	...	৩৲
৮।	গল্পবীথিকা— গদাধর নিয়োগী	...	১৸০
*৯।	আসামের অরণ্যচারী—নলিনীকুমার ভদ্র	...	১॥০

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত
বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

চয়নিকা মাসিক পত্রিকা
নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল
৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

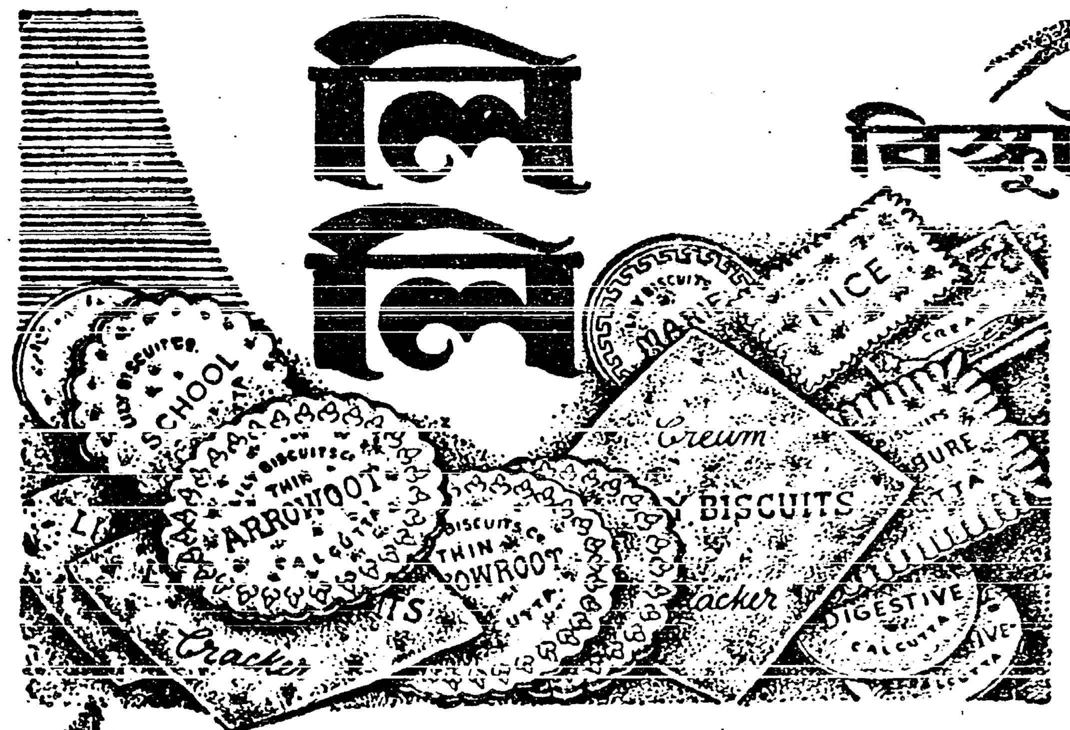

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন ক্রীম,
ক্যানিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

রজত জয়ন্তী বর্ষ

সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সলোমন এণ্ড কোং

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড (মোহতা হাউস) কলিকাতা-১

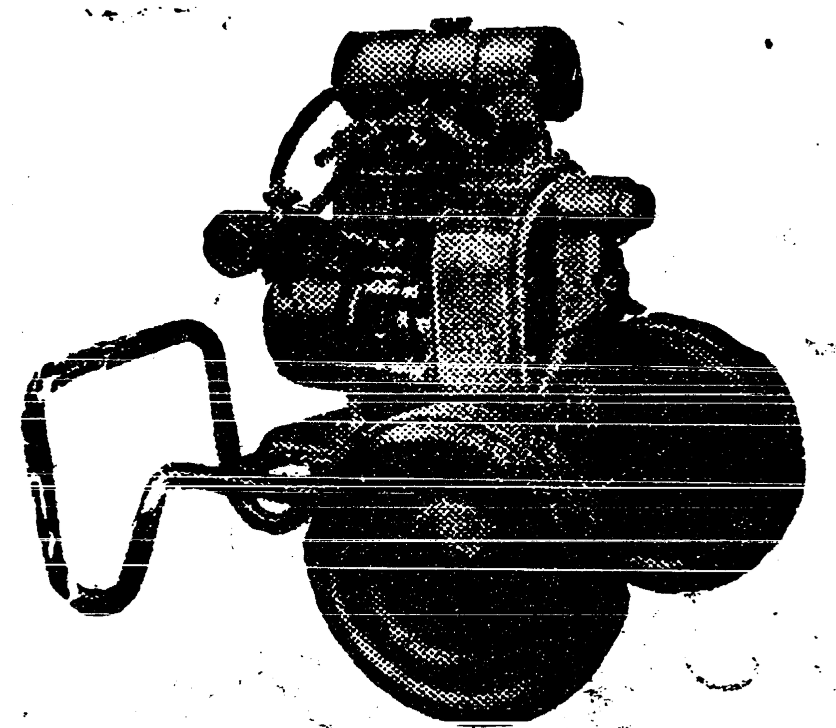

নানা প্রকার ডিজেল—কেরোসিন — পেট্রোল ইঞ্জিন, হাণ্ড ও পাওয়ার-পাম্প—গ্যালভানাইজড টিউব প্রভৃতি আমদানী ও প্রস্তুতকারক।

সোল প্রোপ্রাইটার : নৃপেন ভট্টাচার্য্য

GRAM : AGRASTONS • • • PHONE : BANK 4497

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আমাদের কবি

আবির্ভাব—২৫শে বৈশাখ　　　　তিরোভাব—২২শে শ্রাবণ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি রঞ্জিত

২৫শ বর্ষ } **শ্রাবণ, ১৩৫৯** { ৪র্থ সংখ্যা

হা'ঘরে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

থাকি দিবানিশি পথে প্রান্তরে
চাই—পাই আলো হাওয়া,
চলে উদ্দাম বাতাসের সাথে
আমাদের গান গাওয়া।
পাশেই শৃগাল, সর্প, ব্যাঘ্র
ডাক দিয়ে যায় আসি,
তাহারাও জানে আমরা তাদের
দু'দিনের প্রতিবাসী।
মাটির প্রতিটি রেণুর সঙ্গে
ঘন পরিচিত হই,

জানি নে কখন কোথায় তাদেরি
সঙ্গে মিশিয়া রই।
নাহিকো ক্ষোভের লেশ—
দেখিতেছি দিন কত সঙ্গীর
পথে হতে খেলা শেষ।

উষর মাঠেতে ক্ষণিকের বাস
তবু রয়ে যায় দাগ,
বুঝিতে পারি নে মাটি বোঝে কি না
আমাদের অনুরাগ।
বিজনের ফুল মরুর কুসুম
ভাল যে বাসে তা বুঝি,
আমরাই দিই তাদিকে তারিফ,
চুলে পরি, কাণে গুঁজি।
তারকারা পাতে আকাশে শিবির—
রাতে লাগে বড় ভালো,
তাহারাও যেন আলাপ করিছে —
তঁবুতে তাঁবুতে আলো।

মোরা চিনি ধ্রুবতারা—
অন্ধকারেতে যে দেখায় পথ
হই নাকো দিশেহারা।

গৃহ পরিহরি' কি পাঁবো জানি না
তবু তা পেতেই ছুটি,
দূরত্ব সেই সমানই যে থাকে
ঘুমাই এবং উঠি।
খুঁজি মোরা বুঝি পরশ-পাথর,
সন্ধান করি সুধা,
পাই না তা কই? মানুষ মানুষ,
যায় না আদিম ক্ষুধা।
আগায়ে যাওয়াই কর্ম্ম মোদের—
ধর্ম্ম মোদের তাই,
বুঝি মালিকের কাছেই আগাই
পাই বা তাঁরে না পাই।
যেখানে থাকি বা মরি—
এটা মনে জানি চলেছি তাঁহারি
মন্দিরপথ ধরি'।

যাঁদের লেখা তোমরা পড়ো

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

১

তোমাদেরই মতো তাঁদের অনেককেই আমি দেখি নি। কিন্তু যাঁদের দেখেছি বা দেখে আসচি, যাঁদের সঙ্গে কথা বলেচি, বলে আনন্দ লাভ করেচি, মিতালী পাতিয়ে গৌরব ও তৃপ্তির অধিকারী হয়েচি তাঁদের সংখ্যাও অল্প নয়। তাঁদেরই কথা তোমাদের জন্য আজ লিখতে বসেচি।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ পরলোকে। এই পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে রয়েচে কেবল তাঁদের রচনাবলী, অন্তরে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁদের মধুময় স্মৃতি। তাঁরা তোমাদেরই জন্য লিখে গেচেন, তাতেই জীবনপাত করেচেন। আর যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরাও তোমাদেরই জন্য সাহিত্য সৃষ্টি ও পুষ্টিকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করে তা পালনে নিযুক্ত। আমার পরিচিত পরলোকগত বা জীবিত এই সকল সহকর্মিগণের কথাই আমার এই রচনাটির মুখ্য বিষয়।

তোমরা অনেকের লেখাই পড়ে থাক। কিন্তু তাঁরা সকলেই মুখ্যতঃ তোমাদের জন্য লেখেন না, যদিও তাঁদের অনেকেরই হাতে খড়ি তোমাদের সাহিত্য ও তোমাদের পত্রিকায়। সে সকল পত্রিকার অন্যতম হচ্ছে পঁচিশ বৎসরের বৃদ্ধ "রামধনু"। "রামধনুর" শৈশবের দিনগুলি তাঁদের কাঁচা লেখায় সবুজ ও রসালো হয়ে আছে। তাঁদের কথা বলবো পরে, আগে বলি কেবল তোমাদেরই জন্য যাঁরা লেখেন তাঁদের কথা।

"রামধনুকে" বৃদ্ধ বলেচি, কারণ সে মানুষ নয়। পঁচিশ বৎসরের মানুষ তরুণ। কিন্তু মানুষের কীর্তি পঁচিশ বৎসরে পদার্পণ করলে তাতে প্রাচীনত্বের ছাপ পড়ে। এই জন্যই "রামধনু" বার্ধক্যে উপনীত হয়েচে। কীর্তি যত প্রাচীন হয় ততই তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে ও আদরের সামগ্রী হয়ে উঠে। বাংলা দেশে আরও দু'খানি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা "রামধনুর" বৎসর কতক আগে পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করে সুস্থ দেহে সাহিত্য-ক্ষেত্রে চলমানা। সকলেরই সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। সব কয়খানির সঙ্গেই আমার সৌহার্দ্য ও অল্পবিস্তর সম্পর্ক আছে।

ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—"পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল" আর

পড়েছিলাম "অ—য় অজগর আসছে তেড়ে, আ—য় আমটি আমি খাব পেড়ে—"। "পড়েছিলাম" বল্‌লে ঠিক হবে না, সাথীদের মুখে শুনেছিলাম। কারণ যে বইয়ে এই ছড়া ও ছবিগুলি ছিল সে বই আমার ছিল না; বাড়িতে কেউ কিনেও দেন নি। যে বই কিনে দিয়েছিলেন তাতে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ঐ কবিতাটি ছিল, যতদূর মনে পড়ে একেবারে শেষ দিকে। তর্কালঙ্কার মহাশয় একেবারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমলের লোক, তাঁর বন্ধু। কাজেই তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু কবিতাটিতে প্রভাতের যে সহজ বর্ণনাটি আছে তার কিছু কিছু দেখবার সৌভাগ্য হ'ত। কারণ পুরুষানুক্রমে এই শহরের অধিবাসী হলেও আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছিল একটি মফঃস্বল-শহরে এক সুপ্রশস্ত বিখ্যাত নদী-তটে। সেখানে ভোরে "পাখি সব রব" করতো, "রাখাল গরুর পাল" মাঠেও নিয়ে যেত, কিন্তু ভোরের সঙ্গে সঙ্গে "কাননে কুসুমকলি" সব ফুটতে দেখতাম না। তবে আমাদের পল্লীতে যে কয়টি শিশু ছিল তারা "নিজ নিজ পাঠে মন" দিত। কিন্তু আমার পক্ষে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে "নিজ বেশ" পরিধান করে "আপন পাঠেতে" মনোনিবেশ করার আগ্রহের বিষম অভাব ছিল। আর "নিজ বেশ" পরিধানের প্রয়োজনও ছিল না। কারণ "বেশ" ছিল একটাই এবং সেটাই পরিধান করে থাকতাম। রাত্রেও সেইটিই পরে নিদ্রা যেতাম। সেটি ছিল আট-হাতী মোটা ধুতি। তখন শিশুমহলে আটপৌরে হাফপ্যান্টের চলন হয় নি, এবং বয়স্কমহলে তা পরবার পরামর্শও দেবার মতো কোন উত্তম পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নি অথবা করেছিলেন কিন্তু ছিলেন লোক-চক্ষুর অগোচরে।

৺যোগীন্দ্রনাথ সরকার

গ্রে-সাহেবের "বিষাদ-সঙ্গীত" যে কেবল মিছে একটি গান বা কবি-কল্পনা নয় তার সাক্ষ্য এখনকার সারা ভারতে ছড়ানো প্রকাশ্য মণি-রত্নগুলি।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কবিতাটির কথা থাক্, এখন ঐ ছড়াটির কথা বলি। প্রথমে শুনেছিলাম দু'টি ছত্র। তার পর একদিন শুনলাম সবটুকু। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে চেহারাটিতে পালোয়ানী ঢঙ্ এসেছিল। তবে তা পেটেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর হাত-পা ও বুকের তুলনায় মাথাটা হয়ে উঠেছিল বিদ্যাসাগরী। পাঁচন, টনিক, বড়ি, জলপড়া খেয়ে খেয়ে আর ওষুধ খেতে ইচ্ছে হ'ত না। ছড়াটি শোনবার পর থেকেই ওষুধ দিতে বা খাওয়াতে এলেই বলতাম, "ঔষধ খেতে মিছে বলা।" তারপর আরও কত শুনলাম। "আজিডাঙা, কাজিডাঙা মধ্যে ধনেখালি; সেখান থেকে এল ব্যাঙ চৌদ্দ হাজার ঢালী।" আর সেই সঙ্গে দেখলাম, চৌদ্দ হাজার ব্যাঙা ঢালীর সারবন্দী ছবি। কিন্তু কার তৈরী বই সেদিকে তেমন নজরই গেল না। শৈশবে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দিকেই মন থাকে; সৃষ্টিই মনকে মুগ্ধ করে। তার পর কিছু বড় হয়ে "মজার দেশে" ছেলেদের রসগোল্লা ফেলে ক্যাস্টর অয়েল খাওয়া এবং "দিনে চাঁদের আলো" দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে দু'-একজন "কাজের ছেলে" ছিল। তারা বাজারে "দাদখানি চাল" ও "সরিষার তেল" আনতে গিয়ে পথে ঘুড়ি ওড়ানো ও মার্বেল খেলা দেখে সেখানে এমন জমে যেত, যে, তাদের বাড়ি থেকে লোক যেত খুঁজতে। শেষে একদিন স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানে একটি ছাত্র "কাজের ছেলে" আবৃত্তি করে এমন মুগ্ধ করে ফেললো যে আজও তার কথা ভুলতে পারি নি। এখনও ঐ কবিতাটি পড়তে গেলেই "কাজের ছেলে"র ছবি দেখে মনে প্রশ্ন জেগে উঠে—এই ছবি কি আমার কৈশোরের ছেলেটির?

সেই সময় থেকে লেখককে জানবার কৌতূহল একটু একটু করে জাগতে লাগলো। কিন্তু তাঁকে আর জানা হ'ল না; জানা হ'ল কেবল তাঁর নামটি, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, এবং তা মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে রইলো। তার পর তাঁর লেখা কত বই পড়লাম, পড়ে প্রচুর আনন্দ পেলাম। পড়তে পড়তে মনে হ'ল "এমন আর কেউই লিখতে পারে না।"

তারপর দিনে দিনে বহুদিন গেল। এই শহরে এসে এক সময় ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম। বলতে কুণ্ঠিত হই, বরাবরই লেখার দিকে একটু ঝোঁক ছিল; কিন্তু লেখাই যে এক সময়ে জীবনের বৃত্তি হয়ে উঠবে মনে এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও সব দিক্ দেখে-শুনে ভরসা বিশেষ ছিল না। তবুও যাহোক-কিছু লিখবার জন্য হাত-চুলকাতো। মাঝে-সাঝে দু'-একটা

লেখার বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণাও লাভ হ'ত। অবশ্য সে সময়টাকে বঙ্গসাহিত্যের আশীর্বাদের যুগ বললেও ভুল বলা হয় না। বেশির ভাগ লেখককেই সম্পাদক-মহাশয়দের আশীর্বাদ ও পাঠকের প্রশংসা লাভ করেই খুসি থাকৃতে হ'ত। কিন্তু ও দু'টিতে তো জঠরজ্বালা শান্ত হয় না! লেখককে খেয়ে-পরে, খাইয়ে-পরিয়ে, বেঁচে ও বাঁচিয়ে রেখে তবে সাহিত্য-রস পরিবেশন করতে হয়। অবশ্যি যিনি অন্য কর্ম করেন ও অবসরে সাহিত্যচর্চা করে থাকেন তাঁর অবস্থা পেশাদারী লেখকগণ থেকে পৃথক্।

যে সময়কার কথা বলছি, সে সময়ে এমন এক প্রতিষ্ঠানে জীবিকার্জন করতাম যার সঙ্গে সাহিত্যের দূরতম সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু তার কর্তৃপক্ষ ছিলেন রসিক ব্যক্তি। তাঁদের একজন তো টলস্টয়ের রচনার এমন ভক্ত ছিলেন যে টলস্টয়ের মৎসংগৃহীত একখানি পুস্তক পাঠ করতে নিয়ে একদম জীর্ণ করে ফেললেন। ভুক্তদ্রব্য যে মৃতের মতো আর ফিরে আসে না এ তো সবাই জানে। সেখানে সাহিত্যের সম্পর্ক না থাকলেও একজন সাহিত্যিকের আনাগোনা ছিল। তিনি হলেন "কল্লোলের" দীনেশচন্দ্র দাশ মহাশয়।

আমার সঙ্গে দু'-একখানি মাসিক পত্রিকার যোগ ছিল, তিনি জানতেন। জানতেন যে সেই পথে আমার যৎসামান্য উপার্জনও হয়।

একদিন তো আমাকে হঠাৎ বলে বসলেন, "আপনি আমাকে আক্রমণ করে যা তা লেখেন কেন? ওতে আমার কতটা বিজ্ঞাপন হচ্ছে জানেন? বিলেত হলে আপনি এর জন্য পয়সা পেতেন।"

তিনি গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন। কথাগুলি বলতে বলতে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। আমি তখন তাঁর সামনে একটি প্যাকিং বাক্স থেকে একটি লৌহ-পণ্য টেনে বার করবার চেষ্টা করছি। তাঁর কথায় মনে যেমন বিস্ময়, তেমনি হাসির উদ্রেক করলো। বললাম, "ভুল করছেন। ও সব আমি লিখি না।—"

তবুও তিনি শান্ত হলেন না, তেমনি উত্তেজিত ভাবে বললেন, "বিলেত হলে আপনি এর জন্যে পয়সা পেতেন।"

দুঃখ হ'ল যে এটা বিলেত নয় বলেই পরের লেখার জন্য পুরস্কারের পরিবর্তে আক্রান্ত হতে হ'ল।

এই প্রতিষ্ঠানে যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্রের গতায়াত ছিল। যত দূর মনে পড়ে তিনিই একদিন কথায় কথায় তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে

আমার পরিচয় করে দেবার প্রস্তাব করলেন। টলস্টয়-ভক্ত আমার অন্যতম মনিব মহাশয় বললেন, "আমি সঙ্গে নিয়ে যাব!"

প্রসঙ্গতঃ বলি, লোহা-লক্কড় বিক্রয়ের অবসরে তাঁর একটু-আধটু লেখনী-চালনারও শখ ছিল। তাঁর লেখনী মাঝে মাঝে লৌহ-খণ্ডের মতো দু'-একটি কবিতাও প্রসব করতো এবং আমাকেই তা উৎকৃষ্ট বলে দু'-একবার প্রকাশও করতে হয়েছিল। যাই হোক্, তাঁরই সঙ্গে একদিন, মনে হয় সকালের দিকেই, কম্পিত হৃদয়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাসভবনে গেলাম। তিনি তখন থাকতেন হ্যারিসন রোড ও বেনেটোলার সংযোগ-স্থলের পার্শ্বে একখানি দ্বিতল গৃহে। সে সাক্ষাতের কাহিনী আগামী বারে বলব।

ডাক্তার বাবু

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

খেয়ে ঘুমিয়ে দিন আর কাটে না!

বলতে কি, দু'-চারদিনের মধ্যেই আমি তিত-বিরক্ত হ'য়ে উঠলাম। কেন ছাই ট্রেনের হাঙ্গামা ক'রে এখানে এলাম! এর চেয়ে যে কলকাতাই ঢের ভালো ছিলো! কলকাতায় তবু সময় কাটানোর অনেক উপায় আছে, কিন্তু এখানে আছে কী? ন্যাড়া খেজুর গাছ, ফাঁকা মাঠ, ইটের পাঁজা, ছোট্ট একটা রেল-ইষ্টেশন। রাবিশ!

মুখ দেখে পিসেমশাই বোধ হয় আমার মনের কথা আন্দাজ ক'রলেন। অভ্যেস-মাফিক খানিক হেঁ-হেঁ ক'রে ব'ললেন,—আছে, আছে, এখানেও আছে।

ব্যস্, তার পরে চুপ। কী আছে, কোথায় আছে—সে বিষয়ে আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। পিসেমশাই চোখ বুজে একমনে পান চিবুতে লাগলেন।

এক মিনিট গেলো, দু'মিনিট গেলো, দশ মিনিট গেলো। আমি আর থাকতে পারলাম না, আস্তে আস্তে বললাম,—কী আছে পিসেমশাই?

চোখ মেলেও পিসেমশাই ঘস্ঘস্ ক'রে দু'মিনিট পান চিবুলেন। তারপর বললেন,—পাগলা-গারদ।

পাগলা-গারদ? কিন্তু সেখানে কি নেহাৎ দর্শক হিসেবে আমাকে ঢুকতে দেবে?

—দেবে। আমি ডক্‌টর সামন্তকে ব'লে দেবো। যাবি ?

যাবো মানে ? আমি তো এক পায়ে খাড়া।

পিসেমশায়ের সঙ্গে ডক্‌টর সামন্তের ঘোরতর আলাপ। পরদিন সকালবেলা পিসেমশাই আমাকে নিয়ে গেলেন শহরের শেষ সীমায়, পাগলা-গারদে। পিসেমশাইকে দেখে যে ভদ্রলোক 'আসুন আসুন' ক'রে উঠলেন, অনুমান করলাম তিনিই ডক্‌টর সামন্ত। ট্রুম্যান, বাঁধাকপি, জওহরলাল নেহেরু, সজনে ডাঁটা, লাল ভালুক, রাবড়ি ইত্যাদি আলোচনার পরে পিসেমশাই আসল কথাটি পাড়লেন। হ্যাঁ, আমাকে একবার পাগলা-গারদের মধ্যে ঢুকবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ ! — ডক্‌টর সামন্তের উৎসাহ দেখে আমার মনে হ'লো ইনি বুঝি আমাকে চিরজীবনই পাগলা-গারদে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

ডক্‌টর সামন্তের এত উৎসাহের পরেও একটু 'কিন্তু' আছে। —কিন্তু একটু অপেক্ষা ক'রতে হবে। এখনো ওদের ব্রেক-ফাষ্ট শেষ হয় নি। ওটা না হ'লে—

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। —বলতে বলতে পিসেমশাইও উঠলেন। —তুই তাহ'লে থাক। দেখে-শুনে তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি চ'লে যাবি। তাড়াতাড়ি যাস কিন্তু, না হ'লে আবার তোর পিসীমা, যাক গে'—। তারপর ডক্‌টর সামন্তের দিকে তাকিয়ে,—আমি এখন চলি, আমার আবার না হ'লে আপিসে দেরি হ'য়ে যাবে। ও তাইলে রইলো, আপনি একটু— ।

—ঠিক আছে, কিস্যু ব'লতে হবে না।

পিসেমশাই তো চ'লে গেলেন। ডক্‌টর সামন্তও সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নীচু ক'র একটা কালো চামড়া-বাঁধানো মোটা খাতায় কি সব লিখতে আরম্ভ ক'রলেন। আধঘণ্টা কাবার হয়ে গেলো, তবু ওঁর লেখা আর থামে না ! এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে একটা মানুষ ব'সে আছি, সেটা যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আচ্ছা, পাগলা-গারদের ডাক্তারও কি পাগল হয় ?

অসহ্য, অসহ্য। মরীয়া হ'য়ে আমি একবার ঘর্‌ঘর্‌ ক রে গলা-খাকারি দিলাম।

—ও, আপনি ?

না, যা ভেবেছি তা নয়। এই সহৃদয় উক্তিটুকু ডাক্তারবাবু আমার উদ্দেশে করেন নি। যাকে ক'রেছেন তিনি আমার পাশের চেয়ারে ধপ্‌ ক'রে বসে মাথার টুপি খুলে হাওয়া খেতে লাগলেন।

—ইনি হচ্ছেন ডক্‌টর মহলানবীশ। —ডকটর সামন্ত আমার দিকে তাকালেন। আর ইনি, আপনার নামটা—যাক গে, ইনি হ'লেন পরাশর বাবুর—ইয়ে ; পরাশর বাবু আপনার কী হন তো ?

—পিসেমশাই।

—পিসেমশাই, পিসেমশাই। থ্যাট্‌স্‌ গুড্‌। —ডক্‌টর সামন্ত হাতঘড়ির দিকে তাকালেন

একবার। —তা ইনি একটু পাগলা-গারদটা ঘুরে-টুরে দেখবেন। আমার আবার এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে, ডক্‌টর মহলানবীশই আপনাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে—কি বলেন ?

টুপির হাওয়া খেতে খেতে ডক্‌টর মহলানবীশ ব'ললেন—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ।

ক্ষণিকের মধ্যে ডকটর সামন্ত ধাঁ ক'রে ঘরের দরজা পেরোলেন, তারপর একটা লক্কর সাইকেল চাপলেন, তারপর ক্রিং ক্রিং ক্রিং—ব্যস্‌, এখন শুধু আমি আর ডক্‌টর মহলানবীশ।

ডক্‌টর মহলানবীশ নিজেই কুঁজো থেকে গড়িয়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেলেন। আঃ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, একবার হাই তুললেন, তিনবার তুড়ি বাজালেন, তারপর ব'ললেন—পরাশর বাবু তাইলে আপনার পিসেমশাই ?

আমি আর কি ব'লবো, গোনাগুনতি তেরোটি দাঁত বের ক'রে মদনমোহন ভঙ্গীতে একটু হাসলাম, যার ভাবার্থ—আজ্ঞে, যথার্থ ব'লেছেন !

—পাগল ক'রকম হয় বলতে পারেন ?

যা থাকে বরাতে। কপাল ঠুকে ব'ললাম—দু'রকম হয়।

ডক্‌টর মহলানবীশ তবুও নাছোড় ;—যথা ?

—মানে, ইয়ে আর কি। পাগলা-গারদের মধ্যে একরকম পাগল, আর—। আমি ডক্‌টর মহলানবীশের মুখের ওপরেই ব'ললাম—আর পাগলা-গারদের বাইরে আরেক রকম পাগল। এক আর একে মিলে হ'লো—

কী হ'লো কে জানে, ডক্‌টর মহলানবীশ হো হো ক'রে প্রাণ-পাগল-করা একখানা হাসি হাসলেন। বললেন—আপনি দেখছি পাগলের ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি।

তারপর আমার মতো আনাড়িকে পাগল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবার জন্যেই বোধ হয় ডক্‌টর মহলানবীশ এক নাগাড়ে ব'কে যেতে লাগলেন। তাঁর সেই বকবকানির সারমর্ম হচ্ছে এই যে পাগলদের কথায় সব সময় সায় দিয়ে যেতে হয় ; পাগলদের কথায় উল্টে প্রতিবাদ করলেই ওরা ক্ষেপে গিয়ে আঁচড়ে-কামড়ে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাবে। তা ছাড়া পাগলদের আবার নানা রকম খেয়াল থাকে। যেমন এই ছোট পাগলা-গারদের সব পাগলেরই ধারণা যে তারা প্রত্যেকেই উদয়শঙ্করের আত্মীয় এবং ভালো নাচতে জানে। যেহেতু পাগলদের কথায় প্রতিবাদ করা বারণ, তাই ওরা যখনই উদয়শঙ্করের সঙ্গে আত্মীয়তার উল্লেখ করে, তক্ষুনি ঘাড় হেলিয়ে বলতে হয়—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কথা শুনতে শুনতে হয়তো আমি কিছু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম, ডক্‌টর মহলানবীশ কড়িকাঠ কাঁপিয়ে হাঁকলেন,—বুঝেছেন ?

সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘাড় হেলিয়ে বললাম,—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

দেরাজ খুলে তারপর ডক্‌টর মহলানবীশ একটা পেল্লায় চাবি বের ক'রে ব'ললেন—চলুন।

গেটে খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ডক্‌টর মহলানবীশ বললেন—দরজার বাঁ-দিকে

দেখুন একটা স্যুইচ আছে, ওটা কলিং বেলের স্যুইচ। সব দেখে-শুনে এসে ওটা টিপলেই আমি এসে দরজা খুলে দেবো। বুঝেছেন ?

আমি আবারও ঘাড় হেলিয়ে ব'ললাম,—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

ডক্‌টর মহলানবীশ তো চলে গেলেন। আমার বুক একেবারে টিপ টিপ করছিল না তা নয়, তবু চলতে স্থরু করলাম। কিন্তু দু'পা যেতে না যেতেই এক ভদ্রলোক আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রলেন। —আপনাকে ডক্‌টর মহলানবীশ ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি কি পাগলা-গারদ দেখতে এসেছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে ভদ্রলোক কি মনে ভাবলেন, তারপর আস্তে আস্তে ব'ললেন—কী যে আপনাদের সখ ! আপনার মতো অনেকেই বেশ-জানা আর স্থপারিশের জোরে মাঝে মাঝে পাগলা-গারদ দেখতে আসে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে আপনার-আমার মতো পাঁচ জন, যারা ভাগ্যের দোষে পাগল হয়ে গিয়েছে, তাদের দেখে আনন্দ পেতেও লোকের ইচ্ছে করে ! লোকে একবারও ভাবে না যে এ-অবস্থা তাদেরও হতে পারতো কিম্বা এখনো হ'তে পারে। এও যেন চিড়িয়াখানা দেখার মতো একটা খেয়াল।

সত্যিই মনে মনে যথেষ্ট লজ্জিত হ'লাম। একবার ভাবলাম ফিরে যাই। খানিক চুপ ক'রে থাকার পর এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভদ্রলোক আবার ব'ললেন,—যাক গে ; কর্তার ইচ্ছায় কম্মো। চাকরী ক'রে খাবো, আমার অত মাথাব্যথায় কাজ কি ? এই দেখ, এত কথা বললাম, আমাদের পরিচয়ই যে হ'লো না এখনো ! আমি হচ্ছি এখানকার ইন্-ডোর ডক্‌টর, ডক্‌টর সেনগুপ্ত। মহলানবীশ মশাই হচ্ছেন আউট্-ডোর ডক্‌টর, আর ডক্‌টর আর সামন্ত হচ্ছেন আমাদের স্থপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। আপনি ?

পিসেমশাই এ-শহরে একজন ধনী লোক, আমি তাঁর নাম ক'রে আমার পরিচয় দিলাম।

বিলক্ষণ, বিলক্ষণ।—পিসেমশায়ের নাম শুনে ডক্‌টর সেনগুপ্ত একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,—তাহ'লে তো আপনি আমাদের ঘরের লোক, মশাই ! চলুন এগোনো যাক।

পাগলা-গারদের মধ্যে প্রথম যে পাগলের সঙ্গে পরিচয় হ'লো, ডক্‌টর সেনগুপ্তের মুখে শুনলাম তার নাম বিশু। দিব্যি ভালোমানুষের মতো বিশু-পাগলা আমাকে নমস্কার ক'রে একগাল হাসলো, ব'ললো,—নাচ দেখবেন স্যর, ভালো নাচ ? আমাকে চেনেন না স্যর ? আমি হচ্ছি উদয়শঙ্করের বড় পিসীমার ভাগ্নে-জামাইএর দাদা। নাচ দেখলেই সেটা টের পাবেন স্যর !

কথা শুনে আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, ডক্‌টর সেনগুপ্ত ব'ললেন,—এই ভদ্রলোককে ভালো ক'রে একটা নাচ দেখিয়ে দাও, বিশু !

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে বিশুর নাচ স্থরু হয়ে গেলো। স্থরু হ'লো, অনেকক্ষণ কাটলো কিন্তু সারা হবার কোনো লক্ষণ নেই। আর সে কী নাচ ! ডক্‌টর সেনগুপ্ত গম্ভীর মুখে আমার পাশে দাঁড়িয়ে না থাকলে সেদিন আমি নিশ্চয়ই হাসতে হাসতে হার্টফেল করতাম।

ডক্‌টর সেনগুপ্তের ইশারায় আবার এগোতে স্থরু করলাম। বেশ খানিকদূর হেঁটে একবার পিছন ফিরে দেখি বিশু-পাগলা তখনও সমান উৎসাহে নেচে চলেছে !

তারপর শম্ভু-পাগলা। —আমি হ'লাম উদয়শঙ্করের মাসতুতো ভায়ের আপন জ্যেঠতুতো বোনপোর জামাইএর ভাই। অ, আপনার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না ? বেশ, প্রমাণ দেখুন।

প্রমাণ হ'লো নাচ। মন্দের ভালো হচ্ছে এই যে অল্পের মধ্যেই নাচ থামিয়ে শম্ভু-পাগলা আমাকে জিজ্ঞেস করলো,—কী দাদা, এবার বিশ্বাস হ'লো তো ?

কখন কি বেঁফাস বলে ফেলি, সেই ভয়ে এমনিই আমি যথেষ্ট সতর্ক হ'য়ে আছি।

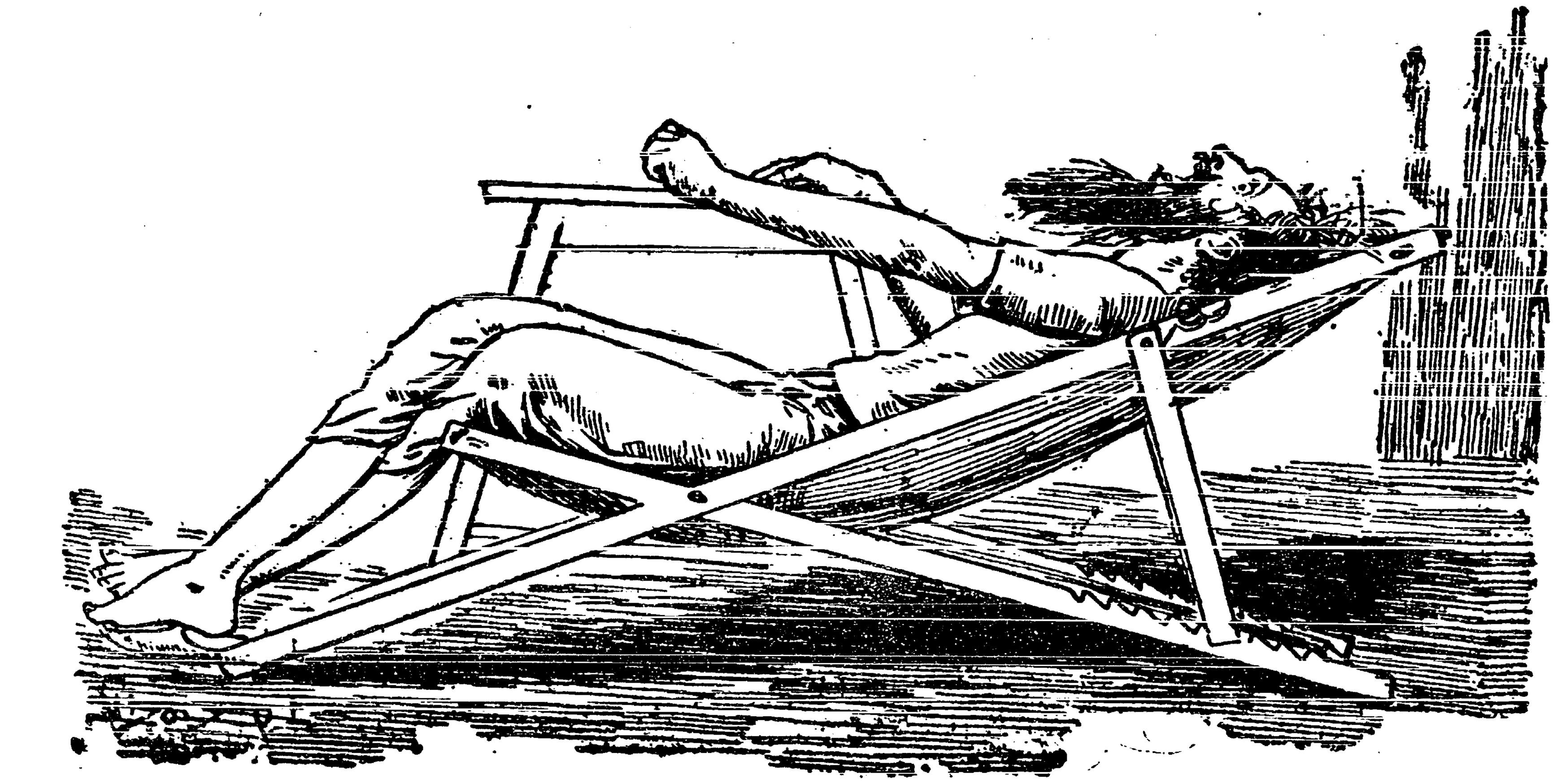

লম্বা লম্বা দাড়ি নিয়ে……শুয়ে ছিল।

শম্ভু-পাগলার কথায় গল্‌গল্ ক'রে বললাম,—কী যে বলেন, বিশ্বাস আবার হবে না ! এ-নাচ দেখেও যে-ব্যাটা আপনার কথা বিশ্বাস করবে না সেটা তো একটা বদ্ধ পাগল !

—বদ্ধ পাগল, এ্যাঁ ? —হেঁ হেঁ হেঁ ক'রে টেনে বিদ্‌ঘুটে গলায় খানিক হাসলো শম্ভু-পাগলা। —তা আপনি যখন আমাকে চিনতেই পেরেছেন, তখন যাবার আগে দয়া ক'রে একটা বিড়ি ছেড়ে যান দেখি, দাদা !

শম্ভু-পাগলাকে ছেড়ে এসে পড়লাম রমেশ-পাগলার পাল্লায়। —না মশাই, যা ভেবেছেন তা নয়, আমি ফাল্‌তু লোক নই। আমি কে জানেন ?

ব'ললাম,—চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি যে নিশ্চয়ই আপনি উদয়শঙ্করের একজন ঘনিষ্ঠ—।

রমেশ-পাগলা আমার কথাটা লুফে নিলো,—ঘনিষ্ঠ মানে ? বলতে গেলে উদয়শঙ্করের সঙ্গে আমার কোন তফাৎই নেই। উদয়শঙ্কর হচ্ছেন আমার পিসতুতো মামার সাক্ষাৎ খুড়্-শশুরের সম্বন্ধী। প্রমাণ চাই ?

প্রমাণ চাই না, সে কথা তো আর বলবার জো নেই, অতএব বাধ্য হয়েই রমেশ-পাগলার পিলে-চমকানো নাচ দেখতে হ'লো। পাশে ডক্‌টর সেনগুপ্ত গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি সমস্ত হাসি বেমালুম চেপে রেখেছি। ফলে আমার পেটের মধ্যে নাড়ি-ভুঁড়ি সব ছিঁড়ে যাবার দাখিল।

শুধু বাঙ্গালী নয়, একজন হিন্দুস্থানীও আছে, নাম হনুমান তেওঁয়ারী। লম্বা লম্বা দাড়ি নিয়ে একটা ডেক্-চেয়ারের ওপর সে শুয়ে ছিল। হাঁ ক'রে কি ভাবছিল সে-ই জানে। আমাকে দেখেই তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠল।—হ্যাঁ বাবুজী, বাংলা মুলুকে রহিয়ে রহিয়ে আখুন হামি বিলকুল বাংগালী হইয়ে গেছে। হামি কে চিনেন? চিনেন না তো? হামার ফুফার একঠো মৌসা-ভাই উদয়শঙ্করজীর দাদার একবারে পেয়ারের জন ছিলো। উদয়শঙ্করজীকে সে ব'লতো—দাদাবাবু। হেঁ হেঁ হেঁ। তবে দেখুন, উদয়শঙ্করজী হামারও দাদাভাই হোয়ে গেইলো। হামার কথা বিশ্বাস গেলেন না তো? ব্যস্, তবে হামার একঠো লাচ দেখুন, সব কুছু বিলকুল পোরিষ্কার হোবে আখুন। হেঁ হেঁ হঁ।

বাতাসে ফুরফুর ক'রে দাড়ি উড়ছে আর হনুমান তেওয়ারী নাচছে, পাশে গম্ভীরমুখে ডক্টর সেনগুপ্ত। আমার অবস্থাটা আর খুলে বলতে চাই না। হরি হে!

হনুমান তেওয়ারী গেলো, এলো গজেন পাগলা।—না মশাই, আমি কিন্তু পাগল-টাগল নই। কিছুই নেই আমার, থাকবার মধ্যে শুধু একটু নাচের সখ। বলতে গেলে, নাচই আমার প্রাণ। আর তা হবেই বা না কেন? আপনাকে চুপি চুপি ব'লছি মশাই, স্বয়ং উদয়শঙ্কর হচ্ছেন আমার সাক্ষাৎ মাসতুতো বোনের পিসতুত ভাসুরের আপন খুড়তুতো বেয়াই।

তেজালো রোদ্দুর, বেলা খুব চাট্টিখানি নয়। আর ভালো লাগছে না, ক্ষিধের চোটে মনে হচ্ছে যেন পেটের মধ্যে ছুঁচো-ইঁদুরের ডন-বৈঠক স্থরু হ'য়ে গিয়েছে। ডক্টর সেনগুপ্তকে বললাম,—এবার ফেরা যাক, চলুন।

ডাক্তারবাবু সামান্য একটু হাসলেন—বেশ ভাই চলুন।

চ'লতে চ'লতে ডাক্তারবাবু ব'ললেন,—আত্মীয়তা দূরে থাক, উদয়শঙ্করকে এদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু চোখেও দেখে নি। উদয়শঙ্করের সঙ্গে ওদের প্রত্যেকের আত্মীয়তা আছে, এটাই কিন্তু ওদের পাগলামি।

গেটের কাছে এসে পড়েছি প্রায়। আমি বললাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ, ডক্টর মহলানবীশ আমাকে আগেই ব'লে দিয়েছেন যে এখানকার সব পাগলেরই ধারণা যে তারা উদয়শঙ্করের আত্মীয় এবং খুব ভালো নাচতে জানে।

—ডক্‌টর মহলানবীশ? ওটা তো একটা আস্ত গাধা!

কলিং বেলের বোতাম টিপতে গিয়েও আমি ডক্‌টর সেনগুপ্তের কথা শুনে থমকে রইলাম। ভদ্রলোক বলছেন কি? গাধা! ডক্‌টর মহলানবীশ একটা গাধা?

—আলবৎ গাধা।—রাস্তার ওপরেই ডক্টর সেনগুপ্ত একটা লাথি ঝাড়লেন,—ও ব্যাটা-চ্ছেলে উদয়শঙ্করের জানে কী? ওর মতো একটা আকাট ক্যাবলাকান্ত উদয়শঙ্করের মর্ম কী বুঝবে?

গলা শুকিয়ে কাঠ, আমি পাথরের ষ্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজের বুকে একটা সাংঘাতিক থাব্‌ড়া মেরে ডক্টর সেনগুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন—এখানকার ডাক্তারগুলো গো-মুখ্যু, পাগলাগুলো হাড়-মিথ্যুক। আসলে উদয়শঙ্কর কে জানেন?

আমার মুখে রা নেই।

—আসলে উদয়শঙ্কর হচ্ছেন আমার আপন বড়মামার সাক্ষাৎ খুড়-শ্বাশুড়ীর পিসতুতো বোনের মাসতুতো জ্যেঠামশাইয়ের মামাতো দাদুর জ্যেঠতুতো নাতি। কী? বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, প্রমাণ দেখুন। —সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর (???) সেনগুপ্ত গায়ের কোট খুলে ছুঁড়ে মারলেন, সেটা রইলো গাছের মগ্‌ডালে। ব্যস্, তারপর হাঁটু অবধি প্যান্ট তুলে স্থরু হ'লো বেদম নাচ।—উদয়শঙ্করের সঙ্গে ওঁর আত্মীয়তার অকাট্য প্রমাণ। হায় হায়, সে কী দৃশ্য!!

আমার চোখ ট্যারা হবার উপক্রম, মনে হচ্ছে শরীরে একবিন্দু রক্ত নেই, এক্ষুণি আমি এখানে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাবো! হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!!

মরীয়া হয়ে আমি ঘন ঘন কলিং বেলের বোতাম টিপতে লাগলাম।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—পনেরো—

"পালা! ক্রুসো, পালা,—শীগ্‌গির!" ক্রুসো ভালুকটাকে প্রতি-আক্রমণ করতে উদ্যত দেখে ডিক চীৎকার করে উঠলো। ক্রুসো কথা শুনলো, এবং পলক ফেলতে না ফেলতে ডিক একটা গাছের পেছনে আত্মগোপন করলো। ভালুকটা কাছে

ধেয়ে আসতেই ডিক তাকে লক্ষ্য করে তার দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়লো। আহত হ'য়ে মুহূর্ত্তের জন্য একবার প'ড়ে গিয়েই ভালুকটা আবার তাকে আক্রমণ করতে এল। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ডিক রাইফেলে গুলি ভ'রতে পারলো না বা যে বড় গাছটার আড়ালে ছিলো তাতে উঠতে পারলো না। আর, ছুটে পালানোও তো সম্ভব নয়! সে চেষ্টা করলে একমুহূর্ত্তের মধ্যেই ধরা পড়তে হবে। তার ডাইনে প্রায় একশ' ফুট উঁচু খাড়াই, আর বাঁয়ে নিবিড় বন। ডিক একবার ভাবলো, রাইফেলটা লাঠির মত ব্যবহার ক'রে ভালুকের সম্মুখীন হয়; কিন্তু তাতে তার মনে কিছুমাত্র আশার সঞ্চার হ'লো না। খাড়াইটার দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত ক'রে ডিক দেখলো, খাড়াইয়ের গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত্ত আর উঁচু পাথর রয়েছে। আর মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করে ডিক একলাফে নীচের গর্ত্তটায় পা দিয়ে ওপরের একটা পাথর ধরে ফেললো। এই ভাবে প্রায় কুড়ি ফুট ওপরে ওঠবার পর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো, ভালুকটাও ঠিক তার মতো সেখান দিয়ে বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বড় বড় নখগুলোর জন্য তাড়াতাড়ি উঠতে পারছে না। ইতিমধ্যে ডিক তাড়াতাড়ি তার রাইফেলে গুলি ভরতে লাগলো। গুলি ভরা হয়ে গেলে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে, ভালুকটা তার প্রায় এক ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে।

ক্রুসো আর স্থির থাকতে পারলো না, প্রভুর এই বিপদ্ দেখে সে তার আদেশ অমান্য ক'রে ক্রুদ্ধ গর্জ্জন তুলে সবেগে ছুটে গিয়ে ভালুকের পিঠ কামড়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে ভালুকের সঙ্গে সে-ও গড়িয়ে পড়লো নীচে।

ইতিমধ্যে ডিকের রাইফেলের দু'টো নলেই গুলি ভরা হ'য়ে গেছে। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেখান থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ভালুকের কানে রাইফেলের মুখ লাগিয়ে ডিক ওর মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিলো। ভালুকের উদ্যত থাবা ক্রুসোর মাথার কাছ পর্য্যন্ত নেমে এসেছিল, কিন্তু গুলি মাথায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থাতেই সে প্রাণত্যাগ করলো।

ডিক তাড়াতাড়ি ক্রুসোকে পরীক্ষা করে দেখলো, কয়েকটা আঁচড় ভিন্ন বিশেষ গুরুতর কোনো আঘাত সে পায় নি। আনন্দের আতিশয্যে ডিক ক্রুসোকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর ডিক ভালুকটার ছাল ছাড়িয়ে নিলো। তারপর বহু যত্ন ক'রে কেটে নিলো তার নখগুলো। সেই নখগুলো দিয়ে একটা মালা ক'রে গলায় প'রে পনি-সর্দ্দারের মত গর্ব্ব বোধ করলো সে। তারপর ক্রুসোর

পিঠ চাপড়ে বললো, "ঘাবড়াস নি বাচ্চু; এর পর যে ভালুক শিকার করবো তার নখের মালা তোর গলায় পরিয়ে দেবো। দেখিস্ তখন, কী সুন্দর মানাবে!"

আরো কয়েকটা দিন সেখানেই কেটে গেলো। তুষারপাত বন্ধ হ'লে ডিক আবার বন্ধুদের অনুসন্ধানে যাবে ঠিক করেছিলো, কিন্তু তুষারপাত বন্ধ হওয়া দূরের কথা, ক্রমশঃই যেন আরো বেশী পুরু হয়ে তুষার পড়তে লাগলো। তবে কি এবার শীত একটু আগে থেকেই শুরু হবে! এ কথা চিন্তা করতেই তার মন মুষড়ে পড়লো, কারণ সারা দেশ তুষারে ছেয়ে গেলে তো তার বন্ধুদের খোঁজে যাওয়া বেশ কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখতে হবে!

খাওয়া-দাওয়া সেরে চুপচাপ ব'সে একথা-সেকথা চিন্তা করছে, এমন সময় হঠাৎ মানুষের সাড়া পেয়ে ডিক সচকিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় পাথরের উপরে উঠে শব্দ লক্ষ্য করে দূরের উপত্যকায় তাকিয়ে দেখলো, প্রায় একশ' অশ্বারোহী ধীর পদক্ষেপে তুষারের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

অপলক দৃষ্টিতে ডিক অশ্বারোহীদের লক্ষ্য করতে লাগলো। ক্রমেই কাছে আসছে দলটা। ছোট ছোট কয়েকটা সারিতে ভাগ হয়ে দলটা এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ। হঠাৎ ডিক অবাক্ হয়ে দেখলো, দলের মধ্যে কয়েকটা সাদা মানুষও রয়েছে। এই নির্ব্বান্ধব রেড-ইণ্ডিয়ানদের দেশে এ ভাবে সাদা মানুষের দেখা পেয়ে ডিক আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি চার্লির পিঠে চ'ড়ে ক্রুসোকে নিয়ে সে সবেগে ওদের লক্ষ্য করে ছুটে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের সারির রেড-ইণ্ডিয়ানদের রাইফেল তাকে লক্ষ্য ক'রে উদ্যত হয়ে উঠলো। কিন্তু একজন সাদা মানুষ তাদের ইঙ্গিতে বাধা দিয়ে ডিকের কাছে এগিয়ে এসে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো, "তুমিও নিশ্চয় ট্র্যাপার। ইংরেজী জানো?"

"হ্যাঁ, জানি বৈকি!" বলে ডিক ঘোড়া থেকে নেমে সজোরে তার করমর্দ্দন ক'রে বললো, "এই বিদেশ বিভূঁইয়ে আপনার মত ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে সত্যিই অত্যন্ত খুসি হয়েছি।" তারপর তার নিজের পরিচয় দিল এবং অভিযানের সমস্ত বৃত্তান্ত তাকে শোনালো। তারপর শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের পরিচয় নিয়ে জানলো তাঁর নাম ওয়াল্টার ক্যামেরন। স্কটল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য অঞ্চলে তিনি সবার কাছে পরিচিত। তাঁর ব্যবসা হচ্ছে পশুর চামড়া আর লোম সংগ্রহ করা।

(ক্রমশঃ)

মহাকালের পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—চার—

বনপথ ধরে কাত্যায়ন এগিয়ে চললো।

মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে। কল কল করে জলস্রোত বহে যাচ্ছে পথের উপর দিয়ে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে সামনের পথ যতটা না দেখা যাক্ তার চেয়ে বেশী ধাঁধা লাগছে চোখে। সেই দুর্য্যোগের মধ্যে দিয়ে সেই বনপথে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়, তবে কাত্যায়নের এ পথে সবই জানা-চেনা, বিশ বছর এই পথে সে হাঁটছে।

কাত্যায়নের সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। উত্তরীয় ও কাপড় ভিজে লেপ্টে গেছে দেহের সঙ্গে। মাথার জল টস্ টস্ করে গড়িয়ে পড়ছে পায়ের উপর। কিন্তু কাত্যায়নের তখন সেদিকে লক্ষ্য নেই, সে ভাবছে আচার্য্যদেবের কথা, মগধ-সম্রাটের কথা। মহাকালের মন্দিরে কোনদিন শোণিতপাত হয় নি, আজ সেখানে মগধ-সম্রাটের শোণিতপাতের চেষ্টা চলছে—সেই কথা। এখনই একটা-কিছু করতে পারলে হ'ত, কিন্তু সে যে একান্ত নিঃসহায়, একান্ত একা। —এই কথাটাই তার মন যুড়ে আলোড়িত হচ্ছিল। দ্রুত পদক্ষেপে কাত্যায়ন বনপথ ধরে এগিয়ে চলেছিল।

সেই দুর্যোগের মধ্যে ক্রোশ খানেক পথ অতিক্রম করা অল্প সময়ের কথা নয়। নগরের উপকণ্ঠে যখন সে এসে পৌঁছালো তখন বৃষ্টিধারা অনেক কমে এসেছে। বৈভব গিরির নিম্নদেশে নগর-তোরণ। তোরণ বন্ধ। কাত্যায়ন এসে তোরণে আঘাত করলো। প্রথমে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তারপর ফটকের উপর দিকে একটি গবাক্ষ খুলে গেল, প্রহরী জিজ্ঞাসা করলো—কে?

—আমি মহাকাল মন্দিরের পূজারী, দ্বার খোল।

—রাত্রে কাউকে নগরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

—বিশেষ প্রয়োজন।

—আপনি প্রত্যূষে আসবেন, রাত্রে তোরণ খোলার আদেশ নেই।

—সম্রাটের অত্যন্ত বিপদ্, এখনই মন্ত্রী বা সেনাপতি কারও সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন।

—নগরে কেউ নেই, সবাই মহারাজের সঙ্গে মৃগয়ায় গেছেন, এখনও ফেরেন নি।

—নগর কতোয়াল?

—এত রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়।

—মহারাণী?

—অসম্ভব। আপনাকে প্রত্যূষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

—সম্রাটের জীবন বিপন্ন। এই মুহূর্তে কিছু সৈন্যসামন্ত না পেলে সর্বনাশ ঘটে যাবে।

—আপনার কাছে মহারাজের পাঞ্জা বা কোন হুকুম-নামা আছে?

—না।

—তা হলে রজনী প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।

রক্ষী গবাক্ষ বন্ধ করে দিল।

কাত্যায়ন ব্যস্তভাবে বললো,—শোনো, শোনো, আমার একটা কথা শোনো—

কিন্তু শত ডাকাডাকিতেও গবাক্ষ আর খুললো না। কাত্যায়ন বিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, কি করবে ভেবে পেল না। এদিকে আবার মুষল ধারে বৃষ্টি নামলো, ফটকের সামনে থেকে সরে এসে একটি বড় নিমগাছের নীচে এসে দাঁড়ালো কাত্যায়ন। অজস্র জলধারার হাত থেকে সে রক্ষা পেল বটে, কিন্তু বৃষ্টির ছাট্ ও গাছের পাতার জল থেকে সে রেহাই পেল না।

সহসা ছলাৎ ছলাৎ করে পায়ের শব্দ শোনা গেল,—কোন বন্য জন্তু আসছে নাকি? কাত্যায়ন উৎকর্ণ হ'ল, গাছের নীচে বসে পড়লো, পাশের ঝোপটার সঙ্গে মিশে গেল।

অন্ধকারের মাঝে একটি লোকের ছায়া দেখা গেল। লোকটি ফটকের দিকেই যাচ্ছে। দ্রুত চলতে চলতে একবার সে পা পিছলে পড়ে গেল। উঠে সুরু করলো ফটকের দিকে ছুটতে কিন্তু কয়েক পদ গিয়েই সে আবার পড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকালো, কাত্যায়ন দেখলো মগধ-সম্রাটের লাল জরীর কাজ করা পোষাক। মানুষটি উপুড় হয়ে পড়েছেন, পিঠে একটি তীর বিঁধে আছে। কাত্যায়নের ইচ্ছা হ'ল ছুটে যায়, কিন্তু মনে হ'ল যেন মানুষের গলা শোনা গেল। কাত্যায়ন আর এগোলো না। পাঁচ-ছ' জন লোক ছুটতে ছুটতে এলো, সম্রাটের উপর ঝুঁকে পড়ে বোধ হয় নেড়েচেড়ে দেখলো, তারপর একজনের কথা শোনা গেল—কাম ফতে, আর এখানে দাঁড়াবার দরকার নেই, চল আমরা তৈরী হই গে—

কণ্ঠস্বরে বক্তাকে কাত্যায়ন চিনতে পারলো।—সে উগ্রসেন নন্দ। কাত্যায়ন বুঝলো সম্রাট্ কোন মতে মন্দির থেকে পালিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি আত্মরক্ষা করতে পারলেন না।

উগ্রসেন সদলে প্রস্থান করলো। কাত্যায়ন এগিয়ে এলো সম্রাটের কাছে। ধমনীর গতি পরীক্ষা করে দেখলো দেহে প্রাণ নেই। বিদ্যুৎ চমকালো, সম্রাটের আঙ্গুলে তাঁর নামাঙ্কিত আংটি কাত্যায়নের চোখে পড়লো। কি ভেবে সেটি সে খুলে নিল, তারপর সেই অবস্থায় সম্রাট্‌কে ফেলে রেখে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল।

বৃষ্টি থামবার পরে সম্রাটের পার্ষদেরা ফিরে এল, তোরণের সামনে আবিষ্কার করলো সম্রাটের মৃতদেহ।

— পাঁচ —

রাজগৃহ।

পাঁচটি পাহাড়-ঘেরা নগরী। দক্ষিণে বৈভব গিরির পাদদেশে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। প্রস্রবণের জলধারা এসে মিশেছে একটি ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী নদীর সঙ্গে। সেই সঙ্গমস্থলে পাহাড়ের নিম্নদেশে একটি কুণ্ড, কুণ্ডের পাশেই ব্রহ্মার মন্দির! নীচে নদীর তীরে বুদ্ধ-শিষ্য মহাকাশ্যপের সমাধিস্থল। পাশেই শ্মশান। সেদিন শ্মশানে তিল ধারণের স্থান নেই। মগধ-সম্রাট্ কাকবর্ণী গত রাত্রে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন, রাজকীয় আড়ম্বরে তাঁর শব শ্মশানে নীত হয়েছে। রোরুদ্যমানা রাণী ময়ূরমতী সঙ্গে এসেছেন, এসেছেন রাজ্যের প্রধানেরা ও যত রাজকর্মচারী। সৈন্যবাহিনীরও সমাবেশ হয়েছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। দম্‌কা হাওয়ায় গাছের পাতার মর্মরধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সেই দম্‌কা হাওয়ার মতই ভেসে আসে রাণীর মৃদু ক্রন্দনোচ্ছ্বাস। স্তব্ধ বিষণ্ণতার মধ্যে সুরু হয় মগধ-সম্রাটের শেষ কৃত্য।

সেই জনতার মধ্যে কাত্যায়নও ছিল, পাহাড়ের কোলে এক গাছের ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে ছিল।

শবযাত্রীদের উপর কাত্যায়নের দৃষ্টি ছিল না, তার নজর ছিল সমবেত জনতার উপর। সহসা ভীড়ের মধ্যে দু'টি লোকের উপর তার দৃষ্টি পড়লো—উগ্রসেন ও ভর্তু। একপাশে ভীড়ের বাইরে তারা দাঁড়িয়ে ছিল। শবযাত্রীরা শ্মশানে পৌঁছাবার পর যখন সবাই সেইদিকেই উৎসুক হয়ে পড়লো, উগ্রসেন তখন ভর্তুর সঙ্গে বাহির হয়ে এলো, আরো প্রায় ত্রিশজন অনুচর তার অনুসরণ করলো।

সকলেই সশস্ত্র। নদীর তীর ধরে তারা অগ্রসর হ'ল; কাত্যায়নের মনে হ'ল সম্ভবতঃ তারা রাজপ্রাসাদের দিকেই যাচ্ছে।

কাত্যায়ন নদীর এপারে পাহাড়ী পথ ধরে তাদের আগে আগে অগ্রসর হ'ল।

কাত্যায়ন যা আন্দাজ করেছিল তাই ঠিক, উগ্রসেন সদলে এলো প্রাসাদের তোরণে। শান্ত্রীর সঙ্গে উগ্রসেনের কি যেন কথা হ'ল, শান্ত্রী দ্বার ছেড়ে দিল।

কাত্যায়ন আর সেখানে দাঁড়ালো না, সেই পথটি গিয়ে প্রাসাদের উত্তর তোরণে শেষ হয়েছে, কাত্যায়ন দ্রুত উত্তর তোরণে এসে পৌঁছালো। সেটি হ'ল অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বার। দ্বাররক্ষী কাত্যায়নের পরিচিত, কাত্যায়নকে দেখেই সে বললো,—কি ঠাকুর, খবর কি?

—অবিলম্বে রাজকুমারকে নিয়ে এসো, এক মুহূর্ত বিলম্ব ক'রো না। রাণীমা শ্মশানে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন!

রাণীমা মূর্ছা গেছেন! শান্ত্রী তখনই ছুটলো অন্তঃপুরের দিকে।

উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাত্যায়ন দ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলো। (ক্রমশঃ)

সোনার বালুচরে

শ্রীঅশোক সেন, এম্. এ

—দশ—

"এখন, ইংরেজিতে e অক্ষরটি সব চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। সেই হিসেবে অন্য অক্ষরগুলি পর পর এইভাবে সাজানো যেতে পারে: a o i d h n r s t u y c f g l m w b k p q x z। e অক্ষরটি এত বেশী ব্যবহার হয় যে, যত লম্বা কথা হোক না কেন, e-র প্রাধান্য তাতে থাকবেই।

"গোড়াতেই তা হ'লে অনুমান ছাড়া এগোনোর আর একটা পথ পেলুম। এখন এই তালিকাটি আমাদের কাজে লাগানো সহজ—এই চিঠিতে অবশ্য পুরোপুরি এর সাহায্য লাগবে না। এখন, আমাদের প্রধান সংখ্যা হ'ল 8, ওটাকে e ধরে নিয়ে আমরা শুরু করতে পারি। আমাদের অনুমানটা একবার যাচাই করে দেখা যাক,—আচ্ছা, 8. জোড় অবস্থায় কত বার

আছে দেখি, কারণ ইংরেজিতে বহু শব্দে e একসাথে পাশাপাশি বসে—যেমন, meet, fleet, speed, seen, been, agree, ইত্যাদি। এই চিঠিতে 8 এ রকম জোড়া বসেছে পাঁচ বারের কম নয়।

"তাহলে ধরে নিলুম, 8 e-র বদলে বসছে। এখন, ইংরেজিতে "the" শব্দটা সবচেয়ে বেশী চলে। পাশাপাশি একই ক্রমানুসারে তিনটি অক্ষর কত বার বসেছে—যার শেষের অক্ষর হবে 8। ঠিক এইভাবে সাজানো কোন কথা যদি বার বার দেখতে পাই, তাহলে খুব সম্ভবতঃ সেই শব্দটি হবে the। এখানে আমরা সে-রকম সাজানো অক্ষর অন্ততঃ সাত বার পাচ্ছি,—সেটা হল—;48। তাহলে বলতে পারি, ; t-র বদলে, 4 h-এর বদলে আর 8 e-র বদলে বসেছে—শেষের অক্ষরটি সম্বন্ধে এখন আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি। একটা শব্দ যখন বের করতে পেরেছি তখন তার সাহায্যে আরো অনেক দূর এগোনো যাবে, অর্থাৎ ঐ শব্দটা ধরে অন্য শব্দের আরম্ভ ও শেষ পাওয়া যাবে। আচ্ছা, এবার চিঠিখানার শেষের দিকে অষ্টম লাইনে ;48 কথাটা লক্ষ্য কর তো। আমরা জানি, তারপর যে ; আছে সেটা আর একটা শব্দের আরম্ভ, আর ঐ the (;48) শব্দের পর ছ'টি অক্ষরের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি অক্ষর আমরা চিনতে পেরেছি। এখন, যে সব অক্ষরের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে সেগুলি সাজিয়ে দেখি কি হয়—অজানা অক্ষরের জায়গায় ফাঁক রেখে যাই। "t—eeth"—এ থেকে শেষের ; 4 অর্থাৎ th আমরা বাদ দিতে পারি—ঐ অংশটুকু t দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এমন কোন শব্দের শেষ হতে পারে না, কারণ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, শূন্যস্থানে অক্ষর বসালে কোন ইংরেজি শব্দ হয় না। তাহলে আন্দাজ করা আরো সহজ হ'ল—t—ee, শূন্যস্থানে r বসালে ইংরেজি শব্দ tree পাওয়া যায়—আর কোন অক্ষর ওখানে পড়তে পারে না। আমরা এবার আর একটা অক্ষর চিনতে পারলুম,—"r" ; তার চিহ্ন হচ্ছে (।

"একসঙ্গে কথাটা হবে—the tree—এর কাছেই সামনে রয়েছে ;48। শব্দটাকে তার ঠিক আগের কথার শেষ ধরলে আমরা দেখি—the tree ; 4(‡?34 the—এর জানা অক্ষরগুলি বসালে এ-রকম হয়—the tree thr‡?3h the। এবার অজানা অক্ষরগুলির জায়গা বাদ দিয়ে গেলে শব্দটা দাঁড়াবে—the tree thr - — — h the, তাহলে চট্ করে through শব্দটাই আমাদের মনে হবে। এতে আমরা আরো তিনটি অক্ষর চিনলুম— o (‡), u (?), g (3)।

"বেশ কয়েকটা অক্ষর বের করা গেল। এখন একবার গোড়ার দিকে দেখা যাক—যেখানটা এভাবে সাজানো আছে—83(88 অথবা egree ; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা degree শব্দের শেষাংশ—তাহলে d-এর চিহ্ন †। degree শব্দের চার অক্ষর পরে আছে ; 46(;88—জানা অক্ষরগুলি বসিয়ে অজানাগুলি ছেড়ে দিলে পাই th—rtee-, শব্দটা কি হবে নিশ্চয় বুঝতে পারছ—thirteen। তাহলে আরো দুটো অক্ষর শিখলুম— i (6) ও n (*)

"এবার একেবারে গোড়ায় যাও—53‡‡† আগের মতন বসালে হবে—good। এখন, এর আগে অক্ষর বসালে সবটা নিয়ে কোন ইংরেজি শব্দ হয় না ; তাহলে বুঝতে পারছ, অক্ষরটা

আলাদা বসবে—A-ই হবে—A good। এখন যাতে সব গুলিয়ে না যায় সেজন্যে একটা তালিকা তৈরী করে নি :—

5	হ'ল	a
†	"	d
8	"	e
3	"	g
4	"	h
6	"	i
*	"	n
‡	"	o
(	"	r
;	"	t
?	"	u

খুব দরকারী এগারোটি অক্ষর আমরা পেলুম—বাকিটা আর না হলেও চলবে। এই ধরণের সাংকেতিক চিঠি কি ভাবে পড়তে হয় তা তো সবই বললুম। এখন সব অক্ষরগুলি বের করে সাজালে এই রকম দাঁড়াবে—

"A good glass in the bishop's hotel in the devil's seat forty-one degrees and thirteen minutes north east and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee-line from the tree through the shot fifty feet out."

অর্থাৎ, "বিশপের হোটেলে শয়তানের আস্তানায় দূরবীণ একচল্লিশ ডিগ্রি তের মিনিট উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর দিয়ে প্রধান শাখা সপ্তম ডাল পূব দিক্ মড়ার খুলির বাঁ চোখ থেকে ছোড় মৌমাছির লাইন গাছ থেকে গুলির জায়গা দিয়ে পঞ্চাশ ফুট বাইরে।"

আমি বললুম—"আমি তো এখনো কিছুই বুঝতে পারলুম না। 'শয়তানের আস্তানা', 'মড়ার খুলি', 'বিশপের হোটেল'—এ সব অদ্ভুত কথার অর্থ কি করলেন ?"

"অর্থ আছে বই কি। এখনো তো তোমায় সবটা বলা হয় নি ; তাইতে তো তোমার অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। চিঠিখানাতে কতকগুলি শব্দ পাওয়া গেছে সত্যি, কিন্তু ঠিকমত ভাগ করতে না পারলে এর কোন মূল্য নেই। তাই এর পর আমার কাজ হ'ল, লেখাটাকে ভাগ করা—যাতে মোটামুটি একটা অর্থ হয়। নানাভাবে ভাগ করতে করতে শেষে যেটা দাঁড়াল তার বেশ একটা অর্থ হয় দেখলুম—

"A good glass in the bishop's hotel in the devil's seat—forty-one degrees and thirteen minutes—north east and by north—main branch

seventh limb east side—shoot from the left eye of the death's head—a bee line fron the tree through the shot fifty feet out."

"বিশপের হোটেলে শয়তানের আস্তানায় দূরবীণ—একচল্লিশ ডিগ্রি তের মিনিট—উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর দিয়ে—প্রধান শাখা সপ্তম ডাল পূর্ব দিক্—মড়ার খুলির বাঁ চোখ থেকে ছোড়—গাছ থেকে মৌমাছির লাইনে, অর্থাৎ সোজা গুলির জায়গা দিয়ে আরো পঞ্চাশ ফুট বাইরে।"

আমি বললুম—"এতেও কিছু বুঝতে পারছি নে।"

"প্রথম কয়েকদিন আমিও বুঝতে পারি নি। তখন স্যুলিভান দ্বীপের চারিধারে ঘুরে খোঁজ করলাম। বিশপের হোটেল বলে কোন বাড়ী আছে কিনা কেউ বলতে পারল না। শেষে একদিন সকালে হঠাৎ আমার খেয়াল হ'ল, বিশপ নামে সেকালের একটি জমিদার পরিবারের কথা শুনেছি বটে। দ্বীপের চার মাইল উত্তরে তাঁদের জমিদারি ছিল। তখুনি গেলুম সেখানে। সেখানকার বুড়ো নিগ্রো বাসিন্দাদের সব জিজ্ঞেস করলুম। একটি নিগ্রো বুড়ী বল্লে, বিশপের কেল্লা কোথায় সে জানে। আমায় পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতেও রাজী হ'ল। সে বল্লে, বিশপের কেল্লা নাকি কেল্লাও নয়, হোটেলও নয়—একটা উঁচু পাহাড়।

"আমি তাকে তার মেহনতের জন্যে বক্‌শিশ দিতে চাইলুম, প্রথমে আপত্তি করলেও শেষে নিতে রাজী হ'ল। তার সঙ্গে রওনা হলুম, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে গিয়ে পৌঁছলুম। বুড়ীকে বিদায় করে দিয়ে আমি চারিদিকে ঘুরে দেখতে লাগলুম। জায়গাটা কতকগুলি উঁচু-নীচু পাহাড়ে ভর্ত্তি। তার মধ্যে একটা খুব উঁচু—সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠলুম, কিন্তু তারপর কি করব বুঝতে পারলুম না। এমন সময় আমার চোখ পড়ল পাহাড়ের পূব দিকে পাথরের একটা সরু কিনারায়—আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেখান থেকে বোধ হয় এক গজ নীচে। কিনারাটা প্রায় আঠারো ইঞ্চি বেরিয়ে ছিল,—চওড়ায় এক ফুটের বেশী হবে না। ঠিক এর উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা খোলের মত ছিল। সেটা দেখতে অনেকটা আগেকার আমলের পেছন দিকে চাপা চেয়ারের মত। কেন জানি নে, আমার দেখে মনে হ'ল, এটাই 'শয়তানের আস্তানা'। পরে দেখলুম সে জায়গাটা এমনি যে সেখানে মাত্র একভাবে বসে থাকা যায়।" (ক্রমশঃ)

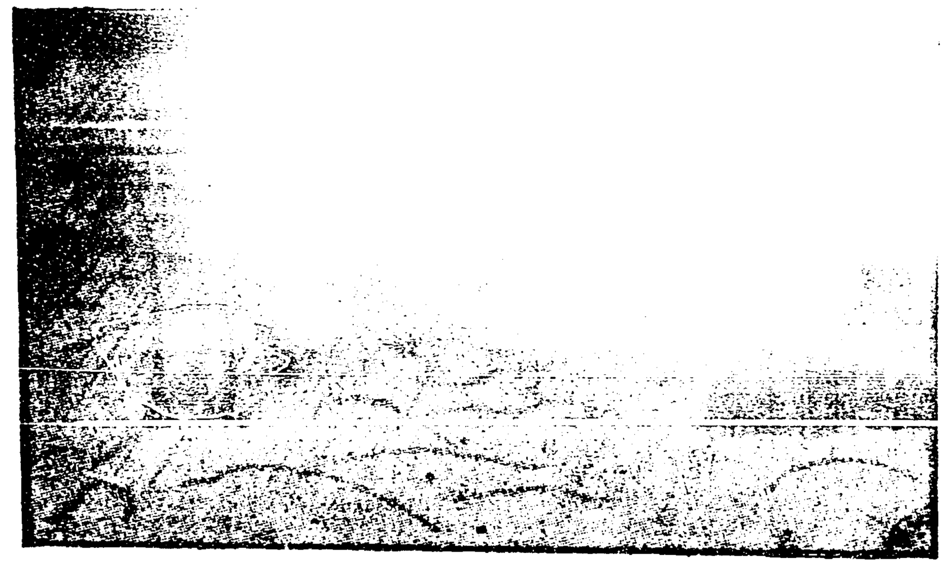

আফ্রিকার চিঠি

অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ

অবশেষে মনরোভিয়া এসে নামলাম। লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়া।

যে পৃথিবীতে এসেছি সেখানকার জল-হাওয়া আমাদের মত হ'লেও, মানুষ-গুলি অন্য রকমের। দাস প্রথা উঠলেও আমেরিকায় এখনও প্রাক্তন দাসদাসীদের অগ্রগতির অনেক বাধা। তাই নিগ্রোদের আদি বাসস্থান আফ্রিকায় পৌঁছবার চেষ্টা অনেকেই করেন। তারই এক প্রচেষ্টার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মনরোভিয়ায় (আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মনরোর নামে) কয়েক জনের আবির্ভাব হয় এক জাহাজে। ক্রমে যুদ্ধ, সাম্য, ব্যবসায় ও বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে এই ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। আজ প্রায় এক শতাব্দীর ওপর এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় নানা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের লোলুপ দৃষ্টির বেষ্টনীতে বেঁচে আছে। আমেরিকার ধরণে এর শাসনতন্ত্র, পতাকাও তাই; যতটা প্রদেশ ততটা লাল দাগ ও একটা তারা—'দি লোন্ স্টার', নিগ্রোদের একক তারকা, বিস্তীর্ণ রাজনৈতিক আকাশে। শ্রদ্ধা ও আশা নিয়ে এসেছি; যদিও চারপাশে অনুকরণ, দারিদ্র্য, ছেলেমানুষী। সর্ব্বদা অবহেলিত ছেলের মত আতঙ্ক—'বুঝি কেউ অগ্রাহ্য করলো।' খুব সাবধানে চলাফেরা করতে ও কথা কইতে সবাই পরামর্শ দিয়েছেন।

খাবার কিচ্ছু পাওয়া যায় না বাজারে। সব চালানী টিনের খাবার দিয়ে সাহেবী কায়দায় হোটেল চলে। জাহাজ দেরী হ'লে সর্ব্বত্র টানাটানি। লোটাস্-ইটারের দেশ—তরি-তরকারী পর্য্যন্ত চাষ করে না! আর ঠিক বাংলার মত লতা-গুল্ম ও মাটি। চেষ্টা অবশ্য হচ্ছে। প্রকাণ্ড কলা পাওয়া যায়—এক

আনা একটা, সবচেয়ে সস্তা খাদ্য! বাদাম, মিষ্টি আলু—এ সবও পাওয়া যায়, তবে সাহেব লোকের খাওয়া মানা।

ফায়ারষ্টোন লেখা মোটরের চাকা বা রবারের জিনিষ দেখলেই লাইবেরিয়া মনে করবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজরা মালয় অঞ্চল থেকে রবারের দাম বাড়িয়ে দেওয়ায় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে চেষ্টা হয় প্রতিকারের। উপযোগী আবহাওয়ার খোঁজ চলে রবারের চাষের; ফলে ১৯২৬ সালে লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়ার প্রায় ৪৫ মাইল দূরে হারবেল ব'লে জায়গায় প্রায় লক্ষ একর (প্রায় ৩ লক্ষ বিঘা) উঁচু-নীচু জমির উপর রবার গাছের চাষ সুরু হয়। ইউক্যালিপটাসের মত লম্বা গাছ—অবশ্য ডাল-পালা বেশী,—লাল চে খোলস সাদা সাদা দাগে ভর্ত্তি। চারপাশে তলার দিকে লম্বা দা দিয়ে সাড়ী জড়ানোর মত ক'রে রেখার পর রেখা কেটে রবারের রস (ল্যাটেক্স) নিঙড়ানো হয়। সারারাতের রস গায়ে লেগে থাকে ও গাছে-লাগানো কাপে জমা হয়। ভোর থেকে সংগ্রহ।

রবার গাছ

বিকেলে আবার কেটে রাখছে রাতের রক্ত ক্ষরণের জন্য। দরিদ্র আফ্রিকাবাসী—নানা জাতির ও ধর্ম্মের লোক—এখানে কাজ করছে। দিনে ২৫ বা ২৭ সেন্ট (আমেরিকান ডলারের শতাংশকে সেন্ট বলে, তিন পয়সা আন্দাজ দাম এক সেন্টের) বেশীর ভাগ লোকেরা পায়। কিন্তু আমি দেখছি যে ঐ পয়সায় ভাত ও তালের তেল-এর ঝোলই একবেলা দু'জনের ভাল ক'রে হয় না। অর্দ্ধনগ্ন স্ত্রী-পুরুষ। এদের থাকার ঘর আমাদের দেশের কুঁড়ের মত। কোম্পানীর অনেকগুলি ঘর ৮ হাত × ৯ হাত। জানালা নেই, দরজা ১টি, বিছানা ২টি। ওর মধ্যেই রান্না-ভাঁড়ার। অবশ্য অধুনা স্কুল, হাসপাতাল ও অন্য সুবিধা (কলের

জল, ঘেরাও করা পায়খানা) এদের কপালে জুটছে; মাঝে ধর্ম্মঘটও হয়েছিল কিনা!

যখন মোটরে বা বাসে চড়ি আমরা, প্রকৃতির দেওয়া রবারের রসকে সংগ্রহের জন্য যে ব্যবস্থা তা কি স্মরণে আনি?

যেদিন প্রথম গেলাম সেদিন একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। অফিসের চারপাশে ঝুমকো, পঞ্চমুখী ও সাদাটে জবা, নারকেল গাছ ও কুঁড়ে ঘর দেখে মনে হচ্ছিল যেন দেশেই আছি। ফিরবার পথে দুর্ঘটনা। হারবেল থেকে কাকাটা ব'লে (বাণিজ্য-কেন্দ্র ও "নিগ্রো-জাতির কর্ম্মবীর" বুকার টি ওয়াশিংটনের নামে আমরিকানদের স্কুল ও কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র) জায়গা হ'য়ে যাব ব'লে বেরিয়েছি। ১২ মাইল দূরে টায়ার ফুটো; সঙ্গে 'পাম্প' ছিল না। রবারের বনের মধ্যে রবারের জন্যই বিভ্রাট। ২ ঘণ্টা পরে ফায়ার-ষ্টোনের খাঁচার মত লম্বা ট্রাকে করে টায়ার নিয়ে হারবেলে এসে রাত দশটায় ফেরত। কিন্তু এ খবর লিখছি বিশেষ করে তখনকার অনুভূতি জানাতে। অরণ্যানী—দু' একজন পথিক যাচ্ছে, মাথায় বোঝা; ১০।১২ মাইল হাঁটা তাদের কাছে "ধর্ত্তব্যের মধ্যেই" নয়! মাছ ধরতে দূরে চার-পাঁচটি স্ত্রীলোক যাচ্ছিল। নদী কাছে, সেখান থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ হয় ফ্যাক্টরীর জন্য। ঝড়ের শব্দ ও মেঘেরঅগ্রগতি লম্বা রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করছিলাম। ভয়, বুঝি এখানেই রাত কাটে। মনে হ'ল, খুব চেনা জায়গা। আহত পাদপেরা যেন অসহায় ভাবে দুঃখ জানাচ্ছে তাদের রস-নিঙড়ানোর জন্য। পাতার উপর পা লেগে শব্দে নিজেই চমকে উঠছি। গাছের

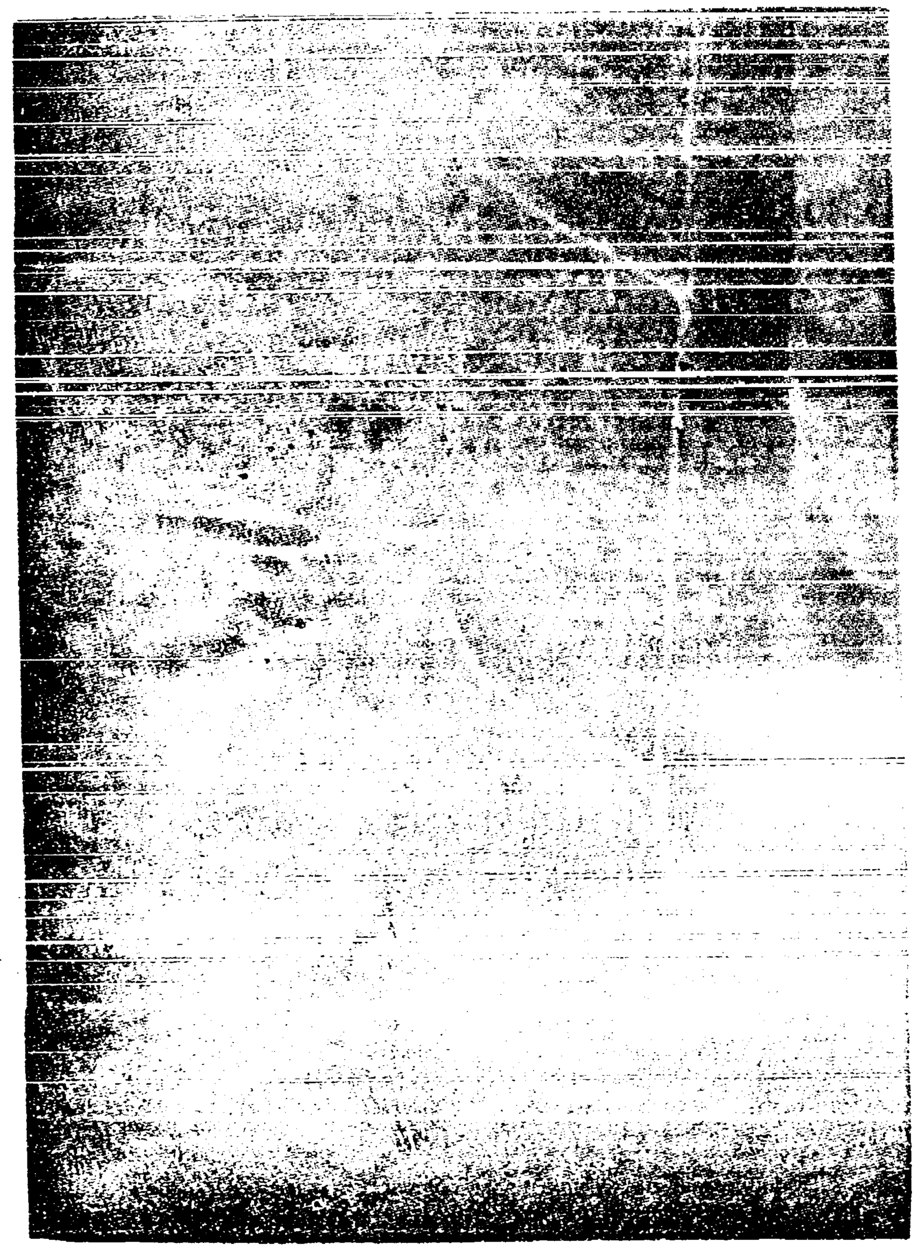

রবারের রস সংগ্রহ

কোটরে পরগাছার প্রবেশ দেখে মনে হ'ল এখন বসন্ত, ফুল কবে হবে? দূরে একটা আমগাছে কচি আম শত শত ফলেছে। অরণ্যের মহিমাকে প্রণাম জানালাম,—সহরবাসী এসিয়ার পথিক আফ্রিকার প্রান্তে এসে, আতলান্তিক সাগরের দিকে লক্ষ্য ক'রে। কারণ ত্রিশ মাইল দক্ষিণে সাগর স্বুরু—যার শব্দ আমার মনরোভিয়ার র‍্যাওল ষ্ট্রীটের গৃহ থেকে গভীর রাত্রে শুনতে পাই।

মনরোভিয়া আতলান্তিকের উপরে। বমি পাহাড়ে লোহার খনি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান অর্থে বন্দর নির্ম্মিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বেসাতি নিয়ে জাহাজ আসছে, যাত্রীও আসছে। ভারতের ও পাকিস্তানের সারেঙ্‌রাও মাঝে মাঝে আসে। এ দেশ থেকে যায় ছোট তালের খোসা (পাম্ কার্ণেল), লোহা, রবার, কফি ও কোকো। সোনা-হীরা যা আছে বা বনজ-সম্পদের খোঁজ পূরো নেই। রাস্তা খোলা হচ্ছে—একটা রাস্তায় মোটর ও ট্রাক্ ফরাসী সীমান্ত পর্য্যন্ত যেতে পারে। ফরাসী অঞ্চলের বহু জিনিষ এখন মনরোভিয়া বন্দর দিয়ে বিদেশে যায়।

সমুদ্রতীরে সন্ধ্যার পর আগে দু'-একদিন গিয়েছি। অশ্রান্ত কল্লোল, কিন্তু পুরীর সমুদ্রতীরে ঢেউয়ের উপর যে আলোর চক্‌মকি তা এখানে নেই। একদিন বিকালে একা খানিকক্ষণ কাটালাম। স্নান অল্প লোকে করে। প্রথমতঃ তীরে খাদ অনেক ও ঢাল অনিশ্চিত, তা ছাড়া হাঙ্গরের ভয়। পশ্চিমে ম্লান সূর্য্য অস্ত যাবার মুখে, সামনে ও বাঁয়ে সমুদ্রতীরের বাঁকে বাঁকে মনরোভিয়ার মনোরম রঙীন বাংলো-বাড়ী; অবশ্য এখানেও সিমেণ্ট ও পাকা আধুনিক বাড়ীর ফ্যাসান স্বুরু হয়েছে। পাহাড়ের উপরের বাড়ীগুলি ও তাল, খেজুর, নারকেল গাছের পাতা হাওয়ায় নাচছে ও স্বুরের রেশ ছড়াচ্ছে। আমার মনে এলো সেইদিনের কথা যেদিন ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা অতিক্রম ক'রে ভারত মহাসাগরে হাজির হয়েছিলেন—সাগরের পর সাগর পার হয়ে! আমরা বিমানে সারছি কিছু না দেখে।

আসছে বারে আবার চিঠি দেব।

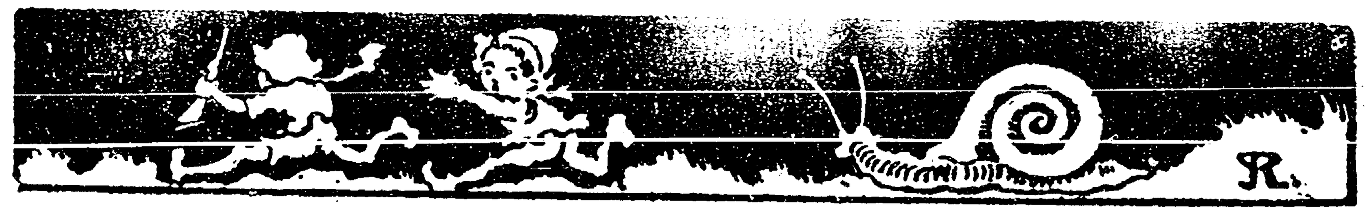

নামে কি হয়

শ্রীরেণুকা দেবী

আমাদের বাবা ছিলেন নির্বিরোধী, হাসিখুসী লোক। পাড়ার তো বটেই, বাড়ীর পর্য্যন্ত কোন কথায় বা কাজে থাকতেন না। তিনি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতেন বেলা আটটায়। তারপর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দু'কাপ্ চা খেতেন। আর দাড়িটা কামিয়ে নিয়ে রোজ আমাদের দুই ভায়ের সঙ্গে বাজী রেখে ক্যারাম খেলতেন। তার পর খেয়েদেয়ে দশটায় অফিস চলে যেতেন। আবার ফিরে আসতেন ছ'টায়। কিছু খাবার খেয়ে যেতেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ী। সেখানে রাত এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা চলতো। শীত-গ্রীষ্ম বারমাস এই এক রুটীন।

মা সব সময়েই বলতেন, এ রকম লোক নিয়ে সংসার করতে এক তিনি বলেই পারছেন। সত্যি কথা বলতে কি, মার চেয়ে বাবাকেই আমাদের বেশী ভালো লাগতো। আর, মা ছিলেন আসলে খুব ভীতু। রাঙ্গা দিদা, মানে আমাদের ঠাকুমা,—তিনি নাকি রাত্রে বাবা এসে ডাকলেও বলতেন, দাঁড়াও বউমা, আগে সাড়া নিই। আজকাল চারিদিকেই চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। মার সেই জন্য ভারী ভয়। সব সময়ে বাবাকে বলতেন, অবশ্য বাবা যতটুকু সময় বাড়ী থাকতেন তারি মধ্যে,—বাড়ী তো থাকো না, কোন্ দিন কি হবে! বাবা বলে উঠতেন, আহা, ডাকাতি হয় বড়লোকের বাড়ী, ব্যাঙ্কে, অফিসে। আমরা তো আর সে রকম বড়লোক নই!

রাঙ্গা দিদা তখুনি বলতেন,—হ্যাঁরে, সেবার যে মীনুর (মানে আমাদের পিসীমা) শ্বশুরবাড়ীর পাশে তারিণী কবরেজের বাড়ী চুরি হ'ল, তারা কোন্ বড়লোক? এই রকম আরো দু'টো-একটা উদাহরণ সুবিধে মত মা, রাঙ্গাদিদা দু'জনেই দিতেন, বাবা হেসে উড়িয়ে দিতেন।

সেদিন হয়েছে কি, আমাদের পেছনের বাড়ীর গিন্নি হাঁউমাঁউ করতে করতে এসে হাজির। —আমাদের বাড়ী সর্ব্বনাশ হয়েছে, বউমা! একরাশ নতুন কাপড় গলিতে মেলে দিয়ে শুইছি তো একটুখানি, ঘুমও তেমন আসে নি, জেগে আছি বল্লেই হয়, এখন উঠে দেখি সব লোপাট! দিনে ডাকাতি! কি দিন-কাল হ'ল গো!

আমাদের কিন্তু বিশ্বাস, বড় জোর একটা ছেঁড়া কাপড়, যেটা বাসনওয়ালীও নিত না, কোন ভিখিরী নিয়ে গিয়েছে।

যাক্, এর ফলে আমাদের বাড়ীতে বেশ ভালো ফলই হ'ল।

মা আর রাঙ্গা দিদা দু'জনেই বাবাকে জোর করে ধরলেন যে বাড়ী থাকতে হবে। এমন যে চোর, সে যে সব সময়ে গলিতে যা পাবে তাই চুরি করবে তার ঠিক কি, ওপরেও তো উঠতে পারে! বিশেষ করে আমাদের বাড়ী কোন বড় মানুষ নেই। নীচের তলাটা একদম খালি পড়ে থাকে।

দু'দিন বাড়ী থেকেই বাবা অস্থির হয়ে পড়লেন। বাবার বন্ধু ব্যাপার শুনে একটা দরোয়ান রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর জানা লোক, বিশ্বাসী,—প্রভুর জন্য জান দিতে পারে। ওঁদের পুরোনো চাকরের দেশের লোক। নাম রাম ফৌজদার। বাবাও রেহাই পেলেন, মাও খুসী।

আমাদের এই দরোয়ানটার চেহারা মোটেই ইয়া লম্বা চওড়া নয়, বড় পাকান গোঁফও নেই। রোগা, লম্বা চেহারা, বয়স কুড়ি-বাইশের মধ্যে। রংটা ফর্সা, মাথায় লম্বা টিকি। তা হলেও ওকে আমাদের বেশ ভালোই লাগলো।

রান্না আর খাওয়ার সময় ছাড়া ও সব সময় বাইরের বারান্দায় বসে থাকতো; মাঝে মাঝে পেছনের জায়গা, দু' পাশের গলিটা ঘুরে ঘুরে দেখতো কোনও চোর আসছে কিনা।

এখন, রাঙ্গা দিদা রাম ফৌজদার না বলে শুধু ফৌজদার বলে ডাকতেন। আমরা জিজ্ঞেস করায় বললেন, আগের নামটা নাকি আমাদের দাদুর নাম! যদিও আমাদের দাদুর নাম রমেশ, তা মাত্র তো একটা আ-এর তফাৎ, তাই উনি ও-নামটাও করেন না।

আমার ছোট ভাইএর সব তাতেই মানে জানা চাই, বলে, রাঙ্গা দিদা, ফৌজদার মানে কি?

রাঙ্গা দিদা বলেন, সৈনিক।

রাম ফৌজদার সেখানেই ছিল, আর তারই নামের মানে বলা হচ্ছে শুনে বলে, ক্যা মাইজি, ফিন বাংলাও। রাঙ্গা দিদা বলেন, ওরে, সৈনিক,—সেপাই, সেপাই। বুঝলি?

রাম ফৌজদারের মুখটা খুসি হয়ে ওঠে। বুকটা ফুলিয়ে সে চলে যায়।

তার পর থেকেই ওর ভাবটা বদলে গেল। সে তাহলে কেউ কেটা নয়, তার নামের মানে হচ্ছে সেপাই।

ক'দিন পরেই দেখি ওর হাতে একটা মস্ত লাঠি। যেন, নেহাৎ যখন বন্দুক বা বেয়নেট নেই তখন একটা লাঠিই থাক!

বাবা বল্লেন, ব্যাটা দেশ থেকে এসেই একেবারে দরোয়ান বনে গিয়ে খুব খুসী আছে।

আমরা লক্ষ্য করলাম, যে রাম ফৌজদার বারান্দা থেকে নামতো না, এখন কোন রিক্সাওয়ালা পয়সা নিয়ে গোলমাল করলে বা যাত্রীর দেরীর জন্য ঘন ঘন ঘণ্টা বাজালে, দৃঢ় পদক্ষেপে লাঠিটা ধরে গিয়ে দাঁড়ায়, তার কাজের জন্য চোখ রাঙ্গায়। একদিন দেখি, একটা ফিরিওলা আর আমাদের রাস্তার ঝাড়ুদারের সঙ্গে বিষম ঝগড়া। আর রাম ফৌজদার তার লাঠি হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝাড়ুদারটা মাঝে মাঝে দরোয়ানজী, তুম বলো, বলে সালিশী মানছে। ব্যাপার মিটে যাবার পর থেকে সেই ঝাড়ুদার তো বটেই, আরো যারা এ রাস্তায় আসতো যেত, বারান্দার উপর রাম ফৌজদারকে দেখলেই সেলাম জানাতো। নামের গর্ব্বে ওর দিন বেশ ভালোই কাটছিল।

আমাদের বাড়ীর পিছনে একটা ধোপা-বস্তি ছিল। ওদের ওখানে প্রায়ই গোলমাল হ'ত। একদিন গোলমাল বেশ বেশী; একজন ধোপা মদ খেয়ে এসে তার ধোপানীকে খুব মারছে। চেঁচামেচি শুনে রাম ফৌজদার ওর লাঠি হাতে করে সদর্পে চল্‌ল।

রাম ফৌজদার জোর গলায় ধোপাকে জিজ্ঞেস করলো, সে কেন মারছে।

ধোপা ছিল নেশায়, বল্লে, হামরা খুসি, তু কে রে বাপ?

বাপ সম্বোধনে রাম ফৌজদারের মেজাজ আরো চড়ে গেল, সজোরে ধোপার ঘাড় ধরে টেনে বল্লে—তব্ দেখ্ মেরা খুস্।

আর সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে যত ধোপা ধোপানী ছিল—মেরে ফেল্ল, খুন কল্ল—বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

দৈবাৎ সেই সময়ে সেখান দিয়ে এক পুলিস কনষ্টেবল যাচ্ছিল; এগিয়ে এলো কি ব্যাপার বলে। দেখে, রাম ফৌজদার ধোপার ঘাড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সকলেই এক বাক্যে বল্ল, রাম ফৌজদার ওকে খুব মেরেছে। এমন কি যে ধোপানী মার খেয়েছিল সে পর্য্যন্ত বললে।

কনষ্টেবল তখন রাম ফৌজদারকে থানায় নিয়ে গেল।

বাবা বাড়ী ফিরতেই রাঙ্গা দিদা চীৎকার করে কেঁদে বল্লেন, কি সর্ব্বনাশ, ফৌজদারকে থানায় নিয়ে গিয়েছে!

বাবা আবার তখুনি ছুটলেন থানায়। সেখানকার লোকদের বুঝিয়ে, হয়তো দু'-চার টাকা খরচ করেই, রাম ফৌজদারকে বাড়ী নিয়ে এলেন। রাতে বাড়ী এসে এই হাঙ্গামার জন্যে বাবা খুব চটে ছিলেন। বল্লেন, ব্যাটার যেমন নাম, তেমনি বুদ্ধি। তোর নামটা কে রেখেছিল রে?

রাম ফৌজদার সগর্ব্বে বলে, মেরা চাচা।

বাবা বলেন, তোর চাচা তো তাহলে খুব বুদ্ধিমান্ লোক রে! ফৌজদার মানে জানিস?

জী হুজুর!—সিপাহী।

দূর, সিপাহী না কচু; রাম ফৌজদার মানে বাঁদর। আর তোর বুদ্ধিও ঠিক বাঁদরের মত।

রাম ফৌজদার মুখ নীচু ক'রে চলে গেল। সকাল বেলা দেখি, সে পুঁটলী বেঁধে চুপটি করে বসে আছে; চোখ-মুখ লাল, মনে হ'ল খুব কেঁদেছে। আমাদের দিকে চাইলোও না।

বাবা উঠ্‌লে বল্ল সে আর কাজ করবে না। বাবা বল্লেন, কেন, তোর কি হ'লো? আর কোন ভয় নেই তোর। বোধ হয় থানার কথা ভেবে।

সে বল্লে, না বাবু, আমি আর কাজ করবো না। গলার স্বরে কান্নার আভাস।

বাবা বলেন, তবে কি বাঁদর বলেছি বলে? আরে, বাঁদর তো মহাবীরজীর নাম! যা যা, পাগলামী করিস্ নে।

কিন্তু ওর এক কথা, না বাবু, হামি আর কাজই করবো না, দেশে যাব।

শেষ পর্য্যন্ত পাঁচ টাকা মাইনে বাড়াবার কথাও হ'ল, কিন্তু ও থাকলো না।

বাবা তো জানেন না, ওর কত বড় গর্ব্ব খর্ব্ব হয়ে গিয়েছে। বেচারী রাম ফৌজদার!

পুকুরের দু পাশে দু'জন লোক ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসেছে। এক ভদ্রলোক দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন বরাত আপনার? দেখি ক'টা মাছ পেলেন?"

"বরাত মোটামুটি মন্দ নয়। চার ঘণ্টা ছিপ ফেলে বসে আছি, এখনও কোন মাছ পাই নি।"

"তবে মন্দ নয় বলছেন যে?"

"ওপাশের ঐ লোকটি আট ঘণ্টা বসে আছে, কিন্তু কোন মাছ পায় নি।"

নয়া কসরৎ

শ্রীনীলরতন দাশ

জমিদার বাবুদের নয়া দারোয়ান,
নাম তার সীতারাম, বড় পালোয়ান।
লাঠি হাতে থেকে থেকে জোরে ছাড়ে হাঁক,
লাফ ঝাঁফ করে আর গোঁফে দেয় পাক।
পরিচয় দেয়,—তার বাড়ী বহু দূর,—
গোমতী গাঁয়ের নাম, জেলা গাজীপুর।
ছাতু খায় ছয় সের, তার সাথে গুড়;
আট ঘটি জল খেয়ে খায় চানাচুর।
রাতে খায় মোটা রুটি মোটে ষাটখান,
খাটিয়ায় শুয়ে গায় 'রামধুন' গান।

একদিন সাঁঝে দেখে' দেউড়ীতে সাপ,
ভয়ে করে চীৎকার, মারে তিন লাফ।
সাথে সাথে চিৎপাত ভূতলে শয়ান,
মরে বুঝি সীতারাম বীর দারোয়ান!
ছুটে এসে জোটে লোক শুনে চীৎকার,
আলো দিয়ে ভালো করে দেখে চারিধার।

বলে সবে,—"সাপ কই? দেখি যে হেথায়
ঝুলিতেছে দড়ি এক দরজার গায়!"
তাই শুনে লাফ দিয়ে ওঠে সীতারাম—
বলে,—"নয়া কসরৎ করতেঁহি হাম্!"

বর্ষার কবিতা

শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত

কাজলা মেঘেতে আজ আকাশ ছাওয়া,
শন্ শন্ বয়ে যায় পুবালী হাওয়া।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝরিছে বারি,
বান এলো দামোদরে—ভাসিল পাড়ি।
লাল জল ছুটে চলে ছল্ ছল্ ছল্,
ওপারেতে তরীখানি করে টলমল।
মেঘে মেঘে আঁধারিয়া আসে ধরণী,
ধানক্ষেতে নেচে চলে শ্যামবরণী।

জাল ফেলে ফেরে ওই একটি জেলে,
কভু মাছ মেলে নাকো, কভু বা মেলে।
ব্যাঙ্ ডাকে একটানা জলার ধারে,
মোষগুলো ভিজিতেছে মাঠের পারে।
দিগন্ত ধোঁয়ামাখা ঝাপ্সা সবি,
মনে মনে ভেসে ওঠে কত না ছবি।
বারি ঝরে ঝুপঝাপ দেখি বসিয়া,
খাল বিল ঘোলা জলে ওঠে ভরিয়া।

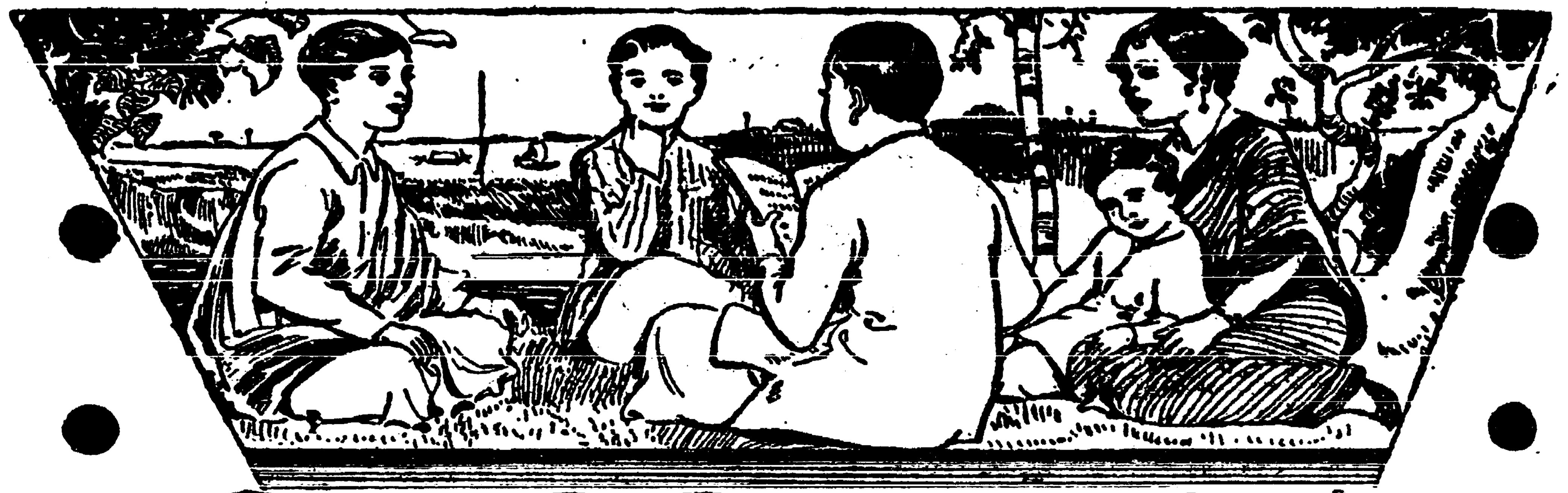

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

কণা

শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আঁধারেরই পরশ পেয়ে
ধরায় এত আলো,
দুঃখ হেথা আছে বলেই
সুখটি কত ভালো।

কবির কণিকা আপনারে ভাবে
সবার চাইতে ধন্য,
না জানিয়া তবু কবির গুণেরে
করে সে যে প্রতিপন্ন।

অবকাশ

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

আকাশের নীল প্রান্তরে আঁকা রৌদ্রের
সোনা-আলো,
পায়ের তলায় নবীন শষ্পদল,
উড়ে চলে চিল— বহু দূর পথ—রোদ্দুরে
ঝলোমলো—
ধরণী সবুজ-উৎসবে উজ্জ্বল! ·····

ভেসে আসে ক্ষীণ বিহগের কোলাহল;
মাঠে মাঠে দূরে বাজে রাখালিয়া
বাঁশী,
উড়ে যায় নভে জলহারা মেঘদল······
নীল প্রজাপতি ফেরে বাতাসেতে
ভাসি।'

মৌন, মেদুর পৃথিবী আজিকে—
আলোময় নীলাকাশ,
মন্দ পবন, উদার গগনে অনন্ত অবকাশ।

জানোয়ার-বন্ধু

গত মাসের রামধনুতে জানোয়ারের বন্ধুত্বের কথা লেখা হয়েছিল। স্বজাতির মধ্যে তো বটেই, বিভিন্ন জাতের—এমন কি স্বভাব-বৈরী জানোয়ারদের মধ্যেও যে সময় সময় কেমন বন্ধুত্ব হতে পারে তার কয়েকখানা ছবিও দেওয়া হয়েছিল। এবারে ঐ রকম আরও একখানা ছবি দেওয়া হ'ল। ছবিতে দেখ, কুকুর তার বিড়াল-বন্ধুকে নিয়ে একটা কাকের সঙ্গে কেমন আলাপ জমিয়েছে। ঠিক যেন পঞ্চতন্ত্রের গল্প! মানুষের বন্ধু হিংস্র জানোয়ারের কথাও ও-বারে বলেছিলাম। তারও কয়েকটা নতুন ছবি দেওয়া হ'ল। একটাতে এক নেকড়ে সাহেবের সঙ্গে "খোস গল্প" করছে, আর একটাতে এক গরিলা তার মানুষ বন্ধুর কোলে চেপে বসেছে। সে বেচারার অবস্থা হয়তো কাহিল! সিংহটি কিন্তু বেশ চালাক। তিনি দিব্যি তাঁর মানুষ বান্ধবীর সঙ্গে মোটরে চড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন!

কুকুর তার বিড়াল-বন্ধুকে নিয়ে কাকের সঙ্গে
আলাপ জমিয়েছে।

আগষ্টের কথা

শ্রীরুণু বসু

আমি আগষ্ট। আমার সঙ্গে তোমাদের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশার কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বর্ষপঞ্জীর পৃষ্ঠায় আমার তারিখগুলির কোনোটি গাঢ় লালে, আবার কোনোটি বা কলঙ্কময় কালোতে খোদিত।

প্রথমেই কি পড়ছে নজরে? গাঢ় কালোতে লেখা ৭ই আগষ্ট, না?

৭ই আগষ্ট, ১৯৪১! সারা দেশ থেকে শুনতে পাচ্ছো কান্না? হ্যাঁ, কান্নাই বটে! সমস্ত দেশের—সমস্ত সভ্য জগতের মর্ম ভেদ করে উঠছে এই ক্রন্দনের রোল। বাঙ্গালী— ভারতবাসী হারিয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠ আপন জনকে— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে। তাই ব্যথাতুর ধরিত্রীর সঙ্গে আকাশের চোখও আজ অশ্রুসিক্ত।

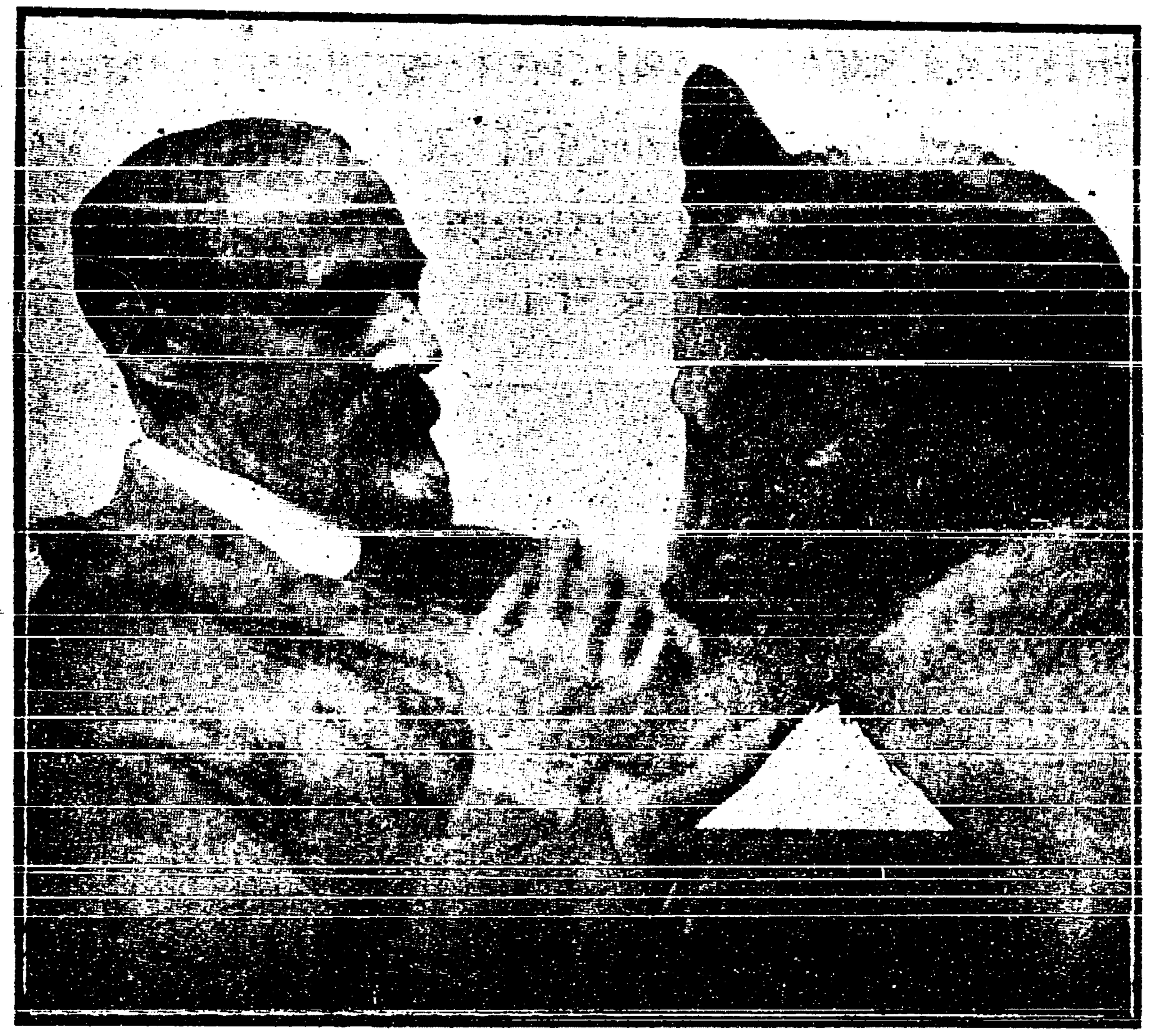

সাহেবের বন্ধু নেকড়ে

তারপর থামো ৯ই আগষ্টের সামনে। ১৯৪২!! শুনতে পাচ্ছো মিলিত ভারতবাসী মহাত্মাজীর সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে— "ভারত ছাড়ো!" বারে বারে আঘাত-খাওয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিৎ কাঁপছে সেই বজ্র-হুঙ্কারে। বাংলায় জ্বলছে বিপ্লবের লেলিহান শিখা। মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে দেখো দুর্জয় দুর্মদ বৃটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করে ক্ষণিকের জন্য উড়ছে স্বাধীন ভারতের প্রতীক্—তে-রঙা পতাকা। সারা ভারত আজ একক কণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে— "কুইট্ ইণ্ডিয়া।"

এগিয়ে চলো ১১ই আগষ্টের সামনে। শুনতে পাচ্ছো নিদ্রিত ভারতের মধ্যে জাগ্রত বাংলার গান—

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে চেয়ে ভারতবাসী।"

ক্ষুদিরামের ফাঁসি—১৯০৮, ১১ই আগষ্ট। অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে এগিয়ে এসেছিলো দুই সাথী—ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী,—অগ্নিযুগের বিপ্লবী সাধকের দুই প্রিয় শিষ্য। কিন্তু প্রতিকূল ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে অক্ষত দেহে বেঁচে রইলো কিংসফোর্ড। সঙ্গী প্রাণ দিলো নিজের রিভলভারের গুলিতে, ধৃত ক্ষুদিরামের বিচারে হলো ফাঁসির আদেশ। নির্বিকার চিত্তে সেই কিশোর বিপ্লবী গ্রহণ করলো তার মৃত্যুদণ্ড। হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে বলে উঠলো — "বন্দে মাতরম্!"

গরিলার আদর

উজ্জ্বল লাল হরফে চোখ ধাঁধিয়ে গেল, কি এটা? ১৫ই আগষ্ট না? হ্যাঁ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭! আমার এই ক্ষণজীবী সাময়িক আয়ুর মধ্যে এটা 'রেড্-লেটার ডে।' তাকিয়ে দেখো সারা ভারত আজ জেগেছে। ভারতের প্রতিটি ঘরে ঘরে উড়ছে আজ আশোকচক্র-লাঞ্ছিত তিনরঙা জাতীয় পতাকা! দীর্ঘ দু'শ' বছরের পর পরাধীনতার কুয়াশা ভেদ করে উঠ্ছে স্বাধীনতার সূর্য।

আরো কি আজ বল তো? আজ যে তোমাদের শ্রীঅরবিন্দের জন্মতিথি! এই দিনেই একদিন বাংলায় আবির্ভাব হয় এক শিশুর যে একদিন ভারতকে স্বাধীন করবার দুর্জয় সংকল্পে ঝাঁপ দিয়েছিল বিপ্লবের অগ্নিশিখায়। কিন্তু শুধু বিপ্লব

দিয়ে নয়, আধ্যাত্মিক সাধনা দিয়েও যে দিয়েছে ভারতকে তার লুপ্ত আসন পুনরুদ্ধার ক'রে।

এত বেদনাময়, কলঙ্কলিপ্ত বিষাদের কালিমামলিন দিনটি কি বল তো! ১৯৪৬ এর ১৬ই আগষ্ট না? তাকিয়ে দেখো সমস্ত দেশ যুড়ে আরম্ভ হয়েছে

সিংহ আর তার বান্ধবী

নৃশংস ভ্রাতৃহত্যা। ভাই কি করে ভাইকে মারছে দেখো! আর তাকিয়ে দেখ বাপুজীর যন্ত্রণা-কাতর বেদনার্ত মুখছবি।

তারপর তাকিয়ে দেখো ১৭ই আগষ্টের দিকে। শাণিত ছুরি হাতে অপেক্ষমান কে ওই বিদেশী? চিন্‌তে পার ওকে? ওই তোমাদের র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ সাহেব। নিজের ইচ্ছামত, খেয়ালী প্রভুর আদেশ অনুসারে আজ ও এসেছে তোমাদের দেশকে ভাগ করতে। আর অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে তোমরা তাই দেখলে? আমার জীবনে সবচেয়ে লজ্জাকর দিন বলে পরিচিত হয়ে রইল ১৭ই আগষ্ট—১৯৪৭!

কত কি ঘটেছে আমার জীবনে! আরো কত কি ঘটবে তা কে জানে?

রাজার হুকুম

শ্রীকনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা মজার গল্প শোন। ইতিহাসের গল্প, অর্থাৎ সত্যি যা ঘটেছিল।

১৮৪১ সাল। রাণী ভিক্টোরিয়া তখন সবে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেছেন। তরুণী রাণী, তাই সব দিকেই প্রখর দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করছেন।

একদিন সকাল বেলা রাণী উইণ্ডসর প্রাসাদের বাগানে বেড়াচ্ছেন, বেড়াতে

বেড়াতে তিনি বাগানের একটা ধারে চলে এলেন। সেদিক্‌টায় কেউ কখনও আসে না, কিন্তু দেখা গেল দু'জন শান্ত্রী সেখানেও অনবরত পাহারা দিচ্ছে।

ও রকম জায়গায় খামাখা পাহারা দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা কোন জবাব দিতে পারল না, শুধু বল্‌ল, তাদের ওপর ঐ রকমই হুকুম দেওয়া আছে, কেউ যাতে ওদিক্‌টায় না যায়।

রাণীর অনুসন্ধিৎসু মন, তিনি ব্যাপারটা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। অনেক ভেবেচিন্তেও যখন কিছু বোঝা গেল না তখন তিনি কথাটা প্রধান মন্ত্রী স্যর্‌ রবার্ট পীলের কাছে পাড়লেন। প্রধান মন্ত্রীও কোন সদুত্তর দিতে না পারায় রাণী দেশের পুলিশের প্রধান কেন্দ্রস্থল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। তারাও, দেখা গেল, কিছু জানে না।

নাছোড়বান্দা রাণী তখন পুরোনো ফাইল দেখতে আদেশ দিলেন। আদেশ মত কর্ম্মচারীরা পুরোনো ফাইল ঘাঁটতে বসল। শেষে এক বুড়ো কেরাণী ফাইল পড়ে জানতে পারল যে প্রায় ২১৬ বছর আগে প্রথম চার্ল্‌স্‌ রাজা হয়ে উইণ্ডসর প্যালেস কেনেন এবং সেখানে একটি সুন্দর চেরী গাছ পোঁতেন। পাছে কেউ গাছটা নষ্ট করে ফেলে এজন্য রাজা হুকুম দেন দু'জন শান্ত্রী যেন ঐ জায়গাটা সর্ব্বদা পাহারা দেয়।

রাজার হুকুম, সুতরাং কর্ম্মচারীরা কি পাহারা দেবার তা না জেনেও পাহারার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই থেকে এখনও ঐ জায়গাটা সমানে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। সেই চেরীগাছ কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু পাহারা দেওয়া ঠিক চলছে। রাজা তো হুকুম তুলে নেন নি!

বলা বাহুল্য এই হাস্যকর রহস্য সমাধানের পর রাণীর হুকুমে পাহারা বাতিল করে দেওয়া হ'ল।

নতুন বই

কিশোর গ্রন্থাবলী—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। প্রকাশক কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১ম খণ্ড ২৲, ২য় খণ্ড ১৷০, ৩য় খণ্ড ২৷০

বাংলা ভাষায় বড়দের সাহিত্যে কয়েকখানি গ্রন্থ একত্র ক'রে সুলভ মূল্যের গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে হ'লেও কিশোর বা শিশুসাহিত্যে এ প্রচেষ্টা এর আগে বিশেষ কেউ

করেন নি—এক যোগীন্দ্রনাথ ছাড়া। এদিক্ দিয়ে ধীরেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থাবলী সিরিজ বাংলা কিশোরসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলতে হবে। এর আর একটা বৈশিষ্ট্য, সচরাচর প্রচলিত গ্রন্থাবলীগুলির মত এর কাগজ ও ছাপা অতি সাধারণ স্তরের করা হয় নি। ভাল এন্টিক কাগজে সুদৃশ্য ছাপা, মলাটও রঙ্গিন, সুরুচিপূর্ণ এবং বাঁধানো ;—উপহার হিসাবে সহজেই ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। সেই হিসাবে দামও সস্তা হয়েছে বলা যেতে পারে।

ধীরেন্দ্র বাবু বর্ত্তমান বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রথিতযশা। তাঁর লেখার মধ্যে মনোজ্ঞ বর্ণনাভঙ্গী, সাবলীল ভাষা এবং বিশেষ ক'রে ঘটনার বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব সহজেই চোখে পড়ে। এই গ্রন্থাবলী সিরিজের প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে তাঁর দু'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস—'নীল নায়ের মাঝি' ও 'হে বীর প্রণাম করি'। ২য় খণ্ডে দু'খানি রহস্য-উপন্যাস—'যকের জঙ্গলে' ও 'আঁধার রাতে আর্ত্তনাদ' এবং ৩য় খণ্ডে আছে দু'খানি যুদ্ধ-উপন্যাস—'কামানের মুখে নানকিঙ' ও 'প্রলয়ের পথিক'।

আমরা পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আজ ২২শে শ্রাবণ চিঠির ঝাঁপি খুলে বসেছি। আজকের দিনটির সঙ্গে বাঙ্গালীর—বাংলা সাহিত্যের একটি গভীর শোকের দিনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই দিনটিতেই আমরা আমাদের কবিকে হারিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে চিরদিন আমাদের কাছে বেঁচে থাকবেন, কিন্তু তবু তাঁকে প্রত্যক্ষ ভাবে পাবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারা এ দিনটির কথা মনে না করে থাকতে পারবে না।

সম্প্রতি কয়েকদিন আগে আমরা আমাদের আর একটি প্রিয় কবিকে হারিয়েছি—কবি মোহিতলাল মজুমদারকে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা সাহিত্যকে সাজাবার মহান্ ব্রত যাঁরা নিয়েছিলেন কবি মোহিতলালের স্থান ছিল তাঁদের সামনের সারিতে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল।

এবারে তোমাদের চিঠির জবাব দেই। শ্রীমালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ)—তোমার চিঠিতে একটু বিস্মিত হলাম। করিমগঞ্জে আমাদের যে ক'টি গ্রাহক-গ্রাহিকা আছেন সকলেই প্রায় ঐ একই কথা লিখেছেন। দেরী হ'লেও অত দেরীতে পাওয়ার তো কোনই কথা নয়! শ্রীঅসীমা পাল (করিমগঞ্জ)—তোমাকেও ঐ একই জবাব দিচ্ছি। আগের চিঠিতে তোমার আই. এ পরীক্ষার ফল (গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম হওয়া) শুনে খুবই আনন্দিত হ'লাম। শ্রীঅঞ্জনকুমার দত্ত (কলিকাতা-৯)—চিঠির জবাব, বিশেষতঃ তাতে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন থাকলে, দেওয়া হবে না এ কি হয়? তবে বেশী চিঠি জমে গেলে একটু দেরী হতে পারে। 'চল অভিযাত্রী' কিন্তু চল্‌ল না। শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য (সজাহানপুর)—লেখা পাঠিয়ে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু "তিন অক্ষরে নাম"—ইত্যাদি ধাঁধার দিন যে চলে গেছে! নতুন ধরণের ধাঁধা চাই, যার জবাব বার করতে হলে তিন দিন তিন রাত মাথা ঘামাতে হবে। তবেই না সে ধাঁধা! পেন্সিলের ধাঁধাটি আগেই রামধনুতে বেরিয়ে গেছে। শ্রীনিবেদিতা সেন (কলিকাতা-২৯)—অবশেষে দাদাকে সরিয়ে গ্রাহকের খাতায় নিজের নাম বসাতে পেরেছ তা হলে? ভাগ্যিস দাদা বি. এ পাশ করে ফেল্‌ল। তোমার দাদা (এ-যাবৎ গ্রাহক শ্রীনবেন্দু সেন) অর্থনীতিতে ১ম শ্রেণীতে ৩য় হয়েছে জেনে খুব খুসী হয়েছি। তোমার ৺ছোড়দার সে চিঠির কথা আজও মনে পড়ে। এ খবরে সে কি খুসীই না হ'ত! শ্রীগৌরকিশোর চৌধুরী (মণিনাথপুর)—বই সমালোচনার জন্য নিশ্চয়ই পাঠাতে পার। কিন্তু হাতে-লেখা বই পাঠিও না তাই বলে। তোমার "শ্রাবণে"তে কিন্তু ছন্দের মেলাই ত্রুটী। ভাল ভাল কবিতার বই পড়বে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, বৃষ্টিও সুরু হ'ল। অতএব প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ শেষ করি।

—ইতি রাঃ সঃ

অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

বহু প্রতীক্ষিত ১৫শ বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান অবশেষে শেষ হ'ল। পৃথিবীর ৭০টি দেশ থেকে প্রায় ছ' হাজার পুরুষ ও মহিলা-খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। এবারকার অলিম্পিকের বিশেষত্ব—পৃথিবীর বহু পুরোনো রেকর্ড এবারকার প্রতিযোগীরা ভেঙ্গে দিতে পেরেছেন। এবারকার অনুষ্ঠানে সব চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন

আমেরিকান্ খেলোয়াড়েরা—বিশেষ ক'রে আমেরিকান্ নিগ্রোরা। আমেরিকা ৪০টি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তাদের মোট পয়েণ্ট হয়েছে ৬১৫। আমেরিকার পরেই স্থান পেয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া (৫৪১½ পয়েণ্ট)। তার পর হাঙ্গেরী, সুইডেন, জার্মেনী, ফিন্ল্যাণ্ড প্রভৃতি। ভারতের স্থান হয়েছে—৩০টি দেশের নীচে আর পয়েণ্ট হয়েছে ১৭। তবে তারা হকিতে এবারেও প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক পেয়েছে, এবং কুস্তীতেও একটি ব্রোঞ্জ পদক তাদের ভাগ্যে জুটেছে—যাদবের মারফৎ। পাকিস্তানের স্থান হয়েছে ৪২টি দেশের নীচে আর পয়েণ্ট হয়েছে মাত্র ৩। তারা কোন বিষয়ে পদক অর্জ্জন করতে পারে নি।

বারান্তরে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ভাল করে শোনাবার ইচ্ছা রইল।

কলকাতার ফুটবল

কলকাতার ফুটবল লীগ প্রায় শেষ হয়ে এল। প্রথম বিভাগে ইষ্ট বেঙ্গল দলের লীগ্ বিজয় এক রকম অবধারিত। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ভবানীপুর দল। মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্দ্ধে বহু নীচে নেমে গেছে। ২য় বিভাগে কোন্ দল নামবে এখন তাই নিয়েই যেন চলছে প্রতিযোগিতা—পুলিশ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন আর উয়াড়ীর মধ্যে। গ্যারিসন্ দল সবার নীচে থাকলেও এদিক্ দিয়ে নিশ্চিন্ত।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

লিচুগুলো প্রথমে এইভাবে ভাগ করা হয়েছিল—১টা, ২টো, ৩টে, ৪টে ও ১০টা।

উত্তরদাতাদের নামঃ- ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); ধূর্জ্জটীদাস ও গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় (পুরুলিয়া); খুকু, কুটু, তুতু, ধীরা, সুনুয়া, নানু (জলপাইগুড়ি); দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, বাণী, রাণী, শিবব্রত (সাজাহানপুর); দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-৪); দিলীপকুমার চন্দ্র (কলিকাতা-৭); অজিতকুমার ও অনুপমা তামূলী, কল্যাণকুমার ও কমলকুমার লহকর (গৌহাটি); চন্দন, শুভা, পূর্ণিমা, শুক্লা, নীলু (নাকড়াকোন্দা); মেজদা, ছোড়দা, বৌদি, নির্ম্মলেন্দু (ভাগলপুর); জীবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য (নৈহাটী); অমলেন্দু সরকার (কলিকাতা-৬); অজিতকুমার ও নীরেন মণ্ডল, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (বামনাবাদ); কিরণ বিশ্বাস, রণজিৎ মণ্ডল, অনিলদা, ডাক্তারদা, অজিতদা, গীতা, আনন্দময়ী, বৌদি, খোকন, দীপু, শ্যামসুন্দর (বামনাবাদ); মালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ); রমা মৈত্র (নিউদিল্লী); অসীমা, গৌতমদা, দিদি, মঞ্জু, নতুন বন্ধু ও বান্ধবী (করিমগঞ্জ)।

নতুন ধাঁধা

ঘণ্টুদা' পাড়ার ছেলেদের ডেকে বললেন, "মার্চ করার আগে তোমরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়াও—পাঁচটা দলে ভাগ হয়ে। আমি প্রত্যেক দলের হাতে একটি করে নিশান দেব—লাল, সবুজ আর সাদা। কিন্তু এমন ভাবে দাঁড়াতে হবে যে পাশাপাশি দুই দলের হাতে যেন একই রংএর নিশান না পড়ে।"

ছেলেরা বুঝে উঠতে পারছিল না এ কি ক'রে সম্ভব হয়। শেষে ঘণ্টুদা'ই তাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন সেই ভাবে। বলতে পার সব শুদ্ধ ক'টি ছেলে থাকলে এই ভাবে দাঁড়ানো সম্ভব?

(১২ই ভাদ্রের মধ্যে গ্রাহক নং সহ উত্তর পাঠাতে হবে।)

জ্যৈষ্ঠ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এবারকার প্রতিযোগিতার বিষয়—"সব চেয়ে কোন্ খেলা ভালবাসি"—এই সম্বন্ধে ছোট একটি রচনা (১০০০ শব্দের অনধিক) লিখে পাঠাতে হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি পূর্ণ ক'রে আঠা, পিন বা সুতো দিয়ে এঁটে দিতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। লেখা ৩১শে ভাদ্রের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই, আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

কুপন
রামধনু
পুঃ শ্রাঃ ৫৯

নাম—

ঠিকানা—

বয়স—

নিজে গ্রাহক/কিনা—

এবার পূজায়—

ছেলেমেয়েদের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজাবার্ষিকী

পরশ মণি

(মূল্য চার টাকা)

—এতে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(অপ্রকাশিত রচনা)
যতীন্দ্রমোহন বাগচী
(অপ্রকাশিত রচনা)
হেমেন্দ্রকুমার রায়
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কালিদাস রায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
বুদ্ধদেব বসু
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সজনীকান্ত দাস
সুনির্ম্মল বসু
বনফুল
প্রভাবতী দেবী
আরও অনেকে

অন্যান্য বছরের
পূজাবার্ষিকী

ছোটদের চয়নিকা
ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন
ঝলমল
আজব বই
শিশু গল্পিকা
সোনার কাঠী
চিত্রদীপ
মধুমেলা
রূপরেখা
বর্ষমঙ্গল
আলপনা
রাঙ্গারাখী
নবারুণ
অঞ্জলি, উদয়ন,
আবাহন।

প্রত্যেকখানা ৩৲ টাকা

এখনও কিছু
অবশিষ্ট আছে
১৩৫৮ সালের
পূজা বার্ষিকী

অভিষেক

মূল্য চার টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর —২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই

[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাল এজুকেশন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত]

১।	মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু	...	৪৸০
*২।	গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১৷৷০
*৩।	মাঞ্চুসেনের অ্যাডভেঞ্চার— „	...	৸০
*৪।	ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস	...	১।০
*৫।	„ আইনষ্টাইন— „	...	১।০
৬।	„ মার্কনি— „	...	১।০
*৭।	দেশবিদেশের লেখা ...	...	৩৲
৮।	গল্পবীথিকা— গদাধর নিয়োগী	...	১৸০
*৯।	আসামের অরণ্যচারী—নলিনীকুমার ভদ্র	...	১৷৷০

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কর্তৃক অনুমোদিত
বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

চয়নিকা

মাসিক পত্রিকা
নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

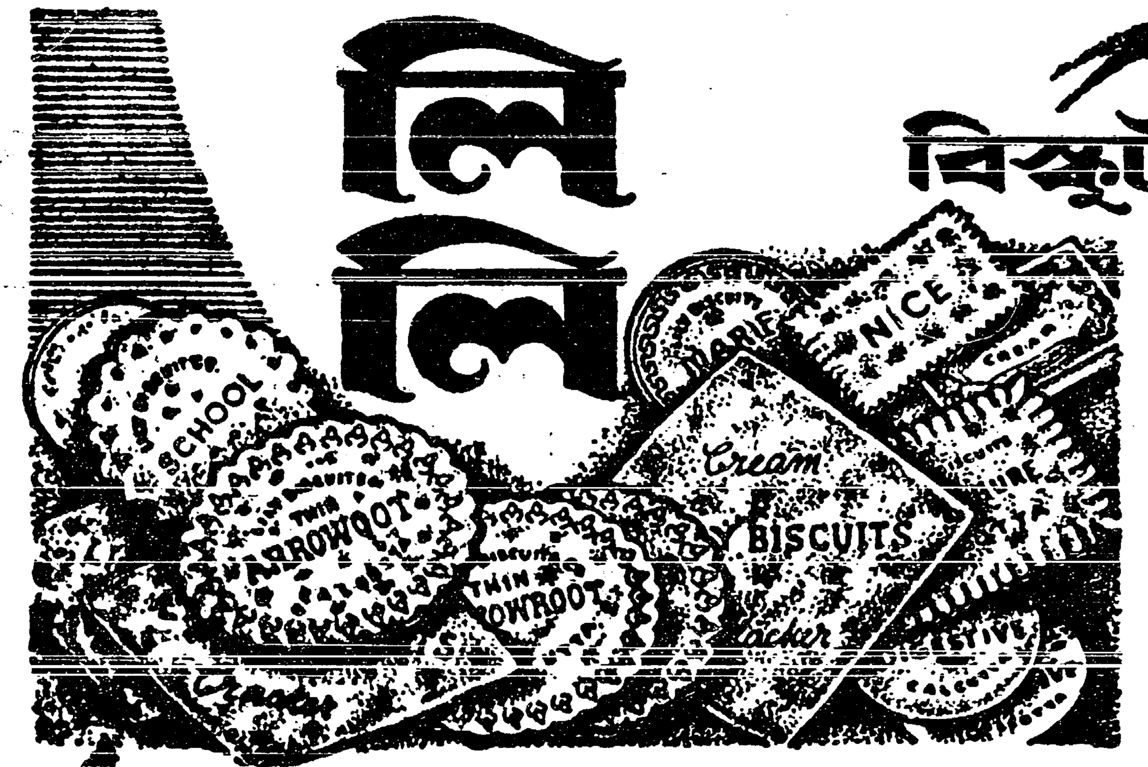

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন ক্রীম,
ক্যাণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

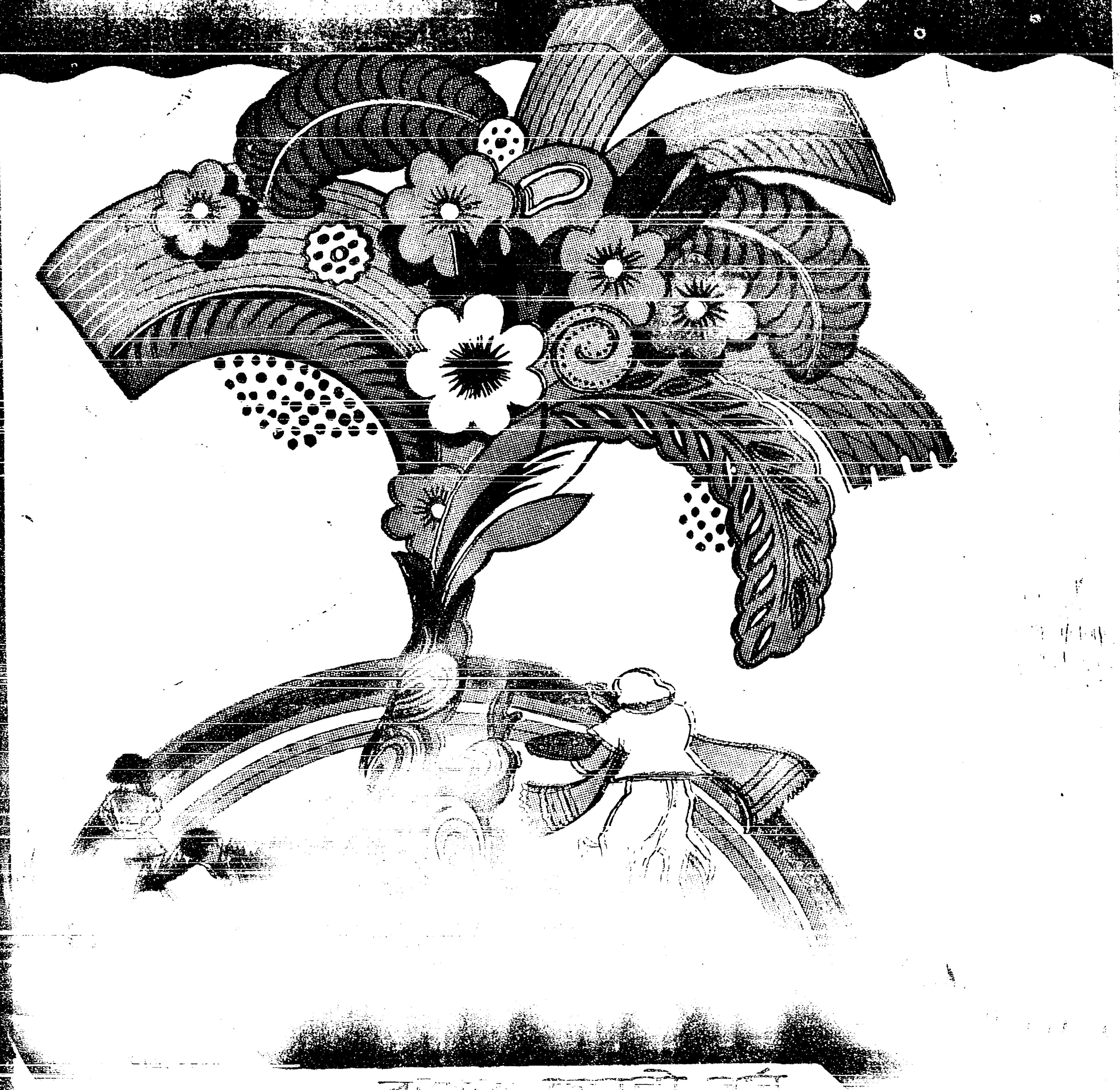

সলোমন এণ্ড কোং

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড (মোহতা হাউস) কলিকাতা-১

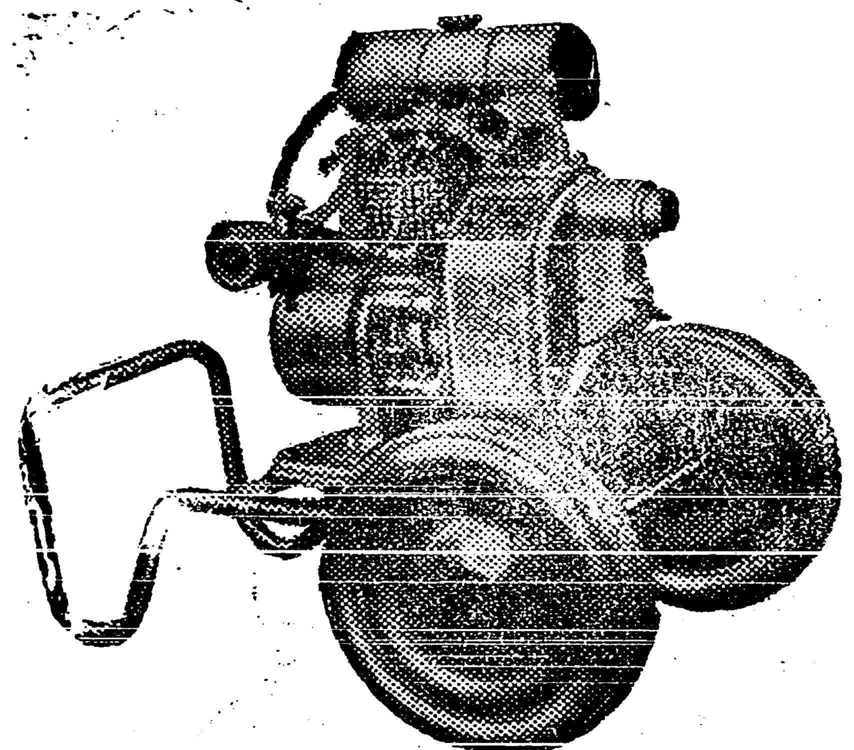

নানা প্রকার ডিজেল—কেরোসিন—পেট্রোল ইঞ্জিন, হ্যাণ্ড ও পাওয়ার-পাম্প—গ্যালভানাইজ্ড টিউব প্রভৃতি আমদানী ও প্রস্তুতকারক।

সোল প্রোপ্রাইটার : নৃপেন ভট্টাচার্য্য

GRAM : 'AGRASTONS' • • • PHONE : BANK 4497

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ষার শেষে

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি রঞ্জিত

২৫শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৫৯ { ৫ম সংখ্যা

আলাপ

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যখন হই মি তখন
কোন্‌খানে ছিলাম ;
কে সে মোরে আদর করে
ডাক্‌তো ধরে নাম ?
সে-দেশ ছিলো কেমন ধারা,
খেলার সাথী ছিলো কারা,
দৌড়ে এসে ভালোবেসে
কার চুমু নিতাম ?

আমি যখন হই নি তখন
একলা ছিলে বুঝি ?

এ ঘর ও ঘর করতে শুধু
আমায় খোঁজা-খুঁজি।
লাটাই, ঘুড়ি, লাটিমগুলি
আমার তরে রাখতে তুলি,
কখন আমি আসবো, তুমি
ভাবতে অবিরাম ?

আফ্রিকার চিঠি

অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ

আমার বাড়ীর দু'পাশে নেটিভরা আছে। চপ্ অর্থাৎ খাবার (ভাত, মিষ্টি আলু, তেলেভাজা—এই রকম) হাঁড়িতে হাঁড়িতে তৈরী করছে একদল মেয়ে। প্রত্যেকের ভিন্ন সংসার; বোধ হয় এক এক ঘর। রান্না খোলা জায়গায়—অন্য সব ব্যবস্থা যত্রতত্র। এরা বাশা জাতের লোক। অন্যদিকে যারা আছে তারা এখানকার 'জঙ্গুলে' (বুশ্‌ম্যান্) নয়, ফান্টি অর্থাৎ সমুদ্র-উপকূলের লোক। জাতে আফ্রিকান্ কিন্তু বিদেশী। এদের অনেকে মুসলমান; মাডিঙ্গো উপজাতি। লাইবেরিয়ার বেশীর ভাগ মুসলমান। নাইজেরিয়াতে যেমন মুসলমান আমীর আছে এদের মধ্যেও তেমনি অধিপতি আছে এবং বেশ সংঘবদ্ধ। মেয়েরা যারা সহুরে হয়েছে তারা অনেকে জুতো, ছাতা ধরেছে। কিন্তু সবার মাথায়ই রঙীন

কাপড় (স্কার্ফ) বাঁধা, নানা কায়দায়। এমন কি কোমরের উপর অনাবৃত অবস্থায় থাকলেও মাথায় রঙীন ওড়না বাঁধা। পোষাকপত্র পরিষ্কার করছে প্রায়ই দেখি, এবং বেয়ারা নিগ্রো চুলকে লোহার তাতানো চিরুণী দিয়ে সায়েস্তা করছে। আর উকুন বাছা তো আছেই। রঙ এত কালো হলেও সব চেয়ে চক্‌মকে গাঢ় রঙের কাপড় দিয়ে জামা, ওড়না তৈরী করতে এখানকার মেয়েরা পছন্দ করে।

ফান্টি মহিলা—নিজ কুঁড়ের সামনে। ঘরটি গোলাকৃতি।

যারা আমেরিকো-লাইবেরিয়ান (এরা অভিজাত শাসক শ্রেণী) তাদের বেশভূষা দক্ষিণ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের অনুকরণে—অর্থাৎ সাহেব মেমসাহেবের মত, মায় নাইলনের মোজা—এই গরমে। পুরুষদের পরনে এখনও গরম স্যুট,—রঙীন এবং ধোয়াতে হবে না বলে। লাইবেরিয়ার সর্ব্বত্র লাল ধূলায় জামা-কাপড় গেরুয়া হয়ে যায়, কাজেই সাদা পোষাক কম। তা ছাড়া, অফিসে টাই-কোট চাই-ই। সেদিন বিকেলের এক পার্টিতে কোট নেই নি বলে উঁকি দিয়ে ফেরৎ এলাম। এই গরম, তাতেও এই অত্যাচার! আমাদের দেশেও ইংরেজ আমলে এ সব কিছু দিন ছিল।

ক্রমে যে নিজ বাসভূমির প্রতি আকর্ষণ আসছে তার প্রমাণও দেখছি। নতুন আইন-সভা ও বিচারালয়ের জন্য যে নক্সা ইতালিয়ানরা করে দিয়েছে তাতে এখানকার গোল গোল পাতার ঘরের নকল চূড়া থাকবে। নাম-করা রেস্তোরাঁ 'পেপার বার্ড' এখানকার প্রভাতী পাখীর (চড়ুই-এর মত) নামে হয়েছে। নেটিভ অধিপতিদের তোয়াজও হচ্ছে, তাদের পোষাক প'রে অভ্যর্থনায়।

কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ধরেছে। এখানকার প্রধান রাস্তা য়্যাশ্‌ম্যান্ ষ্ট্রীট, যার উপরে লাইবেরিয়া সাধারণতন্ত্রের পুনর্নির্ব্বাচিত সভাপতি উইলিয়ম টাবম্যানের সরকারী বাসভবন,—কৃষ্ণচূড়ার ফুল গুঁজেছে কোমরবন্ধে অর্থাৎ মাঝখানে।

রাস্তাটি লম্বায় ৩ মাইল, দূরে সমুদ্র দেখা যায়। শনিবার ১২টায় অফিস বন্ধ, ৯টায় সুরু; অন্য দিন ৮টায় সুরু, ২টায় ছুটি। বিকেলে ঐ রাস্তায় দাঁড়ালে কত রকমের লোক দেখা যায়, বিশেষতঃ শনিবার। সপ্তাহান্ত কাটাতে মোটর ভর্ত্তি 'ইয়ারের দল' নিজ পরিজনের কাছে যাচ্ছে সওদা নিয়ে; হয়তো পিঠে ছোট ছেলেমেয়ে বেঁধে মেয়েরা আর স্থানীয় কৃষ্ণবর্ণ সাহেব-মেমরা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছেন বা নানা পানাহারের আড্ডায় যাচ্ছেন—শেষ রাত পর্য্যন্ত থাকবেন। এত ছোট সহর, কিন্তু রঙ্গভরা। এই রস ও রঙ্গের উপর হাসছে কৃষ্ণচূড়ার ঝাঁক—পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেলে বা তারাভর্তি আকাশের নীচে।

এই ১৪ বছরের মেয়েটি গ্রামের বুড়ি-মা'র তদারকে তিন বছর থেকে (বুশ্ স্কুল অব্ কাষ্টমস্) নিজ গ্রামে ও ভাইদের আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। এবার সংসার-ধর্ম্ম করতে পারে। এরা লাইবেরিয়ার জঙ্গুলে অধিবাসী।

এরা হাসিমুখ, বন্ধুবৎসল, দারিদ্র্য সত্ত্বেও সাজগোজে ত্রুটি নেই; কিন্তু কথায় যত, কাজে তার চাইতে অনেক কম, এবং আপন সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে খুবই সজাগ। ফলে বিদেশীর উপর নির্ভর বেড়ে চলেছে। জার্মান্ ও ইতালিয় পটু কারিগর—বিশেষতঃ ফরাসী যন্ত্রবিদ্ ও সজ্জা-বিশারদ্ এবং আমেরিকান সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বত্র বিচরণ। ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানী ও লেবাননের ব্যবসায়ীকুল সবাই দু' পয়সা করছে। একটি মাত্র ভারতীয় (সিন্ধী) দোকান প্রদীপ জ্বালিয়ে আছে। আমি একা বাঙালী, প্রথম 'নিম দাঁতের মাজন', 'পদসাথী' মার্কা বাক্সে জুতো, 'গোপাল' গেঞ্জী আর রবীন্দ্রনাথের পুঁজি নিয়ে পাড়ি জমিয়েছি। কালো রঙ ও এশিয়ার লোককে এরা প্রীতির চক্ষে দেখছে, এবং আমিও জানি যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে (ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অফিস) এলেও এরা আমার হাসি, বুদ্ধি, প্রীতি ও

আচরণ থেকে আমার অঞ্চলের পৃথিবীকে যাচাই করছে। তবে নিঃসন্দেহ, কালকের পৃথিবীতে কালোর কদর বাড়বে বই কমবে না; আর এই 'কৃষ্ণ মহাদেশের' (ডার্ক কন্টিনেণ্ট) সমৃদ্ধির উপরই চেয়ে আছে পশ্চিমের ক্ষয়িষ্ণু অর্থ নৈতিক বনিয়াদ, আবার খাড়া হবার জন্য। এই মূক মুখে ভাষা ফুটলে নূতন তূর্য্যধ্বনি হয়ত শুনতে পাব। এই নগ্ন, ক্ষুধিত জনগণকে বস্ত্র, অন্ন, বাসগৃহ যোগাতে পারলে শিল্প-সভ্যতা আবার জেঁকে উঠবে। দরিদ্র জনসমষ্টি পৃথিবীর সামগ্রিক শান্তির শত্রু।

[মনরোভিয়া, চৈত্র, ১৩৫৮]

সোনার বালুচরে

শ্রীঅশোক সেন, এম্. এ

—এগারো—

উইল বলে চললেন:

"দূরবীণ ছাড়া 'গুড গ্লাস' কথাটার আর কোন অর্থ হতে পারে না। জান বোধ হয়, নাবিকেরা দূরবীণকে 'গ্লাস্' বলে। বেশ বুঝলুম, দূরবীণ দিয়ে দেখবার নির্দিষ্ট জায়গা হচ্ছে এটা,—উঁচু পাহাড়ের কোলে এমন পাকাপোক্ত জায়গার তো আর কোনদিন নড়চড় হবে না!—দূরবীণ বসাবার পক্ষে সত্যি খুব উপযোগী জায়গা। "৪১ ডিগ্রী-১৩ মিনিট" কথাটার মানে এখন সহজ হয়ে গেল—দূরবীণ বসাতে হবে ঠিক ঐ মাপে। তখুনি তাড়াতাড়ি বাড়ী গেলুম—দূরবীণ নিয়ে আবার ফিরে এলুম। সেই খোলের মধ্যে গিয়ে দূববীণটা বসাতে শুরু করলুম। ৪১ ডিগ্রী-১৩ মিনিট যে মাপ দেওয়া আছে সেটা অবশ্য দিগন্তের উপরে কোণের নির্দেশ, কারণ দিকের কথা তো স্পষ্ট করে দেওয়া ছিল—"উত্তর পূর্ব এবং পূর্ব দিয়ে"। পকেট-কম্পাসের সাহায্যে চট্ করে দিক্‌টা ঠিক করে নিলুম—তারপর দূরবীণের মুখটা আন্দাজে ৪১ ডিগ্রী কোণ করে খুব ধীরে ধীরে ওটাকে উঁচু-নীচু করে দেখতে লাগলুম। হঠাৎ দূরে একটা বড় উঁচু গাছ দেখতে পেলুম। আর তার ডাল-পালার মধ্যে দিয়ে দেখলুম একটা গোলাকার ফাঁক—সেই ফাঁকের মাঝখানে সাদা মতন কিছু

একটা—ঠিক বুঝতে পারলুম না সেটা কি! দূরবীণটা ঠিক করে ভাল ভাবে তাকিয়ে দেখতে পেলুম—একটা মড়ার খুলি!

"মন আমার আনন্দে নেচে উঠলো। সমস্ত রহস্যের সন্ধান পেয়ে গেছি বলে মনে হ'ল! তারপর যে সংকেত দেওয়া আছে তা তো খুবই সহজ—"প্রধান শাখা, সপ্তম ডাল, পূর্ব দিক্"—এ সব হচ্ছে গাছের উপর খুলিটার অবস্থানের নির্দেশ—তা ছাড়া আর কিছু নয়। "খুলির বাঁ চোখ থেকে ছোড়"—এ কথাটির একটি মাত্র অর্থ হতে পারে—সেটা হচ্ছে যদি গুপ্তধনের সন্ধান চাও, তা হলে ঐ পথে এগিয়ে যাও!

"তখন আমি ওদের মতলবটা অনুমান করতে পারলুম। খুলিটার বাঁ চোখের ভিতর দিয়ে গুলি বা কোন ছোট ভারি জিনিষ ফেলতে হবে। তারপর গাছের গোড়ার সবচেয়ে কাছে কোন বিন্দু থেকে গুলিটা যেখানে পড়বে সেই জায়গা অবধি সোজা লাইনে (মৌমাছির লাইনে) চলে যেতে হবে আরো পঞ্চাশ ফুট। সম্ভবতঃ সেই নির্দিষ্ট স্থানের নীচেই লুকানো আছে গুপ্তধন।"

আমি বললুম—"সমস্ত ব্যাপারটা এখন খুবই সোজা ও পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে; এর পেছনে আপনার কিন্তু অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে। ভাল কথা, বিশপের হোটেল থেকে ফিরে এসে কি করলেন তা তো বললেন না?"

"হ্যাঁ, বলছি,—গাছটার সব কিছু ভাল করে দেখে নিলুম, তারপর বাড়ী ফিরবার জন্যে ওখান থেকে উঠে এলুম। তখন একটা জিনিষ দেখে অবাক হলুম—ঐ শয়তানের আস্তানা ছাড়া আর কোন জায়গা থেকে গোলাকার ফাঁকটা দেখা যায় না—চেষ্টা করেও দেখতে পারি নি। অনেক মাথা খাটিয়ে ওরা জায়গাটা বেছে বের করেছিল বলতে হবে।

"বিশপের হোটেলে যাবার সময় আমার সঙ্গে ছিল জুপিটার। আমার হাবভাব দেখে সে বেটা কিছুদিন আমার উপর খুব কড়া নজর রেখেছিল—আমায় কোথাও একা বের হতে দিত না। কিন্তু পরের দিন ওকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এলুম। আবার চললুম পাহাড়ের দিকে—সেই গাছের সন্ধানে। রাত্রে বাড়ী ফিরতেই জুপ লাঠি নিয়ে আমায় তেড়ে এল। তারপর বাকিটুকু তুমি সব জান।"

"আর একটা কথা এখনো জানতে বাকি আছে। জুপের আহাম্মকির জন্যে প্রথম বার খুঁড়বার সময়ে ঠিক জায়গাটা ধরতে পারেন নি। সে তো ডান চোখকে বাঁ চোখ ভেবে তার মধ্যে দিয়ে পোকাটাকে ফেলেছিল।"

"ঠিক বলেছ। ঐ ভুলের জন্যে পোকাটা ফেলবার জায়গা, অর্থাৎ গাছের নিকটের কাঠি থেকে আড়াই ইঞ্চির তফাৎ হয়েছিল। পোকাটা যেখানে পড়েছিল তার নীচে যদি সেই গুপ্তধন থাকত তা'হলে এ ভুলে কিছু এসে যেত না। একটা নির্দিষ্ট সোজা লাইন টানবার জন্যেই কাঠি আর গাছের গোড়াকে দু'টো বিন্দু ধরা হয়েছিল। প্রথম ভুলটা যত সামান্যই হোক না কেন, পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে যাবার পর আমরা আসল জায়গা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে এসেছিলুম। তখনো আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, ধনরত্ন কাছাকাছি কোথাও লুকানো আছে; সেই বিশ্বাস নিয়ে লেগে না থাকলে সেদিন আমাদের সব পণ্ডশ্রম হ'ত।"

"কিন্তু পোকাটাকে নিয়ে আপনার ও রকম বাড়াবাড়ি করার কোন অর্থই আমি খুঁজে পাই নে। এক সময়ে তো ভেবেছিলুম, আপনি বুঝি পাগলই হয়ে গেলেন! আচ্ছা, গুলির বদলে আপনি পোকাটাকে খুলির ভিতর দিয়ে ফেলতে গেলেন কেন?"

উইল একটু মুচকি হেসে বল্লেন—"তারও একটা কারণ আছে। আমার মাথা খারাপ হয়েছিল বলে তুমি সন্দেহ করেছিলে তা আমি জানি। তাতে আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হয়েছিলুম। তোমাকে জব্দ করবার জন্যেই পোকাটাকে নিয়ে ও রকম ঢং করেছিলুম—যাতে ব্যাপারটা একটু রহস্যময় হয়।"

"সবই তো বুঝলুম। শুধু আর একটা কথা জানবার আছে।—গর্তের মধ্যে কংকাল থাকবার কারণ কি? আপনার কি মনে হয়?"

"সেটা আমিও ঠিক অনুমান করতে পারছি নে। একটা কারণ থাকতে পারে—যদিও সেটা এমনই ভয়ানক যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। ভেবে দেখো, এ সব ধনরত্ন পুঁতে রাখবার সময় ক্যাপ্টেন কিডের নিশ্চয় অন্য লোকের সাহায্যের দরকার হয়েছিল। সে জন্যে তিনি হয়তো যারা এই গুপ্তধনের সন্ধান জানে তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলাই নিরাপদ বলে মনে করেছেন। গর্তের মধ্যে তারা যখন কাজে ব্যস্ত ছিল তখন খন্তার কয়েক ঘা তাদের শেষ করবার পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো এ কাজে দশ-বারো জন লোক লেগেছিল—কে আর জানবে সে কথা বলো?"*

—শেষ—

* এড্গার এলেন পো রচিত 'দি গোল্ড বাগ' গল্পের মর্মানুবাদ

নিদারুণ এগজামিন

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্

ভাগ্যিস, তুমি-আমি দক্ষিণ আফ্রিকার বারোৎসি মুল্লুকে জন্মাই নি! যদি জন্মাতুম, তাহলে—

তাহলে কি হতো সে কথা বলেছেন জ্যাকার্ট সাহেব। শোনো তবে বলি সে কথা।

জ্যাকার্ট সাহেব চাকরি উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তর রোডেসিয়াতে কিছুকাল ছিলেন। এটা তার গোড়ার দিকের ঘটনা। ভদ্রলোকের সামনের কয়েকটা দাঁত বাঁধানো ছিল। একদিন তিনি সেই বাঁধানো দাঁত খুলে রেখে কথা বলছেন, তাই দেখে কয়েকজন কাফ্রি সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। তারা সাহেবের ফোকলা মুখের দিকে চেয়ে দেখে, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। আর, কেবলই বলে 'বা-ইলা! বা-ইলা!'

আমাদের সাহেব নতুন এসেছেন, বা-ইলা কাকে বলে জানেন না। তাই গেলেন আর এক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে। তাঁর কাছে শুনলেন যে 'বা-ইলা' হচ্ছে জ্যাম্বেসী নদী-তীরের বারোৎসি মুল্লুকের এক জাতের কাফ্রির নাম। তাদের ছেলেরা যখন বর্শা দিয়ে সিংহ শিকার করে তখন তাদের সামনের দু'টো দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তাদের সিংহ মারবার সার্টিফিকেট হলো ঐ দাঁত-ওপড়ানো। তাদের তো আর তোমার-আমার মত পুঁথি পড়ে পরীক্ষা পাশ করা নয় যে কাগজের সার্টিফিকেট পাবে।

বারোৎসি-মুল্লুকের অধিপতি

কিন্তু মুস্কিল এই যে যতদিন না দাঁত ওপড়ানো হচ্ছে ততদিন কেউ তাকে বড় বলে মানবে না। মানে, একলা সিংহ মারবার পরীক্ষা পাস না করা পর্য্যন্ত তুমি 'এলেবেলে' থেকে যাবে, যদি বারোৎসি দেশে জন্মাও। তাই বলছিলাম, ভাগ্যিস—

এখন, জ্যাকার্ট সাহেবের দাঁত নেই দেখে কাফ্রিরা ভেবেছে যে সাহেবদের নিয়ম আর বা-ইলাদের নিয়ম এক,—বা-ইলাদের মত সাহেবদেরও সাবালক হতে হয় দাঁত ভেঙ্গে। এই কথা ভেবেই তাদের হাসি পাচ্ছিল অত।

সাহেবের সেই থেকে শখ হলো যে এই দাঁত-ভাঙ্গবার ব্যাপার একটা দেখতে হবে। সুযোগও একটা জুটে গেলে অল্পদিনের মধ্যে।

কয়েকদিন পরেই তাঁকে সরকারী কাজে যেতে হলো, জ্যাম্বেসি নদীর তীরে মোনগু বলে একটা গ্রামে। সেখানে পৌঁছে তিনি জানতে পেলেন যে সেটাই বা-ইলাদের দেশ। শুধু তাই নয়, পরদিনই নাকি এক বা-ইলা সর্দ্দারের ছেলের এগজামিন—মানে, সিংহ মারবার পরীক্ষাও বলতে পারো, হাতে-খড়িও বলতে পারো। কাছেই জঙ্গলে একটা সিংহ একটা গরু মেরে রেখে গিয়েছে; সেটা যখন গরুটাকে খেতে আবার আসবে তখন তাকে মারবে সর্দ্দারের সেই ছেলেটা। তার নাম চুলা।

সূর্য্য উঠবার ঘণ্টা দুই আগে তামাসা দেখতে রওনা হলো দলে দলে বা-ইলা কাফ্রিরা। সঙ্গে তাদের ঢাক-ঢোল, বর্শা-বল্লম। আর, সকলের আগে চললো চুলা। সাহেবও তাদের সঙ্গ নিলেন। যে লোকটি সিংহের খবর নিয়ে এসেছিল সে পথ দেখিয়ে চললো চুলার সঙ্গে। সাহেব আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন যে এতগুলি লোক চলেছে কিন্তু কোনও গোলমাল তো দূরের কথা, পায়ের তলাকার ঝরা পাতার মচমচানি পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

যেতে যেতে ভোর হয়-হয় এমন সময় জায়গাটার কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেল দলটা। তারপর সবাই চুপিসাড়ে ছড়িয়ে পড়লো বনের আড়ালে আড়ালে। সাহেবও একটু দূরে একটা টিলার ওপর উঠে পড়লেন—উঁচু থেকে বেশ নিরাপদে অথচ ভাল ভাবে ব্যাপারটা দেখা যাবে।

সেখান থেকে দেখা গেল যে জঙ্গলের ফাঁকা মতন একটা জায়গায় মরা একটা গরু পড়ে আছে, আর তার ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে—সিংহ নয়, একটা সিংহী। তার দিকে ধীরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সর্দ্দারের ছেলে চুলা। হাতে তার একটা ছুঁচালো-মাথাওয়ালা ডাণ্ডা, হাত চারেক লম্বা। ব্যস্, আর কিছু না।

তাই বলে কি চুলা চুপেচুপে গিয়ে সিংহীটাকে মেরে ফেলল? তা নয়। ফাঁকি দিয়ে এগজামিন পাস করবার নিয়ম তাদের শাস্ত্রে নেই। সে সিংহীর কাছাকাছি গিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ালো। অমনি হঠাৎ আশপাশের বন কাঁপিয়ে বেজে উঠলো জংলীদের ঢাক-ঢোল, সঙ্গে সঙ্গে সে কি বিকট চীৎকার তাদের! তাতে বোধ হয় মরা সিংহীও জেগে ওঠে, জ্যান্ত সিংহী তো লাফিয়ে উঠবেই। সে হকচকিয়ে উঠে বসতে না বসতেই তিন দিকের বনের মধ্যে থেকে

বা-ইলা কাফ্রিরা তাকে তাড়া করে এগিয়ে এলো। কেবল তার সামনের দিক্‌টা ফাঁকা। সেইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে চুলা। কাঠের বল্লমটা তার হাতে উঁচু করে ধরা,—তার গোড়াটা মাটিতে চেপে সে নির্ভয়ে সিংহীর আক্রমণের প্রতীক্ষা করছে। এইবার তার পরীক্ষা—জীবন-মরণের খেলা।

সিংহীটা একবার গর্জ্জন করে উঠলো। গুঁড়ি মেরে বসে চুলাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। কেননা, সে-ই কাছে আছে, আর তাকে মারতে পারলেই তার পথ খোলা। দুই পাশ আর পিছন থেকে তাকে তাড়া করে আসছে অনেকগুলি অস্ত্রধারী যোদ্ধা,—সে তিন দিকের কোনও দিক্ দিয়ে পালাবার সুবিধে নেই, তা সে বুঝেছে।

এক মুহূর্ত্ত। তার পরেই হুঙ্কার করে সিংহীটা মারল এক লাফ। চুলার মাথার কাছে তার সামনের থাবাটা এসে পড়েছে। সবাই স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কি হয়, কি হয়! চুলা তার বর্শার মাথাটা একটু হেলিয়ে দিয়ে শক্ত করে ধরে রয়েছে সেটাকে। ঠিক সেই বর্শার আগায় বিঁধে গেল সিংহীর গলাটা। দেখতে দেখতে তার গলার এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেল বর্শার মুখটা।

সিংহীটা মরে যাওয়াতে বা-ইলাদের সে কি আনন্দ! মানুষ আবার জয়ী হয়েছে পশুর উপর। বারোৎসি কথাটার মানে হচ্ছে সিংহ; অর্থাৎ সেই মুল্লুক—যার অধিপতি হচ্ছে সিংহ। কিন্তু আসলে বারোৎসি মুল্লুকের রাজা হচ্ছে বনের পশুরাজ নয়, বা-ইলা মানুষেরা। সে কথাটা আজও আবার প্রমাণিত হ'লো।

শেষ পাতা

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ

মণ্টুর বাবা যখন স্বর্গে গেলেন তখন মণ্টুর বয়স মাত্র ছয় মাস। সামান্য সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন বলে ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্রের জন্য বিশেষ কিছুই সঞ্চিত রেখে যেতে পারেন নি, কেবল মাত্র দেশী একটা বীমা কোম্পানীর রোগা, ময়লা একখানা এ্যাকাউণ্ট বুকের ঠিকানায় কয়েকশ' টাকা ছাড়া। সংসারে আপন বলতে কেউ নেই—মাথার উপর একমাত্র রক্ষক ও অভিভাবক স্বামীকে হারিয়ে বিধবা মণ্টুর মা চক্ষে অন্ধকার দেখলেন।

কিন্তু যে ভাবেই হোক ছেলেকে মানুষ করে তুলতে হবে। আঁচলে চোখ মুছে মণ্টুর মা

শক্ত হলেন। তিনি ভাল সেলাই জানতেন; একটা সেলাইএর কল যোগাড় করতে পারলে মা-ছেলের দু'বেলা দু'টি অন্নের সংস্থান হবেই।

* * * *

তার পর অনেক দিন কেটে গেছে। মণ্টু এখন দশ বছরেরটি হয়েছে। লেখাপড়ায় সে ভয়ানক তুখোড় কিন্তু দুষ্টুমীতেও যুড়ি নেই তার। তার দুরন্তপনা সহ্য করবার মধ্যে মা ছাড়া ছিলেন মাত্র একজন ভদ্রলোক। তাঁর নাম গোবিন্দ গোঁসাই।

মণ্টুরা যে ঘরে ভাড়া থাক্‌তো, গোবিন্দবাবু থাকতেন তার ওপরকার ঘরে। বয়স তাঁর ষাটেরও বেশী; মুখে ঘন দাড়ি-গোঁফ ঝুলে পড়েছে। মণ্টুদের ড্রয়িং-মাষ্টার একদিন তাদের মিকেল এঞ্জেলোর গল্প বলেছিলেন। ঝড়ের দিনে বুড়ো গোবিন্দ বাবুকে দেখলে মণ্টুর মনে পড়তো মিকেল এঞ্জেলোর সেই দীর্ঘ আবক্ষ-শ্বেত শ্মশ্রুর কথা। গোবিন্দ গোঁসাই ছিলেন আর্টিষ্ট। কিন্তু তাঁকে তূলি, রঙ আর ইজেল নিয়ে দিনরাত নাড়াচাড়া করতে দেখলেও চল্লিশ বছরের মধ্যে তাঁর আঁকা একখানি ছবিও চোখে পড়ে নি কারও। আসল কথা, গোবিন্দ বাবুর বরাতটাই ছিল মন্দ। তার ওপর লোকটিও ছিলেন বেশ খামখেয়ালী ধরণের, কাজে-কাজেই বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড লেখা বা বড়লোকের বাড়ীর দেয়াল-সিলিং পেণ্ট করা ছাড়া আর কোন কাজ বড় একটা তাঁর আসতো না।

কিন্তু বাচ্চা মণ্টুর সঙ্গে ছিল তাঁর এক অপূর্ব্ব বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ছোট্ট ছেলেটির ছোঁয়াচ লেগে ঘুণ-ধরা ষাট বৎসরের বৃদ্ধের মন আবার উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো। গোঁসাই ছিলেন অবিবাহিত। আপনার বলতে এ দুনিয়ায় তাঁর কেউ ছিল না। মণ্টু তাঁকে 'দাদু' বলে ডাকতো, আর যখন-তখন তাঁর ঘরে গিয়ে টানাটানি করতো তাঁর এটা-সেটা—ছবির মাল-মশলা নিয়ে। গোবিন্দ বাবুর বরাবরই সাধ ছিল জীবনে তিনি অন্ততঃ একখানিও এমন ছবি এঁকে যাবেন ইংরেজীতে যাকে বলে 'মাষ্টারপিস'। কিন্তু গত কুড়ি বছরেও গোবিন্দ বাবুর মাষ্টার পিসের রঙ দেখা কারুর ভাগ্যে সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। দিনে খুব কম করে পঞ্চাশ কাপ্ চা খেতেন ভদ্রলোক। ড্যাবডেবে চোখ মেলে মণ্টু দেখতো তাঁর আনাড়ী হাতের চা তৈরী করার ধরণ। চা তৈয়ার করতে করতে বুড়ো মণ্টুকে শোনাতেন তাঁর জীবনের কাহিনী। বলতেন, "জানো মণ্টুবাবু, আমি কেবল অপেক্ষা করছি ভাব অর্থাৎ আইডিয়ার জন্যে! মাষ্টার-পিস ছবি একখানা আমি আঁকবোই একদিন। দেখো তুমি।"

মণ্টু তখন একটা পাত্রে কালো আর হলদে রঙ মিশাচ্ছে। তাঁর একটা কথাও কানে যায় নি তার।

সেবারে শীত পড়লো কলকাতায় খুব। আর অন্যান্য রোগ তেমন বেশী না হলেও নিউমোনিয়া যেন সেবার সকলকে নাড়া দিতে আরম্ভ করলো একটু বেশী করে।

মণ্টুও জ্বরে পড়ল। মণ্টুর মা ব্যাকুল হয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, "হ্যাঁ, নিউমোনিয়াই হয়েছে। অবশ্যি এখনও ভয় পাবার মত কিছু নয়, তবে ও যে শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে এই ধারণাটা যেন না যায় ওর মন থেকে। ওর শরীর তেমন সবল নয় আর ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে, আমার কেন জানি না মনে হলো, নিজের আরোগ্যলাভের বিষয়ে বড় নিরাশ

হয়ে পড়েছে বেচারা। চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনও প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে হবে। নচেৎ ওকে বাঁচানো একটু কঠিনও হতে পারে, এই কথা।”

জানালার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় একটা বাচ্চা অশ্বত্থ গাছ। বুড়ো শীতঋতু তার লম্বা চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে বেচারার ডালপালাগুলো। এখানে-সেখানে কতগুলো আধা-সবুজপাতা কাঁপছিল বাতাসে থরথরিয়ে তখনও। সেই পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে মণ্টু একমনে গণনার ভঙ্গীতে আবৃত্তি করছিল, ‘বারো’; তারপর একটু থেমে আবার সে বলে উঠলো, ‘এগার’, তারপর ‘দশ’, ‘নয়’; তারপর প্রায় এক সাথেই, ‘আট’ আর ‘সাত’ বলেই চুপ করে গেল ও।

কিছুই না বুঝতে পেরে অন্নদা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, “মণ্টু, কি হয়েছে বাবা?”

প্রায় ফিস্‌ফিস্ করেই মণ্টু বলতে লাগলো, “ছয়! ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি ঝরে পড়ছে মা! দিন তিনেক আগে ঐ গাছটাতে একশ’রও বেশী পাতা ছিল। ওঃ! তখন আমার যা কষ্ট হ’ত মা ওগুলো গুণতে! এখন কিন্তু খুব সহজ হয়েছে। ঐ দেখ, আর একটা পড়লো। আর মাত্র কয়েকটা পাতা আছে ঐ ডালে। সব শুদ্ধ পাঁচটা।”

বিস্ফারিত চক্ষে অন্নদা দেবীকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে আগেকার মত স্বরেই বলতে লাগল আবার, “মা, শেষ পাতাটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মারা যাব। শেষ পাতাটাও থাকবে না, আর আমিও বাঁচব না। ডাক্তার বাবু বুঝি বলেন নি তোমাকে এই কথা?”

মনে মনে ভয় পেলেও অন্নদা দেবী মুখে সাহস দেখিয়ে বলে উঠলেন, “যাট্! যাট্! কি যে বলিস্ তুই মন্টি! গাছের পাতা ঝরে যাক্ না যাক্ তার সঙ্গে তোর সেরে ওঠা না ওঠার সম্পর্ক কি? নে, ওষুধটুকু খেয়ে ফেল্ দেখি?”

বাইরে ঠিক আগেকার মতই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখে মণ্টু বলে, “আর ওষুধের দরকার নেই মা-মণি! ঐ দেখ আর একটা পাতা খসে পড়ল। চারটে আছে আর। সন্ধ্যার আগে শেষ পাতাটা ঝরে গেলেই আমার ছুটি মা! আমার আর শুয়ে শুয়ে ভাল লাগছে না। ঐ পাতাগুলোর মতো আমিও যদি হাওয়ায় উড়ে যেতে পারতুম!” ও পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজল।

বুড়ো গোবিন্দ বাবু তখন চটিজুতো পায়ে দিয়ে ফট্‌ফট্ শব্দে নামছিলেন নীচে। বাইরে গিয়ে মণ্টুর মা কেঁদে পড়লেন তাঁর কাছে। খুলে বললেন সব কথা তাঁকে। “কি যে বলেন আপনি!” ধমকে উঠলেন আর্টিষ্ট ভদ্রলোক। “এমন কথা কেউ শুনেছে কখনও? কিছু ভয় করবেন না আপনি! রোগের সময় অমন অনেক কথাই রোগীর মনে আসে। তাই বলে আপনিও!” তার পর কি যেন খানিক ভেবে নিলেন তিনি। “দাঁড়ান! ঘণ্টা খানেকের ভিতর ফিরে এসে সব ঠিক করে দিচ্ছি আপনার।”

ভোর বেলা ঘুম ভেঙে যেতেই মণ্টু জানালার দিকে চাইলো। জানালা শক্ত করে বন্ধ করা। সব ভুলে গিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে চীৎকার ক’রে উঠলো সে, “মা, জানলা বন্ধ করে রেখেছ কেন এখনও? কখন রোদ্দুর উঠে গেছে! তুমি জানলা খুলে দাও এখনই। আমি দেখব।”

কি আর করেন, অন্নদা দেবী কম্পিত হাতে জানালাটা খুলে দিলেন। সেই শেষ পাতাটা! কি জানি, সেটা যদি রাত্রে ঝরে গিয়ে থাকে!

অশথ গাছটার দিকে চাইতেই বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়ে গেল অন্নদা দেবীর। সারা রাত্রের হিম, হাওয়া ও ভোরের কুয়াসার সম্মিলিত আক্রমণ সহ্য করেও একটা পাতা তখন পর্য্যন্ত গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলছিল। তার বোঁটাতে তখনও সবুজ ছোঁয়াচের ঠিকানা, কিন্তু চারপাশের প্রান্তসীমায় উঁকি দিতে সুরু করেছিল আসন্ন মৃত্যুর হল্‌দে আলো। বোধ হয়, একটা দম্‌কা হাওয়া এলেই বৃক্ষশাখার সঙ্গে ছিন্ন হবে ওর স্নেহের সম্পর্ক। কি করে ঠিক রইল ওটা অবাক্ হয়ে. তাই ভাবতে লাগলেন মণ্টুর মা।

“ওটা শেষ পাতা,” একঘেয়ে গলায় বলে চল্‌লো মণ্টু, “ভেবেছিলুম কাল রাত্তিরেই খসে যাবে ওটা। কাল হাওয়াও ত’ বেশ জোর ছিল।” পরক্ষণেই যেন আশ্বস্ত হয়ে কতকটা আপনার মনেই বল্লে ও, “থাক্ গে। আজই কোন সময় পড়ে যাবে ওটা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ”

ধীরে ধীরে ঘুরে চল্‌লো দিনের চাকা। গোধূলির ম্লান আলোতে তখনও শেষ পাতাটিকে কিন্তু দেখা যাচ্ছিল গাছের ডালে স্থির ভাবে ঝুলতে। তারপর এলো কালো রাত, তার সঙ্গে কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া আর বৃষ্টি। ভোর হলো। অনিশ্চিতের দোলায় দুল্‌তে দুল্‌তে আবার অন্নদা দেবী জানালা খুলে ভোরের আলোকে জানালেন অভ্যর্থনা।

—শেষ পাতাটা ঠিক একভাবে সেখানে লেগে আছে।

পাতাটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মণ্টু। তারপর অন্নদা দেবীকে বল্ল, “মা, আমি আর তোমার কথার অবাধ্য হব না কোন দিন। আমি বড় দুষ্টু। তোমাকে ছেড়ে যাব এই কথা ভেবে যে কত কষ্ট দিয়েছি তোমায়! ঐ শেষ পাতাটা দিয়ে ভগবান্ আমাকে বুঝিয়েছেন। তুমি বার্লি নিয়ে এস মা, আমি খাব।”

মণ্টু বিছানায় শুয়ে কি একটা গল্পের বই পড়ছিলো। ডাক্তার বলে গেছেন, এ যাত্রা আর কোন ভয় নেই। তার মা ঘরে ঢুকলেন। “—শুনেছিস্ মণ্টু! আজ এইমাত্র খবর এলো, বুড়ো গোবিন্দ বাবু হাসপাতালে মারা গেছেন।” তারপর ডাক্তার বাবুর কাছে যা যা শুনেছিলেন সব জানালেন তাকে। আগের দিন সারারাত তিনি নাকি বাইরে কাটিয়েছিলেন, কোথায় কেউ জানে না। এমনিতেই কয়েকদিন থেকে সর্দ্দিজ্বরে ভুগছিলেন ভদ্রলোক, রাতের ঠাণ্ডায় আর বৃষ্টিতে তা ডবল নিউমোনিয়ায় দাঁড়ায়। রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন, ও-বাড়ীর অনিল বাবু দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বাঁচানো যায় নি। “অনিল বাবু যখন তুলে ধরেন ভদ্রলোককে তখন নাকি তাঁর জামা-জুতো ভিজে হিম হয়ে গেছিল। অত রাত্রে, দুর্য্যোগ মাথায় করে ভদ্রলোক যে কোথায় বেরিয়েছিলেন ওরা জানে না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। অশ্বত্থ গাছটার তলায় নাকি একটা বড় মই, একটা লণ্ঠন, কতকগুলো সবুজ আর হল্‌দে রঙের তূলি আর দু’টো ছোট রঙের পাত্র পাওয়া গেছে। জানলা দিয়ে গাছের পাতাটার দিকে তাকিয়ে দেখ মণ্টু। ওটা হাজার হাওয়াতেও কাঁপে নি কিংবা পড়ে যায় নি কেন

জানিস্? তোর গোবিন্দ দাদু গাছের ডাল চেঁছে তার ওপর এঁকেছিলেন ঐ পাতা। আসল শেষ পাতাটা সন্ধ্যা বেলাতেই ঝরে পড়েছিল কাল।"

মণ্টুর চোখ দু'টো জলে ভরে উঠলো। এই "শেষ পাতাটাই" তা হ'লে তার গোবিন্দ দাদুর "মাষ্টার পিস্"! *

* বিদেশী গল্পের ভাবাবলম্বনে

আমার বন্ধু মন্মথকুমার

৺ অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ, বি. এস্-সি

আমার বন্ধু মন্মথ রায় এখন একজন ধনী ও কর্ম্মী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাহার সহিত প্রথম আলাপ। দু'জনেই তখন বিজ্ঞানের ছাত্র। এই পঞ্চাশ বছরেও সে বন্ধুত্ব কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে রামধনুতে 'আত্মোন্নতি'র কাহিনীতে মন্মথর কথা কিছু লিখিয়াছি। তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এখানে একটু বলিয়া লই।

মন্মথর জন্ম হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে; জন্মস্থান পূর্ব্বস্থলী, বর্দ্ধমান—নবদ্বীপের নিকট। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাহার সম্পর্কে জ্যেঠা ছিলেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ৺চারুব্রত রায় তাহার খুড়তত বা জ্যেঠতুত ভাই ছিলেন। ১৯০৪ সালে কলিকাতার বি. এস-সি পাশ করিয়া ১৯০৭ সালে ষ্টেট্স্ বৃত্তি লইয়া মন্মথ বিলাত যায়। তারপর বার্ম্মিংহামে খনি-বিদ্যা অধ্যয়ন ও মাইনিং এঞ্জিনিয়ারিং-এ উপাধিলাভ। এখানে ফিরিয়া প্রথমে সে ডিগবয়ে আসাম অয়েল কোম্পানীতে ভূতাত্বিকের কাজ গ্রহণ করে, তারপর আলওয়ার রাজ্যে (রাজপুতানা) ষ্টেট জিওলজিষ্টের কাজ নেয়। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সে আসামে যায় এবং সেখানে আসাম অয়েল কোম্পানীতে আরও ৫ বৎসর কাজ করে। তারপর কলিকাতায় আসিয়া ভূবিদ্যার পরামর্শদাতার ব্যবসায় আরম্ভ করে। প্রায় এই সময়েই সে জলপাইগুড়ি জেলায় "বেঙ্গল লাইমষ্টোন কোম্পানী, জয়ন্তী" এই নামে চূণের কারবার আরম্ভ করে। পরে দার্জিলিং জেলায় "হিমালয় কোল্ এণ্ড মিনেরাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ, বাগরাকোট" নামে কয়লার কারবার করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। ১৯৪৯ সালে সে এই কারবারের ভার ছেলেদের উপর দিয়া

নিজে বাহির হইয়া আসে এবং বজবজের নিকট গঙ্গার তীরে অছিপুর গ্রামে এক প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্র ও বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে কৃষিকার্য্যে রত হয়। এখনও সে সেখানেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

বছর দুই আগে এক অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী সংঘ মন্মথ রায়ের কয়লার খনি বারো লক্ষ টাকায় কিনিতে চাহিয়াছিল। মন্মথ বলে, ঐ খনিতে ভূগর্ভে কোটি টাকার কয়লা আছে।

তোমরা মন্মথর সাফল্যের কথা পড়িয়া ভাবিবে, অনেকেই তো সংসারে টাকা করে। এ জীবনের বিশেষত্ব কি? সে কথায় আসিতেছি।

রায় সাধারণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, যাহাদের কাজ করিয়া খাইতে হয়; দেশে হয়তো কিছু জমি-জমা আছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া পল্লীগ্রামে কষ্টেসৃষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। সেই ঘরের ছেলে ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

প্রথম যখন মন্মথর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন বেশী কিছু মনে হইল না। অতি সাধারণ বাঙ্গালী চেহারা। ময়লা রঙ, ম্যালেরিয়ায় কৃশ দেহ। কথা-বার্ত্তায় অত্যন্ত লাজুক। গোবেচারী ধরণের চেহারা ও হাব-ভাব;—প্রায় "ন্যাতাজোবরার" দিকে।

ক্রমশঃ আলাপে দেখিলাম তাহাতে অসাধারণত্ব আছে,—বড় হইবার একটা উগ্র ইচ্ছাশক্তি আছে। বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন—এই ইচ্ছাশক্তির মত উগ্র শক্তি সংসারে আর নাই। ভূগর্ভ হইতে মূল্যবান্ পদার্থ বাহির করিয়া বড়লোক হইব এই উগ্র ইচ্ছা তাহার বরাবর ছিল। আর ছিল সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্ম্ম-কুশলতা।

আমার বহু অভিজ্ঞতায় এই ধারণা হইয়াছে যে মানুষ যখন কোনও উগ্র কামনা করে এবং তাহা পাওয়ার জন্য কষ্ট সহিতে ও শ্রম করিতে বিমুখ হয় না তখন বিধাতা বিচিত্র উপায়ে তাহার সে কাম্য প্রাপ্তির উপায়বিধান করিয়া দেন।

বি. এস-সি পাশ করিয়া মন্মথ প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে পঞ্চাশ টাকা বেতনের সহকারীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বৎসর খানেক পরে তাহাকে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বদলী করা হয়। আমাদের দলভ্রষ্ট হওয়ায় এবং ম্যালেরিয়ার ভীতি তাহার অত্যধিক থাকায় এই পরিবর্ত্তন তাহার

নিকট দুঃখকর হইয়া উঠিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেই তাহার ভবিষ্যতের উন্নতির বীজ উপ্ত হইল।

ব্যাপারটা মন্মথর নিজের মুখে যেমন শুনিয়াছিলাম সেই ভাবেই বলিব।

"শিবপুরে সঙ্গী না জোটায় সন্ধ্যার সময়টা যেন আর কাটিতেই চাহিত না। তাই ল্যাবরেটরীতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া নিজেকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিতাম। টেট সাহেব তখন শিবপুরের রসায়নের প্রধান অধ্যাপক। বাঘা সাহেব। সন্ধ্যায় ল্যাবরেটরীতে আলো জ্বালায় সাহেব তাহা দেখিতে আসেন। আমি তখন নিবিষ্ট মনে কয়েকটা বোতলে লেবেল মারিতেছি। হঠাৎ দেখি, সাহেব নিঃশব্দে আমার কাজ দেখিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতক্ষণ কাজ করিতেছ কেন?' বলিলাম, 'সন্ধ্যাবেলায় আমার বাসায় অন্য কাজ না পাইয়া এই কাজ করিতেছি।' 'লেবেল নিজে আটকাইতেছ কেন? এজন্য তো বেহারা আছে!' 'আমি জিনিসগুলিকে সুন্দর দেখিতে চাই। বেহারারা পছন্দমত কাজ করিতে পারে না'।"

এই ঘটনার পর হইতে টেট সাহেব তাহার মুরুব্বি হইলেন এবং বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহাকে বিলাতে শিক্ষার জন্য ষ্টেট্‌স্ স্কলারশিপ্ যোগাড় করিয়া দিলেন।

প্রসিদ্ধ গ্রীক জীবনচরিত-লেখক প্লুতার্ক লিখিয়াছেন কোনও লোকের আসল পরিচয় তাহার জীবনের ছোট ছোট কার্য্য হইতেই পাওয়া যায়।

মন্মথ সম্বন্ধে আরও দু'টি গল্প যথা সম্ভব তাহার ভাষায় দেওয়া যাইতেছে ঃ

"একবার এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর নামে চুক্তি খেলাপের এক মোকদ্দমা করি। তাহার পক্ষে একটা সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে বিবরণ দিয়াছিলাম। লোকটি উহাতে বিশেষ লাভবান্ হয়। কিন্তু সে আমার প্রাপ্য না দিয়া লুকাইয়া ঐ সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিতেছিল। বিহারের এক সাবজজ-কোর্টে মোকদ্দমা ছিল। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে আমরা দু'জনেই সেখানে যাইতেছিলাম। ট্রেনে আমি যে কামরায় বসিয়া ছিলাম লোকটি সেই কামরার দিকে অগ্রসর হইয়া, আমাকে দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া অন্য কামরায় গিয়া উঠিল। দু'জনেই একই ষ্টেশনে নামিলাম। তখন আমি গিয়া তাহাকে ধরিলাম। বলিলাম, 'মোকদ্দমা কোর্টে হইবে তা নিয়া আপনি অমন মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইবেন কেন? এই ষ্টেশনে খুব ভাল জিলাপী পাওয়া যায়। আসুন দু'জনে এক সঙ্গে খাইব। হয় আপনি আমাকে খাওয়াইবেন, নয় আমি আপনাকে খাওয়াইব।' দু'জনে এক সঙ্গে খাইলাম।

মাড়োয়ারী-ই পয়সা দিল কারণ সেই খুব বড় ধনী ছিল। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় উভয় পক্ষে মিটমাটের সুবিধা হইয়াছিল। প্রাপ্য টাকা অনেকটাই আদায় হইয়াছিল।"

আর একটা গল্প ঃ

"ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছি। সহযাত্রীদিগের মধ্যে একটা রাজনৈতিক বিতর্ক বাধিল। ক্রমে উহা বিতণ্ডা ও বিবাদে পরিণত হইল। হাতাহাতি প্রায় হয় দেখিয়া আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—'চূণ চূণ চূণ! আপনাদের কাহারও দোষ নাই, সব দোষ চূণের।' সকলে অবাক্ হইয়া আমার দিকে তাকাইল। হাতাহাতিটা প্রথম বাধা পাইল। বলিলাম,—'বাঙ্গালীদের রক্তে চূণের—বৈজ্ঞানিক ভাষায় ক্যাল্‌সিয়ামের অভাব বলিয়া তাহাদের 'নার্ভাস সিস্‌টেম' অপ্রকৃতিস্থ থাকে। তাই তাহারা সহজে উত্তেজিত হইয়া পড়ে। আপনারা সকলে রোজ যদি এক কাপ্ চূণের জল খান্ তাহা হইলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির বহর দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। আমি রোজ এক গ্লাস চূণের জল খাই। আপনারা সকলে যদি প্রত্যহ এই মত চূণ খান তাহা হইলে আমিও বিশেষ উপকৃত হইব কারণ চূণের দাম বাড়িবে। অর্থাৎ আমি একজন চূণ ব্যবসায়ী।' এই শেষের উক্তিতে কক্ষমধ্যে হাসির অট্টরোল উঠিল। ঝগড়ার আগুন নিভিয়া গেল।"

মন্মথ রায়ের বর্ত্তমান ঠিকানা ঃ অছিপুর ডেমনষ্ট্রেশন ফার্ম, পোঃ অছিপুর, জেলা ২৪ পরগণা। গঙ্গার উপর। বেহালা ব্রিজ হইতে অছিপুর পর্য্যন্ত বাস্ যায়। ২৫।২৬ বিঘা জমি। তাহার একটা ছোট ট্র্যাকটার আছে। সে নিজেই তাহার সাহায্যে জমি চাষ করিতে পারে। রাষ্ট্র, তাহার ব্যবস্থা দেখিয়া প্রীত হইয়া তাহাকে সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতেছে। এই সাহায্য বিনিময়ে তাহারা তাহার কৃষি-ক্ষেত্রকে একটি শিক্ষা-কৃষিক্ষেত্র করিয়াছে।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—ষোল—

ডিকের দিকে তাকিয়ে ক্যামেরন্ বললেন, "আচ্ছা ভাই, তুমি তো রকি পাহাড়ের পূব দিক্ থেকে আসছো। ওদিকের পথঘাট আমাদের জানা নেই। তুমি কেন আমাদের পথপ্রদর্শক হ'য়ে চলো না! একা একা এই বিপদ্‌সঙ্কুল দেশে আর কত ঘুরে বেড়াবে?"

"আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই, মিঃ ক্যামেরন! কিন্তু বন্ধুদের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোনো চিন্তা আপাততঃ আমার পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয় যদি আপনি আমায় সাহায্য করেন তো বিশেষ উপকৃত হবো।"

"তোমাকে আমি সাধ্যমত সাহায্য করবো, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু আগে আমার লোকজনদের একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা দরকার, তারপর তোমার বন্ধুদের সন্ধানে যাওয়া যাবে। আচ্ছা, তাদের আকৃতির একটা বর্ণনা দাও তো, আমি আমার লোকজনদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, তারা কেউ তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে কি না।"

জো আর হেন্‌রির চেহারার বর্ণনা দিয়ে মিঃ ক্যামেরন অনুচরদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কেউ ওদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে কিনা। শুনে সকলে চুপ ক'রে রইলো। শুধু একজন এগিয়ে এসে জানালো, পথে সে একদল রেড্-ইণ্ডিয়ানকে দু'জন ফ্যাকাশে-মুখো সম্বন্ধে কি যেন বলাবলি ক'রতে শুনেছে।

তাই তখন ঠিক হলো, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর জো আর হেনরির অনুসন্ধানে যাওয়া হবে।

জন ত্রিশেক লোককে তাঁবুর তত্ত্বাবধানে রেখে বাকী ত্রিশজনকে সঙ্গে নিয়ে ডিক আর মিঃ ক্যামেরন বেরিয়ে পড়লেন।

তিনদিন পর ওরা হঠাৎ এক জায়গায় কয়েকজন রেড্-ইণ্ডিয়ানের দেখা পেলো। অতর্কিত

ভাবে ওদের সামনে প'ড়ে যাওয়ায় ওরা আর পালাবার সময় পেলো না, মরিয়া হয়ে তীর-ধনুক বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

মিঃ ক্যামেরন জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথা থেকে এসেছো তোমরা? এখানে কী করছো?"

মিঃ ক্যামেরনকে ওদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতে দেখে ওরা আশ্বস্ত হলো।

"আমরা ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে আর শিকারের সন্ধানে এসেছি। আমাদের বাড়ী অনেক দূরে, মিসৌরি নদীর তীরে।"—ওদের একজন বললো।

"তোমরা পেইগান। কিন্তু পেইগানরা তো যুদ্ধের সাজে শিকার করতে আসে না!"

এ ভাবে ধরা প'ড়ে গিয়ে ওরা ঘাবড়ে গেলো। মিঃ ক্যামেরন যে ওদের সম্বন্ধে এত খবর রাখেন এ ওদের জানা ছিল না।

"পেইগানরা কি কিছু সঙ্গে না এনে খালি হাতেই ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়?" মি ক্যামেরন জিজ্ঞাসা করলেন।

পেইগানদের মুখে এবারও কথা নেই। তারা ধরা পড়ে গিয়েছে।

মিঃ ক্যামেরনের আর কোন সন্দেহই রইলো না যে এরা একটা ডাকাতের দল এবং হয়তো এদের হাতেই জো আর হেনরি ধরা পড়েছে। তিনি বললেন, "পেইগানেরা মিথ্যা কথা বলছে। তোমরা কে আমি তা জানি। তোমরা ডাকাতের দলের লোক; আমাদের তাঁবুতে গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছো। তোমাদের তাঁবুতে যে দু'জন ফ্যাকাশে-মুখো আছে, সে খবরও আমার অজানা নয়। আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা ক'রো না; তোমরা ধরা পড়ে গেছো। যাই হোক, চলো, তোমাদের তাঁবুতে যাই। আমি শত্রুতা করতে আসি নি; আমার উদ্দেশ্য, তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। তোমাদের সর্দ্দারদের সঙ্গে ব্যবসায়-সূত্রে কথাবার্ত্তা বলবো, শান্তির ধূমপান করবো। কি বলো, তোমাদের আপত্তি আছে?"

ওদের সমস্ত জারিজুরি ক্যামেরনের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় ওরা একেবারে মুষড়ে পড়েছিলো; এখন বাধ্য হয়ে ভালোমানুষের মত ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। কিন্তু ওদের শিবিরে যে দু'জন ফ্যাকাশে-মুখো আছে এ কথা ওরা কিছুতেই স্বীকার করলো না।

কিছুক্ষণ চলবার পর ওরা রেড ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুর কাছাকাছি এসে পড়লো। ইতিমধ্যে কখন যে একজন রেড ইণ্ডিয়ান দল ছেড়ে তাঁবুর দিকে এগিয়ে গিয়েছে, কেউ লক্ষ্য করে নি। ব্যাপারটা যখন ডিকের চোখে পড়লো তখন আর তাকে ধরে ফেলবার সম্ভাবনা নেই। মিঃ ক্যামেরনকে এ কথা জানাতে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। যাতে লোকটা সমস্ত ব্যাপার দলের মধ্যে খুলে বলবার সময় না পায় সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

সর্দ্দারদের সঙ্গে দেখা ক'রে মিঃ ক্যামেরন বললেন, তিনি শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং ব্যবসায়ের জন্য তাদের দেশে এসেছেন। পেইগানরা তাতে তাদের সমর্থন জানালো, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করলো না যে ওদের দলে দু'জন ফ্যাকাশে-মুখো আছে। ওরা শান্তির ধূম পান করতে রাজী হ'লো।

অনেক কায়দা ক'রে ঘুরিঁয়ে ফিরিয়ে, অনেক রকম ভাবে চেষ্টা করেও মিঃ ক্যামেরন জো আর হেনরির কোনো সংবাদ বার করতে পারলেন না।

"আমার মনে হয়, ডিক, ওরা সত্যি কথাই বলছে। সত্যিই তারা ওদের তাঁবুতে নেই। হয় ওরা তোমার বন্ধুদের লুকিয়ে রেখেছে, না হয় হত্যা করেছে। যাই হোক, একটু লোভ দেখিয়ে কিছু করতে পারি কিনা দেখি।"

এদিকে ক্রুসো রেড ইণ্ডিয়ানদের মোটেই সহ্য করতে পারছে না; উত্তেজিত হয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছে। তার হাবভাব দেখে ডিকের মনে হলো, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। মিঃ ক্যামেরনকে একান্তে ডেকে নিয়ে সে তাঁর কানে কানে ফিসফিস করে তার মতলব জানালো।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি ডিকের পরামর্শে সায় দিলেন।

ইতিমধ্যে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও একটা ছোটখাটো পরামর্শ হয়ে গেলো।

হঠাৎ মিঃ ক্যামেরন দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর লোকদের বললেন, "আমি ইঙ্গিত করা মাত্র তোমরা লাফিয়ে উঠে বন্দুক বাগিয়ে ধরবে। কিন্তু সাবধান, হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত কেউ গুলি ছুঁড়বে না।" তারপর রেড ইণ্ডিয়ানদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "পেইগানরা মিথ্যাবাদী, তারা দু'জন ফ্যাকাশে-মুখোকে লুকিয়ে রেখেছে, অথচ স্বীকার করছে না। যাই হোক, আমরা ঝগড়া করতে ভালবাসি না। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যদি পেইগানরা সেই ফ্যাকাশে-মুখোদের মুক্ত করে না দেয় তো আমাদের অন্য পথ দেখতে হবে।"

এ কথার উত্তরে পেইগান সর্দ্দার এগিয়ে এসে বললো, "ফ্যাকাশে-মুখো যাদের কথা বলছেন পেইগানরা তাদের দেখে নি এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। এর বেশী তাদের আর কিছু বলবার নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে ক্যামেরন বললেন, "সাবধান পেইগানরা! যেখানে আছো ঠিক তেমনি থাকো। এতটুকু নড়েছো কি মরেছো!"

মিঃ ক্যামেরনের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তাঁর অনুচরেরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলো।

এই অত্যন্ত আকস্মিক ব্যাপারে পেইগানরা এত হতভম্ব হয়ে গেলো যে সংখ্যায় ওদের প্রায় চতুর্গুণ হলেও ওরা কেউ তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হতে সময় পেলো না। যে যার জায়গায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলো।

তখন ডিক ক্রুসোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। কয়েকবার বাতাসে মুখ তুলে ক্রুসো কিসের যেন ঘ্রাণ নিলো, তারপর লাফাতে লাফাতে সোজা বনের দিকে চললো। ডিকও সঙ্গে সঙ্গে তার পেছু পেছু ছুটতে লাগলো।

কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে থেমে দাঁড়ালো ক্রুসো। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে আবার এগিয়ে চললো সে। একটা ঘন পাতায় ঘেরা প্রায়-অন্ধকার ঝোপের কাছে এসে ক্রুসো উত্তেজিত ভাবে মাটি আঁচড়াতে শুরু করলো।

ক্রুসোর ব্যবহারে ডিকের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। তবে কি তার বন্ধুরা এখানে কবরস্থ হয়েছে?

(ক্রমশঃ)

মহাকালের পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—ছয়—

অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত্রী রাজকুমারকে নিয়ে এলো। ধাত্রীর কোলে বছর চারেকের একটি ছেলে, হাতে একটি খেলাঘরের তীরধনু, কোমরে ঝুলছে একটি কাঠের তলোয়ার। আকস্মিক পিতৃবিয়োগে তার উপর দিয়ে কি যে দুর্য্যোগ বহে গেল বালক তার কিছুই জানে না। কাত্যায়নকে দেখে বালক কোমরবন্ধের ফাঁক থেকে একটি কাঁচা আম বের করে বললো—দেখেছ, এক তীর মেরে এই কাঁচা আমটা পেড়েছি! দেখবে, এক তীর মেরে তোমার চোখটা কাণা করে দেব?

—বাঃ বাঃ! তুমি তো খুব ভালো তীর ছুড়তে পার! আমার চোখটা আজ থাক, ওই তীরটা দিয়ে কাল আমরা একটা বাঘ মারবো।

—বাঘ? না, বাঘ আমি মারবো না। আমি লড়াই করবো, আমি হব মস্ত লড়িয়ে-বীর।

—বেশ, বেশ! আমরাও তো তাই চাই। তুমি হবে মস্ত বড় বীর! অনেক লড়াই তোমাকে করতে হবে। এখন চল তো, রাণীমা তোমাকে ডাকছেন।

—তুমি খুব ভালো লোক। এই নাও, এই আমটা তুমি নূন দিয়ে খেও।

এবার কাত্যায়ন হেসে ফেললো, আমটি গ্রহণ করে হাসিমুখে বললো—মহাকুমারের জয় হোক।

প্রাসাদের আর এক দিক্ থেকে কিসের যেন একটা অস্ফুট গোলযোগ উঠলো। কাত্যায়ন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি ধাত্রীকে বললো—মহাকুমারকে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি, রাণীমা মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। কথার সঙ্গে সঙ্গে কাত্যায়ন ধাত্রীর সামনে সম্রাটের নামাঙ্কিত আংটিটি তুলে ধরলো। ধাত্রী আর দ্বিরুক্তি করলো না, রাজকুমারকে কোলে নিয়ে কাত্যায়নের পিছু পিছু প্রাসাদ থেকে বাহির হয়ে পড়লো।

পথটি নদীর ওপারে গিয়ে দ্বিমুখী হয়ে গেছে। একটি শাখা বরাবর নদীর কিনারা ধরে পাহাড়ের কোল দিয়ে চলে গেছে পশ্চিমে ব্রহ্মকুণ্ড অবধি, আর একটি শাখা স্বর্ণভাণ্ডার গুহাকে পাশ কাটিয়ে বরাবর জঙ্গলের ভিতর দিকে চলে গেছে।

কাত্যায়ন সেই জঙ্গলের পথে অগ্রসর হয় দেখে ধাত্রী থমকে দাঁড়ালো, বললো—ওদিকে কোথায় ?

সম্রাটের নামাঙ্কিত আংটিটি ধাত্রীর চোখের সামনে আবার তুলে ধরে কাত্যায়ন আদেশের স্বরে বললো—এসো !

ধাত্রী আর কোন কথা বললো না। নীরবে কাত্যায়নের পিছনে অগ্রসর হ'ল। সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী নদী, পথের উপর দিয়ে বহে যাচ্ছে। পথটি এমন ভাবে বাঁধানো যাতে প্রচণ্ড বর্ষাতেও পথের উপর জলের গভীরতা এক হাতের বেশী না হয়। নদী পার হলেই স্বর্ণভাণ্ডার গুহা, গুহার সামনে দিয়েই পথটি দ্বিমুখী হয়ে গেছে। দু'জনে যখন স্বর্ণভাণ্ডার গুহার সামনে এসেছে এমন সময় প্রাসাদ-তোরণে বিশেষ সোরগোল শোনা গেল, দেখা গেল প্রাসাদের দিক্ থেকে কয়েকজন লোক উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে ছুটে আসছে। ধাত্রী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কাত্যায়ন বললো—ওরা রাজকুমারকে মারতে আসছে, দাও ওকে আমার কোলে দাও।

ধাত্রীর কোল থেকে রাজকুমারকে জোর করে কাত্যায়ন টেনে নিল। তারপর তাকে কোলে নিয়ে স্বর্ণভাণ্ডার গুহার পিছনে বনের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছের শুকনো ডালপাতার উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে যাবার একটা মর্মর শব্দ শোনা গেল, তার পরেই সব চুপচাপ।

পিছনের লোকগুলি তখন স্বর্ণভাণ্ডার গুহার সামনে এসে পড়েছে ; তারা সাড়া তুললো—এই দিকে গেছে—এই দিকে পালিয়েছে—এই দিকে—

কয়েকজন সেই জঙ্গলের মাঝে অগ্রসর হ'ল।

—সাত—

পথ ছেড়ে বনবাদাড় ডিঙ্গিয়ে কাত্যায়ন ঢুকলো বনের মধ্যে ; কিছুটা গিয়ে একটি বড় পাথরের আড়ালে একটি ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে উত্তরীয় দিয়ে মহাকুমারকে শক্ত করে পিঠের সঙ্গে বেঁধে ফেললো। তারপর গাছের ডালপালা ধরে পাহাড়ের গায় এমন একটা ঢালু জায়গায় গিয়ে নামলো যেখানে একবার পা ফস্‌কালে অন্ততঃ একশো হাত নীচে পড়ে শরীর চূর্ণ হয়ে যাবে। সেখানে বনতুলসীর একটি ঝোপের আড়ালে কয়েকটি গাছের শিকড় ধরে কাত্যায়ন কোন রকমে শুয়ে পড়লো, চাপা গলায় বললো—মহাকুমার, কোন কথা

ব'ল না, একেবারে চুপ্। গলা শুনতে পেলে ওরা এসে ধরবে ; ধরতে পারলেই আমাদের মেরে ফেলবে।

—ওরা আমাদের শত্রু, না ?

—হ্যাঁ।

—আমাদের মারতে আসছে, না ?

—হ্যাঁ।

—আমি বড় হয়ে ওদের সব মেরে ঠাণ্ডা করে দেব, তুমি কিচ্ছু ভয় ক'রো না। তুমি আমার কাঁচা আমটা রেখেছ তো ?

—হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। চুপ কর, ওদের গলা শোনা যাচ্ছে।

কাছাকাছি বড় পাথরখানির ওপাশে অনুসন্ধানকারীর গলা শোনা যাচ্ছিল :

—গেল কোথায় বল ত' ?

—এইখানেই কোথাও আছে, খুঁজে বের করবোই।

—খালি হাতে ফিরলে সর্দার আর আস্ত রাখবে না।

—এখন আর সর্দার নয় রে, এখন মহামান্য পরমশ্রদ্ধাভাজন পরমভট্টারক মগধসম্রাট্ শ্রীশ্রীউগ্রসেন···

কিছুক্ষণ চললো খোঁজাখুঁজি—গাছপালা মাড়িয়ে চলার মর্মর শব্দ ও হাঁকডাক। একজন এদিকে এসেছিল কিন্তু এতটা ঢালু দেখে সে আর আসতে সাহস করে নি, এমন জায়গায় যে কেউ শুয়ে থাকতে পারে তা ধারণা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা এদিকে আর খুঁজলো না। অল্পক্ষণ পরেই তাদের আর সাড়া পাওয়া গেল না, এদিকে।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাত্যায়ন সেইখানেই পড়ে রইল।

কোন এক সময় কাত্যায়নের গায় হেলান দিয়ে রাজকুমার ঘুমিয়ে পড়লো।

দিনের আলো নিভে এল, রাত্রির অন্ধকার জমাট বাঁধলো পাহাড়ী জঙ্গলের বুকে। ঝিঁঝি পোকার সাড়া জাগলো, দেখা দিলো জোনাকীর চাঞ্চল্য।

কাত্যায়ন উঠলো। রাজকুমারকে ডেকে তুললো। রাজকুমারের সমস্ত রাজকীয় পোষাক খুলে একটি পোঁটলা বাঁধলো, তারপর তাকে কাঁধে তুলে অগ্রসর হ'ল পাহাড়ী পথে।

কোন এক সময় রাজকুমার বললো—ওগো, আমার ভারী খিদে পেয়েছে।

—এই যে দাদু, আগে এই বনটা পার হয়ে যাই, তারপরেই খাবার পাব—

কত খাবে বল না, মিঠাই মণ্ডা পুরী, যত চাই! - কাত্যায়ন সান্ত্বনা দিল—আমারই কি কম খিদে পেয়েছে?

রাজকুমার আর কিছু বললো না, কাত্যায়নের মাথার উপর মাথাটা রেখে সে আবার ঢুলতে সুরু করলো। কাত্যায়ন দ্রুত বনভূমি অতিক্রম করে চললো।

(ক্রমশঃ)

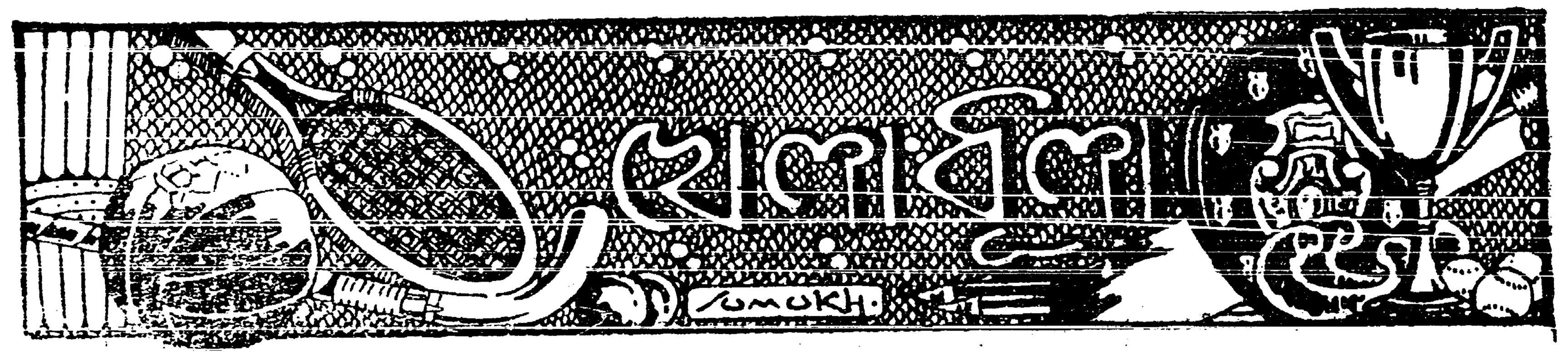

এবারের অলিম্পিক

প্রচুর উত্তেজনা আর সমারোহের মধ্যে পঞ্চদশ অলম্পিক্ প্রতিযোগিতা শেষ হ'ল।

অলম্পিক্ প্রতিযোগিতা হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর বাছাই-করা খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলাধূলার প্রতিযোগিতা। প্রতি চার বছর পর পর এই অনুষ্ঠান হয়—এক এক বছর এক এক জায়গায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য পাঠানো হয়। যারা জয়লাভ করে তারা এবং তারা যে দেশের লোক সে দেশ ক্রীড়াজগতে পায় প্রচুর সম্মান। তাই অলিম্পিক খেলা সুরু হবার আগে থেকেই ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে তুমুল সাড়া পড়ে যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমাদের ভারতবর্ষ থেকেও প্রায় শতাধিক বাছাই-করা খেলোয়াড়কে পাঠানো হয়েছিল, বিশেষ বিমানে করে, নানা বিভাগে যোগদানের জন্য। সে খবর তোমরা আগেই পেয়ে থাকবে।

এবারকার অনুষ্ঠান হয়েছিল হেলসিঙ্কি সহরে। ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কি। এই উপলক্ষে কয়েকদিন ধরে সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি পড়ে ছিল ইয়োরোপের উত্তরাঞ্চলের এই ঠাণ্ডা দেশটির দিকে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ৭১টি দেশ থেকে প্রায় আট হাজার খেলোয়াড় এসে এখানে জড় হয়। অবশ্যি সব রকম খেলারই প্রতিযোগিতা হয় নি, হয়েছিল ১৭ রকমের খেলার। এথলেটের সংখ্যা ছিল হাজারের ওপর। প্রতিযোগিতায় অর্দ্ধ সহস্রের ওপর মহিলা-প্রতিযোগীও যোগ দিয়েছিলেন।

১৯শে জুলাই সরকারী ভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত প্যাসিকিভি। অবশ্যি সময় সংক্ষেপের জন্য তার ২।১ দিন আগে থেকেই কোন কোন প্রতিযোগিতা সুরু করতে হয়েছিল। উদ্বোধনের সময় প্রথা-মত সর্ব্বপ্রথম আমন্ত্রণকারী দেশ হিসাবে ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত বেজে ওঠে। তার পর প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়েরা নিজের নিজের ইউনিফর্ম পরে এবং নিজের নিজের জাতীয় পতাকা হাতে করে মার্চ করে চলতে থাকেন আর পতাকা-দণ্ডের ওপর পৎপৎ করে উড়তে থাকে পাঁচ-রঙ্গা অলিম্পিক পতাকা—পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক্। এর পর তোপধ্বনি করে সেই পতাকাকে অভিবাদন জানানো হয় আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয় হাজার হাজার সাদা পায়রা—যারা নাকি শান্তির প্রতীক্।

তার পর সমবেত জাতীয় সঙ্গীত এবং শপথ গ্রহণ। এই দৃশ্যটিও হয়েছিল চমৎকার—গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। প্রত্যেক দেশের একজন করে প্রতিনিধি নিজেদের জাতীয় পতাকা হাতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন আর অদূরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ালেন আট হাজার খেলোয়াড়। সবাই সমস্বরে পাঠ করলেন অলিম্পিকের সংকল্প বাক্য—যার অর্থ হচ্ছে, 'আমরা সবাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছি অকপট সৌহার্দ্দ্যের মনোভাব নিয়ে। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়েই আমরা এর সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলব। আমাদের দেশের মর্য্যাদা—খেলার মর্য্যাদা কোন রকমে ক্ষুণ্ণ করব না আমরা—এই প্রতিজ্ঞা করছি।'

দাউ দাউ করে জলে উঠল অগ্নিকুণ্ড। সভাপতি অলিম্পিক মশাল নিয়ে তা জ্বালিয়ে দিলেন।

এই মশাল জ্বালানোর মধ্যেও একটা বিশেষত্ব আছে। এটি একটি প্রাচীন প্রথা। অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতাটা আসলে প্রাচীন গ্রীস দেশ থেকে নেওয়া। সেকালে গ্রীসে খেলা-ধূলার প্রচলনটা খুব বেশী ছিল তা হয়তো তোমরা জান। অবশ্য তখনকার অলিম্পিক এমন জাঁকজমকের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর খেলোয়াড়দের নিয়ে হ'ত না—বা হওয়া সম্ভবও ছিল না। আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্ত্তক হচ্ছেন একজন ফরাসী—ব্যারন্ কুবারভ্যাঁ। তা যাই হোক, সেকালের প্রথা মত এই অলিম্পিক মশাল প্রথম জ্বালানো হয় গ্রীসের অলিম্পিয়া সহরে, জিউসের ভগ্ন মন্দিরে। আগুন দিয়ে নয়, সূর্য্যের আলো থেকে, লেন্সের সাহায্যে। সেখান থেকে সেই জ্বলন্ত মশাল পর পর ৩৫৪ জন খেলোয়াড় দৌড়তে দৌড়তে (রীলে করে) নিয়ে আসেন এথেন্স নগরে। তার পর নানা জায়গা ঘুরে হাতে হাতে তা এসে পৌছয় হেলসিঙ্কির ষ্টেডিয়ামে। সভাপতি সেই মশালের আগুনে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে দেন। যতদিন খেলা চলে এই আগুন সমান ভাবে জ্বলতে থাকে।

এবারকার অলিম্পিক অনুষ্ঠান নানা দিক্ দিয়ে মনে রাখবার মত। এত অধিক সংখ্যক দেশ বা এত অধিক সংখ্যক প্রতিযোগী এর আগের কোন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় নি, আর এত অধিক সংখ্যক রেকর্ডও কোন অনুষ্ঠানে ভঙ্গ হয় নি। শুনলে অবাক্ হবে, এবারকার অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়েরা নতুন রেকর্ড করেছেন ২০০রও ওপর।

ব্যক্তিগত ভাবে এবারে সব চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার এমিল জ্যাটোপেক। তিনি ৫০০০ মিটার, ১০০০০ মিটার আর ম্যারাথন্ রেস্ (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) দৌড় তিনটেতেই প্রথম হয়ে তিনটি স্বর্ণপদক পেয়েছেন। আর মজা, এই তিনটিতেই তিনি রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম হ'লে স্বর্ণ পদক দেওয়া হয়, ২য় হলে রৌপ্য পদক এবং ৩য় হ'লে ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয়। আরও মজা, জ্যাটোপেকের স্ত্রী মিসেস্ ডায়না জ্যাটোপেকোভাও মেয়েদের বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করে (১৬৫ ফুট ৭ ইঞ্চি) প্রথম হয়ে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। এ রকম একটা প্রতিযোগিতায় স্বামী আর স্ত্রী দু'জনেরই এমন সাফল্য খুবই আশ্চর্য্যজনক নয় কি ?

এ পর্য্যন্ত অলিম্পিকের ফলাফল সম্বন্ধে সাংবাদিকেরা যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন তা ঠিক "সরকারী" তথ্য বলা যায় না, কাজেই বিভিন্ন তথ্যে একটু-আধটু অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। সরকারী ভাবে তথ্য কবে প্রকাশিত হবে তার ঠিক নেই।

গত কয়েকবার থেকে আমেরিকাই এই অনুষ্ঠানে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পেয়ে আসছিল। এবারে সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দেয় এবং প্রায় শেষ দিক পর্য্যন্ত প্রথম স্থান নিয়ে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। এমন কি, সোভিয়েট মুখপত্র 'প্রাভদা' তো তাদের দেশই প্রথম হয়েছে বলে ঘোষণা করে দিয়েছিল। পরে অবশ্যি তারা তা সংশোধন করে। শেষ দিকে অবশ্যি মোট পয়েণ্টে আমেরিকাই এগিয়ে গিয়ে তাদের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সোভিয়েটের বাহাদুরী—তারা ১৯২৪এর পর এই প্রথম অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতায় নামল। আসছে বারে তারা যে সহজে ছাড়বে না তা অনুমান করা কঠিন নয়।

প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্পর্কে আমরা শেষ যে তালিকা পেয়েছি (বেসরকারী) তাতে দেখা যায় প্রথম হয়েছে আমেরিকা মোট ৬১৫ পয়েণ্ট পেয়ে। তারা স্বর্ণপদক পেয়েছে ৪০টা, রৌপ্যপদক ১৮টা, আর ব্রোঞ্জ পদক ১৭টা। ২য় হয়েছে রাশিয়া ৫৪১½ পয়েণ্ট পেয়ে। তারা স্বর্ণপদক ২২টা পেয়েছে, কিন্তু রৌপ্য পদক পেয়েছে বেশী—৩০টা। ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে ১৫টা। ৩য়–হাঙ্গেরী মোট ৩০৫ পয়েণ্ট (স্বর্ণপদক ১৬টা, রৌপ্য পদক ১০টা, ব্রোঞ্জ পদক ১৫টা)। তারপর ক্রমান্বয়ে সুইডেন (২৪০ পয়েণ্ট), পঃ জার্মেনী (১৭১½ পয়েণ্ট), ফিনল্যাণ্ড (১৫৮ পয়েণ্ট), ফ্রান্স (১৫১¼), ইটালি (১৪৬½) বৃটেন (১১৭), চেকোশ্লোভাকিয়া ১১৩½) ইত্যাদি। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপান হয়েছে ১৭শ (৭১ পয়েণ্ট)। ভারত পেয়েছে ৩১তম স্থান (১৭ পয়েণ্ট) এবং পাকিস্তান ৪৩তম স্থান (৩ পয়েণ্ট)। চীন ও পূর্ব্ব জার্মেনী যোগদান করে নি। অলিম্পিকের জন্মস্থান গ্রীস মাত্র ১½ পয়েণ্ট পেয়ে ৪৬তম স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষ থেকে যে রকম খেলোয়াড় পাঠান হয়েছিল তাতে তারা খুবই হতাশাজনক ফল দেখিয়েছে বলতে হবে। এক হকির জোরেই তাদের যা কিছু সম্মান। হকিতে অবশ্যি তারা ১৯২৮ সন থেকে একাদিক্রমে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে। এবারে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন তাদের সে গৌরব বুঝি বা শেষ হবে, কেন না অন্যান্য বারের তুলনায় এবারকার দল তত শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু এ আশঙ্কা যে অমূলক তা তারা প্রমাণ করেছে প্রথমে অষ্ট্রিয়াকে ৪-০ গোলে, তার পর সেমিফাইনালে ইংল্যাণ্ডকে ৩-১ গোলে এবং ফাইনালে হল্যাণ্ডকে ৬-১ গোলে হারিয়ে।

ফাইনাল খেলার পর হল্যাণ্ডের ম্যানেজার বলেন, "ভারত হকিতে ভাল খেলে বলে জানতাম কিন্তু এত ভাল তা ভাবি নি!" হল্যাণ্ড হকিতে রৌপ্য পদক পেয়েছে। ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে ইংল্যাণ্ড, পাকিস্তানকে হারিয়ে। ভারতীয় হকি দলের ক্যাপটেন ছিলেন বাবু (কে সি. সিংহ), কিন্তু এ দলে সব চেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলবীর সিং। ফাইনালের দিন তিনি একাই ৫টি গোল দেন।

হকি ছাড়া মল্লযুদ্ধ বা কুস্তীতেও ভারত কিছুটা কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ফ্যাণ্টম ওয়েটে ভারতের কে, ডি, যাদব (মাদ্রাজ) ৩য় হয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। তা ছাড়া ফেদার ওয়েটে ভারতীয় প্রতিনিধি কে, ডি, মাংগাভে ৪র্থ স্থান অধিকার করে ৩ পয়েণ্ট অর্জ্জন করেছেন।

এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফলাফল উল্লেখ না করাই ভাল। ফুটবলে তারা প্রথম রাউণ্ডেই যুগোশ্লেভিয়ার কাছে ১০-১ গোলে হেরে গেছে। ওয়াটার পোলোতে ইটালির কাছে হেরেছে ১৬-০ গোলে আর রাশিয়ার কাছে ১২-০ গোলে। আর যে সব সাঁতারু ভারতের হয়ে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই হিটে সকলের শেষ স্থান অধিকার করেছেন। সাঁতারে এশিয়ান্ চ্যাম্পিয়ন্ নামে খ্যাত শচীন নাগ তো শেষ পর্য্যন্ত নামতেই ভরসা পান নি। ম্যারাথন রেসের ২৬ মাইল দৌড়ে ভারতীয় প্রতিনিধি সুরথ সিং শেষ সীমানায় পৌছেছিলেন বটে (যা তাঁর আগে আর কোন ভারতীয় দৌড়বাজ পারেন নি) তবে ৫১ জনের পরে। মহিলা এথলেট মিস্ ডিসুজা ও শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ (বাংলা) প্রথম হিটেই সর্ব্বশেষ স্থান অধিকার করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। হাই জাম্পে মেহেঙ্গা সিংও প্রাথমিক প্রতিযোগিতাতেই বিদায় নিয়েছেন। তবে দৌড়ে ভারতের লেভি পিণ্টো এবং মোহন সিং সেমিফাইনাল পর্য্যন্ত উঠেছিলেন।

পাকিস্তানের ফলাফল হয়েছে আরও খারাপ। তারা কোন প্রতিযোগিতাতেই প্রথম তিনটি স্থানের কোনটি দখল করতে পারে নি। হকিতে তাদের সম্বন্ধে অনেকেই আশা করেছিলেন, কিন্তু তাতেও তারা কিছু করতে পারে নি। প্রথমে ফ্রান্সকে ৬-০ গোলে হারিয়ে তারা সেমিফাইনালে হল্যাণ্ডের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায়। তার পর ৩য় স্থান নিয়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সময়েও তারা ২-১ গোলে পরাজয় বরণ করে।

আর একটি ব্যাপারের উল্লেখ এখানে না করে থাকতে পারছি না। সেটা হচ্ছে রাশিয়ার ফুটবলে অদ্ভুত কৃতিত্ব। যুগোশ্লেভিয়ার সঙ্গে খেলায় ৫-১ গোলে হারতে হারতে তারা যে ভাবে শেষ ১৩ মিনিটে ৪টে গোল শোধ দিয়ে ড্র করে তা সত্যিই বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল। অবশ্যি রি-প্লেতে তারা আবার ৩-১ গোলে হেরে যায়।

আর নাম করতে হয় আমেরিকার অজেয় নিগ্রো খেলোয়াড়দের। আমেরিকা যে অলিম্পিকে এবারেও এত ভাল ফল করেছে তা সম্ভব হয়েছে শুধু এদেরই জন্য।

আর যাঁরা দর্শক হিসেবে এই অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলেন তাঁদেরও একটা হিসাব (সরকারী) সম্প্রতি বেরিয়েছে। সর্ব্বসমেত মোট ৮৫০৩৮০ জন দর্শক এতে উপস্থিত হয়েছিলেন। উদ্বোধনের দিন এঁদের সংখ্যা ছিল ৭০০৫০, আর অন্যান্য দিন গড়পড়তা ৫৩০০০।

খোকন বীরের কাহিনী

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

তোমরা জানো খোকন মোদের মস্ত বড় বীর,
এক ঠুকে সে কাচের গেলাস করেছে চৌচির।
হুমকি দিয়ে দেয়াল-পাশে গিয়েছে যেই তেড়ে,
অমনি দেখি, টিকটিকিটা পালালো লেজ নেড়ে।
ফুঁ দিয়ে সে বেলুনটারে ফাঁসিয়ে দিতে পারে,
এক ডাকে ঐ চমকে দিল ভোলা চাকরটারে।
এক থাপড়ে একটা মশায় করেছে আজ কাবু,
তোমরা বলো, মস্ত বীর আজ নয় কি খোকাবাবু?
সামনে দিকে টিপ্ করে সে গুলতিটা যেই ছুঁড়ে,
পরাণ-ভয়ে চালাক-চতুর কাকটা গেল উড়ে।
অয়-অজগর সাপটাকে আজ থোড়াই কেয়ার করে,
চিমটি দিয়ে খুকুর দু'চোখ জলেতে দেয় ভরে।
বন্দুক সে কিনলো সেদিন গাজন-তলার হাটে,
নির্ভয়ে তাই ঘুরে বেড়ায় একলা পথে-ঘাটে।
য্যাদ্দিন সে দিগ্বিজয়ে চলতো বীরের সাজে,
পক্ষিরাজের বাচ্চাটা তার উড়তে পারে না যে!

কাগজ

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

বাবা কেন কাগজ পেলেই লেখে ঝুড়ি ঝুড়ি?
তৈরী কেন করে না মা কাগজ দিয়ে ঘুড়ি?
ছোট কাকু কিসে মাগো হ'লো ছেলেমানুষ?
কাগজ কেটে করতে জানে কেমন মজার ফানুস!
কাগজ মুড়ে নৌকো গড়ে বর্ষা-দিনে নিজে,
ভাসিয়ে দিল নালার জলে সমস্ত গা ভিজে!
কাগজেতে হয় মা ঘুড়ি, কাগজে হয় ফানুস,
কাগজ কেটে নৌকো গড়ে;—বলবে ছেলেমানুষ?
কাগজ দিয়ে পূজার দিনে, একটুও নয় ভুল,
ছোট কাকু ফোটালো মা হরেক রকম ফুল।
বাবার কি মা, বিদ্যে এ সব নেই কো কিছুই জানা?
বাবার ইস্কুলেতে মাগো, এ সব ছিল মানা?
তবে কেন কাগজ দিয়ে বাঁধে কেবল খাতা?
বেজায় কাগজ নষ্ট করে লিখে লিখে যা-তা!
ফুল ফোটানো, ফানুস করা—এ সব যদি খেলা,
কার খেলা মা রাতের তারা, বনে ফুলের মেলা?

সেকালের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

আজকাল খবরের কাগজে কার্টুন ছবি বা ব্যঙ্গ-রাসাত্মক প্রবন্ধ তোমরা হামেশাই দেখে থাক। একশ'-দেড়শ' বছর আগে আমাদের দেশের সংবাদপত্রে

কি ধরণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বেরোত তার একটু নমুনা দেখ। এটি বেরিয়েছিল সমাচার দর্পণে, ১৮২১ সালে—অর্থাৎ আজ থেকে ১৩১ বছর আগে। কাজেই ভাষাটা সেই তখনকার বাংলা ভাষা। লেখাটির নাম “বৈদ্য সম্বাদ” অর্থাৎ তখনকার বৈদ্য বা কবিরাজদের চিকিৎসা নিয়ে এতে ঠাট্টা করা হয়েছে।

“...এখানে বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে রোগীর প্রাণ কেমন কেমন করিতেছে। দেখিয়া কবিরাজেরদিগকে ডাকাইলেন। কবিরাজ মুক্তা জারা সুদ্ধা শীঘ্র আসিয়া কহিলেন ভয় কি কি বলিব ঔষধি তৈয়ার করিতে দিলেক না ভাল ২ এই সোনা মুক্তা জারা উহার গাত্রে মাখাও দেখ ইহাতে যদি এ ভাব সারে। দ্বিতীয় জন কহিলেন আপনি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন তাহা করাইলে তবু ফিরে। শেষে কহিলেন ও জানা আছে ও ব্যাধি হইতে মুক্ত কখন হয় না। তুমি আমি কি করিব শিব সাক্ষাৎ হইলেও বাঁচে না। আর দেখাশুনা কি গঙ্গাযাত্রা করাও। ভাগ্যে আমরা আসিয়াছিলাম নতুবা গঙ্গা কদাচ পাইত না এই কথা কহিয়া বিদায় লইলেন।

“গঙ্গাতীরে রোগীকে রাখিয়া একজন জ্ঞানবান্ কবিরাজকে ডাকাইয়া আনিলেন। কবিরাজ আসিয়া দেখিতেছেন এমত সময়ে রোগী বিছানাতে হস্ত-পদাদি ঘর্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ শয্যাকণ্টক হইয়াছে। তাহা দেখিয়া রোগীর মাতা কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেক বিছানায় হাত বুলাইতেছে কারণ কি। কবিরাজ কহিলেন এক দ্রব্য তত্ত্ব করিতেছে। রোগীর মাতা কহিলেন কি দ্রব্য। কবিরাজ কহিলেন শিঙ্গা। শিঙ্গা কি করিবেক। কবিরাজ কহেন ফুঁকিবেক আর কি করিবেক। পরে তাহাই হইল।”

কি বই ভাল লাগে

অনেক সময়ে দেখা যায় ব্যক্তি বিশেষের জীবনে এক-একখানি বই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আবার, সব রকম বই-ই যে সকলের ভাল লাগবে তার কোন মানে নেই। এমনও দেখা গেছে, খুব বিখ্যাত এবং পণ্ডিত লোকের সব চেয়ে প্রিয় গ্রন্থ হচ্ছে এমন একখানি বই যা তোমার-আমার কাছে খুব সাধারণ বলে মনে হবে। আবার, তাঁদেরকেই হয়তো এমন অনেক বই আকৃষ্ট করতে পারেনি যা নাকি সর্ব্বকালে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। আসলে ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করে লোকের ব্যক্তিগত রুচির ওপর।

আমার ছেলেবেলায় কুলদারঞ্জন রায়ের “রবিন হুড” বইখানি অসম্ভব রকম ভালো লাগত, কখনও পুরোনো হ'ত না যেন! তেমনি ধারা আমার আত্মীয়-বন্ধুদের কারো কারো এই সব বইএর ওপর অদ্ভুত টান লক্ষ্য করেছি—যেমন ধর, বঙ্কিমের “রাজসিংহ”, বার্ণার্ড শ'র “পিগ্‌মেলিয়ন্”, ডিকেন্সের “পিক্‌উইক্ পেপারস্”, এবটের “নেপোলিয়ন”, ডি কুইন্‌সির “ওপিয়াম্ ঈটার”, আলাওলের “পদ্মাবতী”, শরৎচন্দ্রের “দত্তা”, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের “ভীষ্ম”, দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী” ইত্যাদি। অবশ্যি এগুলো কোনটাই ছোটদের বই নয়, এবং তাঁরাও কেউ শিশু ন'ন।

একজন বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপকের কথা জানি, পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। কিন্তু তিনি অবসর সময়ে দীনেন্দ্র রায়ের ডিটেকটিভ বই পড়তে ভীষণ ভালবাসতেন। আর একজন খুব নাম-করা খবরের কাগজের সম্পাদকের কথা জানি, ভারত যোড়া নাম তাঁর, কিন্তু ছেলেদের এডভেঞ্চার আর ডিটেক্‌টিভ বইএর নাম করতে তিনি পাগল। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—বটতলার অনেক বই-ই নাকি তাঁর পড়তে খুব ভাল লাগে।

বিখ্যাত লোকেদের মধ্যে কার কি বই ভালো লাগত তার একটা ছোটখাট তালিকা এখানে তুলে দিচ্ছি। এগুলির কোন কোনটার কথা তাঁদেরই মুখ থেকে শোনা, কোন কোনটার কথা তাঁদের রচনা বা চিঠিপত্র থেকে জানা গেছে। অবশ্য এগুলি ছাড়া আরও অনেক বই হয়তো তাঁদের প্রিয় ছিল কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে এগুলির নামই শুধু উল্লেখ করছি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কালিদাসের “মেঘদূত”, “গীতা”; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী—বিশেষ করে কমেডি অব্ এররস্, স্কটের ওয়েভার্লি নভেল্‌স্; মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মিল্‌টনের “প্যারাডাইস্ লষ্ট”; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বঙ্কিমের “দুর্গেশনন্দিনী”, গোবিন্দদাসের “পদাবলী”; মহাত্মা গান্ধী—“ভগবদ্গীতা”; জগদীশচন্দ্র বসু—“মহাভারত”; প্রফুল্লচন্দ্র রায়—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের “আত্ম-চরিত”; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিদ্যাসাগরের “কথামালা”, গোবিন্দদাসের “কড়চা” (আর্টিষ্ট হলেও আর্টের বই নাকি এঁর একটুও ভালো লাগত না); রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—“আরব্য উপন্যাস”, তারাশঙ্করের “কাদম্বরীর অনুবাদ”; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের “গোরা” ইত্যাদি।

বিদেশী লেখকদের মধ্যে জার্মান্ কবি গ্যেটে কালিদাসের “শকুন্তলা”

(জার্মান অনুবাদ) খুব বেশী রকম পছন্দ করতেন ; কবি ইয়েট্স রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির খুব ভক্ত ছিলেন ; আর রোমাঁ রোলাঁ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পড়তে খুব ভালবাসতেন।

বিচার

শ্রীকৌটিল্য

সনাতনের সঙ্গে মদনের বহুদিনের ঝগড়া। একই গাঁয়ে দু'জনের বাস হলে কি হবে, কেউ কারও নাম শুনতে পারে না। লোকে বলে, এ ঝগড়া তাদের এক পুরুষের নয়, তিন পুরুষের। সনাতনের ঠাকুরদা আর মদনের ঠাকুরদা এক সময়ে নাকি খুব বন্ধু লোক ছিলেন। দু'জনেই তখন একই নবাবের ফৌজে কাজ করতেন। একদিন সামান্য কি কারণে খিটিমিটি বাধল। দলে বদ্‌লোকের অভাব ছিল না, তাদের উস্কানিতে তা তিল থেকে তাল হ'ল। সনাতনের ঠাকুরদা প্রতিজ্ঞা করলেন, 'জন্মে ও হতভাগার মুখ দেখবো না।' মদনের ঠাকুরদাও বললেন 'তথাস্তু'। তাঁদের জীবিতকালে সে ঝগড়া মিটল না। তারপর তা গিয়ে বর্ত্তাল তাঁদের ছেলেদের ওপর এবং পরিশেষ ছেলে থেকে নাতিতে, আরও বেশী করে।

পাশের গাঁয়ের নিতাই তার মেয়ে ক্ষান্তমণির সঙ্গে সনাতনের বিয়ে দেবে ঠিক করেছিল, মদন হঠাৎ কি কৌশলে সে বিয়ে ভেস্তে দিয়ে নিজে সেই মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল। নিতাইএর ঐ এক মেয়ে, আর টাকাপয়সার দিক্ দিয়েও তার অবস্থা বেশ সচ্ছল, কাজেই দাঁওটা ফস্কে যাওয়ায় সনাতনের রাগ গেল আরও বেড়ে। সেই থেকে তার একমাত্র চিন্তা কি করে মদনকে জব্দ করবে।

দেশের অবস্থা এখন অনেকটা বদলে গেছে। নবাবী রাজত্ব অবশ্যি এখনও সেই রকমই চলছে কিন্তু ওরা আর কেউ এখন বাপ-ঠাকুরদার মত সৈন্য বিভাগে কাজ করে না। সনাতন গাঁয়ের মধ্যে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। ব্যবসা ভালই চলছে, হাটের দিনে তার দোকানে খরিদ্দারের ভিড় দেখলেই তা আন্দাজ করা যায়। মদন হয়েছে শিল্পী, বা আরও ভালো করে বললে বলতে হয়, ভাস্কর।

অবশ্যি সে ঘরে বসে পাথরের মূর্ত্তি গড়ে না, তার কাজ হচ্ছে বাইরে। বড় বড় অট্টালিকার গায়ে খোদাই ক'রে নানা রকম নক্সা তৈরী, মন্দিরের গায়ে বা চূড়ায় পাথরের ওপর নানা কারুকার্য্য করা—এ সব কাজে সে বেশ ওস্তাদ্, এবং এতে করে সে ভালই রোজগার করে।

কিন্তু এইতেই হ'ল একদিন বিপদ্। সহরে খুব বড় একটা তেতলা বাড়ীর কাজে মদনের ডাক পড়েছিল। প্রায় ত্রিশ হাত উঁচু একটা থামের ওপর ভারা বেঁধে উঠে তাকে সেই থামের মাথায় পাথর কেটে ফুলের কাজ করতে হবে।

দু'দিন কাজ করার পর সেদিনও মদন কাজে বসেছে। আগের রাতে একটু বৃষ্টি হয়েছিল, ভারার দড়ি জলে ভিজে কখন আলগা হয়ে ছিল কেউ টের পায় নি। হঠাৎ ভারা ভেঙ্গে মদন একেবারে তিরিশ হাত নীচে মাটীতে পড়ে গেল। ঠিক মাটীতে পড়ল বললে ঠিক হবে না, তা হলে তো সে মরেই যেত ; ঠিক সেই সময়ে ভারার তলায় রাস্তা দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিল, মদন গিয়ে পড়ল তারই ঘাড়ে। ফল হ'ল আশ্চর্য্য! মদনের কিছুই হ'ল না, একটু-আধটু ছড়ে যাওয়া ছাড়া। কিন্তু যে লোকটির ঘাড়ে পড়ল সে প্রাণে বেঁচে গেলেও গুরুতর রকম আহত হ'ল। সবাই যখন তাকে ধরাধরি করে তুলল তখন তার মুখটা দেখে মদনের চিনতে বাকি রইল না। সে তার চিরশত্রু সনাতন। কি একটা কাজে সহরে এসেছিল এবং ঘটনাচক্রে ঠিক এই সময়েই এখান দিয়ে চলছিল সে। একেই বলে নিয়তি।

বেশ দিন কয়েক ভুগে শেষ পর্য্যন্ত সনাতন সেরে উঠল। তবে তার একটা পা আর সারানো গেল না। বাকি জীবনটা তাকে খোঁড়া হয়েই কাটাতে হবে।

কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও একটা কথা ভেবে সনাতনের খুব আনন্দ হচ্ছিল। এতদিন পরে এইবার সে মদনকে বাগে পেয়েছে। এবার সে দেখে নেবে তাকে। তাকে খুন করবার মতলবেই যে সে ঐ উঁচু থেকে নীচে পড়েছিল এ বিষয়ে সাক্ষী দেবার লোকের অভাব হবে না। কাজীর বিচারে বাছাধনকে তার শাস্তি পেতে হবে। হয়তো বা শূলেই প্রাণ দিতে হবে, নয়তো ফাঁসিকাঠে। এবার আর রেহাই নেই মদনের।

একটু সুস্থ হয়েই সনাতন কাজীর দরবারে গিয়ে নালিশ জানিয়ে এল।

মদনের ডাক পড়ল। কাজী জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি অত উঁচু থেকে ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিলে?"

"আজ্ঞে না হুজুর, লাফিয়ে পড়ি নি। ভারা ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিলাম। দৈবাৎ ঐ সময় ও ঐখান দিয়ে যাচ্ছিল তাই—"

কাজী দু' পক্ষকেই নানা রকম জেরা করলেন। তার পর বললেন, "কাল সকালে হুকুম দেব। তোমরা দু'জনেই হাজির থেক।"

পরদিন আদালতে বেশ ভিড়। সনাতন এবং মদন দু'জনেরই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এসে জুটেছে। সনাতনও খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছে। মুখ তার ভারী প্রফুল্ল। আজ তার শত্রু নিপাত হবে। মদনও এসেছে, এবং কম্পিত বক্ষে একদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

যথা সময়ে কাজী সাহেব এসে নিজের আসনে বসলেন। তার পর বিচার সুরু হ'ল।

"সনাতন!" কাজী বললেন, "তুমি বলছ, ঐ লোকটি, মানে মদন, ইচ্ছে করে তোমার ঘাড়ে পড়েছিল,—তোমাকে মেরে ফেলবার উদ্দেশ্যে। অপরাধ গুরুতর সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য রকম শাস্তি দিলে তো ও ওর অপরাধের গুরুত্ব বুঝবে না, ওকে ঠিক ওর অপরাধের অনুরূপ সাজা দিতে হবে। যেখান থেকে ও নীচে পড়ে গিয়েছিল সেখানে আবার সেই ভারা আমি বাঁধিয়ে দিচ্ছি। তুমি গিয়ে সেইখানে উঠবে। আর ও থাকবে নীচে রাস্তায়, যেখান দিয়ে তুমি যাচ্ছিলে। তার পর তুমি সেই তিরিশ হাত ওপর থেকে ওর ওপর লাফিয়ে পড়বে। যেমনটা ও পড়েছিল। কেমন সনাতন, তোমার নিশ্চয়ই আপত্তি নেই এতে?"

সনাতনের বন্ধুরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ কি সম্ভব? যদি লাফাতে গিয়ে একটু এদিক্ ওদিক্ হয়ে যায় তবে তো নির্ঘাৎ মৃত্যু। তা ছাড়া মদনের ঘাড়ে পড়লেও ও-ও যে মদনের মত বেঁচে যাবে তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

সনাতনের আমতা আমতা ভাব দেখে কাজী সাহেব ধমকে উঠলেন। "কি, রাজী নও? কিন্তু ও তো, তোমার মতে, ঐ ভাবেই তোমাকে মারতে চেয়েছিল, নয় কি? এ সাজা তোমার মনঃপূত না হলে বিদায় হও, আদালতের সময় নষ্ট ক'র না।"

মদনের মুখে এবার হাসি ফুটল। সনাতন মুখ নীচু করে বেরিয়ে গেল।

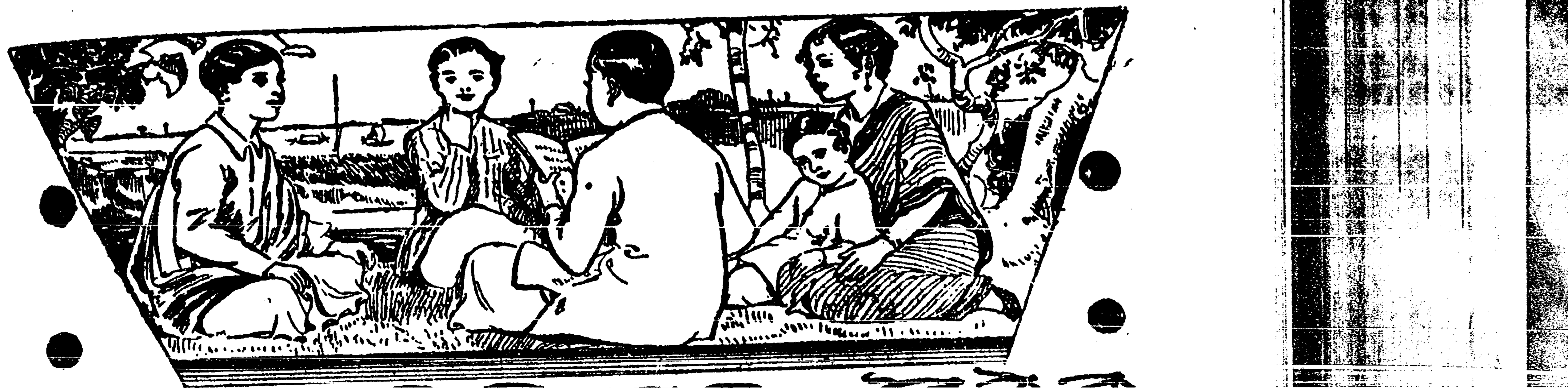

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

চিঠি

কুমারী নমিতা দাম

প্রিয় 'অপরাজিত',

জীবন-'পথের পাঁচালী' অনুসরণ করে আজ জীবন-সন্ধ্যায় পৌঁছেছি। এ 'বিচিত্র জগৎ'কে নানাভাবে, নানা রূপে দেখলাম আমার চিরনির্ভর 'দৃষ্টিপ্রদীপ' দিয়ে; একের পর এক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছি একে মধ্যস্থ করে; ······'বনে পাহাড়ে' ঘুরে ঘুরে এর সৌন্দর্য্য কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়েছি আমার সংগ্রহ-থলিতে। 'আরণ্যকে'র সে সৌন্দর্য্য আজও আমি ভুলতে পারি না, আজও সে সৌন্দর্য্য কল্পনা করতে করতে নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে মুখ থেকে - 'হে অরণ্য, কথা কও।' 'কুশল-পাহাড়ীর' ন্যায় 'পাহাড়ে পাহাড়ে' ঘুরে 'উৎকর্ণ' হয়ে শুনেছি গাছপালা, বন-জঙ্গলের সে 'ঊর্মিমুখর' ধ্বনি। মনে পড়ে 'ইছামতী' নদীর তীরে 'উপলখণ্ডে' বসে কতদিন গভীর রাত পর্য্যন্ত চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কল্পনায় 'চাঁদের পাহাড়' দেখেছি! সেদিনের সে কল্পনার 'মুখোস ও মুখশ্রী' আজও হারিয়ে ফেলি নি,—আজও জীবনের 'অথৈ জলে' দাঁড়িয়ে কল্পনায় 'অভিযাত্রিক'-এর বেশে ছুটে চলে যাই 'বেণীগির ফুলবাড়ী'র পথে।

······সেই 'তাল-নবমী'র দিনে 'নবাগত' 'বিধুমাষ্টারে'র সঙ্গে 'আচার্য্য কৃপালনী কলোনী' দেখতে যাওয়া,—সেদিনের সে 'যাত্রাপথে' তুমিও তো ছিলে আমার একজন যাত্রাসঙ্গী। তারপর পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য 'আম-আঁটির ভেঁপু' বাজিয়ে যাওয়া,—ফিরে আসার পথে 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে' বসে 'জন্ম ও মৃত্যু' নিয়ে সে কি গভীর আলোচনা! আজ তো জীবন-সন্ধ্যায় পৌঁছেছি,—জীবনে আজ 'মরণের ডঙ্কা বাজে'। তবু সে 'স্মৃতির রেখাকে' আজও মুছে ফেলতে পারি নি। এ ছাড়াও শৈশবের সে 'তৃণাঙ্কুর' দিনগুলি,—সেই পাঠশালায় সুর করে 'অভিনব বাঙ্গালা ব্যাকরণ' পাঠ করার কাহিনী আর সেই 'কেদার-রাজা' প্লে করা! তখন আমরা দুই বন্ধুই ছিলাম একই পথের যাত্রী। অবশেষে কালের বিচিত্র গতিতে কোন এক অসচেতন মুহূর্ত্তে দুজনেই 'যাত্রাবদল' করে ভিন্ন পথে পা দিলাম। হয়তো আবার কোন এক অসচেতন মুহূর্ত্তে 'দেবযান' এসে দাঁড়াবে আমাদের দোরগোড়ায়,—সেই ঘটাবে চিরসমাপ্তি।·········

এবার অন্য কথায় আসা যাক্। গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি সুপ্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। কি 'অসাধারণ' নৈপুণ্য ছিল তাঁর গ্রাম্য চিত্রাঙ্কনে। মনে পড়ে 'বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প' নিয়ে আমার সঙ্গে কতদিন তোমার কথা বন্ধ ছিল,—কিন্তু কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না! এ মনোভাবই সেদিন ঘটালো আমাদের 'ক্ষণভঙ্গুর' মনোমালিন্যের অবসান।

তারপর, 'বিপিনের সংসারের' খবর কি? ওর খবরাখবর অনেক দিনের মধ্যে পাই নি। ওদের 'দুই বাড়ীর' মধ্যে মনোমালিন্যের অবসান ঘটেছে কি?

প্রীতি জানিয়ে এখানেই আজ শেষ করি। ইতি—

'মৌরীফুল' (যে নামে তুমি আমায় সম্বোধন কর)*

* এই চিঠিখানায় কোন বিশেষত্ব দেখছ কি? শেষ পৃষ্ঠায় জবাব দেখ।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

পঞ্জিকার হিসেব অনুযায়ী শরৎকাল সুরু হয়ে গেছে—যদিও বর্ষার রেশ এখনও কাটে নি। বৃষ্টি যখন তখন ঝরছে, তবে তা আগের মত এখন আর দীর্ঘ-স্থায়ী নয়। পাড়ার ছেলেরা পূজোর চাঁদার খাতা নিয়ে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে। আকাশে-বাতাসে তাই এখন থেকেই একটা পূজো পূজো গন্ধ টের পাচ্ছি। পূজোর রামধনু তোমাদের হাতে সময়-মত পৌঁছে দিতে হবে সে কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল।

শ্রীসবিতা বসু (এলাহাবাদ)—বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কবিতা কেন আমার ভাল লাগে এতে তুমি বিস্ময় প্রকাশ করেছ। মনের খোরাক মেটাতে কবিতার মত আর কিছু আছে নাকি? তোমার বুঝি ভাল লাগে না? আমি কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই কবিতা পড়ি এবং লিখি; এবং বাকি জীবনটাও পড়ব, এবং

হয়তো লিখবও। বলতে কি, ছেলেবেলায় এই কবিতার মারফৎই আমার সাহিত্যজগতে ঢুকবার সুযোগ হয়েছিল। কবিতার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ থাকবে এ কথার কোনও মানে নেই। কবি ওমর খৈয়াম মস্ত বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন। জার্মান্ কবি গ্যেটে ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান ভাল বাসতেন, এবং বিজ্ঞানের ওপর বইও লিখে গেছেন। শ্রীনন্দলাল সেনগুপ্ত (কাশী)—ছেলেদের হিন্দী মাসিকপত্র কিছু কিছু আমার কাছে আসে এবং পড়িও। সম্প্রতি হিন্দী শিশুসাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তবু মনে হয় এদিক্ দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্য এখনও অনেক এগিয়ে আছে, যেমন বাংলার তুলনায় আছে ইংরেজী শিশুসাহিত্য। শ্রীগৌরকিশোর চৌধুরী (মণিনাথপুর)—তোমার কবিতা মনোনীত না হওয়ায় এবং ছন্দের ত্রুটীর উল্লেখ করায় তুমি দেখছি ভীষণ চটে গেছ! চিঠিখানা কিন্তু আর একটু ঠাণ্ডা হয়ে লেখা উচিত ছিল, নইলে নিজেই পরে লজ্জা পাবে। তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই ত্রুটী দেখান হয়েছিল। কিছু মিলিয়ে লিখলেই তো আর তা কবিতা হয় না, এজন্য সাধনা দরকার। ধৈর্য্য তোমাকে আরও অনেক দিন হয়তো ধরতে হবে কথাটা কিন্তু 'ধর্য্য' নয়, 'ধৈর্য্য')। আর একটা কথা, চাঁদার কথা যা লিখেছ তা কিন্তু আপত্তিকর। বোধ হয় ছেলেমানুষ বলেই ও কথা লিখেছ। এটা মনে রেখ, তোমার লেখা যখন ছাপবার উপযোগী হবে তখন সম্পাদকরাই টাকা নিয়ে তোমার দ্বারস্থ হবেন, তোমাকে টাকা দিতে হবে না। যতদিন লেখা ছাপাবার মত না হচ্ছে ততদিন হাজার বার গ্রাহক হলেও সে লেখা বেরোবার কোন সম্ভাবনা নেই। গ্রাহকদের অপেক্ষাকৃত কাঁচা লেখাকে উৎসাহ দেবার জন্য আমরা আলাদা বিভাগ রেখেছি, কিন্তু সে বিভাগেরও তো একটা 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' বা মান আছে! তবে দেখে সুখী হলাম, তোমার নতুন কবিতা অনেকটা ভাল হয়েছে। "শরৎ এল"তে শেষ দু'লাইন ছাড়া ছন্দে কোন ত্রুটী নেই। সাধনা করলে নিশ্চয়ই তুমি সফল হবে এ ভরসা আমাদের আছে। শ্রীশেফালিকা দত্ত (সিমলা)—তোমার চিঠিতে পাহাড়ী ঝরণার সুরই যেন ঝরে পড়ছে। ভারী মিষ্টি লাগল। শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী (পুরুলিয়া)—তোমাদের ওদিকে বাংলা ভাষার ওপর অবিচারের কাহিনী শুনে ক্ষুব্ধ হ'লাম। পশ্চিম বাংলার নেতারা ওদিক্কার বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল ফিরে পাবার জন্য যে দাবী জানিয়েছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—রাঃ সঃ।

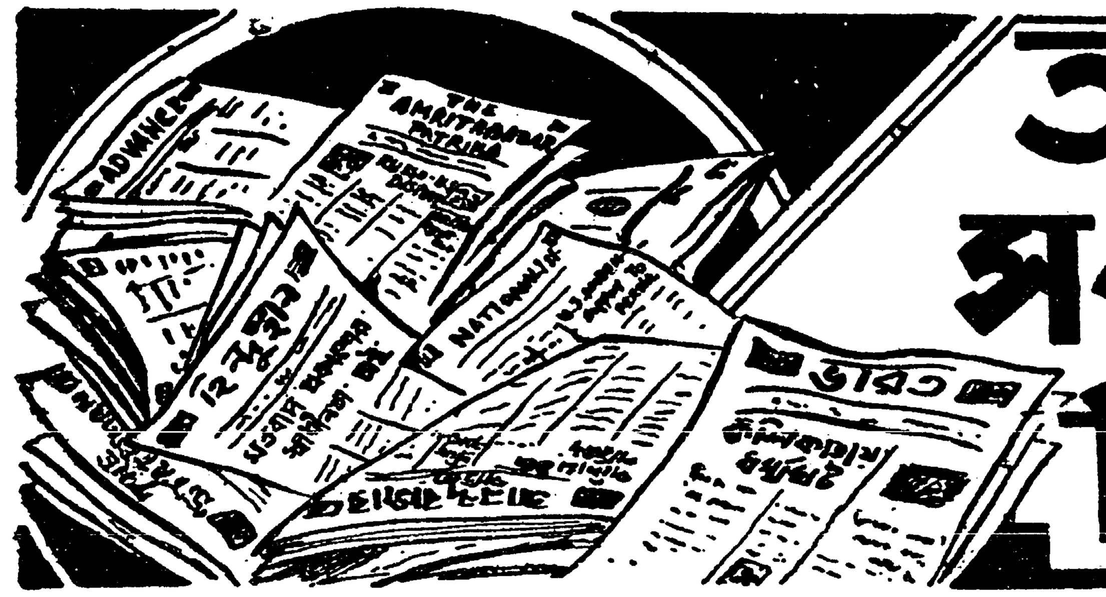

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

কলকাতার ফুটবল

কলকাতার ফুটবল লীগ্ শেষ হয়েছে। ১ম বিভাগে ইষ্ট বেঙ্গল দলই শেষ পর্য্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্ হ'ল। ২৬টি ম্যাচ খেলে তাদের পয়েণ্ট হয়েছে ৪০। এই নিয়ে তারা ৬ বার লীগ্ বিজয়ী হ'ল (১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫২)। এক ক্যালকাটা আর মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়া আর কেউ এত বার লীগ্ বিজয়ী হয় নি।

এবারে রানার্স আপ্ হয়েছে ভবানীপুর দল। জনপ্রিয় মোহনবাগান কিন্তু এবারে লোক হাসিয়েছে – তালিকার অনেক নীচে নেমে গিয়ে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে তারা প্রায় খেলাতেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

লীগের পর আই-এফ-এ শীল্ড্ খেলা চলছে। বাইরে থেকে এবারেও অনেক দল এতে যোগ দিয়েছে। শীল্ডে অবশ্যি মোহন-বাগান হেলসিঙ্কি-ফেরৎ পুরোনো খেলোয়াড়দের পেয়ে ভালই করছে এবং এ পর্য্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে।

বিলাতে ক্রিকেট টেষ্ট

ভারতীয় ক্রিকেট টীমের এবারকার ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ তাদের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় হয়ে রইল। প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্টে পরাজয়ের পর তৃতীয় টেষ্টে তারা প্রাণপণে যুঝবে এই আশাই সকলে করেছিলেন কিন্তু এই খেলায় তারা আরও শোচনীয় ভাবে, এক ইনিংস্ ও ২০৭ রানে পরাজিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ড দল প্রথম ইনিংস্এ ব্যাট্ করতে নেমে ৯ উইকেটে ৩৪৭ রান্ করে ডিক্লেয়ার করে। অধিনায়ক হাটন্ একাই করেন ১০৪ রান্। প্রত্যুত্তরে ভারতীয় দল করে ১ম ইনিংস্এ সকলে মিলে ৫৮ রান্। ফলে তাদের ফলো অন্ করতে হয়। ২য় ইনিংসএ ভারতের সকলে আবার ৮২ রানে আউট হয়ে যায়। ৫ দিনের খেলা তিন দিনেই শেষ হয়। ইংল্যাণ্ড দল রাবার অর্জ্জন করে।

তারপর ৪র্থ টেষ্ট। এই টেষ্টেও ভারতের জিতবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, এবং খেলা শেষ হলে এবারেও সম্ভবতঃ তাদের শোচনীয় ভাবেই পরাজয় বরণ করতে হ'ত। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি এসে তাদের রেহাই দিয়েছে। বৃষ্টির জন্য খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে এবং ক্রিকেটের নিয়ম মত খেলা অমীমাংসিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মিশরে পট পরিবর্ত্তন

সম্প্রতি মিশরের রাজনীতিতে এক নাটকীয় পরিবর্ত্তন হয়েছে। জেনারেল মহম্মদ নাগুইব বে'র নেতৃত্বে মিশরীয় সেনাবাহিনী রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং রাজা ফারুককে রাজ্যত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। অবশ্যি এ ব্যাপারে কোন রক্তক্ষয় হয় নি। রাজা ফারুক তাঁর পত্নী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে নির্ব্বাসনে যাত্রা করেছেন। তিনি আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করবেন। রাজার সাত মাস বয়স্ক ছেলে ফুয়াদকে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফুয়াদ অবশ্যি মায়ের কাছেই রয়েছে, তবে সাত বছর বয়সে তাকে মিশরে ফিরে আসতে হবে। ইতিমধ্যে তার প্রতিনিধি রাজ্য শাসন করবে। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী আলি মেহের পাশা আবার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। নাগুইব দেশবাসীকে ভারতের নেতা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বল তো ?

একটি প্রবাদের ছবি। বল দেখি প্রবাদটি কি ?
না পারলে শেষ পৃষ্ঠা দেখ।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

৬

উত্তরদাতাদের নাম ঃ— নীলিমা সান্ন্যাল (কলিকাতা), ব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ (কটক), শোভা ও বিভা সেন (নিউ দিল্লী), কমলকুমার মিত্র (রাণীর চক)।

নূতন ধাঁধা

নীচের ব্র্যাকেটগুলিতে একটি ক'রে সংখ্যা দেওয়া আছে। সেই সংখ্যার বদলে উপযুক্ত শব্দ বসাতে হবে। কিন্তু প্রত্যেকটি সংখ্যার বদলে বিভিন্ন শব্দ বসবে' আর একই সংখ্যার বদলে প্রথম বারে যা বসবে দ্বিতীয় বারে সেটা উল্টো ক'রে বসাতে হবে। ধর, ১-এর বদলে প্রথম বারে যদি বসানো হয় 'তিনি', তবে দ্বিতীয় বারে বসাতে হবে 'নিতি'। এই ভাবে পড় ঃ—

ব্যাপার কি! (১) করা আংটী পরে কানে (২) ফুল গুঁজে (৩) ভরা (৪) নিয়ে কোথায় চলেছ? (৪) (২)ল খেয়াল আছে? আর রোদে (৫) না। বাজে (৬) (৬)। ও (৭) পরে

হবে। এখানে (৭)। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার (৮) (১) লোক (৯) জানি, তুমি (৯) নও। এই, চেঁচামেচি (৩)। আরে (৮), আমি তো (৫) ডাকাত নই!

[৩১শে ভাদ্রের মধ্যে গ্রাহক নং সহ উত্তর পাঠাতে হবে।

২২৫ পৃষ্ঠার ছবি ঃ—প্রবাদটি হচ্ছে "দু' নৌকোয় পা দিও না।"

২২১—২২ পৃষ্ঠার চিঠি ঃ—বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন বইএর নাম এই চিঠিখানার মধ্যে ছড়ানো রয়েছে।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতিযোগিতা

পুরস্কার পেলেন—শ্রীমতী নিবেদিতা চক্রবর্ত্তী কলিকাতা)।

আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে—কুমারী প্রকৃতি পণ্ডিত (কালিম্পং), শ্রীউমাশঙ্কর মিত্র (বড়া—লাভপুর), শ্রীনির্ম্মলেন্দু সরকার (ভাগলপুর)। পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখাটি বারান্তরে রামধনুতে প্রকাশিত হবে।

আষাঢ় মাসের প্রতিযোগিতা

পুরস্কার পেলেন – শ্রীনিমাই বসু রায় (চন্দননগর)

আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল (মহেশ্বরা), শ্রীসলিল সেন (কলিকাতা), শ্রীমিহির দাশগুপ্ত (জামসেদপুর), শ্রীলীনা রায় (জলপাইগুড়ি)।

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় হচ্ছে 'বিতর্ক-প্রতিযোগিতা'। বিতর্কের বিষয় ঃ "সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষা"। এই দুই ভাষার একটির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে লিখতে হবে, যুক্তি দিয়ে। আমাদের বিচারে যার লেখা সব চেয়ে ভাল হবে সেই পুরস্কার পাবে। প্রতিযোগিতায় যে কেউ যোগ দিতে পারবে তবে প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচেকার কুপনটি কেটে পূর্ণ করে আঠা, সুতো বা পিন দিয়ে যুড়ে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। লেখা ১৮ই আশ্বিনের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

কুপন

রামধনু

পুঃ ভাঃ ৫৯

নাম—

ঠিকানা—

বয়স—   নিজে গ্রাহক কিনা—

এবার পূজায়—

ছেলেমেয়েদের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজাবার্ষিকী

পরশ মণি

(মূল্য চার টাকা)

—এতে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(অপ্রকাশিত রচনা)
যতীন্দ্রমোহন বাগচী
(অপ্রকাশিত রচনা)
হেমেন্দ্রকুমার রায়
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কালিদাস রায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
বুদ্ধদেব বসু
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সজনীকান্ত দাস
সুনির্ম্মল বসু
বনফুল
প্রভাবতী দেবী
আরও অনেকে

অন্যান্য বছরের
পূজাবার্ষিকী
ছোটদের চয়নিকা
ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন
ঝলমল
আজব বই
শিশু গল্পিকা
সোনার কাঠী
চিত্রদীপ
মধুমেলা
রূপরেখা
বর্ষমঙ্গল
আলপনা
রাঙ্গারাখী
নবারুণ
অঞ্জলি, উদয়ন,
আবাহন।

প্রত্যেকখানা ৩৲ টাকা

এখনও কিছু
অবশিষ্ট আছে
১৩৫৮ সালের
পূজা বার্ষিকী
অভিষেক
মূল্য চার টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর —২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই

[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাল এজুকেশন বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত]

১।	মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু	...	৪৸৹
*২।	গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১৷৹
*৩।	মাঞ্চুসেনের অ্যাডভেঞ্চার— „	...	৸৹
*৪।	ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস	...	১।৹
*৫।	„ আইনষ্টাইন— „	...	১।৹
৬।	„ মার্কনি— „	...	১।৹
*৭।	দেশবিদেশের লেখা ...	...	৩৲
৮।	গল্পবীথিকা— গদাধর নিয়োগী	...	১৸৹
*৯।	আসামের অরণ্যচারী—নলিনীকুমার ভদ্র	...	১৷৹

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কর্ত্তৃক অনুমোদিত
বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

চয়নিকা

মাসিক পত্রিকা
নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

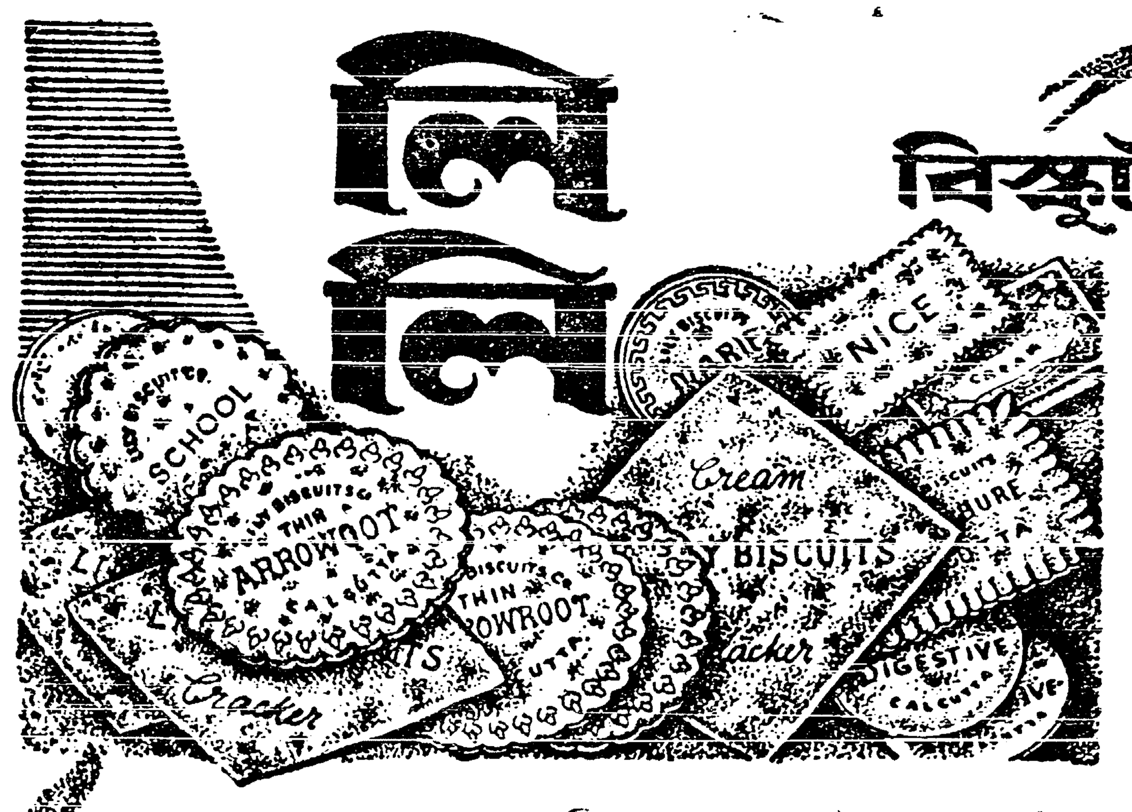

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোস্টন-ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

বঙ্গলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোং

৩৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

ভ্যালুয়েশনে সন্তোষজনক উদ্বৃত্ত (Surplus) হইয়াছে।

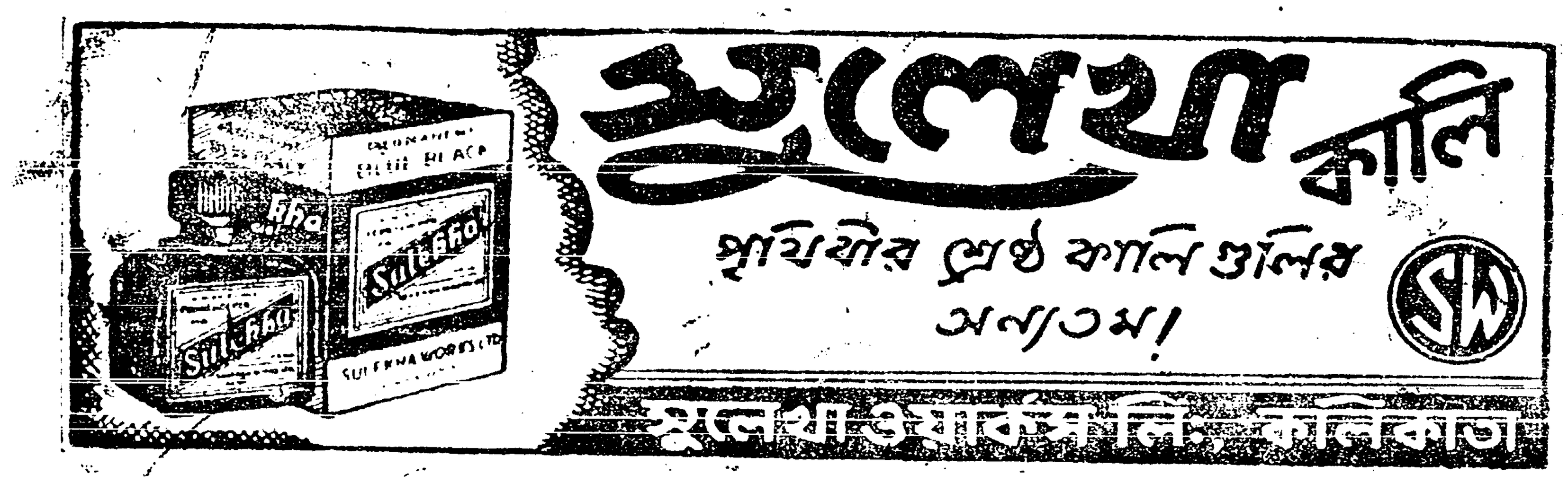

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দস্যি মেয়ে

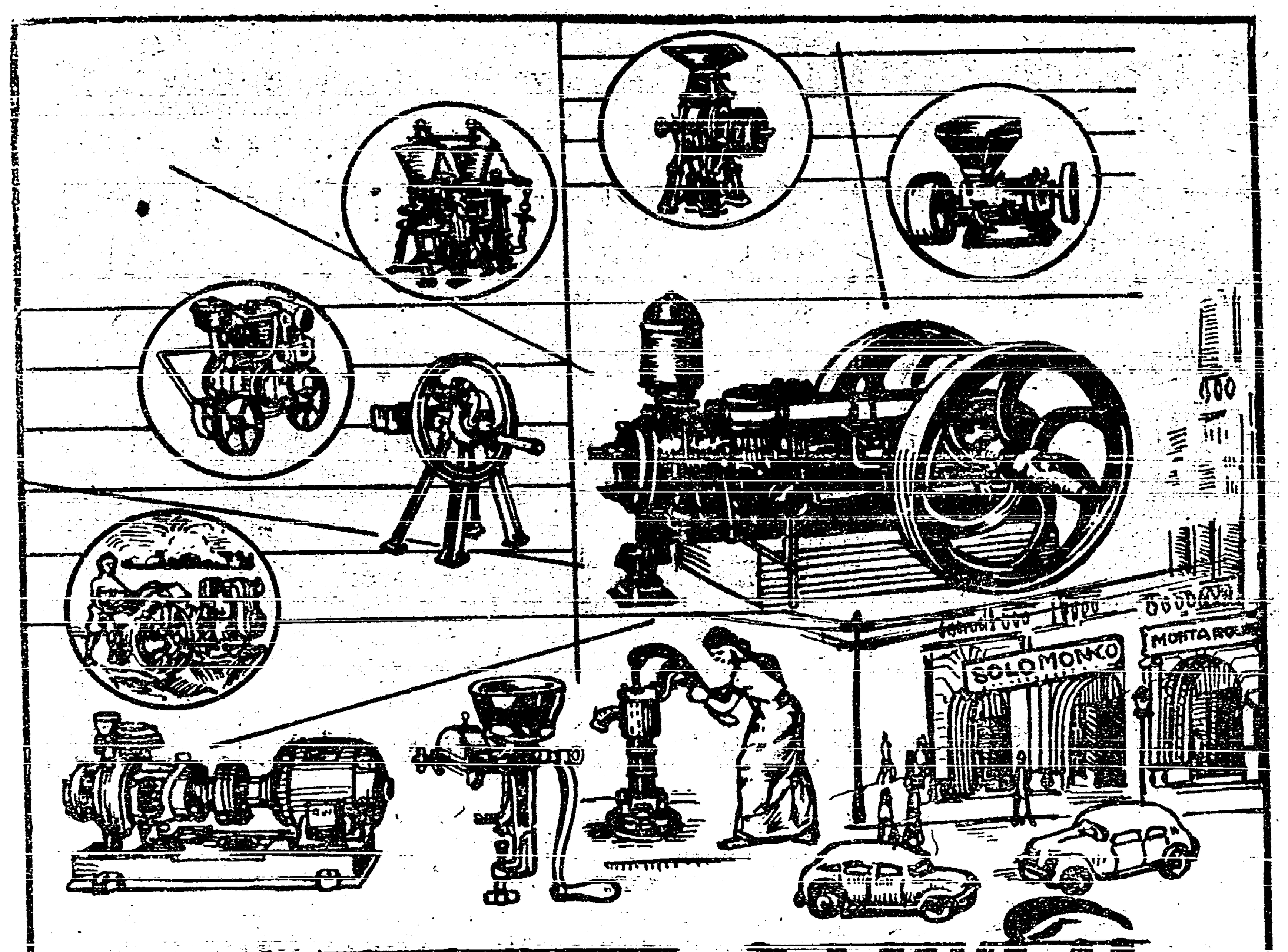

সলোমন এণ্ড কোম্পানি

ইম্পোর্টারস, এক্সপোর্টারর্স এবং মেসিনারী মার্চেন্টস্

(একমাত্র সত্ত্বাধিকারী:- নৃপেন ভট্টাচার্য্য)

২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড (মোহতা হাউস্) কলিকাতা – ১.

ফোন: ব্যাঙ্ক :- 4497 * গ্রাম:- AGRASTONS

স্বর্ণঘটিত

অমৃত সালসা

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহুপ্রকার মূল্যবান্‌ রক্ত পরিষ্কারক ও বলকারক উপাদান ও স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত—জগদ্বিখ্যাত "অমৃত সালসা" আজ ৫৬ বৎসর যাবৎ পূর্ণ সুখ্যাতির সহিত মানবসমাজে সুপরিচিত। রক্ত শোধন, বাত ও যাবতীয় দুর্ব্বলতা বিনাশে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, জটিল ও পুরাতন চর্ম্মরোগে, দুষিত ক্ষত এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ইহা অদ্বিতীয় টনিক। সকল ঋতুতে সকলের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক।

১ শিশি ১॥০, ৩ শিশি ৩।৶০, ১ ডজন ১২॥০, মাশুল স্বতন্ত্র।

পদ্মমধু

যাবতীয় চক্ষুরোগ ও ছানির মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি ১॥০, ৩ শিশি ৩।৶০

গৃহচিকিৎসার বাক্স

নিজে নিজেই সর্ব্বরোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

২৬ প্রকার ঔষধযুক্ত। ১ বাক্স মূল্য ১২॥০

মকরধ্বজ—১ তোলা ৬।০ চ্যবনপ্রাশ—৴১ সের ২০৲

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৪৪এ, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা ৫

ফোন : বড়বাজার ৬০৫২

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৫৯ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বোধন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শরৎ এসেছে, উজল ধরণী,
শ্যামল বনশ্রী—
কে যে আসিছেন ভুলিয়া যেও না,
খপর রেখেছ কি ?
সারা বৎসর আমি যে দিবস গণি,—
বাঁশরী বাজাই, করি শঙ্খের ধ্বনি,
জগৎজননী আসিছেন তাই
জগতে জানায়ে দি।

শোভাময়ী ধরা কত অপূর্ণা
আমার আছে তো জানা,

কার্য্য আমার পূর্ণতার যে
গৌরব ঢেকে আনা।
অপূর্ণ আর হেথায় কিছু না রবে,
সবার মনস্কামনা পূর্ণ হবে,
অঙ্গার যাহা পড়ে আছে—তাতে
বাঁধিবে হীরার দানা।

আনন্দময়ী জননী যে তিনি—
আনন্দে তাঁর স্থিতি,
আনন্দ ভরা, ভক্তিতে ভরা,
প্রীতি ভরা হবে ক্ষিতি।
দেখিতেছি আমি স্বাধীন ভারত মাঝ
হাজার বছর আগেকার পূজা আজ,
উল্লসিত যে হয়ে উঠিতেছে
মোর স্মৃতি, মোর গীতি।

মধুর চাষ

শ্রীদ্বিজেন মল্লিক

ছোট্ট আমার বন্ধুরা!

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো মৌমাছি দেখে থাকবে। দেখে থাকবে মৌচাকও। কিন্তু কেমন করে যে এই মৌমাছি তার চাক প্রস্তুত করে এবং কেমন করেই বা সে মধু সংগ্রহ করে তার কোন খবর তোমরা রাখ কি? তোমরা বোধ হয় জান না যে আজকাল পাশ্চাত্য দেশে তোমাদের মত স্কুলের ছেলেমেয়েরাও মৌমাছি পুষে মধু সংগ্রহ করছে। এতে ভয় পাবার মত কিছু নেই, নেই এতে আশ্চর্য হবার মতও কিছু। যদি তোমরা অবসর মত এদিকে একটু মনোযোগ দাও তাহলে দেখবে যে খেলা-ধূলার মতই এ-কাজেও আনন্দ পাবে প্রচুর। তোমরাও নিজেদের ইচ্ছামত হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে পারবে মৌমাছির চাক—মাছি সমেত। পাবে সুযোগ দেশের সম্পদ্ বাড়াবার, দিতে

পারবে খাঁটি মধু বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের। আরো হবে দেশের ও দশের সেবা। এই চিঠিতে সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা ক'রব।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন রকমের মৌমাছি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন,—(১) বাঘা মাছি বা ডাঁশ মাছি। ইংরাজীতে এদের 'রক্ বী' বলা হয়। এরা খোলা বা ফাঁকা জায়গাতে অথবা দালানের কোণে একটি মাত্র বড় চাক তৈরী করে। চাকটি আকৃতিতে প্রায় ৫।৬ ফুট লম্বা ও ২।৩ ফুট চওড়া। এরা দেখতে বেশ বড় এবং এদের মধু সংগ্রহ করবার ক্ষমতাও বেশী। কিন্তু এরা সহজেই রেগে যায়, কাছে গেলেই হুল ফোটাতে চায়। তাই এদের পোষ মানান এক রকম অসাধ্য বললেই চলে। অবশ্য এখন এদেরও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পোষ মানাবার চেষ্টা চলছে।

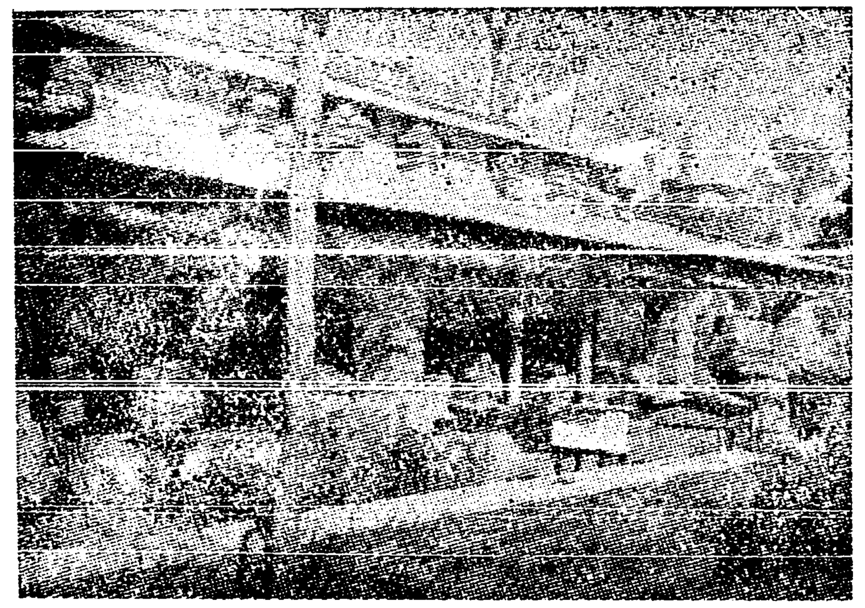

শ্রীরামকৃষ্ণধাম মৌমাছি পালন-কেন্দ্র, আলমোড়া

(২) আর এক রকমের মৌমাছি আছে যাদের বলা হয় ক্ষুদে-মৌমাছি। ইংরাজিতে বলে "লিট্ল্ বী"। এরা সাধারণতঃ ছোটখাট খোপের মধ্যে নিজেদের চাক তৈরী করে। কখনও কখনও বাঘা মৌমাছির মত খোলা জায়গাতেও এদের চাক তৈরী করতে দেখা যায়। এরা খুবই শান্ত প্রকৃতির। কাছে গেলে বাঘা মাছির মত সব সময়েই হুল ফোটাতে আসে না। এরা দেখতে যেমন ছোট, তেমনি মধু সংগ্রহ করবার ক্ষমতাও এদের অনেক কম। সেই জন্যই এদের বড় একটা কেউ পোষ মানাতে চায় না।

(৩) ভারতীয় মৌমাছি বা "ইণ্ডিয়ান বী" হ'ল আর এক রকমের মৌমাছি। স্থান বিশেষে এরা জাত মাছি নামেও পরিচিত। এদের আকৃতি মাঝারি রকমের। অর্থাৎ বাঘা মৌমাছির চেয়ে কিছু ছোট এবং ক্ষুদে মৌমাছির চেয়ে কিছু বড়। সাধারণতঃ পুরোন প্যাকিং বাক্স, গাছের গুঁড়ি, খালি জালা বা কলসী প্রভৃতির মধ্যেই এরা চাক তৈরী করে। অর্থাৎ এদের চাক তৈরী করবার জায়গা হ'ল বাঘা এবং ক্ষুদে মৌমাছিদের ঠিক বিপরীত। ওরা তৈরী করে খোলা জায়গায়,

আর এরা তৈরী করে কোন অবদ্ধ বা অন্ধকার স্থানে। এরা কিছুতেই খোলা জায়গায় নিজেদের চাক তৈরী করে না। ওদের তুলনায় এদের চাকের একটু বিশেষত্ব আছে। অন্য মৌমাছিদের মত মাত্র একটি চাক নিয়েই এরা সন্তুষ্ট থাকে না,—পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে ৬।৭খানি চাক তৈরী করে। যদিও বাঘা মৌমাছির তুলনায় এদের মধু সংগ্রহ করবার ক্ষমতা কিছু কম, তবুও এদেরই পালনযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। তার কারণ এদের স্বভাব উগ্র নয়। এদের চাক হ'তে বছরে প্রায় ২০।২৫ পাউণ্ড মধু পাওয়া যায়।

একজন শিক্ষার্থী মৌ-কলোনি পর্যবেক্ষণ করছে।

প্রকৃত পক্ষে মধু যে কি পদার্থ তা বোধ হয় তোমরা ঠিক জান না। একটা চলতি কথা আছে যে মৌমাছি ফুল হ'তে মধু সঞ্চয় ক'রে নিজেদের চাকে তা জমিয়ে রাখে। আসলে কিন্তু এর মধ্যে একটু তারতম্য আছে। মৌমাছি ফুল থেকে ফুলের রস চুষে নিয়ে তা নিজেদের পেটের থলিতে জমা করে। এইরূপ অবস্থায় রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে রসের কিছুটা জলীয় অংশ উবে গিয়ে সেটা মধুতে পরিণত হয়। তখন মৌমাছি নিজেদের চাকে তা উগরে দেয়। এরই নাম মধু। এ থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে একমাত্র মৌমাছি ভিন্ন আর কেউই মধু তৈরী করতে পারে না।

বহু প্রাচীন কাল হ'তেই আমাদের দেশে মধু ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে মধু দেবার একটা রীতি আছে। শবদেহ দাহ করবার পূর্বেও মুখে মধু দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমাদের জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ের সঙ্গেই মধুর সম্পর্ক জড়িত আছে। আয়ুর্বেদ এবং পৌরাণিক গ্রন্থে মধু ব্যবহারের অনেক প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায়। মধুই নাকি অমৃত! শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই মধু ব্যবহারের প্রচলন ছিল! প্রাচীন মিশরেও এক কালে এমন কোন ওষুধ ছিল না যার সঙ্গে মধুর ব্যবহার হ'ত না। প্রাচীন রোমেও মধু ব্যবহারের খুবই প্রচলন ছিল। সম্রাট্ নীরোর সময়ে মক্ষিকা পালন রোমের একটি প্রসিদ্ধ এবং উন্নত ধরণের ব্যবসা ছিল বলে জানা যায়।

মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ মধুর খুবই প্রশংসা করতেন বলে খ্যাতি আছে। মধু সকল ব্যাধির ওষুধ বলেও নাকি তিনি মন্তব্য করেছেন। বাইবেলেও মধুর অনেক উল্লেখ আছে।

চিকিৎসকদের মতে মধু খুবই শক্তিপ্রদ এবং বলকারক খাদ্য। মধুর প্রায় সকল অংশই দেহের মধ্যে প্রবেশ করে—একটুও নষ্ট হয় না। এর উপকারিতা সম্বন্ধে বলা হয় যে মধু অজীর্ণ বা অম্লরোগ, শ্লেষ্মা, সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস ও প্লুরিসি, হার্ট ও লিভার সংক্রান্ত ব্যাধি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি রোগের মহৌষধ এবং খাদ্যও। নিয়মিত মধু ব্যবহারে মানুষ বলবান্ ও তেজস্বী হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করে।

রাণী-মৌমাছিকে আঙ্গুল দিয়ে চিনিয়ে দেওয়া হচ্ছে

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আজকাল মধু আহরণের চেষ্টা চলছে। য়ুরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা অঞ্চলে মধুর চাষ একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসা বলে পরিগণিত হয়েছে। শুধু মধু ছাড়াও মোমাছি পোষায় আর একটি বিশেষ উপকারিতা আছে। মৌমাছি ফুল হ'তে ফুলে ঘুরে বেড়ায়, তার গায়ে লেগে যায় ফুলের রেণু। সেই রেণু গিয়ে মেলে অন্য ফুলে। এমনি করেই পরাগ বয়ে বেড়ায় মৌমাছি ফুল হ'তে ফুলে। ফলে গাছের হয় শ্রীবৃদ্ধি, ফল হয় উন্নত। আমাদের দেশ হ'ল কৃষি-প্রধান দেশ। কাজেই দেখা যায় যে মৌমাছি-পালক তাঁর নিজের জন্য মাছি পুষতে গিয়ে পরোক্ষে দেশের কাজই করছেন—বেশী করে শস্য উৎপাদনের সহায়তা ক'রে। কেবলমাত্র মধু সংগ্রহের জন্য না হলেও এই কারণেও মৌমাছির চাষ পাশ্চাত্য দেশে খুবই প্রসারতা লাভ করেছে। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে একমাত্র আমাদের দেশেই বছরে প্রায় আড়াই লক্ষ পাউণ্ড মধু তারা বিক্রীর জন্য পাঠাচ্ছে।

দুঃখের বিষয়, মধু এবং মৌমাছির এত গুণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এর আজকাল তত বেশী চলন নেই। যদিও পাশ্চাত্য দেশের হাওয়া এবং আলো আমাদের দেশে বর্তমানে কিছুটা এসে পৌঁছেছে কিন্তু তা এতই সামান্য যে তা না পৌঁছনোর মধ্যেই। সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান এবং আরো দু'-একটি স্থানে

এ কাজ সুরু হয়েছে বটে কিন্তু সংখ্যায় সেগুলি খুবই কম। বরঞ্চ এ বিষয়ে উত্তর প্রদেশ সরকারের দৃষ্টি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছে। হিমালয়-বুকে নৈনীতাল, আলমোড়া, গাড়োয়াল প্রভৃতি জেলাগুলিতে মধু চাষের জন্য সরকারী ভাতায় কতকগুলি প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। নৈনীতাল জেলার জেলীকোট নামক স্থানে শুধু সরকারী গবেষণাগারই নয়, একটি শিক্ষাকেন্দ্রও আছে। তা ছাড়া প্রাদেশিক প্রায় প্রত্যেক মেলা বা প্রদর্শনীতে এই কেন্দ্র হ'তে সরকারী খরচে মৌ-পালন সম্বন্ধে আবশ্যকীয় বিষয়বস্তুগুলি হাতে-কলমে কাজ করে দেখিয়ে দেওয়া হয় সকলের বোঝবার সুবিধা হবে ব'লে।

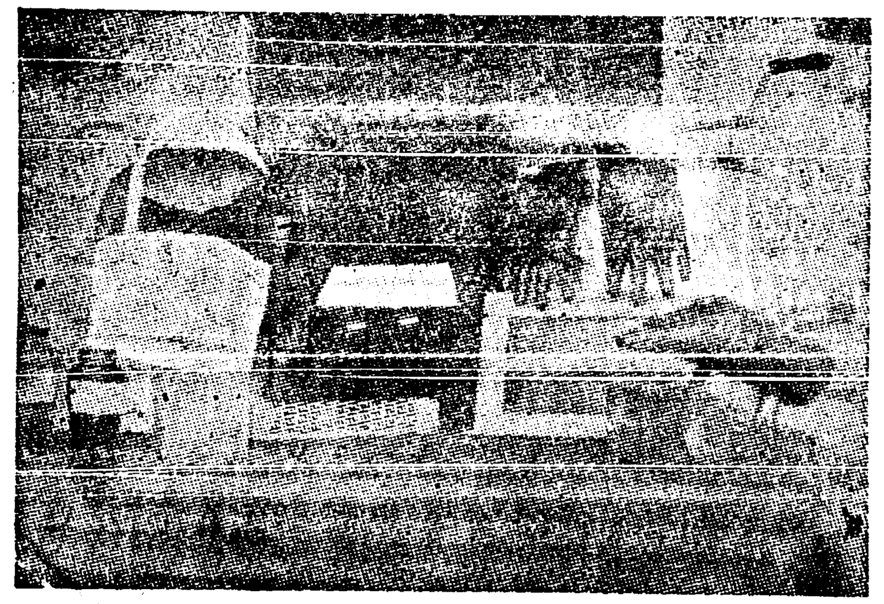

মৌমাছি পালনের যন্ত্রপাতি

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌ-পালন ব্যবস্থা যে কত সুন্দর এবং চিত্ত-বিনোদনকারী তা লিখে বোঝান সম্ভবপর নয়। হিমালয়-বুকে উত্তর প্রদেশের আলমোড়া পাহাড়ে "শ্রীরামকৃষ্ণ ধাম এপিয়ারী" এ-বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটী দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট স্বামী পরব্রহ্মানন্দ একজন বিখ্যাত মৌ-পালক। বর্তমানে এঁর আশ্রমে প্রায় শতাধিক মৌ-কলোনি আছে। বছরে প্রায় ৭।৮ শ' পাউণ্ড মধু এই কলোনি থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। আধুনিক পদ্ধতিতে এই মধু সংগ্রহ করার ফলে একটীও মৌমাছি কিংবা মৌমাছির ডিম এখানে নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় না মৌমাছির চাক। এই মধুর প্রায় সবটাই স্বামীজী দাতব্য করেন পরের সুবিধার জন্য—ঔষধ ও পথ্য হিসাবে ব্যবহার করতে। স্বামীজী প্রথমে একটি মাত্র কলোনি নিয়ে এ কাজ আরম্ভ করেছিলেন—কয়েক বছর পূর্বে। কাজেই আজ তাঁর এ প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। কত ছাত্র আসে তাঁর কাছে এই মৌ-পালন বিদ্যা শেখার জন্য। কতজনকে তিনি সাহায্য করেছেন মৌমাছি দিয়ে, রাণী দিয়ে, মৌমাছির চাক দিয়ে। তোমাদের মধ্যে যদি সত্যিই কেউ এ বিষয়ে উৎসুক হয়ে থাক, তাহ'লে স্বামীজীকে চিঠি লিখে অন্যান্য খবরাখবর জানতে পার। স্বামীজী সানন্দে তোমাদের চিঠির উত্তর দেবেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ এইখানেই চিঠি শেষ করলাম। মৌমাছির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আর একদিন তোমাদের ভাল করে বলব। ইতি—

পাটেল বৌ-এর দস্যি মেয়ে

শ্রীশামুক

চাকরিতে বদলি হয়ে বিষম বিপদে পড়লাম। বাংলা দেশ থেকে এত দূরে হনুমানের মত হুপ করে লাফিয়ে এসে দিশেহারা অবস্থা। সবই নতুন, সবই অন্য ধরণের। যাই হোক, সব প্রথম সমস্যা একটি বাড়ি খুঁজে বার করা। মাথা গোঁজবার স্থান চাই।

শিল্পপ্রধান ছোট ঘিঞ্জি শহর, যেখানেই সন্ধান করি—একই কথা—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী।' ঘুরতে ঘুরতে শহরের সীমায় নদীর ধারে এসে পৌছালাম। ভাঙা পাঁচীল-ঘেরা জরাজীর্ণ এক বাগান-বাড়ির সামনে এসে বড় ভাল লাগে।

পুরাকালে এর যে খুব ঠাট-ঠমক, জাঁক-জমক ছিল তার বহু নিশানা চোখে পড়ে কিন্তু বর্তমানে আগাছা ও জংগলে সে অতীত গৌরব বহু অংশে ঢেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। গাছের সারির মাঝে লুকিয়ে রঙ-চটা বড় বাড়িখানি আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে। এপাশে-ওপাশে কোণে কোণে ছোট ছোট অন্য বাড়িরও মাথা দেখা যায়। সত্যযুগে এরা হয়তো অতিথিশালা, অশ্ব বা হাতীশালা ছিল কিন্তু উপস্থিত বাসিন্দা কে বা কারা দূর থেকে আন্দাজ করা মুশকিল।

হাঁ করে দেখছি, মানুষের গলার আওয়াজে চমকে ফিরে দাঁড়াই।

—বাবুজী, কী খুঁজছেন?

দেখি এক আধাবয়সী মহিলা, কোলে কচি শিশু। আরেকটি তার বড় গুড়গুড়ে, মার হাত ধরে অন্য হাতে এক থলি ঝুলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

বাংলা দেশে আবরুর মধ্যে রাস্তাঘাটে আচমকা পিসিমার সংগে দেখা হলেও কেমন একটা সংকোচ লাগে, আর এখানে এই সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ এসে জিজ্ঞাসা করলো আমার চাই কি এবং তার ব্যবস্থাও করে দিল তখুনি। আশ্রয় মিললো।

পূব কোণের বাড়িটায় আমরা থাকি। ওপরের তলায় আমি আর নীচে পাটেল-বৌ সাত আটটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। দেবদারু ও ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে বড় বাড়িটি অতি সামান্য আবছা দেখা যায়। ভোরের সবুজ আলোতে মনে হয় তুষার-ঢাকা হিমালয়ের অংগ বিশেষ, আর গোধূলি বেলায় যেন সোনার পাত মোড়া বৌদ্ধমন্দির চারকোণা প্যাগোডা, থাকের পর থাক আকাশে গেছে উঠে।

পাটেল হঠাৎ এক একদিন বাড়ি আসে, ছেলেমেয়েদের হৈ-হল্লা থেকে তখুনি জানতে পারি। তার পর বেশ কিছুদিনের মত ডুব মেরে দেয়। ওর অনেক আবাদে জমি, তুলো আর তামাকের চাষ করে। মাটি থেকে সরু সরু ডাঁটার মত ওঠা সাদা ফুলঝুরি তুলোগাছের তলায়

বসে সূর্যের আলোয় তামাক পাতার রঙ বদলানো দেখে আর হিসেব করে কতদিনে অনেক টাকা জমবে আর সে একটি কাপড়ের কল কিনে চালাতে সুরু করবে। নদীর জলের ধারার মত মেশিন থেকে নানা রঙের কাপড় তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসবে আর সে সব যাবে দেশের চারিদিকে—বিদেশেও। মানুষটি বড় সরল। নিজের আশা-আকাংক্ষা—নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা কারুর কাছেই বলতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না।

পাটেল-বৌ সারাদিন চরকির মত কাজ করে। অতগুলি বাচ্চা সামলানোই এক বৃহৎ

জরাজীর্ণ বিরাট বাড়ি—আগাছা ও জংগলে ঘেরা।

ব্যাপার। তার ওপর বাজার, হাট, ডাক্তার, কুটুম্বিতা সবই আছে। ঘর-দোর পরিষ্কার ঝকঝক করছে। ছোটদের পোষাক-পরিচ্ছদেও মায়ের যত্ন স্পষ্ট দেখা যায়।

সকাল বেলা ফুরসৎ হয় না, তাই সন্ধ্যার পর খাওয়া সেরে নিয়েই পাঠশালা বসে। মা হয় গুরুমশাই। সুর করে এক দুই শেখানো—এই অল্পদিনেই আমারও মুখস্থ হয়ে গেছে। মা ভারী ক্লান্ত গলায় প্রথমে বলে ও পরে কচি গলার কোরাস একসংগে—

বে একড়া—এগিয়ার
একড়ে বগড়ে—বার
একড়ে তগড়ে—তের
একড়ে চগড়ে—চৌদ
একড়ে পাঁচড়ে—পন্‌দর

শেষে সুর টেনে ও হাঁফ ছেড়ে—বগড়ে অনে মিড়ে—বি—ই—শ।

মাঝ রাতে বৃষ্টি এল। জানালা দিয়ে জলের ফোঁটা গায়ে লাগতে ঘুম গেল ভেঙ্গে। উঠে বাগানের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠি। নারী-মূর্তি গাছের ঝোপঝাপের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে কি! মেয়ে চোর? না, ডাকিনী যোগিনী? কে—ও!

পাটেল-বৌএর গলা—আমার মেয়ে বাকুড়িকে খুঁজছি।

নেমে গিয়ে শুনলাম কি ব্যাপার। মেয়েটির ঐ এক প্রধান দস্যিপনা। রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে একলা বেরিয়ে যায়—ঘুরে বেড়ায় ঐ বন-জঙ্গলের ভেতর। পেত্নী নাকি কে জানে! বুঝিয়ে, মেরে-ধরে কোন ফল হয় নি। ঘরে চাবি দিয়ে শুলে ঘুমন্ত মায়ের আঁচল থেকে চাবি খুলে বেরিয়ে গেছে।

হাজার হোক, মায়ের প্রাণ ত', হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় নেই দেখলে একটু খুঁজে আসতে হয় বৈকি। বেশীর ভাগ মেয়ে নিজেই চুপিচুপি ফিরে এসে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে আবার। ও কখন যায় আর কখন আসে তার কোন ঠিকানা নেই। কেবল যেদিন বড় বাড়ির রাতের চৌকিদার মোহন সিং দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি করে সেদিন পালিয়ে আসে তাড়াতাড়ি।

কী ভয়ংকর ব্যাপার বল দেখি! একটা অপঘাত হতে কতক্ষণ?

বাকুড়ির বছর বারো বয়স হবে। পাতলা ছিপছিপে একগুঁয়ে ধরণের খেয়ালি মেয়ে। কখনও মিলে মিশে ভাইবোনদের সংগে অনেকক্ষণ খেলা করে, আবার কখনও হঠাৎ বেধড়ক মারপিট করে হরিণের মত দৌড়ে পালায়, হয়তো গাছের আগডালে উঠে পা ঝুলিয়ে বসে দোল খায়।

একবার ওকে গাছ থেকে নামাতে গিয়ে সে যা নাজেহাল! গাছে চড়ার অভ্যাস নেই, তার ওপর ওর মত স্প্রীংএর হাত-পা পাবো কোথায়? ও সর সর করে নাগালের বাইরে চলে গেল, আর আমি খানিকটা উঠেই পা পিছলে ধড়াস। ওরা আজও এই শহুরে মানুষের গাছে চড়ার দুর্ভোগ বর্ণনা করতে করতে হেসে বিষম খেয়ে যায়।

কিন্তু এ যে বড় ভীষণ কথা! এই রাতের আঁধারে একলা ঘুরে বেড়ানো! পাটেল-বৌ আমার জন্য এত করলো, ওর কোন বিপদ ঘটতে দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় না। বাকুড়িকে কত বোঝালাম। পৃথিবীতে যত রকমের ভয় আছে বা থাকতে পারে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বললাম, কিন্তু কিছুতেই নয় কিছু। ও যেমন ছিল তেমনি রইল। শেষে আমারও রোখ চেপে গেল ভীষণ। ঐ অতটুকু দস্যি মেয়ের কাছে হেরে যাবো?—না, কিছুতেই নয়।

জানালার কাছে চেয়ার নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। এই নিয়ে পর পর চারটি রাত। আগের তিন রাতে বাকুড়ি হয় বোরোয় নি বা কখন বেরিয়ে চুপিচুপি ফিরেছে কেউ জানে না।

অন্ধকারে বসে ঝিমুনি আসে, কিন্তু চমকে সজাগ হয়ে উঠি—কর্তব্য করা চাই। ঐ মেয়েকে ভূতের ভয় দেখিয়ে ওর মাথার ভূত তাড়াতেই হবে।

ওদের পাঠশালার কোরাস—বগড়ে একড়ে—একবিশ, বে বগড়ে—বাবিশ, বগড়ে তগড়ে

—তেবিশ—শুনতে শুনতে খেয়ে নিয়ে এই অদ্ভুত সাজ-পোষাক করে তৈরী হয়ে নিয়েছি। আর যেই ওদের আলো নিভলো আমিও চেয়ার টেনে বসে গেলাম। কিন্তু কতক্ষণ হয়ে গেল, আরো কত রাত এমনি বসে বসে—

পাতার খস্ খস্ আওয়াজে দেখি ঐ বেরিয়েছে ধিংগি মেয়ে। আয়নার সামনে গিয়ে সাবধানে টর্চের আলোতে শেষবার দেখে নি নিজের চেহারাটি। হ্যাঁ, খাসা মানিয়েছে বটে।

সমস্ত মুখ ঢাকা বিকট মুখোশ, চোখ দু'টি শুধু জ্বল জ্বল করছে। কালো চাদর কাঁধের ওপর থেকে পা পর্যন্ত ঝুলছে বোরখার মত— সেফ্‌টিপিন ভাল করে আঁটা, দৌড়ালেও খুলে যাবে না। পায়ে কালো মোজা ও রবারের জুতো।

বাগানে নেমে দেখি বাকুড়ি বেপরোয়া চলছে ঘাস ও আগাছা মাড়িয়ে। ধন্যি মেয়ে! ঐ থমথমে কালো রাতে গা ছমছম করছিল আমার, কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই কোন।

একবার গাছপালার আড়ালে কোথায় লুকিয়ে গেল। সন্ধান করে বার করতে আমাকে অনেকখানি ঘুরতে হ'ল অনেক বার হোঁচট খেয়ে। ঐ সময় মনে হ'ল যেন আমার পিছনে কার পায়ের শব্দ শুনলাম কয়েকবার—কিন্তু ঠাহর করেও দেখতে পেলাম না কারুকে।

কী অদ্ভুত আপন-ভোলা মেয়ে! দু'টো প্রকাণ্ড নিমগাছের মধ্যে এক ঝাড়ালো কেয়া-গাছের তলায় বসে খেলছে—কুড়ানো পাথরের টুকরো নিয়ে। কেয়া গাছ? এদের মধ্যেই ত' যাদের নাম রাতের বেলায় করতে নেই তারা থাকে না? দাঁড়াও, এবার দেখাচ্ছি মজা! এমন দেখাবো যে জীবনে ভুলতে পারবে না। আরো একটু এগিয়ে সামনা সামনি গিয়ে ভয়ংকর নাকীস্বরে আওয়াজ করতে যাবো—আর এ কী! আমায় লোহার মত জাপটে ধরলে কে? এবারে এল নাকি সত্যি আসল ভূত?

সমস্ত শরীরে ভয়ের এক দুর্দান্ত ভূমিকম্প বয়ে গেল। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল বিদঘুটে গলা-চাপা এক শব্দ। বাকুড়ি হাউমাউ করে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

মানুষের যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ চেষ্টা করে বাঁচবার। ভূত হোক, দানব হোক, মরিয়া হয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি স্বরু করি তার সংগে—যদি একবার ছাড়ান পাই ধৃতরাষ্ট্রের ঐ বজ্র-আলিংগন থেকে। শক্তিশালী হাতের বাঁধন খুলতে না পেরে কটাস করে কামড়ে দিলাম তার হাত।

সে যন্ত্রণায় চীৎকার করে আমায় ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে যেতে পা পিছলে পড়ে গেল মাটিতে। এই সুযোগে পা দু'টো আমাকে দৌড়ে পগার পার করে দিল।

মোহন সিংএর ডাকাডাকিতে অন্য লোকেরা এসে পরে বাকুড়িকে পাটেল-বৌএর কাছে পৌছে দিয়ে গেল। তখন ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে। হাত-কামড়ানো বদমাইসটার অনেক অনুসন্ধান ওরা করলো কিন্তু খুঁজে পেল না। বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করতে করতে শুনলাম সব কিছুই। উঠে জানলায় উঁকি মারবো সে সাহসও ছিল না।

নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করেছি আর কোন দিন ভূত সেজে কারুকে ভয় দেখাতে যাবো না। আর একটু হলে মারের চোটে আলু-ভাতে হয়ে যেতাম। মোহন সিং প্রথম দিকটায় ভয়

না পেলে সেদিন নিজের প্রাণ নিয়ে ফিরতাম কিনা সন্দেহ। আর, কি লজ্জার কথা বল দেখি—কি করে বোঝাতাম যে আমি ভাল করবার উদ্দেশ্যেই ঐ অদ্ভুত পন্থা নিয়েছিলাম?

মোহন সিংকে দু'টি টাকা বকশিস করেছি। বাকুড়ি আর রাতে বেরোয় না। বলে, মোহন সিংকে ভূতে কামড়ে দিয়ে গেছে; মূলোর মতন লম্বা লম্বা সেই ভূতের চক্‌চকে দাঁত নিজের চোখে দেখেছে ও।

কেবল হাসির দেশে

শ্রীপ্রভাত বসু

হারু—(একটানা সুরে ভ্যাঁ ভ্যাঁ ক'রে কাঁদ্‌ছে)

বলাই—কি রে হারু, ছিঁচকাঁদুনের মত ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে কাঁদছিস্ কেন?

হা—(কান্নার সুরে) অঙ্ক পারি নি বলে মাষ্টার মশাই আমাকে বেঞ্চির ওপর এক পা তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

ব—সে ত' ভালই রে! তোর পায়ের বেশ ব্যায়াম হয়ে গেল।

হা—তোমার ও রকম শাস্তি হ'লে বুঝতে! এঁ্যা, এঁ্যা, এঁ্যা…

[দূরে ঢোলের শব্দ]

ব—ওরে, ঐ ভ্যাখ্—ঢোল বাজিয়ে আমাদের দিকে কে যেন আস্‌ছে! চুপ্ কর, কাঁদিস নি।

ঢোলবাদক—(বাদ্যসহকারে ছড়া কাটিতে লাগিল)

শ্যামগরুড়ের দেশে —
যাও যদি ভাই কোনো কালে পার পাবে না হেসে।
চোখ রাঙিয়ে গুরু যখন ধম্‌কানি দেন্ জোরে
ছাত্ররা সব হাস্‌তে থাকে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে!
ধপাস্ ক'রে আছাড় খেয়ে খিলখিলিয়ে ওঠে—
শ্যামগরুড়ের দেশে আঘাত লাগেই না যে মোটে।
কাঁকড়া-বিছে কাম্‌ড়ে দিলেও ঠোঁটের কোণে হাঁসি
আজব দেশের লোকের মুখে সদাই ওঠে ভাসি'।

তোমরা যদি তাদের দেশে মুখ বেঁকিয়ে থাকো,
বল্‌বে তারা—'সামনে এদের আর্শি ধরে রাখো!'
প্যাঁচার মত সে মুখ দেখে তোমার হাসি পাবে—
ফিক্‌ফিকিয়ে উঠবে হেসে, কান্না দূরে যাবে!
শ্যামগরুড়ের ছানারা সব তুল্‌বে অট্টরোল,
হাসির দেশে হেসে হেসে পেটটি হবে ঢোল।

ব যাবি নাকি হারু, ওদের দেশে? মারলেও গায়ে লাগে না, ভারী মজার ত'!

হা—আমারও ভাই যেতে ইচ্ছে করচে।···ও ঢোলওয়ালা, তোমাদের দেশ কত দূরে?

ঢো—এই ত' কাছেই। যাবে নাকি খোকারা? তবে সেখানে গিয়ে কাঁদতে পাবে না। একটু মুখ ভার করেছ কি, অম্‌নি সেখানকার পুলিশরা হাসির গ্যাস ছেড়ে দেবে!

ব—আচ্ছা, শ্যামগরুড়ের দেশের রাজা কে?

ঢো—কেন,—সম্রাট্ কাতুকুতু সিংহ হাস্যচক্রবর্তী!

ব ও হা—বাঃ, বেশ মজার নামটি ত'!

ঢো—যাবে ত' চল তোমরা। আমার আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে। হুতোম প্যাঁচাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজার দরবারে হাজির করতে হবে।···ঐ দেখ গাছের ওপর চোখ ছু'টি বুজে গম্ভীর মুখে বসে আছে! [প্যাঁচার ডাক]

প্যাঁচা—চক্ষু বুঁজে থাক্‌ব বসে তোদের হাসি দেখব না—
মরে গেলেও বোকার মত হাসির দায়ে ঠেকব না!

ঢো—(অট্টহাস্য করে)
সবাই মিলে প্যাঁচারে ভাই পাঠাও এবার রাঁচি,
ছুই নাকেতে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে দেবে হাঁচি।
তার পরেতে খুলবে মাথা, বুঝবে হাসির দাম—
পাঁচের মত মুখ দিয়ে তার ঝরবে হাসির ঘাম!

ধর্ ধর্—ঐ ওড়বার চেষ্টা করছে।···এইবার ধরেছি। চলো বাপু, আমাদের দেশে—দেখি কেমন না হেসে থাকতে পারো। ছেলেরা, তোমরাও আমার পিছু পিছু এসো! (ঢোলবাদ্য) [একটু পরে অনেক লোকের হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল] এই

যে এসে গেছি শ্যামগরুড়ের দেশে। ঐ দেখ—হাসির দেশের ফিরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে।

ফিরিওয়ালা—(ঝুম্‌ঝুমি বাজিয়ে)
আমার ঠোঙায় আছে রে ভাই, হাসির নকলদানা,
টাটকা তাজা হাসবে হাসি খেলেই হাসির খানা!
পয়সা না থাক্ নাও না হাতে, ফিক্ ক'রে দাও হেসে,
বিলিয়ে দেব হাসির দানা সবায় ভালবেসে।

হা—ও ফিরিওয়ালা, আমাকে চারটি নকলদানা দেবে? আমার কাছে পয়সা নেই কিন্তু!

ফি—নিশ্চয়ই। তোমার মত কাঁছনে ছেলেদের জন্যই ত' আমি হাসির নকলদানা ফিরি করছি। এই নাও—ছু'টি গালে ফেলে দাও দেখি!

হা—(খেয়ে ফিক্ ফিক্, খিল্ খিল্—শেষে হো হো করে হাস্‌তে লাগ্‌ল।)

ব—কি হ'ল রে হারু? হাস্‌তে হাসতে শেষকালে তুই পেট ফেটে মারা যাবি নাকি? দে ত' আমায় চারটি, খেয়ে দেখি! (তারও অট্টহাস্য)

ঢো—আরে থামো, থামো,—তোমরা দেখচি হাস্‌তে হাস্‌তে পাগল হয়ে যাবে। ঐ দেখ—পুলিশরা কাদের হাসির দড়ি দিয়ে বেঁধে আন্‌চে!

পুলিশ— হাস্‌তে গিয়ে উঠ্‌চে কাশি, হাঁচছে শত লোক,
রামগরুড়ের ছানারা সব করছে মহাশোক।
সবাই যদি হাস্‌তে থাকে তাদের হবে কি?
করুণ সুরে বলছে তারা,—"আমরা কেঁদেছি।"
ভাবছি এবার ছাড়ব সেথা হাসির এটম্ বম্,
সেই বারুদের গন্ধ পেলে কাঁদবে তারা কম।

হা—ও ঢোলওয়ালা, বাবাকে ব'লে তোমাদের দেশের ইস্কুলেই আমি ভর্তি হব; কোনোদিন আর কাঁদতে হবে না তাহলে!

ঢো— পাঠশালাতে পণ্ডিতে কয় হাসির মানে 'হাস্য',
হাসিবিহীন দেশ যে আছে সেটাই অবিশ্বাস্য।
গাধাও হাসে, ঘোড়াও হাসে, হাসে চড়াই পাখী,
ব্যা-ব্যা রবে ছাগল হাসে-হাস্‌তে কে আর বাকী?

[নেপথ্যে রামশিঙা ও জগঝম্পের শব্দ]

ঐ রাজা বেরিয়েছেন নগর পরিভ্রমণ করতে। কেউ যেন মুখ বেঁকিয়ে থেকো

না। আরে, দেখো দেখো—প্যাঁচার মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে! শোনো, সম্রাট্ শ্রীকাতুকুতু সিংহ হাস্যচক্রবর্তী, পরিহাসবিশারদ, রহস্যার্ণব কি বল্‌ছেন—

সম্রাট্— পড়াশোনা করো আর খাওদাও হাসো—
হাসি দিয়ে জগতের দুঃখেরে নাশো!!

(চতুর্দ্দিকে হাসির আওয়াজ)

লাঙ্গুল-সংবাদ

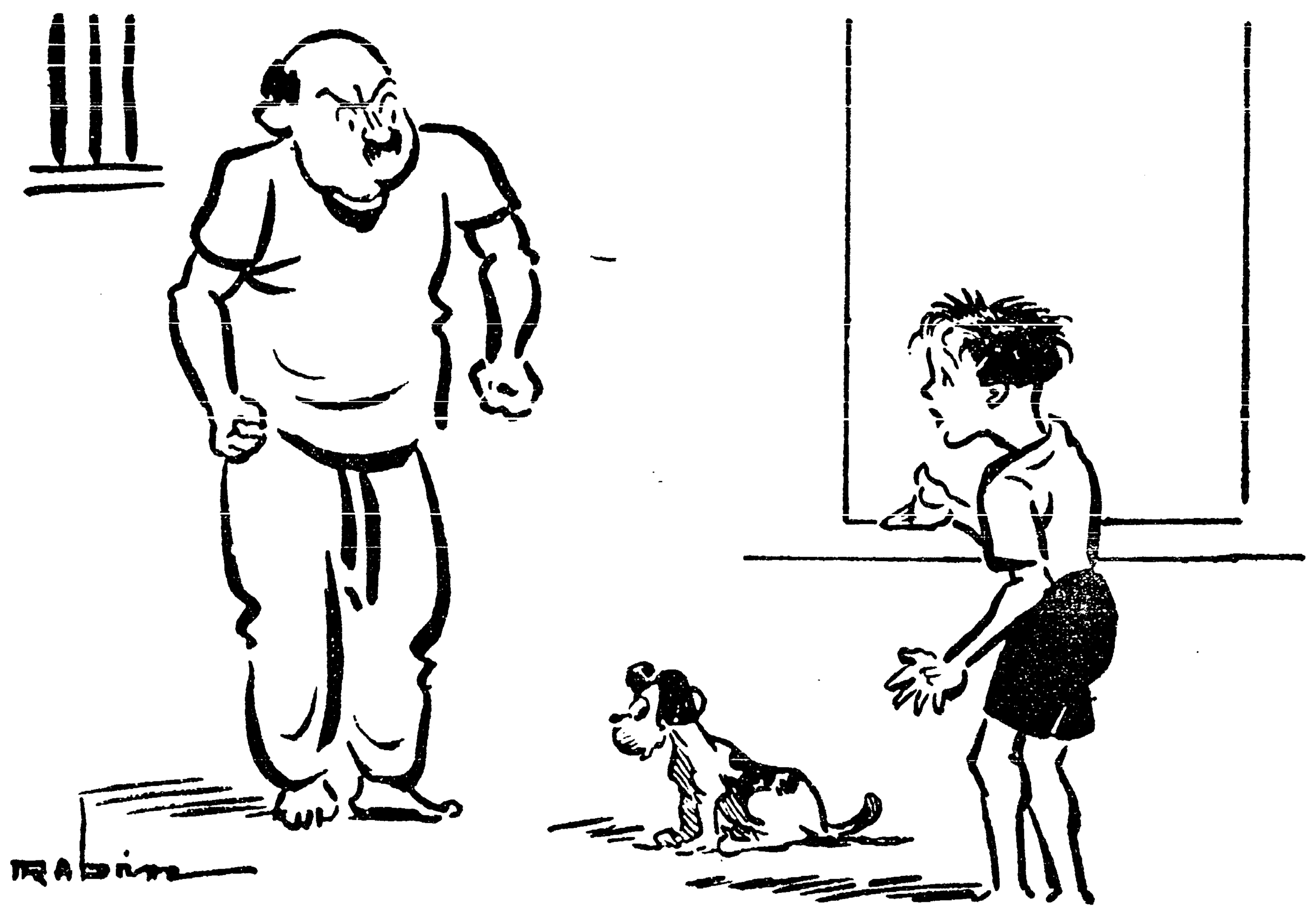

"ফের কুকুরের ল্যাজ ধ'রে টানাটানি করছিস্!"
"বাঃ রে! আমি তো মাত্র ল্যাজটা ধরেছিলুম,—কুকুরটাই টানাটানি করছিল!......"

—শিল্পী শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

জগন্মাতা

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বিশ্বের জননী তুমি,
কেবা বলে বিভক্ত বঙ্গের?
যা কিছু সুষমা-ছটা
বিচ্ছুরিত তোমারি অঙ্গের।

করাচীর সিন্ধুতীরে, মাদ্রাজের
সৈকত বেলায়,
তোমারি করুণারাজি
স্নিগ্ধ করে আর্ত্তের ব্যথায়।

দশ হাতে অস্ত্র তব
শাসিবারে দুর্ব্বার সন্তানে,
সদা সচেতন তুমি,
নাহি তুষ্টি অলস শয়ানে।

কেন যে কাশ্মীর-পৃষ্ঠে,
কোরিয়ার শৈলশৃঙ্গোপর
গরজে না সিংহ তব
না পারি বুঝিতে, ক্ষুদ্র নর!

সন্তানে সন্তানে করি
সম্প্রীতির শুভ সম্মেলন
কর সৃষ্টি, মাতঃ, তুমি
বসুধায় নন্দনকানন।

জননী এসেছে দ্বারে

শ্রীনবগোপাল সিংহ

মন্থরগতি স্বচ্ছ নদীর সোনালী স্রোতে,
শুভ্র মেঘের পাল তুলি ঐ আকাশপথে,
উদয়-রবির স্বর্ণকিরণে সে অবগাহি
সুরলোক হ'তে দেবীর তরণী এসেছে বাহি।

কানন চমরী চামর ঢুলায় কাশের ফুলে,
শ্যামল পত্রে সহকারে শত কেতন তুলে।
অঙ্গে সুনীল অপরাজিতার বসন প'রে
শারদ দুহিতা হিমদুহিতায় বরণ করে।

ধরিতে মায়ের কোমল চরণ কমল ফোটে,
বনকেতকীর স্ফুরিত অধরে সুরভি ছোটে।
রামধনুকের সাতটি বরণ হরণ করি
আলিম্পনের স্বপ্ন জাগায় আকাশ-পরী।

শুভ্র বলাকা মালা গাঁথে ঐ নীলাম্বরে,
বন নহবতে দোয়েল পাপিয়া শানাই ধরে।
শারদসভায় পূজিতে মায়ের চরণ দু'টি
বন অঙ্গনে শত শেফালীর কি লুটোপুটি!

এসেছে জননী, অন্নপূর্ণা মোদের ঘরে,
শূন্য ভবন অন্নে নে আজ পূর্ণ ক'রে।
দশ প্রহরণে সজ্জিত ওরে যে দশভূজা
অশ্রু অর্ঘ্যে হয় কিরে কভু তাহার পূজা?

শরতের হাঁস

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

শরতের হাঁস ওড়ে আকাশের গায়,
রামধনুকের দেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।
রোদ্দুর ঝিক্‌মিক
পাখা করে চিক্‌মিক্,
লঘু বায়ে ওড়ে যেন সাদা সাদা কাশ।
শরতের হাঁস।

ঐ বুঝি পার হ'ল চূর্ণীর বাঁক,
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঝাঁক।
দেখা যায় যদ্দূর
ওঠে পৎ পৎ সুর—
সবাকার চোখে-মুখে জাগে উল্লাস।
শরতের হাঁস।

ওড়ে হাঁস, ওড়ে ঐ তূলোপারা মেঘ,
কিশলয়ে জাগে কোন্ খুসীর আবেগ।
বট-ছায়ে রাখালের
মেঠো বাঁশী বাজে ফের,
হেসে ওঠে বন-পথে শিউলির রাশ।
শরতের হাঁস।

মিশে গেল হাঁসগুলো শূন্যের মাঝ,
কোন্ ঠিকানায় যাবে, কত দূরে আজ?
চেয়ে চেয়ে চোখে মোর
জাগে স্বপনের ঘোর,
ঐ সাথে উড়ে যেতে মনে বড় আশ।
শরতের হাঁস।

জলশূর ব্রাহ্মণ

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

রাজপুতানার শীত জানো তুমি?
কন্‌কন্ কন্‌কন্!
সেই শীতে রাজা দক্ষিণা দিতে
ডাকিলেন ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণদল সমবেত যেথা,
লোভে লোভে সেইখানে
এক ঢুলি এসে ব্রাহ্মণবেশে
ঢুকে পড়ে সাবধানে।
সন্দেহ হয় মন্ত্রীর, তাই
ডেকে ডেকে তিনি কন্—
'রণশূর হল ছত্রীরা, আর
জলশূর ব্রাহ্মণ।
ক্ষত্রিয় নয় যুদ্ধে ভীত ও
ব্রাহ্মণ নয় জলে,
রাজস্থানের গ্রামে ও নগরে
এ কথা সবাই বলে।
তাই বলি, আগে স্নান ক'রে নিন,
পরে সভাতলে এসে
দশ মোহরের দক্ষিণা নিয়ে
যান নিজেদের দেশে।'

কন্‌কনে শীত, কুয়াসা গভীর
রৌদ্রের লেশ নাই;
ব্রাহ্মণ যত স্নান ক'রে নেন
যথা অভ্যাস, তাই।
ঢুলি তার গায়ে সারা শীতকাল
জল ঢালে নাকো মোটে,
প্রাণ বাঁচাইতে সভাতল ছেড়ে
পন্‌পন্ ক'রে ছোটে।
কন্‌কনে শীত তবু ত' কমে না,
দেখে, কেবা ছোটে পাছে।
সত্য ঘটনা—শুনি বিকানীর-
বাসী বন্ধুর কাছে॥

বীজ

শ্রীরেণুকা দেবী

কলকাতা সহরের দোকানে দেকানে, ফুটপাথে, অলিতে-গলিতে ফাউনটেন পেন সাজানো। পঞ্চাশ থেকে পাঁচসিকে দামের হোক না, তবু তো দেখা যায়, চোখে পড়ে সকলের! আছেও বোধ হয় প্রায় সব ছেলেরই একটা করে, তা যে দামেরই হোক! কিন্তু ছোট সহরে এখনও এটা একটা দামী ও সমীহ করবার বস্তু এবং ছেলেদের কাছে বিস্ময়ের দ্রব্য।

সেদিন ইস্কুলের টিফিন হবার সঙ্গে সঙ্গে অমলের চারধারে একদল ছেলে, অবশ্য ওরই এক ক্লাশে পড়ে তারা,—সবাই ওর বন্ধু, ওকে ঘিরে ধরেছে। অমলের হাতে একটা ফাউনটেন পেন, আর সবাই 'আমাকে দে ত' দেখি,' বলে ব্যস্ত করছে। ক্রমশঃ সেটা অমলের হাত থেকে চলে আসে বন্ধুদের হাতে, আর ঘুরতে থাকে হাতে হাতে। হাত বদল হয়ে যখন সেটা সমীরের হাতে এসে পৌঁছুল তখন তার ভাগ্যদোষেই হোক, আর এই দুর্ল্ভ সামগ্রী হাতে নেবার ব্যস্ততার জন্যেই হোক, সেটা তার হাত থেকে পড়ে গেল স্কুল-বারান্দার নীচে রাবিশ-পেটান শক্ত জায়গাটার উপরে। নিবটা একেবারেই ভেঙ্গে গিয়েছে। কলমটার চেহারা দেখে অমলের চোখে জল, আর সব ছেলেদের মুখে হায় হায় রব, আর সমীর তো হতভম্ব। একটু পরেই এ ভাবটা কেটে যায়, আরম্ভ হয় বচসা, বিচার। কেউ অমলের পক্ষে, কেউ আবার সমীরের পক্ষও নেয়। অমলের পক্ষেই বেশী। আর কি-ই বা বলবার আছে সমীরের? যদিও সত্যিই সে ইচ্ছা করে ফেলে নি, তবু তার নিজেরই তো কষ্ট হচ্ছে, আর অমলের তো হবেই! তার উপর এ কলমটা ওর মাসীমার দেওয়া। অমলের মাসিমা থাকেন সুদূর বোম্বাইতে; এবার বাংলা দেশে ফিরে, দিদির সঙ্গে দেখা করতে এসে, সেটা অমলকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন।

এই কলমের ব্যাপারটা এমন হয় যে সেদিন টিফিনের শেষে ঘণ্টা পড়লেও

ক্লাশ এইটের ছেলেদের আর ক্লাশ করা হয় না। এই ঘণ্টার মাষ্টার মশাই সুরেন বাবু আসতেই একজন বলে ওঠে, "স্যর, সমীর অমলের ফাউটেন পেনটা ভেঙ্গে দিয়েছে"।

মুখ বিকৃত করে তিনি বলেন, "ফাউনটেন পেন!"

"হ্যাঁ স্যর, এই দেখুন।"

সত্যিই একটা ফাউনটেন পেন দেখে তিনি একটু আশ্বস্ত হন, বলেন, "দেখি?" তারপর সমীরকে ডেকেই বলেন, "হাত পাত।"

সমীর আমতা আমতা করে বলতে যায়, "না স্যর, আমি ইচ্ছে করে—" মুখের কথা মুখেই থেকে যায়,—"হাত পাত, ইচ্ছে করে করি নি!...দেখতে গিয়ে? ...দেখতে যাবার কি দরকার ছিল?"

টীচার্স্ রুমে...

বেশ ঘা কতক বেত খেয়ে আহত, দুঃখিত মলিন মুখে সমীর বেঞ্চিতে ফিরে যায়।

কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ হ'ল না। কয়েকজন ছেলে মিলে জটলা করে কথাটা হেড মাষ্টারের কানে তুলল। তিনি টীচার্স্ রুমে সমীরকে ডেকে পাঠান। সমীর নত মুখে এসে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বলে, "সত্যি স্যর, আমি ইচ্ছে করে ফেলি নি।"

সুরেন বাবু বলে ওঠেন, "ইচ্ছে করে করি নি? দেখবার কি দরকার ছিল? খাবার জিনিষ তো নয়!"

হেড মাষ্টার মশায় ছিলেন অভিজ্ঞ, হৃদয়বান্ লোক। তিনি বোঝেন,

খাবার জিনিষের লোভ ও ক্ষুধা ছাড়াও আরো একটা ক্ষুধা মানুষের আছে, সে হচ্ছে দৃষ্টিক্ষুধা। এ ছাড়া কিশোর-মনে কৌতূহল এবং আগ্রহও আছে। অমলের দুঃখও তিনি বোঝেন; তাই তিনি বলেন, "জিনিসটা যখন তোমার হাত থেকেই ভেঙ্গেছে, আর ওর মাসীমার দেওয়া জিনিস, ওর দামটা তোমারই দেওয়া উচিত।" অকারণে এই ছেলেটিকে প্রহার করা দেখে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

অমলের কলমটা ভেঙ্গে যাওয়ায় সমীরের নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল। তাই হেড মাষ্টার মশায়ের কথায় হাসিমুখেই সে রাজি হয়ে গেল। ছুটীর শেষে, ছেলেরা সবাই মিলে এখানকার সব চেয়ে বড় মনিহারী দোকানে গিয়ে দামটা জানতে চাইলো। দোকানী বল্লে, শুধু নিব বদলালেই হবে, এক টাকা লাগবে। ওর কাছে নেই, তবে আনিয়ে দেবে। এই নিবই পাবে, পরশু বিকেলে এলে।

সমীর বাড়ী এসে মার কাছে ঘটনাটা বলতেই তিনি মারমুখী হয়ে উঠলেন।—"আমার হাত থেকে ভেঙ্গেছে? কেন দেখতে গিয়েছিলে? আবার বুক ফুলিয়ে বলা হয়েছে দাম দেব! দাম কোত্থেকে দেবে শুনি? উনিই যেন রোজগার করেন!"

সমীর ভয়ে ভয়ে বলে, "আমি দেবো বলি নি আগে, হেড মাষ্টার মশাই ...."

কর্কশস্বরে মা বলে ওঠেন, "হেড মাষ্টারের কানে তোলবার কি দরকার ছিল? বল্লেই হ'ত হঠাৎ পড়ে গিয়েছে, আমি কি করব! হেড মাষ্টারকে কেন বল্লে না আমি কি করে দেবো, আমি কি রোজগার করি?"

হৈ-চৈ শুনে সমীরের বড়দা' এসে আবার সব শোনেন। তারপর ওর গালে একটা চড় মেরে, সজোরে কানটা মলে দিয়ে বলেন, "সব মিথ্যে কথা, ওই পয়সা দিয়ে খ্যাঁট মারা হবে, নয়? আর ভেঙ্গেই যদি গিয়ে থাকে, আবার সাধু সেজে দাম দেবো বলা হয়েছে কেন?"

লাঞ্ছিত, অপমানিত সমীর নত মুখে চলে যায়।

পরদিন স্কুলে যাবার সময়ে কুণ্ঠিত হয়ে সমীর মার কাছে দামটা চায়। উচ্চকণ্ঠে মা বলেন, "সত্যি সত্যি দাম দিতে হবে নাকি?"

সমীর বলে, "ভেঙ্গেছে তো আমার হাত থেকেই!"

মা বলেন, "পয়সা খোলামকুচি, না?—তবু তো এখনো তোর বাবা শোনেন নি।"

সমীর আবার চায়। মা বলে ওঠেন, "টাকার গাছ নিয়ে আমি বসে রইছি, না? যাও—যাও এখান থেকে।"

সমীর চলে যায়, বাড়ী ফেরার সময়ে ওর কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসে। একটা ক্ষীণ আশা—এদের সামনে অন্ততঃ দামটা তিনি দিয়ে দেবেন।

সমীরের বাবা সব শুনে খুব রেগে উঠলেন। প্রথমে বকুনি, তারপর প্রহার আরম্ভ করলেন, ওর বন্ধুদের সামনেই। অনেক শেষে ক্ষান্ত হয়ে, একটা টাকা সমীরের হাতে দিয়ে বল্লেন, "যাও, দিয়ে এস; আর কোন দিন যদি এ রকম বাঁদরামী, ও পয়সা দেবার চাল মারা শুনি তো পিঠের ছাল তুলে দেবো।" পিতার ব্যবহারে লজ্জায় মুখ কালো করে বাইরে এসেই সমীর দেখতে পেল, এই সব মারধোর দেখে সবাই পালিয়েছে। সে তখন টাকাটা নিয়ে অমলদের বাড়ী গেল।

অমলও ভয়ে ভয়ে কথাটা বাড়ীতে বলে নি, ভেবেছিল নিবটা লাগিয়ে নিলেই কেউ জানতে পারবে না। সমীর যখন গেল অমল তখন বাড়ী ছিল না, সেই জন্যে অমলের মার কাছেই সে টাকাটা দিতে যায়। অমলের বাবাও বাড়ী ছিলেন, তিনি সমীরকে ডেকে সব ব্যাপারটা শোনেন। ইতিমধ্যে অমল এসে পড়ে। অমলের মা অমলকে খুব বকেন, "ছিঃ, দৈবাৎ বন্ধুর হাত থেকে ভেঙ্গে গিয়েছে বলেই কি তার কাছ থেকে দাম নিতে হয়!"

অমল লজ্জিত হয়ে বলে, "আমি চাই নি, সবাই বল্ল, আর ও নিজেও দিতে চাইলো।"

মা বল্লেন, "তা হোক, তুমিও তো বাড়ী এসে কিছু বলো নি!"

অমল বলে, "এক টাকা দাম যে!"

"তা হোক, যে করেই হোক তোমাকে দিতাম আমরা।"

অমলের বাবা বলেন, "শোন অমল, গরীব হলেও নীচ হতে নেই।" সমীরকে বলেন, "না বাবা,—তোমার টাকা আমরা নিতে পারবো না। আমরা জানি তুমি ইচ্ছে করে ভাঙ্গো নি।"

টাকাটা হাতে করে সমীর বাড়ী আসে। টাকাটা ফেরত দেবার কথা মনে হতেই ওর মনটা হিংস্র হয়ে ওঠে, মনে পড়ে যায় এই একটা টাকার জন্যে কত লাঞ্ছনা! অথচ তাদের অবস্থা অমলদের চেয়ে অনেক ভাল। ওর বাবা সামান্য উকিলের মুহুরী মাত্র। মনে পড়ে যায় মার কৌটো কৌটো জর্দ্দার কথা, দাদার সিনেমা দেখা, বাবার সিগারেট ও মাছ ধরার সরঞ্জাম তার জন্যে টাকা খরচের

কথা। তাঁদের সমস্ত অপব্যয়ের যতটা ওর চোখে পড়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অথচ সামান্য দু'-এক পয়সাও সে পায় না। "ইয়ো ইয়ো" লাট্টু কিনতে চাওয়ায় সাড়ে ছ'আনা পয়সার জন্যে বাবার হাতের চড়টা সে আবার নতুন করে অনুভব করলো। তারপর একটাকার নোটের কাগজটার দিকে তাকালো। শেষে নিজের গায়ের প্রহারের চিহ্নগুলির দিকে একবার তাকিয়ে একটু হাসলো, আর টাকাটা লুকিয়ে রাখলো ওর নিজের একটা মোটা খাতার মধ্যে।

আজকাল সমীরের কাছে সব সময়ে পয়সা থাকে। একে দু' পয়সার চীনে বাদাম, ওকে চার পয়সার আইসক্রীম সে খাওয়ায়। এমন কি ছ' আনার টিকিটে সিনেমা পর্য্যন্ত সে দেখাতে পারে। এ পয়সা সে সংগ্রহ করে বাবার পকেট থেকে, দাদার ব্যাগ থেকে, মা ঘুমোলে চাবী খুলে তাঁর বাক্স থেকে।

তার ছোট্ট মনে অজ্ঞাতে যে বিষ-বৃক্ষের বীজ রোপন করা হয়েছে তার শিকড় ক্রমেই বেড়ে চলে, গজিয়ে ওঠে ডালপালা। কে তাকে রোধ করবে?

পিঠে-ইতিহাস

শ্রীকাত্তিক মজুমদার

সন্তোষ নেমন্তন্ন করেছে একেবারে গোটা মেসশুদ্ধকে। তারই নতুন বাড়ীতে তক্তপোষে কেউ চিৎপটাং হয়ে, কেউ বা কাৎ হয়ে পৌষপার্ব্বণের দিনে চা আর পিঠে মারছি, একেবারে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। মেসের মরা গরুরা সব ঘাসে পড়েছি, কারো মুখ দিয়ে কোনো না না নেই। কিন্তু তাতেও সন্তোষের কোনো অসন্তোষের লক্ষণ নেই। বাড়ী তার ফরিদপুর, ও দেশের পিঠের নাম রাখবার জন্যে ও কোনো ত্রুটিই রাখে নি। তিন-চার রকমের পিঠে আসছে, আমরা মুহূর্ত্তে তা নস্যাৎ করছি। আমাদের মধ্যে আবার ডান হাতের খেলার মাষ্টার হলেন বিলু বাবু। নীরবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন, কোনো কথা নেই, কোনো শব্দ নেই।

তিন-চার রকমের পিঠের পরে এল আসকে পিঠে। সন্তোষ বল্‌ল, আমাদের দেশে একে বলে চিতই পিঠে, মোছা মোছা করে ঝোলা গুড় দিয়ে খেতে হয়।

এতক্ষণ ক্ষীরের পুলির পর কিনা এই আসকে পিঠে! সবাই একটু মন-মরা হ'ল, তবু তাতে হাত লাগাল। কিন্তু বিলু বাবু আচমকা তাঁর ভাঙ্গা মোটা গলায় বলে বসলেন, আমি ও পিঠে খাব না। আমাকে বরঞ্চ একবাটি ক্ষীরের পুলি দাও ওর বদলে।

সে কি! একটু চেখে দেখুন না; শক্ত হলে কি হয়, খেতে খুব ভাল। আপনি বুঝি ভালবাসেন না ও পিঠে?

ভালবাসি না নয়, ভালবাসি বলেই খাব না। বিলু বাবু বাটিতে আঙ্গুল রাখলেন। আমি ঐ তোমাদের চিতই পিঠের কাছে কৃতজ্ঞ, ওর জন্যেই ত জীবন ফিরে পেয়েছি। আর তাই ত' আজ তোমাদের সঙ্গে বসে পৌষ মাস করতে পারছি। নয় ত' এতক্ষণে আমি কোথায়?

কে একজন টিপ্পনি কাটল, সাহারার মরুভূমিতে।

বিলু বাবু গম্ভীর মুখে বললেন, সাহারার নয়, রাজপুতানার মরুভূমিতে।

ঘরভর্ত্তি লোক এ ওর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। রণেন বলল, কই, বলেন নি ত' কোনো দিন সে কথা আমাদের! এদ্দিন একসঙ্গে রইলাম, এত আড্ডা মারি অতচ—'

বিলু বাবু বললেন, এই চিতই পিঠে দেখে সে কথা মনে পড়ল আজকে। আর তা ছাড়া সব কথাই কি তোমাদের বলতে হবে বলে দিব্যি দেওয়া আছে নাকি?

কিন্তু সন্তোষ ছাড়ল না, প্রায় মাথার দিব্যি দেবার মতই ও চেপে ধরল, বলতেই হবে ঐ চিতই পিঠের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী।—পিঠের কাছে সেই কৃতজ্ঞতার কথা।

দু' দুটো বাটি তিন খাবলে শেষ করলেন বিলু বাবু, তারপর সন্তোষের পকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলেন, ইণ্ডিয়ায় প্লেন ক্র্যাশ বছরে ক'বার হয় কেউ বলতে পার?

প্রায় গোটা পঁয়তাল্লিশ।—কে যেন উত্তর করল।

গেল বছরের আগের বছর হয়েছিল সাতষট্টিটা, আর তার একটায় আমি ছিলাম। প্রাণে যে বাঁচতে পেরেছিলাম তা, ঠিক ভগবান্ বলব না, এই চিতই পিঠের কাছে। বিলু বাবু সোজা হয়ে বসলেন।

গেল বছরের আগের বছর, ঠিক এমনি সময়েই অফিসের কাজে আমাকে পাঠানো হ'ল,—কিছু মালপত্তর বিকানীরে ডেলিভারি দিতে হবে। প্লেনে করে যাব, চারদিনেই কাজ মিটিয়ে চলে আসব। অফিসের খুব জরুরি কাজ, কাজেই আমাকে যেতেই হবে, কোনো উপায় নেই। তবু মনকে সান্ত্বনা দিলাম—এরোপ্লেনে যাব, অনেক হুজ্জতি বেঁচে যাবে। ট্রেনে গেলে আর বাঁচার উপায় থাকত না।

যাবার সময় পিসিমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, বছরকার দিনে যাচ্ছিস, কিছু পিঠে নিয়ে যা। তোর জন্যে বানিয়েছি, এরোপ্লেনে বসে বসে খাবি।

পিঠের বহর দেখে ঘাবড়ে গেলাম, বললাম, পিসিমা, এ নিয়ে উঠলে যে আলাদা ভাড়া লেগে যাবে! করেছ কি তুমি?

পিসিমা খেঁকিয়ে উঠলেন, লাগে ত লাগুক। তাই বলে কি তোর জন্যে করা পিঠেগুলো

ও পাড়ার হাবু চাঁড়াল খাবে? সব সময় পিঠের পুঁটলিটা কাছে কাছে রাখবি, নয়ত' আর কেউ শেষ করে দেবে।

পিসিমাকে হটান যাবে না। ঐ পিঠের পুঁটলি সমেত উঠলাম প্লেনে। প্লেন ছাড়ল; বেশ আরামেই কাটল সারাদিন। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি, সবার মুখ শাদা। এ ছুটোছুটি করছে, ও চীৎকার করছে। তারপরে কয়েক মিনিট বাদেই বিকট আওয়াজ করে আমাদের প্লেন পাক খেয়ে নীচে পড়তে লাগল। বিরাট একটা শব্দ—তারপরে আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হতে দেখি সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা, একটা বালির ঢিবির উপর আমি উবুড় হয়ে পড়ে আছি। সমস্ত জামাটা ছেঁড়া, কপালটা খানিক কেটে গেছে। তবুও পিসিমার দেওয়া পিঠের পুটলিটা অক্ষতভাবে আমারই পেটের তলায় পড়ে আছে। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম চারদিক্ বালি ধূ ধূ করছে। লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই, বাড়ী নেই, ঘর-দুয়ার নেই, কেবলই চারদিকে বালির সমুদ্র! বুঝলাম, রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে এসে পড়েছি। ঐ দূরে প্লেনটা পড়ে আছে। সেখানে লোকজন, জিনিসপত্র আর কিছু নেই। সব কিছু ছাই হয়ে গেছে।

ক্ষিদেয় পেট চোঁ চাঁ করছে। পিসিমার পিঠের পুঁটলিটায় প্লেন থেকেই হাত দেওয়া সুরু করেছিলাম; তা খুলে দেখি ভাল পিঠেগুলি প্রায় শেষ হয়ে গেছে, রয়েছে শুধু একরাশ চিতই পিঠে। তাই খেলাম ক্ষিধের ঠ্যালায় গোগ্রাসে খান দশেক। কিন্তু জল? জল কোথায়? পিঠের পুঁটলি কাঁধে নিয়ে ঘুরলাম জলের খোঁজে। ঐ দুর্ব্বল শরীর নিয়ে এদিক্ ওদিকে মাইল খানেক পথ হাঁটলাম, তবু কোথাও জলের চিহ্নও দেখতে পেলাম না। গলা তখন আমার কাঠ হয়ে গেছে। জলের কষ্টে সমস্ত শরীরের মধ্যে মনে হতে লাগল যেন আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। দিন শেষ হয়ে গেল, ঐ বালির মধ্যে বসে পড়লাম প্রায় অজ্ঞানের মত।

আবার অসহ্য ক্ষিধে, এদিকে জলতেষ্টায়ও প্রাণ যায়। পিঠেগুলো ত' পিঠে নয়, যেন কামানের গোলা। পিসিমার হাতে পিঠে কখনো নরম হয় না ব'লে পাড়ায় একটা খ্যাতি ছিল। সেই পিঠে আবার বাসি হয়ে মরুভূমির গরমে জুতোর চামড়া হয়ে গেছে। দাঁতে কাটা যায় না সেই চিতই পিঠে, তবু চিবোলাম পাগলের মত খান দুয়েক। তারপর আবার জলের জন্যে ছটফট করতে লাগলাম। াণ যায় প্রাণ যায় অবস্থা!

সকালে উঠে দেখি প্রচণ্ড জলতেষ্টায় সমস্ত শরীরটা যেন কেমন হয়ে গেছে। ভাল করে উঠে বসতে পাচ্ছি না। আশেপাশে চেয়ে দেখি একরাশ কাক কা কা করছে। নিশ্চয়ই যমরাজের কাছ থেকে খবর পেয়েছে আমার আর দেরী নেই। ভয়ে চোখ বুজতে পারি না। মনে হ'ল চোখ বুজলেই হয়ত ওরা আমাকে জ্যান্ত খেতে সুরু করে দেবে। কাকগুলো কি রাক্ষসের মত দেখতে! যেমন আওয়াজ তেমনি বীভৎস চেহারা। মনে হ'ল, কত কাল যেন তারা কিছু খায় নি, এখন কর্কশ গলায় আমাকে বলছে—একটু তাড়াতাড়ি চোখ বোজ্, একটু তাড়াতাড়ি চোখ বোজ্, আমাদের ভোজের ব্যাপারে আর দেরি করাস কেন?

তৃষ্ণায় তখন আমার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। চোখে সর্ষেফুল দেখছি। গলা দিয়ে একবার 'মাঃ' আওয়াজ বের হ'ল। দু'-তিনটে কাক এগিয়ে আসছিল। একটু পেছিয়ে

গেল। প্রাণ যায় যায়, তবু ঐ অর্দ্ধ-আচ্ছন্নের ঘোরে মাথায় একটা প্ল্যান খেলে গেল। পিসিমার পুঁটলিটা খুলে যে ক'টা চিতই পিঠে ছিল সেগুলো সব দিলাম ছড়িয়ে, আর কাকগুলো তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাম হাম করে খেতে লাগল সেগুলো।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। কতখানি আর খেতে পারবে? আধখানা এক-এক জনা খেতেই গলার কা কা আওয়াজ প্রায় মা মা ডাক হয়ে বের হতে লাগল। তারপর সেগুলো সোজা একদিকে মা মা ডাক ছাড়তে ছাড়তে উড়তে লাগল। আমিও এবার ছুটলাম তাদের পিছু পিছু। এই একমাত্র সুযোগ! প্রাণপণে ছুটলাম তাদের পিছনে পিছনে।

যা ভেবেছিলাম তাই হ'ল। প্রায় আধঘন্টা দৌড়াবার পর দেখি সামনে ঢিবির পি নে একটা ছোট্ট জলা। কাকগুলো সেখানে নেমে জলে নাকানি-চুবানি খেতে লাগল। পিসিমার তৈরী চিতই পিঠে আমি নেহাৎ পিসিমার ভয়েই গিলতে পারি, এরা কেন পারবে? আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে; তারপর অগস্ত্যের মত চোঁ চোঁ করে জল খেতে লাগলাম প্রাণ ভরে—শরীর এলিয়ে দিয়ে। তারপর সেই জলের উপর শুয়ে রইলাম সারাটা দিন। শরীরটা যেন খানিকটা ঠাণ্ডা হ'ল। তারপর একদিন বাদে একটা প্লেন এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল।

সেই থেকেই ঐ চিতই পিঠেকে আমি ভালবাসি। আর সেই জন্যেই খাই না। বলতে গেলে ঐ ত' আমার প্রাণটা বাঁচিয়েছিল সে যাত্রায়!

প্রতিশোধ

শ্রীসুবোধ বসু

কিংবদন্তী আছে, দিঙনাগের ভয়ে স্বয়ং কবি কালিদাস কাঁপতেন। কিন্তু দিগ্‌দর্শন বাবুর ভয়ে যে বাংলার লেখকেরা কাঁপে এটা মোটেই কিংবদন্তী নয়। এক একজন লেখককে ধরেন, আর কাপড়-কাচা করে ছেড়ে দেন দিগ্‌দর্শন বাবু। বেচারীরা লজ্জায় আর জনসাধারণের কাছে মুখ দেখাতে পারে না। তাদের প্রত্যেকটা বই-ই এক একটা নরহত্যার মতো মনে হতে থাকে নিজেদের কাছে।

এই রকম আরও কিছুকাল চললে বাংলা বই লেখা একেবারে বন্ধ হয়ে যেত। দিগ্‌দর্শনের আরব্ধ কার্য্য শেষ হ'তো। কিন্তু সহসা পাঠকেরা বিগড়ে বসল।

একদিন দেখা গেল, যে সব বই পড়তে বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের দিগ্‌দর্শন

বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন, সে সব বই ছাড়া বাজারে আর কোনও বই বিক্রী হয় না।

দিগ্‌দর্শন বিস্মিত হলেন, ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর "ত্রিশূল" কাগজে তিনি আধুনিক পাঠক-পাঠিকাদের "বুদ্ধু" বলে অভিহিত করলেন। ভাল বইয়ের কি কি সদ্‌গুণ থাকা চাই সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেন। ফলে পাঠকেরা তাঁর প্রশংসা-পাওয়া বই দেখলেই তা সসম্ভ্রমে সরিয়ে রাখে। বলে, "ওরে বাবা, এটাও তবে সদুপদেশমূলক বই!"

দিগ্‌দর্শন আরও চটে ওঠেন। পাঠক সাধারণকেও "ত্রিশূল" বিদ্ধ করতে চান। বলেন, "বাংলা দেশে কেউ কিছু বোঝে না।" কলেজের ছোক্‌রারা "ত্রিশূল" কাগজের এখানটায় লাল-নীল পেন্সিলে টিপ্পনী জুড়ে দেয়—"এক দিগ্‌দর্শন ছাড়া।"

দিগ্‌দর্শনের হিতৈষী বন্ধুরা বলেন, "এ করছ কি? জনগণেশকে চটিয়ে তুমি কাগজ চালাতে চাও? তারা যে বই চায় সে বইয়েরই প্রশংসা কর।"

দিগ্‌দর্শন বন্ধুদের এই উপদেশের সংবাদ তো তাঁর "ত্রিশূল" কাগজে ছাপলেনই, উপরন্ত তিনি তার কি জবাব দিয়েছেন তাও ছাপলেন। তিনি বন্ধুদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "ত্রিশূল"-সম্পাদক বরঞ্চ গোল-আলুর ব্যবসা করিবে, তবু যাহা গালির যোগ্য তাহাকে গালি না দিয়া ক্ষান্ত হইবে না।"

"ত্রিশূলের" এই উক্তির খবর দিতে গিয়ে গালি-খাওয়া লেখকদের এক মুখপত্র সংবাদের শিরোনামা দিল: "দিগ্‌দর্শন বাবুর গোলোকপ্রাপ্তি সম্ভাবনা।"

দিগ্‌দর্শনের গাল-খাওয়া বইগুলির বিক্রীর বহর দেখে তাঁর অনুগত লেখকেরা তাঁকে চটাবার চেষ্টায়ই ছিল। এইবার সুযোগ দেখে তারাও বিপক্ষ দলে যোগ দিলে।

চারদিকে আক্রান্ত হয়ে দিগ্‌দর্শন পাগল হয়ে উঠতে পারতেন, কিন্তু তিনি মাত্র রক্তের চাপে আক্রান্ত হলেন।

আবার বন্ধুবান্ধবেরা এলো। তারা বুঝিয়ে বল্ল, 'সবাইকে গালাগালি দিয়ে আর কি লাভটা হচ্ছে? যে বই আর বইয়ের লেখকেরই তুমি নিন্দে কর তারাই নাকি বাজারে চালু হয়ে যায়। অথচ ইদিকে গালাগালি তৈরী করতে তোমার রক্তের চাপ অভদ্র রকম বেড়ে ওঠে।......'

'তবে কি করতে হবে?' দিগ্‌দর্শন আহত কণ্ঠে বলেন, 'ত্রিশূল ভেঙ্গে ফেলে গোল আলুর ব্যবসাই আরম্ভ করতে হবে?'

'আহা, তা কেন!' বন্ধুরা বলেন, 'তবে "ত্রিশূলের" ধার একটু কমাও......'

'তা অসম্ভব!' ত্রিশূলাধিপতি বল্লেন, 'অকৃতজ্ঞদের আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব···'

'তবে এক কাজ কর;' দিগ্‌দর্শনের এটর্নী বন্ধুটি উপদেশ দিলেন। 'যাদের ওপর প্রতিশোধ তুলতে চাও, ধৃতরাষ্ট্র-আলিঙ্গনের মতো তাদের বইয়েরই প্রশংসা শুরু কর না কেন! এক ঢিলে তোমার স্বাস্থ্য ও ব্যবসা রক্ষা আর ওদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাক···'

দিগ্‌দর্শন এই ছ্যাব্‌লামির জবাব দিলেন না। গম্ভীর ভাবে বললেন, 'ত্রিশূল আমি ভেঙ্গে ফেলব, কিন্তু অকৃতজ্ঞ লেখক আর অকৃতজ্ঞ পাঠকদের উপর এমন প্রতিশোধ নেব যে কালাপাহাড়ের কীর্ত্তি তার কাছে শিশুলীলা! তরোয়াল নয়, মাত্র কলমের খোঁচায় কি সর্ব্বনাশটা আমি করি, একবার দেখে নিও .....'

সত্যই দিগ্‌দর্শন "ত্রিশূল" কাগজ তুলে দিয়েছেন। তিনি এখন আর সাহিত্য সমালোচনা করেন না, কাউকে গালাগালি দেন না। গল্পের বইয়ের লেখক হিসাবে এখন তাঁর জনপ্রিয়তার অন্ত নেই।

বেকুব খুনী ও গাধা ডিটেকটিভের গল্প এবং আফিং-মেশানো গাঁজাখুরী অ্যাড্‌ভেঞ্চারের অন্ততঃ দেড় শ' বই লিখে তিনি বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের মুগ্ধ করেছেন। এমন আজগুবি গল্প আর কেউ লিখতে পারে না। যে কোনও নির্ব্বোধ লোক পড়ে আনন্দ পাবে। অন্য লেখকেরা, তাঁর বইয়ের কথা উঠলেই, অবজ্ঞায় নাক সিঁটকোয় এবং তাঁর সাফল্যে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।

সব নয় ছয়

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

'নয় ছয় কতো ?' নেপথ্যে কোলাহলের মতই কথাটা আমি পাড়লাম—'কতো হয় নয়-ছয়ে ?'

ঘরে বসে বড়ো মামা, ছোট কাকু আর আমার তুই জ্যেঠতুতু বোন। সুশীলা আর পূর্ণশশী। অঙ্কের খাতা নিয়ে পড়েছি, হোমটাস্‌ক্ করছি সোমবারের। কাল রোববার, সারাদিন হৈ-হল্লা আছে। পরশু ইস্কুলে গিয়ে প্রথম ঘণ্টাতেই অঙ্ক। তাই শনিবারের বিকেল গড়িয়ে গেলেও খেলতে বেরুই নি।

অঙ্কের মাষ্টার আবার বেজায় কড়া।

তাড়াতাড়ি সারছিলাম টাস্‌ক্। নয় ছয়-এর একটা হদিশ পেলেই যে আঁকটা হয়ে যায় তা নয়, কিন্তু ঐখেনেই এসে আটকেছে আমার। ওর একটা হিল্লে না হলে হয় না। নইলে সবটাই নয় ছয়!

বিশেষ কারুকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করি নি। নাটকে যেমন স্বগতোক্তি থাকে, থাকে না ?—সেই রকম জনান্তিকেই আমার প্রশ্নবাণ ছেড়েছিলাম।

'হ্যাঁ রে, এখনো তোর শেষ হোলো না ?' সুশীলাদি বলে উঠলো।

'কি করে হবে ? ঐখেনেই আটকেছে যে! নয় ছয়ে কতো হয় বলো না দেখি ?' আমি বলি।

সুশীলাদি সে ধার দিয়েই যায় না।—'সামান্য একটা আঁক! তাই নিয়ে তখন থেকে লেগে আছিস্!'

'তুমি জানো পূর্ণদি ? কতো হয় নয় ছয়ে ?'

'নামতা জানিস্ নে মূখ্য! আঁক কষবার আগে নামতা মুখস্থ করতে হয়।' উল্‌টে পূর্ণশশীর উপদেশ পাই।

আহা, কী কথাই বল্লেন! মুখস্থ করতে হয় বল্লেই যেন তা হয়ে যায়। মুখে মুখে ডাকা মনে মনে রাখা যেন এতই সোজা ? মুখস্থ করা যেন চারটেখানি! ক' ঘর নাম্‌তা তার খবর জানা আছে ওর ?

'ছয় নয় কতো হবে বল্ দেখি আগে ?' সুশীলাদি বাৎলায় আমায়: 'ছয়-নয় যা হবে, নয়-ছয়েও ঠিক তাই।'

বড়ো মামা চায়ের পেয়ালায় পাউরুটি ডুবিয়ে চাখছিলেন—একেবারে তন্ময়গত হয়ে। তার মধ্যে কোনো আঁকের গোলযোগ এসে তুফান তোলে তা তিনি চান না। তাঁর সমস্ত মনটা পাউরুটিতেই পড়ে রইলো।

কিন্তু ছোট কাকু অমন ধারা না। বিপন্ন লোককে তুলে ধরতে সর্বদাই তিনি আগুয়ান্। ফস্ করে দেশলাই জ্বেলে সিগ্রেটটা ধরিয়ে নিয়েই তিনি বল্লেন—'ছাপ্পান্ন, বুঝলি শিবু!'

ঐ খবরটুকুর জন্যই আটকাচ্ছিল আমার। ছাপ্পান্ন পেয়েই আমার হয়ে গেল। আঁকটা সেরে খাতাটা তুলে রেখে ব্যাড্‌মিন্‌টনের র‍্যাকেট নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, বড়ো মামা বাগড়া দিলেন। বল্লেন, 'উঁহু, হয় নি তোর আঁক। যাচ্ছিস কোথা ?'

'না, শিবসন্তোষ, ছাপ্পান্ন নয়।' ছোট কাকুর দিকে তাকিয়ে তিনি ঘাড় নাড়লেন—'বোধ হয় চুয়ান্ন হবে।'

'চুয়ান্ন! কিসের চুয়ান্ন ?'

'নয় ছয়—চুয়ান্ন।' বড়ো মামা আরো বিশদ হন।

'চুয়ান্ন ? বল্‌লেই হোলো ?' ছোট কাকু আমলই দেন না মামার কথায়—'নাম্‌তার ঘরে লেখা আছে চুয়ান্ন ? দেখেচো তুমি ?'

'না, তা দেখি নি—' বড়ো মামা আম্‌তা আমতা কল্লেন—'নামতার কোনো বই নেই তো এখানে, তবে এই রকম আমার মনে হচ্ছে।'

'মনে হলেই হয় না।' ছোট কাকুর গলা বড়ো হয়—'নয় ছয় ছাপ্পান্ন।'

ছোট কাকুর ধারাই ঐ। কাজ এবং কথা—সবই দৃঢ়তাব্যঞ্জক। অটল আত্মপ্রত্যয়ের জলন্ত প্রতিমূর্তি। দেখলে সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে আসে আপনিই। তাঁর কথার কোনখানেও সংশয়ের ছায়াটুকুও নেই।

কাকুর কথায় বিশ্বাস জাগে আপনার থেকেই। দ্বিধা হয় না মেনে নিতে। কিন্তু এই আমাদের বড়ো মামু ? যেমন গোবেচারী তেম্‌নি—(ভাগ্‌নে হয়ে বলা হয়ত উচিত নয়, কিন্তু না বলেও আমি নিরুপায়, কেন না কথাটার সাধুভাষা জানা নেই আমার)—তেম্‌নিই একটি গবেট্।

মামার দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হয়। তেম্‌নি অবুঝের মতন মাথা নাড়তে নাড়তে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকেন তিনি।

সুশীলাদিরও বুঝি মায়া হোলো। মামার মান রাখার জন্যেই মনে হয় সে বল্লে—'বোধ হয় ওরা বদলে দিয়েছে। ঐ নাম্‌তাওয়ালারা।'

'আগে ছাপ্পান্নই হোতো,' পূর্ণদিও অংশ নেন—'কিন্তু আজকাল আর—'

'চিরকালই ছাপ্পান্ন।' ছোট কাকু ওর কথাটা সম্পূর্ণ হতে দেন না—'আগেও হোতো, এখনো হয়, এর পরেও হবে।'

এর পরে আর কোনো কথা নেই। লাফিয়ে উঠে র‍্যাকেট্টা আমি পাড়তে যাই। কিন্তু তার মধ্যেই বাধা পড়ে। আর এক কথা এসে পড়ে।

ছোট কাকার কথা!

আর ছোট কাকার কথা হচ্ছে এমন কথা যে না শুনলেই নয়কো। কান খাড়া করে শোনবার মতই। ছোট কাকুই আমাদের হীরো। হীরের ধার কাকুর কথায়, আর সবার কথা—সকলের কচকচি কাঁচ-ফাঁচের মতন তিনি কচ্ কচ্ করে কেটে দেন।

বড়ো মামা হয়ত বা প্রতিবাদের ছলেই হাঁ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার ওপরেই ছোট কাকু হাঁকড়েছেন—'চিরকাল ধরেই আমি তাই হতে দেখছি। দেখে দেখে অবাক্ হয়ে গেছি। সাত আষ্টে যে ছাপ্পান্ন হয়, কেন হয়, তা কি কখনো তোমার মাথায় খেলেচে? নয়ে-ছয়ে যে জন্যে হয়ে থাকে সেই জন্যেই।"

এমন একটা দৃষ্টান্তের পর বড়ো মামাও মানতে বাধ্য হন্। তারপর আর তিনি মুখ খোলেন না। ঠিক পাকা চব্বিশ ঘণ্টা চুপ করে থাকেন। কিন্তু রোববারের বিকেলে আবার তাঁর মৃদুগুঞ্জন শোনা যায়। —'শোনো সন্তোষ, (অসন্তোষের সুর বাজে তাঁর গলায়) কাল বিকেলে আমাদের যে-আলোচনা হচ্ছিল—'

'কিসের আলোচনা?' ছোট কাকুর নির্বিকার জিজ্ঞাসা।

'এই নয়-ছয়ের।·····ওটা—ওটা চুয়ান্নই হবে। বুঝলে?'

'ছাপ্পান্ন।' সেই এক কথা ছোট কাকুর।

খানিক চুপ করে থেকে বড়ো মামু মুখ খোলেন ফের—'আচ্ছা, ছয় আটে আটচল্লিশ, এটা তো তুমি মানবে?'

'আলবৎ।' মামার কথায় ছোট কাকুর বিনা দ্বিরুক্তিতে সায়।

'তাহলে ·····তাহলে কী হয়?'·····বলেন বড়ো মামু।

কী হয়, জানবার জন্যে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করি। রুদ্ধনিশ্বাসে সাবাই।

'যা হয় তা বুঝতেই পারছো।'

এই বলেই কেমন যেন মিইয়ে পড়েন বড়ো মামা। আমরাও মুষড়ে পড়ি। এমন লোকের ওপর কেমন করে শ্রদ্ধা রাখা যায়? মাতুল-ভক্তির ছিটেফোঁটা যাও বা বাকী ছিলো, মামার এই আচরণে সেটুকুও আমার যেন উপে যাবার মত দাঁড়ায়।

'ও, ওই কথা বলছো!' ছোট কাকু বলেন—'তাহলে তো আমিও তা বলতে পারি। সাত আষ্টে কতো? ছাপ্পান্ন তো?'

বড়ো মামা সায় দেন ঘাড় নেড়ে।

'বেশ, সাতের থেকে এক কেটে নাও—নিয়ে আটে লাগাও। লাগালে কী হয়? ছয়-নয়। নয় কি? অতএব নয়ে-ছয়েও ছাপ্পান্ন। সোজা হিসেব।'

ছোট কাকুকে আমার দ্বিতীয় যাদব চক্কোত্তি বলে সন্দেহ হতে থাকে।

'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তেপ্পান্ন।' সুশীলাদিও মুরব্বির মত বলে।

বড়ো মামার মন তবুও যেন মানতে চায় না। তিনি আস্তে আস্তে উঠে দেওয়ালপাঁজিটাকে পাড়েন। তাকে নিয়ে পড়েন। তারপর নামতার ঘরের মত একখানা ছক খাড়া করা যায় কিনা দেখতে যান। পাতার পর পাতা ছিঁড়ে যান—কিন্তু হিসাবের কোনো কুল-কিনারা পান না।

তখন ধুত্তোর বলে কাগজগুলোর নিকুচি করে রান্নাঘরে চলে যান। সেখান থেকে একটা দেশলাই ধার করে আনেন—জ্যাঠাইমাকে না জানিয়েই।

ছ'টা করে কাঠি ন'-ভাগে সাজাবেন, না ন'টা করে কাঠি ছ' ভাগে? আর এক সাজা সে। হিসেবটা ছয়-নয়ের, না নয়-ছয়ের? ধাঁধায় পড়ে জিজ্ঞেস করেন অবশেষে—'হ্যাঁরে, তুই কি চেয়েছিলি? নয়-ছয়ে কতো হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, বড়ো মামা।'

তখন তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ন'-টা করে কাঠির ছ' থাক্ বানান্। বানিয়ে এইবার এক দুই করে গুণে যাবেন কাঠিগুলো; কিন্তু মুস্কিল, তিরিশ গুণতে না গুণতেই তাঁর বিঁড়ি নিবে যেতে থাকে, আর যে-কাঠিটা দিয়ে তিনি বিড়িটাকে ধরান, সেটাকে পরে গোণার মধ্যে ধরা হয়েছে কিনা তা আর তাঁর মনে পড়ে না। আবার ফিরে ফিরতি গোণাগুণ্‌তি শুরু হয়; ফের আবার তিরিশে কি তেইশে এসে সেই ঠেকা। আর, এই করে, গোটা দেশলাইটাই ফাঁক হয়ে গেল, কিন্তু আঁক আর হোল না। বিঁড়ির জন্যই সংখ্যার সিঁড়ির শেষ পৈঠায় পৌঁছোনো হোলা না তার।

কিন্তু তবু তিনি হাল ছাড়বার ন'ন্। লেগে রইলেন তারপরও। দেশলাইয়ের বাক্সটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে কাঠি বানাতে লাগলেন। তাঁর এই অধ্যবসায়ের মাঝখানে জ্যাঠাইমা এলেন দেশলায়ের খোঁজে—এসে দেখলেন তার দশা। তখন মামার হাত থেকে খালি বাক্স আর কাঁচিটাকে কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

বড়ো মামার গোঁ গেল না কিন্তু। একটু পরেই পুরুত ঠাকুর এলেন—সত্যনারাণের পূজোয়। তাঁর কাছেই সমস্যাটা তিনি পাড়লেন।

মামার প্রশ্নবাণে আহত হয়ে পুরুত মশাই বল্লেন—'ও হরি! কবে ছেড়েচি সেই পাঠশালা! শুভঙ্করীর বিদ্যে কি আর মনে আছে? যাক্, চেষ্টা করে দেখা যাক্ তবু। দেখতে দোষ কি? কাগজ পেন্‌সিল্ দাও তো হে!'

কাগজ পেন্‌সিল আমি এগিয়ে দিই।

'দাঁড়াও, দেখি পারি কি না।' বলে তিনি কাগজের পিঠে দাঁড়ি কাটতে বসেন—একটার পর আর একটা। খুব যত্ন ও ধৈর্য্যসহকারে। সারি সারি দাঁড়ি খাড়া হয়। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

ন'টা করে দাঁড়ি এক এক সারে। এই রকম ছ'টি সার ভাগের পর গোণার পালা আসে। একে একে চুয়ান্ন অবধি তিনি গুণে যান, কিন্তু তখনো একটা দাঁড়ি বাকী থেকে যায়।

তখন ছোট কাকু বলেন—'দেখি তো আমি।' বলে কাগজখানা হাতে নিয়ে আপন মনে বিড় বিড় করে সুরু করেন গুণতে। মুখের বিড়ম্বনার সঙ্গে তাঁর মোটা মোটা আঙুল তর্‌তর্ করে চলতে থাকে দাঁড়িগুলোর ওপর। বেশ তৎপরতার সঙ্গে শেষ করে—শেষের দিকে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন। 'তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন।'

তাঁর খতম্ হতেই পুরুত মশাই হাত বাড়ালেন—'দেখি আমি আর একবার।' আর একবার

তিনি স্থরু করলেন গুণতে। শেষ হোলো তাঁর তিপ্পান্নয়। তখন ফের ধরলেন গুণতে। তৃতীয় দফায় তিনি পঞ্চান্নয় এসে ঠেকলেন। তারপর বড়ো মামার চশমাটা নাকে লাগিয়ে আবার তিনি লাগলেন। এবারে দাঁড়ালো চুয়ান্ন। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর ওপরে আমাদের আর একটুও আস্থা ছিল না। সবার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছিল।

বড়ো মামা বল্লেন—'কাল ইস্কুলে অঙ্কের মাষ্টারকে জিজ্ঞেস করে আসবি। তাঁর ওপরে তো কারু কথা নেই। তিনি যা বলবেন তাই হবে।'

সারা রাত সেদিন যা করে কাটলো আমার! ঘুম নেই চোখে, এমন মুস্কিলে কখনো আমি পড়ি নি। নয় ছয় ঠিক কতো হয় ইস্কুল থেকে তার নিষ্পত্তি করে আনতে হবে। নিষ্পত্তি যাই হোক না, বিপত্তি তো আমার। সরকারী রায় যার পক্ষেই যাক্ তার ডিক্রিটা তো জারি করতে হবে. আমাকেই। আর তা'তে দু'জনের একজনা না চটে যায় না। বড়ো মামা চটলে সিকিটা দুয়ানিটা গেল—আমার রোজকার রোজগার! ছোট কাকু বেগড়ালে ····তাহলে যে কী হবে তা আমি ভাবতেই পারি নে!

ভাবতে ভাবতে ইস্কুলে যাই। কিছুতেই মন দিতে পারি না। না পড়ায়, না টিফিনের মার্বেল খেলায়। ছটফট করি সারাক্ষণ। তারপর ছুটির ঘণ্টা পড়লে ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরি। কি করি এখন? বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবো বোম্বাই? নাকি, জাহাজের খালাসীর কাজ নিয়ে পাড়ি দেব বার্মা মুলুকে?

পায়ে পায়ে বাড়িতে এসে পড়ি।—'কিরে? কী বল্লেন অঙ্কের মাষ্টার?' মামা যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন।

ছোট কাকুর দিকে তাকাই আমি। তেম্‌নি নির্বিকার চিত্তে তিনি সিগ্রেট টানছেন। আত্মবিশ্বাসের অটল হিমালয়। মহিমার যেন পরাকাষ্ঠা। এত বড়ো ব্যক্তিত্ব এক মুহূর্তে নিজের চূড়ান্ত থেকে পড়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে···আমার চোখের সামনে ·· আমার একটি কথায়? কোথায় যেন লাগে, কেমন যেন বাধ বাধ জাগে আমার।

'বল্ নারে, কী বল্লো তোর মাষ্টার?' তাড়া লাগান মামা।

আমি সাহস সঞ্চয় করি।—'ছাপ্পান্ন।' কোনো রকমে বলে ফেলি এক নিশ্বাসে।

'মাষ্টারটা তাহলে গোরু।' বল্লেন তখন ছোট কাকু: 'এক নম্বরের আকাট। বুঝলে নকুড়দা, তুমি যা বলেছো তাই ঠিক। নয় ছয় চুয়ান্নই। চুয়ান্নই হবে, আমি ভালো করে ভেবে দেখলাম আজ।'

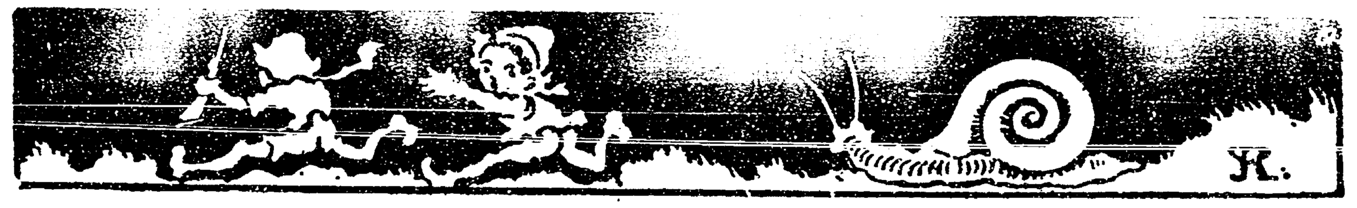

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

দুগ্ধবতী গাছ

দুগ্ধবতী গরুর কথাই তো আমরা জানি, গাছও আবার দুগ্ধবতী হয় নাকি?

আমাদের রামকানাই বলছে, "কেন হবেক না? ভেজিটেবল্ ঘি যদি হ'তে পারে তবে ভেজিটেবল্ দুধ হবেক না কেন? দুধ থেকেই তো ঘি হয়।"

কথাটা শুনতে সেই রকমই মনে হয় বটে কিন্তু ওর মধ্যেও একটু "কিন্তু" আছে। খাঁটী ঘি তৈরী হয় মাখন থেকে, আর সেই মাখন পাওয়া যায় দুধ থেকে। মাখন হচ্ছে দুধের তেল বা চর্ব্বি জাতীয় অংশ—সাধু ভাষায় যাকে বলা যায় "জান্তব তেল"। নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যেও এই তেল আছে, যদিও তা মাখনের মত ঘন বা শক্ত নয়, পাৎলা। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, বিশেষতঃ হাইড্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে ঐ তেলকে ঘন বা শক্ত করলেই তা দেখতে মাখন বা ঘিএর মত হয়। এই জিনিষটাকেই আমরা বলি ভেজিটেবল ঘি,—আজকাল নাম হয়েছে বনস্পতি ঘি। কিন্তু দুধের বেলা কথাটা খাটে না—কারণ দুধ জিনিষটি একেবারেই প্রাণিদেহের ব্যাপার। গরু, মোষ, ছাগল ইত্যাদি স্তন্যপায়ী জীবদের নিয়ে তার কারবার। কাজেই দুগ্ধবতী বললে ঐ সব জানোয়ারের কথাই মনে পড়বে। গাছ থেকে আর কেউ কোনদিন দুধ দোহায় না!

কিন্তু ঠিক দুধ না হলেও অনেকটা দুধেরই অনুরূপ রস ক্ষরণ করে এমন একটি গাছের কথা বিজ্ঞানীরা জানেন। তাঁদের ভাষায় এই গাছের নাম হচ্ছে "ব্রসিমাম্ গ্যালাক্‌টোডেনড্রন্"। দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন জায়গায়—বিশেষতঃ ভেনেজুয়েলায় এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ভেনেজুয়েলায় এর রীতিমত চাষ হয় প্রচুর পরিমাণে,—ঐ দুধেরই জন্য। এই গাছের গুঁড়ি চাঁছলে

ঠিক দুধেরই মত সাদা সাদা এক রকম রস বেরোতে থাকে। এই রস দেখতেই শুধু দুধের মত নয়, পুষ্টির দিক্ দিয়েও নাকি এর গুণ অনেকটা দুধেরই মত।

কিছুদিন আগে বোম্বাই থেকে একজন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌কে পাঠান হয়েছিল ভেনেজুয়েলায়; তিনি ঐ গাছের চাষ সম্বন্ধে ভাল করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছেন। বোম্বাই সরকার ঠিক করেছেন, শীগ্‌গিরই ওদেশ থেকে বিমানে কিছু টাটকা বীজ আনিয়ে এঁর তত্ত্বাবধানে বোম্বাইয়ের পল্লী অঞ্চলে ঐ গাছের চাষ সুরু করবেন। তা হ'লে হয়তো গরুর বদলে গাছ থেকেই দেশের দুগ্ধ-সমস্যা কিছুটা কমবে। আর খরচ তো নেই বললেই হয়! গাছকে গরুর মত বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হবে না, নিজের খোরাক সে নিজেই সংগ্রহ করবে,—শুধু একটু সার আর একটু যত্ন দিলেই হ'ল। আর একটা মস্ত সুবিধে, বোম্বাইএর জল-হাওয়া নাকি অনেকটা ভেনেজুয়েলারই মত।

ভূতের বিয়ে

রূপকথার কাহিনী নয়, সত্যিকারের ঘটনা। ব্যাপারটি ঘটেছিল অল্প কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুরের কাছে পেনাংএ।

একজন চীনা দরজী প্রেততত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত। কিছুদিন আগে তার ছেলেটি মারা যায়। একদিন নাকি সে প্ল্যানচেট নিয়ে বসলে সেই প্ল্যানচেটে এক প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয় এবং সে তাকে জানায় যে তার ছেলে পরলোকে গিয়েও একটি স্ত্রীর অভাবে শান্তি পাচ্ছে না। সুতরাং তার একটি বিয়ে দেওয়া দরকার। পাত্রীর সন্ধানও ঐ প্রেতাত্মাই দেয়। এই মেয়েটিও পরলোকবাসী এবং সেও অবিবাহিত অবস্থায়ই মারা গেছে, ঐ ছেলেটির মৃত্যুর প্রায় একই সময়ে।

এমন কথা শুনলে কোন্ বাপের না মন ছটফট করে? চীনা বাপটি তখন একটি ঘটক পাঠায় মেয়ের বাপের কাছে তাঁর পরলোকগত কন্যার সঙ্গে নিজের পরলোকগত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করে। সেই সঙ্গে এও জানায় যে এ জন্য সে উপযুক্ত যৌতুকও দেবে।

মেয়ের বাপ-মা রাজী হয়ে যায়। তখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করা হয়। বর-কনের জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ, মেয়ের অলঙ্কার, বরের বরাভরণ এবং

বিবাহের আসবাবপত্র—সবই তৈরী করা হয়। পুরোহিত এসে যথারীতি মন্ত্র পড়ে বিবাহ সম্পন্ন করান। আত্মীয়বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হয়ে জলযোগে আপ্যায়িত হন। তারপর মোটরে করে বর-কনের বদলে তাদের বস্ত্র-অলঙ্কার নিয়ে সহরময় মিছিল করে ঘুরে অবশেষে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়। পুরোহিত প্রেতাত্মার বিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

বর পরলোকে বসেও মনের মত বৌ পেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুসী হয়েছে।

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা কর

নীচের প্রশ্নগুলির জবাব দেবার চেষ্টা কর, না পারলে শেষ দিকে দেখ।

(১) নীচের বইগুলি কোন্‌টা কার লেখা?—

(ক) রঘুবংশ (খ) লোকরহস্য গ) কাদম্বরী (ঘ) টয়লার্স অব দি সী (ঙ) প্যারাডাইস লষ্ট।

(২) কোন্‌টা ঠিক?—ক) ফুজিয়ামা হচ্ছে—ব্রহ্মদেশের একজন বড় কবির নাম, জাপানের একটা পাহাড়ের নাম, দক্ষিণ আমেরিকার একটি দুর্দ্ধর্ষ জাতের নাম।

(খ) পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শক্ত জিনিষ হচ্ছে—লোহা, হীরা, কোয়ার্টজ, প্ল্যাটিনাম্।

গ) 'রবিনসন্ ক্রুসো'র রচয়িতা হচ্ছেন—আলেকজ্যাণ্ডার ডুমা, হান্‌স্ য়্যাণ্ডারসন, ড্যানিয়াল ডিফো, জুল ভার্ণে, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্।

(৩) নীচের লাইনগুলি কোন্‌টা কার লেখা?—

(ক) 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' (খ) 'এ থিং অব্ বিউটি ইজ্ এ জয় ফর্ এভার।' (গ) 'মা কুরু ধন-জন-যৌবনগর্ব্বম্।' (ঘ) 'কাক ডাকে কা কা, আগে অ পরে আ।'

(৪) এগুলি বলতে কি বুঝায়?—(ক) ক্রোমিয়াম্ (খ) ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (গ) আর্ট পাউণ্ড কাগজ।

(৫) এই সহরগুলির কোনটা কোন্ নদীর ধারে?—(ক) কৃষ্ণনগর (খ) কাটোয়া (গ) জলপাইগুড়ি (ঘ) রাজসাহী (ঙ) ঢাকা (চ) চট্টগ্রাম (ছ) লক্ষ্ণৌ (জ) মথুরা (ঝ) গয়া (ঞ) কাশী।

চল যাই মিশর

শ্রীগৌরী দেবী

সকালে উঠে খবরের কাগজ খুললে আজকাল যে ক'টি দেশের নাম প্রায়ই বড় বড় শিরোনামায় চোখে পড়ে তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে মিশর। সম্প্রতি

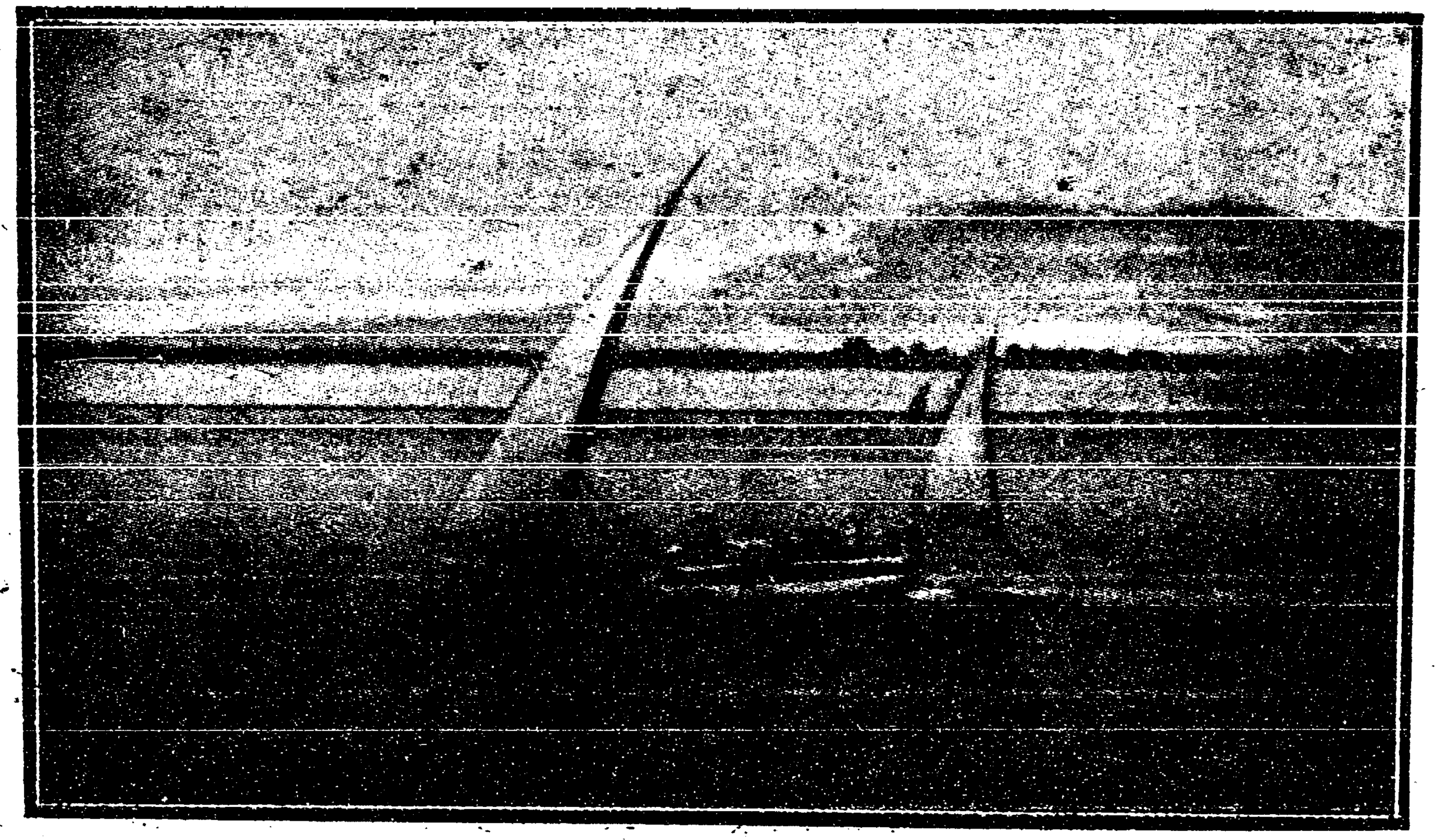

মিশরের পিতা—নীল নদ

মিশরের রাজনৈতিক আকাশে পর পর অনেকগুলো বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। প্রথমে সুয়েজ এলাকা নিয়ে বৃটীশ-বিরোধী আন্দোলন, তার পর জেনারেল

নাগুইবের নেতৃত্বে রাতারাতি নাটকীয় ভাবে রাজা ফারুককে সিংহাসন-চ্যুত করে নির্বাসনে পাঠিয়ে তাঁর সাত মাস বয়স্ক ছেলেকে রাজা বলে ঘোষণা এবং অবশেষে দেশের বড় বড় নেতাকে বন্দী করে জেনারেল নাগুইবের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ইত্যাদি। রামধনুতেও এর বিবরণ কিছু কিছু তোমরা পড়েছ। কেউ কেউ মনে

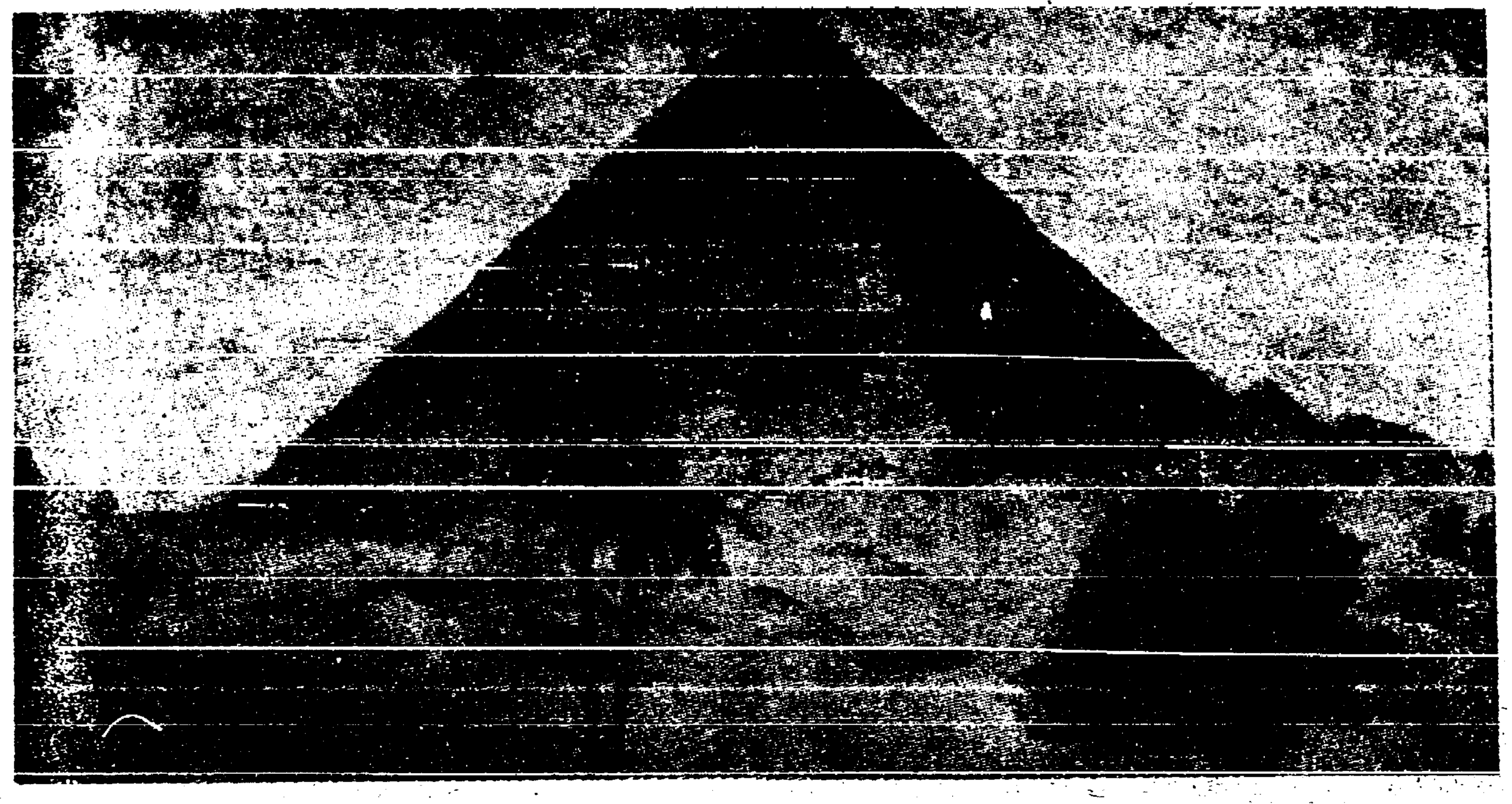

পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য—মিশরের পিরামিড

করছেন, জেনারেল নাগুইব হচ্ছেন মিশরের ত্রাণকর্ত্তা—নতুন এক মিশর সৃষ্টি করে যাবেন তিনি,—যেমন করে গেছেন কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে, যেমন চেষ্টা করেছিলেন আমানউল্লা আফগানিস্থানে। মিশরের ঘরে ঘরে তাই ছোট ছেলেদের নামকরণ করা হচ্ছে 'নাগুইব'। আবার কেউ কেউ বলছেন, সব বাজে কথা; নাগুইব হচ্ছেন ডিক্টেটর।

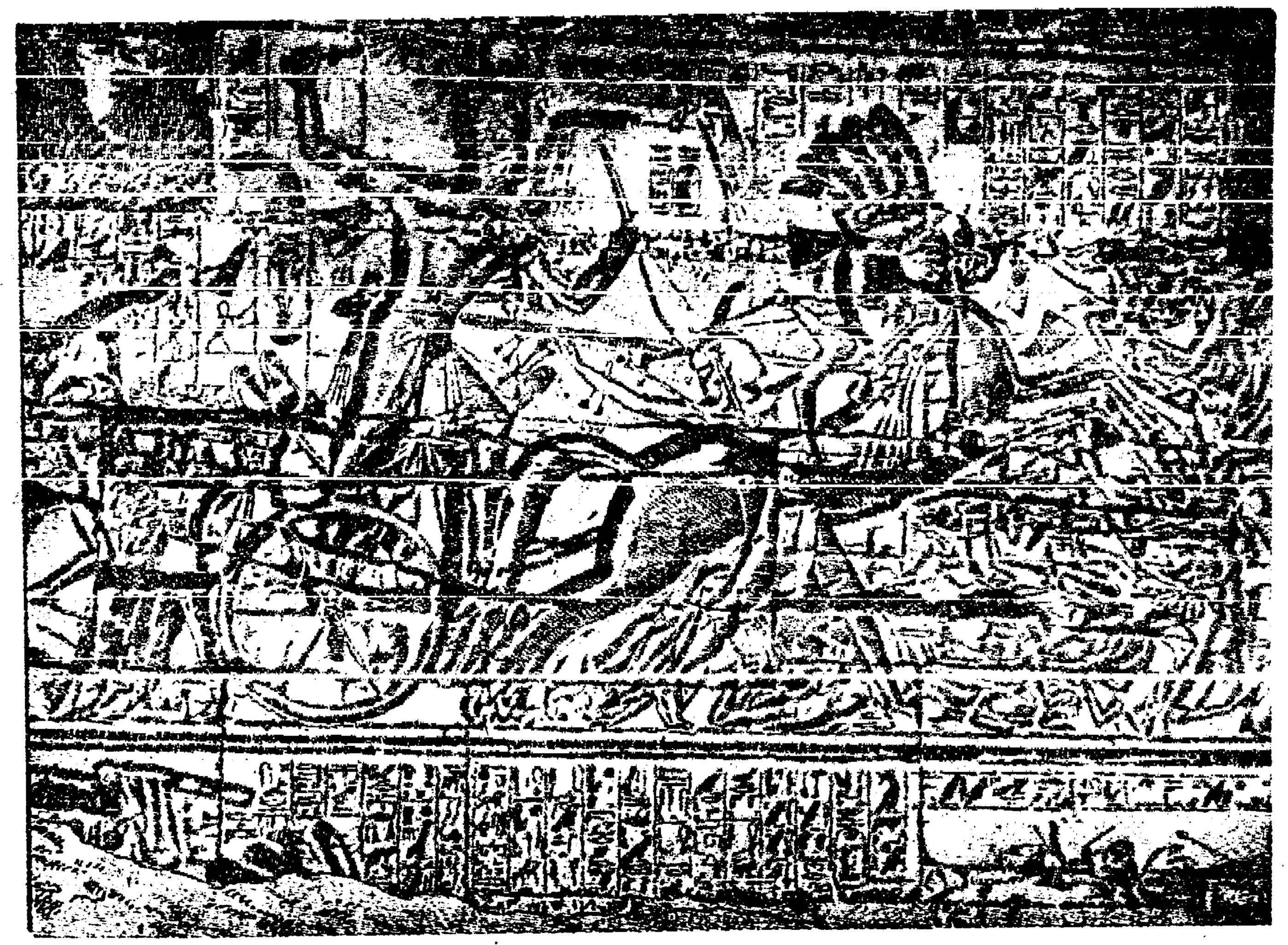

কার্ণাক মন্দিরের গায়ে খোদাই করা প্রাচীর-চিত্র

ডিক্টেটারী শাসনে দেশকে ছারেখারে দেবেন তিনি—যেমন দিয়েছিলেন হিটলার

জার্মানীকে, মুসোলিনী ইটালিকে। গোড়ায় তাঁদের নিয়েও তো দেশের লোক মাতামাতি করেছে!

ব্যাপারটা এত টাটকা যে এর ওপর কোন মতামত দেওয়া বা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াবে বলা কঠিন। তবে আশার কথা এই, নাগুইব নাকি জনসভায় সবাইকে ভারতের মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করবার উপদেশ দিয়েছেন।

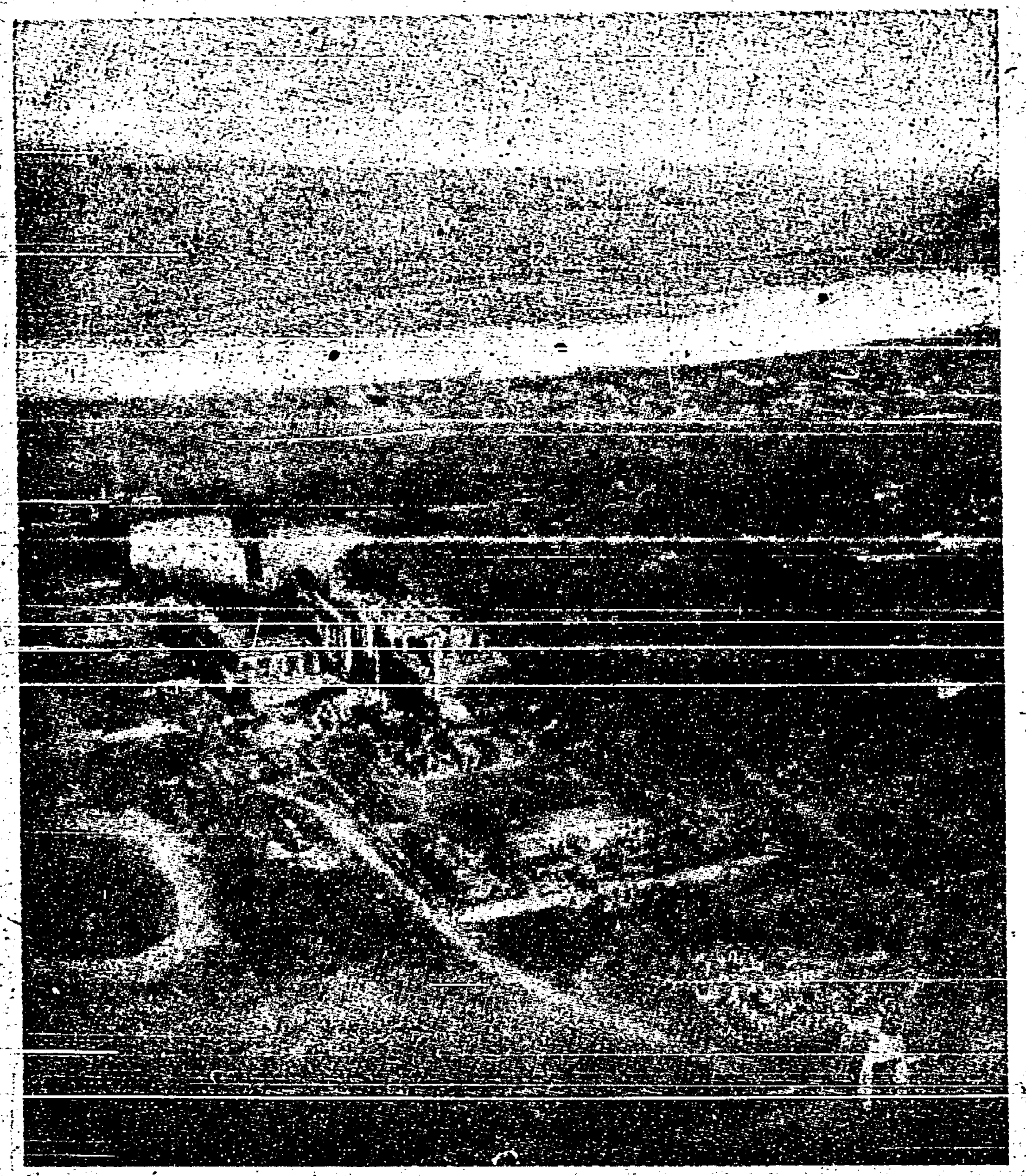

থিবিসের বিখ্যাত প্রাচীন কার্ণাক মন্দির

মিশর হচ্ছে অতি প্রাচীন দেশ—তেমনি প্রাচীন তার সভ্যতা। ৩।৪ হাজার বছর আগে, যখন এখনকার সভ্য জাতের অনেকেই বনে-জঙ্গলে পশুর মত দিন কাটাত তখনও মিশর শিল্পে, সভ্যতায়—নানা দিক্ দিয়ে পৃথিবীতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে গেছে। এখন অবশ্যি সে মিশর আর নেই, কিন্তু অতীতের সে গৌরব মিশরবাসী আজও ভোলে নি।

তোমরা ভূগোলে নিশ্চয়ই পড়েছ, মিশরকে "নীল নদের দান" বলা হয়। এই নীল নদই মিশরকে শস্যশ্যামল করে রেখেছে। বছরে দু'বার করে নীল নদে বন্যা হয়। গ্রীষ্মের পরে যে বন্যা হয় সে বন্যায় ভেসে আসে আবিসিনিয়া অঞ্চল থেকে প্রচুর কালো মাটি। এই পলিমাটিই মিশরের ভূমিকে সর্ব্বদা উর্ব্বর করে রাখে। তাই প্রতি বছর নীল নদে বন্যা এলে মিশরী চাষীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়; মহা উৎসাহে তারা "পিতা নীলের" উৎসবে মেতে উঠে। এই উৎসবকে বলা হয় উই-ফা-এন্-নীল।

মিশরের বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তূলো খুব নাম-করা। অমন উৎকৃষ্ট তূলো বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও হয় না! হেনা গাছের চাষ হয় লাল রং-

এর জন্য। এ ছাড়া আছে ভুট্টা। এই ভুট্টা শুধু সেখানকার চাষীদের অন্যতম প্রধান খাদ্যই নয়, আরও নানা ব্যাপারে তারা ভুট্টাকে কাজে লাগায়। ভুট্টার ডাঁটা-পাতা দিয়ে ঘর তৈরী করে, কাঁচা ডাঁটা গরু-ভেড়াকে খাওয়ায়, শুকনো ডাঁটা দিয়ে জ্বালানীর কাজ চলে। মিশরের আশপাশ হচ্ছে মরুভূমির রাজ্য। কাজেই খেজুর গাছও এখানে প্রচুর জন্মায়। মিশরী চাষারা খেজুর কেবল নিজেরাই খায় না দেশবিদেশে চালানও দেয়।

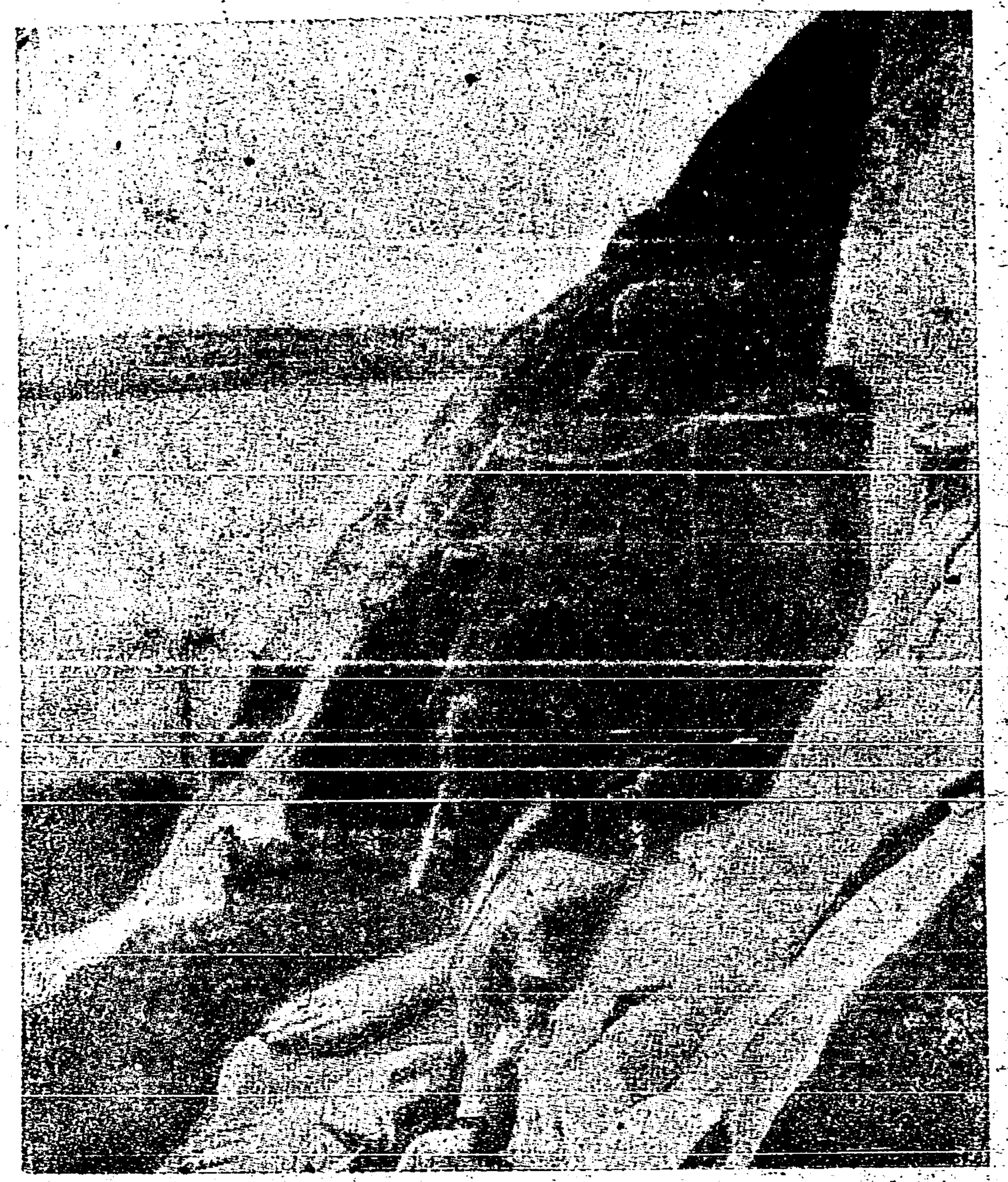

প্রাচীন মিশরের আর একটি কীর্ত্তি—পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা সম্রাট্ রামশেষের বিরাট মূর্ত্তি

সুপ্রাচীন দেশ মিশর—নানা জাতের, নানা ধরণের লোকের বাস এখানে। যাযাবর বেদুইন থেকে সুরু করে নিউবিয়ান, গ্রীক, ইংরেজ, ইটালিয়ান, ফরাসী প্রভৃতি নানা দেশের লোক এসে এখানে আড্ডা গেড়েছে। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান—শত করা ৮৮ জন। খৃষ্টানের সংখ্যা শত করা প্রায় ১১ জন। অবশিষ্টরা ইহুদী। সেকালের মিশরী ভাষা লেখা হ'ত ছবির অক্ষরে—তাকে বলা হয় হায়রোগ্লিফ্। এখনকার মিশরীরা কিন্তু সকলেই আরবী ভাষায় কথা বলে ও লেখে। সহর অঞ্চলে ফরাসী ভাষারও খুব প্রসার হয়েছে। সেখানকার সব স্কুলেই প্রায় ফরাসী অবশ্যপাঠ্য। ইংরেজীও বেশ চলে।

ছবির অক্ষরে লেখা প্রাচীন মিশরের অদ্ভুত ভাষা

আধুনিক মিশর চাল-চলনে দ্রুত ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে,—

মিশরের আর একটি দৃশ্য

অবশ্যি সহর অঞ্চলের কথা বলছি। পোষাক-আষাকে অনেকেই ইয়োরোপীয়দের

অনুকরণ করছে। আগে তুর্কী ফেজ খুব চলত, এখন তারও চলন উঠে যাচ্ছে। সহুরে মেয়েরাও মেম সাহেবদের মত স্কার্ট পরছে। পর্দ্দা প্রথাও ক্রমে উঠে যাচ্ছে; মেয়েরা লেখাপড়া শিখে দোকানে, হোটেলে, সিনেমায় চাকরী করছে।

মিশরের রাজধানী হচ্ছে কায়রো। সেখানে ছ'টো বিশ্ববিদ্যালয়। রাজা ১ম ফুয়াদের নামে যে বিশ্ববিদ্যালয় সেটাই হচ্ছে আধুনিক। এখানে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হয়—নানা আধুনিক বিষয়ে। প্রায় ন' হাজার ছাত্র এখানে পড়ে। বেশীর ভাগই মুসলমান, পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে তারা আসে। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আল্ আজাহার। এটি হচ্ছে ধর্ম্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে কোরাণ, মুসলিম-আইন এবং মুসলিম-সংস্কৃতি সম্বন্ধে পড়ানো হয়। এটী বহু দিনের পুরোনো, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে স্থাপিত, এবং খুব নাম-করা। এখানেও ছাত্রসংখ্যা প্রচুর এবং নানা দেশ থেকে মুসলমান ছাত্রেরা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য এখানে আসে। পুরোনো হ'লেও এখানকার ব্যবস্থা সব সময়োপযোগী। ছাত্রেরা নিজেদের 'আল্-হাজারী' বলে খুব গর্ব্ব বোধ করে।

মিশরের সহর অঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ক্রমেই বেশ উন্নত হচ্ছে। বিদেশী মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলগুলির তো কথাই নেই, দেশী স্কুলগুলিও সরকারী সাহায্যে বেশ কেতা-ছুরস্ত হয়ে উঠছে। স্কুল থেকেই টিফিনের ব্যবস্থা হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে ১টা, আবার ২টো থেকে ৪টে স্কুল বসে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মকতবও অনেক আছে। মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল, তবে কোন কোন বিদেশী স্কুলে ছেলেমেয়ে একসঙ্গেও পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গৃহস্থালীও শিখতে হয়। সহরের লোকেরা প্রাতরাশ ছাড়া প্রায় সব খাবারই হোটেলে খেয়ে নেয়, কাজেই মেয়েরাও প্রচুর অবসর পায়।

সহরের তুলনায় কিন্তু গ্রামগুলি আজও ভয়ানক রকম পিছিয়ে আছে। গ্রামবাসী মিশরীরা এখনও মন্ত্রতন্ত্রে প্রচুর বিশ্বাস করে। ভূতের ওঝা, ঝাড়-ফুঁক, দরগায় ধন্না দেওয়া এ সব প্রথা সমানে চলছে। গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ারও তেমন ধার ধারে না। সামান্য একটু কোরাণ পড়তে পারলে আর বড় জোর নাম-সইটা করতে পারলেই হ'ল। ইতিহাসবিখ্যাত মিশরে দেখবার জিনিষ অনেক—পিরামিড, স্ফিংক্স্, মামী, পুরোনো সহর, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি। তাই এখানে 'ট্যুরিষ্ট্' অর্থাৎ ভ্রমণকারীরা খুব বেশী আসে। অনেকেই তাদের 'গাইড' বা পথপ্রদর্শক হয়ে বেশ ছ' পয়সা রোজগার করে।

নতুন বই

আমার ভালুক শিকার—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। ২৪বি, লেক্ রোড, কলিকাতা-২৯। দাম ১৷৷০

শিবরাম বাবুর "পঞ্চাননের অশ্বমেধ" একখানা পুরোনো নাম-করা বই। বইখানা অনেকদিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছির্ল না। সেই বইএরই কয়েকটি গল্প নিয়ে এবং তার সঙ্গে নতুন গল্প যোগ করে এ বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। সবগুলি গল্পই হাসির এবং দেদার মজার। অনেকগুলি রামধনুতেই বেরিয়েছিল। প্রকাশক ভূমিকায় লিখেছেন, "শিব্রামদা'র অধুনাতন Pun-শে গল্পের থেকে তখনকার গল্পগুলোই যেন বেশী সুখপাঠ্য ছিল।" এ বিষয় আমরাও একমত। কাজেই এ বইখানি তোমাদের ভালো লাগবে এ কথা জোর করেই বলতে পারি। গল্পের সঙ্গে শ্রীকার্ত্তিক মজুমদারের আঁকা ছবিগুলিও বেশ মানিয়েছে।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। সাহিত্য চয়নিকা। ৫৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ২৲

ধীরেন বাবু বাংলা শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁর ভাষা এবং লেখার ভঙ্গী যেমন মনোজ্ঞ, গল্পের বিষয়বস্তুও তেমনি বৈচিত্র্যময়। তাঁরই বিভিন্ন ধরণের লেখা থেকে ১৫টি সুন্দর সুন্দর গল্প বাছাই করে এই গল্প-সংকলনটি তৈরী করা হয়েছে। বইটির ছাপা, বাঁধাই এবং রূপসজ্জা সুন্দর এবং সুরুচিপূর্ণ,—উপহার হিসাবে ছেলেমেয়েরা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করবে। তা ছাড়া মুখপত্রে লেখকের ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠকের কৌতূহল মেটাতে সাহায্য করবে।

অথই জলের রূপকথা—শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ২৪বি, লেক্ রোড, কলিকাতা। দাম ১৷৷০

চার্ল্‌স্ কিংসলির লেখা 'দি ওয়াটার বেবীজ্' ইংরেজি শিশুসাহিত্যের একখানি মনোজ্ঞ বই। অমিয় বাবু তারই মর্মানুবাদ করে 'অথই জলের রূপকথা' নামে বাংলার ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। ছোট্ট "চিমনী-পরিষ্কারক" টমের অপরূপ কাহিনী পড়তে পড়তে মন যেন স্বপ্নরাজ্যে চলে যায়। অনুবাদের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। ভাষাও স্বচ্ছ ও সহজ, অনুবাদ বলে মনেই হয় না। অনেকগুলি রেখাচিত্র এবং ওপরের সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটটিও বইখানিকে খানিকটা লোভনীয় করেছে।

স্বপনকুমার—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। বৃন্দাবন ধর বুক হাউস, ৯৩৷৩৷১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-৯। দাম ৸০

প্রসিদ্ধ ইটালিয়ান্ লেখক কার্লো কলোদির 'পিনোশিও' পৃথিবীর শিশুসাহিত্যে একখানি সুপরিচিত বই। পৃথিবীর নানা ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। সুলেখক শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী এরই গল্পাংশ নিয়ে বাংলা ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের পাতে পরিবেশন করেছেন। গল্পটি শুধু মজাদারই নয়, শিখবারও কিছু কিছু আছে এতে। ননী বাবুর গল্প বলার ভঙ্গীটি চমৎকার, ভাষাও ছোটদের মনের মত। প্রচুর ছবি এবং রঙ্গিন মলাট বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে।

ছবি ছড়ায় সুভাষ—শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী। প্রকাশক—রত্নাকর পাবলিশিং হাউস। ১৬৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯। দাম ৷৷০

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে খুব ছোটদের জন্য লেখা ছড়ার বই। প্রত্যেক পাতায় একটি ক'রে সু-অঙ্কিত ছবি। ছড়াগুলিও সুন্দর। তবে এ ধরণের বই আর একটু রং-চংএ—অন্ততঃ ছবিগুলি রঙ্গিন কালিতে ছাপা হ'লে আরও লোভনীয় হ'ত। ৩য় পৃষ্ঠায় ওটেন সাহেব ঘটিত ব্যাপারটির যে রকম ছবি দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু ঠিক নয়, ওতে সুভাষ সম্বন্ধে ছোটদের ভ্রান্ত ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

নাকের গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্. এস-সি

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা মুখের বর্ণনা করতে গিয়ে নাকের ওপর প্রায়ই খুব জোর দিতেন। খাঁড়া নাক, লম্বা নাক, বাঁকানো নাক, ঝোলা নাক, উঁচু নাক—নানা রকম নাকের কথা তাঁরা লিখে গেছেন, উপমা দিয়ে। যেমন ধর, অর্জ্জুনের চেহারার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।" খগরাজ অর্থাৎ কিনা গরুড়ের নাকও যে নাক দেখে লজ্জা পায় এমনি নাক। এ ছাড়া 'তিলফুল জিনি নাসা', 'বাঁশীর মত নাক', 'শুকচঞ্চু নাসা' অর্থাৎ টিয়ার ঠোঁটের মত নাক—সবই নাকি সুন্দর। তেমনি থাঁদা নাকের নিন্দাও করেছেন প্রচুর। চলতি কথায়ও বেড়াল-নাক, ঝোলা নাক, বড়ি নাক, শিকেয়-তোলা নাক ইত্যাদি নাকের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি আমরা সর্ব্বদাই শুনছি (যদিও পশ্চিম বঙ্গে থ্যাঁদা কিংবা থেঁদী এই ডাক-নাম খুবই প্রচলিত!) চীন-জাপানে অবশ্যি সবাই থাঁদা, কাজেই সে সব দেশে নিশ্চয়ই থাঁদা নাক সৌন্দর্য্যের ত্রুটী বলে গণ্য হয় না, বরঞ্চ লম্বা নাকই হয়তো সে দেশে কুরূপের লক্ষণ।

কিন্তু ঠিক মুখের সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্যই যে বিধাতা নাকের সৃষ্টি করেছেন এমন মনে হয় না। নাক হচ্ছে আমাদের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ—আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটি। নাক আছে বলেই আমরা গন্ধ টের পাই। কিন্তু এর চেয়েও বড় কাজ আছে নাকের। ধরতে

গেলে নাকই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, কারণ এই নাকের সাহায্যেই আমরা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারি—যা নাকি জীবন ধারণের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের দরকার। নাকের ভিতর দিয়ে বাতাসের অক্সিজেন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। সাধু বাংলায় তাকে বলে প্রশ্বাস গ্রহণ। ঐ অক্সিজেন ফুসফুসে ঢুকে শরীরের ভিতরকার দহনকার্য্য সম্পন্ন করে, রক্তকে করে পরিষ্কার—সজীব, আর তার ফলে যে দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরী হয় তাই আবার নাকের ভিতর দিয়েই বেরিয়ে আসে—যাকে সাধুভাষায় বলে নিঃশ্বাস ত্যাগ। অবশ্যি, কোন কারণে নাক এই কাজ করতে না পারলে বা না চাইলে মুখ দিয়েও এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালান যায়, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন অতি মাত্রায় কাজ করতে থাকে—যেমন ধর ব্যায়াম করা, খেলাধূলা, দৌড়ানো বা ছুটোছুটি করা—তখন এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজও খুব বেড়ে যায়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ ঐ সময়ে আমাদের নাক কেমন প্রসারিত হয়! মনে হয় যেন নাকের ছিদ্র ‌আরও বড় হলে বেশ হ'ত। আদিম যুগে মানুষ যখন বনেজঙ্গলে বাস করত—জীবন ধারণের জন্য যখন তাদেরকে অতিমাত্রায় পরিশ্রম—ছুটোছুটি করতে হ'ত তখন তাদের নাকের ছিদ্র এই কারণেই অনেক বড় হ'ত। নানা জাতের আদিম মানুষের কঙ্কাল পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা তাদের যে সব ছবি এঁকেছেন তা দেখলেই এ কথার সত্যতা বুঝতে পারবে। ওরাংওটাং, গরিলা প্রভৃতি জন্তুর নাকের ছিদ্রও ঠিক ঐ জন্যই অত বড় আর চ্যাপ্টা।

ঘোড়া, উট, কুকুর কিংবা চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংহের নাক কখনও ভাল করে লক্ষ্য করেছ? লক্ষ্য করলে দেখবে মানুষের তুলনায় ওদের নাকের ছিদ্র কত চওড়া আর মজবুত! খুব দৌড়োদৌড়ি ও কায়িক পরিশ্রম করতে হয় বলেই ওদের নাকের গড়ন ঐ রকম। আমরা যদি পূর্ব্বপুরুষের মত ঐ রকম দৌড়-ঝাঁপে অভ্যস্ত থাকতাম তা হ'লে আমাদেরও নাকের গড়ন সম্ভবতঃ ঐ গরিলাদের মতই থাকত। নাকের ব্যবহার কমিয়ে ফেলাতেই ক্রমবিকাশের ফলে আমাদের নাকের চেহারা বদলে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে ঠেকেছে।

এইবার নাকের ছিদ্র দিয়ে ভিতরে ঢোকা যাক। প্রবেশ-পথেই রয়েছে কতকগুলি সূক্ষ্ম ছোট ছোট লোম। এগুলির কাজ হচ্ছে নাকের ভিতরটাকে বাইরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা। আমাদের আশপাশের বাতাসে সর্ব্বদাই নানা রকম ধুলো, ময়লা, সূক্ষ্ম আঁশ জাতীয় জিনিষ ভেসে বেড়াচ্ছে। এগুলো যাতে নিঃশ্বাসের সঙ্গে যখন তখন নাকের ভিতর ঢুকে নাক বন্ধ করতে না পারে তারই জন্য এই লোমগুলো রয়েছে প্রহরী। ছাঁকনীর মত বাতাসকে ছেঁকে নিচ্ছে তারা।

নাকের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট নরম হাড় নাকটাকে দু'ভাগ করে রেখেছে, আর নাকের ভিতরের চামড়াটা হচ্ছে ঈষৎ লাল। এই চামড়াটার মধ্যে কিন্তু অনেক কারিকুরি আছে। এই চামড়ার খানিকটা অংশ নিয়ে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলে দেখা যায় তবে দেখবে সমস্ত 'চামড়া'টা যুড়ে মৌমাছির চাকের মত অসংখ্য ছিদ্র বা ঝাঁঝরি। এই জন্য ভাল কথায় একে বলে ঝিল্লী,—আরও ভাল করে বললে—"শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী"। ঐ ঝিল্লী থেকেই শ্লেষ্মা তৈরী হয়

বলে ঐ নাম। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই ঝিল্লী, সামান্য একটু উত্তেজিত হলেই তার ভিতর থেকে শ্লেষ্মা বেরোতে থাকে। ঠাণ্ডা লাগলে তো কথাই নেই, কোন জিনিষ ঢুকিয়ে দিলে—যেমন নস্যি গুঁজলে বা কাগজে পাকিয়ে ওখানে ঢুকিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে এই ঝিল্লী উত্তেজিত হয়ে শ্লেষ্মা তৈরী করতে সুরু করে দেয়।

অণুবীক্ষণে ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ভিতর অসংখ্য শিরা এবং ধমনী এসে মিশেছে। শিরা আর ধমনীর ভিতর দিয়েই যে শরীরের রক্ত চলাচল করে তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এই রক্ত চলাচলের ফলে ঐ অংশটা সর্ব্বদাই গরম থাকে এবং ওখান দিয়ে যে বাতাস চলাচল করে তাও ঐ কারণে গরম হয়ে যায়। নিঃশ্বাস ছাড়লে যে সে বাতাস কেন গরম লাগে তা এইবার বুঝতে পারছ। বিজ্ঞানীরা বলেন, বাতাস এখানে এসে গরম হয়ে ভিতরে ঢোকার দরুণ আর একটা মস্ত উপকার হয়, ফুসফুসে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে সহজে তাকে কাবু করতে পারে না। অসতর্ক অবস্থায় ঠাণ্ডা হাওয়া ফুসফুসে ঢুকে পড়লে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের ভয় থাকে, এ উপায়ে তাকে অনেকখানি ঠেকিয়ে রাখা যায়। তা ছাড়া এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে দেখতে যতটা ছোট্ট বলে মনে হয় আসলে সে তার চেয়ে অনেক বেশী জায়গা যুড়ে রয়েছে। নাকের মাঝখানে যে পাৎলা হাড় নাককে দু'ভাগ করে রেখেছে তারই দু'পাশে আছে পাকানো পাকানো আরও তিন যোড়া নরম হাড় আর এর সবটা যুড়েই রয়েছে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী। এত বেশী জায়গা যুড়ে থাকার দরুণ বাতাসকে তার সংস্পর্শে এলে কিছুটা গরম হতেই হবে, তা সে যত তাড়াতাড়িই ঢুকুক না কেন।

নাকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে গন্ধ টের পাওয়া। কোন কিছু থেকে গন্ধ কি ভাবে ছড়ায় তা জান কি? সাধারণতঃ যে সব জিনিষকে আমরা গন্ধওয়ালা জিনিষ বলি তা থেকে সর্ব্বদাই অতি সূক্ষ্ম কতকগুলি কণা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এত সূক্ষ্ম যে চোখে তাদের কখনও দেখা যায় না। এখন, আমাদের নাকের ভিতর কতকগুলি গন্ধ-বোধক স্নায়ু আছে, যার সঙ্গে রয়েছে মগজের যোগ। বাতাসের ঐ কণাগুলি যখন ভাসতে ভাসতে নাকের ছিদ্র দিয়ে ঐ গন্ধ-বোধক স্নায়ুতে গিয়ে আঘাত করে তখনই তা উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে মগজে সে খবর পৌঁছে দেয় আর আমরা সে গন্ধ টের পাই। বিভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন রকমের গন্ধ। এই সব স্নায়ু তাও আলাদা ভাবে ধরে দিতে পারে। আবার মজা, এই স্নায়ুগুলি সাধারণতঃ নাকের ওপরের দিকেই বেশী করে বসানো। কাজেই কোন জিনিষের গন্ধ ভাল করে অনুভব করতে হ'লে আমাদের নাকটাকে তার কাছে নিয়ে জোরে প্রশ্বাস গ্রহণ করতে হয়, যাতে ঐ গন্ধ-কণাগুলো নাকের ওপরের দিকে উঠে সেখানকার স্নায়ুগুলোকে আঘাত করতে পারে। সব জিনিষের গন্ধ অবশ্যি সমান জোরাল নয়। উইলিয়াম্ র‍্যাম্‌জে নামে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মতে যে জিনিষের অণু যত বড় তার গন্ধও তত তীব্র। অবশ্যি তরল পদার্থ আর গ্যাস সম্বন্ধেই কথাটা খাটে। কুকুর প্রভৃতি যে সব জানোয়ারের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে বেশী তাদের নাকে এই স্নায়ুর সংখ্যা অনেক বেশী এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও আমাদের চাইতে অনেক বেশী ছড়ানো। অনেকে মনে করেন, মানুষ চেষ্টা করলে এবং ঠিকমত চর্চ্চা করলে এই ঘ্রাণশক্তি কিছুটা বাড়াতে পারে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যাদের একটা ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল তাদের অন্য ইন্দ্রিয় অনেকটা প্রবল হয়। যারা অন্ধ তাদের ঘ্রাণশক্তি এবং স্পর্শশক্তি (সময় সময় শ্রবণশক্তিও) সচরাচর সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রখর হতে দেখা গেছে। মানুষ বুড়ো হলে অন্যান্য প্রত্যঙ্গের মত তার নাকের শক্তিও কমে আসে, ঘ্রাণশক্তিও নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

নাকের সঙ্গে কান এবং জিভের সম্পর্কও খুব নিকট। যারা রাতদিন খুব তীব্র গন্ধের মধ্যে থাকে কিংবা অতিরিক্ত নস্যি নেয় তাদের অনেকেই কানেও কম শোনে। সর্ব্বক্ষণ উত্তেজিত হওয়ায় তাদের নাকের ভিতরকার স্নায়ুর ক্ষমতা তো নষ্ট হয়ই—কানেও তা সংক্রমিত হয়। সর্দ্দীতে নাক বন্ধ হলে জিভে ঠিক ঠিক স্বাদ পাওয়া যায় না এ তো তোমরা দেখেছই! আবার খাবারের মিষ্টি গন্ধে "জিভে জল এসে যায়" এ কথাও লোকে বলতেই বলে! এবং সত্যিই তা হয়। নাকের সঙ্গে মুখগহ্বরের সংযোগ রয়েছে। কোন কারণে মুখ দিয়ে খেতে না পারলে নাক দিয়েই খাইয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আমাদের একটি বন্ধু আছেন, তিনি এক জেলখানার কর্ত্তা। তাঁর কাছে শুনেছি, কয়েদীরা যখন 'হাঙ্গার ষ্ট্রাইক' অর্থাৎ কিনা অনশন ধর্ম্মঘট করে তখন জেল-কর্ত্তৃপক্ষ অনেক সময় তাদের নাক দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। নাকের ভিতর রবারের নল ঢুকিয়ে আর তার মাথায় একটা 'ফানেল' বসিয়ে তার ভিতর রকমারি খাদ্য ঢেলে দেওয়া হয়, আর তা নাকের ভিতর দিয়ে দিব্যি গন্তব্যস্থলে গিয়ে হাজির হয়। মুখ না হয় জোর ক'রে দাঁতে চেপে বন্ধ করে রাখা হ'ল কিন্তু নাক তো আর সে ভাবে বন্ধ করে রাখা যায় না!

দেবতার বর

(চীন দেশের গল্প)

শ্রীশান্তা দেবী

নীল আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে মেঘের রাজ্য। সেইখানে থাকেন মেঘের দেবতা ফো। মেঘের আড়াল থেকে মাটীর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি, আর ভাবেন ওখানকার মানুষগুলো কেমন করে দিন কাটায় একবার গিয়ে দেখে আসতে হবে নিজের চোখে।

অবশেষে একদিন তিনি মেঘের বাহনে চড়ে নেমে এলেন পৃথিবীতে, আর

এক বুড়ো ভিখারীর ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন পথে। ছেঁড়া জামা গায়ে, ছেঁড়া কাপড় পরনে, হাতে লাঠি, কুঁজো হয়ে হাঁটছেন ফো। কার সাধ্য তাঁকে দেবতা বলে চিনতে পারে?

তখন সন্ধ্যা হয় হয়, ফো একটা কুটীর দেখতে পেয়ে ভাবলেন আজকের মত এখানে অতিথি হওয়া যাক্।

দরজায় কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল, তারপর দুয়ারে অতিথি দেখে তাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল।

মেয়েটি বাড়ীতে একাই থাকে। অবস্থা তার এমন কিছু ভাল নয়; জামা-কাপড় সেলাই করে সামান্য যা রোজগার হয় তাইতেই, একা মানুষ, কোন রকমে চলে যায়। কিন্তু ফো দেখলেন স্বভাবটি তার বড় মিষ্টি।

মেয়েটির আদর-আপ্যায়নে সে রাতটা ফো-র বড় ভাল ভাবেই কাটল। মেয়েটি সযত্নে রান্না করে কাছে বসিয়ে তাঁকে খাওয়াল, তারপর নিজের হাতে নরম বিছানা পেতে, মশারি টাঙ্গিয়ে তাঁর শোবার ব্যবস্থা করে দিল। ফো যে জামাটা পরেছিলেন সেটা ছিল শতছিন্ন। মেয়েটি বল্‌ল, "এত ছেঁড়া জামা তোমায় পরতে হবে না, আমি তোমার জন্য একটা নতুন জামা সেলাই করে দিচ্ছি।" বলে সেই রাত্রেই নতুন কাপড় নিয়ে বসে গেল ফো-র জন্য জামা তৈরী করতে।

সারা রাত জেগে মেয়েটি জামা সেলাই করল, কিন্তু সকাল বেলাও জামাটা সম্পূর্ণ শেষ হ'ল না। তখন সে ফো-কে বল্‌ল, "আজ আর তোমার যাওয়া হচ্ছে না। আজকের দিনটাও তুমি এখানে থেকে খাওয়া-দাওয়া কর, ততক্ষণে জামাটাও আমার শেষ হোক। কাল নতুন জামা গায়ে দিয়ে তারপর যেও।"

সত্যি সত্যি ফোকে মেয়েটি সেদিন যেতে দিল না। পরদিন সকালে তাঁকে খাইয়ে, নতুন জামা পরিয়ে বল্‌ল, "দেখ তো কেমন মানিয়েছে! বুড়ো মানুষ, ঐ রকম ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে ঘুরতে আছে? ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে!"

মেয়েটির ব্যবহারে ফো-ও খুব খুসী। তাই বিদায় নেবার সময় তিনি বললেন, "তুমি ভারী লক্ষ্মী মেয়ে! আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আমি চলে যাবার পর তুমি যে কাজে হাত দেবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই কাজই করতে পারবে।"

ফো চলে গেলে মেয়েটি তার নিত্যকার কাজ নিয়ে বসল। খানিকটা কাপড় ফো-র জামা তৈরী করতে খরচ হয়ে গেছে, আর কতটা আছে দেখবার জন্য প্রথমেই সে একটা ফিতে নিয়ে কাপড় মাপতে বসল। কিন্তু ও মা, এ কি

কাণ্ড! মাপা যে কিছুতেই শেষ হয় না! যত মাপে ততই কাপড় বাড়তে থাকে। সারাদিন ধরে এইভাবে কাপড় বেড়ে চলল, সেও মেপে চল্‌ল সমানে। অবশেষে সন্ধ্যাবেলা মাপা শেষ হ'ল। ততক্ষণে তার সারা বাড়ী কাপড়ে ভরে গেছে। এত কাপড় জমেছে যে তা বিক্রী করলে সে টাকায় তার সারা জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

মেয়েটির সৌভাগ্যের কথা পাড়ায় কারো কাছে চাপা রইল না। যারা তাকে পছন্দ করত তারা সকলেই খুসী হ'ল। এখন, তার বাড়ীর কাছে আর একটি মেয়ে থাকত। ওর বন্ধু হলেও মনটা তার অত বড় ছিল না কিন্তু লোভ ছিল পুরো মাত্রায়। সে ভাবতে লাগল, আহা আমার বাড়ীতেও যদি ঐ রকম কোন বুড়ো অতিথি আসে!

এদিকে ফো ভাবলেন, একটি লোক দেখে তো মানুষের সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করা উচিত নয়, তাই তিনি ঠিক করলেন আর একজনের বাড়ী অতিথি হয়ে দেখবেন। এবং, দৈবক্রমে, তিনি সেই লোভী মেয়েটির বাড়ী গিয়েই হাজির হলেন।

অতিথি দেখে লোভ হলেও অতিথির চেহারা দেখে মেয়েটির পিত্তি জ্বলে গেল। ফো আবার সেই পুরোনো ছেঁড়া জামাটাই প'রে এসেছেন। এই রকম নোংরা একটা বুড়ো ভিখারীকে কি কেউ আদর যত্ন করতে পারে? তবু ভেবে-চিন্তে মেয়েটি শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেল। কিন্তু খেতে দিল শুধু কয়েকখানা আধ-পোড়া রুটি আর জল। তারপর একটা ময়লা মাদুর দেখিয়ে বল্‌ল, "এইখানে শুয়ে থাক।"

ফো তাঁর ছেঁড়া জামাটা দেখিয়ে বললেন, "জামাটা বড্ড ছিঁড়ে গেছে…"

মেয়েটি প্রথমে মুখ ঝামটা দিয়ে বল্‌ল, "তা আমি কি করব!" তারপর কি মনে করে একটা সূচ-সূতো নিয়ে বল্‌ল, "দাও, মেরামত করে দিচ্ছি।" —অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে সে কোন রকমে জামার ছেঁড়াগুলো একটু একটু যুড়ে দিয়েই জামাটা ফো-র গায়ে ছুঁড়ে দিল।

পরদিন সকালে ফো বাসিমুখেই বিদায় নিলেন। মেয়েটি একবারও তাঁকে খেয়ে যেতে বলল না, যদিও ফো দেখলেন ঘরে যথেষ্ট খাবার মজুত রয়েছে।

কিন্তু তবু ফো ভাবলেন, আমি কেন অতিথির কর্ত্তব্য করে যাব না? তিনি বললেন, "আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, আমি চলে যাবার পর তুমি যে কাজে হাত দেবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই কাজই করে যেতে পারবে।"

ফো চলে যেতেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি ছুটল গজের ফিতে খুঁজতে, কাপড় মাপতে হবে তো! ঠিক সেই সময়ে তার পোষা শূয়োরটাও সুরু করে দিল দারুণ চীৎকার—ক্ষিদের চোটে। কাল থেকে সে খেতে পায় নি, গোলমালে। ওকে খাবার খাইয়ে শান্ত করতে না পারলে কোন কাজই ও করতে দেবে না—চেঁচিয়ে বাড়ী মাৎ করে তুলবে। অগত্যা মেয়েটি ওকে খাবারটা আগে দিয়ে শান্ত করে নেবে ভেবে কূয়োয় গেল জল তুলতে। খাবারের সঙ্গে জল না দিলে ও আবার তা ছোঁবে না। কিন্তু ও মা, কূয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে তার হাতে ব্যথা ধরে গেল, তবু তার জল তোলা যে আর শেষই হয় না! চেষ্টা করেও সে জল তোলা বন্ধ করতে পারল না! দেবতার বর—প্রথমে যে কাজে সে হাত দেবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাকে আজ সেই কাজই করে যেতে হবে।

দেখতে দেখতে সমস্ত বাড়ী জলে জলময় হয়ে উঠল। শেষে সে জল রাস্তায় জমতে লাগল,—তার পর প্রতিবেশীদের বাড়ীতে। তারা এসে থামাবার চেষ্টা করল কিন্তু না পেরে বিরক্ত হয়ে রাজার সেপাইদের খবর দিল। সেপাইরা তো আর সব কথা জানে না, তারা মনে করল মেয়েটি ইচ্ছে করেই সবাইকে বিপদে ফেলবার জন্য এই রকম করছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে যখন মেয়েটি থামল তখন তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে, শাস্তি দেবার জন্য।

তারপর মেয়েটির যা সাজা হ'ল তা আর নাই বা বললাম।

নিমন্ত্রণ রক্ষা (সপরিবারে)

গোপাল তাদের পরিবারের সঙ্গেও পরিচিত হ'ল। হেমের বোনই হচ্ছে স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতার সঙ্গেও গোপালের খুব ভাব হ'ল এবং তারা পরস্পরকে বিয়ে করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু স্বর্ণলতার বাবা গরীব গোপালকে জামাই করতে রাজী হলেন না।

তারপর নানা ঘটনার পর অনেক দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে গোপাল ও স্বর্ণলতার বিয়ে হ'ল। তাদের সুখের দিন ফিরে এল।

ওদিকে তাদের গ্রামে ততদিনে এক কাণ্ড হয়েছে। শশিভূষণ মনিবের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। তিনি তাঁর টাকাপয়সা কিছুই নিজের নামে রাখতেন না—সবই স্ত্রী প্রমদার নামে বেনামী করা থাকত। স্বামীর এই বিপদের সময়েও প্রমদা তা থেকে একটি পয়সা স্বামীকে সাহায্য না করায় শশিভূষণ বিপদে পড়লেন। চাকরী, সম্পত্তি সমস্তই খোয়া গেল তাঁর। জীবন হয়ে গেল মরুভূমি। এদিকে প্রমদাও সুখী হতে পারলেন না। শেষে একদিন নৌকো করে যাবার সময় নৌকোডুবি হয়ে তাঁর অভিশপ্ত জীবন শেষ হ'ল।

ছড়া

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রুক্মিণীর পক্ষিণী

এক যে আছে রুক্মিণী
তার যে এক পক্ষিণী।
কাজের মধ্যে খাওয়া,
হলুদ-জলে নাওয়া;
বুক ফুলিয়ে হাঁটেন,
পারলে ঠোঁটে কাটেন।
বলবে তাকে লক্ষ্মিণী?

একে একে দুই

এক
হি
যাবে সাগরডিহি?
সেখানে হরদম
ব্যাঙ-বাচ্ছা খাচ্ছে আলুর দম;
বিকেল হলে বেড়ায় পরে
কাপড় মিহি মিহি॥

দুই
হি-হি-হি
মাঝ-রাত্রে কাঠের ঘোড়া
হাঁকে চিঁহি-চিঁহি।
"কী চাই রে, কী চাই?"
"জ্বালাও কেন ভাই?
ম্যালেরিয়ার জ্বর ছেড়েছে
গান গাচ্ছি তাই॥"

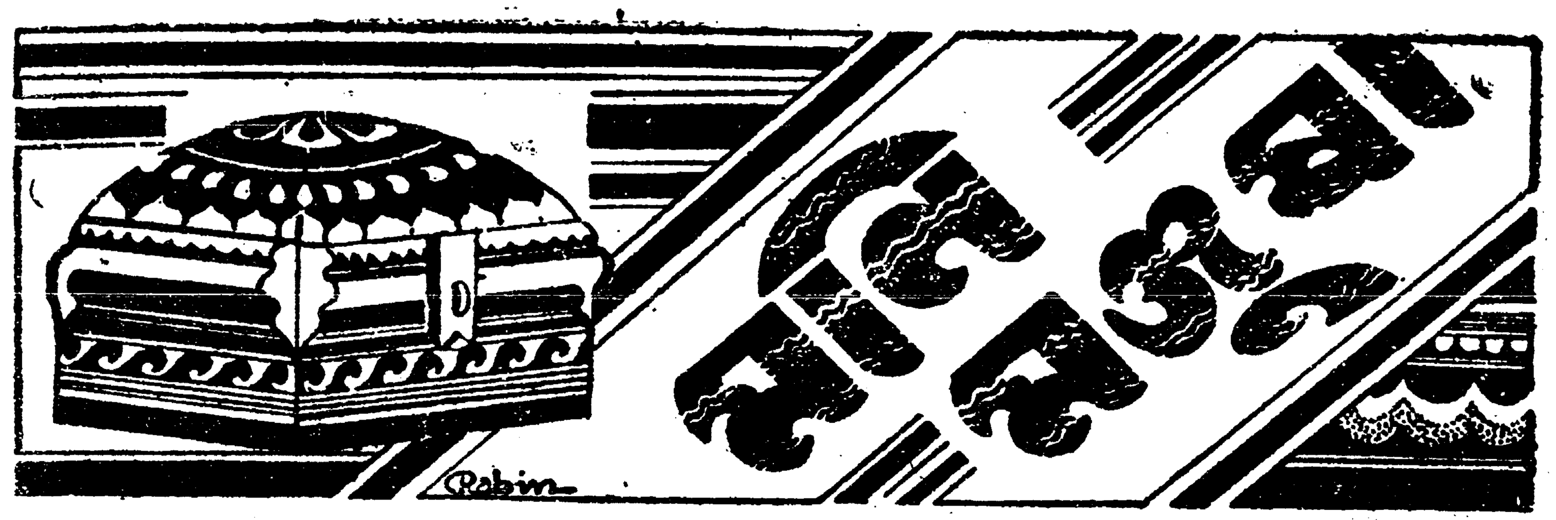

স্বর্ণলতা

[স্বর্ণলতা ডাঃ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একখানি বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস। এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মতই এই বইখানি বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে সমাদর পেয়েছিল এবং ধরতে গেলে এই একখানি বই লিখেই গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। এখানে বইএর গল্পাংশটি খুব সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল।]

শশিভূষণ আর বিধুভূষণ দুই ভাই। বড় শশিভূষণ গ্রামের জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করতেন কিন্তু বিধুভূষণ কিছুই করতেন না। শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদা ছিলেন অত্যন্ত ঝগড়াটে এবং কুটীল, বিধুভূষণের স্ত্রী সরলা ছিলেন আবার তেমনি লক্ষ্মী এবং গুণবতী। কিন্তু বেকার স্বামীর জন্য তাঁকে সর্ব্বদাই বড় জায়ের কাছে গঞ্জনা সইতে হ'ত। প্রমদার একটি ভাই ছিল—রামখোকা গডাঢরচণ্ড। সে "ডুডও খেট, টামাকও খেট।"

যাই হোক্, অবশেষে প্রমদার চক্রান্তে দু'ভাই পৃথক্ হলেন। বিধুভূষণ তখন আর উপায়ান্তর না দেখে রোজগারের জন্য চলে এলেন কলকাতায় এবং অনেক দুঃখকষ্টের পর একটি চাকরী যোগাড় করে মাসে মাসে দেশে ছেলে গোপালের নামে চিঠি ও টাকা পাঠাতে লাগলেন। এদিকে প্রমদা কৌশলে সে চিঠি ও টাকা হস্তগত করতে লাগলেন। ফলে সরলার আর দুঃখের অবধি রইল না। এইভাবে পাঁচ বছর কেটে গেল, শেষে সরলা কঠিন অসুখে পড়লেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন বিধুভূষণ গ্রামে এসে হাজির। কিন্তু সরলার জীবনদীপ তখন প্রায় নিভে এসেছে। স্বামীর সঙ্গে একবার শেষ দেখা হবার পরই তাঁর মৃত্যু হ'ল। বিধুভূষণ এ শোক সহ্য করতে পারলেন না, তিনি বালক গোপালের হাত ধরে কলকাতায় চলে এলেন।

কলকাতায় এসে গোপালকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হ'ল। তার পর তার থাকার আর খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে বিধুভূষণ চলে গেলেন ঢাকায়। এদিকে, হেম নামে একটি বড়লোকের ছেলের সঙ্গে গোপালের খুব বন্ধুত্ব হ'ল।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

এ মাসের রামধনু যখন তোমাদের হাতে পৌঁছবে তখন তোমরা সকলেই প্রায় পূজোর আনন্দে বিভোর। দুর্গোৎসব বাংলা দেশের সব চেয়ে বড় উৎসব। আবালবৃদ্ধবনিতা এতে অংশ গ্রহণ করে। এত ঘটা, এত দীর্ঘকালব্যাপী আনন্দ-অনুষ্ঠান আর কোন উৎসবেই হয় না। বাংলা দেশের বাইরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অবশ্যি দুর্গা পূজা এমন জাঁকজমকের সঙ্গে হয় না, তবুও সে সব জায়গায়ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সাড়া নেহাৎ কম দেখা যায় না।

কয়েক বছর থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি, দেশের তরুণরা ক্ষেত্র বিশেষে এই উৎসবের সময় নানা ব্যাপারে মাত্রা ছাড়িয়ে যান। আসল পূজা-অনুষ্ঠানের চাইতে লোক-দেখানো আড়ম্বরই সেখানে হয়ে পড়ে বেশী। অনেক সময় তা শালীনতার গণ্ডীও ছাড়িয়ে যায়। দেশের এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে সাধারণের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—অহেতুক অপব্যয়—একে কোন রকমেই প্রশংসা করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় এই ব্যাপার নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় (বা একই পাড়ায়) দলাদলি, ঝগড়াঝাঁটি এ সবও হয় প্রচুর। পূজার মূল উদ্দেশ্যই যে তাতে ব্যাহত হয় তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পার। তোমরা ও-রকম কিছু দেখলে তা সংশোধন করার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করবে এই তোমাদের কাছে আমাদের অনুরোধ।

শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য (সাজাহানপুর)—তোমার পাঠানো ধাঁধাগুলি বেশীর ভাগই পুরোনো—তার উত্তর অনেকেরই জানা। কাজেই ওরকম ধাঁধা না পাঠিয়ে স্বরচিত নতুন ধরণের ধাঁধা তৈরী করে পাঠাবার চেষ্টা ক'র। 'খোকাখুকু' পত্রিকা অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রীঅসীমা পাল (করিমগঞ্জ)—'তুমি গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এতে প্রথম হয়েছ এ খবরটা ভুল' লিখেছ। তোমার পুরোনো চিঠিটা বার করে দেখলাম—পড়লে কিন্তু ঐ রকমই মনে হয়। অবশ্যি জড়ানো লেখা পড়তে আমাদের ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। কিংবা তোমার চিঠিতে ম-এর পরে কোন শব্দ বাদ পড়ে যাওয়াতেই হয়তো এই বিভ্রাট হয়েছে। তবে তোমার লজ্জার কোন কারণ নেই, ত্রুটী আমাদেরই। শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী)—তোমার কাছে লেখা বড় বড় চিঠিগুলি বারে বারেই ডাকের গোলমালে হারায়। কি মুশ্‌কিল বল তো! আবার ঐ রকম 'মুড্' এলে তবেই না চিঠি লেখা যাবে! ভাল কথা, তোমার দেওয়া খবর—রামধনুর গ্রাহিকাদের মধ্যে কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা, দীপ্তি সেনগুপ্তা ও নিরুপমা তাম্‌লী বি এ অনার্সে উঁচু দিকে স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে জেনে খুব আনন্দ হ'ল। শ্রীগৌরকিশোর চৌধুরী (মণিনাথপুর)—তোমার কবিতার হাত এবারে অনেক ভাল হয়েছে দেখে খুসী হলাম। 'মন্বন্তরে' অবশ্যি ত্রুটী রয়ে

গেছে কিন্তু 'পাগল হাওয়া' আমাদের পছন্দ হয়েছে। পূর্ব্বমনোনীত কবিতাগুলি শেষ হলে এটি প্রকাশ করার চেষ্টা করব। শ্রীঅখিল সরকার (কৃষ্ণনগর)—তোমার সাহসিকতা-পূর্ণ চিঠিখানা পেয়ে খুব খুসী হলাম। ত্রুটী নিশ্চয়ই দেখাবে, তবে সবেতেই যে ত্রুটীর উল্লেখ করেছ তাতে মনে হয় তোমার রুচিটা হয়তো একটু অন্য রকম। বই মোটা হওয়াটাই তার গুণের সব চেয়ে বড় পরিচয় নয়। তা হ'লে তো পঞ্জিকার মত অত উঁচু-দরের সাহিত্য আর হ'তে পারে না। অত সস্তায় অত পাতা! কি ধরণের বা কোন্ লেখকদের লেখা তোমার পছন্দ তা জানিও। রঙ্গচিত্র এবারে দেওয়া হ'ল। তোমার পাঠানো গল্পটা কিন্তু অচল। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য (নৈহাটী)—তোমার দীর্ঘ পত্র ও ছবিটি পেয়ে ভাল লাগল। ছবিটি না দিতে পারলেও তোমার ছবির হাত বেশ ভাল। প্রস্তাবগুলি ভেবে দেখব, কিন্তু রহস্য-উপন্যাস যদি অস্বাভাবিক না হয় এবং তার রহস্যভেদ যদি বিজ্ঞানসম্মত হয় তবে তা অপাংক্তেয় হবে কেন? "জয়যাত্রা", "কৈশোরিকা", "রংমশাল"-- যত দূর জানি বন্ধ হয়ে গেছে। "কিশোর বাংলা" চলছে। শ্রীনমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর)—তোমার অনুরোধ পরে রাখতে চেষ্টা করব। পূজো-সংখ্যায় আমরা সাধারণতঃ কোনও ধারাবাহিক রচনা দেই না, এবারেও দেওয়া হ'ল না।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। পূজোর ছুটী কে কি রকম কাটালে জানালে খুসী হব।

ইতি—রাঃ সঃ

শ্রাবণ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

"কোন্ খেলা সব চেয়ে ভালবাসি"—এই সম্বন্ধে সব চেয়ে ভালো লেখার জন্য পুরস্কার পেলেন—শ্রীআশুতোষ মিত্র (মধুখাল)। আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে ঃ—শ্রীতৃপ্তি দাশগুপ্তা (এলাহাবাদ), শ্রীমনোজ রায় (কলিকাতা-৩২)

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(১) (ক) কালিদাস (খ) বঙ্কিমচন্দ্র (গ) বাণভট্ট (ঘ) ভিক্তর হুগো (ঙ) মিল্টন। (২) (ক) জাপানের একটা পাহাড়ের নাম। (খ) হীরা (গ) ড্যানিয়াল ডিফো। (৩) (ক) চণ্ডীদাস (খ) কীট্‌স্ (গ) শঙ্করাচার্য্য (ঘ) যোগীন্দ্রনাথ সরকার (৪) (ক) একরকম ধাতু (খ) বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে এক ধাতুর গায়ে অন্য ধাতু লাগানো (গ) এমন কাগজ যার এক রীমের (২০ দিস্তা) ওজন ৮ পাউণ্ড। (৫) (ক) জলাঙ্গী বা খড়ে (খ) গঙ্গা ও অজয় (গ) তিস্তা (ঘ) পদ্মা (ঙ) বুড়ীগঙ্গা (চ) কর্ণফুলি (ছ) গোমতী (জ) যমুনা (ঝ) ফল্গু (ঞ) গঙ্গা, বরুণা ও অসি (অধুনালুপ্ত)।

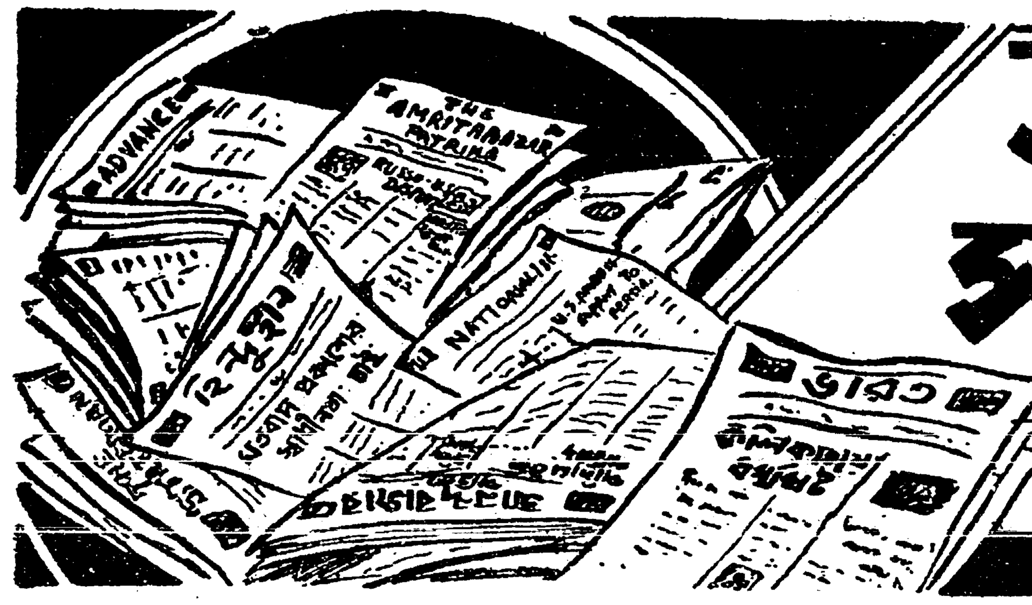

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

আই. এফ. এ. শীল্ড

কলকাতার ফুটবল মরশুম এখনও শেষ হয় নি। আই. এফ্. এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা এখনও বাকি। ফাইনালে উঠেছে দু'টি স্থানীয় দল—রাজস্থান ও মোহনবাগান।

বাইরে থেকে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে 'বাঙ্গালোর ব্লুজ্'-এর ওপর অনেকেই উচ্চাশা পোষণ করেছিল,—বিশেষতঃ তারা যখন লীগ্-চ্যাম্পিয়ন্ ইষ্ট বেঙ্গলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠল। কিন্তু সেমিফাইনালে তারা রাজস্থানের সঙ্গে পেরে ওঠে নি। অবশ্যি খেলার সুরুতেও তারা একবার হেরে গিয়েছিল ২৪ পরগণার কাছে। কিন্তু প্রতিযোগিতার নিয়মে ২৪ পরগণা দলে খেলতে পারে না এমন কয়েকটি খেলোয়াড় ঐ দলে খেলায় আই. এফ্. এ কর্ত্তৃপক্ষ তাদের সে জয় বাতিল করে বাঙ্গালোর ব্লুজ্‌কে ওয়াক্ ওভার দেন।

মোহনবাগান সেমিফাইনালে এরিয়ান্‌স্-এর সঙ্গে একদিন ড্র রেখে পরের দিন ২-০ গোলে জয়লাভ করে।

বিশ্ব ভলি বল্ প্রতিযোগিতা

'ভলি বল্' আমাদের দেশে আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি সমারোহের সঙ্গে এই খেলার আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। ভারত থেকে একদল পুরুষ ও একদল মহিলা খেলোয়াড় এতে যোগ দিয়েছিলেন। পুরুষ দল ইস্রাইল, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও লেবাননকে হারিয়ে ৩ পয়েণ্ট পায়; ১১টি প্রতিযোগীর মধ্যে তাদের স্থান হয় ৮ম। মহিলা দল ৮টি প্রতিযোগীদের মধ্যে ৮ম স্থান অর্থাৎ সকলের নীচেকার স্থান লাভ করে। তবে এই দলকে সর্ব্বভারতীয় দল বলে অনেকেই স্বীকার করেন নি, শুধু উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড়দের নিয়েই এই দলটি গঠিত হয়েছিল।

খেলায় পুরুষ ও মহিলা দু'টি বিভাগেই সোভিয়েট দল চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে। রানার্স আপ্ হয়েছে পুরুষ বিভাগে চেকোশ্লোভাকিয়া, মহিলা বিভাগে পোল্যাণ্ড। আমেরিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নি।

নতুন রাষ্ট্রদূত

সম্প্রতি সর্দ্দার কে. এম্. পানিকর মিশর দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত হয়েছেন, শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনকে আমেরিকা থেকে ইটালীতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পদে বদলী করা হয়েছে। আমেরিকায় গেছেন শ্রীযুক্ত জি. এল্. মেহ্‌তা।

ছাড়পত্র

বাংলা দেশ বিভক্ত হলেও এ যাবৎ পশ্চিম বাংলা আর পূর্ব্ব বাংলায় যাতায়াতে কোন বাধানিষেধ ছিল না। সম্প্রতি এই দুই রাজ্যে যাতায়াতের জন্যও বিদেশী দুই রাষ্ট্রের বিধান মত 'ভিসা' বা ছাড়পত্রের প্রবর্ত্তন হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলা সম্পূর্ণ ভাবেই ভাগ হ'ল। এই ছাড়পত্রের বিড়ম্বনার জন্য নতুন করে পূর্ব্ব বঙ্গ থেকে বাস্তুত্যাগীর ভিড় দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তান সরকারও সাধারণ নাগরিকদের ভীতি সঞ্চার করে দুই রাজ্যের সমস্ত সীমান্ত যুড়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেছেন।

হাসিখুসি

(সংগ্রহ)

শ্রীবিনতা মজুমদার (গ্রাহিকা)

কর্ম্মচারী—আমাকে আরও এক সপ্তাহ বেশী ছুটী দিন।

মালিক— কেন বল তো?

কর্ম্মচারী—দেখছেন না, কি রকম পরিশ্রম করতে পারি আমি! অন্য সবাই যে কাজ দশ ঘণ্টায় করছে আমি তা পাঁচ ঘণ্টায় করে দিচ্ছি। সব কিছুই অর্দ্ধেক সময়ে হয়ে যায় আমার। কাজেই সবাই এক সপ্তাহ ছুটী পেলে আমি দু' সপ্তাহ দাবী করতে পারি অনায়াসে।

মালিক—ঠিক উল্টো কথা বলছ। আর সবাইকার যদি এক সপ্তাহ ছুটী দরকার হয় তোমার তো তবে দরকার হবে আধ সপ্তাহ। কারণ এক সপ্তাহে ওরা যেটুকু ছুটী উপভোগ করবে তুমি তার অর্দ্ধেক সময়েই সেটুকু উপভোগ করে নিতে পারবে, নয় কি?

* *

খোকা—দাদু, তোমার মুখে ক'টা দাঁত?

দাদু—বুড়ো মানুষের কি দাঁত থাকে রে? সব পড়ে গেছে।

খোকা—একটাও নেই? কিচ্ছু চিবুতে পার না তা হলে?

দাদু—না—রে!

খোকা—তবে দাদু, এই বিস্কুটটা একটু ধর না, আমি এক্ষুণি আসছি।

বিঃ দ্রঃ পূজো উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকবে, তাই কার্ত্তিকের রামধনু কার্ত্তিক মাসের ২য় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

শব্দগুলি এই রকম হবে ঃ—

(১) মীনা—নামী (২) জবা—বাজ (৩) মাথা—থামা (৪) টাক—কটা (৫) ঘুর—রঘু (৬) কথা—থাক (৭) সব—বস (৮) বাবা—বাবা (৯) তা তো—তো তা।

উত্তরদাতাদের নাম ঃ— সুমিতা মুখোপাধ্যায় (কার্কী—পুনা) ; টাটা, টুটু, টিটি, টিটো, টোটা, টৈটু (জামসেদপুর) ; সরিৎকুমার দত্ত (গুড়াপ) ; অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা-১৪) ; সুস্মিতা বসু (কলিকাতা-২৫) ; হেমেন্দ্রনাথ সেন (বালিগঞ্জ) ; বিভাসবিহারী বসু (পাটনা) ; মিন্টো, টুকা, খুকু, ইরা পাটনা ; দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, বাণী, রাণী, শিবু (সাজাহানপুর) ; সঞ্জীবকুমার গাঙ্গুলী (কলিকাতা-২৮) ; মহম্মদ আলি (বগুড়া) ; সুপ্রভা বসু (কালীঘাট) ; রমা মৈত্র (দিল্লী)।

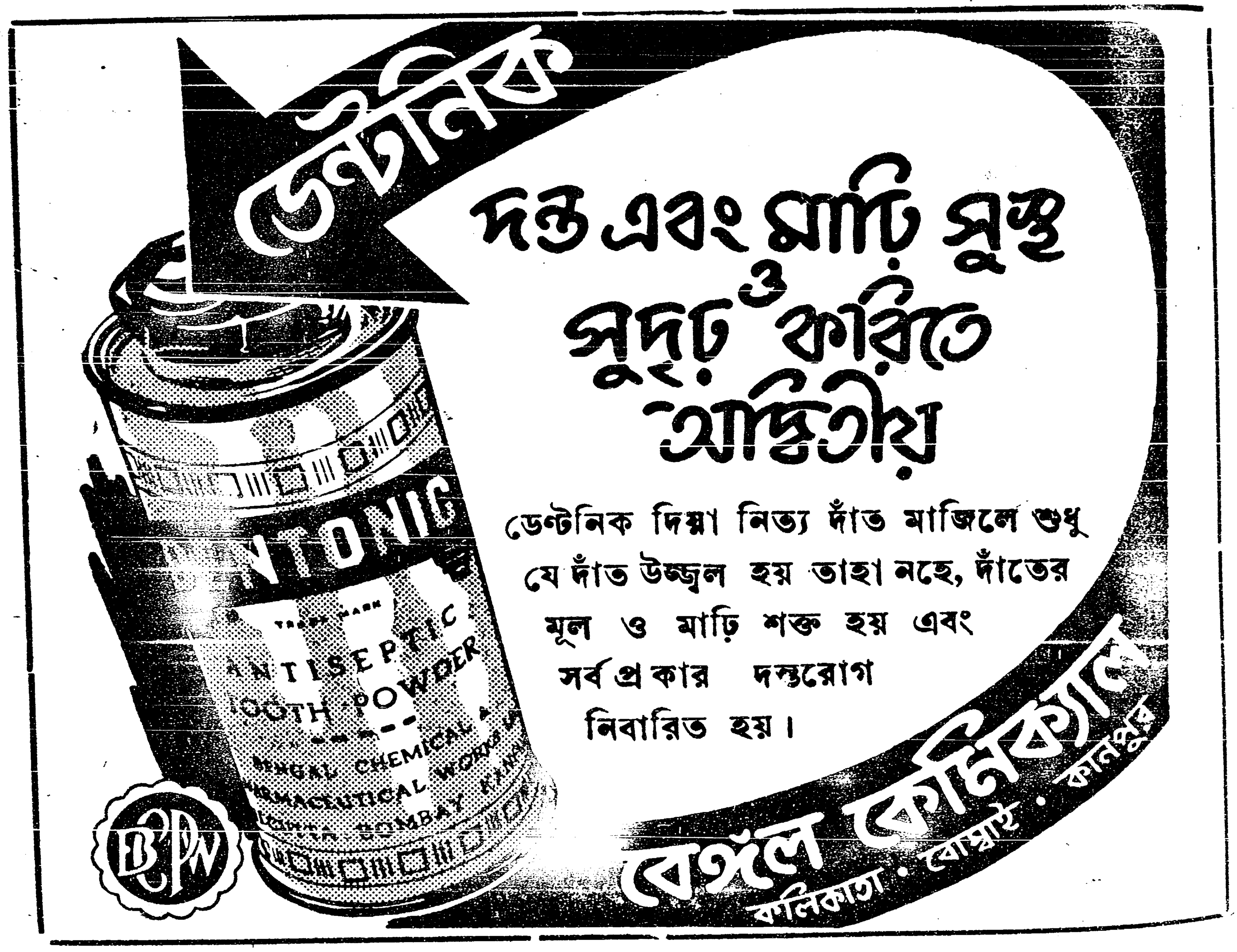

নূতন ধাঁধা

হেঁয়ালী

(১) কোন্ জায়গা মনটাকে খুসী করে? (২) কোন্ সহরে একটি ইংরাজী অক্ষরকে আক্ষেপ করে বাদ দেওয়া হয়েছে? (৩) কোন্ বন্দর হীরে দিয়ে তৈরী? (৪) কোথায় হিন্দীভাষীদের জল দেখে ভয় লাগে? (৫) কোন্ পবিত্র নদীর বয়স খুব বেশী? (৬) কোন্ রাজার শরীরে গিয়ে চাঁদ লুকিয়ে ছিল? (৭) কোন রাজা পাৎলা ন'ন? (৮) কোন্ দেশ সব সময়েই রেগে আছে? (৯) কোন্ দেশের কোনও জিনিষ নেবার লোভ নেই? (১০) কোন্ নদী আসলে সমুদ্র? (১১) কোন্ পাহাড় সবুজও নয়, সাদাও নয়? (১২) পূজোর আগে পাড়ার ছেলেরা কোন্ মাছের জন্য ঘুরে বেড়ায়? (১৩) কোন্ প্রাণীর লেজের দিক্‌টা পণ্ডিত মশায়ের মাথায়? (১৪) কোথাকার ঘাট বালি দিয়ে তৈরী? (১৫) কোন্ পাখী দু'বার করলে ভাল লাগে না?-

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এবারে ২টি পুরস্কার

নীচে ১৬ জন স্বদেশপ্রেমিকের নাম দেওয়া হ'ল। এঁদের মধ্যে তোমার সব চেয়ে প্রিয় কে, কে তারপর—এই রকম ১ম, ২য়, ৩য়—এই ভাবে লিখে পাঠাও। তোমাদের সকলকার ভোট নিয়ে আমরা তালিকা তৈরী করব এবং সেই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি যার তালিকা হবে সেই পাবে প্রথম পুরস্কার, এবং তার পরের জন ২য় পুরস্কার। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক তালিকার সঙ্গে নীচের কুপনখানি কেটে যুড়ে দিতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। প্রতিযোগিতার লেখা ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

স্বদেশপ্রেমিকদের নাম ঃ—দাদাভাই নৌরজী, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), রাসবিহারী বসু, ক্ষুদিরাম বসু, জওহরলাল নেহরু, রাজাগোপাল আচারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু।

কুপন

রামধনু

পুঃ আশ্বিন ৫৯

নাম—

ঠিকানা—

বয়স—

নিজে গ্রাহক কিনা—

শিশুদের জন্য

পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার—

মেট্রোপলিটানের

একটি 'বিলম্বিত দায়যুক্ত পলিসি'

(CHILDREN'S DEFERRED POLICY)

দি

মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোং, লিঃ

কলিকাতা

—পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার—

- দি ওয়ার অব দি ওয়ার্লডস্—ওয়েলস্ ১৷৷০
- দি চিলড্রেন অব দি নিউ ফরেষ্ট—ম্যারিয়াট ১৷০
- অথই জলের রূপকথা (দি ওয়াটার বেবীজ) —কিংসলে ১৷৷০
- দি ইন্‌ভিজিব্‌ল্ ম্যান্—ওয়েলস ১৷৷০
- দি আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো ঐ ২৲
- এইচ্. জি. ওয়েল্‌সের গল্প ঐ সম্পাদক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২৷৵০
- কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড—ব্যাল্যাণ্টাইন ১৷০
- গরিলা হাণ্টাস—ঐ ১৷০
- নিকলাস্ নিকল্‌বি—ডিকেন্স ১৲
- দি ব্ল্যাক টিউলিপ—ডুমা ১৷৷০
- মাষ্টারম্যান রেডি—ম্যারিয়াট ১৲
- নিশাচর—স্বকুমার দে সরকার ১৲
- ২৪শে এপ্রিল চুপ—ঐ ১৲

- আমার ভালুক শিকার—শিব্রাম চক্রবর্ত্তী ১৷৷০
- ময়ূরকণ্ঠী বন—স্বকুমার দে সরকার ২৲
- হত্যা এবং তারপর—হেমেন্দ্রকুমার রায় ১৲
- ফিরোজা-মুকুট রহস্য—ঐ ১৲
- স্বলু সাগরের ভূতুড়ে দেশ—ঐ ১৷৷০
- রুণুটুনুর এ্যাড্‌ভেঞ্চার ঐ ১৷৵০
- বিশাল গড়ের দুঃশাসন—ঐ ২৲
- অদৃশ্য কালো হাত—নীহার গুপ্ত ১৲
- ভ্যাম্পায়ার—মণিলাল অধিকারী ১৲
- রক্তাভ বুদ্ধ—ঐ ১৷০
- ব্ল্যাক মেল—অমিয় চক্রবর্ত্তী ১৲
- দ্বীপান্তরের কয়েদী—ঐ ৷৷৵০
- রঙ্গীন হাসি (ছড়া)—স্বনির্মল বসু ৷৷০
- খোকাখুকুর আসর—মণি অধিকারী ৷৵০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির—২৪বি লেক রোড, কলিকাতা-২৯

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই

[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাল এজুকেশন বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত]

১।	মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু ...	৪৷৵০
*২।	গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র ...	১৷৷০
*৩।	মাঞ্চুসেনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার— " ...	৵০
*৪।	ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস ...	১৷০
*৫।	" আইনষ্টাইন— " ...	১৷০
৬।	" মার্কনি— " ...	১৷০
*৭।	দেশবিদেশের লেখা	৩৲
৮।	গল্পবীথিকা—গদাধর নিয়োগী ...	১৷৵০
*৯।	আসামের অরণ্যচারী—নলিনীকুমার ভদ্র ...	১৷৷০

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত

চয়নিকা

মাসিক পত্রিকা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

এবারেও পূজোয় তোমাদের জন্যে

"ইন্দিরা দেবীর"

সম্পাদনায় প্রকাশ করা হচ্ছে

ঝলমলে পূজা-বার্ষিকী

সাত সমুদ্দুর

২য় বর্ষ

শুধু ঝলমলে নয়—গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, ধাঁধা, মজার খেলা, কবিতা, কার্টুন, ভ্রমণ-কাহিনী, হাসির গল্পে বোঝাই।

দাম: আড়াই টাকা প্রকাশক: শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী

পরিবেশক:

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা: ১২

শৈশবেই শিক্ষা দিন

নিম
টুথ পেষ্ট

শৈশব থেকেই শিশুদের দাঁতের যত্নের জন্য নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহার করতে শেখান উচিত

কারণ ঃ—

১। নিম টুথ পেষ্টে নিম দাঁতনের সব গুণ তো আছেই, তার সঙ্গে দাঁত ও মাড়ীর পক্ষে উপকারী প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নানা উপাদানও আছে ; তার ফলে নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও সুন্দর হয়, পাইওরিয়া হয় না, মাড়ী শক্ত হয়, মুখের দুর্গন্ধও দূর করে।

২। নিম টুথ পেষ্টে দাঁতের এনামেল বা মাড়ীর পক্ষে সামান্যতম ক্ষতিকরও কোন জিনিষ নেই।

৩। সীসক বিষ যাতে সংক্রামিত হতে না পারে, এজন্য মূল্যবান টিনের টিউবে ভর্ত্তি করা হয়।

নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল নিম টুথ পেষ্টএর সঙ্গে বাজারের সাধারণ টুথ পেষ্ট-এর তুলনা করা চলে না।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, লিঃ
কলিকাতা-২৯

এবার পূজায়—

ছেলেমেয়েদের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা বার্ষিকী

পরশ মণি—

(মূল্য চার টাকা)

—এতে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(অপ্রকাশিত রচনা)
যতীন্দ্রমোহন বাগচী
(অপ্রকাশিত রচনা)
হেমেন্দ্রকুমার রায়
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কালিদাস রায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
বুদ্ধদেব বসু
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সজনীকান্ত দাস
সুনির্ম্মল বসু
বনফুল
প্রভাবতী দেবী
আরও অনেকে

অন্যান্য বছরের
পূজাবার্ষিকী
ছোটদের চয়নিকা
ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন
ঝলমল
আজব বই
শিশু গল্পিকা
সোনার কাঠী
চিত্রদীপ
মধুমেলা
রূপরেখা
বর্ষমঙ্গল
আলপনা
রাঙ্গারাখী
নবারুণ
অঞ্জলি, উদয়ন,
আবাহন।

প্রত্যেকখানা ৩৲ টাকা

এখনও কিছু
অবশিষ্ট আছে
১৩৫৮ সালের
পূজা বার্ষিকী

অভিষেক
মূল্য চার টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর —২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

৪/১, পণ্ডিতিয়া রোড ও ৭/১. রসা রোড; ফোন পি.কে. ৪৩৫৬

সুপ্রসিদ্ধ

লক্ষ্মী ঘি

উৎসব অনুষ্ঠানে
অপরিহার্য্য
ছেলেমেয়েদের বিশেষ প্রিয়

সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র
সুপরিচিত ও সমাদৃত

* * *

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—ব্যাঙ্ক ৭২৪৩

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

কয়েকটী মনোরম
ও
স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

রজত জয়ন্তী বর্ষ

সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম.এস.সি

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই

[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাল এডুকেশন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত]

১।	মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু	...	৪৬৹
*২।	গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১॥৹
*৩।	মাঞ্চুসেনের অ্যাডভেঞ্চার— „	...	৬৹
*৪।	ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস	...	১।৹
*৫।	„ আইনষ্টাইন— „	...	১।৹
৬।	„ মার্কনি— „	...	১।৹

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

চয়নিকা মাসিক পত্রিকা

নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৫৯ { ৭ম সংখ্যা

নতুন খেলা

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা এলেন বিদেশ থেকে—
আঙিনাতে বস্‌ল মেলা,
শিউলি-ঝরা ভোরের বেলায়
সুরু মোদের নতুন খেলা।
নীল গগনে যাচ্ছে ভেসে
দুধের বরণ মেঘের তরী,
দুষ্টু হাওয়ার মিষ্টি দোলায়—
শিউলি বকুল পড়ছে ঝরি'।
সবুজ মাঠের ওপার থেকে
ডাক্‌ছে কে, মা, হাতছানিতে,

কাশের বনে ভাব করে সে
চায়, মা, রাখী পরিয়ে দিতে।
মাগো, ওমা, আজকে মোরা
যাবো না ত' কারোর কাছে,
বাবায় ঘিরে দিন কাটাবো—
সকাল তুপুর গান ও নাচে।
বিদেশ থেকে সবার বাবাই
মা, আজ বুঝি ফিরল ঘরে ;
ফুল-ছেলেরা ফুলের বনে
বাবার সাথেই খেলা করে।
নীল আকাশের ওপর থেকে
পাখীর বাবা ফিরল নীড়ে,
রামধনুকের প্রজাপতি—
বাবায় তাদের পায় যে ফিরে।
রেল চলেছে ঝম্‌ঝমিয়ে—
ষ্টিমার চলে নদীর জলে,
বাবার আসার পথটি চেয়ে
জাগাই পুলক বুকের তলে।
বাবার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি—
মায়ের অশ্রু পড়ছে ঝ'রে,
বাবায় ঘিরে সুরু মোদের
নতুন খেলা আজকে ভোরে।

ছুটিতে গোপালপুর

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

আমি বসে আছি। সামনে বঙ্গোপসাগরের নীল ঢেউগুলো সাদা ফণা তুলে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এগিয়ে আস্‌ছে। চক্ষের নিমেষে তীরে এসে তারা মাথা কুটে পড়ল। বেলাভূমিতে একরাশ সাদা ফুলের ছড়াছড়ি। তারপর কার অদৃশ্য হাত যেন ফেনিল জলরাশিকে আবার টেনে নিয়ে চলে গেল। যতদূর তাকাই নীল আর নীল। দৃষ্টির শেষ প্রান্তে দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের গাঢ় নীল রং আকাশের ঘন নীলিমার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। "নীলিমায় নীলিমায় মহিমায় মহিমায় মহাদৃশ্য অনন্তের অনন্ত মিলন।"

সমুদ্রের কথা কে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল জানি না। এবার গরমের ছুটিতে কলেজ বন্ধ হবার আগে কলকাতার জনাকীর্ণ রাস্তার ধারে বসে আমি এই স্বপ্ন দেখতুম। এ যেন সংক্রামক ব্যাধি, বাড়ীর আর সকলকে পেয়ে বসল। শেষে ঠিক হ'ল কলেজ বন্ধ হলেই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতে হবে। পুরীতে বড় লোকের ভীড়। আমরা চাই সমুদ্রকে একান্ত ভাবে পেতে। তাই ঠিক হ'ল আর একটু এগিয়ে নিরিবিলি গোপালপুরে গিয়ে ক'দিন কাটিয়ে আসব।

একদিন বিকেলে আমরা মাদ্রাজ মেলে চড়ে বসলুম। সারারাত্রি চলে মহানদী, বৈতরণী, কাটজুড়ি পিছনে ফেলে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরকে পাশে রেখে, ঘুমন্ত চিল্কার দিকে একবার অতৃপ্ত দৃষ্টি ফেলে, তু'পাশের পর্বতমালার সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে ভোরবেলা পৌঁছে গেলাম বেরহামপুর বলে উড়িষ্যার একটি ছোট্ট সহরে। ছোট কিন্তু ঝর্‌ঝরে। বাংলো ধরণের সব বাড়ী ; পিচের রাস্তা। রাস্তার ধারে অগুণতি কৃষ্ণচূড়া গাছে লালফুলের আগুন। ষ্টেশন থেকে বাস্-স্ট্যাণ্ড এক মাইল। সেখান থেকে বাসে চেপে বার মাইল পার হয়ে গোপালপুর।

ষ্টেশনের বাইরে এসে দেখি বহু ঝট্‌কা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের লুফে নেবার জন্য সবাই ব্যগ্র। বাংলার পল্লী অঞ্চলের ঢাকা গরুর গাড়ির ছোট সংস্করণের সঙ্গে যদি টাট্টু ঘোড়া জুড়ে দেওয়া যায় তা হলে যেমন দেখতে হয় ঝট্‌কা অনেকটা তেমনি। যখন জোরে ছোটে তখন অনভ্যস্ত মন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ঝট্‌কার গতিবিধি দেখে ক্ষণিকের জন্য আমাদের সাগরস্বপ্ন টুটে গেল। কিন্তু যেতে তো হবেই। অনেক দর কষাকষি করে আমরা তু'খানি গাড়িতে

চেপে বসলুম। প্রথমটিতে রইলেন এক বন্ধু, তাঁর সঙ্গে আমার ছ' বছরের মেয়ে। পরেরটিতে আমরা বাকী তিনজন।

যা ভয় করেছিলুম ঠিক তাই। ভোরের ফুরফুরে হাওয়ায় আগের ঝট্‌কা-ওয়ালার মনে স্ফূর্তি এল। দ্রুতগতিতে সে চালিয়ে দিল তার গাড়ী। তারপর মনের আনন্দে—বোধ হয় চোখ বুজে—তেলেগু ভাষায় সুর ধরল। ভোরের অন্ধকার তখনও একবারে কাটে নি। এক বৃদ্ধ রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে চলেছে। সম্ভবতঃ তার দৃষ্টিশক্তি ঈষৎ ক্ষীণ। ঝট্‌কা হুড়মুড় করে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। তার উরুর উপর দিয়ে একটি চাকা গেল চলে। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের মধ্য দিয়ে মহাভারতে করুণ রসের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধের উরুভঙ্গের ফলে আমাদের অবস্থা হ'ল আরও করুণ। বৃদ্ধ স্থির হয়ে রাস্তায় পড়ে। পিছনে তার স্ত্রী তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। দু'-চার জন লোক জড় হয়ে গেল। ঝট্‌কাওয়ালা তড়াক করে গাড়ি থেকে নেমে বৃদ্ধের পা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে তাকে রাস্তার পাশে নিয়ে গেল। এদিকে চালকহীন অশ্ব গাড়ি শুদ্ধ মনের আনন্দে পাশের এক খালের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। বন্ধু হৈ হৈ করে উঠলেন। আমরাও চেঁচিয়ে উঠলাম। ঝট্‌কাওয়ালা আবার ছুটে এসে ঘোড়াকে শান্ত করল। যাই হোক, কোন রকমে হাঙ্গামা চুকিয়ে বাস্-ষ্ট্যাণ্ড আসা গেল।

বাসে উঠে বস্‌লে গোপালপুর যেতে বেশীক্ষণ লাগে না। বাস্ থেকে নেমে আমরা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে নতুন বাসার উদ্দেশে চললুম। পিছনে নুলিয়ার দল। বাসায় পোঁছে যাবার আগেই তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করি এই তারা চায়। পরিশ্রান্ত আমরা তাদের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায় আরও ক্লান্ত হয়ে গেলুম। এমনি সময় হঠাৎ চোখের সামনে সমুদ্র ভেসে উঠল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় পথের সমস্ত গ্লানি জুড়িয়ে গেল যেন।

গোপালপুর ছোট্ট সহর। তাকে সহর বলাই ভুল। লম্বা কিম্বা চওড়ায় এক মাইলও নয়। বাড়ীগুলো প্রায় সবই সমুদ্রের ধারে ধারে। স্থানীয় গরীবদের আড্ডাগুলো ভিতরের দিকে। অনেকগুলো হোটেল আছে। এখানকার বেশীর ভাগ লোকেরই চলে পর্যটকদের সেবা আর তুষ্টি সাধন করে।

একধারে খুব চওড়া অনেকটা বড় খালের মত একটি জলস্রোত। তার নাম ব্যাক ওয়াটার। সমুদ্র তাকে জলদান করে। এর জল ধীর স্থির। চারিদিকে মাছের জাল পাতা। মাছ ধরবার এবং নৌকাবিহারের প্রশস্ত স্থান।

তীরভূমি থেকে খানিক দূরে ছোট ছোট পাহাড়। সেখানে উঠলে ছোট্ট সহরটিকে দেখায় ছবির মত। তার পাশ দিয়ে গর্জন করতে করতে সমুদ্রকে ছুটে চলতে দেখা যায়। পাহাড়ের উপর একটি লাইট হাউস জাহাজদের পথ দেখায়।

এখানে একটি মানমন্দির আছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রত্যহ লোকজনদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

সমুদ্রস্নান

গোপালপুর উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজের প্রায় সীমায় অবস্থিত। উড়িয়াদের সংখ্যা খুব কম। যে দিকে তাকাও দেখবে তেলেগুভাষী মাদ্রাজীদের।

এখানকার বেলাভূমি নির্জন, গম্ভীর এবং সুন্দর। যতদূর পার বেড়াও, বাধা পাবে না। পাশে পাশে খানিকটা দূরে নুলিয়াদের গ্রাম। এদের কাজ মাছ ধরা, শামুক-ঝিনুক প্রভৃতি সংগ্রহ করা, বিদেশীকে সমুদ্রস্নানে সাহায্য করা। বড় গরীব এরা। একটা পয়সার জন্য এক মাইল তোমার পিছনে যাবে! কিন্তু এত গরীব হলেও এখানকার লোক চুরি প্রায় করেই না।

ভোরবেলা নুলিয়ারা তাদের নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যায়। নৌকাগুলো অদ্ভুত। তিনটে লম্বা কাঠকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নৌকা তৈরী করা হয়। নাম ক্যাটামারান। সমুদ্রের সঙ্গে যেন ছেলেখেলা। এই নৌকা নিয়ে তারা মাইলের পর মাইল চলে যায়। কত বার নৌকা উল্টে যায়, আবার ঠিক হয়ে তারা চড়ে বসে। মাছের থলি আর জালকে শক্ত করে নৌকার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সারা দুপুর এদের নৌকা ফিরতে থাকে, আর তীরভূমিতে লেগে যায় মৎস্যাশীদের ভিড়। কত রকমের মাছ! বড় বড় চাঁদা—সূর্যের আলোয় তাদের গা ঝকমক্ করে ওঠে; ইংরেজীতে যাদের বলে পম্‌ফ্রেট, ম্যাকারেল, সার্ডিন আরও কত কী!

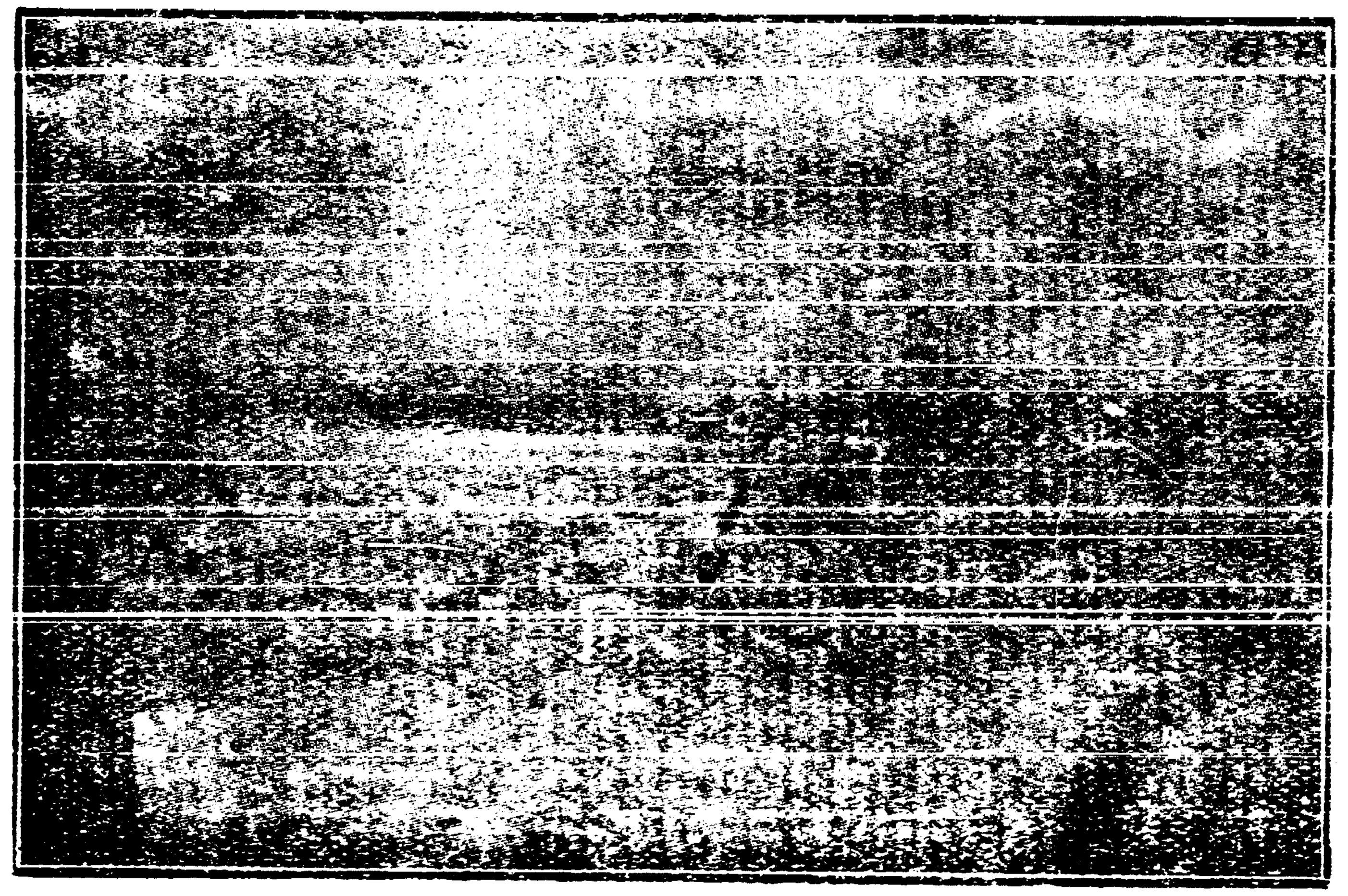

সাগরে আলোর খেলা

গোপালপুরে দু' দলের লোক আসেন। একদল আসেন স্বাস্থ্যের অন্বেষণে, অন্য দল আসেন বেড়াতে। সমুদ্রস্নান, সমুদ্র-দর্শন আর সমুদ্রচিন্তাই হ'ল এ দলের কাজ। আমরা ছিলুম এ দলেরই লোক।

সমুদ্রের ধারে বসে দিনের পর দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সে অপরূপ রূপ দেখে কিছুতে তৃপ্তি আসে না। ক্ষণে ক্ষণে দেখি নতুন নতুন রংএর খেলা। ভোর হতে না হতে সমুদ্র তোমাকে তীরে টেনে নিয়ে যাবে। তুমি দেখবে জল থেকে লাফিয়ে সূর্য আকাশে ঠ্‌ছে। হঠাৎ চারিদিক্ আলোয় আলো হয়ে যাবে। যত বেলা বাড়তে থাকবে তত সমুদ্র নিজের রং বদলাবে। ভোরবেলা ঘন নীল। দুপুরে সবুজ আর নীলের সংমিশ্রণ। বেলা পড়ে এলে আকাশে লাল আর নীলের খেলা। নীচে নীল জলে লালের আভা। ক্রমে নীল জল কালো হতে থাকে। আরও পরে কিছু দেখা যায় না। শোনা যায় একটানা গর্জন আর বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে। তখন বসে থাকতে গা ছম্‌ছম্ করে

সমুদ্রকে বিদায় জানিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে কলকাতায় ফিরেছি। মহানগরীর জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে যখন সাঁতার কাটি তখন হঠাৎ গোপালপুরের সমুদ্র মনশ্চক্ষে ফুটে ওঠে। স্থান কাল ভুলে যাই। সত্যিই কি সমুদ্র চিরকালের মত আমার মনের পর্দায় তার ছাপ রেখে গিয়েছে?

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—সতেরো—

ডিকও ক্রুসোর সঙ্গে গাছপাতা সরাতে লাগল।

হঠাৎ নরম মত কি একটা হাতে লাগতে ডিক চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি সেখানকার পাতাগুলো সরাতেই একটা মানুষের আকৃতি তার চোখে পড়লো। এ কি! এ যে জো ব্রাণ্ট! তবে কি জো বেঁচে আছে! তখন আর চিন্তা করবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি সমস্ত ঘাস-পাতা সরিয়ে ফেলে ডিক জোকে উদ্ধার করলো। তারপর তার পা আর মুখের বাঁধন খুলে দিতেই জো একবার আড়মোড়া ভেঙে ফিসফিস করে বললো, "পাশেই হেন্‌রি ঠিক এই ভাবে পড়ে রয়েছে। এসো তাকেও উদ্ধার করি।"

জো আর হেনরিকে সঙ্গে করে ডিক ক্যামেরনের সঙ্গে মিলিত হলো। এ ভাবে ওদের সমস্ত চাতুরী ধরা পড়ে যাওয়ায় রেড্ ইণ্ডিয়ানরা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হলো।

"পেইগানরা মিথ্যাবাদী। এখনি আমি তাদের সবার মাথার চামড়া তুলে নিতে পারি। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, আমরা শান্তির উদ্দেশ্যে এসেছি। তাই তাদের ছেড়ে দিলাম। তারা মুক্ত।"

ওদের এ ভাবে ক্ষমা করাটা হেনরির মোটেই মনঃপূত হলো না। ওরা তাদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করেছে।

জো আর হেনরির ঘোড়া আর মাল-বোঝাই ঘোড়াটা নিয়ে ওরা ফেরার পথ ধরলো। জো আর হেনরির সম্বন্ধে একান্ত নিশ্চিত ছিলো ব'লে রেড ইণ্ডিয়ানরা মালপত্র কিছুই সরিয়ে রাখে নি। যাবার আগে মিঃ ক্যামেরন কিছু মালপত্র ওদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে ভুললেন না। ফ্যাকাশে-মুখোদের এই সদাশয় ব্যবহারে পেইগানরা আশ্চর্য্য হলো।

পথে ওরা আরো অনেক জাতের রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তির ধূমপান করলো। এই ভাবে বেশ কিছু দিন কেটে গেলো। ইতিমধ্যে ডিক আরো কয়েকটা গ্রিজলি ভালুক শিকার করেছে এবং তার রূপোলী "ওষুধ-রাইফেল" সকল শ্রেণীর রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেই এক বিস্ময়কর বস্তু বলে স্বীকৃত হয়েছে।

ক্রমে ওদের সমস্ত মালপত্রই বিলানো হয়ে গেল। এবার দেশে ফেরার পালা। মিঃ ক্যামেরনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের বন্ধুরা ফেরার পথ ধরলো।

পথে আরো অনেক বিপদ্, অনেকবার প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে একদিন ভোরের দিকে ওরা নিজেদের গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়লো।

সেই মার্স্টনের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? সেই যে ছেলেটা যাকে ডিক রূপোলী রাইফেল লাভ করবার পর তার পুরোনো রাইফেলটা দিয়ে দিয়েছিলো? ডিক চলে যাওয়া থেকে সে রোজ ডিকের মায়ের খোঁজখবর করতো। তার মুখে ডিকের গল্প শুনতে শুনতে মা যেন প্রবাসী পুত্রের সান্নিধ্য অনুভব করতেন।

একদিন ভোরে উঠে গ্রামের প্রান্তে পায়চারী করতে করতে দূর-থেকে-ভেসে-আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে মার্স্টন সচকিত হয়ে উঠলো। আগন্তুকদের রেড ইণ্ডিয়ান মনে করে সে তাড়াতাড়ি গ্রামের মাতব্বরদের সংবাদ দিলো।

ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। আরো অনেকটা কাছে আসতে অশ্বারোহীদের দেখা মিললো। কিন্তু তাদের সঙ্গে ওটা কি? আর একটা ঘোড়াও তাদের দলে রয়েছে মনে হচ্ছে, যার সওয়ার নেই!

"ও! বুঝেছি, বুঝেছি।" উত্তেজনায় অধীর হয়ে চীৎকার করে উঠলো মার্স্টন।—"ঐ তো ক্রুসো,—ক্রুসোকে কি আমি ভুল করতে পারি? আর ঐ, ঐ ডিক, ঐ হেনরি, ঐ জো!"

তার কথায় ছোটখাট দলটার মধ্যে আনন্দগুঞ্জন শুরু হলো। তারপর দেখতে দেখতে ডিক, হেনরি, জো আর ক্রুসো ওদের মধ্যে এসে উপস্থিত হলো।

সমবেত গ্রামবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতে জো এক সময়ে দেখলো, ডিক সেখানে নেই। ডিক এক মুহূর্ত্তও ওদের মধ্যে না থেমে সোজা বাড়ীতে চলে গিয়েছিলো।

মিসেস্ ভার্লে তখনো ডিকের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পান নি। তাই এই ভোরে দরজায় ঘন ঘন করাঘাতে আশ্চর্য্য হয়ে দরজা খোলামাত্র ডিক সজোরে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো।

পুনর্মিলনের সে দৃশ্য কথায় বোঝানো যায় না।

এদিকে সেই ছোট্ট কুকুরটা, প্রাম্প্স্, যে সব সময়ে ক্রুসোর পিছু পিছু ঘুরতো, ক্রুসোকে ফিরে পেয়ে তার আনন্দ দেখে কে? তার আপ্যায়নের চোটে ক্রুসো ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো।

এদের সাফল্যমণ্ডিত সফরের ফলে পরদিন গ্রাম জুড়ে যে ভোজসভা হলো তাতেও লক্ষ্য-বেধের প্রতিযোগিতা হয়েছিলো। তাতে ডিকের রূপোলী রাইফেল পর পর তিন বার পেরেক বসিয়ে দিয়ে ডিকের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণ করলো।

জো ব্লান্ট এবং হেনরিকে গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে সবাই একবাক্যে মেনে নিলো। ডিকের কিন্তু এ সব ভালো লাগতো না। সে তার জীবনের পথ বেছে নিয়েছে। বনে-জঙ্গলে ঘুরে ফিরে শিকার করার মত আনন্দ সে আর কিছুতে পায় না। এর পর যতদিন মা ছিলেন, ডিক গ্রামের আশে-পাশে শিকার করেই সন্তুষ্ট থাকতো। তাঁর মৃত্যুর পর ডিক ক্রুসো আর চার্লিকে নিয়ে পুরোপুরি শিকারী হয়ে বনে চলে গেলো। ইয়েলো ষ্টোন নদীর তীর থেকে সুদূর মেক্সিকো উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে ডিকের রূপোলী রাইফেল আর তার কুকুর ক্রুসোর বীরত্বের কাহিনী আজ রূপকথায় পরিণত হয়েছে। *

—শেষ—

* ব্যাল্যান্টাইনের 'দি ডগ্ ক্রুসো' নামক সুবিখ্যাত উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ।

মহাকালের পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—আট—

অযত্নে এই অঞ্চলটি এখন লতাগুল্মাচ্ছাদিত
বনভূমিতে পরিণত হলেও একদা এখানে বাঁশবন
ও আমের বাগান ছিল। এখনও নালন্দা
যাবার পথ এরই ভিতর দিয়ে প্রসারিত।
সারাদিন এই পথে লোকজনের গতায়াত চলে,
সেই জন্য এ পথে বন্য জন্তুর ভয় কম। তবে
সাপের ভয় আছে। দু'-একটা চিতা বাঘও যে
সময়-অসময়ে দেখা যায় না তা নয়। রাতের
বেলা এই পথে হাতে একগাছা লাঠি রাখা
ভালো। লাঠি নেই বলেই কাত্যায়ন দ্রুত পা
চালালো। এ পথ তার কাছে অতি পরিচিত।

ক্রোশ দুই পথ পার হয়ে কাত্যায়ন জনপদে এসে পৌছালো। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর।
জনপদ নিষ্প্রদীপ, গৃহগুলি নিস্প্রাণ বড় বড় পাথরের টুকরোর মত। দূরে শিয়াল ডেকে ওঠে।
গাছের মাথায় শঙ্কিত পাখীর আর্ত্তনাদ ও ডানার আস্ফালন শোনা যায়। কাত্যায়ন এগিয়ে চলে।
মধ্যরাত্রির জনবিরল পথে সে একক পথিক। দু'পাশের গৃহগুলিতে নিশ্চিন্ত মনে কত মানুষ
নিদ্রা যাচ্ছে, কিন্তু কাত্যায়ন সজাগ, সচল, সতর্ক। তার কাছে সাম্রাজ্যের বোঝা, সিংহাসনের
দায়িত্ব। দায়িত্বের বোঝা কখন কোন্ দিক্ থেকে মানুষের কাঁধে এসে চাপে মানুষ তা জানে না,
কিন্তু এই দায়িত্ব বহে বেড়ানোই তার কাজ। জীবনে নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল হয়ে সে আসে, নিঃসঙ্গ
ও নিঃসম্বল হয়ে সে চলে যায়। চলার পথে আসে এক একটা দায়িত্ব, তাই হয় তার চলার
অবলম্বন। সেইটুকুই সে নিজের বলে মনে করে, নিজের কর্ত্তব্য বলে ধরে, কিন্তু আসলে ওটা
তার সাময়িক অবলম্বন ছাড়া কিছু নয়। আসলে সে মৃত্যু পর্য্যন্ত একক যাত্রী, সব থেকেও তার
কিছু নেই। দু' পাশে অনেক লোক, অনেক জানা-চেনা মুখ, কত আত্মীয়, কত সহানুভূতি,
তথাপি রোগ শোক জরা মৃত্যু তার একান্ত নিজস্ব, সুখ ও দুঃখ ভোগের দায়িত্ব তার একান্ত
নিজের। সে নিঃস্ব, নিরালম্ব। সেই জন্যই মানুষ অবলম্বন চায়, অবলম্বন নিয়ে সে ভুলে থাকতে
চায়! এই যে মহাকুমারের প্রাণ রক্ষা করার দায়িত্ব সে নিয়েছে, তাকে কাঁধে নিয়ে চলেছে, এও
কাত্যায়নের জীবনে একটা সাময়িক অবলম্বন মাত্র। আজ যে বালককে সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়,
এই বালক যখন বৃদ্ধ হবে তখন সে মরবেই, তখন আর বেঁচে থাকার কথা উঠবে না। কাল

অনন্ত, নিরবধি। এই কালের মাঝে কে আগে মরলো আর কে কয়েক বছর পরে মরলো. তাতে বিরাট বিশ্বে কি যায় আসে? মৃত্যু নিশ্চিত, তবু বেঁচে থাকার কি দুর্বার চেষ্টা!

কাত্যায়ন বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন রীতিমত পড়েছে, দর্শনের তত্ত্বকথা ভাবতে ভাবতে সে পথ চলে। জনপদ পার হয়ে সে আসে শস্যক্ষেত্রের মাঝে, তারপর শস্যক্ষেত্র পার হয়ে আবার এসে পৌছায় স্তব্ধ জনপদে। কাত্যায়নের পথ চলার বিরাম নেই, রাত্রির মধ্যে একটা গাছতলায় বসে সে দু' দণ্ড বিশ্রাম নেয় না। তখনকার দিনে অবশ্য মানুষের এ ভাবে পথ চলার অভ্যাস ছিল।

প্রত্যূষে কাত্যায়ন কুসুমপুরে এসে পৌছালো। পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে সমৃদ্ধ জনপদ এই কুসুমপুর।

নগরীর উপকণ্ঠে একটি গৃহের সামনের দাওয়ায় বসে এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ দাঁতন করছিলেন, কাত্যায়নকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, বললেন—এত সকালে! খবর কি? গৃহের সব কুশল তো?

কাত্যায়ন বললো—হ্যাঁ, গৃহের সকলেই কুশলে আছে। ভিতরে চলুন, অন্য কথা আছে।

প্রৌঢ় তাড়াতাড়ি দাঁতন শেষ করে কাত্যায়নকে ভিতরে নিয়ে এলেন। ঘরে আর কেউ নেই দেখে কাত্যায়ন চুপি চুপি প্রৌঢ়ের কানের কাছে বললে—এই বালকটি কে জানেন? মগধের মহাকুমার, সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী।

বিস্ময়ে প্রৌঢ়ের চোখ দু'টি বড় বড় হয়ে উঠলো, কাত্যায়নের কথা সহসা তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। এই অর্দ্ধনগ্ন বালক মগধ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী! এক দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে চড়ে এই প্রত্যূষে কুসুমপুরের এক পর্ণকুটীরে তার আবির্ভাব, এও কি সম্ভব?

কাত্যায়ন তাঁর মনোভাব বুঝতে পারলো, বললো—সব শুনুন, তা হলে বুঝবেন। এই বালকের প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব এখন আপনাকে গ্রহণ করতে হবে!

কাত্যায়ন ধীরে ধীরে সব ঘটনা প্রৌঢ়কে বললো। শেষে কাঁধ থেকে পুঁটলিটী নামিয়ে বললো—এতে মহাকুমারের পোষাক ও অলঙ্কারাদি আছে। এই পোষাকে যে সব মণি-রত্ন বসানো আছে ও এই সব অলঙ্কার বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তাতে কয়েক বছর ভালো ভাবেই মহাকুমারের ভরণ-পোষণের খরচ চলে যাবে। এগুলি আপনি রাখুন।

প্রৌঢ়ের মুখে চিন্তার রেখা পড়লো, বললেন—এ বড় গুরু দায়িত্ব, কাত্যায়ন!

—কিন্তু আপনি ছাড়া আমার জানা-চেনা এমন আর কেউ নেই যাকে আমি এই দায়িত্ব-ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। আমি বালককে নিজের কাছেই রাখতাম, কিন্তু এখন যে তারা আমারই সন্ধান করছে! আমার কাছে থাকলে তো ওকে রক্ষা করা যাবে না।

—প্রতিবেশীরা যখন এর পরিচয় জানতে চাইবে তখন কি বলবো?

—আপনার পুত্র-কন্যা নেই। আপনি বলবেন, এটি আপনার ভাগিনেয়, আপনি পালন করতে নিয়েছেন। তাহলে আর কোন কথাই উঠবে না।

প্রৌঢ় রাজকুমারের মুখের পানে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—তুমি কি মনে কর এই বালক আবার একদিন পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে পারবে?

—তা জানি না, সে ভাবীকালের কথা। তবে এর পিতাকে আমি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারি নি, একে রক্ষা করতে পারছি—এইটুকুই আমার সন্তোষ।

কথাটা প্রৌঢ়ের মনঃপূত হ'ল না, বললেন—তা তো বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপারটা বড়ই গুরুতর। যদি কোন রকমে একবার জানাজানি হয় তাহলে নিজের মাথা বাঁচানো মুস্কিল হবে।

কাত্যায়ন তাঁর মনের কথাটা বুঝলো, বললো—আমি ওকে নিয়ে চলে যেতাম কোন দূর দেশে, কিন্তু আমি চলে গেলে আমার সাত পুত্রের ভরণ-পোষণ করবে কে? সেই জন্যই তো আপনার শরণ নিলাম। তবে এ কথা ঠিক, যদি এই ছেলে কোন দিন পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে পারে, তা হ'লে কিন্তু আমাদের আর এত দুঃখ করে খেতে হবে না।

এ কথা প্রৌঢ়ের মনে ধরলো, মাথা নেড়ে বললেন—সে কথা অবশ্য।

এই সময় দরজার সামনে এক মহিলাকে দেখা গেল; কাত্যায়নকে দেখে তিনি হেসে বললেন —কি গো, এত সকালেই যে! কি খবর ভাই?

—এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি বৌদি, এর বাপ-মা কেউ নেই, তুমি যদি একে মানুষ করার ভার নাও!

—এই বুঝি? বাঃ, বেশ ছেলেটি তো!

—নাও না বৌদি, নেবে?

কাত্যায়ন ঘুমন্ত রাজকুমারকে এগিয়ে দিলে মহিলা তাকে কোলে তুলে নিলেন, সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—আহা, দুধের ছেলে, এই বয়সেই বাপ-মা হারিয়েছে!

—ওকে তোমারই হাতে দিলাম বৌদি, আজ থেকে তুমিই ওর মা হলে।

মহিলা হাসলেন। কাত্যায়ন এবার নিশ্চিন্ত হ'ল।

এটি কাত্যায়নের শ্বশুরবাড়ী। প্রৌঢ় রামলোচন কাত্যায়নের শ্যালক, মহিলা শ্যালকপত্নী। কাত্যায়নকে তাঁরা তখনই ছাড়লেন না, স্নানাহার সেরে সেখান থেকে কাত্যায়নের বাহির হতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হয়ে গেল।

ফেরার পথে কাত্যায়নের সঙ্গে রাজকীয় ঘোষকের দেখা হ'ল, ঢোল সহরতে তারা নগর মধ্যে ঘোষণা করে ফিরছে:

'—মগধ-সম্রাটের আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। তাঁরই অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁর ভাগিনেয় সর্বগুণ-সমন্বিত, মহাপরাক্রান্ত, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ উগ্রসেন নন্দ আজ থেকে মগধের রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। শীঘ্রই তাঁর অভিষেক-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। নূতন সম্রাট্ প্রত্যেক নাগরিকের শুভেচ্ছা কামনা করেন। রাজভক্ত নাগরিকেরা অবহিত হউন।'

অশ্বারোহীরা তাকে পার হয়ে চলে গেল। কাত্যায়ন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর আবার রাজগৃহের পথ ধরলো।

(ক্রমশঃ)

ভৌতিক সিন্দুক

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

নীলিমার অসীম জগতে ভেসে চলেছি।

আমাদের এই ছোট্ট জাহাজটিতে আমরা মাত্র পনেরো জন আরোহী। ক্যাপ্টেন ছাড়া আমরা সকলেই ভারতীয়। তবে বাঙ্গালী মাত্র দু' জন। আমি আর দ্বিতীয় এঞ্জিনিয়ার মৃণাল। ক্যাপ্টেন লোকটি ক্যানেডিয়ান। বয়স চল্লিশের ওপরে। অত্যন্ত অমায়িক, মিশুকে ও ধর্মভীরু লোক। জাহাজের সকলকেই তিনি স্নেহ করতেন।

সন্ধ্যা হতে তখন আর বেশী দেরী নেই। সাগরের নীল জলে সাঁঝের ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা কয়েক জন ডেকের ওপরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সাগরের সান্ধ্য শোভা উপভোগ করছি। এমন সময় হঠাৎ সন্ধ্যার জমাট নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দূরে কোথায় একটা বন্দুক গর্জে উঠল—গুড়ুম গুড়ুম...

চমকে উঠলাম সবাই। কে বন্দুক ছোঁড়ে! পরক্ষণেই আবার বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

আমি তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে ছুটলাম। ডেকটা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, "তুষার, কোনও জাহাজ বিপদে পড়েছে। তারাই গুলি ছুঁড়ে সংকেত জানাচ্ছে।" বলে তিনি জাহাজের মুখ ঘোরাতে আদেশ দিলেন,—"জাহাজ উত্তর মুখে চালাও।"

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বিপন্ন জাহাজটির খোঁজ পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বললেন, 'ঐ একটা জাহাজ দেখতে পাচ্ছি, ওটাই বোধ হয় সংকেত জানাচ্ছিল। মনে হচ্ছে ওটা একটা ফরাসী কোম্পানীর মাল-বহা জাহাজ; হ্যাঁ তাই। ডী, জেভাঙ্ক। জাহাজটা একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জাহাজ ডী, জেভাঙ্কের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ক্যাপ্টেনের হুকুমে তক্ষুনি দু' খানা বোট নামিয়ে জলে ভাসান হ'ল

এবং কয়েকজন খালাসীর সঙ্গে ক্যাপ্টেন, মৃণাল ও আমি গিয়ে সেই বোটের ওপর চড়ে বসলাম। বোট এগিয়ে চলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বোট ডী, জেভাস্কের পাশে ভিড়ল। একটা দড়ির সিঁড়ি উপর থেকে ঝুলছিল। আমরা তার সাহায্যে উপরে উঠলাম।

জাহাজের ভাঙ্গা জায়গাটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃণাল বলল, "কোন বড় পাথরের সঙ্গে ঠোক্কর লেগে ভেঙ্গে গেছে। যে পরিমাণে জল ঢুকেছে, এ ভাবে যদি আরো ঘণ্টা খানেক ঢোকে তাহলে জাহাজটা ডুবে যাবে।"

কিন্তু আশ্চর্য্য! জাহাজে কোন প্রাণীরই দেখা পেলাম না। সকলে গেল কোথায়? কথাটা ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, "জাহাজ ডুবে যাওয়ার আগেই সকলে বোধ হয় বোটে করে পালিয়ে গিয়েছে। চলো ক্যাপ্টেনের কেবিনে যাই। জাহাজে কি কি মাল আছে তার একটা ফর্দ হয়তো সেখানে আছে। দেখি যদি কোন দামী জিনিষ উদ্ধার করতে পারি।"

ক্যাপ্টেনের কেবিনে ঢুকে একটু খুঁজতেই ফর্দটা পাওয়া গেল। ক্যাপ্টেন সাগ্রহে সেটা পড়তে লাগলেন। হঠাৎ তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "এই জাহাজে একটা লোহার সিন্দুক আছে, সেটি প্রচুর অর্থে ভরা। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হচ্ছিল সেটা। চলো আমরা সেটাকে উদ্ধার করি।"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় সে সিন্দুক? সমস্ত জাহাজটা প্রায় চষে ফেললাম কিন্তু কোথাও সে সিন্দুক পাওয়া গেল না। অবশেষে ক্যাপ্টেন, মৃণাল ও আমি খুঁজতে খুঁজতে নীচে নেমে গেলাম। সেখানে একটি ঘর ভিতর থেকে বন্ধ।

অনেক ডাকাডাকির পরও দরজা খুলল না। নিরুপায় হয়ে আমরা বন্ধ দরজায় লাথির পর লাথি মারতে লাগলাম। তিন জনের মিলিত শক্তি প্রতিরোধ করবার মতো ক্ষমতা সামান্য কাঠের দরজার ছিল না—দরজা ভেঙ্গে গেল। হুড়মুড় করে সকলে ঘরের মধ্যে গিয়ে ছিট্‌কে পড়লাম।

কিন্তু ঢুকেই যে ভয়ংকর দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল, বিস্ময়ে আতংকে আমরা নির্বাক্ হয়ে গেলাম।

প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুকের সামনে চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে এক খালাসীর মৃতদেহ। পা দু'টি সিন্দুকের দিকে ছড়ানো। দুই ভ্রূর মাঝে

কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার ফলে প্রায় আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ এক গভীর ক্ষত। চারিদিকে শুকনো রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। দু' হাতের আঙ্গুলগুলো দুমড়ে আছে। চোখের মণি দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সমস্ত মুখখানির ভিতর তখনও যেন একটা ভয়াবহ বিভীষিকা বিরাজ করছে!

খানিকক্ষণ সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইলাম। হঠাৎ ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, "দরজা তো দেখছি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। তা হলে হত্যাকারী নিশ্চয় বাইরে যেতে পারে নি। সে এই ঘরেই কোথাও আছে। এসো, আমরা তাকে খুঁজে বার করি।"

তিনজনেই পিস্তল বার করে খুঁজতে শুরু করলাম। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেললাম। কিন্তু কই, কোথাও কেউ নেই তো!

এক সময়ে মৃণাল বলে উঠল, "ক্যাপ্টেন, আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই জাহাজটা ডুবে যাবে। যদি সিন্দুকটা উদ্ধার করতে চান তাহলে এই মুহূর্তে চেষ্টা করুন।"

ক্যাপ্টেন বাইরে এসে সকলকে ডেকে সিন্দুকটা আমাদের জাহাজে তুলতে আদেশ দিলেন। মিনিট দশেক আপ্রাণ চেষ্টার পর সিন্দুকটাকে আমাদের জাহাজে তোলা হ'ল। আর ঠিক তার একটু পরেই ডী, জেভাস্ক সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে গেল।

সেই রাত্রেই ক্যাপ্টেনের কেবিনে এক পরামর্শ-সভা বসল। ক্যাপ্টেন বললেন, "আজ সন্ধ্যার সব কথাই তোমরা জানো। ঐ বহুমূল্য সিন্দুকটাকে নিয়ে এখন কি করা যাবে?"

উত্তর দিল ছোট মিস্ত্রী। বলল, "কেন, ওটা খুলে সব টাকাপয়সা আমরা সকলে ভাগ করে নেবো।"

ক্যাপ্টেন সকলের দিকে একবার চেয়ে বললেন, "আর কেউ কোন পরামর্শ দিতে চায়?"

জন দশেক লোক সমস্বরে বলে উঠল, "ছোট মিস্ত্রীর কথায় আমরা একমত।"

ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, "তোমাদের সকলেরই কি এই মত?"

সহসা মৃণাল বলে উঠল, "আমার মতে ওটাকে ওর সত্যিকার মালিক অর্থাৎ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।"

ক্যাপ্টেনের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সোৎসাহে বললেন, "আমারও সেই মত। তোমাদের কারো কোনও আপত্তি আছে?"

সকলেই মাথা নীচু করে রইল। তখন ক্যাপ্টেন বললেন, "তাহলে সকলেরই মত আছে? বেশ, তোমরা এখন যেতে পারো।"

আরো গভীর রাত্রি। জাহাজ শুদ্ধ লোক ঘুমে অচেতন। সহসা রাত্রির ঘন নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে একটা আর্ত চীৎকার জেগে উঠল – "ওরে বাবা রে!"

মুহূর্তে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। শব্দটা যেন আসছে গুদাম ঘর থেকে। তক্ষুনই সকলে গুদাম ঘরের দিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম, ক্যাপ্টেন আগেই এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, অদূরে মৃণাল। কয়েকজন খালাসী প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

ঘরের সব ক'টি প্রাণীই যেন ভূত দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। সকলের চোখেই ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি।

হঠাৎ সামনে নজর পড়তেই বিস্ময়ে আতংকে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সিন্দুকটার সামনে চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে জাহাজের ওয়ারলেস অপারেটারের মৃতদেহ, ঠিক সেই খালাসীর মত পা দু'টি সিন্দুকের দিকে, আর কপালে তেমনিই গভীর ক্ষত।

(ক্রমশঃ)

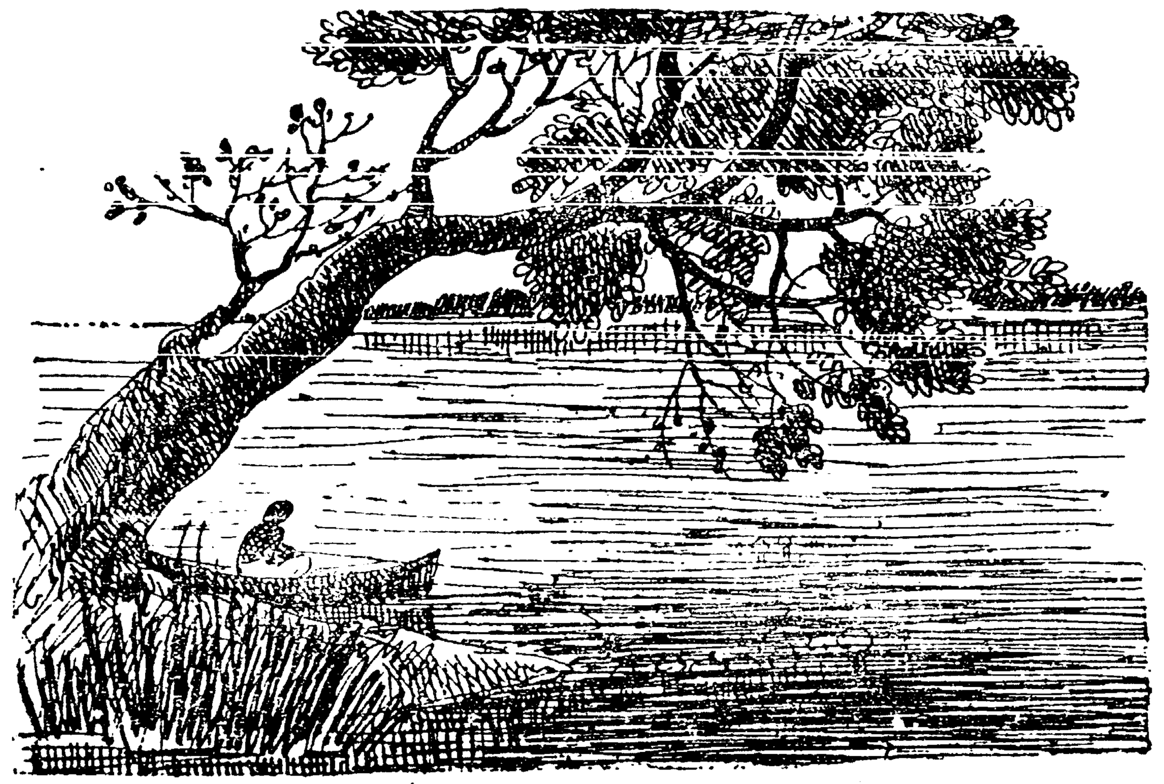

বেলুন ওড়ানোর গল্প

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

কোন কোন আবহাওয়া-অফিসের পাশে রোজ বেলুন ওড়ানো হয়। ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বেলুন সাঁ সাঁ করে উপরে উঠে যায় এবং একটু পরেই আর তাকে দেখা যায় না।

ওই বেলুন ওড়ায় কারা?

আবহাওয়া-অফিসের লোকেরাই!

কেন?

স্থানীয় আবহাওয়া কেমন থাকবে, শীগ্গিরই ঝড় বৃষ্টি আসচে কিনা, এই সব জানবার জন্য।

আবহাওয়া-অফিসের লোকেরা কি জ্যোতিষও জানে নাকি? না হ'লে বেলুন ওড়ানোর খেলা খেলে কেউ আবহাওয়ার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে?

কিন্তু সত্যি সত্যিই ওরা পারে।

কেমন করে?

সেই "কেমন করে"র গল্পই বলি।

মেঘ-বৃষ্টি, ঝড়-বাদল, শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত এরা সবাই যদি জোট বেঁধে বা দুই-এক করেও দেখা দেয়, তা' হ'লেই আমরা বলি আবহাওয়া খারাপ। বিশেষ করে মেঘ-বৃষ্টিই হ'ল প্রধান আসামী। কিন্তু আমাদের কথা হ'ল, ভবিষ্যতে ঝড়-বাদলা হবে কিনা তা' আগে থাকতেই কি করে জানা যাবে! বেদবাক্যের মত নির্ভুল ভাবে কেউই অবশ্য ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে না, তবে নানা রকম অবস্থা দেখে অনেকটা আন্দাজ করা যায়। চারিদিকের অবস্থা খুব ভাল করে খতিয়ে দেখে যে আন্দাজ করা যায় তা প্রায়ই নির্ভুল হয়। আবার অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মত আন্দাজ করলে না ফলবার সম্ভাবনাই বেশী। আকাশে যদি ঘন কাল মেঘ জমতে দেখি, তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে বৃষ্টি হবে। এ আন্দাজ ফলতেও পারে নাও ফলতে পারে; কারণ আমাদের বৃষ্টি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুধু মেঘ জমতে দেখেই করা হয়েছিল। আবহাওয়া-বিজ্ঞানীদের কিন্তু একটুখানি মেঘ বা একটু জোর হাওয়া দেখেই ভবিষ্যদ্বাণী করলে, চলে না। তাঁদের আরও নানা রকম খোঁজ-খবর নিতে হয়। তাই তাঁরা অনেক সময় অদ্ভুত রকমের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। আকাশে হয়ত মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই, অথচ তাঁরা হঠাৎ বলে দিলেন, আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যাবে। অবাক্ হবার মতই কথা বটে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়ত দেখা যাবে তাঁদের কথাই ফলে গেছে। অবশ্য, আমি এমন কথা বলছি নে যে তাঁদের সব কথাই সব সময় ফলবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলে বলেই তাঁদের কথার দাম আছে।

আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর নাম দেওয়া হয়েছে "পূর্ব্বাভাস"। পূর্ব্বাভাস আবার নানান ধরণের হতে পারে। কোনটা বা সময়ের মাপে, কোনটা বা জায়গার হিসাবে। আগামী কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, যেমন ছ' ঘণ্টা কি বারো ঘণ্টা,—আবহাওয়া কেমন থাকবে সেই পূর্ব্বাভাস

হ'ল সময়ের মাপে। আবার যখন কোন বিশেষ জায়গা বা অঞ্চল সম্বন্ধে কথা বলা হয়, তখনই বলি আঞ্চলিক পূর্ব্বাভাস। পূরো পূর্ব্বাভাসটি হবে স্থান এবং কাল মিলিয়ে।

আমরা বলেছি আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা অনেক দেখেশুনে তবে মুখ খোলেন। কিন্তু, কি তাঁরা দেখেন ?

সে কথা বলতে হলে, আবহাওয়া খারাপ কেন হয় তার মোটামুটি কারণটি জানতে হবে। জল পেলে, হাওয়া যে ক্রমে ক্রমে তা শুষে নেয় এ ব্যাপার আমরা সবাই দেখেছি। এই শুষে-যাওয়া জলই যখন কোন রকমে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখনই কুয়াসা-মেঘ প্রভৃতির জন্ম হয়। মাটি, ঘাস, পাতার উপরে এই জল জমলে তাকে বলি "শিশির"। মাটি থেকে খানিকটা উপর পর্য্যন্ত যখন এই রকম জমে-যাওয়া জলকণা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তখন তার নাম "কুয়াশা"। আর উঁচু আকাশে এই জলকণারা দেখা দিলে বলি "মেঘ"।

মেঘ হলেই যে বৃষ্টি দেখা দেবে এমনও কোন কথা নেই। কোনও কোনও বিশেষ ধরণের মেঘ, যারা সাধারণতঃ আকাশের নীচের দিকেই ভীড় করে, তাদের কাছ থেকেই সচরাচর ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ে। আবার এমন এক ধরণের ঘন মেঘ আছে যাদের দেখে মনে হয়, তারা যেন বিরাট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এরা বড় সাংঘাতিক। শুধু যে মুষলধারায় বৃষ্টি দেয় তাই নয়, সঙ্গে থাকে বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, এই সবও। আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন ঝঞ্ঝা-মেঘ। ঝঞ্ঝাটে মেঘও বলা যেতে পারে।

প্লেনে করে উড়তে উড়তে এই মেঘের মধ্যে গিয়ে পড়লে কি যে হবে, আর কি যে হবে না তা বলা শক্ত।

আবার যে সব মেঘ খুব উঁচু আকাশে ভেসে বেড়ায় তারা প্রায়ই নিরীহ।

যাই হোক, আমরা জানলুম যে জলীয় বাষ্প-ভর্তি হাওয়া ঠাণ্ডা হ'লে মেঘের জন্ম হয়। কোথায় বসে ঠাণ্ডা হ'ল, কেমন করে ঠাণ্ডা হ'ল, হাওয়ার ভিতরে কতটা পরিমাণ জলীয় বাষ্প লুকিয়ে ছিল—এই সব নানা ব্যাপারের উপর নির্ভর করে কোন্ রকমের মেঘ হবে।

কি কি উপায়ে হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে মেঘ-বাদলার সৃষ্টি হ'তে পারে, আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা খুঁজে খুঁজে তার সঠিক খবর বার করেছেন।

অনেক সময় শীতের দেশের ঠাণ্ডা হাওয়া গরম দেশে এসে গরম হাওয়ার সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেয়। কখনও বা গরম দেশের হাওয়া গিয়ে শীতের দেশে চড়াও হয়। বাতাসে বাতাসে লড়াই! কথাটা অদ্ভুত হলেও সত্যি। আরও মজার কথা হ'ল, গরম হাওয়া এবং ঠাণ্ডা হাওয়ার লড়াইতে দু'জনে মিশে একাকার হয়ে যায় না, গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঘাড়ে চড়ে বসে। গরম হাওয়া লাফ দিয়ে ঘাড়ে চড়বার সময় ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে যদি দরকার মত জলীয় বাষ্প থাকে তা হ'লে মেঘ দেখা দেবে। এই হাওয়ার লড়াই সাদা চোখে দেখা যায় না। দু' জাতের হাওয়ার লড়াই লেগেছে কিনা, বা লাগলেও যুদ্ধক্ষেত্রটা ঠিক কোথায় তা জানতে হবে নানা রকম লক্ষণ দেখে।

লক্ষণগুলো কি ?

আর কিছু নয়, বাতাসের চাপ, তাপ, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, এই সব। তাই অনেক দূর পর্য্যন্ত নানা জায়গার বাতাসের চাপ, তাপ, হাওয়ার গতি প্রভৃতির খবর নিয়ে আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন কোথাও লড়াই বেধেছে কিনা এবং সেই লড়াইএর তেজটাই বা কতখানি।

আরও একটা বড় কারণে বাতাস হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে। উপর আকাশের হাওয়া যদি কোন কারণে অস্থির অবস্থায় থাকে তা হ'লে এমনটা ঘটতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানীরা "অস্থির" কথাটাকে একটু অন্য রকম অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কোন একটা কিছুকে সামান্য একটুখানি নাড়িয়ে দিলেই সে যদি বেসামাল হয়ে পড়ে, তা হ'লেই তাকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হবে অস্থির। একটা পেনসিলকে টেবিলের উপর খাড়া করে রাখলে তার অবস্থাটাকে বলব অস্থির অবস্থা। কারণ একটু নাড়া খেলেই সে পড়ে যাবে। হাওয়ার ব্যাপারটাও তেমনি। যে হাওয়ায় সামান্য নাড়াচাড়া লাগলেই তোলপাড় আরম্ভ হয়ে যায় তাকেই বলতে পারি অস্থির হাওয়া। তখন নীচের হাওয়া উপরে উঠতে থাকবে আর উপরের হাওয়া নামতে থাকবে নীচের দিকে। আর হাওয়া লাফ দিয়ে উপরে উঠতে গেলে যে ঠাণ্ডা হয়ে যায় সে কথা তো আমরা একটু আগেই বলেছি।

এবারে আমাদের দেখতে হবে, বাতাসের অস্থিরতার লক্ষণ কি ? আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যত উঁচুতে ওঠা যাবে বাতাসও তত ঠাণ্ডা হবে। প্রত্যেক হাজার ফুটে তাপাঙ্ক সওয়া তিন ডিগ্রি করে কমে যায়। এই কারণে পাহাড়ের চূড়ো নীচের সমতলভূমি থেকে অনেক ঠাণ্ডা। এখন, প্রতি হাজার ফুটে সওয়া তিন ডিগ্রি করে তাপ কমে যাওয়া হ'ল স্বাভাবিক নিয়ম। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, যে, কোন কারণে যদি তাপ এর চাইতে বেশী কমে যায় তা হলে বুঝতে হবে বাতাস মশাই কিঞ্চিৎ অস্থির হয়ে পড়েছেন। তখন সামান্য কারণেই তোলপাড় আরম্ভ হয়ে যাবে। তার ফলে যে হাওয়া উপরের দিকে উঠবে সে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং সেই বাতাসের মধ্যে যদি দরকার মত জলীয় বাষ্প থাকে তা হলে ঝঞ্ঝা-মেঘের সৃষ্টি হতে পারে। বাতাস যত বেশী অস্থির হবে, ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত প্রভৃতির সম্ভাবনাও তত বেশী।

তা হলে কোন একটা স্থান বিশেষে আবহাওয়া খারাপ হবে কিনা তা জানতে হবে উপরকার হাওয়া স্থির কি অস্থির তাই দেখে এবং সেটা জানা যাবে উপর আকাশের খবর নিয়ে। উঁচু আকাশের খবর নেবার চেষ্টা চলছে অনেক দিন ধরেই। আবহাওয়ার খবর জানাবার জন্য নিয়মিত ভাবে বেলুন ওড়ানো আরম্ভ হয় গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে।

তখনকার দিনে শুধু বেলুন ছেড়ে দেওয়া হ'ত না, তাতে নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে লোক উঠতেন। বেলুন ভর্ত্তি করা হ'ত হিলিয়াম বা হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেই সে সাঁ সাঁ করে উপরে উঠে যেত। উঁচুতে গিয়ে বেলুনচারী লোকেরা হাওয়ার তাপ, চাপ, গতি, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে খবর নিয়ে আসতেন তাতে আবহাওয়া-বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যদ্বাণী করবার খুব সুবিধে হ'ত। এ্যাসাম্যান নামে এক ভদ্রলোক এক বছরের মধ্যে এমনি করে পঁচাত্তরটা বেলুন উড়িয়েছিলেন।

এর কিছু দিন পরে মানুষ ছাড়াই, শুধু যন্ত্রপাতি নিয়ে, বেলুন ওড়ানো সুরু হ'ল। বেলুনগুলির সঙ্গে বাঁধা থাকত প্যারাসুট আর যন্ত্রপাতিগুলি ছিল স্বয়ংক্রিয় ধরণের—আপনা আপনিই তাতে বিভিন্ন উচ্চতায় হাওয়ার চাপ, তাপ এই সব লেখা হয়ে যেত। অনেক—অনেক উঁচুতে উঠলে পরে বেলুন নিজে নিজেই যেত ফেটে এবং তখন ওই যন্ত্রপাতিগুলি প্যারাসুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে আসত। আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা তখন বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে সেই ছেঁড়া বেলুন আর তার যন্ত্রপাতির সন্ধান করতেন।

এরও বেশ কিছু পরে এলো এরোপ্লেনের যুগ। অনেক আবহাওয়া-বিজ্ঞানী প্লেনে করে হাওয়ার খবর নিতে বেরুতেন। কেউ কেউ বা বেলুনের বদলে মস্ত বড় ঘুড়ির সঙ্গে হাওয়ার তাপ, চাপ প্রভৃতি মাপবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি বেঁধে মজবুত দড়ির সাহায্যে উড়িয়ে দিতেন। খানিকক্ষণ পরে সুতো গুটিয়ে ঘুড়ি নামিয়ে আনতেন এবং সঙ্গের যন্ত্রের মধ্যে হাওয়ার যে সব খবর আপনা-আপনি লেখা হয়ে যেত সেগুলি উদ্ধার করতেন।

তার পরে এলো আবার বেলুনের পালা। তবে এর রকমটা আগের চাইতে একটু আলাদা। এই বেলুনের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে একটা বেতের বা বাঁশের ঝাঁপি। আর তার ভিতরে চাপমান, তাপমান এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ মাপবার যন্ত্র। শুধু তাই নয়—আরও একটি জিনিষ রয়েছে—সে হ'ল একটি অতি ছোট বেতার যন্ত্র। তাপ-চাপ প্রভৃতি মাপবার যন্ত্রগুলি বেতার যন্ত্রটির সঙ্গে এমন কায়দা করে লাগিয়ে দেওয়া হয় যে খানিকক্ষণ পরে পরেই সেই বেতার যন্ত্র থেকে সাঙ্কেতিক ভাষায় হাওয়ার কোথায় কত চাপ-তাপ, কতটা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এই সব খবর বেতারে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। নীচে আবহাওয়া-অফিসে লোক বসে আছে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র নিয়ে। সে ওই খবর পেয়ে বুঝতে পারে, হাওয়ার উপর দিকটার সত্যিকারের অবস্থা কি। যদি দেখে উপরের দিকে তাপ খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে, তাহ'লে হাওয়াট হ'ল অস্থির ধরণের। এবং সঙ্গে, হাওয়ার ভিতরে, যদি যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে তাহলে সো সহজেই বলতে পারবে যে ঝঞ্ঝাবৃষ্টি আসন্ন। যদি বাতাসের অস্থিরতার পরিমাণ খুব বেশী হয়, তাহলে মেঘ-বজ্র-বৃষ্টি সব কিছুই দেখা দিতে পারে। আর যদি ততটা মারাত্মক ধরণের অস্থিরতা না থাকে তাহ'লে হয়ত সামান্য মেঘ এবং অল্পস্বল্প গর্জ্জনের উপর দিয়েই গোলমাল মিটে যাবে।

এই ধরণের বেতারওয়ালা বেলুনের নাম "রেডিও সণ্ড"। এই প্রণালীটি আবিষ্কার করেছেন ফরাসীরা। এখন অবশ্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এগুলির ব্যবহার হচ্ছে।

এই বেলুনের সাহায্যে আমরা শুধু কোন একটা জায়গার হাওয়ার স্থিরতা বা অস্থিরতার খবরই পেতে পারি। এবং অস্থিরতা দেখলে বলতে পারি সেই জায়গাটায় ঝড়-বৃষ্টি হবে কিনা। অন্য কোন জায়গার আবহাওয়া সম্বন্ধে বলা চলবে না।

আমাদের বেলুনের সঙ্গে যে বেতার এবং অন্যান্য যন্ত্র থাকে সেগুলি বেশ দামী। তাই বেলুন ফেটে যাবার পরে সেগুলি যাতে রক্ষা পায় এবং ফেরৎ পাওয়া যায় তার জন্যে বাঁশের ঝাঁপির সঙ্গে একটা প্যারাসুট বাঁধা থাকে। ওই প্যারাসুটের সাহায্যে যন্ত্রপাতিগুলি নিরাপদে নেমে আসতে পারে। এগুলি যাতে তারপরে ফেরৎ পাওয়া যায়, তার জন্য বাঁশের ঝাঁপির সঙ্গে একটুকরো কাগজ সেঁটে দেওয়া হয়—তার উপরে লেখা:

"এই যন্ত্রপাতি পেয়ে নিকটস্থ থানায়, বা আবহাওয়া-অফিসে ফেরৎ দিলে পথ খরচ এবং উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।"

অতএব সন্ধানে থেকো। পেলে পরে পরের পয়সায় বেড়ানো হবে, আবার পুরস্কারও মিলবে।

আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা বেলুন উড়িয়ে হাওয়া সম্বন্ধে যে খবর জানতে পারেন তা থেকে স্থানীয় আবহাওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বা পূর্ব্বাভাস তৈরী করে বেতার-কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। তারপর সেখান থেকে বেতার যোগে আমরা শুনতে পাই: "স্থানীয় আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস হচ্ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ছড়া ও ছন্দ

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

খোকনের দাদা পাইলট। এই তো সেদিনও খোকনের বাড়ীর ওপর দিয়ে দাদা 'ড্যাকোটা' উড়িয়ে নিয়ে গেলো। জানো? খোকন আওয়াজ শুনে বলে দিতে পারে কোন্‌টা ড্যাকোটা, কোন্‌টা কন্‌ষ্টেলেশন্। দাদা শিখিয়েছে যে! তারপর এরোপ্লেনের কোন্ অংশটিকে কি বলে তাও সে দাদার কাছ থেকে শিখেছে। মনে প্রাণে খোকন এখন 'উইং কমাণ্ডার'।

সেদিন খোকন, পিণ্টু, টুটুল, খুকু অশথতলায় খেলছে। হঠাৎ খোকন ও পিণ্টুর এরোপ্লেন চালাবার সখ হ'ল। তাই তারা চল্‌ল দম্‌দমাতে।

"আমার ছিলো উড়ো-জাহাজ
দম্‌দমাতে গিয়েছিলেম ভোরে,
নাকের চাকা বন্‌বনিয়ে
চালিয়ে দিলেম জোরে।
তড়াক করে লাফিয়ে বসে তেড়ে
'জয়ষ্টিক্'টা একটু দিলেম নেড়ে,

বোঁ করে ভাই আকাশ-পথে
ভাসিয়ে দিলেম গা ;
তোমরা আমার নাগাল পেলে না।

দুই ডানাতে গেরুয়া সবুজ রেখা,
হিজিবিজি অনেক ছিল লেখা,
জানতো কি কেউ 'কমেট' চালায় খোকা ?"

টুটুল, খুকুরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। এরোপ্লেন চড়তে কার না ইচ্ছে হয় বলো ? তাই বললে—"ও দাদা, আমায় নেবে ?"

খোকা—

"তোমায় নেবো ? পাও নি এমন বোকা !
যখন তখন ভেংচি কাট—
ছিচ্ কাঁদুনের মা,
ঠুন ঠুন ঠুন রিক্‌সা চড়,
উড়ো জাহাজ না।"

ইসস্ ! এতে কার না রাগ হয় বলো ! "বটেই তো, রিক্‌সা চড়বে না হাতী ! বয়ে গেলো। তোমার সাথে কথা না বল্‌লে কি হয় ! আমার মোটেই এরোপ্লেন চাই নে। আমরা চড়ব উড়ন্ত কার্পেট।

নাই বা নিলে, জাঁক করো না,
থাক্ গে দাদা, তোমার পচা এরোপ্লেন !
মা বলেছেন, 'একটু রোসো,
গড়িয়ে দেবো হাল ফ্যাসানের
সোনার চেন।
থাক্ গে দাদা, তোমার পচা এরোপ্লেন।

বাবার ঘরে গালচে আছে কাশ্মীরী,
নেইকো আওয়াজ কান ফাটানো,
নেই সিঁড়ি।
বসব সুখে পা ছড়িয়ে, সঙ্গে পুসী—আলসেটা,
বলব, 'চলো হনলুলু'— চলবে উড়ে গালচেটা !
থাক্ গে দাদা, তোমার পচা কমেট্‌টা।

এক নিমিষে গালচে আমার শূন্যে ধায় ;
কমেট তোমার রইলো দাদা পেছনটায়।
পুসীর কানে রেডিও আঁটা,
বল্‌লে—'ম্যাও—ডাকেন মা',
গাল্‌চেটাকে ঘুরিয়ে বলি,
'পদ্মপুকুর এখন যা !'
কোথায় দাদা, তোমার পচা কমেট্‌টা ?"

বেচারী পিন্টু, খোকন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে পরে বলল, "যাঃ, গাল্‌চে আবার ওড়ে নাকি ?"

"ওড়ে কিনা আরব্য উপন্যাসে পড়ে দেখো।" বল্‌লে টুটুল। "তোমাদের সঙ্গে বক্‌তে পারি না বাপু,—রান্নাবাড়ি আছে, এবার যাই।"

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

নৃপতি অশোক প্রচার করেন বৌদ্ধধর্ম-কথা,
ধর্মশরণ, সংঘশরণ,
বুদ্ধশরণ লহ জনগণ,
জন্ম হলেই হবে যে মৃত্যু, নাহি এর অন্যথা।

ভ্রাতা বীতশোক কুক্কুটারামে গেল প্রব্রজ্যা নিতে,
রাজভ্রাতা বলি চিনে যদি কেহ
তাই সেথা হ'তে গেল সে বিদেহ,
অর্হৎ পদ লাভ করি ফিরে আসিল হৃষ্ট চিতে।

পাটলিপুত্রে প্রাসাদ-সৌধে কত দীপমালা জ্বলে ;
বাজিল নাকাড়া, ভেরী ও বিষাণ,
গায়কেরা গায় বন্দনা গান
"বীতশোক আসে ভেটিতে অশোক"
—সান্ত্রী ফুকারি' বলে।

ধূলিধূসরিত চীবর অঙ্গে, ভিক্ষাপাত্র হাতে—
শান্ত সৌম্য দেহ উন্নত,
মধুর বিনয়ে আঁখি দু'টি নত,
বীতশোক এলো সন্নত ভালে, দৌবারিকের সাথে।

কহিল অশোক কম্প্রকণ্ঠে অশ্রু-সজল চোখে,
"শ্রমণের বেশ কর পরিহার,
বিচ্ছেদ তব সহে না যে আর,
পুরবাসী হের বিরস বদন তোমা হারাবার শোকে।"

কহে বীতশোক, 'সম্রাট্, কেন আজি এ ভিন্ন মতি ?
এ জগতে হায় কেহ নহে কার,
বিচ্ছেদ ধ্রুব, মৃত্যু যে সার,
ধর্মশরণ ছাড়া মানবের আছে কি অন্য গতি ?"

বিদায় দিলেন অশোক ভ্রাতারে, কাঁদে
পুরনারী যত ;
চলে জনগণ পরিখার পারে,
ঘন বনানীর ছায়ার আঁধারে,
পাটলিপুত্র ছাড়ে বীতশোক ইহজন্মের মত।

সীমান্ত দেশে থাকি রাজভ্রাতা তথাগত পূজা করে,
ভিক্ষাচর্য্যা, পঠন, মনন,
এই তিন লয়ে ভরে ওঠে মন,
আর্ত্তের সেবা করিয়া ফিরেন গরীবের ঘরে ঘরে।

রটে সংবাদ, নিদারুণ রোগে রাজভ্রাতা
আছে পড়ি ;
নৃপতি অশোক করে হায় হায়,
উপস্থায়ক বৈদ্যেরা যায়—
ভেষজে সেবায় 'কুমারে' তাহারা দিল
নিরাময় করি।

ধর্মাশোকের রাজ্যে হঠাৎ হিংসা উঠিল জাগি ;
বুদ্ধ-মহিমা করিয়া খর্ব
আজীবকগণ করিল গর্ব,
আঁকিল চিত্রে—মহাবীর-কৃপা বুদ্ধ লইছে মাগি'।

বৌদ্ধ অশোক হইল আবার রূঢ় আজীবক প্রতি ;
নাচিল রক্ত শিরায় শিরায়,
চণ্ড অশোক জাগে পুনরায়,
ধর্মরাজ্যে বহিল আবার শোণিত-স্রোতস্বতী।

ভেরী হাতে চলে ঘোষকের দল অন্তবিহীন স্রোতে;
নগরে ও গ্রামে রাজার ঘোষণা—
আজীবক-শির আনিবে যে জনা
প্রতি শির পিছু একটি 'দীনার' পাবে
রাজকোষ হ'তে।

আঠারো হাজার আজীবক মরে
পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেতে ;
দগ্ধ হইল কত পরিবার,
শির কাটা গেল লক্ষ জনার,
জৈন-নিধনে পাটলিপুত্র তাণ্ডবে ওঠে মেতে।

মুণ্ডিত-কেশ বিগত-শ্মশ্রু অর্হৎ বীতশোক
ক্লান্ত চরণে, শ্রান্ত শরীরে
যাপেন রজনী আভীরের ঘরে,
পরমার্থের চিন্তায় তাঁর খসে মায়া-নির্মোক।

আভীরপত্নী বলিল আভীরে, 'আজীবক
এই জন।'
আভীর অমনি নিষ্কাসি' অসি
জ্ঞানী বীতশোক-শিয়রেতে বসি
অপেক্ষা করে কখন আসিবে হত্যার শুভ'খণ।

গত জনমের অসৎকর্ম প্রতিশোধ নিতে আসে,
ধ্যানযোগে সব জানি বীতশোক
মরণে বরেন না করিয়া শোক,
শির পেতে দেন আভীরের কাছে সরল মধুর
হাসে।

মূর্চ্ছিত হ'ল সভাগৃহে রাজা হেরিয়া ছিন্ন শির ;
অমাত্য রাধাগুপ্ত কহিল,
"হিংসা সবার হৃদয় দহিল,
পাপভারে নত রাজ্য বাঁচাতে মৃত্যু
বরেছে ধীর।
ভীত বিমর্ষ প্রজাকুলে, প্রভু, করুন অভয় দান।"
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অশোক
কাতরে বলেন, "হোক, তাই হোক"
পাটলিপুত্রে মন্দ্রি' উঠিল অহিংসা-প্রেমগান।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

দেয়ালী

কুমারী মালতী মুখোপাধ্যায়

ঠাস্ করে অপুর গালে এক চড় বসিয়ে দিল অপুর মা। "মর্ না তুই, আমার হাড়ে একটু বাতাস লাগুক্।" বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলে। দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে অপুরও গাল বেয়ে।

গিন্নী বারান্দা থেকে চীৎকার করছেন, "হাবাতে ছোঁড়া, দিল সব তেলটা ফেলে। বসে বসে অন্ন ধ্বংসাচ্চ, তার উপর আবার জিনিষ নষ্ট করা!"

বাগানটা পেরিয়েই দু'টো ছোট ঘর, তার অপরটাতে রায় বাবুদের বাড়ীর ভাঙ্গা আসবাব-পত্র থাকে। সেই ঘরে রায় বাবুর ছেলেরা মহানন্দে বাজি তৈরী করছে। অপু গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল।

"অপু, আড়ালে কি দেখছিস? চুরি করবার মতলব বুঝি?" বললে রায় বাবুর ছোট ছেলে বিমল।

"ইস্! চুরি করলেই হ'ল! মেরে পিঠের ছাল তুলে দেব না!" রায় বাবুর বড় ছেলে অজয় বলে উঠলো।

অপু ফিরে এসে নিজের ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর শুয়ে ভাবে, কি এমন দোষ করেছি? আমি তো গিয়েছিলুম পয়সা চাইতে, মা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল বলেই তো আঁচলটা টেনে ধরে-ছিলুম। আমি কি জানতাম তেলের বাটীটা পড়ে যাবে?

গিন্নী-মা কেন আমাকে বকল? বাজি তৈরী করতে ইচ্ছে হয় না আমার?

ইস্! অজয় মেরে পিঠের ছাল তুলে নেবে! কাউকে বাজি পোড়াতে দেব না! দশ বছরের অপু উত্তেজনার অধীর হয়ে উঠল।

তুলসীতলায় প্রণাম করতে করতে বল্ল অপুর মা,—"ক্ষমা কোরো ঠাকুর! মা কি কখনও

ছেলের মৃত্যুকামনা করতে পারে? উত্তেজনায়, দুঃখে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। অপরাধ নিও না ঠাকুর!"

হঠাৎ বাইরে কিসের যেন একটা গোলমাল। অজানিত আশঙ্কায় কেঁপে উঠল অপুর মা। কে যেন বল্ল—"ওগো অপুর মা, অপুর কি হয়েছে দেখ গে!'

বাগান পার হয়ে যখন মা টালির ঘরটার কাছে পৌছাল তখনও পাশের ঘরে আগুন জ্বলছে। কয়েকটি ছেলে আধপোড়া অপুকে টেনে বার করেছে। পাগলের মত অপুর মা তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

সারা রাত অপুর আর জ্ঞান ফিরল না। "অপু, বাপ আমার, একবার মা বলে ডাক। ঠাকুর, শুধু মুখের কথাটাই শুন্‌লে, মায়ের অন্তরের কথা কি শুনতে পাও নি?"

বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে পড়ল অপুর মাথাটা?

ঘরে ঘরে জ্বলে উৎসবের বাতি। আলোকসজ্জায় আর বাজির আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে সারা আকাশ। সেই আলোর মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায় ছোট্ট অপুর চিতার আলো, কে তার খবর রাখে?

গাঁয়ের মেয়ে

শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

গাঁয়ের মেয়ে
উদাস চেয়ে
কলসী কাঁখে
চলছে বাঁকে।
নদীর পারে
পথটি বাঁকা,
মাঠের ধারে
স্বুরটি মাখা,
গরুর মেলা
করছে খেলা,
তাহার পাশে
কীটের আশে
ঘুরছে পাখী
উজল আঁখি।

গাঁয়ের মেয়ে
চলছে ধেয়ে
ঘরের পানে,
ক্ষেতের ধানে
টানছে জোরে
আঁচল ধ'রে;
উদাস চেয়ে
গাঁয়ের মেয়ে।
মেঘের মেলা
করছে খেলা
আকাশ মাঝে,
আঁধার সাঁঝে
সবুজ পাখী
বলছে ডাকি

জোরসে চল
জোরসে চল,
গাঁয়ের মেয়ে
চললো ধেয়ে
সবুজে শাড়ী
হাওয়ায় নাড়ি;
হাঁসের দলে
ভাসছে জলে,
বাঁশের পাতা,
গাছের লতা
দুলছে জোরে
সাঁঝের ঘোরে;
গাঁয়ের মেয়ে
চললো ধেয়ে।

যাদের লেখা তোমরা পড়

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভাদ্র মাসের রামধনুতে তোমাদের বলেছিলাম শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে আমার দেখা করতে যাওয়ার কাহিনী। সে কাহিনী এবার ভাল করে শোন।

দ্বিতলে উঠে একখানি ঘরে গিয়ে বসতেই শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ এলেন। তাঁর পরনে সাদা পাজামা, গায়ে গোল-গলা সাদা গেঞ্জী, মাথার চুল সাদা, গোঁফ সাদা, গায়ের রঙ সাদা, মুখের হাসিও সাদা। দক্ষিণ হাতখানি আড়ষ্ট, পাখানিও কতকটা তাই। নাতিদীর্ঘ দেহ। তখন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। এসেই হাত তুলে নমস্কার করে সহাস্যে বললেন, "বসুন।"

বসলাম, কিন্তু মনে একটি প্রশ্ন জাগলো। ইনি উপস্থিত সকলকেই "তুমি" সম্বোধন করছেন, আমাকে এতটা তফাতে রাখছেন কেন? ইচ্ছা সত্ত্বেও মুখ ফুটে বলতে পারলাম না "আমাকেও 'তুমি' সম্বোধন করুন।" তিনি আমাকে কোন প্রশ্নের বা বক্তব্যের অবসর না দিয়েই শিশুসাহিত্যের কথা পেড়ে বস্‌লেন। শিশুসাহিত্য সৃষ্টি যে সহজ ব্যাপার নয়, এ কথাটি বুঝিয়ে দিয়ে একখানি ইংরেজি গল্পের বই আমার সামনে টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "বইখানা পড়েছেন? যদি শিশুসাহিত্য রচনা করতে চান, এই সব বই পড়বেন।"

দেখলাম, বইখানিতে কেবল জন্তু-জানোয়ারের গল্প আছে।

বইখানি আমি হাতে তুলে নিতেই বললেন, "বইখানি আপনি নিয়ে যান। ওর ভেতর—" বলে বইখানি আমার হাত থেকে নিয়ে একটি গল্প বার করে বললেন, "এই গল্পটি আমায় লিখে এনে দেবেন।"

গল্পটি আফ্রিকার জঙ্গলে এক শখের শিকারীর চিতাবাঘ শিকারের।

তারপর বল্‌লেন, "গল্পটি চার-পাঁচবার পড়ে বই বন্ধ করে লিখবেন।"

সেদিন ঐ পর্যন্ত। বই নিয়ে উত্তেজিত মনে বাড়ি এলাম এবং তার তিনদিন পরে গল্পটি লিখে প্রথম দিন অপেক্ষাও কম্পিত হৃদয়ে সরকার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। শিশুসাহিত্যে আমার সেই হাতে-খড়ি। জানি না, লেখা পড়ে গুরুমহাশয় কি বলবেন।

কিন্তু সেদিনও তেমনি সাদর সম্ভাষণ। গল্পটি আমার সামনে ব'সে পড়েই

"হাসিখুসি"-প্রণেতা হাসিতে খুসিতে একেবারে ছাপিয়ে উঠ্‌লেন। বললেন, "আপনি পারবেন।"

তবুও "তুমি" নয়!

ঠিক মনে করতে পারছি না, গল্পটির জন্য আমাকে কিছু পারিশ্রমিকও যেন দিয়েছিলেন।

তার পর দিন যায়। একদিন ডেকে পাঠালেন। গেলাম। সেদিন মনে হ'ল, আমাকে যেন কিছু মর্যাদা দান করছেন। বললেন, "একখানা বই লিখতে হবে। পারবেন?"

তার আগে আমার ছ'খানি শিশু-পাঠ্য গল্প-পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। বললাম, "কি বই?"

তিনি ব্যালানটাইনের "গোরিলা হান্টার"খানি আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই বই থেকে একখানি বই লিখতে হবে। কি করে লিখবেন বলুন তো?"

মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

বললেন, "বইখানা পড়ে যাবেন। আর সেই সঙ্গে যেখানে যেখানে 'ফ্যাক্‌ট্' আছে সেখানে সেখানে নীল পেনসিল দিয়ে দাগ দেবেন। পড়া হলে নীল দাগগুলো থেকে দেখবেন, এত বড় বইয়ে ফ্যাক্‌ট্ আছে মোটে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। আর সব ফেনানো। ছেলেরা ফ্যাক্‌ট্‌ই চায়, বেশী ফেনানো চায় না। ঐ পঞ্চাশ-খানি পৃষ্ঠাকে বাড়িয়ে একশ'খানি পৃষ্ঠা করবেন।" বলে বইখানি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন এবং এমন আচরণ করতে লাগলেন যেন আমি তাঁর সমকক্ষ সহকর্মী।

নমস্কারান্তে হাল্কা মনে বাড়ি এলাম এবং বাড়ি এসেই বইখানি পড়তে বস্‌লাম।

তার কিছুদিন পরে একখানি বই লিখে নিয়ে গেলাম। সেদিনও তেমনি সম্ভাষণ এবং হাসিটা যেন কিছু বেশীই মনে হ'ল। পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে এখান-ওখান থেকে কিছু কিছু পড়ে বললেন, "বেশ হয়েছে। আচ্ছা, সবটা পড়ে দেখবো। বইখানার কি নাম দিয়েছেন? 'আফ্রিকার জঙ্গলে'?—হুঁ, তা বেশ হয়েছে।"

বলতে পারলাম না যে আগের দিন তাঁরই কথার মধ্যে থেকে নামটি সংগ্রহ করেছিলাম। তিনি বলছিলেন, "এ সব আফ্রিকার জঙ্গলের ব্যাপার" ইত্যাদি।

আর যায় কোথায়? তখনই সঙ্কল্প করেছিলাম, বইখানার নাম দেব তাই।

কয়েকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তাই গেলাম। পাণ্ডুলিপিখানি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার এখন নেওয়া হবে না। বইখানি ভাল, ছেলেদের ভাল লাগবে। আর একজনকে লিখতে দিয়েছিলাম, সে কি-সব মাথামুণ্ডু লিখে নিয়ে এসেছিল। তার চোখও নেই, ভাষাও নেই। আপনার ভাষার বেশ ফ্লো।"

প্রশংসা লাভ হ'ল প্রচুর কিন্তু যাতে জীবনীশক্তি লাভ হয় তা পাওয়া গেল না। পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে ধীরে ধীরে চলে এলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম আর একজন যাকে লিখতে দিয়েছিলেন, তিনি হলেন আমার সেই লোহ-কবি মনিব মশায়।

তারপর অনেক দিন তাঁর কাছে যাই নি। কিন্তু লোকমুখে খবর নিতাম। শেষে শুনলাম, তিনি সে বাড়ি ছেড়ে গোয়াবাগানে "মাইকেল-জীবনচরিত" প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসুর পাশের বাড়ীতে উঠে এসেছেন। শরীর আগের চেয়ে আরও অসুস্থ।

এই সময় একদিন আমাকে লোক মারফৎ ডেকে পাঠালেন।

গেলামও। এবার পড়তে দিলেন এমন সব ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিন শিকারীদের লেখা বই যেগুলির এক একখানির আকার ও ওজনই এক একখানা এগারো ইঞ্চি ইটের চেয়ে বেশী। যখন কাঠের ব্লকে ছবি তৈরী হ'ত বইগুলো তখনকার, এবং বিলাতে ছাপা। প্রত্যেকখানি বইয়ের পাতা লাল ও বিস্কুটের মতো মুচমুচে হয়ে এসেছিল। গ্রন্থপ্রণেতারা আমার মতো বই পড়ে সে-সব বই রচনা করেন নি; আফ্রিকার গভীর অরণ্যে, পাহাড়ে ও মরুময় প্রদেশে, আমাদের সুন্দরবনে, মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে, তরাইয়ের জঙ্গলে শিকারের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বইগুলি দেখিয়ে বললেন, "এইগুলো নিয়ে যান, পড়বেন। ওর ভেতর থেকে বেছে বেছে গল্প লিখে এনে দেবেন। সাবধান! বইগুলো যেন না হারায় বা নষ্ট না হয়। তাহলে আপনারও দুঃখের কারণ হবে, আমারও দুঃখের কারণ হবে।"

তারপর বললেন, "মনে রাখতে হবে কাদের জন্য লিখ্‌চেন। শিকারের গল্প—'সিরিয়াস্' হবে।"

সেদিনকার মতো বইগুলো বয়ে নিয়ে বাড়িতে এলাম। কিছুদিন পরে

কতকগুলি গল্পও লিখে নিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার হাতের লেখা দেখে খুসি হলেন না। না হবারই কথা, কারণ, তাঁর হাতের লেখা ছিল সুন্দর। তবে তখন লিখতে পারতেন না, দক্ষিণ অঙ্গ পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। তবুও, বাঁ-হাতে যা লিখ্‌তেন, তাও অনুকরণীয়। কিন্তু সোজাসুজি বল্‌লেন না যে আমার হাতের লেখা ভাল নয়! তাঁর পুত্রের হাতের লেখার উল্লেখ করে আমাকে পরোক্ষে উপদেশ দিলেন। তাঁর এক পুত্রের মুখে শুনেচি, তাঁদের হাতের লেখাও পছন্দ হ'ত না।

এর পর তাঁর সঙ্গে আর একবার আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন থাকতেন হ্যারিসন রোডে ওয়াই. এম. সি. এর এক অংশে। দেখলাম শরীর খুবই অসুস্থ। কিন্তু স্বাভাবিক সৌজন্য পরিপূর্ণ ভাবেই আছে। তেমনি সাদর সম্ভাষণ, তেমনি প্রাণ-খোলা হাসি, তেমনি সুমিষ্ট কথাগুলি, তেমনি গল্প বলার উৎসাহ। শরীর ব্যাধিগ্রস্ত, মন কিন্তু নিরীক্ষবিহারী মুক্ত বিহঙ্গের মতো। আমার উঠে আসতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তার কিছুকাল পরে খবর পেলাম, তিনি পরলোকে।

এই সময়ে একদিন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে একখানি বইয়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে দোকানের ভেতর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দোকানের কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের পাশে একখানি চেয়ারে বসে আছেন একটি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটির মুখখানি গম্ভীর, গায়ের রঙ কালো, কিন্তু দেহ বেশ উন্নত। চিনতে পারলাম, তিনি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পথ দিয়ে দু' এক জন সাহিত্য-বন্ধুর সঙ্গে চলবার সময় তাঁকে দু'-একবার দেখেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে তিনি আলাপও করেছিলেন। তাঁদের মুখেই যোগেন বাবুর নামও শুনেছিলাম। তা ছাড়া "বিক্রমপুরের ইতিহাস"-প্রণেতারূপে তাঁর নাম তো জানাই ছিল। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করতে আমার বরাবরই কেমন একটা ভয়। কি বলে তাঁদের কাছে নিজ পরিচয় দেব সেও এক কথা, তার ওপর তাঁরা হয়তো এমন সব কথা বলবেন যার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারবো না, কেবল মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবো। তাঁরা ভাববেন লোকটা বোকা ও মূর্খ। নিজেকে বোকা ও মূর্খ বলে পরিচয় কি কেউ দিতে চায়?

দোকানের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে কর্ম্ম-সূত্রে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি ডাক্‌লেন, "আসুন, ভেতরে আসুন।"

ভয়ে, কুণ্ঠায়, কম্পিত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোকানে ঢুকলাম।

কার্যাধ্যক্ষ মশায় বললেন, "বসুন!" তারপর যোগেন্দ্র বাবুকে দেখিয়ে বললেন, "এঁকে চেনেন?"

স্বচ্ছন্দে বললাম, "না।"

"ইনি আমাদের 'শিশুভারতীর' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। যোগেন্দ্র বাবু, ইনি খগেন মিত্র—রায় বাহাদুর ন'ন—হাঃ হাঃ হাঃ—"

মরমে মরে গেলাম। কোন রকমে হাত তুলে নমস্কার করতেই যোগেন্দ্র বাবুও চট্ করে হাত দু'খানি একটু তুলেই বুকের ওপর আগের মতোই নামিয়ে রাখলেন, এবং ঈষতুচ্চাঙ্গের হাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, "কি করেন?"

যা করি তা জানালাম।

বললেন, "এতে চলে?"

বললাম, "মটোর গাড়িও চলে, গোরুর গাড়িও চলে।"

উত্তরে তিনি স্পষ্টই ক্ষুণ্ণ হলেন।

অতঃপর আমার সঙ্গে আর কথা বল্‌লেন না, উঠে দাঁড়ালেন এবং কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে যষ্টি হাতে ভারিক্কী চালে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সেদিনকার মত পরিচয় সেইটুকু।

সমাধান

শ্রীরেণুকা দেবী

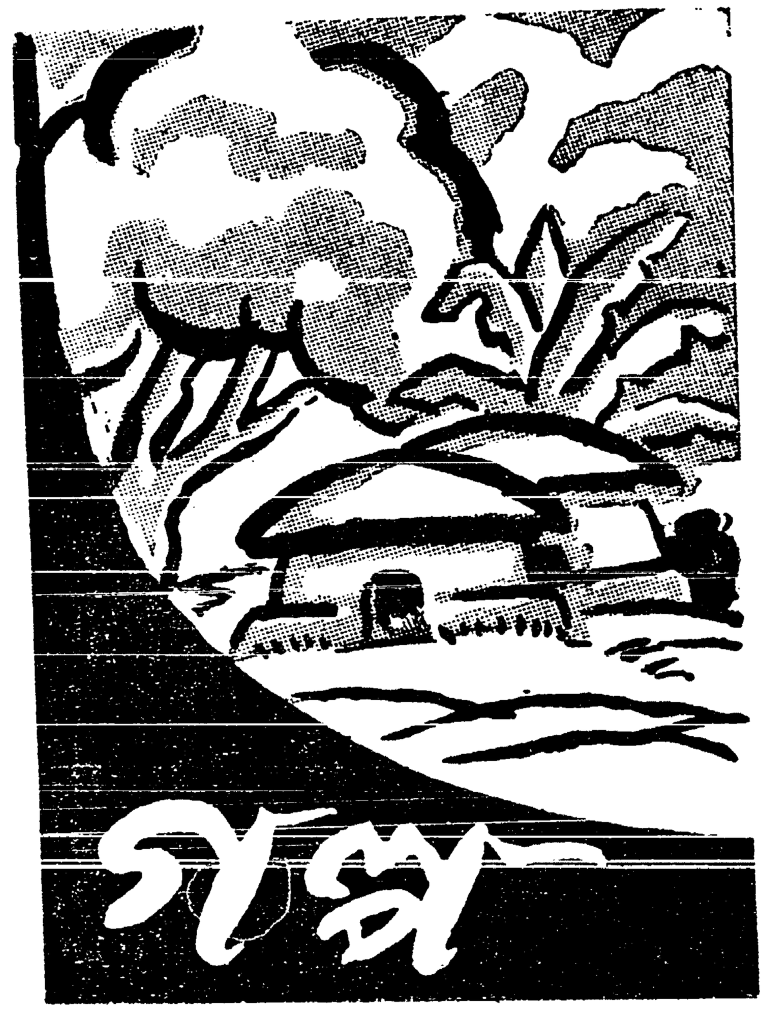

বিকাশদের বাড়ীর একতালার তিনখানা ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সেকালের বাড়ী, কাজেই ঘরগুলো বেশ বড়। ভাড়াটে স্থবিমল বাবু কোন মার্চ্চেণ্ট-অফিসে বেশ ভালো মাইনের চাকরী করেন। ভাড়াটেদের মালপত্র আসছে, আর বিকাশ অবাক্ হয়ে সেই সব জিনিস নামানো দেখছে। এই সব জিনিস নামানো-ওঠানো, খোলা-মেলা দেখতে ওর খুব ভালো লাগে।

বিকাশদের ভাড়াটেরা সর্ব্বসমেত পাঁচজন। স্বামী, স্ত্রী, একটি ছেলে, একটি মেয়ে ও চাকর। বছর বারো বয়সের ছেলেটিই বিকাশের সমবয়সী; সে-ই আগে এসেছে, মালপত্রের সঙ্গে। জিনিসপত্র তদারকের গুরু কর্ত্তব্য পাওয়ায় খুব গর্ব্ব সহকারে ব্যস্ত থাকায় সে প্রথমে বিকাশকে দেখতে পায় নি। আশেপাশে বারান্দার কৌতূহলী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে যখন ঘরের ভিতরের দুয়ারের দিকে তাকালো তখন বিকাশকে দেখতে পেল। প্রথমটা, সে-ই যেন এই পরিবারের কর্ত্তা ব্যক্তি এই রকম ভাব দেখিয়ে, দু'-এক বার বিকাশের দিকে তাকিয়ে অনর্থক কুলীদের হুম্‌কী দিয়ে এটা এখানে রাখ, ওটা ওখানে রাখ ইত্যাদি হুকুম করতে লাগলো। কিন্তু বিকাশের চোখে আলাপের আগ্রহ আর নিজের মনের বালসুলভ ইচ্ছায় সে ভাব বেশীক্ষণ থাকলো না, সে এগিয়ে এল বিকাশের দিকে একবার তার আপাদমস্তক দেখে, ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করলো—"হোয়াট্‌ ইজ্ ইয়োর নেম্?"

যদিও এটুকু ইংরাজি বুঝবার বিদ্যা বিকাশের ছিল তবুও ইংরাজীতে প্রশ্ন শুনে সে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল, চট্‌ করেই উত্তর দিতে পারলো না। ছেলেটি আবার বল্ল, "তোমার নাম কি?"

"—নাম? ও—ও, বিকাশ মিত্র।"

এবার বিকাশ বলে, "তোমার নাম কি?"

"সুরঞ্জিত ডাট।"

একটুখানি সময়ের মধ্যে দু'জনের ভাব জমে ওঠে। কে কোন্ ইস্কুলে পড়ে, কে কি গল্পের বই পড়েছে ইত্যাদি। ক্যারাম বোর্ড, লুডো, খেলোয়াড়দের কাটা ছবি—খবরের কাগজ থেকে—কার কাছে কত আছে কিছুই জানতে বা জানাতে বাকী থাকে না। একটু পরেই একটা

ট্যাক্সি এসে থামে; নেমে আসেন একজন অতি সুসজ্জিতা মহিলা, হাতে একটা মস্ত বড় ব্যাগ। বিকাশ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে, "কে রে?"

সুরঞ্জিত বলে, "আমার মা, বাবা, আর বোন দীপা।"

বিকাশের আর কারো দিকেই তাকানো হয় না, শুধু মহিলাটিকেই আশ্চর্য্য ভাবে দেখে। একটু অবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, "তোমার মা!"

মহিলাটি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে গেছেন, গম্ভীর স্বরে বল্লেন, "রঞ্জু, যাও ঐ মোড়াটা নিয়ে ঐ ধারে বস।" তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি এই বাড়ীর ছেলে? কি নাম?" ব্যস্, আর কিছুই না। কাজের ব্যবস্থায় লেগে যান তিনি। বিকাশ তবুও দাঁড়িয়ে থাকে, অবাক্ হয়ে দেখে ঐ মহিলাটিকে। মা!—'রঞ্জুর মা!' তবুও তার মন সায় দিতে পারছিলো না। কোথায় যেন তার মনে মাদের সম্বন্ধে যে কল্পনাটি ছিল, তার সঙ্গে মিল ছিল না। একটু পরেই তার এত খারাপ লাগতে লাগলো যে জিনিসপত্র দেখার লোভও আর থাকলো না।

রঞ্জুরা আগে যেখানে থাকতো সেখান থেকে দূর বলে ওকে এই পাড়ার কাছাকাছি সাউথ সুব্যরবানে-ই ভর্ত্তি করা হ'ল। একবয়সী হলেও সুরঞ্জিত বিকাশের চেয়ে এক ক্লাশ ওপরে পড়ে। রঞ্জুর বিকাশকে খুব ভালো লাগে, বিকাশেরও রঞ্জুকে ভালো লাগে কেবল যখন সে বাড়ীর বাইরে থাকে, বা ওদের ঘরে থাকে। রঞ্জুদের ঘরে গিয়ে সে যেন আর রঞ্জুকে তেমন করে পায় না। চারিদিকের একটা নিয়ম-শাসন অহেতুক ভয়ের সঞ্চার করে তার মনে। একদিন সে রঞ্জুকে ডাকতে গিয়েছে; রঞ্জুরা যে ঘরটা বসবার ঘর করেছে তার একটা দরজা খুললেই বিকাশদের দালান। দরজাটা খোলাই ছিল, পর্দ্দা ঝুলছে। তার পরের ঘরখানাই ওর মায়ের শোবার ঘর। রঞ্জুও বোধ হয় আসতে চাইছিল, ওর মা বলছেন, "রঞ্জু, আজকাল প্রায়ই দেখি তুমি খালি পায়ে বাইরে যাও। ঐ বিকাশের দেখে শিখ্‌ছো বুঝি? যাও, চটি পায়ে দিয়ে এস।"

রঞ্জু বলে, —"না মা, বাইরে যাচ্ছি না। ওদের ছাতে যাচ্ছি।"

—"তা হোক, কখ্‌খোনো খালি পায়ে থাকবে না।" তারপর হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, "যাও, আধঘণ্টার মধ্যেই আসবে, তোমাদের গানের মাষ্টার মশাই আসবেন আজ।"

রঞ্জু মুখ ভার করে বলে, "বিকেল বেলা গান শিখতে ভালো লাগে না।" গম্ভীর আওয়াজ হয়—"রঞ্জু!" তারপর একটু থেমে বলেন, "দিন দিন উন্নতি হচ্ছে তোমার! মায়ের কথার প্রতিবাদ করতে শিখ্‌ছো! যাও, ঘরে যাও, ছাতে যাওয়া হবে না।"

বিকাশ সেখান থেকেই ফিরে যায়, আর মলিন মুখে রঞ্জু ফিরে যায় তার ঘরে, তার জন্য নির্দ্দিষ্ট যে টেবিল-চেয়ার আছে সেইখানে। ছাতের উপর থেকে ভেসে-আসা সমবয়সীদের কলকণ্ঠ শুনতে শুনতে তার ক্ষোভ ক্রোধে পরিণত হয়। আপন মনে সে গজরাতে থাকে। একটু পরেই মা আসেন ঘরে, আবার তাঁর হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, "এখন সাড়ে পাঁচটা। ঠিক ছ'টার সময়ে গানের মাষ্টার মশাই আসবেন, তুমি ও দীপা গান শিখবে।"

রঞ্জুর মা ওর বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে যান। রঞ্জু ছুটে আসে ওদের বসবার ঘরে জানালার কাছে, যেখানে ওর বোন দীপা সতৃষ্ণ নয়নে অন্য মেয়েদের ছুটোছুটী দেখছিল। কারণ তারও বাইরে যাওয়া নিষেধ। রঞ্জু আট বছরের বোন দীপার দিকে তাকিয়ে বলে, "হ্যাঁ, থাকবে ঘরে বসে!" সোজা সে চলে যায় ছাতে। একটু পরেই বৃষ্টি আসে; সবাই নেমে আসে, কেউ কেউ বাড়ীতে চলে যায়। রঞ্জু আসে বিকাশদের শোবার ঘরে। সেকালের বাড়ী বলে ঘরগুলো বেশ বড়, আর সেই বড় ঘরের একদিক্ যুড়ে মস্ত বড় দু'টি খাট যোড়া করে পাতা। রঞ্জু অবাক্ হয়ে যায়, বলে, "এত বড় বিছানা! কে শোয় রে এখানে? তুই নাকি?"

বিকাশ বলে, "হ্যাঁ; আমি, মা, ছোড়দা, আর পুতুল। এই দেখছিস নে চারটে বালিশ? এই ছোড়দা, আর এই মার দু'পাশে আমি আর পুতুল। আমরা দু'জনেই মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকি।"

রঞ্জুর মনটা কেমন হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় নিজের সঙ্কীর্ণ খাট, একলা শুয়ে থাকার কথা। মার গায়ে হাত দিয়ে ঘুমোতে কি রকম লাগে? সে দিন সর্ব্বপ্রথম রঞ্জুর রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম আর আসে না। অস্থির চঞ্চল মনে উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সামনের ঘরে যেখানে ওর বাবা-মা থাকেন। দরজায় হাত দিয়েই বুঝতে পারে বন্ধ। বিফল মনে ফিরে এসে আপনার খাটে বসে দেখে সামনের খাটে ওর ছোট বোন দীপা ঘুমুচ্ছে। নিজের কথা ভুলে ছোট বোনটির জন্যে করুণায় তার মন ভরে ওঠে।

রঞ্জুর মন আজকাল সব সময়ে পড়ে থাকে বিকাশদের ওখানে। কিন্তু আকর্ষণ তার প্রতি কি ওর মার প্রতি তা সে ভালো বুঝতে পারে না। তবে, বিকাশের মাকে ওর খুব ভালো লাগে। সাজ নেই, সজ্জা নেই, তবুও কি সুন্দর! সেদিনও মা বেরিয়ে যাবার পর সে বিকাশদের বাড়ীতে এসেছে। সিঁড়ির সামনের ঘরটাই এখন বিকাশদের রান্নাঘর। দেখে কি, বিকাশের মা তালের বড়া ভাজছেন, আর ওরা চার ভাইবোন,—মানে ওর বড়দা', যে কলেজে পড়ে সে পর্য্যন্ত, বসেছে ডিস্ নিয়ে। ওর মা ভেজে ভেজে দিচ্ছেন, ওরা খাচ্ছে। ওর মা সস্নেহ দৃষ্টিতে তাই দেখছেন মাঝে মাঝে তাকিয়ে। পেছন দিক্ পড়ে বলে ওরা রঞ্জুকে দেখতে পায় নি, কিন্তু বিকাশের মার চোখ এড়াল না। তিনি বল্লেন, "এস এস। পুতুল, দে তো মা ওকে একটা ডিস। খাও বাবা, দু'টো গরম বড়া।"

রঞ্জু অভিভূত হয়ে যায়। কিছু বলতেও পারে না, নড়তেও পারে না। বিকাশের মা বলেন, "ভয় করছে? মা বকবে? কিছু হবে না, খাও। আমি বলছি সব ভালো জিনিষ, আমার নিজের হাতের তৈরী।" একটা ডিসে কিছু বড়া এগিয়ে দিয়ে বলেন, "এস বাবা, এস।" পুলকিত হয়ে রঞ্জু বসে পড়ে—তা ওর মাকেই বেশী ভালোবেসে, না বড়াকেই, তা বুঝতে পারে না। তবে এটুকু মনে হয়, এমন আনন্দ ও আগে কখনও পায় নি।

দু'দিন হ'ল বিকাশের সর্দ্দি-জ্বর হয়েছে। শনিবার দিন রঞ্জু ইস্কুল থেকে এসেই ওকে দেখতে যায়। খাটের ধারে, টুলের উপর একটা বাটীতে মুড়ী, আর ছোট ডিসে সরু সরু করে আদা কুচানো, নুন; আর বিকাশ বসে ফন্দী আঁটছে, 'মুড়ী খাব না, লুচী খাব।' ওর মা গায়ে হাত

বুলিয়ে, মাথার চুল নেড়ে নেড়ে বলছেন, "লক্ষ্মী ছেলে, আজ মুড়ী খাও, কাল জ্বর না থাকলে লুচী করে দেবো। আজকেই তোর বাবাকে বলব ভাল গাওয়া ঘি কিনে আনতে। আদা দিয়ে মুড়ী কত ভালো লাগে জানিস? আমি তো খুব ভালোবাসি।" রঞ্জুকে দেখে তিনি বলেন, "ঐ দ্যাখ, রঞ্জুও সর্দ্দি-জ্বর হলে ওর মার কাছে বসে মুড়ী দিয়ে আদা দিয়ে খায়, না রে রঞ্জু?" ক্রমশঃ ক্রমশঃ মার কথা ও গায়ে হাত বোলানোর মধ্যে বাটীর মুড়ীও শেষ হয়ে যায়।

সর্দ্দি-জ্বর ছোঁয়াচে বলেই হোক আর আবহাওয়ার দোষেই হোক, দু'-এক দিন পরেই রঞ্জুরও সর্দ্দি-জ্বর হ'ল। ডাক্তার আসেন, প্রেস্‌ক্রিপশান্ করে ওষুধ ও বার্লির ব্যবস্থা করে যান। রঞ্জু ওর খাটে শুয়ে আছে, বেলা তখন আড়াইটে হবে। মা এলেন থার্ম্মোমিটার হাতে। রঞ্জুর খুব ইচ্ছে মা একটু কাছে বসেন, একটুখানি মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে। মা অবশ্য বসেন, তবে খাটে নয়, চেয়ার টেনে খাটের পাশে। থার্ম্মোমিটারটা বগলে দিয়ে, রঞ্জুর কপালে হাত রাখেন উত্তাপ দেখবার জন্যে। ভারী ভালো লাগে ওর। তখুনি নিজের ডান হাত দিয়ে মার হাতটা চেপে ধরে। জ্বর দেখা হয়ে গেলে মা উঠে পড়েন, হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, "আমি যাই, আজ আবার মহিলা সমিতির মিটিং আছে। ৪টের সময় ওষুধ খাবে এক দাগ, আর রাজেনকে বলবে বার্লি দিতে; আর আমিও ওকে বলে যাচ্ছি।" সুন্দর ভাবে বেশ-বাস করা, বাইরে যাবার জন্য তৈরী-হয়েই-আসা মার দিকে একটা ব্যথাহত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে। রাজেনের দরজা বন্ধ করার শব্দেই বুঝতে পারে মা বেরিয়ে গেছেন। অমনি আহত মনে বালিশের উপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে সে, আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে চোখে দু'-এক ফোঁটা জল।

এ রকম ভাবে কতক্ষণ ছিল তা তার খেয়াল নেই, রাজেনের ডাকে উঠে বসে। টেবিলের উপর গ্লাসে এক দাগ ওষুধ ঢেলে দিয়ে রাজেন বার্লি আনতে যায়। রঞ্জু বসে থাকে ওষুধ না খেয়েই। রাজেন বার্লি এনে গেলাসটা টেবিলের উপর রাখতেই সেই আ-ছাঁকা, সর-ভাসা-ভাসা বার্লির দিকে তাকিয়ে ওর মন বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে, আর মনের সমস্ত ব্যথা-বেদনা একটা অব্যক্ত ক্রোধে পরিণত হয়। ওষুধ সমেত গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, "যা, আমি খাব না ওষুধ।" পরক্ষণেই আবার বার্লি সমেত গেলাসটা সজোরে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে, "যা, যা এখান থেকে। কিচ্ছু চাই না আমি, কারো থাকতে হবে না আমার কাছে।"

রাজেন প্রথমটা অবাক্ হয়ে যায়, তার পর ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে তার নিজেরই কাজ বেড়েছে দেখে ভীষণ চটে যায়, বলে, "দাঁড়াও না, আমি এ সব তো এখন পরিষ্কার করবো না, আগে মা আসুন।" রঞ্জুর মনের উত্তেজনাও তখন কমে এসেছে, বুঝতে পারে মা এলে আর এ সব দেখলে তার কি পরিণাম, তবুও আহত মনে গজ্‌রাতে থাকে, "হ্যাঁ, আসুন না, ভারী! বেশ করবো, খুব করবো।"

যে রঞ্জু সামান্য অপরাধে মায়ের বকুনীতে কেঁদে ভাসিয়ে দিত আর সহজেই স্বীকার করতো এমন আর সে কখনও করবে না, এ দিনের এত বড় অপরাধের সব তিরস্কার সে সহ্য করলো

নীরবে। কোন মতেই তার মুখ দিয়ে বার করানো গেল না যে সে আর এমন করবে না। ক্রমশঃই তার এই একগুঁয়েমীর ভাব প্রকাশ পেতে লাগলো। রঞ্জুর মা ভেবে পান না, কি করে সে এমন বেয়াড়া হচ্ছে। সে তো মেশে একমাত্র বিকাশের সঙ্গে, আর বিকাশ ছেলেটি বেশ শান্ত, ভদ্র, সত্যিই ভালো ছেলে। বিকাশ কিন্তু রঞ্জুর একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলো। রঞ্জু যেন হঠাৎ তার উপর কেমন খাপ্পা মতন হয়ে গিয়েছে। খামখা তার উপর রেগে ওঠে। যে রঞ্জু ইচ্ছে করে এসে দু'জনের জমানো ছবি বদল করেছে, যে ষ্ট্যাম্প ওর নেই সেটা দিয়েছে, হঠাৎ এসে সে 'আমার গুলো দিয়ে দাও' বলে চেয়ে নিয়ে যায়। বিকাশ পরে জানতে পেরেছে, সেগুলো সে অন্য ছেলেকে দিয়ে দিয়েছে। রঞ্জুর মাসিক রামধনুটা চাইতে গেল, অকারণ 'দেব না' বলে ওঠে। বিকাশ ভেবে পায় না, কেন সে এমন হ'ল। রঞ্জুর মন ভালো করবার জন্য সে যতই তাকে খুসী করবার চেষ্টা করে রঞ্জু যেন ততই হিংসুক হয়ে ওঠে। বিকাশের জন্মদিনে-পাওয়া গল্পের বই পড়তে এনে ছিঁড়ে দেয়, ম্যাপটা দেখতে নিয়ে কালি ঢেলে দেয়। বিকাশ কেঁদে মাকে দেখায়, মা কিন্তু রঞ্জুর মাকে বলতে দেন না, বলেন 'ছেলেমানুষ, হঠাৎ হয়ে গেছে।' সেদিনের ঘটনাটা আরো ভয়ানক। রঞ্জু হঠাৎ ক্যারাম খেলতে এল বিকাশের কাছে। খেলতে খেলতে মায়ের ডাকে বিকাশ একবার উঠে যেতেই রঞ্জু পকেট থেকে একটা ছুরী বের করে বোর্ডটা ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। ক্যারাম বোর্ডটার চেহারা দেখে বিকাশ এমন কান্নাকাটি সুরু করলো যে রঞ্জুর মা-বাবারও তা অজানা থাকলো না। বিকাশের মাও অবাক্ হয়ে গেলেন, কেন ও অমন করলো!

প্রচুর প্রহারের পর রঞ্জুকে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে ওর মা, বাবা গেলেন বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে—ছেলে যে রকম অসভ্য, বেয়াড়া হচ্ছে, কি করা যায়? কোন বোর্ডিংয়ে পাঠাবেন কি না। বন্ধ ঘরে রঞ্জু গুম হয়ে বসে আছে। রাজেনের কাছ থেকে চাবী চেয়ে নিয়ে বিকাশের মা এলেন। রঞ্জু, তিনি বকবেন ভেবে, মনকে শক্ত করে। কিন্তু তিনি আস্তে আস্তে ওকে কোলে টেনে নেন। অপরাধের কথা কিছুই বলেন না। গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন, "বড্ড লেগেছে, না রে?" তাঁর সেই স্নেহ-মাখা স্বরে রঞ্জু ফুকরে কেঁদে ওঠে; দু' চোখে জলধারা—দু' হাত দিয়ে বিকাশের মাকে জড়িয়ে ধরে, তাঁর বুকে মাথা গুঁজতে থাকে। মুখের ভাষায় না বল্লেও সেই গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরার মধ্যে কি ছিল বিকাশের মার তা বুঝতে একটুও দেরী হয় না।

সেদিন থেকে রঞ্জু আবার নতুন মানুষ।

ভাদ্র মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

ভাদ্র মাসের প্রতিযোগিতা (বিতর্ক প্রতিযোগিতায়) প্রথম পুরস্কার পেলেন—শ্রীঅমিয়া চৌধুরী (বনারস)। ইনি চলতি ভাষার স্বপক্ষে লিখেছেন।

আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে ঃ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল (মহেশ্বরা)—চলতি ভাষা, শ্রীকরুণা গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা)—সাধু ভাষা ও শ্রীগৌরকিশোর চৌধুরী (মণিনাথপুর)—চলতি ভাষা।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

দীর্ঘ ছুটীর পর আবার তোমাদের সঙ্গে পত্রালাপ করছি। ইতিমধ্যে তোমাদের ৺বিজয়ার শুভেচ্ছাজ্ঞাপক চিঠিতে আমাদের চিঠির ঝাঁপি ভর্ত্তি হয়ে উঠেছে। কাজেই সমবেত ভাবে সে সব চিঠির প্রাপ্তি-স্বীকার ও তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া আর উপায় কি? তবে তোমাদের সকলকেই এই সুযোগে আমাদের ৺বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম।

শ্রীঅখিল সরকার (কৃষ্ণনগর)—তোমার ৬ পৃষ্ঠা যোড়া দীর্ঘ পত্রের জন্য প্রথমেই তোমার চিঠির জবাব দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করছি। বড় হলেও তোমার চিঠিখানা ভারী সুন্দর, তোমার ছোট্ট মনের কথা অপকট ভাবে ফুটে বেরিয়েছে। তোমার প্রস্তাবগুলি অধিকাংশই খুব সময়োচিত এবং এর কোন কোনটা আমরা গ্রহণও করব। তুমি যে ১০ খানা ছোটদের পত্রিকার নাম করেছ তা ছাড়া চলতি কাগজ আর কোথায়? এরও সব ক'খানা এখন কি টিকে আছে? তবে যে সব কাগজ এক সময় সুনাম অর্জ্জন করেছিল কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের নাম যদি চাও, অনেক দিতে পারি। বর্ত্তমানে ছোটদের চালু কাগজের মধ্যে তোমার তালিকার বাইরে শ্রীমায়া মল্লিক সম্পাদিত "অঙ্কুর" (ঠাকুর পুকুর, বরিষা কলিকাতা-৮) ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত "পাঠশালা" (৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)—এদের নাম করা যায়। শেষোক্তটি অবশ্যি ঠিক ছোটদের নয়—যুবকদের উপযোগী। শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী)—তোমার দেওয়া নতুন প্রস্তাব ও নতুন গ্রাহক দু'টিই সাদরে গ্রহণ করছি। শ্রীদীপককুমার বসু (কলিকাতা-২৯)—তোমাদের পূজো দেখেছি বই কি, কিন্তু যা ভীড়! ভলান্টিয়ারের ব্যবস্থারও সুখ্যাতি করতে পারলাম না। আর সব ভালই লেগেছে। তুমি ঠিকই বলেছ, জীবনটাই পরীক্ষা। তবে আপাততঃ আই. এস-সি পরীক্ষার জন্য ভাল করে তৈরী হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ইউনিভার্সিটির রকম-সকম তো দেখছই! হাতে আঁকা ছবি একরঙা চলবে। "পেনফ্রেণ্ড"এ তেমন সাড়া

কোথায় ? শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ (কলিকাতা-১২) – তোমার লেখার উন্নতি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি। 'হৈমন্তিক' সুন্দর হয়েছে,—'ভাবী'র গণ্ডী ছাড়িয়ে অনায়াসে ওকে স্থান দেওয়া যায়। কিন্তু, মুশকিল, কবিতা এত জমে গেছে যে অপরকে স্থানভ্রষ্ট না করে স্থান দান করা তুরূহ। শিশুসাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তথ্যপঞ্জী তৈরী হচ্ছে। ইতিমধ্যে খগেন্দ্র বাবু তোমাদের জন্য তাঁর নিজের চোখে দেখা শিশুসাহিত্যিকদের কথা লিখছেন। আশা করি ভাল লাগবে। শ্রীমঞ্জুশ্রী বসু (ছাপরা)—তোমার চিঠির জবাব অনেক দিন পরে দিচ্ছি। 'নটরাজের' মূৰ্ত্তির পায়ের তলায় যে শিশুমূৰ্ত্তি দেখা যায় সেটি হচ্ছে 'মল' বা অজ্ঞান অথবা মায়ার মূৰ্ত্তি। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কুমারস্বামী লিখেছেন—"নটরাজ নৃত্য করছেন এক শায়িত বামনের ওপর—যে হচ্ছে 'মল'—অজ্ঞানতা বা মায়ার প্রতীক।" শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী (নবদ্বীপ)—আশ্বিন মাসের প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু নিয়ে তুমি আপত্তি জানিয়েছ। এঁরা যে সকলেই স্বদেশপ্রেমিক সে বিষয়ে তো কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে নি এবং এঁদের মধ্যে কে "বড়" সে প্রশ্নও উঠছে না। কাজেই সম্মান-হানিকর কোন প্রস্তাব নেই এতে। কে তোমার "প্রিয়" তাই জানাতে বলা হয়েছে। "সবাই সমান প্রিয়" শুনতে হয়তো ভাল, কিন্তু সত্যি কি আর তা হয়? প্রত্যেকেরই নিজের একটা আদর্শ আছে। শ্রীমিহির দাশগুপ্ত (জামসেদপুর)—প্রতিযোগিতার উত্তর ছোট হ'লে রামধনুতে ছাপানো হবে এবং হয়ও। বড় হলে তার জন্য স্থান সংকুলান করা কঠিন হয়ে পড়ে। শ্রীগোবিন্দমোহন মাইতি (লখিয়া)—ইণ্টারন্যাশনাল বুক হাউস লিঃ, ৯, য়্যাশ্‌লেন বোম্বাই—১, এই ঠিকানায় লিখলে ছোটদের বহু ইংরেজি পত্রিকার দাম ও অন্যান্য বিবরণ জানতে পারবে। শ্রীতুষারকান্তি চাকী (আগমনী)—তোমাদের ওখানকার পূজোর বর্ণনা পড়ে খুশী হলাম। কিন্তু আশ্বিনের রামধনু তো পূজোর আগেই বেরিয়ে গেছে, এবং অন্ততঃ পঞ্চমীর দিনই তা পাবার কথা। অথচ তুমি লিখেছ, রামধনু পেয়েছ লক্ষ্মীপূজোর পরে। খুব অশ্চর্য্যের কথা তো! কলকাতা শ্যামবাজার থেকেও একটি গ্রাহক ঐ রকম দেরীতে রামধনু পেয়েছে বলে জানিয়েছে! শ্রীনিবেদিতা সেন (কলিকাতা ২৯)—তোমার শুভেচ্ছার সঙ্গে কলকাতার ছবিখানি পেয়ে পরম প্রীত হ'লাম। শ্রীশোভা সিংহ (কলিকাতা)—দীর্ঘ দিন কলকাতায় কাটিয়ে ২।৪ দিনের জন্য বাইরে ঘুরে আসতে পারা যে কত লোভনীয় তা লিখেছ। আমিও এবারে কয়েকদিন ঘুরে এলাম বাইরে থেকে, তাই তোমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করছি।

পুনরায় প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি শেষ করি। ইতি—রাঃ সঃ

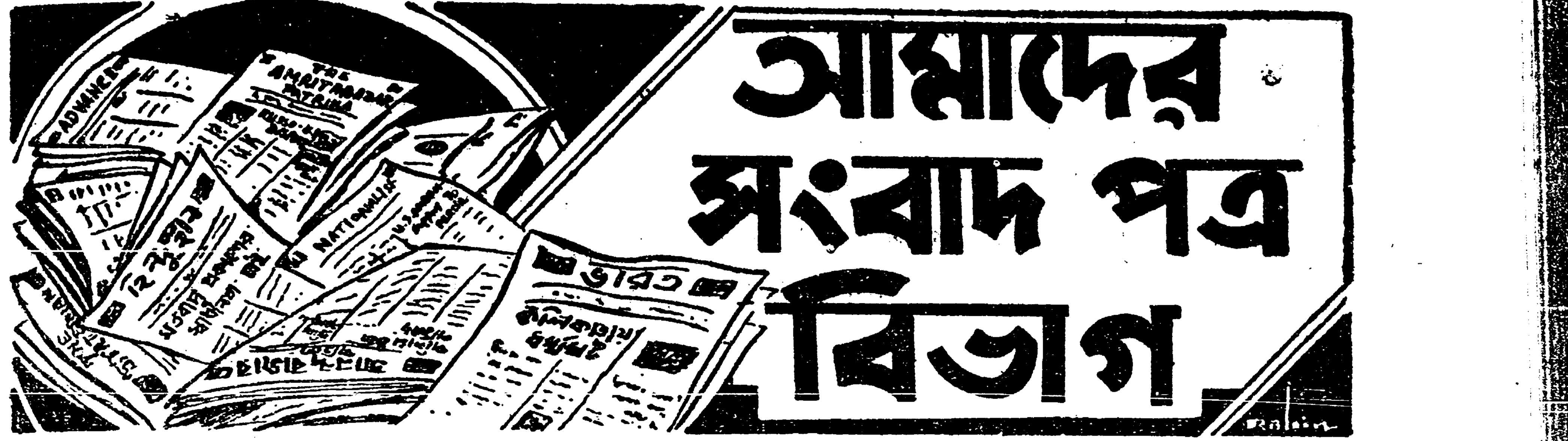

পরলোকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, সুপণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁর আসল প্রতিভার পরিচয় হচ্ছে তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণায়। সেকালকার প্রাচীন সংবাদপত্র ঘেটে তিনি সে যুগের যে ইতিহাস উদ্ধার করেছেন তার জন্য তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস রচয়িতা হিসাবেও তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই সব কৃতিত্বের জন্য এ বছর সরকার থেকে তাঁকে রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

ভারত বনাম পাকিস্তান – ক্রিকেট টেষ্ট

পাকিস্তান থেকে একটি শক্তিশালী বাছাই-করা দল এসেছে ভারতে ক্রিকেট খেলতে। ভারতীয় দলের সঙ্গে তাদের পর পর কয়েকটি টেষ্ট তিযোগিতা হবে ঠিক হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লীতে এই পর্য্যায়ের প্রথম খেলা হয়ে গেল। এতে কিন্তু পাকিস্তান সুবিধা করতে পারে নি,—ভারতীয় দলের কাছে এক ইনিংস্ ও ৭০ রানে পরাজিত হয়েছে। ভারতীয় দলের ১ম ইনিংস্-এর ৩৭২ রানের প্রত্যুত্তরে তারা করে ১ম ইনিংস্এ ১৫০ রান্ এবং ২য় ইনিংস্এ ১৫২ রান্। ভারতীয় দলের এই বিজয়ের প্রায় সবটা কৃতিত্বই অবশ্যি দাবী করতে পারেন মানকড়। তিনি ১ম ইনিংস্এ ৮টি এবং ২য় ইনিংস্এ ৫টি উইকেট দখল করেন। ভারতীয় দলে সব চেয়ে বেশী রান্ তোলেন অধিকারী—৮১, নট্ আউট। তারপর হাজারে—৭৬। পাকিস্তান দলের মহম্মদ হানিফ ১ম ইনিংস্এ ৫১ করেন; ২য় ইনিংস্এ কারদার নট্ আউট থেকে ৪৩ আর ইমতিয়াজ আমেদ ৪১ করেন। অনেক দিন পরে লালা অমরনাথ এবার ভারতীয় দলে যোগ দিয়েছিলেন অধিনায়ক রূপে। পাকিস্তান দলের অধিনায়ক ছিলেন আবতুল হাফিজ কারদার।

ফুটবল

কলকাতার আই. এফ. এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল এখন পর্য্যন্ত স্থগিত আছে। মোহনবাগান আর রাজস্থান ফাইনালে উঠে বসে আছে, একবার ড্র করে। কবে যে খেলার চূড়ান্ত নিস্পত্তি হবে তা কেউ জানে না। এদিকে মোহনবাগান বোম্বাইএ রোভার্স্ কাপে খেলতে গিয়ে শক্তিশালী উইম্‌কো দলকে

হারাবার পর কোয়ার্টার ফাইনালে 'লাহোর রেইডার্স' দলের কাছে ৩—০ গোলে হেরে এসেছে। দিল্লীর ক্লথ্ মিল্ প্রতিযোগিতায় ইষ্টবেঙ্গল দল জয়ী হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতা হয়— এবারে তার তোড়জোড় চলছে। ফুটবল মরশুম শেষে শীতকাল অবধি চলবে মনে হচ্ছে।

নোবেল পুরস্কার

সম্প্রতি আমেরিকাবাসী ডাঃ সেল্‌ম্যান ওয়াক্‌স্‌মেন্‌কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে—চিকিৎসা শাস্ত্রে। ওয়াক্‌স্‌মেন্ হচ্ছেন ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন্ নামে সুবিখ্যাত ওষুধের আবিষ্কারক। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের গুণের কথা তোমরা কিছু কিছু শুনেছ। যক্ষ্মা রোগে এর চাইতে ফলপ্রদ ওষুধ এর আগে আর বেরোয় নি।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) চিত্তরঞ্জন (২) এল্‌-আহা-বাদ (৩ ডায়মণ্ড হারবার (৪) পানিত্রাস (৫) বুড়ীগঙ্গা (৬) চন্দ্রগুপ্ত (৭) পুরু (৮) রুষিয়া (৯) চায়না (১০) সিন্ধু (১১) নীলগিরি (১২) চাঁদা (১৩) টিকটিকি (১৪) বালুর ঘাট (১৫) বক।

উত্তরদাতাদের নাম: নির্ভুল—টাটা, টুটু, টিটি, টিটো, টোটা, টৈটু (জামসেদপুর); অমিতাভ গাঙ্গুলী (কলিকাতা-১৪); সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (গয়া); কল্যাণী বসু (নাগপুর); আংশিক—মিহির, সমীর, সলিল, অসীমা (জামসেদপুর); দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-৪); মিণ্টো, টুকা, সুকু, খেঁদু, ভুঁটে (পাটনা); সুস্মিতা বসু (কলিকাতা-২৫); নমিতা, সবিতা, সুচিত্রা, সমীর ও ভাই সোনা দাম (গৌহাটী); হেমেন্দ্রনাথ সেন (বালিগঞ্জ); করালীচরণ হালদার (কালীঘাট); ব্যোমকেশ ও হৃষীকেশ (দোয়ানির হাট); চন্দ্রা সোম (নিউ দিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

জোরকর আর ধীরকর দু'জনেই নাম-করা ক্রিকেট বোলার। এ বছর এ পর্য্যন্ত তারা দু'জনে মিলে সমান সংখ্যক ম্যাচ খেলে মোট ৩০টা উইকেট দখল করেছে আর উইকেট প্রতি গড়পরতা রান্ দিয়েছে দু'জনেই সমান।

একটি খেলা তাদের বাকী ছিল, সেটাও শেষ হ'ল। তাতে জোরকর ২৪ রান্ দিয়ে ৩টে উইকেট আর ধীরকর ২৬ রান্ দিয়ে ২টো উইকেট পেল। কিন্তু তাতেও তাদের গড়পরতা (উইকেট প্রতি ৪ রান্) সমানই রয়ে গেল। তা হলে সারা বছরে শেষ পর্য্যন্ত তাদের কে কত রানে ক'টা উইকেট দখল করল?

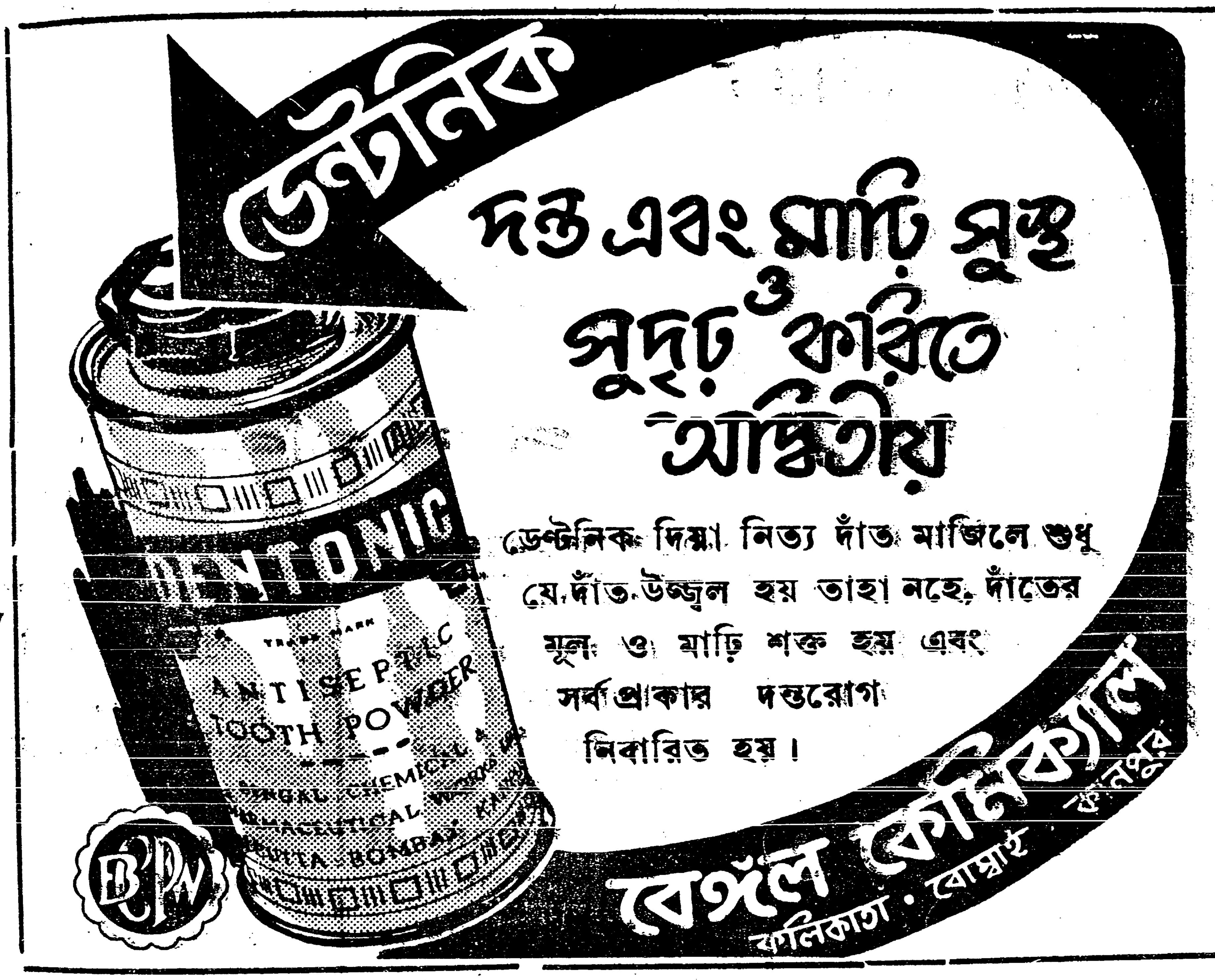

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এবারকার পুরস্কার-প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ব্বাচন করে দিয়েছেন একজন নাম-করা সাহিত্যিক। বিষয়টি যেমন সোজা তেমনি কঠিন,—"গরু" সম্বন্ধে একটি "সরস" রচনা। 'সরস' কথাটির উপর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে এই রচনা লিখতে হবে। আমাদের বিচারে যার লেখা সব চেয়ে ভাল হবে সেই পাবে পুরস্কার। প্রতিযোগিতায় যে কেউ যোগ দিতে পারবে তবে প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচেকার কুপনটি কেটে পূর্ণ করে যুড়ে দিতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। রচনা ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পেঁছান চাই।

কুপন
রামধনু
পুঃ কাত্তিক ৫৯

নাম—

ঠিকানা—

বয়স—

নিজে গ্রাহক কিনা—

এবার পূজায়—

ছেলেমেয়েদের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা বার্ষিকী

পরশ মণি—

(মূল্য চার টাকা)

—এতে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(অপ্রকাশিত রচনা)
যতীন্দ্রমোহন বাগচী
(অপ্রকাশিত রচনা)
হেমেন্দ্রকুমার রায়
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কালিদাস রায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
প্রবোধকুমার সান্যাল
বুদ্ধদেব বসু
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সজনীকান্ত দাস
সুনির্ম্মল বসু
বনফুল
প্রভাবতী দেবী
আরও অনেকে

অন্যান্য বছরের
পূজাবার্ষিকী
ছোটদের চয়নিকা
ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন
ঝলমল
আজব বই
শিশু গল্পিকা
সোনার কাঠী
চিত্রদীপ
মধুমেলা
রূপরেখা
বর্ষমঙ্গল
আলপনা
রাঙ্গারাখী
নবারুণ
অঞ্জলি, উদয়ন,
আবাহন।

প্রত্যেকখানা ৩৲ টাকা

এখনও কিছু
অবশিষ্ট আছে
১৩৫৮ সালের
পূজা বার্ষিকী

অভিষেক

মূল্য চার টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর —২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

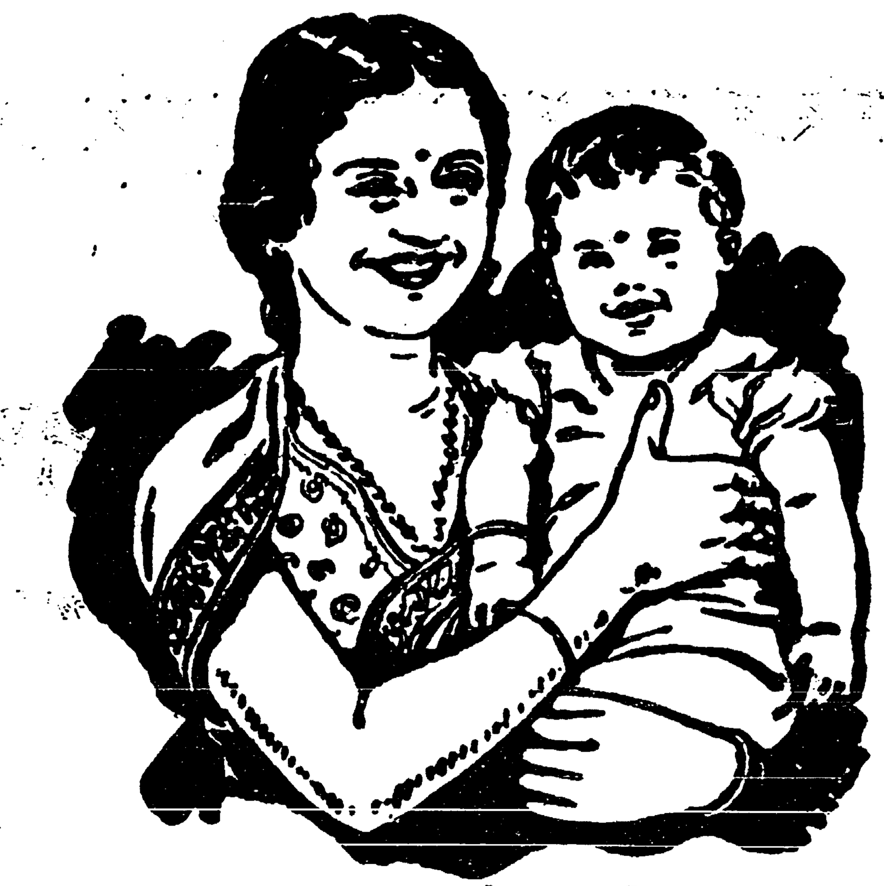

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

সুস্বাদু ও পুষ্টিকর
আর্য্যের
থিন এরারুট ও
স্কুল বিস্কুট

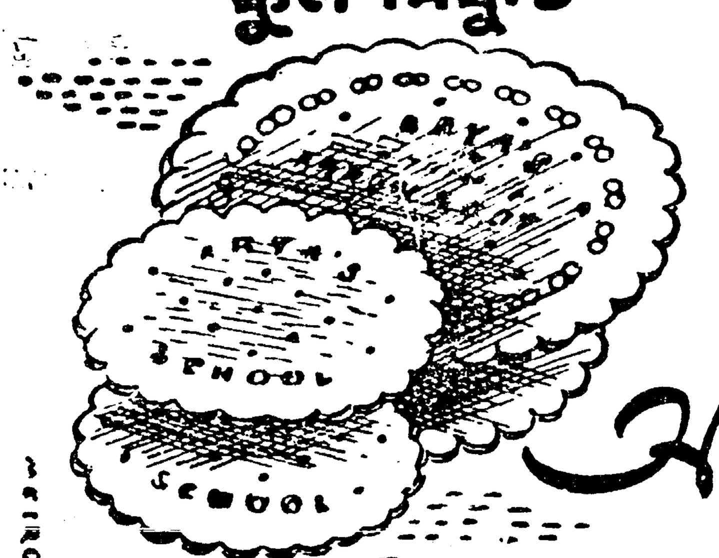

আর্য্য বেকারি
এণ্ড কনফেকসনারী
৪/১, পণ্ডিতিয়া রোড ও ৭/১, রসা রোড; ফোন পি.কে. ৪৩৫৬

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

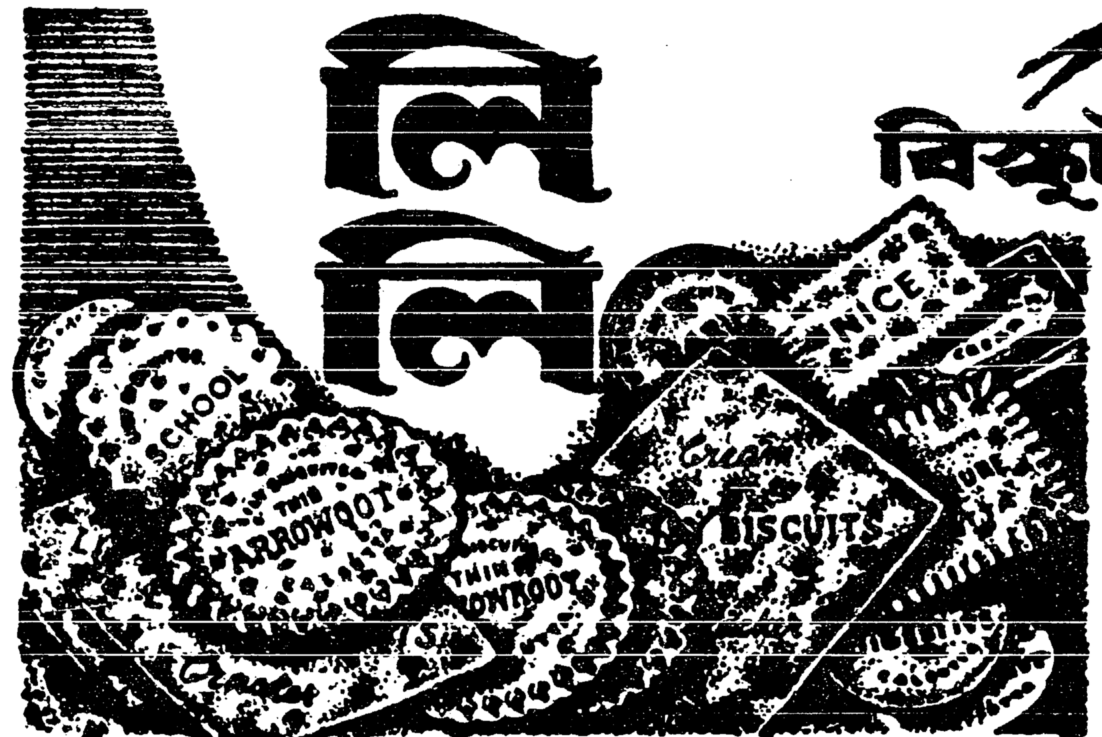

কয়েকটী মনোরম
ও
স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

রজত জয়ন্তী বর্ষ

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই

[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাল এজুকেশন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত]

১।	মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু	...	৪৸৹
*২।	গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১৷৷৹
*৩।	মাঞ্চুসেনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার— „	...	৸৹
*৪।	ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস	...	১।৹
*৫।	„ আইনষ্টাইন— „	...	১।৹
৬।	„ মার্কনি— „	...	১।৹

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

চয়নিকা মাসিক পত্রিকা

নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অবাক হয়ে দেখি

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ | ৮ম সংখ্যা

মিণ্টু রাণীর ডাইরী থেকে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

কি জানি ভাই, আমার ’পরে সবার কেন রোষ,
চলায় ফেরায় প্রতি কাজেই দেখে কেবল দোষ।
মিষ্টি মাসীর আমের আচার মেঝেয় পড়ে রয়,
একটুখানি খামচে নিলে দোষের কিছু হয়?
আর কোথা যায়? মা যুড়ে দেয় বিশ্রী রকম গাল,
— দিনে দিনে বিচ্ছু মেয়ের হচ্ছে এ কি হাল!
কালকে শোন, রাণু দিদির রঙ আর তূলি নিয়ে
আঁকতেছিলাম হুলোর ছবি সত্যি দরদ দিয়ে।
যেই দেখেছে, মুখ বেঁকিয়ে আসলো তেড়ে মেয়ে,
রাখলো কেড়ে—ফোঁটা ফোঁটা জল এল গাল বেয়ে।

ঠিক জানি ভাই, ও সব যদি খোকন তুলে নিত,
খিলখিলিয়ে হেসে ও তায় চুমায় ভরে দিত।
ছোড়দা' ব'লে,—দরজা ঠেলে গিয়েছি যেই কাছে—
—মিণ্টু, এখন গোল ক'রো না, পাশের পড়া আছে।
খোকন এলো, রইলো পড়ে পাশের পড়া যত,
ধেড়ে ছেলেয় কোলে নিয়ে সোহাগ করা কত!
লাল-টুকটুক্ বেলুন নিতি আসছে উহার তরে,
কাচের পুতুল, কাঠের ঘোড়ায় বাক্স আছে ভরে'।
আমি যদি একটা কিছু খুঁজি বাপির কাছে,
অম্‌নি শুনি—একে চন্দর নামতা মনে আছে?
এত্তোটুকু ছেলের কথা সবার মুখে ফেরে,
আমার মনের গোপন ব্যথা কেউ কি বুঝেছে রে?
ডাইরীতে তাই লিখে গেলাম মনের কথা ক'টা,
তেস্‌রা আষাঢ় - বিষ্যুদবার—সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

মৌমাছির কথা

শ্রীদ্বিজেন মল্লিক

এর আগে একবার তোমাদের মধুর চাষ সম্বন্ধে বলেছিলাম। এবারে মৌমাছিদের কাজ সম্বন্ধে একটু আলোচনা ক'রব। তোমরা সকলেই জান যে মৌমাছির বাসাকে মৌচাক বলা হয়। মৌমাছি সমেত এদের বাসা অর্থাৎ মৌচাকের কার্যপ্রণালী যদি তোমরা পর্যবেক্ষণ কর তা হ'লে দেখতে পাবে যে এদের ব্যবস্থা কত সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। দেখতে পাবে যে আধুনিক পদ্ধতিতে গড়া একটি সহরের সব রকম ব্যবস্থাই এদের জানা আছে। যেমন, আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার ব্যবস্থা, পাহারা দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি। গ্রীষ্মকালে এদের চাক ঠাণ্ডা রাখবার পদ্ধতি সত্যিই আশ্চর্য্যজনক। জানি না এদের কাছ থেকেই আমরা "এয়ার কন্‌ডিসণ্ড" প্রথা শিখেছি কিনা।

যাই হোক, এদের এই সুনিপুণ ব্যবস্থার জন্যই চলতি কালের বৈজ্ঞানিকেরা মৌমাছি সমেত এদের বাসগৃহকে "মৌ-কলোনি" নামে আখ্যা দিয়ে থাকেন। সত্যিই এ একটি কলোনি!

এই কলোনিতে যে সব মৌমাছি বাস করে, এবার শোন তাদের গল্প। প্রথমেই বলা যাক রাণীর কথা। প্রত্যেক কলোনিতে মাত্র একটি করে রাণী মৌমাছি থাকে। কদাচিৎ দু'টো রাণীও দেখা যায়। কিন্তু সে-রকম অবস্থায় রাণী মৌমাছিদের মধ্যেই ঝগড়া সুরু হয়ে যায়। কোন মতেই একটি রাণী মৌমাছি আর একটি রাণী মৌমাছির অবস্থান সহ্য করতে পারে না। দু'জনে ঝগড়া করতে করতে শেষে একটি অপরটিকে এত জোরে হুল ফুটিয়ে দেয় যে তার আর সে যাত্রা বাঁচবার কোন উপায়ই থাকে না। অথচ অন্য সময় রাণী কত শান্ত, কোনদিন কাউকে হুল ফোটাবার চেষ্টাও করে না! এই রাণীই প্রকৃতপক্ষে কলোনির প্রায় সমস্ত মৌমাছিদের মা। এর কাজ হ'ল সমস্ত কলোনিটি ঘুরে বেড়ান এবং খোপে খোপে ডিম পাড়া। রাণী মাছি নিজের ইচ্ছামত দু' রকমের ডিম পাড়তে পারে। এক রকমের ডিম থেকে হয় রাণী এবং কর্মী মৌমাছি, আর এক রকমের ডিম থেকে হয় পুরুষ মৌমাছি। প্রত্যেক রাণী মাছিই নিজেদের প্রয়োজন মত দিনে ৭।৮ শ' ডিম দিতে পারে। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের রাণী-মাছিরা দিনে ২।৩ হাজার পর্যন্ত ডিম পেড়ে থাকে। এ-দিক্ থেকে ও দেশের মৌমাছিরা অনেক ভাল হ'লে কি হয়, অপর দিকে ওদের অনেক প্রকার ব্যাধি আছে। আমাদের দেশের মৌমাছিদের কোন প্রকার ব্যাধি নেই বল্লেই চলে। কাজেই এই দিক্ থেকে বিচার করলে আমাদের দেশের মৌমাছিদেরই ভাল বলতে হবে। সাধারণতঃ যখন ভাঁড়ারে খাবারের কোন অভাব থাকে না এবং যখন বাইরে থেকে মধু সংগ্রহ করবার সময়, তখনই রাণী মাছি বেশী করে ডিম দিতে থাকে। পরে খাবার কমে এলে ডিম পাড়াও কমিয়ে দেয়।

রাণী-মাছির জন্মকথা শোন। নতুন রাণীর প্রয়োজন হ'লে কর্মী-মৌমাছিরা চাকের নীচের দিকে একটি লম্বা এবং বড় গোছের খোপ তৈরী করে দেয় এবং সেই খোপে রাণী-মৌমাছি নিজের ইচ্ছায় একটি স্ত্রী-ডিম্ব প্রসব করে। সাধারণতঃ তিন দিনে ঐ ডিম ফুটে একটি বাচ্চার জন্ম হয়। এই অবস্থায় সমস্ত বাচ্চাকেই (অর্থাৎ রাণী, কর্মী কিম্বা পুরুষ মৌমামাছির বাচ্চাকে) দেখতে প্রায় একই রকমের। যাই হোক, রাণীর প্রয়োজন ব'লে কর্মী-মৌমাছিরা এই

বাচ্চাকে প্রায় ৫।৬ দিন ধরে এক রকমের পুষ্টিকর খাদ্য (রাজভোগ বা 'রয়াল জেলী') খাইয়ে থাকে। তারপর খুব সাবধানে খোপের মুখটি বন্ধ করে দেয়। ওদিকে নিজেরই লালা দিয়ে তৈরী এক রকম জালের সৃষ্টি করে শিশু রাণী আরো প্রায় ৭ দিন ঐ খোপের মধ্যে অবস্থান করে। সর্বশুদ্ধ প্রায় ১৫।১৬ দিনের মধ্যে ঐ খোপের মুখ কেটে একটি পূর্ণাঙ্গ রাণী-মৌমাছি বেরিয়ে আসে। প্রথম প্রথম এই রাণী-মৌমাছি তার অসমতল পদক্ষেপে সমস্ত চাকটি ঘুরে বেড়ায়—প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধানে, এবং মাত্র ৫ থেকে ৯ দিনের মধ্যেই পূর্ণ যৌবনত্ব লাভ করে। অন্যান্য মৌমাছিদের তুলনায় রাণী-মৌমাছির পরমায়ু অনেক বেশী—প্রায় তিন বছর।

কর্মী-মৌমাছিরাও স্ত্রী-মাছি, তবে রাণীর মত দেহের গঠন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এদের সম্পূর্ণ নয়, কিছুটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য হবার কারণ হ'ল খাবারের তারতম্য। শিশু অবস্থায় এদের মাত্র ৩ দিন ধরে রাজভোগ দেবার পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে ফুলের রেণু, মধু, জল, ইত্যাদি মিশিয়ে এক রকমের জলীয় খাদ্য দেওয়া হয়। রাণী মৌমাছির মতই এদের খোপও ঢেকে দেওয়া হয়। সর্বশুদ্ধ প্রায় ২১ দিন সময় লাগে এই কর্মী মাছিকে গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে। সত্যিই এরা কর্মী! গুটি কেটে বেরিয়ে আসবার পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরা পরিশ্রম করে যায়। চাক তৈরী করা, বাচ্চাদের দেখাশুনা করা, কলোনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পাহারা দেওয়া, মধু সংগ্রহ করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজই ক'রে থাকে এই কর্মী মৌমাছিরা। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মৌমাছিরা ভিন্ন ভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকে কিন্তু বেশী কাজের চাপ পড়লে মাত্র ২।৩ মাসের মধ্যেই এদের পরমায়ু শেষ হ'য়ে আসে। প্রত্যেক কলোনিতেই কর্মী মৌমাছিরা সংখ্যায় অত্যধিক। জায়গার অবস্থানুসারে এক একটি কলোনিতে ২০ থেকে ৫০ হাজার মৌমাছি বাস করে।

এ ছাড়াও মৌ-কলোনিতে কিছু সংখ্যায় পুরুষ মৌমাছি বাস করে। শিশু অবস্থায় এদের ৪ দিন রাজভোগ খেতে দেওয়া হয়; অর্থাৎ কর্মী মৌমাছিদের চেয়ে এক দিন বেশী। গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে এদের প্রায় ২৪ দিন সময় লাগে। এদের গায়ের রং কালো এবং পাখা দু'টো পিঠ থেকে কিছুটা বেরিয়ে থাকে। আকৃতিতে প্রায় রাণীরই সমান, কখনও কখনও বা রাণী মৌমাছির চেয়ে বড়ও হয়ে যায়। এরা কিন্তু সত্যিই কুঁড়ের বাদশা। কখনও কোন কাজ করবে না, কেবল

বসে বসে প্রচুর মধু ধ্বংস করবে। এরা এত বেশী মধু খায় যে প্রত্যেক পুরুষ মৌমাছিকে মধু যোগাতে প্রায় ৩।৪টি কর্মী মৌমাছিকে মধু সংগ্রহ ব্যপারে লিপ্ত থাকতে হয়। এরা এত বেশী কুঁড়ে যে যদি এদের কলোনির বাইরে বার করে দেওয়া যায় এবং যদি তার কিছু দূরেই যথেষ্ট পরিমাণে আহার থাকে, তা হলেও নিজে কষ্ট করে গিয়ে ঐ খাবার খাবে না, যদিও শেষ পর্যন্ত না খেতে পেয়ে অনাহারে মারা যাবে। শেষের দিকে এরা কলোনির কোন কাজেই লাগে না। তাই কলোনিতে অকাল উপস্থিত হ'লে, অর্থাৎ মধুর ভাণ্ডার কমে এলে কিংবা বাইরে থেকে মধু বেশী না পাওয়া গেলে, কর্মী-মৌমাছিরা এদের আর মিছামিছি বসিয়ে খাওয়াতে চায় না—মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। যদি এরা তখন অন্নে যেতে না চায়, তা হ'লে অনেকে মিলে এদের ডানা কেটে দিয়ে ধাক্কা মেরে কিংবা পিঠের উপরে চড়িয়ে নিয়ে কলোনির বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। সেখান থেকে কলোনিতে ফিরে আসবার এদের আর কোন উপায়ই থাকে না। তাই সে অবস্থায় অনাহারেই এদের প্রাণত্যাগ করতে হয়, নতুবা কোন পোকা-মাকড়ের পেটে গিয়ে ইহলীলা সাঙ্গ করে।

সাধারণতঃ মৌমাছিরা ১॥।২ মাইলের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। এর মধ্যে যে সমস্ত গাছে ফুল ফোটে, সেখান থেকেই এরা ফুলের রস সংগ্রহ করে। প্রত্যেক মৌমাছিই তার নিজ কলোনির রাস্তা চেনে খুব ভাল করেই। একটি কলোনির মৌমাছি অন্য কলোনিতে বড় একটা যায় না। যদি ভুল করে গিয়ে পড়ে তা হ'লে সেখানকার মৌ-সেনারা এদের আস্ত রাখে না—মেরে ফেলে। প্রত্যেক মৌ-কলোনির মৌমাছিদের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে এবং এই গন্ধ দ্বারাই এরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে চিনতে পারে। এই হ'ল মোটামুটি মৌমাছিদের জীবন-কথা।

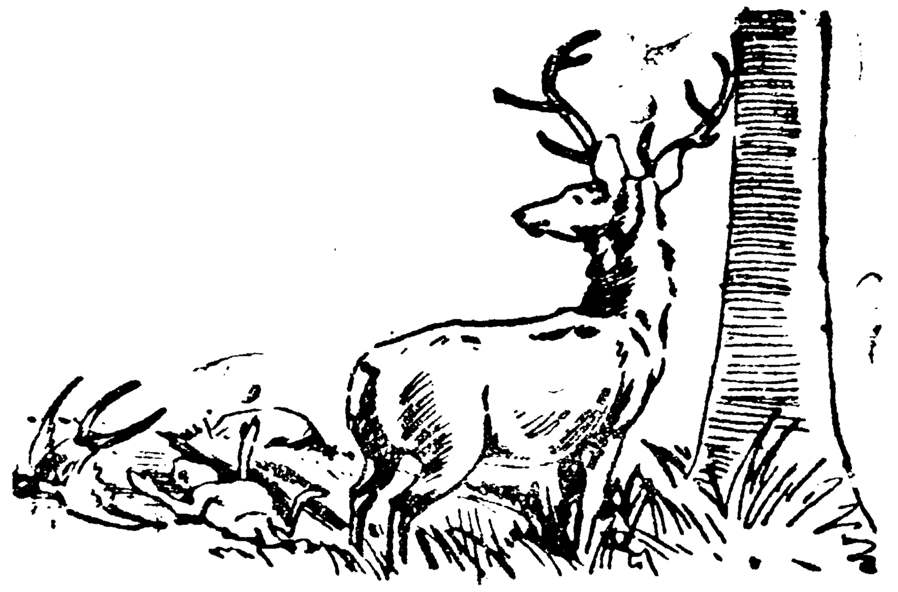

বক-ধার্মিক

শ্রীলীলা মজুমদার এম্.এ,

১

বল্‌তে হ'লে ব্যাপারটার গোড়া থেকেই বল্‌তে হয়। তার আগের দিন পর্য্যন্ত আমাদের সহরের সব্বাই দিব্যি নিশ্চিন্তে ছিল। সেদিন সকালে আমার জগদীশদা'র পিসিমা আল্‌মারির দেরাজ খুলে বিরাট এক সাত নহর বের ক'রে বল্‌লেন, "এটাকে কখনও দেখেছিস্? এর ইতিহাস শুনেছিস্?"

জগদীশদা' ত' একেবারে থ'! গোল গোল চোখ ক'রে বল্‌ল, "ইস্, পিসিমা, এদ্দিন কোথায় রেখেছিলে? পেলে কোথায়?"

পিসিমা কাষ্ঠ হেসে বল্‌লেন—"এত ভালো জিনিষ কি আর এ পাপের জগতে সদুপায়ে পাওয়া যায় ভেবেছিস্? আমার বাবা এটাকে জুয়ো খেলায় জিতেছিলেন।"

জগদীশদা' আরও অবাক্ হয়ে গেল।

"তোমার এত টাকার জিনিষ আছে, তবে তুমি কেন আমি মাইনে পেলেই খালি খালি এটা দাও ওটা দাও কর?"

পিসিমা বল্‌লেন—"আরে, এটাকে কি আর আমার নিজের জন্য রেখেছি রে? তোর বৌ এলে তাকেই দেব মনে করেছি। কিন্তু এটাকে আর বাড়িতে রাখতে সাহস হচ্ছে না, তুই বরং আপিসে টিপিনের ছুটি হ'লে ওটাকে ব্যাঙ্কেই জমা দিয়ে দে।"

তারপর একটুক্‌রো লাল সালু দিয়ে বেশ ক'রে মুড়ে জগদীশদা'র হাতে দিলেন।

"খুব সাবধানে রাখিস্ কিন্তু, এর দাম শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে নয়, কে জানে এর জন্য হয় ত' আমার বাবাকে নরক ভোগ পর্য্যন্ত করতে হচ্ছে। খবরদার, ব্যাঙ্কে তালাচাবি বন্ধ না হওয়া অবধি হাতছাড়া করবি নে।"

জগদীশদা' ওটাকে প্যাণ্টের পকেটে পূরতে পূরতে বল্‌ল—"আচ্ছা, আচ্ছা, কচি খোকা নই ত' আর!"

"না রে জগদীশ, হাসিঠাট্টার কথা নয়। শুনেছি যা'র কাছ থেকে বাবা ওটাকে জিতেছিলেন সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেমন করেই হোক্ নাত্‌নীর বিয়েতে ঐটেকেই যৌতুক দেবে। নাত্‌নীর তখন এক বছর বয়স ছিল। তুই বলিস্ কিরে জগদীশ, এদ্দিনে তা'র বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, ওটাকে আর বাড়ীতে রাখা নয়।"

তারপর দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে জগদীশদা'কে রওনা করিয়ে দিতে দিতে বল্‌লেন—"দেখ্ দেখি

অন্যায়! কি এমন দোষ করেছিলেন বাবা বেচারি? যা'রা জুয়ো খেলে তারা ত' একটু-আধটু জোচ্চুরী ক'রে জিতবেই। তাই ব'লে এমন কথা! লোকটা ত' কম পাজী নয়!"

আপিসে কাজের তাড়া ছিল, তবু তারই মধ্যে থেকে থেকে জগদীশদা' প্যাণ্টের পকেট চাপ্‌ড়ে বার বার দেখেছিল পুঁটুলিটা ঠিকই আছে। অথচ ব্যাঙ্কে গিয়ে যখন পকেট থেকে পুঁটলি বের করল, জগদীশদা'র চক্ষুস্থির। কোথায় গেল সেই লাল সালুর পুঁটলি, এ যে একটা ময়লা গাম্‌ছায় বাঁধা কতগুলো কড়ি! রাম রাম, ছো ছো।

হাঁক-ডাক, থানা-পুলিশ, খানাতল্লাসি হ'ল বই কি! কিন্তু কোনও ভালো ফল হ'ল না। বরং সেইদিন থেকেই যে কাণ্ড সুরু হ'ল সে না দেখ্‌লে বিশ্বাস হয় না। কারো কিছু রাখ্‌বার যো নেই, যার যেখানে যা ভালো জিনিষ আছে সব চুরী যেতে লাগ্‌ল। অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘট্‌তে লাগ্‌ল। বিশেষ ক'রে স্কুল-পাড়ায়, অর্থাৎ কি না যেখানে আমরা থাকি।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই কারো বুঝতে বাকি নেই যে এ সব কাণ্ড কলকাতা সহরে ঘট্‌ছে না। আমাদের সহরটা মফঃস্বলে হ'লেও খুব ছোট নয়; পাহাড়ে জায়গা,—আপিস, আদালত, থানা, ব্যাঙ্ক, ছেলেদের স্কুল, মেয়েদের স্কুল, বড় হাসপাতাল, মায় জেলখানা—সবই আছে। জগদীশদা'র সাতনহর চুরী যাবার কয়েকদিন পরেই আমাদের স্কুলের বড় দিদিমণির সেলাই-কল, গুপেদের হেড মাষ্টার মশাইয়ের আপিস-ঘরের টাইপ্‌রাইটার আর ব্যোমকেশ বাবুর দু'টো দু'টো ছাগল এক রাত্রের মধ্যে উধাও হ'ল। শুধু কি তাই? আমাদের কালেক্টার মিষ্টার গুপ্তর দেয়ালঘড়ি, রেডিও আর বারান্দায় ঝোলান দশ রকমের দামী দামী অর্কিড ফুলের গাছ শুদ্ধ লোপাট! এমন কি সেগুলোকে পাহারা দেবার জন্য যে বিকট বিলিতী কুকুর কিনেছিলেন, যা'র ভয়ে মিসেস্ গুপ্ত পারতপক্ষে বারান্দায় বেরোতেন না, সেটা শুদ্ধ চুরী গেল!

পুলিশে আর কি করবে? শোনা গেল থানার বড় ঘণ্টা আর পাহারাওয়ালাদের চব্বিশটা লোটা শুদ্ধ পাওয়া যাচ্ছে না।

তোমাদের হয় ত' শুনে হাসি পাচ্ছে। আমারও গোড়াতে পেয়েছিল। কিন্তু যখন আমাদের বাড়ি থেকে আমাদের ভালো কাপড়চোপড় শুদ্ধ আমার মার বড় ট্রাঙ্কটা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন মোটেই হাসির কথা হ'ল না।

সবাই সাবধান হয়েছিল বই কি! কিন্তু হ'লে হ'বে কি? চোরেরা আরও সেয়ানা। ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, "আর তা হ'বে নাই বা কেন? বোকা হ'লে ত' তারা সৎপথেই থাকৃত।"

তারপর কত দিন হয়ে গেছে, এখনও আমার ভাবতে অবাক্ লাগে। গুপে বল্‌ছিল যে পিসিমার কাছে রামতাড়া খেয়ে জগদীশদা' তিনজন সাক্ষী ডেকে তামা-তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে চোর সে ধরবেই—সে যেমন করেই হোক। তাই নিয়ে রাত্রে ওরা খুব লুচী, মুর্গী-কারি রেঁধে খাওয়া-দাওয়াও করেছিল; তাই আর এখন কথাটির নড়চড় হ'বার জো নেই।

আমরা, স্কুলের মেয়েরাও, টিফিনের সময় রোজই খুব জট্‌লা করতাম। ইন্দুদিদি দেখ্‌লাম খালি হাতে আর গলায় অঙ্কের ক্লাশে এলেন। আমাদের বল্‌লেন, "ওরে, তোরা সময় থাকতে

সাবধান হ’, নইলে পরে আপশোষ ক’রে কোনও লাভ হবে না।” শুনে ত’ আমরা যে যা’র চুড়ী, বালা, গলার চেন আর কানের ইয়ারিং খুলে ইন্দুদিদির ডেস্কে চাবিবন্ধ করে ফেল্‌লাম। তারপর টিফিনের সময় সবাই গিয়ে ডালিমগাছের নীচে খাবার-টাবার খেলাম, গালগল্প করলাম। ফিরে এসে যখন ডেস্ক খোলা হ’ল, দেখা গেল, ওমা, কি সর্বনাশ, গয়নাগাঁটি হাওয়া !

আমাদের নতুন হেড মিষ্ট্রেস ললিতাদি’ তাই নিয়ে মহা অশান্তি করলেন। ইন্দুদিদি কেঁদেকেটে একাকার। বাড়িতেও বকবকি। থাক্‌, সে সব কথা ভেবে লাভ নেই।

রাত্রে খেতে বসে গুপে বল্‌ল, “আমাদের অপূর্বদা’ বল্‌ছিলেন যে এ সবই কোনও মেয়ে চোরের কাজ। এত নীচ, ছোটলোক, ধূর্ত্ত হওয়া কেবল স্ত্রীলোকেরই সম্ভব।” রাগে আমার গা জ্বলে গেল, কিন্তু আমাকে আর কিছু বল্‌তে হ’ল না, মা, মেজখুড়ি, অরুণা বৌদি বাছাধনকে আচ্ছা ক’রে দু’ কথা শুনিয়ে দিলেন।

ওদের ঐ অপূর্বদা’টি একটি দেখবার মত জিনিষ। ইয়া-লম্বা চওড়া, গা-ময় পাকান পাকান দড়ির মত সব মাস্‌ল্‌, এদিকে ছোট্ট ছোট্ট করে চুল কাটা, ওদিকে এই কান পর্য্যন্ত গোঁফ! আর গুপেটা ত’ অপূর্বদা’র চেলা বল্‌লেই হয়। নেহাৎ গোঁফটা এখনও গজায় নি। মেজখুড়ি বল্‌লেন—“মেয়েদের কাজ না আরো কিছু! ঐ অত বড় ট্রাঙ্ক, রেডিও সরানো কোনও মেয়েমানুষের কর্ম নয়, ও সব সরাতে ষণ্ডামার্কা পুরুষ মানুষের দরকার।” অরুণা বৌদি বললেন, “গোঁফ থাকুলে ত’ কথাই নেই।”

গুপে রেগে চটে পাতে দু’খানা হাতের রুটি ফেলেই উঠে গেল। বড়দা’ একটু হেসে বল্‌লেন, “ও রকম বল্‌তে হয় না। গুপেরা তা’ হ’লে তোমার নামে মানহানি কেস আন্‌বে।”

যাই হোক্‌, চারদিকে কত রকম জল্পনা-কল্পনা যে চল্‌তে লাগ্‌ল তার ঠিক নেই। শেষ পর্য্যন্ত এমন হ’ল যে সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে লাগ্‌ল। একদিন ডাক্তার বাবুর গাড়ি থামিয়ে নতুন ইন্সপেক্টর বাবু ওঁর ব্যাগ পর্য্যন্ত সার্চ করেছিলেন। ডাক্তার বাবু ব্যাগ গোছাতে গোছাতে খালি বলেছিলেন, “আচ্ছা, দেখা যাবে।” তাই নাকি ওরা সন্দেহজনক লোকদের নামের সঙ্গে খাতায় ডাক্তার বাবুর নামও লিখে রেখেছিল। যাই হোক্‌, এইভাবে বেশ দু’-তিন মাস কেটে গেল, একটা জিনিষ বা একটা লোকও ধরা পড়ল না।

(ক্রমশঃ)

অছিপুরের বাগানে

শ্রীসুমিত্রা চক্রবর্ত্তী

রামধনুর ছোট্ট ভাইবোনেরা,

আমিও তোমাদের একটি ছোট্ট বোন এবং রামধনুর গ্রাহিকা। তোমাদের মত আমিও রামধনু পড়তে খুব ভালবাসি। ভাদ্র মাসের রামধনুতে ৺নিবারণ বাবুর লেখা “আমার বন্ধু মন্মথকুমার” নামে লেখাটি তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। এই মন্মথকুমার হচ্ছেন আমার দাদু—দাদামশাই। কাজেই লেখাটি আমার কত ভাল লেগেছিল বুঝতেই পারছ। ঐ প্রবন্ধে দাদুর কথাই আছে, তাঁর বাগান সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু লেখা হয় নি। তাই তোমাদের সেই বাগানের গল্প একটু বলব।

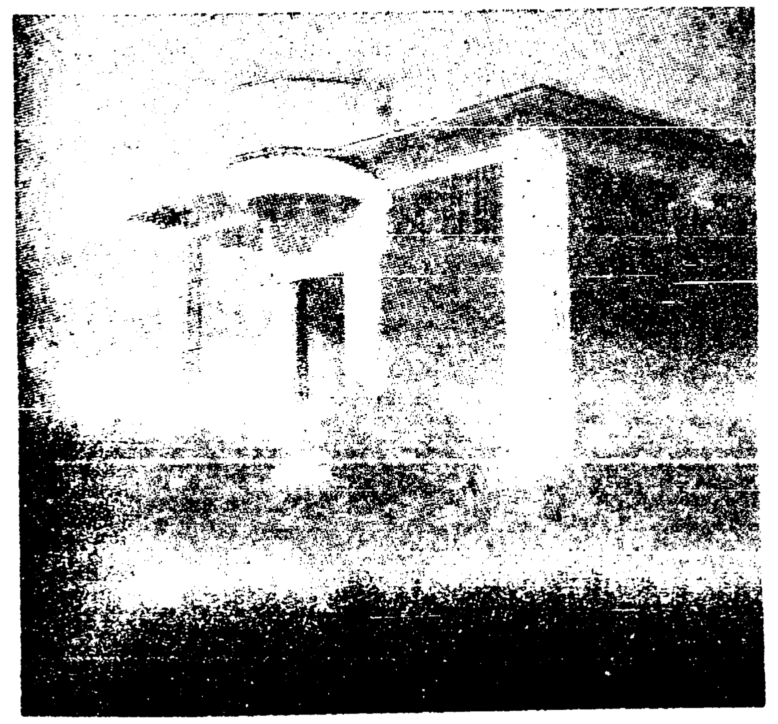

অছিপুরের বাগানে শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায়ের বাড়ী

অছিপুর হচ্ছে একেবারে গঙ্গার ধারে—কলকাতা থেকে আঠারো মাইল। এখানে দাদু একটি আদর্শ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তিনি নিজেও এখন সেখানেই বাস করেন। আমরাও ছুটি-ছাঁটা পেলে মাঝে মাঝে সেখানে চলে যাই আর ২।৩ দিন ক’রে কাটিয়ে আসি। সে যে কি মজা তা তোমরা, যারা সহরে থাক, তারা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারবে না।

অছিপুরের বাগানে ধান, গম, ভুট্টা, মুগ, মসুর, অরহর, কলাই, ছোলা, মটর—এক কথায় যত রকম ফসল আছে প্রায় সবেরই চাষ হয়। তা ছাড়া আজকাল পাট আর তামাকের চাষও চলছে। যত রকম তরিতরকারী সম্ভব—আলু থেকে আরম্ভ করে কপি, টম্যাটো, গাজর, বীট, লাউ, কুমড়ো, বেগুন—সব রকম তরকারী, শাকপাতা, ডাঁটা সবই এখানে লাগানো হয়, আর তার এক-একটার চেহারা যদি দেখতে! শুধু কি তাই? আম-জাম-কাঁঠাল থেকে সুরু করে দেশী-বিলেতী

TIGHT BINDING

প্রায় কোন রকম ফলই লাগাতে কসুর করেন নি দাছু,—মায় আঙ্গুর, আলুবখরা, পীচ, কমলা লেবু পর্য্যন্ত !

তোমরা বাজার থেকে ফল কিনে এনে কেটেকুটে ডিসে সাজিয়ে নিয়ে খাও ; অছিপুর গেলে কিন্তু আমরা কক্ষণো তা করি না—একেবারে বাগানে গিয়ে চড়াও হই, আর গাছ থেকে লুটপাট করে ফল নিয়ে খেতে সুরু করি। এতে মজা যে কত বেশী তা যারা খায় তারাই বোঝে।

দাছুর বাগানে বেশ চমৎকার একটা পুকুর আছে—মাছে ভর্ত্তি। ছিপ

ধানক্ষেতে ধান রোপন করা হচ্ছে।

বাগানের মোটর-লঞ্চ

ফেলে সেখানে বসে মাছ ধরতেও ভারী মজা লাগে। তা ছাড়া ধানের ক্ষেতের জলেও অনেক বড় বড় ভেটকি মাছ আছে। ঐ ক্ষেতের মাঝখানে আছে একটা চৌবাচ্চা। ক্ষেতের জল যখন শুকিয়ে যাবে তখন সব মাছ ঐ চৌবাচ্চার জলে গিয়ে হাজির হবে। তখন সে মাছ নিয়ে পুকুরে ছাড়ব।

শীগ্‌গিরই শীত আসছে। এইবার বাগানের খেজুর রস-থেকে গুড় আর সেই গুড়ের পাটালি হবে। বড় মাসীমা, যিনি আসামে থাকেন, হয়তো এই পাটালির জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। এই পাটালি তাঁর ভারী প্রিয়। পাটালি হলেই আমরা তা আসামে পাঠিয়ে দেব।

এখানকার ফুলবাগানের কথা বলা হয় নি। সে বাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঐ ফুলেরই লোভে আমরা এখানে এসে সরস্বতী পূজা করি।

সরস্বতী পূজার সময় শুধু ফুল নয়, কুল গাছ থেকে কুলও পাড়ি আর কুল পাড়তে গিয়ে প্রায়ই চোখে পড়ে গাছের গায়ে গুটিপোকার গুটি--যা থেকে রেশম তৈরী হয়। একদিন আমরা কতকগুলো গুটি নিয়ে কাচের আলমারীতে রেখে দিয়েছিলাম ; কয়েকদিন পরে দেখলাম গুটিগুলো কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে এসেছে, কাচের আলমারী বন্ধ থাকায় পালিয়ে যেতে পারে নি। আমাদের ইচ্ছা ছিল, এবার গুটিপোকার চাষ করব ; কিন্তু পরদিন উঠে দেখি কতকগুলো পিঁপড়ে এসে প্রজাপতিগুলোকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। যা দুঃখ হয়েছিল সেদিন !

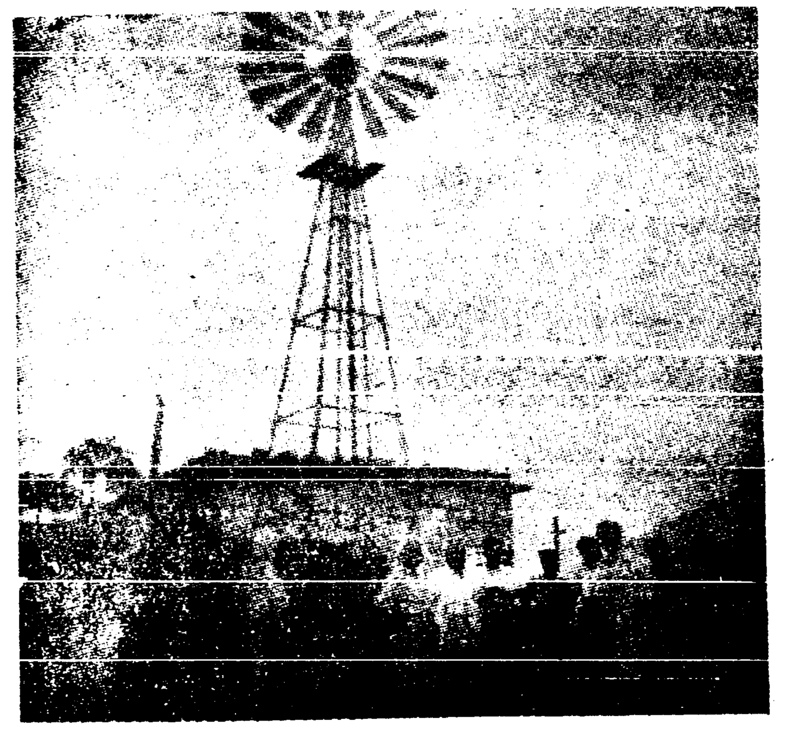

উইণ্ড মিল্

এখানে ধানের জন্য নানা রকম পাখী এসে জড় হয়। তাদের মধ্যে বাবুই একটি। এই বাবুই পাখী ঠোঁট দিয়ে কি সুন্দর বাসা বানায় দেখলে অবাক্ বনে যেতে হয়। এখানে ও রকম বাসা হামেশাই দেখা যায়। এখানে একটা চড়াই পাখী আছে—দাছুর সঙ্গে তার ভারী ভাব। সে রোজ দাছুর টেবিলে বসে তূলো চাইত, আর দাছুও তাকে রোজ একটু করে তূলো দিতেন। তার পর দেখি, ওমা, সেই তূলো দিয়ে সে কি চমৎকার বাসা বেঁধেছে !

এখানকার জঙ্গলে অনেক বুনো খরগোস ছুটোছুটি করে। একদিন আমরা তাদের ছু'টোকে ধরেছিলাম। পোষা জন্তুদের মধ্যে গোটা কয়েক বিড়াল আর কুকুর আছে। কুকুরগুলো বাড়ী পাহারার কাজে খুব ওস্তাদ্।

আগেই বলেছি, অছিপুরের এই বাগান একেবারে বড় গঙ্গার ধারে। কলকাতা বন্দর থেকে সমুদ্রে যেতে হ'লে এই পথেই যেতে হয়। কাজেই দেশ-বিদেশের কত বড় বড় জাহাজ এই বাগানের সামনে দিয়েই যাতায়াত করে ;—দেখতে ভারী ভাল লাগে। দাছুর নিজেরও একটা মোটর-লঞ্চ আছে; আর আছে ট্র্যাক্টর বা কলের লাঙ্গল—খুব তাড়াতাড়ি তা দিয়ে জমি চাষ করা যায়।

TIGHT BINDING

জল তুলবার জন্য একটা উইণ্ড মিল্‌ও আছে। বাংলায় একে 'বায়ুচালিত কল' বলতে পার। তার একটা ছবি এখানে দিলাম।

ছুটীর দিনে এখানে একদিন বেড়িয়ে যাবার জন্য তোমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করছি।

ভৌতিক সিন্দুক

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

২

ডাক্তার ওয়্যারলেস্ অপারেটারের মৃতদেহ পরীক্ষা করে বললেন, "একটু আগেই মৃত্যু হয়েছে। কোন লম্বা ও তীক্ষ্ণ ছোরা দিয়ে জোরে আঘাত করা হয়েছে। আর···"

"আর কি ?" ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করল মৃণাল।

"আর ছোরার সঙ্গে কোন সংঘাতিক বিষ মাখানো ছিল।"

"কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু কে এ কাজ করলে ?" ক্যাপ্টেন বললেন।

মৃণাল মৃদুকণ্ঠে বলল, "একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি। এই মৃতদেহ ও সেই 'ডী জিভাস্ক' জাহাজের খালাসীর মৃতদেহের পড়ে থাকার ধরণ অবিকল এক। আঘাতও ঠিক একই রকম। এতে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই দুই ব্যাপারের খুনী একই লোক।"

"আমারও তাই মনে হয়," মৃদুস্বরে বললাম। "শুধু তাই নয়, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে অত জোরে অব্যর্থ আঘাত করা সম্ভবপর নয়।"

তারপর শুরু হ'ল হত্যাকারীর খোঁজ। কিন্তু সমস্ত জাহাজ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাউকে পাওয়া গেল না। সকলে যখন হতাশ হয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে গিয়ে বসল তখন রাতও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ হাত দু'টো মুষ্টিবদ্ধ করে ঘরের মধ্যে পায়চারী করলেন। তারপর সহসা সকলের দিকে ফিরে বললেন, "আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, খুনী ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। খুন করে সে আবার গা ঢাকা দিয়েছে।"

"কিন্তু এ খুনের উদ্দেশ্য কি ? আর ওয়ারলেস অপারেটারই বা ওখানে গিয়েছিল কেন ?" প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

"খুনের উদ্দেশ্য জানা আপাততঃ সম্ভবপর নয়। তবে নিহত ব্যক্তির ওখানে যাওয়ার কারণ স্পষ্ট," ধীরে ধীরে মৃণাল বলল, "সে সিন্দুক থেকে চুরি করতে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ বাবু, উনি টাকার লোভেই ওখানে গিয়েছিলেন।" বল্‌ল বড় মিস্ত্রী।—"কিন্তু খুন করলো কে ?"

পরদিন রাত্রে···

গভীর রাত্রে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত কত হয়েছে ঠিক নেই। সহসা অস্পষ্ট একটা খট্ খট্ শব্দ শুনতে পেলাম।

তাড়াতাড়ি ছুটে ডাক্তারের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু আশ্চর্য্য! দরজাটা খোলা, হা-হা করছে। বিছানা খালি। কেউ নেই সেখানে।

আর সময় নষ্ট না করে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজায় এসে টোকা দিলাম। ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার, তুষার ?"

কিন্তু আমাকে আর জবাব দিতে হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির স্তব্ধ বুকখানাকে কাঁপিয়ে গুদাম ঘরের দিক্ থেকে একটা আর্ত্ত চীৎকার ভেসে এল—"আ—আ—আ—আ—আঃ!"

পরক্ষণেই দু'জনে ছুটে এলাম গুদাম ঘরের কাছে। অন্ধকার ঘরে আরও একটা টর্চের আলো দেখতে পেলাম। সেই আলোতে দেখলাম মেঝেতে কে একজন চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। আর কে একজন যেন শায়িত ব্যক্তির মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে।

কিন্তু চিনতে দেরী হ'ল না। সিন্দুকটার সামনে চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে ছোট মিস্ত্রীর মৃতদেহ। পড়ে থাকার ধরণ ঠিক আগের মৃতদেহ দু'টির মত। কপালে ঠিক তেমনি গভীর ক্ষত। হাতে একটা হাতুড়ি। আর, জাহাজের ডাক্তার তার ওপর ঝুঁকে রয়েছেন।

ক্যাপ্টেন ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, "তুমি এখানে কি করে এলে, ডাক্তার ?"

ডাক্তারের উত্তেজনা তখনও কমে নি! একটু দম নিয়ে তিনি বললেন, "গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় একটা খট্ খট্ শব্দে। উঠে টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদূর আসতেই মনে হ'ল আওয়াজটা আসছে গুদাম ঘর থেকে। ছুটে এলাম এখানে অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখলাম, কে যেন সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে; সিন্দুকটা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। হঠাৎ হাতুড়ির খট্ খট্ শব্দ ছাপিয়ে একটা কেমন ধুপ্ ধুপ্ শব্দ জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু ধুপ্ ধুপ্ শব্দ বন্ধ হ'ল না। আমার মনে হ'ল যেন একটা মত্ত হাতী সারা গুদাম ঘরে ছুটে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই আমি কিসের একটা ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ আমার কানে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ জেলে দেখছিলাম—তারপরই আপনারা এসে গেলেন।"

ইতিমধ্যে এক এক করে জাহাজের সকলেই এসে জমা হয়েছে। সকলেই ভীত উৎসুকভাবে নানা প্রশ্ন একে ওকে জিজ্ঞাসা করছে। খুনী কি এখনও ঘরের মধ্যে আছে? না থাকে তো কোথায় গেল!

সাহসী বলে বড় মিস্ত্রীর সুনাম ছিল। সে হঠাৎ ব'লে উঠল, "আপনারা সবাই বাইরে খুঁজুন। আমি এ ঘরটা একবার ভাল করে দেখে নি।"

খানিকটা ইতস্ততঃ করে সবাই বেরিয়ে এলাম। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। একটু পরেই আবার শুনতে পেলাম সেই ধুপ্ ধুপ্ আওয়াজ, আর পরমুহূর্ত্তেই একটা মৃত্যু-কাতর আর্ত্তনাদ—"আ—আ—আ—আ - আঃ!"

সবাই ছুটে এলাম।—বড় মিস্ত্রীও তেমনি রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে, কপালে ক্ষত, দেহ প্রাণহীন।

আবার তন্ন তন্ন করে ঘর খোঁজা হ'ল;—একা নয়, সবাই মিলে, হাতে পিস্তল উঁচিয়ে রেখে। কিন্তু না, কোথাও কেউ নেই। কোথায় গেল খুনী!

"আমার মনে হয় খুনী ঐ সিন্দুকের মধ্যেই লুকিয়ে আছে", পেণ্টার বলল।

তা কি করে সম্ভব? সিন্দুকের মধ্যে যদি কেউ থাকে তা হলে সে নিঃশ্বাস নেয় কি করে? খায় কোথায়? তা ছাড়া সে নিশ্চয়ই ডী, জেভাস্ক-এর ভেঙ্গে যাওয়ার খবর শুনেছিল। তবে সে বার হয়ে পালাবার চেষ্টা করল না কেন? আমরা যদি সিন্দুকটিকে উদ্ধার না করতাম তা হলে বেচারীর সলিলসমাধি হ'ত যে! আর সেই অমানুষিক শব্দই বা আসবে কোত্থেকে? (ক্রমশঃ)

যাঁদের লেখা তোমরা পড়

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৩

যোগেন বাবুর সঙ্গে বইয়ের দোকানে আলাপ হ'ল কিন্তু সে আলাপ যে কোনদিন ঘনিষ্ঠ এবং তারপর থেকে তর-তম পর্য্যায়ে পৌঁছবে, তাঁকে "দাদা" সম্বোধন করবো এ ধারণার উদয় সেদিন তো মনে হ'লই না, বরং তারপর থেকে এমন দু'-একটি ঘটনা ঘটলো যা থেকে মনে হ'ল আমাদের উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের উপায়ও নেই, প্রয়োজনও নেই। তখন বয়স ছিল অল্প, কাজেই এ সত্যটি চোখে ধরা পড়লো না যে মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্কই বাঞ্ছনীয়। তার ওপর আমরা উভয়েই জীবনে একই পথ বেছে নিয়ে দুঃখ-কষ্ট মাথায় করে এগিয়ে চলেচি।

তাঁকে তখন কেবল জানতাম ইতিহাস-প্রণেতা ও সাহিত্যিক রূপে। কিন্তু আমারই মতো তাঁরও জীবন যে বিচিত্র-পথে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, এ কথা

জেনেচি অনেক পরে। অনেক পরেই দেখেচি, তিনি কর্মী ও নির্ভীক্, জীবনে অনেক আঘাত সয়ে এমন একটি শক্তি ও তেজ তাঁর মধ্যে সঞ্চিত হয়েচে যার ফলে সময়ে সময়ে মনে হয়েচে, এখনও হয়,—তিনি কিছু দাম্ভিক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দম্ভ তাঁর মধ্যে নেই, আছে একটা বেপরোয়া ভাব। চাকরি-বাকরি করেন না, যতটা জানি অর্থসঞ্চয়ও করেন নি; বয়সও সত্তরের কোঠায়। যেমন পথ চলায় একখানি যষ্টি সম্বল, তেমনি সংস্কৃতি ও উপার্জনের ক্ষেত্রেও লেখনী ভরসা। পাঠক-পাঠিকাগণের ধারণাতেই আসবে না, এ জীবন কী কঠোর! কী বিপদসংকুল! বিশেষ করে আজকের দিনে। দেশ বিভক্ত। সমাজ বিভিন্ন। সংস্কৃতির পথ অবরুদ্ধ। এখানে-সেখানে যেটুকু আলোকগীতির স্ফুরণ হয়, তা আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী। যাক সে কথা।

দিন যায়। তাঁর রচনা পড়ি, তিনি আমার রচনা পড়েন কি না জানি না। বয়স্কদের একখানি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাতে তাঁর রচনার কিঞ্চিৎ বিরূপ সমালোচনাও একবার করলাম। কিন্তু তাতে তাঁর কাছ থেকে কোন অনুযোগই শুনলাম না, শুনলাম তাঁরই অন্যতম প্রিয়জনের মুখে। তবে সেটা অনুযোগ নয়, অপ্রীতিকর ও আচম্বিত আক্রমণ। ফলে অবাঞ্ছনীয় বাক্‌যুদ্ধ ও মন্তব্য। সেও ঐ যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল সেখানেই।

পথে, ট্রামে, বাসে, সভায় দেখি, সাদা পাঞ্জাবী গায়ে, কালো নিউকাট জুতো পায়ে, যষ্টি হস্তে এক দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ পুরুষ। তাঁর চাল-চলন ও চলার মধ্যে রয়েচে বৈশিষ্ট্য। সেই জন্যই জানতে ইচ্ছা হয় লোকটি কে। কিন্তু আমি তো জানতামই কে তিনি। কাজেই লক্ষ্য করতাম!

একদিন দেখলাম, এস্‌প্লানেডে একখানি চলতি ট্রামকে থামাবার জন্যে যে ভাবে হাতের যষ্টিখানি সঞ্চালন করে চালককে ইঙ্গিত, অনুরোধ বা আদেশ করচেন তাতে যে কেউ তা উপেক্ষা করতে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। কাজেই ট্রামখানি না থেমেই সামনে দিয়ে চলে গেল। সামান্য ঘটনা। কিন্তু তাতেই প্রকাশ পেল মানুষটির মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে। আর আছে বলেই তো বাংলার শিশুসাহিত্যে "শিশুভারতীর" আবির্ভাব।

১৯৪২ সালে সারা ভারতের ওপর নেমে এসেছিল এক অন্ধকার রাত্রি। সারা দুনিয়ায় বইছিল যুদ্ধের ঝড়, বয়ে চলেছিল মানুষের রক্তস্রোত, আমাদের শস্যশালিনী বঙ্গজননীর লক্ষ লক্ষ সন্তান শূন্যপানে বৃথাই কাতর হাত তুলে একমুষ্টি অন্নের জন্যে হাহাকার করতে করতে প্রাণত্যাগ করছিল। তারই মধ্যে

এই শহরের এক প্রান্তে জন্ম নিল "শিশুসাহিত্য-পরিষদ্"। এর গোড়ার কথা রামধনুতেই বছর কতক আগে "যা ছিল সবার মনে" নাম দিয়ে লিখি। সেই প্রবন্ধটির পাঠক-পাঠিকাগণ এখন নিশ্চয়ই তরুণ বয়সে উপনীত। সুবাই জানে, পরিষদের জন্মক্ষণে আমাদের "যোগেন দা'ই" ছিলেন মাঙ্গলিক উচ্চারণের প্রধান ও প্রথম পুরোহিত। তাঁর উৎসাহ, কর্মশক্তি ও শ্রম আমাদেরও অন্তরে অনুপ্রেরণা দান ক'রে তাঁরই সঙ্গে অর্থ সংগ্রহের জন্য নানা জায়গায় ঘুরিয়েচে। যেখানেই গেচি সেখানেই দেখেচি, তাঁর প্রতি গৃহস্বামীর আদর আপ্যায়ন। আবার সেই সঙ্গে কানে কানে সাবধান বাণীও বলেচে অনেকে। কিন্তু মানুষ যে মানুষকে অনেক সময়েই ভুল বুঝে তার সম্বন্ধে সর্ব বিষয়ে একটি বিরূপ বা অনুকূল ধারণা গড়ে তোলে এর প্রমাণ আবার পেলাম। আমাদের মধ্যে যদি পরিষদের জন্য কারো বাস্তবিক দরদ থাকে তো তাঁরই।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পাকিস্তানের, বিক্রমপুর পরগণার লোক তিনি। দেশে জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ী ছিল। কিন্তু তা এখন পঞ্চভৌতিক ভোগদখলে। আর, তাঁর জীবনও কতকটা যাযাবরের মতো—ভারতের নগরে নগরে, পার্বত্য প্রদেশে, গ্রামে, অরণ্যে ঘুরে ঘুরে কাটে এবং এ জীবন ভালও বাসেন। এর ফলে জীবনে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেচেন, গল্পের যে ঝোলাটি গড়ে তুলেচেন, যে রসগ্রহণ করেচেন তা অনেকেরই নেই এবং অনেকেই তা লাভ করতে পারলে নিজেকে সম্পদ্‌শালী ও সৌভাগ্যবান্ মনে করবে।

যখনকার কথা বলচি তখন পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের দিন সুখে ও নিরাপদে

কাটছিল না—এখনকার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই।—একদিন শুনলাম যোগেন দা' দেশে গেচেন, কালীপুজো করতে। জানি না, মা কালীই তাঁকে আদেশ করেছিলেন, কি তাঁর স্বাভাবিক বেপরোয়া ভাবই তাঁকে এ কর্মে প্রবৃত্ত করেছিল। মোট কথা, খুবই আমোদ পেয়েছিলাম তখন। তিনি পূজো করে অক্ষত শরীরেই ফিরে আসেন।

আবার, বৎসর দুই আগে কুলটিতে গিয়েছিলেন, এক সাহিত্যসভায় পৌরোহিত্য করতে। এসে গল্প বললেন, যার সার কথা হ'ল, চলন্ত রেলের কামরায় এক চোর ঢুকে তাঁর মনি-ব্যাগটি চুরি করে পালাচ্ছিল, সেই সময়ে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোর পালাবার আগেই তাকে চেপে ধরেন এবং সে বলপ্রয়োগ করতেই দাদা এক ঘুষিতে তাকে মেঝেশায়ী করে তার বুকের ওপর চেপে বসেন। তবে রক্তপানের আগেই দুঃশাসন কাতর ভাবে মুক্তি ভিক্ষা করে ও তাঁকে টাকাশুদ্ধ ব্যাগটি ফেরৎ দেয়।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত (যৌবনে)

শুনেচি, যৌবনে মল্লযুদ্ধ করতেন। তাই এক সময়ে এক সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌যুদ্ধ হয় এবং তা ক্রমে মুষ্টিযুদ্ধে এসে গায়ে মুষ্টি পড়বার আগেই সাহেবের মুষ্টি ধরা পড়ে দাদার "মুঠোয়"। পুরাতন দিনের ভুলে-যাওয়া ঘটনা, সামান্য বিবরণ দিলাম : কিন্তু সেই মানুষটি আজও জীবিত। বয়োধর্মে মাথার একগাছি

কেশও সাদা হয় নি, চলা-ফেরায় ঈষৎ জড়তাও নেই, আহারে সামান্য অরুচিও দেখা যায় না ; কণ্ঠস্বর স্থূল-গম্ভীর ও উচ্চ এবং এখনও লিখে চলেচেন।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। বয়সে দু'জনে সমান কিংবা কার্তিক বাবু তাঁর চেয়ে ছোটই। কিন্তু তিনি হয়ে পড়েচেন পঙ্গুপ্রায়, কর্ম থেকে বৎসর কতক অবসর নিয়ে সম্পূর্ণ গৃহবাসী। এক সময়ে তাঁর রচনাবলী বাংলার শিশুদের প্রচুর আনন্দরস দানে পরিতৃপ্ত করতো। বিখ্যাত প্রবাসী পত্রিকাই প্রথম বয়স্কদের পত্রিকা যাতে 'ছোটদের পাতাতাড়ি' নামে ছেলেমেয়েদের একটি বিভাগ ছিল। কার্তিক বাবু এই বিভাগে নানা রচনায় নিজ কবি-প্রাণকে উন্মুক্ত করতেন।

তাঁর সঙ্গেও প্রথম আলাপ হয়, একটি বইয়ের দোকানে। কিন্তু যে কর্ম তিনি করতেন সেই কর্মেরই পদমর্য্যাদা-বশেই, অন্ততঃ আমাদের কাছে, ছিলেন গম্ভীর, স্বল্পভাষী ও হাস্যরস-পরিবেশনকুণ্ঠ। অবশ্য তিনি মানুষটিও খর্বকায়, নিরীহ। এমন একটি দিনের সুযোগও পাই নি যে তাঁর সঙ্গে মন খুলে আলাপ করি। তাঁর কাছ থেকে শুষ্ক নমস্কার, ততোধিক শুষ্ক হাসি, শীতল দৃষ্টি এইটুকুই সংগ্রহ করে রেখেচি। পাঠক-পাঠিকাগণকে তা দিতে মন চায় না অথচ তার বেশী আর কিছু দিতেও পারলাম না। আবার এমন সময়ও হয় না, এবং আমার প্রকৃতিও এমন নয় যে ওপর-পড়া হয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি।

তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু না দিতে পারলেও পণ্ডিত শ্রীরাজকুমার চক্রবর্তীর কথা অনেক করেই বলতে পারি এবং মনেও থাকবে আমরণ। এখন তাঁর বয়স আশীর কোঠার উপর দিকে, তবুও তাঁর মনে "হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি"। দেহের বর্ণ গৌর, মুখের সবটুকু হাসি, চোখ দু'টির সবটুকু হাস্যরসে উচ্ছল, বাক্যের সবটুকু গল্পের ঝরণার মতো শীতল, সুমিষ্ট ও অফুরন্ত। তবে বয়োধর্মে সব ম্লান হয়ে এসেচে কিন্তু শুকিয়ে পীড়াদায়ক হয় নি, বরং বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে।

এক সময়ে "শিশুসাথী" সম্পাদনা করতেন। আলাপও সেইখানে এবং আমি নতুন লেখক বলে আমার প্রথম রচনাটি অমনোনীত করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর প্রতি অনুযোগের অন্ত ছিল না আমার মনে। কিন্তু সেই রচনাটিই একখানি বিখ্যাত পূজাবার্ষিকের জন্য সাদরে গৃহীত ও তাতে মুদ্রিত হয়। ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ এমন জমে ওঠে, তাঁর মুখের কথা শুনতে এমন একটা আকর্ষণ জাগে যে, তিনি বহুদিন এই শহর ত্যাগ করে প্রবাসী জীবন যাপন করলেও তাঁকে ভুলতে পারি না। তিনিও কদাচিৎ এখানে এলেই আমাদের খোঁজ

করেন এবং দেখা করতে অনুরোধ জানান। দেখা হ'লে, গল্পের ঝরণাতলায় বসিয়ে দুঃখবেদনাক্লিষ্ট চিত্তকে শীতল ও সরস করে তোলেন, হাসির ঢেউয়ে নাচিয়ে জীবনের দিনগুলিকে বেশ একটা নাড়া দিয়ে তাদের গা থেকে দুঃখস্মৃতিকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করেন।

বই লিখেচেন অনেক কিন্তু অর্থসঞ্চয় করেন নি কিছুই এবং তার উপায়ও ছিল না। পাকিস্তানের অধিবাসী। কিন্তু এখন সে বাসভূমিও পরিত্যক্ত। কারণ যে স্থানকে এক সময়ে সুখের ও নিরাপদ মনে হ'ত আজ তা মনে হয় বিপদ্‌ভরা ও দুঃখময়। সেখানে বহুদিনের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে, কিন্তু সে মাধুর্য নেই।

পণ্ডিত মশাইয়ের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, কথা বলার ভঙ্গী তাঁর নিজস্ব এবং সমালোচনার রীতিও অনুকরণীয়। ঈষৎ নীল চশমা জোড়ার মধ্য দিয়ে রসোচ্ছল সুকোমল চোখ দু'টি শ্রোতার মুখে নিবদ্ধ। সুগৌর ললাট, মাথার শুভ্র কেশ, চশমার সোনালি ফ্রেম সব হাসির উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বল। এক বিখ্যাত বিদেশী লেখকের রচনার এক জায়গায় পাঠ করেছিলাম, "যার অন্তরে গভীর বেদনা সেই হাসিতে ফেটে পড়ে ও হাসায়।" কথাটি কখনও মনে হয় সত্য, কখন মনে হয় মূলে কোন সত্য নেই। কিন্তু গুপ্ত কবির "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা" এই বাক্যে ও পরিচিত অনেকের জীবনে সে সত্যের সন্ধান যে পাই না তা নয়। তাই সময় সময় মনে হয়েচে পণ্ডিত মশাইয়ের অন্তঃস্থল কি দুঃখবেদনার হাহাকারে পরিপূর্ণ? তাকে ঢাকতেই কি এত হাসির উচ্ছ্বাস?

মহাকালের পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

— নয় —

রাজগৃহের রাজপ্রাসাদ।

প্রাসাদসংলগ্ন মণিনাগের মন্দির-মধ্যে মহানন্দ ভর্তু ও অন্যান্য কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন, এমন সময় দৌবারিক এসে জানালো—রাণীমা এসেছেন।

কোন অনুমতির অপেক্ষা না করেই রাণী ময়ূরমতী প্রবেশ করলেন। সদ্য বিধবা, শুভ্র বেশ, দৃষ্টিতে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। কোন আড়ম্বর না করে রাণী সোজাসুজি বললেন,—মহানন্দ, আমার ছেলেকে তুমি কোথায় রেখেছ বলে দাও। তোমাকে আমি করযোড়ে নিবেদন করছি, আমার পুত্রকে তুমি ফিরিয়ে দাও। আমার ছেলেকে নিয়ে আমি পিপ্পলী বনে পিতৃগৃহে চলে যাবো, তোমার রাজ্য-ভোগের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করবো না। তুমি দয়া করে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

মহানন্দ বললেন,—আমি তো বলেছি, আমি আপনার ছেলের সন্ধান করছি, খবর পেলেই তাকে ফিরিয়ে আনবো।

রাণী মহানন্দের মুখের পানে তাকিয়ে ক্ষণেক চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন,—আমার কাছে শুধু একটা কথা তুমি সত্য করে বল মহানন্দ, তোমার লোক কুমারকে হত্যা করেছে কিনা? সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু কি এখনও জীবিত আছে, না তোমার লোক তাকে হত্যা করেছে, সত্য করে বল?

—সত্য কথাই আমি বলেছি। আপনি এখন অন্তঃপুরে যান।

—যাচ্ছি, আমি এখনি চলে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি সত্য করে বল, কুমারের তুমি কোন অনিষ্ট কর নি, সে বেঁচে আছে।

—আমি তো আপনাকে বলেছি তার কোন সংবাদ আমি জানি না।

—কিন্তু তোমার কথা তো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মহানন্দ। মাতুলকে হত্যা করে তুমি মগধের সিংহাসনে বসেছ, মাতুলপুত্রকে যে তুমি হত্যা কর নি তা কি করে বিশ্বাস করি?

মহানন্দের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো, বললেন—বাজে কথা বলার স্থান এ নয়। আপনি অন্তঃপুরে যান।

—আমার সন্দেহ তা হ'লে মিথ্যা নয়, কুমারকে তোমার লোকই অপহরণ করেছে। আমার ছেলেকে তুমি ফিরিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। আর কোন দিন কখনও তোমার সামনে আসবো না।

মহানন্দ এবার আদেশ দিলেন—প্রতিহারী, এঁকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

প্রতিহারী এগিয়ে এলো, রাণী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন—সুন্দর! মাতুলকে হত্যা করেছ, মাতুলপুত্রকে অপহরণ করেছ, মাতুলানীকে প্রতিহারী ডেকে অপমান করছ! মনে রেখ, একজন মাথার উপরে আছেন, তিনি সব দেখছেন, তুলাদণ্ডে ন্যায়বিচার করছেন, তাঁর হাত থেকে তোমার পরিত্রাণ নেই।

রাণী ঘৃণাভরে একবার মহানন্দের মুখের পানে তাকিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন মন্দির থেকে।

মহানন্দ বললেন,—প্রতিহারী, পুরাধ্যক্ষকে বলে দিও যেন সব সময় এঁর উপর দৃষ্টি রাখে ইচ্ছা করলেই যেন অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম করে কোথাও না যেতে পারেন—এ আমার আদেশ।

প্রতিহারী বাহির হয়ে গেল।

ভর্তু বললো,—সত্যই তো, ছেলেটা কোথায় গেল, আশ্চর্য্য!

মহানন্দ বললেন, তুমি ঠিকমত সন্ধান করেছ?

—রাজগৃহ থেকে পাটলিপুত্র অবধি খোঁজ নিয়েছি, কেউ কিছুই বলতে পারে নি। কোন ...মান কূটনীতিক তাকে লুকিয়ে রেখেছে।

—তাতে ভয় পাবার কোন কারণ দেখি না। সে ছেলে বড় হয়ে যখন পিতৃরাজ্য উদ্ধার ...চাইবে তখন আমি সিংহাসনে পাকা হয়ে বসে আছি। যাক্ সে কথা, ধাত্রী আর কিছু ...েছে?

—নতুন কথা আর কিছুই বলে নি, সেই এক কথা—এক ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে নিয়ে গেছে।

—পূজারী কাত্যায়নের কোন সন্ধান পেয়েছ?

—না। সেইদিন থেকে সে আর গৃহে ফেরে নি, মন্দিরেও সে পূজা করতে যায় না।

—আমার মনে হয় সে-ই এর মধ্যে আছে, তার সন্ধান পেলেই তাকে ধরে আনবে।

—তার গৃহের পাশে প্রহরী নিযুক্ত রেখেছি।

—দশ—

...মাগাদ কাত্যায়ন রাজগৃহের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলো।

খানিকটা বেণুবন, পিছনে কিছু আম ও অশ্বত্থ গাছ, তার পরেই পাহাড়ের কোলে ছোট

একখানি গ্রাম। গ্রামের এক পাশে কাত্যায়নের বাড়ী। এই বন পার হতে হতে কাত্যায়ন দ্বিধায় পড়লো—গৃহে যাওয়া তার পক্ষে ঠিক হবে কি না সে বুঝতে পারলো না। সে-ই যে মহাকুমারকে নিয়ে গেছে এই কথাটা যদি কোন রকমে প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে বিপদের পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। তখন মহানন্দের হাতে নির্য্যাতনের একশেষ ঘটবে। ততটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে গৃহে ফেরা ঠিক হবে কিনা কাত্যায়ন চিন্তা করলো। কিন্তু ক্ষুধা ও ক্লান্তি তখন তাকে অবসন্ন করেছে, একমুঠো অন্ন ও খানিকক্ষণ বিশ্রাম তার একান্ত প্রয়োজন। সে ভাবলো, নগর থেকে প্রায় একক্রোশ দূরে তার গৃহ, এত দূরে এত রাত্রে কে আর তার খবর রাখে? আজকের রাতটুকু কোন রকমে কাটিয়ে প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের আগে গৃহত্যাগ করলেই চল্‌বে, কেউ জানতেও পারবে না। এই কথা ভেবে চারিপাশে একবার সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্যাত্যায়ন গ্রামে প্রবেশ করলো, গৃহদ্বারে গিয়ে করাঘাত করলো।

ক্লান্ত কাত্যায়নের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেই রাত্রে অন্ধকারে কাউকে দেখতে না পেলেও, নিকটে বনান্তরালে একটি লোক সজাগ হয়ে বসে ছিল, কাত্যায়ন গৃহমধ্যে প্রবেশ করা মাত্রই সে একটি গবাক্ষের পাশে এসে দাঁড়ালো, আড়াল থেকে কথাবার্তার কিছু কিছু শুনলো, তারপরেই ছুটলো ভর্তুকে সংবাদ দিতে।

রাত্রিশেষে শান্ত্রীরা কাত্যায়নের গৃহে এসে হানা দিল।

প্রভাতে ভর্তু কাত্যায়নকে এনে উপস্থিত করলো মহানন্দের সামনে মহানন্দ রাজকুমারের ধাত্রীকে ডাকলেন। ধাত্রী কাত্যায়নকে চিনলো, বললো—হ্যাঁ, এ-ই লোক।

মহানন্দ কাত্যায়নকে জিজ্ঞাসা করলেন,—মহাকুমারকে তুমি কোথায় রেখেছ বল?

ব্রাহ্মণ, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ বলে মনে করে। কাত্যায়ন চুপ করে রইল।

—কী, তুমি আমার কথার উত্তর দেবে না?

—কি উত্তর তুমি চাও?

—রাজকুমারকে তুমি কোথায় রেখেছ?

—যেখানে সে নিরাপদে থাকবে।

—সে কোথায়?

—নিরাপদ স্থানে।

—কোথায় সে নিরাপদ স্থান?

—সে কথা তোমাকে আমি বলব না।

—বলবে না?

—না।

—উত্তম, দেখি তোমার মুখ থেকে সে কথা বার করা যায় কি না? ভর্তু, এ… সপরিবারে কারাগারে নিক্ষেপ কর, পরে এর সম্পর্কে আমি যথাবিধ ব্যবস্থা করবো।

কাত্যায়নের মুখে শুধু অবজ্ঞার মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, নিজের মনকে সে সব দুঃখ… জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে নিয়েছিল।

—এগারো—

মগধের মহামাত্য শ্রেষ্ঠী রাক্ষস-নিসূদনকে উগ্রসেনের দূত জরুরী আহ্বান জানিয়ে আমন্ত্রণ করে আনলো। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে উগ্রসেন বললেন,—গত কয়েকদিন ধরে আমি শুধু আপনার কথাই চিন্তা করছি। আপনি ছাড়া এই দুর্দিনে সাম্রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি তো আর কেউ নেই। সামন্ত রাজাদের গোপন চক্রান্তে আমার মাতুল সম্রাট কাকবর্ণী নিহত হয়েছেন, মহাকুমারও অপহৃত হয়েছেন, রাজ্যমধ্যে একটা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে। এই বিশৃঙ্খলাকে আয়ত্ত করার জন্য সদ্যবিধবা মাতুলানী আমাকে রাজ্য পরিচালনার জন্য আহ্বান করেছেন। রাজকুমারের সন্ধান করে তাকে রাজকাজের উপযুক্ত করে তুলতে পারলেই আমার ছুটি পাব। আপনি যদি এই দুর্দিনে আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে মগধ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা আমার পক্ষে কঠিন হবে।

রাক্ষস শুনেছিলেন যে উগ্রসেনই মগধ-সম্রাট্‌কে হত্যা করেছে। এখন অন্যরূপ শুনে তিনি একটু দ্বিধায় পড়লেন, কিন্তু উগ্রসেনের অধীনে কাজ করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, বললেন,—আমি একবার বারাণসী যাব বলে স্থির করেছি। সেখানে আমার শ্বশুর আছেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে স্ত্রী বড় ব্যকুল হয়ে পড়েছেন। তাঁকে একবার দেখতে যাওয়া প্রয়োজন।

—কিন্তু রাজ্যের এই দুর্দিনে আমাকে ত্যাগ করে যাওয়া কি আপনার পক্ষে উচিত হবে? আপনারা কয়েক পুরুষ ধরে মগধের সেবা করে আসছেন, এখন নাবালক রাজকুমারের স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষা করাই কি আপনার কর্ত্তব্য নয়?

—আপনি যথার্থ বলেছেন। আমরা পুরুষানুক্রমে মগধ-সম্রাটের অন্নে পুষ্ট, কিন্তু এখন একবার বারাণসী না গেলে তো গৃহে শান্তি থাকে না।

—সে জন্য আপনার যাবার প্রয়োজন কি? আপনার পত্নীর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিন, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, এই সময় আপনি আমায় ত্যাগ করবেন না। আমি মহাকালের পূজারী, সন্ন্যাসী মানুষ, রাজকাজ কিছুই বুঝি না। আপনি পাশে না থাকলে সব অচল হয়ে যাবে। আপনি আর দ্বিমত করবেন না।

—আমায় একটু চিন্তার অবসর দিন, গৃহিণীর আগে অনুমতি নিই। পতি-পত্নী দু'জনে বিশ্বনাথের পূজা করবেন বলে তাঁর মানসিক আছে।

—সে তো করবেনই। আজকের এই দুর্যোগ কেটে গেলে বিশ্বনাথের পূজা করার অবসর আপনি অনেক পাবেন, আমিও আপনার সহগামী হব।

রাক্ষস-নিসূদন সহসা কোন উত্তর দিলেন না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার উগ্রসেনের মুখের পানে তাকালেন, তাঁর মনের কথাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন।

উগ্রসেন তাঁর মনোভাব বুঝলেন, বললেন,—আপনি হয়তো শুনেছেন মাতুলকে আমিই হত্যা করিয়েছি। কিন্তু আমি সত্য করে বলছি, আমি এই হত্যাকাণ্ডের বিন্দুবিসর্গ জানি না, এ শুধু শত্রু-পক্ষের রটনা। রাজ্যের প্রতি আমার কিছুমাত্র লোভ নেই। সেই জন্য আমি আপনাকে ডেকেছি। যে ক'দিন মহাকুমারকে উদ্ধার না করা যায় সেই ক'দিন আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন,

তারপর যদি আপনার মনে হয় যে আমার কাজে যুবরাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তাহলে মাতুলানীর সঙ্গে পরামর্শ করে তখনই আমাকে জানাবেন, আমি মহাকালের মন্দিরে ফিরে চলে যাব।

রাক্ষস আর কোন আপত্তি তুলতে পারলেন না—চিন্তিত মুখে তিনি বিদায় নিলেন।

ভর্তু অন্তরাল থেকে শুনছিল, বললো,—আপনি সুন্দর অভিনয় করতে পারেন, আপনার উপর শ্রদ্ধা আমার আরো বাড়লো। মগধসম্রাটের জয় হোক্!

উগ্রসেনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

দাঁত

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

দাঁতের অসুখের মতো অমন বিতিকিচ্ছিরি ব্যামো তুনিয়ায় আর তু'টি নেই। এবং তুঃখের কথা বলবো কি, আমাদের গুষ্টিশুদ্ধু সক্কলের ঐ ব্যামোটি আছে। ঠাকুমার মুখে শুনেছি, দাঁত নিয়ে আমাদের এই যন্ত্রণা নাকি চৌদ্দ তু'গুণে আটাশ পুরুষ থেকেই লেগে আছে। শুধু আমাদের পরিবারে দাঁতের চিকিৎসা ক'রেই বিষ্টু ডাক্তার বালিগঞ্জে একখানা তিনতলা বাড়ী বাগিয়েছে, একখানা ডাক্সাইটে গাড়ি হাঁকিয়েছে।

আর এ কথা কে না জানে যে দাঁত যাওয়া মানেই সব কিছু যাওয়া? দাঁতের সঙ্গে চোখ, চোখের সঙ্গে মাথা; আমাদের সব্বাই অল্প বয়সেই চোখে চশমা লাগাই, হাজার রকম তেল লাগিয়েও মাথার টাক আটকানো যায় না। ধরো আমার বড়দা'। এই কার্তিকে কেবল ছাব্বিশ বছর পূরলো তার, কিন্তু এর মধ্যেই মাথার সামনের অর্দ্ধেক সাফ্ হয়ে গেছে। অচেনা-অজানা লোক অবশ্যি ঝাঁ ক'রে ওটাকে টাক ব'লে বুঝতে পারে না (অন্ততঃ বড়দা'র তাই ধারণা),

কিন্তু আমার তো মনে হয় বুঝেও তারা না-বোঝার ভান করে। বড়দা'র মাথার দিকে, যাকে বলে অপলকনয়নে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে—আপনি মশাই, ধন্যি। উফ্, কি প্রশস্ত কপাল আপনার!

যে যাই বলুক, পঞ্জিকা আর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে হাজার রকম তেল লাগানো হ'লো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না; চিরুণী চালানোর সময় প্রত্যেক দিন বড়দা'র মাথা থেকে গোছা গোছা চুল উঠে যায়, প্রত্যেক দিন বড়দা'র হৃদয়বিদারক দীর্ঘশ্বাস পড়ে। গেলো গেলো, সব গেলো। এমনি ভাবে চললে আর ক'দিনেই বড়দা'র মাথাটি দিব্যি পাড়াগেঁয়ে নিকোনো উঠোনের মতো ঝক্ঝকে হ'য়ে উঠবে। এখনই অবস্থা এমন যে বড়দা'কে দেখলে মনে হয় যেন সাতাশ বছরের ধড়ের উপরে কেউ একখানা সাতাশি বছরের সাফ্ মাথা বসিয়ে দিয়েছে।

মায়ের চোখে পড়লো ব্যাপারটা। জরুরী ডাক পেয়ে শিবপুর থেকে মাসীমা চ'লে এলেন, আর উলুবেড়ে থেকে পিসীমা।

মা, মাসীমা আর পিসীমা! রবিবারের এক সকালে তিনজনে জেঁকে ধরলেন বাবাকে। কী বৃত্তান্ত? না, এই মাসের মধ্যেই দেখে-শুনে খোকার বিয়ে লাগাও।

—বিয়ে? খোকার বিয়ে? নিজের টাকে হাত বুলুতে বুলুতে বাবা বললেন—তা এতে এত তাড়াহুড়োর কী? আস্তে-সুস্থে দেখে-শুনে—

বাবার কথার উপর থাবা মেরে মা ব'লে উঠলেন- দেখবে কি আবার? তুমি কি কিছু দেখ চোখ মেলে? বলে কিনা আস্তে-সুস্থে, দেখে-শুনে! খোকার মাথার অবস্থাটা দেখেছো একবার?

এ কি কথা! বোধ হয় বাবা সে সব লক্ষ্য করেন নি, আস্তে আস্তে বললেন, খোকার মাথায় তো জন্ম থেকেই গোবর জানি, এখন আবার অল্প একটু ছিটের ভাবও হয়েছে নাকি? য়্যাঁ?

মাসীমা একটু চিপটেন কাটলেন—না, বাবার সে গুণ খোকা পায় নি। আসল কথা হচ্ছে কি—

মাসীমা, মা আর পিসীমা তিনজনে মিলে আস্তে আস্তে বাবাকে তখন আসল কথাটা বোঝালেন। খোকার মাথায় ত্যাখ-না-ত্যাখ হড়হড় ক'রে টাক বেড়ে যাচ্ছে। অতএব তাড়াতাড়ি যদি খোকার বিয়ে না হয়, তাহ'লে টাকের বহর দেখে কোনো ভদ্রলোক হয়তো ভবিষ্যতে খোকাকে আর জামাই ক'রতে রাজী

হবেন না। অ, এই কথা? বাবা বুঝলেন এবং রাজী হলেন। এমন কি, এও ঠিক হ'লো যে কাল থেকেই বাবা খোকার বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে মেয়ে দেখতে সুরু করবেন।

মাসীমা, মা আর পিসিমা, বড়দার চুল উঠে যাচ্ছে ব'লে তিনজনেরই চুলের উপর বিষম রাগ। কিন্তু বাবার তা নয়, বাবার চোখ গলদের গোড়ায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা বললেন,—মিছিমিছি রাগ ক'রে তোমরা চুলের বাপান্ত করছো, চুলের কী দোষ? গলদ হচ্ছে গোড়ায়। দাঁতের দোষেই আমাদের বংশের এই দুর্দশা, দাঁতের জন্যেই খোকার মাথাটি গেলো। শুধু কি খোকা? আমাদের চৌদ্দ দু'গুণে আটাশ পুরুষ ধরেই—

বাবার গলা বুঁজে এলো, আটাশ পুরুষের দুঃখে বাবা শেষ পর্যন্ত চোখের জল সামলাতে পারলেন না। ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

মুকুন্দ মোক্তারের মেয়ে মণিমালা প্রথমদফায় তাকে দেখতে গিয়ে যে কেলেঙ্কারীটা হ'লো তা আর কহতব্য নয়।

মেয়ে তো এসে যথারীতি বাবাকে প্রণাম করেছে, লজ্জাবতী লতার ভঙ্গীতে মুখ বুঁজে চোখ নীচু ক'রে বসেছে। নাম জিজ্ঞেস করা, হাঁটা-চলতি দেখা, চুল কি পরিমাণ লম্বা তার পরখ করা, হাতের লেখা কিম্বা সেলাই দেখা অথবা গান শোনা,—বাবা এ সবের ধার দিয়েও গেলেন না। বাবার প্রশ্ন হ'লো প্রথমেই—একটু দাঁত বের ক'রে হাসো দেখি!

মেয়ে তো হতভম্ব। দাঁত বের ক'রে হাসবে কি, কথা শুনে মেয়েটি তো ভ্যাঁ-ক ক'রে কেঁদে ফেললো।

মেয়েকে ভিতরে পাঠিয়ে মুকুন্দ মোক্তার তারপর বাবাকে সোজা আঙ্গুলে দরজা দেখালেন; গাঁক্ গাঁক্ ক'রে বললেন,—যান মশাই, পথ দেখুন। পাগলের ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেবো না। বলে কিনা দাঁত বের ক'রে হাসো!

গজরাতে গজরাতে বাবা সটান বাড়ী চ'লে এলেন। ছেলের বিয়ে মাথায় থাক, এ সব হাঙ্গামার মধ্যে মাথা গলাতে যাওয়াই ঝক্‌মারী। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তাঁর।

কিন্তু উঁহু, বাড়ীতেও আছেন মাসীমা, মা আর পিসীমা। সব শুনে তিন জনে মিলে বাবাকে এমন গঞ্জনা দিলেন যা খুলে লিখতে সুরু করলে লজ্জায় আমার কলমের কালি অবধি শুকিয়ে যাবে। গঞ্জনা শুনে বাবা একটি কথাও

বললেন না; ঘাড় নীচু ক'রে সারাক্ষণ ফোঁস্‌ফোঁস্ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলেন।

এদিকে সশব্দে এই কাণ্ড; ওদিকে নিঃশব্দে নিয়মিত বড়দা'র মাথা থেকে গোছা গোছা চুল উঠে যাচ্ছে, হড়হড় ক'রে টাক বেড়ে যাচ্ছে। সব কাণ্ডের গোড়ায় কিন্তু দাঁত!

অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক ঝামেলার পর শেষ পর্য্যন্ত পছন্দসই কনে পাওয়া গেলো। বালিগঞ্জের মেয়ে; ঘোরতর সুন্দরী এবং, আমাদের পক্ষে তার থেকেও আনন্দের কথা হ'লো, মেয়েটির দাঁত নাকি চমৎকার। মুক্তার মতো চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। না, এখানে বাবা আর মেয়েটিকে দাঁত বের ক'রে হাসতে বলেন নি। মাসীমা, মা আর পিসিমা; এঁরা তিনজনে বাবাকে যে উপায় বাৎলে দিয়েছেন অক্ষরে অক্ষরে বাবা তাই মেনেছেন। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেছেন, দেদার আলাপ। এই যেমন, তোমার নাম কি, আলুর চপ্ বানাতে জানো কি না, তিন কাপ্ চায়ে ক' চামচ দুধ লাগে, ষাঁড়ের ইংরাজি কি, ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে ক'জন সেপাই কচু-কাটা হয়েছিলো ইত্যাদি, ইত্যাদি; জবাব দেবার সময় বাবা দাঁত দেখে নিয়েছেন। পোকায় কাটা কিংবা বিতিকিচ্ছিরি রকম উঁচু-নীচু তো দূরের কথা, দিব্যি সুন্দর দাঁত। চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে।

আমাদের আনন্দ আর ধরে না। মা, মাসীমা, পিসীমা, বাবা কিংবা আমার কথা বাদ দাও; সবচেয়ে সুখের কথা হচ্ছে যে বড়দা'র দীর্ঘশ্বাস আর ফোঁস্‌ফোঁসানি বিলকুল বন্ধ, বড়দা'র মুখে আজকাল দিনরাত্তির গুণ্‌গুণ্ গান। এমন কি, আমাকে এর মধ্যে একদিন মেট্রোতে টার্জনের ছবি দেখালো, আইস্‌ক্রীম খাওয়ালো, দু'পেকেট ভর্তি চকোলেট কিনে দিলো।

আমাদের হবু বৌদির অমন চমৎকার দাঁতের খবর শুনেও শুধু আমার মেজদি কিন্তু মুখ ভার ক'রে রইলো। হবু বৌদির দাঁত নিয়ে এত 'ইয়ে' করা নাকি আমাদের বাড়াবাড়ি। আর বাড়াবাড়ি দেখলেই নাকি ওর মেজাজ খিঁচড়ে যায়। যাক গে, যেতে দাও। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আরে, ছেলেমানুষ ব'লে আমি কি আর কিছু বুঝি না? নিজের মুখের মধ্যে তো এবড়ো-খেবড়ো কতগুলো কুচ্ছিৎ পোকা-দাঁত! এমন সুন্দর দাঁত সমেত একজন সুন্দরী এ-বাড়ীতে আসছে, মেয়ে হ'য়ে মেজদির সেটা সহ্য হবে কেন? মেজদিটার একেবারে হাড়ে হাড়ে হিংসে। এমন বিচ্ছিরি লাগে!

শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় বিয়ে হ'য়ে গেলো। বিয়ের উপহারে বৌদি পেলো রাশি রাশি টুথ-ব্রাশ, টুথ-পেষ্ট। এমনি টুথ-ব্রাশ তো অগুণতি, দু'টো সোনা-বাঁধানো, সতেরোটা রূপো-বাঁধানো। দেশী বিলিতি টুথ-পেষ্টের মধ্যে একটা আড়াই-সেরী ওজনের কবরেজী দাঁতের মাজনও আছে; ওটা আমাদের দূর সম্পর্কের এক দাদুর উপহার। ও সব বিলিতি কায়দায় পেষ্ট-ফেষ্টের ওপর তিনি মর্মে মর্মে চটা।

বিয়ের হাঙ্গামার দিন তিনেক বাদে বাবা এক সকালে নিজে গিয়ে কসবা থেকে দেড় সের টাটকা পাঁঠার মাংস নিয়ে এলেন। আমাদের বাড়ীতে মাংস! আটাশ পুরুষ ধ'রে আমরা মাংসের গন্ধই শুধু শুঁকেছি, গন্ধে গন্ধে আমাদের জিভের জলই শুধু সক্‌সক্‌ করেছে। শুনেছি, আমাদের আটাশ পুরুষের সাধ, মাংস খাবো। কিন্তু যত সাধ ছিলো, সাধ্য ছিলো না। আমাদের সাধে দাঁতই বাধ সেধেছে। সেই আমাদের বাড়ীতে মাংস কেন রে বাবা?

না, কারণ আছে। বৌদি।

ভেবে-চিন্তে বাবাই এই প্ল্যানটা বের করেছেন। সবাইকে চমকে দেবেন বলেই বাবা ব্যাপারটা আগে কারো কাছে ভাঙেন নি। এখন ভাঙচেন। আস্তে আস্তে ভাঙছেন।

আজ দুপুরে বৌদি মাংস খাবেন, আমরা সবাই গোল হয়ে বসে জুল্ জুল্ করে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখবো। শুধু কি বাবা আর আমরা? স্বর্গ থেকে বাকি ছাব্বিশ পুরুষও নিশ্চয়ই তাঁদেরই বংশের একটি বৌয়ের এই কীর্তি দেখে আনন্দে গদগদ হবেন। অন্ততঃ বাবার এই বিশ্বাস।

মাসীমা, মা আর পিসীমা; এঁরা পর্যন্ত তিনজনে প্ল্যান শুনে বাবাকে তারিফ করতে লাগলেন।

মুখ গোঁজ করে রইলো শুধু মেজদি। এত বাড়াবাড়ি নাকি অসহ্য।

বৌদি একে নতুন, তার ওপরে মেজদির সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে কাল ধমক খেয়েছে। 'হ্যাঁ, ভাই'—বলে বৌদি আলাপ সুরু করতেই মেজদি মুখ ঘুরিয়ে বলেছে—ন্যাকামি রাখো। যত ভেবেছো আমি তত বোকা নেই। আলাপের ছুতো করে দাঁত দেখাতে চাও, এই তো? তা অত অহঙ্কার কিসের? মানছি তোমার মতো অমন দাঁত ভূ-ভারতে কারো হয় নি, হবে না। ব্যস, হলো?

বেচারী বৌদি। মুখ চূণ করে গুটি গুটি নিজের ঘরে এসে দু' হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেছে। একটু-আধটু কেঁদেছে কি না কে জানে!

এজন্যে মা মেজদিকে আড়ালে খানিক বকেছেও বুঝি। যাগ গে, অত কথায় আমার দরকার কি?

দুপুর বেলাই মাংস রান্না হয়ে গেল, বাড়ীময় মাংসের প্রাণ-আইঢাই-করা গন্ধ। লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমরা, স্রেফ গন্ধ টেনে যতখানি মেরে দেওয়া যায়।

এমনিতেই বৌদি একটু বেশি রকম লাজুক, তার ওপর এমনি একখানা হৈ হৈ কাণ্ড। কেন কে জানে, বাবা আবার বেছে বেছে মেজদিকে ভার দিয়েছে বৌদিকে ডেকে এনে খেতে বসানোর। প্রথমে মেজদি একটু গাঁইগুঁই করেছিলো, কিন্তু বাবার এক ধমকে ঠাণ্ডা।

বৌদিকে হাত ধ'রে এনে পিঁড়িতে বসালো মেজদি। সামনে থালার ওপর ভাতের সঙ্গে গরম গরম মাংসের খণ্ড ধোঁয়া ছড়াচ্ছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমরা সবাই চারপাশে গোল হয়ে বসে যে যার জিভের জল গিলছি। শব্দ হচ্ছে কক্ কক্, কক্ কক্। হ্যাঁ, বড়দা'ও আছে। দু' চোখ বাতাবি লেবুর মত করে বড়দা'ও টকাস্ টকাস্ করে জিভের জল খাচ্ছে।

এক কথায় রান্নাঘর গিজ্‌গিজ্‌ করছে। গিজ্‌গিজ্‌ কিংবা গম্‌গম্ যাই বলো।

লজ্জায় ঘোমটার আড়ালে বৌদি জড়োসড়ো। এত লজ্জা-টজ্জা মেজদির অসহ্য। মেজদি বললো,—খেয়ে নাও না চট্‌পট্। ঝামেলা একটু তাড়াতাড়ি চুকলে বাঁচি বাপু!

কিন্তু উঁহু, তবু বৌদির হাত ওঠে না। তখন বাবা মেজদিকে বললেন – নতুন বৌ কখনও অত লোকের সামনে এমন করে খেতে পারে? তুই মেখে দু'-চার টুকরো খাইয়ে দে না।

বোঝো কাণ্ড! যে জিনিষ মেজদি ভগবানের মারে জীবনে নিজে কখনও খেতে পারবে না, তাই কিনা নিজের হাতে বৌদিকে খাইয়ে দিতে হবে! কিন্তু উপায় কি? বাবার হুকুম যে!

বাবা আবার মেজদিকে তাড়া দিলেন—দে না।

মনে মনে গজর গজর করতে করতে মেজদি একসঙ্গে তিন-চার টুকরো পেল্লায় সাইজের মাংস একসঙ্গে তুলে বৌদির ঘোমটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে

সঙ্গে বৌদির এক ঝটকা। মাংসগুলো ছিটকে পড়লো, আর, সেই ঝটকা সামলাতে পারলো না মেজদি। মুখ থুবড়ে মেজদি পড়লো মাংসের থালায়।

যখন উঠলো, সারা মুখে মাংসের ঝোল, সঙ্গে ছু'-চারটে ভাত। বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে, ছু' চোখ জ্বল জ্বল করছে। একেবারে পূরোপূরি রণ-রঙ্গিনী মূর্তি! বাবা পর্যন্ত থ' মেরে বসে আছেন। বাবাও জানেন, ভালো করেই জানেন, রাগলে মেজদির আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না।

সত্যিই রইলো না। আমরা অবাক্ হয়ে দেখলাম, মেজদি ডান হাতে বৌদির গালে একখানা বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় হাঁকড়ালো।

চড়ের ঘাল দেখেও অবশ্যি আমরা কিছু কম অবাক্ হলাম না। চড়ের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো ছু'পাটি বাঁধানো দাঁত। ছু' পাটিই পড়লো সেই মাংসের থালায়। বৌদির মুখ কিন্তু তখনও ঘোমটার আড়ালে।

তক্ষুণি বাবা হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। বড়দা'র অবস্থাও খুব সঙ্গীন। আমরাও প্রায় কাঁদো কাঁদো।

মেজদি কিন্তু মহাখুসি। বৌদির ওপরে মেজদির আর বিন্দুমাত্র রাগ নেই।

নিগ্রো উপকথা

শ্রীসুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়

শম্বুকগতি

"শম্বুকগতি" অর্থাৎ শামুকের আস্তে হাঁটা তো প্রবাদ বাক্য। তাদের এই হাঁটা নিয়ে নিগ্রোদের মধ্যে অনেক গল্প আছে। সাত বছরে শামুক কতদূর এগোয়?

একবার এক শামুক নাকি সাত বছর ধরে একটা রাস্তা পার হয়েছিল। যেই সে রাস্তার ওপার পৌঁছেছে সাত বছর পরে, ঠিক তক্ষুনি একটা গাছ ভেঙ্গে পড়'ল, আর মাত্র এক ইঞ্চির জন্য শামুকটা গাছের তলায় চাপা পড়ার থেকে বেঁচে গেল। শামুক তখন পেছন ফিরে গাছটার দিকে আর লোকেদের দিকে তাকিয়ে বল্লে,—"দেখ, তাড়াতাড়ি হাঁটার কি রকম সুফল! আমি তাড়াতাড়ি হেঁটেছিলাম বলে আজ মরতে মরতে বেঁচে গেলাম।" সত্যি সত্যিই, ছ'মাস আগে সে যেখানে ছিল, তখনও যদি সেখানে থাকত তবে সে নিশ্চয়ই চাপা পড়ে যেত। এই ছ'মাসে ভাগ্যিস সে এক ইঞ্চি এগিয়েছিল!

এ সম্পর্কে আর একটা গল্প আছে, সেটা আরও মজার। একবার এক শামুকের স্ত্রীর খুব অসুখ করেছিল। স্ত্রীর কথামত শামুক তাই তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে বেরুল। শামুক চলে যাবার পর থেকে তার বৌয়ের অসুখ আরও বেড়ে গেল। বেচারী কেবল বিছানার এ পাশ আর ও পাশ করে আর মাঝে মাঝে বলে, "ভগবান্ জানেন আমি কি কষ্ট পাচ্ছি, তাঁর দয়ায় নিশ্চয় তাড়াতাড়ি ডাক্তার আসবে।"

দেখতে দেখতে এক এক করে সাত বছর কেটে গেল। কিন্তু শামুক বাবাজীর আর দেখা নেই। হঠাৎ একদিন শামুকগিন্নীর কানে দরজা থেকে একটা খস্‌খস্ আওয়াজ এল। সে খুব খুসী হয়ে বল্‌লো, কর্তা, এতদিনে তুমি তাহলে ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলে? ধড়ে আমার প্রাণ এলো। এবার তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবো।"

শামুক বল্‌লো—"আরে, অত তাড়াহুড়ো ক'রো না—আমি তো এখনও ডাক্তারের কাছেই যাই নি।"

কি ব্যাপার? না—শামুক এই সাত বছরে অনেক চেষ্টায় নিজের জায়গা থেকে মোটে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এগিয়েছিল।

শামুকের হাঁটার বহরটা দেখলে তো! *

* নিগ্রো লেখক জোরা নীল হার্ষ্টন্ এই রকম অনেক নিগ্রো উপকথা লিখেছেন। লেখিকা মনরোভিয়া (লাইবেরিয়া) থেকে তারই কিছু সংগ্রহ করে রামধনুকে উপহার দিচ্ছেন।

ঝগড়াটে পড়ুয়া

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

[নদীর ধারে প্রকাণ্ড অশথ গাছ—তারই একটু দূরে একখানা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী—একপাশে ঝাঝারি-গোছের একটি ঘর—ঘেরা বারান্দা বলাও চলে। একটি ছোট্ট শেল্‌ফ, তাতে বইপত্তর আছে। দু'টি ছোট্ট দেরাজ টেবিল। আর রয়েছে হরেক রকমের খেলনা—উড়োজাহাজ, রেল, ডবল ডেকার, ডল পুতুল। ছাদ থেকে ঝুলছে দোলনা চেয়ার—কি যে নেই জানি না! একধারের দেয়ালে রকমারি রাংতা লাগানো রয়েছে, আর একদিকের দেয়ালে খবরের কাগজ থেকে কাটা শৈলেন মান্না, বশিথ, আও প্রভৃতি ফুটবল-খেলোয়াড়দের ছবি। তারই নীচে মোহনবাগান কোন্ কোন্ বছর ক'বার ইষ্ট বেঙ্গলকে হারিয়েছে তাই নীল চক্ দিয়ে সন তারিখ সমেত বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্টোদিকে রাংতার নীচে বড় বড় করে লেখা "মোহনবাগান জিন্দাবাদ"—

ওপর থেকে দু'-দু'টো আলো ঝুলছে,—একটা সাদা একটা নীল। ঘরের যৌথ মালিক নীলা দিদি—বয়স নয় ও পিণ্টু দাদা বয়স ৮। সন্ধ্যে হয়েছে—পড়তে না বসার ওজর আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই—]

পিণ্টু : খালি পড় পড় পড়—আমার ঘুম পাচ্ছে টুটু—

টুটুল : ফের টুটুল বলছ ? বল দিদি। (তারপর গলা চড়িয়ে) মা-আ-আ—এই দেখ—

পি : আচ্ছা আচ্ছা, টুটুদি—। আজ কিন্তু নীল আলোতে পড়ব—(নীল আলো জ্বালল]

টু : নাঃ, সাদা আলো—(নীল নিভল, সাদা জ্বলল।)

পি : বাঃ রে, কালকেও তো তুমি সাদা জ্বালিয়েছ! আজ নীল জ্বলবে—(সাদা নিভল, নীল জ্বলল।)

টু : খবরদার পিণ্টু! আজ সাদা—

পি : কখ্খনো না—আজ নীল—

টু : সাদা—!

পি : নীল—!

(বাস্, চল্ল সাদা আর নীলের জ্বলা আর নেভা।

পিণ্টু দাদা টুটুলের চুল মুঠো করে ধরেছে একহাতে আর অন্য হাতে সুইচ টিপে রয়েছে—মুখে বলছে "আজ নীল"—। টুটুল দিদিরও একহাতে সাদা আলোর সুইচ টেপা, অন্য হাতে পিণ্টুর চুলের মুঠো—মুখে "আজও সাদা"! ভেতর থেকে মার কানে যুদ্ধের আওয়াজ "সাদা নীল" যেতেই মা ভাবলেন—)

মা : 'ঘরে ঢুকতে ঢুকতে—' ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। ওরে পিণ্টু, ও টুটুল! ও মা! ও মা! সুইচ ধরে ভাইবোন—

পিণ্টু : (এক সঙ্গে) আজ নীল জ্বালাবার পালা না মা ?

টুটুল : (এক সঙ্গে) আজ সাদা জ্বালাবার পালা না মা ?

মা : পড়া-শোনা ফেলে নীল-সাদা করা হচ্চে !

পিণ্টু : কাল সাদা জ্বলেছে মা—

টুটুল : আমি নীল আলোতে পড়তে পারি না যে মা—

মা : আচ্ছা-আচ্ছা, দয়া করে চুলের গোছা ছাড়ো (দু'জনকে বেশ করে ঝাঁকুনী দিলেন মা) এক দণ্ডও ঝগড়া না করে চলবে না।—বেশ, নীল সাদা দুইই জ্বলবে। এবার পড়তে বোসো। ব'লো না যেন—

পি : আমার ঘুম পাচ্ছে মা—

মা : তা আর জানি নে—

টু : আমার খিদে পেয়েছে মা! সেই কখন—

মা : আধ ঘণ্টা আগে খেয়েছো! মাগো মা! কি দস্যি ছেলেমেয়ে! পড়া না হলে খেতেও পাবে না, শুতেও পাবে না। পিণ্টু, ১১. ১২, ১৩ ঘরের নামতা মুখস্থ করবে—

পি : ও বাবাঃ, তিনটে! না মা, শুধু ১১—

মা : উহুঃ, ১১—১২—১৩। টুটুল, তুমি শুভঙ্করীয় যতটা বলেছি আর ১৬র ঘরের নামতা—

টু : ও বাবা! আগে খেয়ে নি মা, তারপর পড়ব।

মা : তা আর আমি জানি নে! সে সব হবে না। নামতা মুখস্থ না হ'লে খেতেও পাবে না, শুতেও পাবে না। চুপ্ করে পড়া মুখস্থ কর। আমি এখুনি আসছি।

(মা বেরিয়ে গেলেন। পিণ্টু, টুটুল একবার পরস্পরকে ভেংচী কেটে নিল, তারপর নাচার হয়ে লেগে গেলো নামতা মুখস্থ করতে। সারাদিন দস্যিপনা করলে যা হয়ে থাকে তাই হ'ল, ১১ একে ১১ বল্তে বলতে পিণ্টুর চোখ দু'টি আপনি বুজে এসেছে। টুটুলেরও তাই। ধারাপাত হাতেই ভাইবোন কার্পেটের মেঝেতে সাদা-নীল আলো মাথায় ঘুম। তারপরই সুরু হবে আসল মজা—আসছে বারে।)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে তোমরা অনেকেই বোধ হয় এখন ব্যস্ত রয়েছ। কিন্তু আর কয়েকদিন পরেই সুরু হবে অখণ্ড অবসর। ভারী চমৎকার ঐ সময়টা। এ সময়ে পত্রিকা পেতে একটু দেরী হ'লে রাগ হয় বৈকি! কিন্তু ঘটনাচক্রে, অনিচ্ছা সত্বেও, এ রকম হয়ে পড়ে।

শ্রীসীমা পাল (করিমগঞ্জ)—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি জানতে হ'লে এই বইগুলো দিয়ে সুরু করতে পার—৺দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের কথা', অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাস'। এ ছাড়া ৺মোহিতলাল মজুমদার রচিত কয়েকখানি বই এবং বিশেষ বিশেষ লেখকের রচনা সম্বন্ধে আলোচনামূলক অনেক বই আছে। শিশুসাহিত্যের গণ্ডী পার হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা দিয়ে

সাহিত্য পাঠ শুরু করা উচিত; এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিক্‌কার রচিত কবিতা। শ্রীনিবেদিতা সেন কলিকাতা-২৯)—অন্যের হাতে লেখা চিঠিতে তোমার অসুস্থতার কথা জেনে ক্ষুব্ধ হলাম। আশা করি এতদিনে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছ। শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী)—তোমার দীর্ঘ পত্রে রামধনুর প্রতি তোমার ভালবাসার পরিচয় আবার নতুন করে পেলাম। তোমার নতুন নতুন প্রস্তাব—বিশেষ করে পুনশ্চ দিয়ে লেখা প্রস্তাবগুলি নিশ্চয়ই গ্রহণ করব, অবশ্যি জায়গায় কুলোতে পারলে। তবে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধকে কি আর স্থানচ্যুত করা যায়? শিলংএর 'ব্যাঙের ছাতা' ক্লাবের নামটা বেশ কৌতুককর। তুমি তা হ'লে ক্যারমেও বেশ দক্ষ! শ্রীঝর্ণা চৌধুরী (মধুপুর) আলেকজাণ্ডার ডুমার 'দি ম্যান্ ইন্ দি আয়রন মাস্ক' বাংলায় ঠিক অনুবাদ কেউই করেন নি। তবে ওরই গল্পাংশ নিয়ে ছোটদের উপযোগী করে লেখা একাধিক বই বাংলায় বেরিয়েছে। সবই একখণ্ডে সম্পূর্ণ। শ্রীগৌরকিশোর চৌধুরী মণিনাথপুর) আগের মনোনীত লেখা সম্বন্ধে সঠিক বলা কঠিন। তবে বেশী দেরী হয়তো হবে না। রংমশাল বর্ত্তমানে বেরোয় না, সোনার কাঠি মাঝে মাঝে বেরোয়। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য (নৈহাটী) নামে ভুল হওয়ায় খুবই লজ্জিত। তোমার চিঠিখানা কিন্তু বেশ উপভোগ্য। বাংলা অনেক বই-ই পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে—নাম দিলে বিরাট তালিকা হবে। রবীন্দ্রনাথের অনেক বই, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আধুনিক কোন কোন লেখকের বই ইংরেজীতে তর্জমা হয়েছে, ফরাসী, জার্মান ভাষাতেও। শ্রীঅমিয় সামন্ত (বীরসিংহ) আমার শুভেচ্ছা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে থাকবে। হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ একজন বাঙ্গালী লেখক হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে তোমাদের জন্য লিখবেন বলেছেন। বর্ত্তমান হিন্দী বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদে বেশ এগিয়ে গেছে। তবে রবীন্দ্রনাথের যুড়ি পাওয়া যাবে কোন সাহিত্যে? শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ (কলিকাতা-১২)—তোমার সরস চিঠিখানা খুবই ভাল লাগল। স্থানাভাব না হ'লে তুলে দিতাম। নাবালক থেকে সাবালক হওয়ার সময় আধ পেয়ালা থেকে ভর্ত্তি পেয়ালা চায়ে উন্নীত হওয়ার কাহিনী পরম উপভোগ্য, বিশেষতঃ আমাদের কাছে। আমাদের ছেলেবেলায়ও ঠিক ঐ রকমটা দেখেছি কিনা!

আজ এইখানে শেষ করি, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে। ইতি—

রাঃ সঃ

দেশবন্ধুর গল্প

শ্রীঅনঙ্গমোহন চট্টোপাধ্যায়

একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি, শোন।

আমাদের বাড়ার পাশে এক বাড়ীতে বৃদ্ধদের তাস খেলার ও তামাক খাওয়ার আড্ডা ছিল। একদিন দুপুর বেলা একটি ভিখারী ক্লান্ত হয়ে সেই বাড়ীর দেউড়িতে তন্দ্রাভিভূত হয়ে শুয়ে ছিল। ভিখারীর গায়ে কিন্তু ছিল অত্যন্ত মূল্যবান্ একখানা নতুন শাল। দু'-একজন বৃদ্ধ তাই দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, "মজা দেখে যান, মজা দেখে যান। বেটা এসেছেন ভিক্ষে করতে, গায়ে কিন্তু পরেছেন এমন একখানা শাল যে জিনিষ আপনারাও কখনও দেখেন নি!"

কোলাহলে ভিখারীর তন্দ্রা ছুটে গেল। বেচারা কাঁচুমাচু হয়ে বল্লে, "বাবুরা, এ আমার নিজের কেনা জিনিষ নয়। ঐখানে এক সাহেবের বাড়ীতে গান গাইতে গাইতে ভিক্ষে করছিলাম। সাহেব মানে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার—খুব বড়লোক। গানটি তাঁর বড় ভাল লেগেছিল। তিনি বার বার আমাকে গাইতে বলে শুনতে লাগলেন। গানটি হয়েছিল বোধ হয় তাঁর খুব মনের মত। গলা, বাবু, আমার খুব ভালো ছিল না, গানের নিজ গুণেই বোধ তাঁর মন গলিয়ে দিয়েছিল। তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এই গায়ের চাদরখানি ভিক্ষা দিলেন। দেবার সময় বলে দিলেন, 'এই শালটা দরকারের সময় নিজে গায়ে দিও; বিক্রী ক'র না কিংবা কাউকে দিও না। আমার কাছে যখনই তোমার দরকার হবে তুমি এসো।' তাই সেই গায়ের কাপড়খানি আমি প্রাণে ধরে বেচতে পারি নি। আর আজ শীত লাগায় তাই গায়ে দিয়ে শুয়ে আছি। আপনাদের বিশ্বাস না হয়—চলুন ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী।"

বৃদ্ধেরা আর কথা বলতে পারলেন না, কারণ সেই ব্যারিষ্টারটি হচ্ছেন সি. আর. দাশ—যিনি পরবর্ত্তী জীবনে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিলিয়ে "দেশবন্ধু" নাম অর্জন করেন।

ক্রিকেট সম্বন্ধে দু' একটি কথা

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

ক্রিকেট নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়া গেছে আজকাল ব্যাটিংএর প্রাধান্য চলছে বোলিংএর উপর। ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে কোনও খেলাই শীগ্‌গির শীগ্‌গির শেষ হতে চাচ্ছে না।

সময়ের সমস্যা কিন্তু বিচার করে দেখতে গেলে মোটেই নূতন বলে বোধ হবে না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন সেক্রেটারী-অফ্-ষ্টেট্স্ মিষ্টার ব্রডরিক্ এই প্রস্তাব

করেন যে বোলারদের সুবিধার্থে এর পর থেকে স্টাম্পগুলি আরও এক ইঞ্চি করে বাড়িয়ে দেওয়া হোক। তাঁর সে প্রস্তাব তখন অবশ্য গ্রহণ করা হয় নি।

ক্রিকেট আমাদের জাতীয় খেলা নয়, বৈদেশিক খেলা হিসাবেই এর জনপ্রিয়তা আমাদের দেশে। তাই ক্রিকেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিদেশের ক্রিকেট-জগৎ থেকে কিছু জ্ঞানার্জ্জন করা এখানে বিশেষ অশোভন হবে না।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিকেট-জগতে একটা মজার ব্যাপার ঘটে। সে বৎসর "জেণ্টলম্যান একাদশের" বিরুদ্ধে "খেলোয়াড় একাদশ"-এর একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। শেষোক্ত দলটি সব দিক্ দিয়ে প্রথমোক্ত দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বসম্পন্ন থাকায় স্থির হয় যে "জেণ্টলম্যান একাদশ" যখন ব্যাট করতে যাবে তখন ষ্টাম্প্‌সের উচ্চতা হবে মাত্র ২২ ইঞ্চি করে আর প্রত্যেকটির দূরত্ব অপরটি হতে ৬ ইঞ্চি করে হবে; আর "খেলোয়াড় একাদশ" যখন ব্যাট করতে নামবে তখন স্টাম্প্‌সের উচ্চতা হবে ২৭ ইঞ্চি করে আর দূরত্ব হবে ৭ ইঞ্চি করে। এত সব সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে জেণ্টলম্যানদের ১ম ইনিংসে ৫৭ আর ২য় ইনিংসে ৬০ হয়েছে, আর অপর দিকে "খেলোয়াড় একাদশের" প্রথম ইনিংসেই ১৫১ হয়েছে। ফলাফল থেকে এইরূপ ব্যবস্থার অকার্য্যকারিতা সপ্রমাণিত হওয়াতে আর কদাপি এইরূপ অয়োজন করা করা হয় নি।

অনেকে বর্ত্তমানে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে বোলারদের বোলিং করবার শক্তি আর আগের মতন নেই। ওয়ালটার হ্যামণ্ড কিছুদিন আগে বলেছিলেন, "আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বোলিংএর তীব্রতা তিরিশ বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। নিয়ম-কানুনের মধ্যে এখন আর সংস্কার এনে কি করবেন? খেলার মান, বিশেষতঃ বোলিংএর মান উঁচু করাই আমাদের লক্ষ্য হোক্।"

প্রায় সত্তর বৎসর আগে ইংল্যাণ্ডের এডজার উইলসার বোলিংএ অসাধারণ নাম করেন। কেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি অনন্যসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। ৪১ ওভার দিয়ে তিনি ৩১টি মেডেন পান এবং মাত্র ১৭ রানে ৮টি উইকেট দখল করেন। তাঁর সেদিনের খেলা এখনও অনেক বৃদ্ধ খেলোয়াড়দের স্পষ্ট মনে আছে। বলা বাহুল্য তাঁরা যখন উইলসারের খেলা দেখেছিলেন তখন সকলে বালক ছিলেন।

ওভালে ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার খেলাটিতে বোধ হয় সবচেয়ে আস্তে আস্তে রান্ উঠেছিল। ইংল্যাণ্ড টসে জিতে ডবলিউ. জি, ও স্কটনকে ব্যাট করতে পাঠান। এক ঘণ্টার খেলায় মাত্র ২০ রান্ উঠেছিল, তার মধ্যে স্কটন করেন তিন। তারপর আরও আধ ঘণ্টা খেলে তিনি এক রান্ তোলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ডবলিউ জি. পিটিয়ে খেলতে আরম্ভ করেন এবং শতাধিক রান্ তোলেন। সত্যি কথা বলতে কি, ক্রীড়ামোদীগণ "শামুক-গতি"র খেলা অপছন্দ করেন। দ্রুতগতির খেলা হয় দর্শনীয়। এজন্য ভারতবর্ষের মুস্তাক আলী আর অষ্ট্রেলিয়ার কিথ মিলারের খুব নাম হয়েছিল।

ভারতবর্ষের বোলিংএ এখনও অনেক উন্নতি আবশ্যক। লিণ্ডওয়ালের মতন বোলার ভারতবর্ষে বোধ হয় একজনও নেই। ফাষ্ট-বোলারও তেমন কেউ নেই। মহম্মদ নীসারের মতন একজন বোলার এখন ভারতবর্ষের দরকার—আর তার জন্য প্রয়োজন সাধনার।

কার্ত্তিক

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

পূজে তোমা বঙ্গবধূ সন্তানের তরে,
কহিছে ভারত রাষ্ট্র, না চাই সন্ততি,
যারা আছে তারা যেন থাকে দুধে-ভাতে,
লভে যেন অন্নবস্ত্র, আরামে বসতি।

শুনেছি পুরাণে, তুমি তারক অসুরে
বধিলে, আশঙ্কাহীন হ'ল দেবগণ;
কোদণ্ড টঙ্কারে তব কম্পিত সতত
ত্যজিল দানব ভয়ে নন্দনকানন।

সেই মূর্ত্তি আজি দেব দেখাও মোদের,
নির্জ্জীব ভারতে কর শক্তি সঞ্চালন;
ত্যজ দেব সেকালের জীর্ণ ধনুখানি,
বৈজ্ঞানিক নব অস্ত্র কর আহরণ।

বিভক্ত, বিপন্ন আজি বঙ্গের সন্তান,
দিয়া অন্ন, দিয়া বীর্য্য কর তারে ত্রাণ।

চল

শ্রীমানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাহক)

উধাও ঠিকানা চল্‌তি হাওয়ায় এল ভেসে আজ দূরের ডাক—
চল্, ওরে চল্, পেছনে চাস্ নে, পেছন পেছনে পড়িয়া থাক্।
প্রাণ-বন্যার আহ্বান-ধ্বনি
রক্তে রক্তে তোল্ রণরণি,
দুর্গম গিরি বন্ধুর পথে সারি সারি পদচিহ্ন আঁক্।

ঝড়ের বিষাণ বেজেছে আকাশে, জাগে দিকে দিকে প্রেতের দল,
নিকষ আঁধার ঘনাল সমুখে, ঘনাক, তবুও এগিয়ে চল্।
তোরা তো নহিস ভীরু কাপুরুষ,
হুঁশ ফিরে আন ওরে ও বেহুঁশ,
ঘাবড়াস কেন? হুঁশিয়ার হয়ে কদম কদম বাড়ায়ে চল্।

মরু-কান্তার বন্ধুর পথে গা'রে স্বরে আজ চলার গান,
ভাঙ্গা জাহাজের বন্দরে দেখ্ সুপ্ত শোণিতে জাগিছে বান।
ঝড়ের-আকাশে গর্জিছে বাজ,
প্রলয় নাচনে নাচে নটরাজ,
অরুণ-পথের তরুণ যাত্রী, তোরাও সঙ্গে তোল্ রে তান।

আশ্বিন মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রাহক-গ্রাহিকার ভোটে সবচেয়ে প্রিয় ১৬ জন স্বদেশপ্রেমিকের নাম পর পর এই রকম স্থান পেয়েছেঃ— ১। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ২। মহাত্মা গান্ধী ৩। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ৪। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫। যতীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ৬। ক্ষুদিরাম বসু ৭। বাল গঙ্গাধর তিলক ৮। রাসবিহারী বসু ৯। দাদাভাই নৌরজী ১০। জওহরলাল নেহরু ১১। মতিলাল নেহরু ১২। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৩। সরোজিনী নাইডু ১৪। লালা লাজপৎ রায় ১৫। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৬। রাজাগোপাল আচারী।

এই তালিকার সবচেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠানোয় ১ম পুরস্কার পেলেন— শ্রীনিমাই ভৌমিক (কলিকাতা-৬) এবং ২য় পুরস্কার পেলেন শ্রীসাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (বাঁকুড়া)।

আর যাঁদের তালিকা কাছাকাছি হয়েছেঃ শ্রীআরতি বসু কলিকাতা-২৯, শ্রীপীযূষ দে (জিয়াগঞ্জ), শ্রীনমিতা দাম (গৌহাটী), শ্রীকল্যাণকুমার সোম (নিউদিল্লী)।

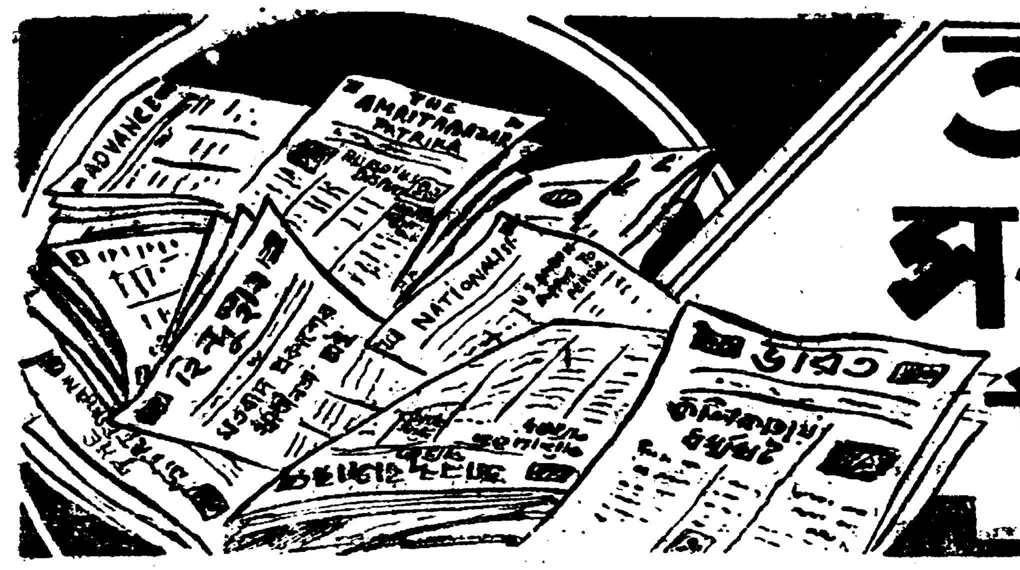

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

ক্রিকেট টেষ্ট—ভারত ও পাকিস্তান

ভারতীয় দলের সঙ্গে পাকিস্তান দলের আরও তিনটি টেষ্ট—দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ৪র্থ টেষ্ট ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। প্রথম টেষ্টে শোচনীয় ভাবে ইনিংস পরাজয়ের পর কানপুরের ২য় টেষ্টে পাকিস্তান সে ক্রটী সম্পূর্ণ সংশোধন করে নেয় ভারতকে উল্টে ইনিংস্এ পরাজিত ক'রে। অবশ্যি এই ম্যাচে ভারতের কয়েকজন নাম-করা খেলোয়াড়—যেমন হাজারে, মানকড়, ফাদকর প্রভৃতি খেলেন নি, তবুও পাকিস্তানের ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের এটা খুবই বাহাদুরী বলতে হবে। বোম্বাইএর তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে বোধ হয় ভারতের টনক নড়ে, এবারে আবার তারা পাকি-স্তানকে হারিয়ে দেয় দশ উইকেটে। চতুর্থ টেষ্টের (মাদ্রাজ) ফলাফল কি হয় সে জন্য সকলেরই খুব কৌতূহল হয়েছিল, পাকিস্তানও প্রথম ইনিংসএ বেশ ভাল রান্‌ই তুলেছিল, কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে প্রকৃতিই বাদ সাধলেন। মাদ্রাজের উপর দিয়ে এমনই ঝড়-বৃষ্টি সুরু হ'ল যে শেষ পর্য্যন্ত খেলা আর সম্ভব হ'ল না—ফলে অমীমাংসিত ঘোষণা করেই খেলা শেষ হ'ল। দেখা যাক্ কলকাতার মাঠে শেষ টেষ্টে কি হয়!

মানকড়ের কৃতিত্ব

প্রসিদ্ধ ভারতীয় ক্রিকেট-খেলোয়াড় মানকড় সম্প্রতি টেষ্ট ম্যাচে মোট ১০০০ রান্ ও ১০০ উইকেট দখল করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৫ জন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সমপর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। খেলার সংখ্যার দিক্ দিয়ে দেখলে এদিক্ দিয়ে তাঁরই কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী।

ইষ্ট বেঙ্গল দলের 'ডুরাণ্ড' কাপ্ বিজয়

সুবিখ্যাত ফুটবল ক্লাব ইষ্ট বেঙ্গল এ বছরেও দিল্লীর 'ডুরাণ্ড কাপ' বিজয়ী হয়েছে। তারা ফাইনালে শক্তিশালী হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে। বাংলার এরিয়ান্‌স্ দলও এই প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইনাল্ পর্য্যন্ত উঠেছিল।

আমেরিকার নতুন প্রেসিডেণ্ট

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হ'ল। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্ এবারে আর প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য দাঁড়ান নি, তাঁর দল (ডেমোক্রেটিক দল) থেকে ঐ পদের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন ষ্টিভেনসন্। রিপাবলিকান্ দল থেকে দাঁড়িয়ে-ছিলেন আইসেনহাওয়ার। শেষ পর্য্যন্ত আইসেন-হাওয়ারই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সেনানায়ক হিসাবে তাঁর নাম সুবিদিত। নতুন দলের নতুন প্রেসিডেণ্টের হাতে পড়ে আমেরিকার রাজনৈতিক গগনে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা দেবে কিনা এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে।

পরলোকে স্বেন হেডিন

সম্প্রতি ৮৭ বছর বয়সে বিখ্যাত পৃথিবী-পর্য্যটক স্বেন হেডিন পরলোক গমন করেছেন। স্বেন হেডিনের বাড়ী ছিল সুইডেনে। অল্প বয়স থেকেই ভ্রমণের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল—যার ফলে তিনি সুদূর পারস্তে সুইডেনের রাজদূত-দপ্তরে চাকুরী নিয়ে চলে আসেন। তার পর থেকেই সুরু হয় তাঁর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভিযান। বিশেষ করে মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চল ঘুরে ঘুরে আবিষ্কার করে তিনি এত রকম ভৌগোলিক তথ্য আমাদের দিয়ে গেছেন যা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে চিরকালের জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে। এ জন্য তাঁকে কত সময় কত বিপদে পড়তে হয়েছে—কত সময় জীবন বিপন্ন করতে হয়েছে! রক্ত-জমাট-করা বরফের রাজ্য আর বিভীষিকাময় মরুভূমি পার হতে হয়েছে! তাঁর টাকলা মাকান, পামীর তিব্বত, মানস সরোবর প্রভৃতি দুর্গম স্থান ভ্রমণের কাহিনী তোমরা অনেকে রামধনুতেও পড়েছ। এ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও তিনি ঘুরেছেন। মোট কথা, এ যুগের ভূপর্য্যটক ও আবিষ্কারকদের মধ্যে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

জোরকর ৬০ রানে ১৫ উইকেট, ধীরকর ৮০ রানে ২০ উইকেট।

উত্তর দাতাদের নাম :—ঝরণা, সানু ও গৌরী দাশ (কলিকাতা-১২); দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-৪) গৌরাঙ্গ, অশোক, খগেন বাবু (শান্তিনিকেতন); টাটা, টুটু, টিটি, টিটো, টোটা, টৈটু (জামসেদপুর); মীরা, ইরা, শ্যামল, সুকুমার ও সুনন্দা চট্টোপাধ্যায় (পাটনা); নিবেদিতা সেন (কলিকাতা-২৯); অমলেন্দু সরকার (কলিকাতা-৬); বীরেন্দ্রনাথ দত্ত (দিল্লী); জগন্নাথ দাস (কটক)।

নূতন ধাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি এমন এক-একটি শব্দ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে যার সবটাই বা অংশ বিশেষ কোনও ভৌগোলিক নাম।

১। রাজা — গেছেন, — অন্ধকার।
২। মহেঞ্জোদড়োয় — —সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে।
৩। তুমি — বোঝ কর, আমি কিন্তু — নিয়ে যাব না।
৪। — বেলা উত্তরের জানলা —, — হতে পারে।
৫। ঘরের সবটা— দিয়ে —।

কোল্ড ক্রীম অভ রোজেজ

গোলাপগন্ধ
প্রসাধন প্রলেপ

শীতের দৌরাত্ম্য হইতে হাত, পা, মুখ ও গাত্রচর্মের লাবণ্য রক্ষা করে।
সৌন্দর্য সাধনার শ্রেষ্ঠ সহায় এবং শৌখিন সম্প্রদায়ের পরম বন্ধু।

❋

সুদৃশ্য আধারে ও টিউবে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই :: কানপুর

এ মাসের নতুন পুরস্কার প্রতিযোগিতা

এবারকার বিষয় হচ্ছে 'ছোটগল্প প্রতিযোগিতা'। ছোটদের উপযোগী করে ৬০০ শব্দের মধ্যে একটি গল্প লিখে পাঠাতে হবে। গল্পটি মৌলিক হওয়া চাই, অনুবাদ হলে চলবে না। যার গল্প আমাদের বিচারে সব চেয়ে ভাল হবে সেই পাবে পুরস্কার। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে, পূর্ণ করে, যুড়ে দিতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। লেখা ২৯শে পৌষের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

কুপন
রামধনু
পুঃ অগ্রহায়ণ ৫৯

নাম—
ঠিকানা
বয়স—
নিজে গ্রাহক কিনা—

— পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। —

বিশ্ব পরিচয়

পৃথিবীর সকল দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস সহ পাঁচশতাধিক একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ ৮৲

দশ বছর পরে পুনরায় ছাপা হইল।

বিশ্বকথা সিরিজ

সোভিয়েৎ দেশ ১।০

শ্রীপ্রভাবতী দেবীর

কৃষ্ণা-সিরিজ

(মেয়েদের অ্যাডভেঞ্চার)

প্রথম-গ্রন্থ :—

কারাগারে কৃষ্ণা ১৷৷০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

বিচিত্রা-সিরিজ

(ডিটেকটিভ ও অ্যাডভেঞ্চার)

প্রথম গ্রন্থ :—

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন

অনুবাদ সাহিত্য

অলিভার টুইষ্ট	১৷৷০
ব্ল্যাক অ্যারো	১৷৷০
ট্রেজার আইল্যাণ্ড	১৷৷০
টেল্ অব্ টু সিটিজ	
অ্যাডভেঞ্চার অব মার্কো পোলো	১।০
কাউণ্ট অব মন্টিক্রুষ্টো	১৷৷০
ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড	১৷৷০

শিশু-মাসিক

শুকতারা

প্রতি সংখ্যা—	।৵০
বার্ষিক—	৪৲

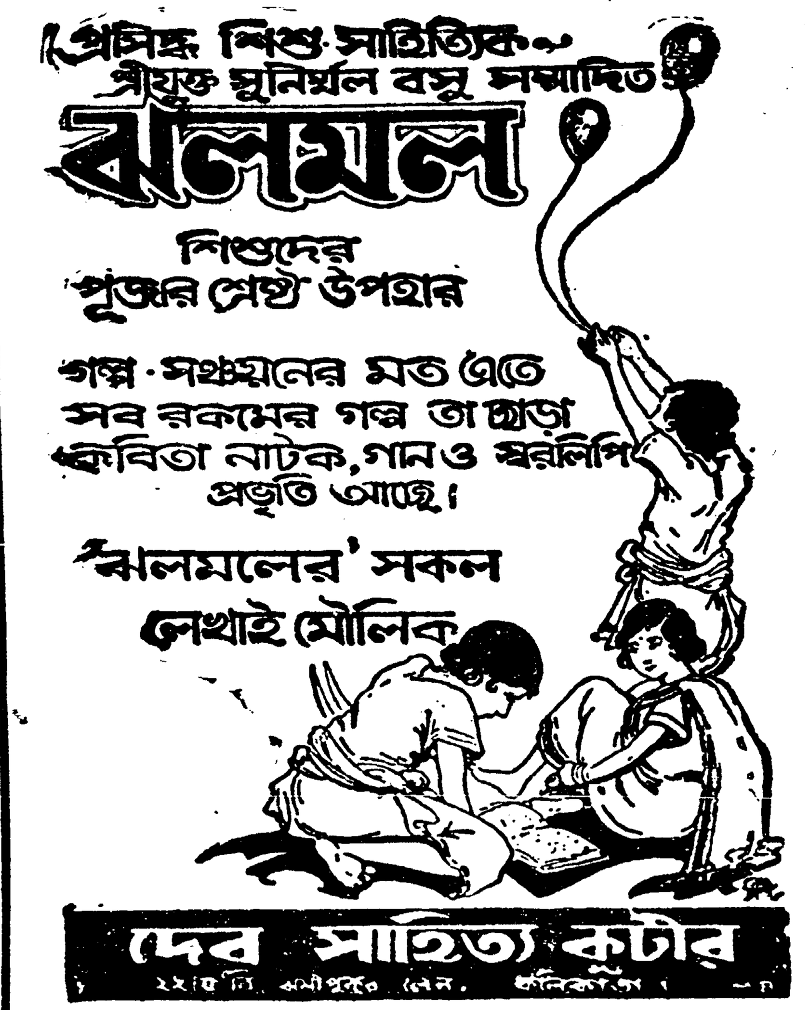

১৬ খানি রঙ্গিন ছবি ও অসংখ্য রেখাচিত্রে পরিশোভিত দাম – ৩৲

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প সঞ্চয়ন
আলো দিয়ে গেল
বাঁধা—২৲

*

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

বিশ্বকথা সিরিজ

জার্ম্মান দেশ ১।০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

চতুর্দশ গ্রন্থ :—

কমলাকান্তের দপ্তর ১৲

অমর বীর সিরিজ

দশম গ্রন্থ :—

বারীন ঘোষ ৷৷০

ভ্রমণ, শিকার ও অ্যাডভেঞ্চার

আকাশ গঙ্গা	১৷৷০
দুর্গমের বিভীষিকা	১৲
সুন্দর বনের শিকারী	১৲
আবার যখের ধন	১।০
হিমালয়ের বুকে	১৲
বামনের দেশ	৸০
দৈত্যপুরী	৸০

শিশুনাটক

সিপাহী বিদ্রোহ	১৲
কেদার রায়	৷৷৵০
বীর শিবাজী	৷৷৵০
স্বামীজী	৷৷৵০
স্বাধীনতা জাগলো	৷৷০
জাগোরে ধীরে	৷৷৵০

দেবসাহিত্য কুটীর * * * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অব্ দি মোহিকান্স্	৷৷৵০

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১৷৷০
সোনার হরিণ	১৷৷০
নূতন পুরাণ	৸৵০
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত

অলিভার টুইষ্ট	৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

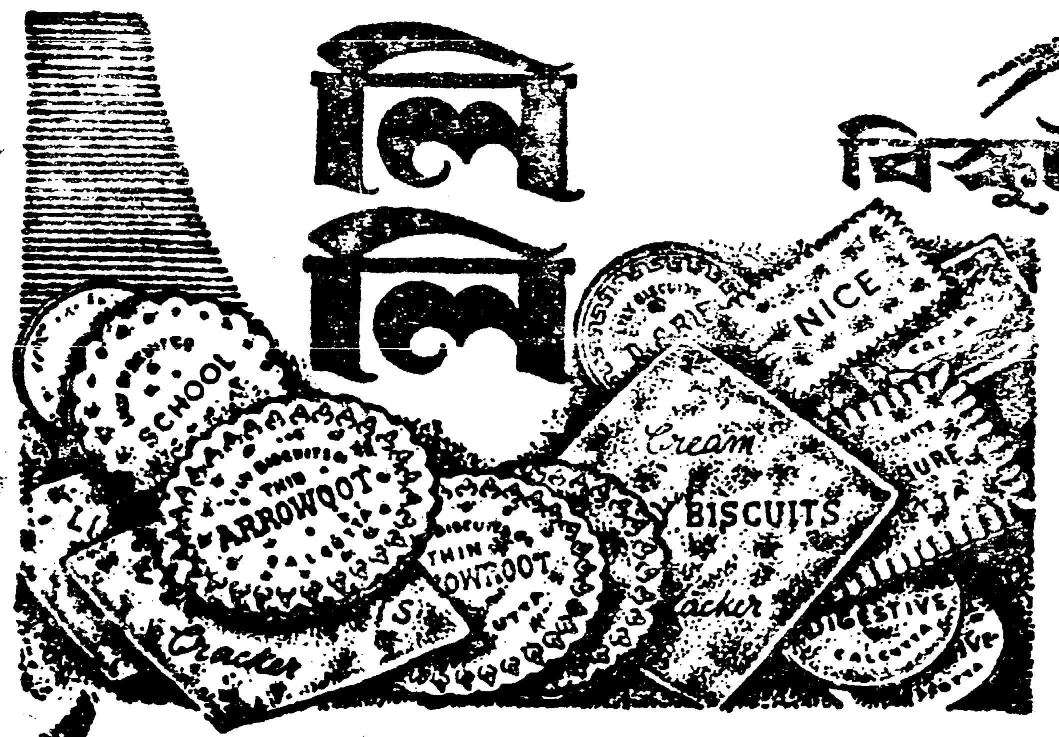

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন ক্রীম,
ক্যাণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই

[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাল এডুকেশন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত]

১। মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু	...	৪৮০
*২। গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১॥০
*৩। মাঞ্চুসেনের অ্যাডভেঞ্চার— „	...	৮০
*৪। ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস	...	১।০
*৫। „ আইনষ্টাইন— „	...	১।০
৬। „ মার্কনি— „	...	১।০

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

চয়নিকা

মাসিক পত্রিকা

নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

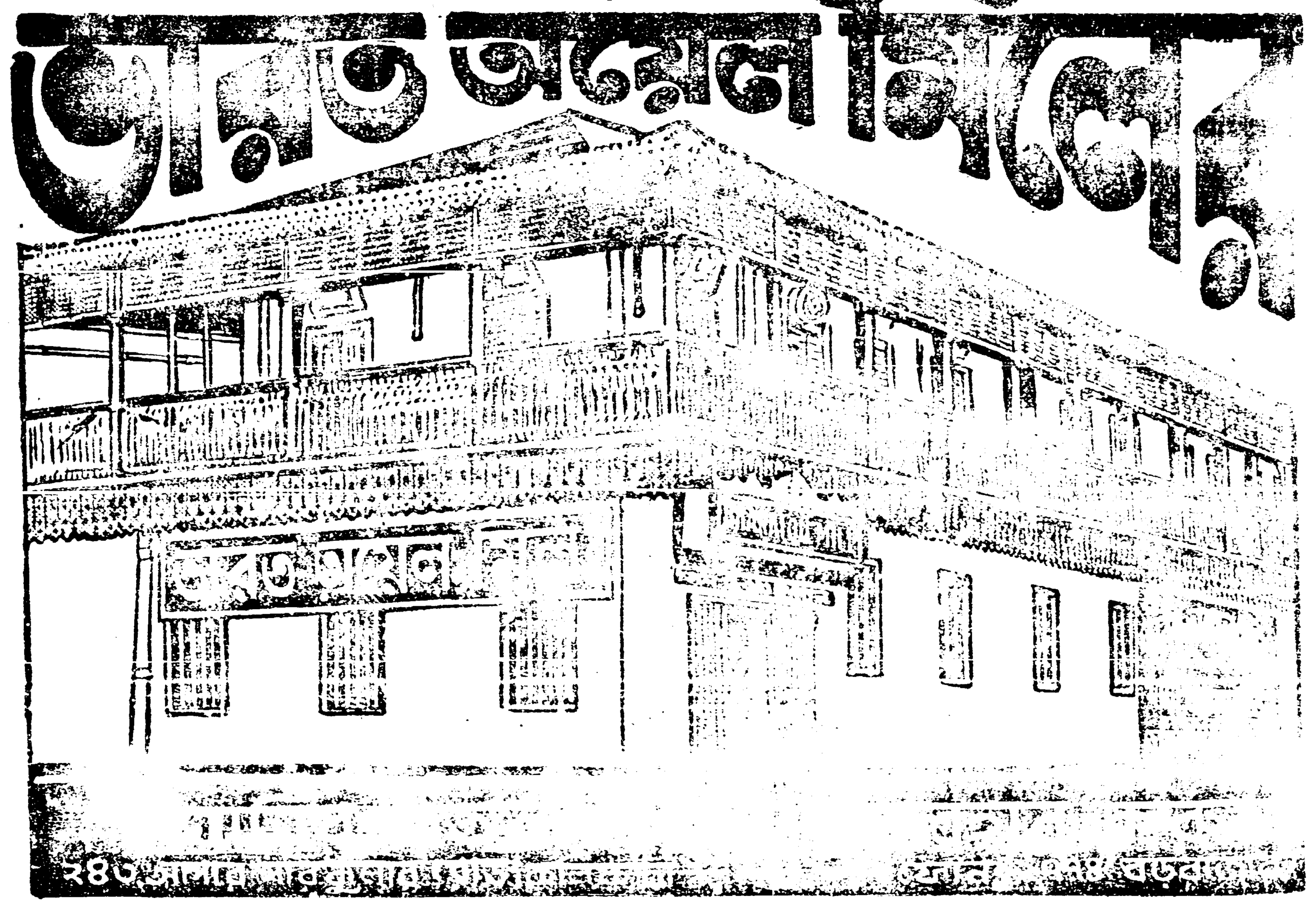

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কালকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রামধনু—

স্বামীজীর জন্মদিনে

রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৫৯ { ৯ম সংখ্যা

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গঙ্গামাটির মানুষ, পূর্ণ মনুষত্বে বুক,
সম্পদ লয়ে করিয়াছ কৌতুক।
তব জাতিপ্রেম অগাধ অপরিমেয়,
তোমার চক্ষে কেহই ছিল না হেয়,
ধর্ম্মেই তব আনন্দ, আর—
দানেই তোমার সুখ।

মানাতো বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হলে তুমি,
ধন্য হইত, পুণ্য হইত ভূমি।

যদি তুমি পেতে কুবেরের ভাণ্ডার,
তৃপ্তি হইত দানের আকাঙ্ক্ষার,
অতৃপ্ত তব দানের পিয়াসা
বহে বায়ু মৌশুমী।

তুমি নৈষ্ঠিক উদার হিন্দু, বিশ্বাসী বৈষ্ণব,
ভবনে তোমার নিতি নব উৎসব।
কৃত্রিমতার কোথাও ছিল না লেশ,
মনের কোণেও ছিল নাকো বিদ্বেষ,
তোমার মতন মানব মানব-
জাতির যে গৌরব।

শুনি নি তেমন অতি দীন হীনে আত্মীয় বলে ডাকা,
স্নিগ্ধ মমতা, মধুরতা তাহে মাখা।
অন্তর তব অমূল্য ধনে ধনী,
তুমি মণীন্দ্র, স্নেহের স্পর্শমণি,
বিধির দত্ত রাজ-টিকা তব
প্রশান্ত ভালে আঁকা।

দেখেছি তোমাতে পুণ্যের প্রভা, শুচিতার পরিবেশ,
আলোকিত করে ছিলে তুমি সারা দেশ।
তপস্যা তব সাধক, আত্মভোলা!
গোটা দেশকেই শিক্ষিত করে তোলা,
বৃহৎ বাঙ্গালী—ছিল না তোমাতে
ক্ষুদ্রতার যে লেশ।

তুলনা ছিল না তোমার বিনয়, তোমার আতিথ্যের,
আয়োজন যেন রাজসূয় যজ্ঞের।
দরদী, মরমী, মানুষের মহারাজা!
হৃদয় পূজার পদ্মের মত তাজা,
তব সন্নিধি এনে দিত মনে
বিশুদ্ধি তীর্থের।

ভৌতিক সিন্দুক

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

৩

পরদিন রাত্রে·· ···

হঠাৎ খট্ করে একটা অস্পষ্ট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চুপ করে খানিকক্ষণ শুয়ে রইলাম, তারপর চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে এলাম। অন্ধকারে যদিও দৃষ্টি চলে না তবুও মনে হ'ল তরল অন্ধকারের মধ্যে একটা সঞ্চরণশীল ছায়ামূর্ত্তি। মূর্ত্তিটা যেন অত্যন্ত লঘুপদে নিঃশব্দে চুপিচুপি ছায়ার মত চলে যাচ্ছে গুদাম ঘরের দিকে।

তাড়াতাড়ি কম্বলটা তুলে সেটাকে বেশ করে গায়ে চাপিয়ে নিয়ে চুপি চুপি মূর্ত্তিটাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

টানা লম্বা গলিপথটা রাতের নিঃসঙ্গ আঁধারে খা-খা করছে। চোরের মত পা টিপে টিপে মূর্ত্তিটা নিঃশব্দে শিকারী বিড়ালের মত এগুতে লাগল, তারপর চকিতে একবার চারিদিকে চেয়ে গুদাম ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মূর্ত্তিটা হেঁট হয়ে কি যেন করছে।

কিছুক্ষণ পরেই ছায়ামূর্ত্তি আবার বেরিয়ে এল। এদিকে অন্ধকারে হঠাৎ কিসে যেন আমার পা লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা হুড়মুড় করে আমার সামনে পড়ে গেল। চকিতে মূর্ত্তিটা ফিরে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় এঞ্জিনের আগুনের এক ঝলক আলো আমার মুখে এসে পড়ায় ক্ষণিকের জন্য আমার দৃষ্টি রুদ্ধ হ'ল। যখন চোখ খুললাম তখন চারিদিক ফাঁকা, কেউ নেই কোথাও। মূর্ত্তিটা যেন যাতুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে! অগত্যা কিছুক্ষণ ঘোরা-ঘুরির পর নিজের কেবিনে ফিরে এলাম।

বিছানায় শুয়েও অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা মস্তিষ্কে ঘূর্ণি-বায়ুর মত পাক দিয়ে ফিরতে লাগল।···ঐ ছায়ামূর্ত্তি কে?···সে কেন গিয়েছিল ও ঘরে?··· তবে কি খুনী আমাদের জাহাজেরই কেউ?···ঐ কি খুনী?·· সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় চোখের পাতা হু'টি বুজে এলো।

সহসা একটা অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দে আবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হ'ল কেবিনের বাইরে কে যেন আস্তে আস্তে চলে বেড়াচ্ছে। পোর্টহোলটা খোলা ছিল, তার মধ্যে দিয়ে তারায় ভরা খোলা কালো আকাশের এক টুকরো দেখা যাচ্ছিল। সহসা একটা চলন্ত ছায়া এসে পোর্টহোলটার সামনে দাঁড়াল। একটু পরেই আবার সরে গেল।

হু'হাতে ভাল করে চোখ হুটো রগড়ে নিলাম। নাঃ, এ স্বপ্ন নয়!···হঠাৎ মনে হ'ল দরজাটা যেন একটু ফাঁক হয়ে গেল। তার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকল একখানা হাত।

আমার সমস্ত স্নায়ু তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি যতটা সম্ভব প্রখর করে ঘরের ভিতরকার সব কিছু দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আগাগোড়া সাদা চাদরে ঢাকা একটা মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ভিতরে এসে ঢুকল; চকিতে একবার চারিদিকে চেয়ে টেবিলের দিকে চলে গেল। ঘস্-স-স্ শব্দ শুনে বুঝলাম মূর্ত্তিটা ড্রয়ার খুলছে। অন্ধকারেই ও যেন খানিকক্ষণ কি খুঁজল। একটু পরে ড্রয়ার বন্ধ করে কেবিনের দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

আমি এতক্ষণ আড়ষ্টভাবে শুয়েছিলাম, কি করব কিছুই ভেবে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু এবার মন ঠিক করে ফেললাম। তখনই উঠে ছায়ামূর্ত্তিকে অনুসরণ করতে লাগলাম। সাদা মূর্ত্তিটা ততক্ষণ গলিপথ ধরে চলেছে।

অনুসরণ করতে করতে লক্ষ্য করলাম যে এ সাদা মূর্ত্তি আর আগেকার ছায়ামূর্ত্তি এক নয়। এর হাঁটার ভঙ্গীটা অন্য রকম।

একটু পরে সাদা মূর্ত্তিটা গুদাম ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

আমি আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম। সেখান থেকে গুদাম ঘরের ভিতরটা অল্প অল্প দেখা যায়।···সহসা সেই সময় কোথা থেকে যেন শত শত যক্ষ জেগে উঠে ছুটে আসতে লাগল সেই রত্ন-সিন্দুকের দিকে। তাদের পায়ের চাপে সমস্ত জাহাজটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। সমস্ত গুদাম ঘরটা প্রতিধ্বনিত হয়ে শব্দ হতে লাগল—ধুপ-ধুপ্, ধুপ্-ধুপ্, ধুপ-ধুপ্,··· শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিক আবার নিস্তব্ধ। তারপরেই অন্ধকার রাত্রির কঠিন নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল—গুড়ুম!

পরক্ষণেই একটা দীর্ণ আর্ত্ত চীৎকার স্তব্ধ নিশীথিনীর শান্ত বুকখানাকে কাঁপিয়ে জেগে উঠল—আ-আ-আ-া-া-আ!

টর্চটা বাগিয়ে ধরে অন্ধকার গুদাম ঘরের দিকে ছুটলাম। অসীম দুঃসাহসের সঙ্গে যখন সেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম—দেখলাম একজন কে যেন মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। টর্চের আলো ঘরের চারিদিকে ফেলে দেখলাম ঘরে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই···ঘর শূন্য···

টর্চের আলো মৃত ব্যক্তির মুখের 'পরে পড়তেই বিস্ময়ে আতংকে চমকে উঠলাম। লোকটা আর কেউ নয়—পেণ্টার। অদূরে পড়ে আছে একটা সাদা চাদর।

পিস্তলের আওয়াজ ও চীৎকার শুনে প্রায় সকলেই এসে গিয়েছিল। আমাকে দেখে সকলেই নানা প্রশ্ন করতে লাগল। সংক্ষেপে সব কথাই বললাম। হঠাৎ একজন বাবুর্চি বলে উঠল, "হুজুর, ঘরময় সাদা সাদা ও কি?"

সত্যিই তো, এতক্ষণ কেউই তা লক্ষ্য করে নি। সমস্ত ঘরময় সাদা সাদা কিসের গুঁড়ো যেন ছড়ান। ডাক্তার একটা কাগজে খানিকটা গুঁড়ো নিয়ে পরীক্ষা করল। খানিকক্ষণ পরে মুখ তুলে বলল, "পাউডার।"

"ঘরময় পাউডার ছড়াল কে?" বিস্মিত ক্যাপ্টেন বললেন।

কে আর তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবে? সকলেই চুপ করে রইল। সহসা মৃণাল দু' হাতে

ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলল, আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে থাকুন, "আমি আগে গিয়ে একটু দেখে আসি।"

হেঁট হয়ে মৃণাল কি যেন খুঁজে বেড়াল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, "আপনারা ভিতরে আসতে পারেন।" সকলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। মৃতদেহের দিকে বারেক চেয়ে ডাক্তার অস্ফুট স্বরে বলল, "দি সেম মার্ডার···দি সেম পেজিসন··· "

সাদা চাদরটার দিকে নির্দেশ করে ক্যাপ্টেন বললেন, "তুষার, তোমার দেখা সেই সাদা মূর্ত্তিই বোধ হয় খুনী স্বয়ং। পালাবার সময় চাদরটা ফেলে পালিয়েছে।"

"খুনী আমার ঘরে কেন ঢুকেছিল?"—আমি প্রশ্ন করলাম। "আর প্রথম ছায়ামূর্ত্তিটাই বা কে?"

"ও প্রথম ছায়ামূর্ত্তি আর দ্বিতীয় সাদা মূর্ত্তি একই লোক, মানে খুনী। সে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।"—ক্যাপ্টেন বললেন।

"না ক্যাপ্টেন, প্রথম ছায়ামূর্ত্তি আর দ্বিতীয় সাদা মূর্ত্তি এক লোক নয়। তবে দু'জনের মধ্যে যে কোন একজন খুনী, এতে কোন সন্দেহই নেই।" আমি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলাম।

সহসা মৃণাল বলল, "একটা গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। কে কাকে গুলি করল?"

"মৃত ব্যক্তির হাতে একটা পিস্তল রয়েছে।"—বলল ডাক্তার।

ক্যাপ্টেন মৃত পেণ্টারের হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, "এতে পাঁচ রাউণ্ড গুলি আছে।"

পিস্তল দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। "আরে, এটা তো আমার পিস্তল! ওতে ছ' রাউণ্ড গুলি ছিল।"

গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেন বললেন, "হুঁ, তবে এই পিস্তল থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে এবং মনে হয় পেণ্টারই গুলি ছুঁড়েছে। কাকে দেখে সে গুলি ছুঁড়ল? এ তো অদ্ভুত ব্যাপার!"

"সত্যিই অদ্ভুত।"—ডাক্তার বলে উঠল, "আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, আমি প্রথমেই লক্ষ্য করি যে মৃতের চারিপাশে পাউডার ছড়ান রয়েছে অথচ মৃতের ধারে কাছে বা দূরে কোথাও কোন পদচিহ্ন নেই। ছোরার আঘাত দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আঘাত করা হয়েছে খুবই নিকট থেকে।···আশ্চর্য্য! তবে কি হত্যাকারী হাওয়ায় উড়ে এসে খুন করে গেল, না সে পাখীর পালকের চেয়েও হালকা?"

"কিন্তু ডাক্তার," আমি বললাম, "খুনের একটু আগে আমি এই ঘরেই হত্যাকারীর পদশব্দ শুনেছি। সে মানুষের পায়ের শব্দ নয় মানুষের পায়ের শব্দ অত ভারী হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য, পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনলাম অথচ ঘরের ছড়ান পাউডারে কোন পদচিহ্নই নেই!"

ক্যাপ্টেন বললেন, "আমার মনে হয় পেণ্টার আগে থাকতে ঢুকে সিন্দুকটা খোলার চেষ্টা করছিল। সাদা মূর্ত্তিকে দেখে সে ভয় পেয়ে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু ভয়ের জন্য ও উত্তেজনা বশতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাদা মূর্ত্তি তাকে ছোরার আঘাত করে এবং পরে চাদর ফেলে পালিয়ে যায়।"

"কিন্তু ক্যাপ্টেন, তা' হলে তো পাউডারে তার পায়ের ছাপ পড়ে যেত। আর আপনারা সেই অমানুষিক পদশব্দের কথাও ভুলে যাচ্ছেন!" ডাক্তার বলল।

শাস্ত্রশিক্ষার পর কবি একদিন গেলেন গৌড়েশ্বরের দরবারে কাব্য শোনাতে। এই 'গৌড়েশ্বর' যে তখন কে ছিলেন আজ পর্য্যন্ত তা কেউ সঠিক বলতে পারেন নি ; তবে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন তিনি ছিলেন রাজা গণেশ। রাজাই কবিকে যথেষ্ট সমাদর করে রামায়ণ রচনা করতে অনুরোধ করলেন—

"সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোগ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
* * * *
বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান॥"

কৃত্তিবাসের পরে আরো অনেক কবি বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে অনন্তদাসের পুঁথিখানিও বেশ প্রাচীন। পরের যুগে চন্দ্রাবতী নামে পূর্ব্ববঙ্গের একজন মহিলা কবি একখানা সুন্দর রামায়ণ রচনা করেন। হিন্দী ভাষায় এই রামায়ণ রচনা ক'রে সারা ভারত যুড়ে নাম করেছেন তুলসীদাস ; ভারতবর্ষে আজও সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক এই বইখানিই পড়ে থাকেন।

মহাভারতের গল্প

রামায়ণের মত মহাভারতের গল্পকেও বহু কবিই অনুবাদ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে সঞ্জয় নামে একজন কবির একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে ; পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সেখানিই বাংলা ভাষায় প্রচীনতম মহাভারত। সঞ্জয় ছাড়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারতও অতি প্রচীন পুঁথি।

বাংলার বিখ্যাত সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন পরাগল খাঁন। সেনাপতি বিজয়াভিযানে চট্টগ্রামে গিয়ে সেখানকার কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাছে মহাভারতের গল্প শুনতে চান। এই ভাবেই সৃষ্টি হয় কবির মহাভারত। পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটিখাঁন সেনাপতি হ'ন। তিনিও ছিলেন হিন্দু সংস্কৃতির উৎসাহদাতা। তাঁর অনুরোধে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, এ সব বইয়ের কোনোটির নামই মহাভারত ছিল না, তাদের নাম ছিল 'পাণ্ডব বিজয়', 'ভারত পাঁচালী' প্রভৃতি।

ওঁরা দু'জন ছাড়া আরো কয়েকজন কবি সে সময়ে পাণ্ডব বিজয় কাব্য লিখতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় রামচন্দ্র খাঁন, দ্বিজ রঘুনাথ প্রভৃতির। আমরা যে মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত তার অনুবাদ করেন সর্বপ্রথম কাশীরাম দাস। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলের সিঙ্গিগ্রামে কবি ষোড়শ

শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কমলাকান্ত, ভাইদের নাম ছিল কৃষ্ণকিঙ্কর, গদাধর প্রভৃতি। যেমন—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস—পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হবো কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

এখন মজা হচ্ছে এই যে কাশীরামরা তিন ভাইই ছিলেন বেশ ভালো কবি। বড় ভাই কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণবিলাস নামে একখানি সুন্দর কাব্য লিখেছেন। ছোট ভাই গদাধরও কম যান না, তাঁর কাব্যের নাম 'জগন্নাথমঙ্গল'। অনেকে বলেন যে কাশীরাম পূরোপূরি সমস্ত মহাভারতটা লিখে যেতে পারেন নি, তাঁর পুত্র নন্দরাম দাস নাকি বাকিটা শেষ করেন—

"আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥
ধন্য হইল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥

মহাভারতের মধ্যে মূল গল্প ছাড়া অনেক সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট গল্প আছে ; সেগুলির কয়েকটি তোমরা রামধনুর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের কাছে শুনেছ।

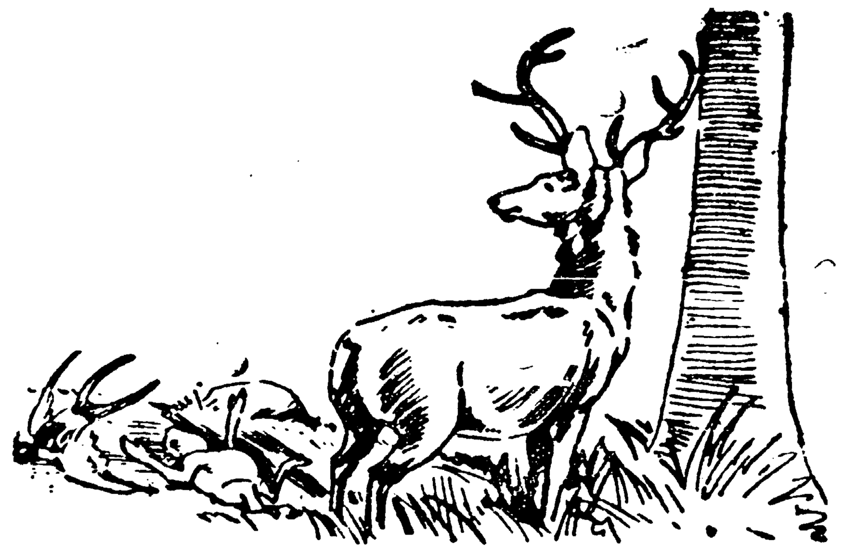

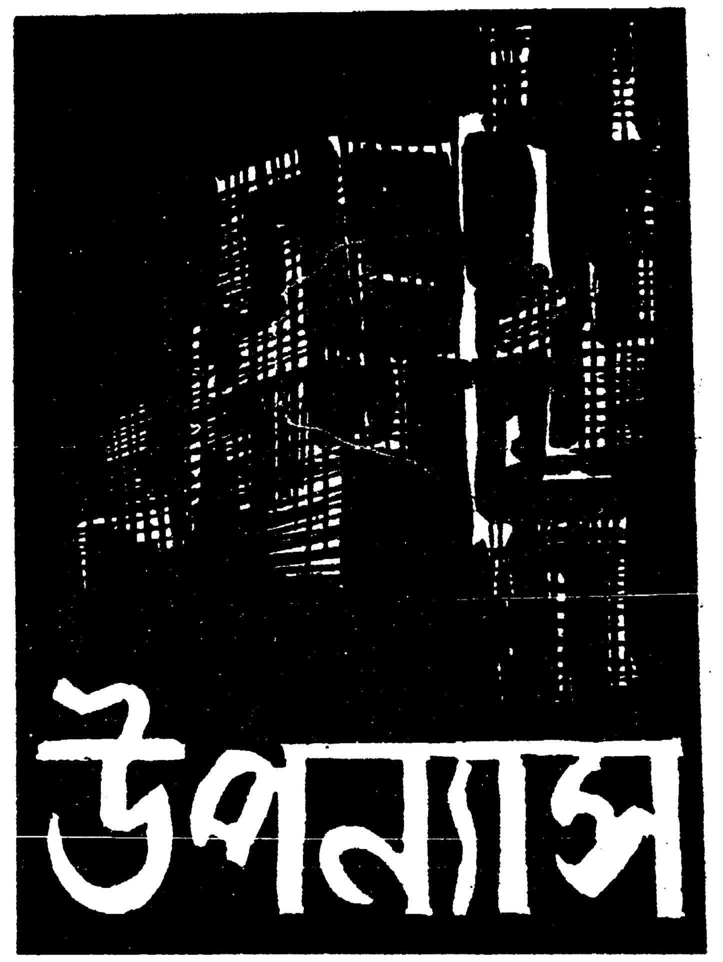

বক ধার্মিক

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ

২

এ সব কিছুই বানানো নয়, সব একেবারে সত্যি।

সহরটা ছিল পাহাড়ে, দারুণ শীত পড়ত। রাত্রে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনতাম বাড়ির পিছনে, ছোট নদীর ওপারে জঙ্গলের ভিতরে শীত লেগেছে ব'লে হুতুম প্যাঁচা ডাক্‌ছে, আর দূর থেকে দু'-একটা শেয়াল ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া ব'লে চ্যাঁচাচ্ছে। তার চেয়েও স্পষ্ট শুনতে পেতাম আমাদের বাড়ির চারদিকে কারা যেন পা টিপে টিপে হেঁটে বেড়াচ্ছে। একবার সন্ধ্যাবেলা বাবা ছুটে গিয়ে এক ব্যাটার গলা টিপে ধরেওছিলেন। সে ত' মহা চেঁচামেচি সুরু ক'রে দিল—"আরে সাহেব, ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, হামি থানার হেড্ জমাদার আছে।" আলো এনে দেখা গেল সত্যিই তাই, শেষ পর্য্যন্ত বাবা বিরক্ত হ'য়ে তাকে ছেড়েই দিলেন। চোর-টোর কেউ একদিন চোখেও দেখল না। অথচ রাতারাতি কমিশনার সাহেবের বাগানের সমস্ত আলুগাছ কে উপড়ে নিয়ে চলে গেল। তা'তে কত আলু! এক একটা গাছে ইয়া বড়া বড়া কুড়ি-বাইশটা ক'রে আলু ছিল। এর জন্য থানার ইন্-চার্জ বদলী হ'য়ে গেলেন পর্য্যন্ত, নাকি কোথায় কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু চোর-টোর কেউ ধরতে পারল না।

নতুন যিনি এলেন, তিনি এসেই সহরে নতুন যারা এসেছে তাদের সকলের নাম সব টুকে নিলেন। জগদীশের পিসিমার গুরুদেব এই সময় প্রতি বছরই এসে দশ দিন লুচী-পাঁঠা, ক্ষীর-সর খেয়ে, মোটা মোটা দু'খানি কম্বল নিয়ে চলে যান। এ বছর যেই না টিকিশুদ্ধ দেখা দিয়েছেন অমনি ক্যাঁক্ ক'রে পুলিশরা ধরেছে তাঁকে। আমাদের ক্লাশের সব চেয়ে ভালো মেয়ে পুঁটি ওঁদের পাশের বাড়ি থাকে। সে বল্‌ল, পিসিমার সে কি রাগ! "আমার অমন সাত-ন'র গেল, বলে তারই শোকে গেলাম! আবার কিনা শ্রীভগবানকে ফাটকে দিয়েছে।' এমন দেশে চুরি হ'বে না ত' কোথায় হ'বে? দেখো, কক্ষণও চোর ধরা পড়বে না, আর আমার সাত-ন'রও পাওয়া যাবে না। হাউ হাউ।"

যখন বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, কমিশনার সাহেবের বাড়িতে সকলের নেমন্তন্ন হ'ল। বাগানের মাঝখানে খোলা জায়গায় সকলকে ছেঁড়া সতরঞ্চিতে বসিয়ে চা আর আলুভাজা খাইয়ে দেওয়া হ'ল। তার পর সকলে মিলে স্থির করা হ'ল যে একা পুলিশের কম্ম নয়, সহর-শুদ্ধ সকলকেই কাজে নেমে যেতে হ'বে, ইত্যাদি।

বাবা বাড়ি ফিরবার পথে একটা মোটা খাতা কিনে, বাড়ি এসেই আমার নতুন সবুজ কলমটা চেয়ে নিয়ে চোর ধরবার লোকদের নাম লিখ্‌তে বসে গেলেন। কলমটা দিয়ে আবার গল গল ক'রে কালি বেরোয়, নতুন খাতায় কালি মেখে-টেখে বাবা ত' রেগে একেবারে কাঁই। শেষটা পেন্‌সিলেই লেখা হ'ল। গুপে আর আমি স্কুলে নাম দেব ব'লে আমরা ছাড়া সকলের নাম ১নং, ২নং ক'রে লেখা হ'ল। আমাদের শঙ্কর ঠাকুর ত' নাম লিখিয়ে সটাং নিজের ঘরে গিয়ে জিনিষ-পত্র বাঁধতে সুরু করল। "আজ নাম্‌অ লিগিলুঁ; কাল ধরি নিলুঁ!" ওকে বোঝাতেই মা'র আর জ্যেঠিমার আধ ঘণ্টা লাগ্‌ল। শেষটা ভারী খুসি হ'য়ে রাত্রে শোবার সময় মাছ-কাটা বঁটিটা মাথার কাছে নিয়ে শু'ল।

পরদিন গুপে স্কুল থেকে ফিরে এসে আবার বল্‌ল—"অপূর্বদা'রা টের পেয়েছেন, এ সবই কোনও মেয়ের কাজ। তোদের স্কুলের মাষ্টারণীদের সাবধান হ'তে বলিস্।" আমিই বা ছেড়ে দেব কেন, একটা মানসম্মান আছে ত'? বল্‌লাম—"যার বিশে ডাকাতের মত চেহারা সে যেন কথা বল্‌তে না আসে।" গুপে রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে বল্‌ল, "তোদের লাবণ্য দিদিকে ওয়ার্ণ ক'রে দিস্।" আমিও রেগে বল্‌লাম—"অপূর্ব লোকটাকে উইল লিখে রাখতে বলিস্।" এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়েদের স্কুলে আর ছেলেদের স্কুলে দু'টো দল গড়ে উঠ্‌ল, যারা পরস্পরকে দেখতে পারত না।

গুপে হ'ল আবার সাব-ক্যাপ্টেন। গলায় একটা দড়ি দিয়ে একটা বাঁশি ঝুলিয়ে বাড়ি এল। দেখে হেসে বাঁচি নে। এদিকে আমাদের স্কুলেও রীতিমত কাজ আরম্ভ হ য়ে গেছে, ছোট ছোট দল ক'রে ফেলা হ'য়েছে। আমি একটা দলের লীডার হয়েছি। একটা লাল রিবনের ব্যাজ্‌ও পেয়েছি, আমার পেন্‌সিল-বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি; গুপেকে দেখাতে বয়ে গেছে।

এ সবের মধ্যে আবার অ্যানুয়েল পরীক্ষা হ ল। গুপেরা হেডমাষ্টার মশাইএর কাছে গেছিল—নাকি গোলমালে প্রেপারেসন হয় নি, এ বছর পরীক্ষা না হোক। তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছিল। ঠিক হয়েছিল। আমরা যে ও কথা একদম ভাবি নি তা নয়, কিন্তু গুপেদের ব্যাপার দেখে চেপে গিয়েছিলাম।

অ্যানুয়েলের পর বড় দিনের ছুটি ছিল বারো দিন, তার মধ্যে কাজ হাসিল করতে পারলে কি মজাটাই না হয়! মা জ্যেঠিমাদের নামও বাবা লিখে নিয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলা জগদীশদা'র পিসিমা একটা মোষের মত রং এর আলোয়ান গায়ে দিয়ে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আস্‌তেন। তখন মা-জ্যেঠিমাদের কাজকর্ম্ম হ'য়ে গেছে, সবাই হাত-মুখ ধুয়ে চুলটুল বেঁধে একটা করে নীল আলোয়ান জড়িয়ে জ্যেঠিমার শোবার ঘরের তক্তপোষের উপর গোল হ'য়ে বস্‌তেন। আজকাল বড্ড শীত পড়ে গেছে, বাগানে আর বসা চলে না। কত রকম জল্পনা-কল্পনাই না চল্‌ত ওঁদের। আবার মাঝে মাঝে বাইরে একটা পাতা খসার শব্দ শুন্‌লেই চম্‌কে চম্‌কে উঠতেন—"ও দিদি, ও আবার কেমন-ধারা আওয়াজ!" জ্যেঠিমার ত' অন্ধকারের পর জান্‌লার কাচ দিয়ে বাইরে তাকাতেই ভয় করে, উনি আবার চোর ধরবেন! মা'কে বল্‌তেন, "ছোটবৌ, যা, দেখে আয়।" আমার মা বন্ধ জান্‌লার পর্দাটা একটু সরিয়ে টুক্ করে একবার দেখে বল্‌তেন, "কই, কিছু না ত'! পাতা পড়ছে বোধ হয়।" ফিরে এসে জগদীশদা'র পিসিমাকে একদিন বলে

বস্‌লেন—"তুমি ত' দিদি, সবই জান। তবে কেন পুলিশের কাছে সব কথাটা খুলে বল না? ঐ যার কাছ থেকে তোমার বাবা জুয়ো খেলে সাতন'র জিতে নিয়েছিলেন, তুমিই ত' বলেছিলে যে সেই লোকটা প্রতিজ্ঞা করেছে ঐ মালা নাত্‌নীর বিয়েতে দেবেই দেবে। তা'কে কেন ধরিয়ে দিচ্ছ না?"

"আরে, কি যে বলিস্! সে ত' কোন্ কালে স্বর্গে গেছে। পৃথিবীর নিয়মই—হাড়পাজিরা বেশীদিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে না। তাকে আবার কী ক'রে ধরিয়ে দেব?" মা বল্‌লেন—"আহা, তার ছেলেকে ত' জেলে দিতে পার। সেও ত' আর মরে যায় নি।" "গেছে রে গেছে। পাজির গুষ্টি। সব ক'টা স্বর্গে গেছে। আছে ঐ নাত্‌নী, আর গোটা দুতিন নাতি। সব সমান বদমায়েস।"

"সে কি দিদি, তুমি চেনো নাকি?"

"চিনবার দরকার হয় না। ও বংশের কেউ ভালো হ'তে পারে না। আরে, আমার বাবা বেচারা না হয় একটু জোচ্চুরী করেই জিতেছিলেন। অমন কে না ক'রে থাকে তোরাই বল,—বিশেষ ক'রে যখন অমন একখানি মালা পাওয়া যাচ্ছে? সবাই করে রে! অথচ সে হতভাগা বুড়ো এমন করতে লাগ্‌ল যেন বাবা বেচারী কত না অন্যায় করেছেন। সেই জন্যই ত' বাবা কলকাতা ছেড়েছুড়ে, এখানে এসে বাড়িটাড়ি ক'রে, শেষ বয়সটা নিরিবিলি ভগবানের নাম করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। হরি নারায়ণ।"

মা আবার বল্‌লেন—"নাতি নাত্‌নীদের হাজতে দেওয়া হচ্ছে না কেন?"

"আরে, তুই ত' ভারী বোকা! তা' হ'লে যে পুলিশকে জোচ্চুরী ক'রে মালা জেতার কথা বলতে হয়। তবেই আর সাতন'র পেয়েছি! চোরের হাত থেকে যদি বা পাওয়া যায়, পুলিশের হাত থেকে নেভার।" পিসিমা উঠে পড়েন, গায়ের আলোয়ানটা ভালো ক'রে জড়িয়ে চাপা গলায় বলেন—"জগদীশ একটা নতুন চাকর রেখেছে।"

মারা আঁৎকে উঠে বলেন—"না না, দিদি, আজকাল চারদিকে যে রকম কাণ্ড হচ্ছে, অচেনা লোক না রাখাই ভালো।"

পিসিমা হেসে বল্‌লেন—"তোদেরও যেমন বুদ্ধি! আরে, লোকটা একজন পাকা গোয়েন্দা। টিক্‌টিকি গো! কই, শঙ্করা আমাকে একটু এগিয়ে দিক্ তা' হ'লে।"

(ক্রমশঃ)

ফিরপোতে খানা খেয়ে বাড়ী ফেরে হাঁদু রায়,
খুসী মনে বারে বারে মেনুটারে আওড়ায়।
হঠাৎ পেটেতে তার
ঢুঁ মারে পাগলা ষাঁড়,—
ফিরপোর 'মেনু' ফুটপাথে একাকার হায়!

শ্রীকল্যাণী দেবী

কার দোষ?

শ্রীরেণুকা দেবী

হলদে, বেগুনি, নীল ইত্যাদি নানা রঙের বেলুনগুলো একটা গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় উড়িয়ে 'বেলুনওলা' এই ছোট রাস্তাটির উপর এসে দাঁড়াতেই, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল তাকে ঘিরে ধরলো। কেউ বা তখনি বাড়ী থেকে পয়সা এনে ফোলানো-অবস্থায়-থাকা বেলুনের মধ্যে থেকেই একটা নিয়ে দোলাতে আরম্ভ করে, আর কেউ কেউ আবার পাম্প-রত বেলুনওলার দিকে অধীর চিত্তে তাকিয়ে থাকে। মাণিকও সেই দলে দাঁড়িয়ে থাকে আর বলে, 'আমাকে একটা বেলুন দাও।' ওর দাদা সাতু কেবলি বলছে, 'আরে, ও বেলুন ভালো না। মাণিক, চলে আয়, পরে ভালো বেলুন কিনে দেবো।' মাণিক শোনে না, বলে, 'না হোক ভালো, আমি নেব।'

বেলুনওলা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তার সামনেই একটা পুরোনো বড় বাড়ীতেই মাণিকরা থাকে, একেবারে পেছনের দিকে। বড় বাড়ীটার দোতলা ও তিনতলায় বাস করেন বাড়ীর অধিকারী, আর অন্ধকার-আচ্ছন্ন একতালার ঘরগুলি, লম্বালম্বি ভাবে চারজন ও আড়াআড়ি আটজন থাকতে পারে এই ভাবে বিভক্ত করে ভাড়া দিয়ে, গৃহহীন—আশ্রয়হীন দরিদ্রদের কষ্টার্জিত অর্থের একটা সিংহাংশ ও তাদের স্বাস্থ্য দুইই তিনি দোহন করেন। এই বাড়ীরই সব চেয়ে নিকৃষ্ট, পেছনের দিকের একটা ঘরে মাণিকরা ভাড়া থাকে। মাণিকের মা জানতে পান যে সে বেলুনের জন্য ফন্দী করছে। তাঁর আর সহ্য হয় না। আর কি বা করবেন তিনি? দু'দিন আগে বাঁশীওলার কাছ থেকে বাঁশী নেবার জন্য তাকে চার পয়সা দাম দিতে হয়েছে। দু' পয়সার ডুমুর ও দু' পয়সার কলমী শাক দিয়েও যাকে বাজার চালিয়ে নিতে হয়, তার কাছে এই বেলুনের দাম দেওয়া যে অসম্ভব তা কে বুঝবে? তিনি ছুটে যান একেবারে রাস্তার উপরে, বালকবেষ্টিত 'বেলুনওলার'

সামনে থেকে মাণিককে টেনে নিয়ে আসেন সবেগে—তার পিঠের উপর প্রহার করতে করতে।

মাণিকের মার মুখের দিকে ভালো করে তাকালে দেখা যেত, মাণিকের চেয়েও শতাধিক পরিমাণ বেদনার ছাপ। ভগবানের কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে, সন্তানের কাছ থেকে, এমন কি বেলুনওলার কাছ থেকেও যে বেদনা তিনি পাচ্ছেন, তাই যেন স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। মনের সমস্ত দুঃখ-বেদনাই ভাগ্যের উপর দিতে দিতে ঘরের মধ্যে এসে, মাণিককে দু' হাত দিয়ে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন তিনি। মাণিক, তাঁর কত আদরের মাণিক, সাতুর দশ বছর পরে জন্মানোর জন্য শিশুহীন ঘরে মাণিককে সাতরাজার ধন মাণিকের মতই গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। গ্রামের মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন তাঁর স্বামী। বেশ ছিলেন তাঁরা; অভাব থাকলেও, অভাবের বেদনা-বোধ ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য ফেরীওয়ালার বহুরূপী প্রলোভনে অবোধ শিশুচিত্ত পীড়িত হ'ত না। কিন্তু গাঁয়ে ওঁরা থাকতে পারলেন কই? মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় যুক্তি দিয়ে, কিন্তু উদর? উদর যে অবোধ শিশুর চেয়েও অবুঝ। তাই তো বড় দু'টি ছেলেকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে কারখানায় চাকরীতে দিতে হ'ল।

আবার তাদের সস্তা র‍্যাশন, এক সঙ্গে থাকার স্বল্প ব্যয়ের জন্য আটাশ টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে মাণিকের বাবাকে কলকাতায় আসতে হ'ল। ম্যালেরিয়া-পীড়িত যে দেহ খোলা আলো-হাওয়া ও টাট্‌কা সব্জীর জোরে দাঁড়িয়ে ছিল, অনবরত টুইশনীর চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে ও মাঝে মাঝে অতি অল্প টাকায় অনেকগুলি ছাত্র পড়ানোর পরিশ্রমে তা ভেঙ্গে পড়লো। যে দশ টাকা মাইনে দেবে সে-ই বি. এ পাশ মাষ্টার চায়, তা ছাত্র যে শ্রেণীরই হোক না কেন।

গরীবের ঘরে একটা ভাগ্য বড় দরের; থাকাটা রাজোচিত না হলেও, রোগটা হয় রাজসিক। মাণিকের দাদার কারখানার ম্যানেজারের দয়ায় যাদবপুরে একটা ফ্রি বেড পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু ওষুধ আর ফলমূল—এই যে তাঁদের সাধ্যাতীত। তৃতীয় ছেলেটির সহযোগে কিছু কিছু কাগজ কিনে ঠোঙ্গাও তৈরী করেন তিনি, কিন্তু অভাব,—অভাব যেন আর যেতেই চায় না। সেই অভাবের তাড়নায়, তার মাণিক, অত আদরের মাণিকের কোমল দেহেও নির্ম্মম আঘাত করতে হচ্ছে তাঁকে।

মাণিকদের বাড়ীর ঠিক সামনেই, রাস্তার অপর দিকে, একটি বড় নূতন বাড়ী; বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন নির্ম্মলা দেবী। ধনীর বাড়ীর বধূ, অখণ্ড

অবসর। চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়েই দিন যাপন করেন। তাঁর ছেলেরা সব বড়। কেউ কলেজে পড়ে, কেউ চাকরী করে। তারা যেন তাঁর ছায়ার তল থেকে মুক্ত হয়ে রোদের মধ্যে মাথা উঁচু করে চলতে আরম্ভ করেছে। তাঁর মনের কোণে সঞ্চিত গোপন মাতৃস্নেহ মাণিকের কান্নার স্পর্শে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু কি করবেন তিনি? আহা, সামান্য চার পয়সার জিনিষ দিয়ে শিশুমুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটাবার শক্তিও ওদের নেই! একবার ভাবেন তিনি, কিনে দেবেন; আবার ভয় হয়, ওরা ভাববে ধনী বলে তিনি ওদের করুণা করছেন,—চার পয়সার একটা বেলুন কিনে দিয়ে তাদের অপমান করছেন। ঠিক সে সময়ে মাণিকদের বাড়ী থেকেই বার হয়ে আসেন আর একজন মহিলা, বারান্দায় দাঁড়ানো ধনী প্রতিবেশিনী নির্ম্মলার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কি ফন্দীবাজ ছেলে! কেনবার পয়সা নেই, তবুও বায়না, নিত্য বায়না করাই চাই।' ব'লে, বেলুনওলার কাছে গিয়ে একটা বেলুন কিনে, নিজের নাতির হাতে দিয়ে, সগর্ব্বে আর একবার উপরের দিকে তাকালেন। নির্ম্মলা দেবী ভাবলেন, হায় হায়, কই, সমব্যথীরাই কি দুঃখ বোঝে? এই একতলায় যারা বাস করে তারা সকলেই প্রায় সমান অবস্থার লোক। কেউ—কেউ কি পারলো না একটা বেলুন কিনে দিতে ঐ শিশুর হাতে!

আর মাণিক, যেন সমস্ত না-পাওয়ার আক্রোশ ওর শিশুমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাই যত কিছু পাওয়ার জিনিষ দেখলেই ছুটে আসে পাওয়ার জন্য। সে দিন সাড়ে ছ'আনাওয়ালা তার ট্রেটা ঠেলতে ঠেলতে এনে রাখতেই মাণিক ছুটে গিয়ে একটা বাঁশী তুলে নেয়। সাতু তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে ভোলায়, 'ছি, বাঁশী দিয়ে দাও, বাবার অসুখ ভালো হ'লে তোমায় ভালো বাঁশী কিনে দেবো।' মাণিক অবুঝ, বলে, 'না, দেবো না। ঐ বলে বলে আমাকে কিছু দাও না! বাবার অসুখ ভালোই হবে না।' সাতু তখন কেড়ে নিতে গেল। মাণিক ছাড়বে না, প্রাণপণ শক্তিতে সে ধরে আছে। দু'জনের টানাটানিতে পাতলা প্লাসটিক্‌এর বাঁশী গেল ভেঙ্গে, আর বাঁশী ভাঙ্গার জন্য মাণিকের কান্না ও বাঁশীওলার দাম চাওয়া ইত্যাদিতে বেশ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। চারদিকে দু'-চার জন ছেলে-বুড়ো জুটতে লাগল। সকাল তখন ন'টা হবে, একতালার অফিসের বাবুরা ছিলেন, খালি যারা ফ্যাক্টরীতে চাকরী করে তারাই চলে গিয়েছে। তাঁরা কেউ এসে একটু দাঁড়ালেন, কেউ বা শুধু বাঁশীওলাকে সাবধানে রাখতে, দাম না দিয়ে কেন জিনিষ দেয় ব'লে সরে পড়লেন। বাঁশীওলা তাড়না করেই চলেছে পয়সার জন্য। একজন বল্লে, 'যা না সাতু, মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আয়।'

হপ্তার শেষে মার কাছে সাড়ে ছ'আনা পয়সা। সাতু ভালোই জানে। আশে-পাশে সমসাথীদের মধ্যে লজ্জা ও অপমানে মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে থাকে সাতু, আর ভাঙ্গা বাঁশীর টুকরো দু'টো হাতে করে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে মাণিক। হঠাৎ বাঁশীওলা মুখ বিকৃত কয়ে বলে উঠে, 'এ্যাঃ, বড়া বদমাস, ঠগ্ হ্যায়।' পাশ থেকে দু'-একজন হেসে ওঠে। সমর্থক পেয়ে বাঁশীওলা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ উপরের বারান্দা থেকে উচ্চ গম্ভীর স্বর ভেসে আসে, 'এই ফেরীওলা, মুঃ সামালকে বাত বোলো।' বাঁশীওলা বলে, 'জী এ পয়সা নেই দেতা হ্যায়, এত্তা বদমাস।' 'চুপ রহো, জবান সামালো।'—বলেই নির্ম্মলা দেবী বারান্দা থেকে চলে যান। একটু পরেই সকলে সবিস্ময়ে দেখলো, বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার ভেতর থেকে প্রকাণ্ড বড় গাড়ী করেই যাঁর বার হওয়া অভ্যাস, যাঁকে এর আগে কেউ কোনদিন রাস্তায় দেখে নি,—সেই নির্ম্মলা দেবী বাড়ীর ফুটপাথ অতিক্রম করে এসে দাঁড়িয়েছেন একেবারে রাস্তার উপরে। এসেই মাণিককে কোলে নিয়ে, ভাঙ্গা বাঁশীটা ফেলে দিয়ে আর একটা নতুন বাঁশী নিয়ে বললেন, 'এ মেরা বেটা।' তারপর একটা টাকা ফেলে দিয়ে এদিকে সরে আসতেই একটি উর্দ্দী-পরিহিত চাকর বাকী পয়সা বুঝে নিতে গেল। ইতিমধ্যে মাণিকের মাও ধার-ধোর করে সাড়ে ছ' আনা পয়সা নিয়ে এসেছিলেন, এই ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় তা আর দিতে পারেন নি। একটু কুণ্ঠিত হয়ে পয়সাটা দিতে গেলেন; কিন্তু নির্ম্মলা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর দুই চোখে জল, আর নূতন বাঁশী-পাওয়া সহাস্য শিশু-মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মাণিকের মা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তখন্ নিজেকে একটু সামলে নির্ম্মলা দেবী বললেন, 'একান্তই যদি পয়সা না নিলে অপমান বোধ করেন তবে ছেলেরা বাড়ী এলে, মাইনে পেলে, যখন খুসী পাঠিয়ে দেবেন।' মাণিককে কোলে নিয়েই তিনি নিজের বাড়ী ফিরে আসেন। তখনও তিনি ভাবছিলেন, এদের সমশ্রেণীর এই এতগুলি লোকের কারো কাছেই কি উপস্থিত সাড়ে ছ' আনা পয়সা সত্যিই ছিল না! একটী কিশোর বালকের অপমান-কাতর মুখ ও অবোধ শিশুর কান্নার চেয়েও কি সাড়ে ছ' আনা পয়সার দাম বেশী? মানুষের মনের এই মানবিক ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এর জন্য দায়ী কে?

মহাকালের পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—বারো—

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মহাকুমার কান্না জুড়ে দিল—মা কোথায়?

—আমার লাল জামা কোথায় গেল?

—আমার তলোয়ার? আমার ধনুর্বাণ?

—আমি এখানে থাকবো না, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।

রামলোচনের স্ত্রী বিপদে পড়লেন, ছেলেকে তিনি কিছুতেই চুপ করাতে পারেন না। রামলোচন দোকান থেকে মিঠাই কিনে এনে ছেলের হাতে দিলেন, ছেলে ঠোঁট উল্টে বলে উঠলো—এ মিঠাই আমি খাব না, এর চেয়ে আমার বাড়ীর মিঠাই অনেক ভালো।

বালক মিঠাই মুখে তোলে না।

রামলোচনের স্ত্রী কি করে যে ছেলেটিকে ঠাণ্ডা করবেন তা ভেবে পেলেন না।

ইতিমধ্যে রামলোচন কি একটা কাজে বাহির হয়েছিলেন, ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফিরে এসে বললেন—গিন্নী, শুনেছ? খুব দুঃসংবাদ! কাত্যায়ন আর তার দুই ছেলেকে কাল রাজপুরুষেরা ধরে নিয়ে গেছে। এদিকে নগর কোতোয়ালিতে খবর এসেছে যে রাজকুমারের কোন সন্ধান যদি কেউ গোপনে প্রাসাদে পৌঁছে দিতে পারে তাহলে তাকে সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

মহিলা ক্ষণেক চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—তাহলে?

—আমিও তো তাই ভাবছি, এখন কি করা উচিত!

মহিলা বললেন—যে রাজাকে হত্যা করেছে, সে তো সুবিধা পেলে রাজকুমারকেও হত্যা করবে।

—সে সম্পর্কে সন্দেহ করার কিছু নেই।

—এই সব অনাচার লোকে মুখ বুঁজে সইবে ?

—প্রাণের মায়া থাকলে সইতেই হবে। সৈন্তসামন্ত যার হাতে সে যা করবে তাই মেনে নিতে হবে।

রামলোচন স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। এই পল্লীতে তাঁরা পুরাতন বাসিন্দা। প্রতিবেশীরা সকলেই জানে তাঁদের ছেলেমেয়ে নেই। এখানে রাজকুমারকে লুকিয়ে রাখা সহজ নয়। রামলোচন ঠিক করলেন তিনি কাশী যাবেন। কাশীতে তাঁর বন্ধুর এক চতুস্পাঠী আছে, সেইখানে কিছুদিন অধ্যাপনা করে কাটাবেন। তারপর রাজকুমারকে নিয়ে যখন ফিরে আসবেন তখন সবাইকে বলবেন, এটি বন্ধুপুত্র, তিনি পোষ্য গ্রহণ করেছেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে রামলোচন স্ত্রী ও রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে কাশীর পথে রওনা হলেন।

পাটলিপুত্র থেকে কাশী অবধি প্রশস্ত রাজপথ। এই পথ ধরেই একদিন ভগবান্ তথাগত বুদ্ধ সারনাথ থেকে রাজগৃহে এসেছিলেন। এই পথ বরাবর উত্তরমুখী হয়ে চলে গেছে পঞ্চনদের মধ্য দিয়ে। কবে এই পথ কে তৈরী করেছিল জানা নেই। এইটিই শেরশা'র এবং আজকের গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড কিনা তাই বা কে বলবে! এখনকার মত এই পথে তখন মোটর-গাড়ীর ভীড় ছিল না, তবে রথ, অশ্ব, গোযান ও পদাতিকের চলাচল ছিল যথেষ্ট। পথের পাশে অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। গৃহস্থের গোলাভরা ধান ও গোয়ালে গরু ছিল। পথচারী গ্রামের যে কোন গৃহদ্বারে গিয়ে দাঁড়ালে দু'মুঠো অন্নের অভাব হ'ত না। গৃহস্থ অতিথিকে নারায়ণ বলে মনে করতো, অতিথি সেবা করে নিজেকে কৃতার্থ করতো।

দীর্ঘ পথ, তার উপর সঙ্গে রমণী থাকলে তো কথাই নেই। তবে এখনকার মত তখনকার মেয়েরা দুর্বল ছিলেন না। পাঁচ-ছ' ক্রোশ পথ মেয়েরা পদব্রজে স্বচ্ছন্দে যেতে পারতেন। রামলোচনও দিনে প্রায় পাঁচ-ছ' ক্রোশ পথ চলতে লাগলেন।

কিন্তু রামলোচনের অদৃষ্ট খারাপ বলতে হবে। পথিমধ্যে এক পুষ্করিণীতে তিনি হাত-মুখ ধুয়ে কিছু জল পান করেন। সে অঞ্চলে তখন ওলাউঠার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল, রামলোচন তা জানতেন না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর ভেদবমি দেখা দিল। মাঠের মাঝে এক গাছতলায় রামলোচন শুয়ে পড়লেন। গৃহিণী একা কি করবেন ভেবে পেলেন না। ঘন ঘন তৃষ্ণায় রামলোচনের গলা শুকিয়ে ওঠে, গৃহিণী কাছাকাছি এক পুষ্করিণীর জল নিয়ে এসে মুখে দেন। রামলোচনের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, হাতে পায়ে খিল ধরতে সুরু করে।

গৃহিণী স্বামীর সেবা করছিলেন, সহসা তাঁরও দু'বার ভেদবমি হয়ে শরীরটা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে এলো; তিনিও আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না, স্বামীর পাশে তিনিও গাছতলায় শুয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা এক রাখাল মাঠের পথ ধরে গরু চরিয়ে ফিরছিল; দেখে, পথের ধারে এক গাছতলায় দু'টি মৃতদেহ পড়ে আছে, আর একটি শিশু তাদের পাশে বসে গাছের কয়েকটা শুকনো

পাতা নিয়ে খেলা করছে, মৃত্যু সম্বন্ধে তার বোধ হয় কোন ধারণাই নেই। রাখাল ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিল। তখন সে অঞ্চলে ওলাউঠা হচ্ছে, এই ধরণের দু'-একটা মৃত্যু সে ইতিপূর্ব্বে দেখেছে। দেখেই সে বুঝলো মৃতদেহ দু'টি স্থানীয় লোকের নয়। তার একার পক্ষে সৎকার করার কথা ওঠে না! কিছুক্ষণ সে কি যেন ভাবলো, তারপর ছেলেটিকে কোলে তুলে নিল বললো,—চল, খোকা, আমাদের বাড়ী চল।

বালক প্রথমে একটু বিস্মিত হয়েছিল, এবার বললো,—তোমাদের বাড়ী ? না, তোমার বাড়ী আমি যাব না, আমি যাব রাজার বাড়ী।

বালক রাখালের কোল থেকে নামার জন্য ছটফট করে উঠলো। পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি মোষ, রাখাল সেই মোষের পিঠে বালকটিকে চড়িয়ে দিয়ে বললো,—দুষ্টুমী ক'র না, চল তোমাকে রাজার বাড়ীতেই নিয়ে যাব,—রাখাল রাজার বাড়ী।

বালক কিন্তু মোটেই ভয় পেল না, মোষের পিঠে চড়ে সে বেজায় খুসি; বললো,—আমার একটা হাতী আছে, একটা ঘোড়া আছে, তুমি জান ? ঘোড়াটা কেমন লাফায়! এই মোষ লাফাবে তো? তুমি ওর শিং দু'টো ভেঙ্গে দাও।

রামলোচনের পাশে একটি পোঁটলা পড়ে ছিল। তার মধ্যে বালকের জামা-কাপড় আছে ভেবে রাখাল পোঁটলাটি তুলে নিল, তারপর অগ্রসর হ'ল গৃহাভিমুখে। সমস্ত পথটি বালক বক বক করলো, তার কতক রাখাল শুনলো, কতক শুনলো না। তবে এটুকু সে বুঝলো যে বালক ধনীর সন্তান। মহাকুমারের হারিয়ে যাওয়ার খবর সে শোনে নি, তেমন কিছু যে ঘটতে পারে সে তা ভাবতেও পারলো না।

গ্রামের বাহিরে রাখালের ঘর। গরু-মোষগুলিকে গাঁয়ের পথে ছেড়ে দিয়ে সে ঘরে এসে পোঁটলা খুললো। রামলোচন সেই পোঁটলার মধ্যে রাজকুমারের স্বর্ণালঙ্কার ও পোষাকের মণিমুক্তাগুলি একটি ছোট থলিয়ার মধ্যে সঙ্গে নিয়েছিলেন; সেইগুলি পেয়ে রাখালের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে বালক সত্যই কোন ধনীর সন্তান। তখনকার দিনে মানুষ ছিল নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মভীরু। রাখাল সেই অলঙ্কার আত্মসাৎ করলো না, সেগুলি সযত্নে রেখে দিল বালকের ভবিষ্যতের জন্য।

চার বছরের শিশু, কয়েকদিন মোষের পিঠে চড়ে ঘাটে-মাঠে ঘুরতে ঘুরতে দিব্যি রাখাল বনে গেল। রাজপ্রাসাদ, হাতী, ঘোড়া, তলোয়ার, তীরধনুর কথা ভুলে সে হ'ল গরু ও মহিষের বন্ধু। বড় বড় গরু-মোষগুলির গলায় সে হাত বুলিয়ে দেয়, তাদের পিঠের উপর চড়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও বা বাছুরের লেজ ধরে ছুটোছুটি করে মাঠের বুকে। বড় বড় বৃষগুলির শিং ধরে নেড়ে দেয়। রাখাল আদর করে ছেলেটির নাম রাখলো বৃষল।

মগধের রাজকুমার হ'ল রাখাল বৃষল।

—তেরো—

উগ্রসেন নন্দ ছিলেন বিচক্ষণ লোক। মহামাত্য রাক্ষসনিসূদনের সহায়তায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা বদলে গেল, কিন্তু রাজ্যমধ্যে এতটুকু বিপর্য্যয় ঘটলো না। যে সব রাজকর্মচারীদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষ দেখা দেবার সম্ভাবনা ছিল তাদের বেতন বৃদ্ধি করে দিয়ে তিনি তাদের মুখ বন্ধ করলেন। সীমান্তে যদি কোন গোলমাল হয় এই আশঙ্কায় সীমান্তের দুর্গগুলিতে তিনি একে একে নিজের একান্ত অনুগতদের সীমান্ত-নায়ক হিসাবে নিয়োগ করলেন। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ স্বকর্ণে শোনার জন্য তিনি দরবারে সকলের প্রবেশ-অধিকার দিলেন। রজেকর্মচারী ও প্রজারা খুসি হ'ল।

উগ্রসেন নিজে ছিলেন দস্যু। দস্যুদের কলা-কৌশল তিনি ভালোমত বুঝতেন। দস্যুবৃত্তি নিরোধ করার জন্য বড় বড় বনে তিনি বনাধ্যক্ষ নিয়োগ করলেন, বনপথগুলিতে রক্ষী সেনা রাখার ব্যবস্থা করলেন। দস্যুদের ধরলেই প্রাণদণ্ডের বিধান দিলেন। পথিক ও স্বার্থবাহদের জন্য রাজপথ নিরাপদ হ'ল। বিত্তবানেরা নিশ্চিন্ত মনে রাত্রে নিদ্রা যেতে পারলো, সদাগরেরা খুসি হ'ল।

দেবমন্দিরগুলি সারানো হ'ল। জৈন ও বৌদ্ধ মঠগুলির সংস্কার হ'ল। সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য রাজা অতিথিশালা করে দিলেন। ধর্মপ্রবণ নরনারীরা মগধ-সম্রাটের কল্যাণ কামনায় পঞ্চমুখ হ'ল।

রাজ্যে শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। কোন দিক থেকে অসন্তোষ জাগার কোন আশঙ্কা আর রইল না। মগধ-সম্রাটের হত্যাকাহিনী প্রজারা ভুলে গেল। উগ্রসেন স্বস্তি পেলেন। নিরুদ্দিষ্ট রাজকুমারকে নিয়ে আর তিনি মাথা ঘামালেন না। শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে নন্দ সাম্রাজ্যের রথ এগিয়ে চললো।

(ক্রমশঃ)

যাঁদের লেখা তোমরা পড়

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৪

তখন আমার ছাত্রাবস্থা, কবি সুকুমার রায়কে প্রায় প্রত্যহ বিকালে দেখতাম, গড়পার রোড থেকে বেরিয়ে আপার সারকুলার রোড পার হয়ে এপারে আসচেন। যেমন নাম, তেমনি কমনীয় মুখশ্রী, সেইরূপই স্নিগ্ধ দৃষ্টি। পোশাক সাদাসিধা কিন্তু ছিম্‌ছাম, চাদর বা আলোয়ানখানি গায়ে পেঁচিয়ে পরা। মনে মনে ভাবতাম, এই শান্ত, ধীর মানুষটি বাঙলার ছেলে-মেয়েদের হাস্যরসতরঙ্গে ভাসিয়ে আনন্দদোলা দিয়ে থাকেন? মানুষের চেহারা ও কাজে কত গরমিল! কিন্তু আমার পরম

দুর্ভাগ্য যে তাঁর সঙ্গে একটি কথা কইবার সুযোগও জীবনে কোনদিনই পেলাম না; কেবল তাঁকে দেখে, তাঁর রচনা পাঠ করে, তাঁর রচিত নাটিকা দেখেই খুশী থাকতে হ'ল। যদি আমার চরিত্রে গায়ে-পড়া ভাব থাকতো, পত্রিকায় রচনা প্রকাশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তখন ভর করতো, তাহ'লে যে তাঁর অফিসে বসে তাঁর সঙ্গে যেমন-তেমন দু'টো কথাও কইতাম এতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। জিজ্ঞেস করতাম, "আপনি কখন ও কতক্ষণ লেখেন? রবি ঠাকুরের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে? শরৎ বাবুর বাড়িতে গিয়েচেন? তিনি খুব সিঙ্গাড়া খাওয়ান, না? অমুক লেখক বা বড়লোক আমার জ্যাঠামশাই হন, তাঁকে চেনেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশেষে স্বরচিত কবিতা বা গল্প প্রকাশের জন্য দিয়ে আসতাম এবং সেই সূত্রে আলাপও ক্রমে এমন জমিয়ে নিতাম যে শেষকালে তিনি—না, থাক, যা হয় নি তা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই।

৺সুকুমার রায়

তবে তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয় রায়ের বেলায় এ কথা বলতে পারি না। তাঁর সঙ্গে কোথায় প্রথম আলাপ হয়, মনে করতে পারচি না। "বইয়ের দোকানে" বললে ভুল ধরবার কেউ নেই; একখানি পত্রিকা-অফিসের নাম করলেও ল্যাঠা চুকে যেত, কিন্তু তাহ'লে বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে এই আশঙ্কায় নিরস্ত হলাম। তবে এ কথা ঠিক এবং প্রকাশেও বাধার কিছু নেই, যে, তখন আমি সবে শিশুসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করচি, তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে বাঙলার ছেলেমেয়েদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেচেন। বঙ্গসাহিত্যে যেমন ঠাকুর বংশের দান অমূল্য, তেমনি বাঙলার শিশুসাহিত্যে রায় পরিবারের দানও অতুলনীয়। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র, সুকুমার রায়ের মধ্যম ভ্রাতা এবং এক সময়ে সুবিখ্যাত "সন্দেশের" সম্পাদক। কাজেই কতকটা উত্তরাধিকারসূত্রে, কতকটা পরিবেশ ও শিক্ষায় সুসাহিত্যিক হয়ে উঠেছিলেন। শিশুমন ছিল তাঁর সম্মুখে প্রস্ফুটিত কুসুমের মতো। তার সবটুকু যেন তিনি পরিষ্কার দেখতে পেতেন। তাই তাদের জন্য যা রচনা করতেন তাই হ'ত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।

তিনি ছিলেন গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার, সুপুরুষ। কথা বলতেন ধীরে, অনুচ্চকণ্ঠে।

নামে সুবিনয়, আচরণেও ছিলেন সুবিনয়। কোনদিন একটি রূঢ় শব্দ তাঁর মুখে শুনেচি বা তাঁর দৃষ্টিতে কোনদিন ঈষৎ রুক্ষতা দেখেচি—এমন মনে পড়ে না।

একদিন একখানি শিশুমাসিক-পত্রিকা অফিসে আমাকে একটি ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞেস করে এমন ধাঁধায় ফেলে দিলেন যে আমার স্বাভাবিক শীতল মস্তিষ্ক উষ্ণ হয়ে উঠলো। ধাঁধাটি তাঁরই তৈরী। ধাঁধা সৃষ্টি ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেদিন মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম।

৺সুবিনয় রায়

তিনি উঠে গেলে পত্রিকার মালিক আমাকে বললেন, "আমাদের পত্রিকার জন্যে আপনাকে ধাঁধা তৈরী করে দিতে হবে।"

বললাম, "ধাঁধা তৈরী করবো আমি? ওঁর মতো জ্ঞানবুদ্ধি আমার নেই; ও আমার দ্বারা হবে না।"

"হবে, হবে। ইচ্ছা করলে সব পারেন।"

তাঁকে আর ঘাঁটালাম না। কারণ তাঁর কাছ থেকে কয়েকটি টাকা আনতে গিয়েছিলাম। নিজের ক্ষমতা আরও বেশী করে জানালে টাকা কয়টিও ধাঁধায় পড়ে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

সুবিনয় বাবু "রামধনুর" এমন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন যে এর সম্পাদন ও প্রকাশন ব্যাপারে সাহায্য করতে সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকতেন এবং এজন্য প্রভূত শ্রম স্বীকার করতেন। এই "রামধনুতেই", তার কিছুকাল আগে কি পরে মনে পড়চে না, তদানীন্তন শিশুসাহিত্যিকগণের গুণ বিচার করে জনৈক ভদ্রলোক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। (পরে অবশ্যি শুনেছি, লেখক ছিলেন গ্রাহকদেরই একজন, আর লেখাটিও বেরিয়েছিল "ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক" বিভাগে।) যেমন এখন মাঝে মাঝে দেখা যায়, তখনও দেখা গেল, সে প্রবন্ধে জন কতক বিখ্যাত লেখকের নামোল্লেখ ছিল না এবং জন কতকের প্রশংসা একটু বেশিই করা হয়েছিল। এতে আমার সন্দেহ হ'ল সেই প্রবন্ধের পশ্চাতে হয়তো কারা আছেন। জানি না সম্পাদক মশাই আমার এই কথা কয়টা সম্পাদকীয় কাঁচিসই করবেন কিনা, যদি বলি, "সাহিত্যক্ষেত্রেও 'দল' আছে, যার ফলে এ রকমটা ঘটে থাকে।"

তখন শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের "মাসপয়লা" মাসকাবারে প্রকাশিত হ'ত। আমি তাতেই প্রবন্ধটির একটি উত্তর দিলাম, অবশ্য ছদ্মনামে। কারণ আমাকেও বাদ দেওয়া হয়েছিল, আমার রাগ হওয়া তো স্বাভাবিক! উত্তরটি পাঠ করে সুবিনয় বাবু খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, যদিও তাঁকে আক্রমণ করেছিলাম পরোক্ষে। তাঁর মনোবেদনা তিনি প্রকাশ করেন জনৈক পুস্তকবিক্রেতার কাছে। সে ব্যক্তি আজও জীবিত কিন্তু সুবিনয় বাবু পরলোকে। ঐ উত্তরটি পাঠ করে নাকি বাংলার শিশুসাহিত্যর 'মার্ক টোয়েন' বলেছিলেন, "যদি এই ষ্টাইল খগেন মিত্তিরের হয় তো আমি একদিন ডিনার দেবো।" জানি না শ্রোতার ভাগ্যে সত্যই "ডিনার" জুটেছিল কিনা। তখন "ডিনার" ছিল সস্তা এবং রচনার মূল্যও ছিল সামান্য। তবুও সুবিনয় বাবু আমার প্রতি কোনদিন বিরূপতা প্রকাশ করেন নি, এমনি ছিল তাঁর সংযম ও সুজনতা।

৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

যে বয়সে তিনি ও তাঁর অগ্রজ পরলোক গমন করেন সে বয়সকে বলা হয় 'অকাল'। এঁদের উভয়েরই অকালে লোকান্তর গমনের ফলে বাংলার শিশু-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েচে। তাঁদের শূন্য স্থান শূন্যই রয়ে গেল।

এমনি আরও একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক অকালে আমাদের মাঝ থেকে পরলোকে চলে গেচেন। তিনি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। যখন তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় তখন তিনি "রামধনুর" সম্পাদক। তাঁকে চোখে দেখবার আগে মনে করতাম, সোনার চশমা চোখে, ফুটফুটে ছিপছিপে এক তরুণ। কিন্তু যখন মানুষটিকে দেখলাম, মনে হ'ল ঠিক উল্টো। গায়ের রং কালো, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ, মোটা শেলের চশমা চোখে হাস্যময় তরুণ। কথা বলবার আগেই হাসিতে সারা মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; গলার স্বরেও কেমন একটু স্নিগ্ধ স্মিতভাব—যার প্রকাশ তাঁর সমস্ত রচনায়।

যে প্রবন্ধটির উল্লেখ আগে করেচি, তাতে তাঁর রচনারও সুতীব্র সমালোচনা ছিল। হয়তো তিনিই রামধনুর সম্পাদক ছিলেন ব'লে এবং লেখাটির ওপর কলম চালান নি ব'লে ঝালটা বেশি হয়েছিল; তবুও কি করে যেন আমাদের মধ্যে

একটি প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে। আমাদের পল্লীতে তিনি কর্মসূত্রে এক জায়গায় মাঝে মাঝে আসতেন। তখন যদি দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়েচে তো তাঁর গল্প শুনতে বসে গেচি। হাস্যরসে কানায় কানায় ভরা ছোট ছোট ঘটনা, কিন্তু স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, আবিলতার লেশমাত্র তাতে নেই। তাঁরও অকালে লোকান্তর গমন একটি মর্মান্তিক কাহিনী।

বাঙলার সবচেয়ে অল্পমূল্যের শিশু-মাসিক পত্রিকা ছিল বোধ হয় "মাস-পয়লা" যা কোনদিনই মাসের পয়লা প্রকাশিত হ'ত না এবং হওয়াটাই ছিল তার পক্ষে অস্বাভাবিক। অবশ্য তাতে দোষাবহ কিছু নেই। কারণ সার্থক নাম সংসারে কয়টিই বা? এই পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যাঁর 'ঈশচন্দ্র' ও রামধনুর সম্পাদকের 'ইন্দ্রনারায়ণে'-র পার্থক্য অনেকেরই চোখে ধরা পড়ে না। গোড়ার ও শেষের মিলই যে সব নয়, মাঝের মিলও দরকার, এই প্রয়োজনীয় কথাটি কেন যে তারা ভোলে তা তারাই জানে। তবে নামের সবটুকু মিললেও যে মানুষ এক হবে এমনও কথা নেই। এই রকমের নামের ভুল হয়, "রামধনু" ও "রামধেনু"তে। "রামধনু" প্রত্যক্ষীভূত বস্তু ও ঘটনা, কিন্তু "রামধেনু" বেদে-পুরাণেও নেই তো একালে কোথায় দেখা যাবে? তবুও এমন এমন লোকে ভুল করেন যে শুনে হাসি পায় কিন্তু তাঁদের সামনে হাসাও যায় না, স্বীকার করে নিতে হয় "রামধনু" "রামধেনু"ই। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা সম্পাদক মশাইকেই জিজ্ঞেস করলে যাচাই হয়ে যাবে।

শ্রীভূমির যে অংশ বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ক্ষিতীশ বাবু সেই অংশেরই লোক। অস্থি, চর্ম ও নাসাসর্বস্ব গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘ মানুষটি তিনি। যে সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল অল্প, নাম ছিল বেশ, কাজকর্ম ছিল অনেক, বন্ধু-বান্ধব ছিল প্রচুর। তিনি এত জোরে হাঁটতেন যে মনে হ'ত পথ দিয়ে একখানি হলদে রঙের পাতা উড়ে চলেচে। তিনি বোধ হয় তখন থাকতেন ঝামাপুকুরে, কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ হয় ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের একটি মেসে। সেই মেসে থাকতেন অনেক শিল্পী, তাঁদের কাছে অনেক প্রকাশক ও লেখকের যাতায়াত ছিল। একটি ঘরে গল্পের আসর বসতো এবং বক্তার নৈপুণ্যে আসরটি গল্পরসে এমন মশগুল হ'য়ে যেত যে সেখান থেকে উঠে আসতে মন চাইত না। ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে দেখা ও আলাপ হয় এই রকমের একটি আসরে এবং সেইদিন থেকে বন্ধুত্বও ধীরে ধীরে জমে উঠতে থাকে।

———

ভারত-পাকিস্তান শেষ টেষ্ট

শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

এবারে ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলতে এসেছিল পাকিস্তান। ক্রিকেট-জগতে পাকিস্তান পা দিয়েছে নতুন। কিন্তু এর মধ্যেই সে কুড়ি বছর ধরে ক্রিকেট খেলে হাত-পাকানো ভারতবর্ষকে ইনিংসে হারিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় টেষ্টে। কলকাতায় যখন পাকিস্তান খেলতে এলো তখন ভারত ২-১ গেমে এগিয়ে আছে টেষ্ট খেলায়, শেষ খেলায় না হারলে রাবার সে-ই পাবে। তাই ইডেন গার্ডেনের শেষ টেষ্ট খেলায় পাকিস্তান ভারতের হাত থেকে রাবার ছিনিয়ে নেয় কিনা দেখতে আমরা ছুটলাম রঞ্জি স্টেডিয়ামে।

টসে জিতে অমরনাথ ফিল্ডিং নিলেন। হয়তো ভাবলেন—রাতের শিশির-পড়া ভিজে পিচে চট্‌পট্‌ ফেলে দেব পাকিস্তানী উইকেট। আনন্দে হাততালি দিলাম আমরা—পাকিস্তানের ভাঙ্গন দেখবার আশায়। কিন্তু মানুষ ভাবে এক—হয় আর। পাকিস্তানের ওপ্‌নিং জুটি নাজার হানিফ ঠুকঠাক্‌ করে বল ঠেকিয়ে যেতে লাগলেন। রামচাঁদ এর আগে দু'টো টেস্টে হানিফের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে প্রায় তাঁর ব্যাট্‌ থেকে বল তুলে নিয়েছিলেন। এবারে সেখানে দাঁড়াতে গিয়ে দু'বার বলের প্রচণ্ড বাড়ি খেয়েও হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেন মোটেই ভালো উইকেট-কীপিং করতে পারছিলেন না। হানিফকে একবার ফস্কালেন। হানিফ হঠাৎ ফাদকারের বলে বোল্ড হওয়ায় মাঠে তুমুল হৈচৈ সুরু হ'লো। কিন্তু পরে যখন জানা গেল যে সেটা নো-বল ছিল তখন আমরা বোকা বনে বসে পড়লাম। লাঞ্চের আগে নাজার বা হানিফ কেউই তাঁবুতে ফিরতে রাজী হলেন না।

লাঞ্চের পরে কিন্তু নাজার নিজের ৫৫ রানের মাথায় গোলাম আমেদকে কাট করতে গিয়ে অমরনাথের হাতে আটকে গেলেন। এলেন ওয়াকার হাসান। এদিকে হানিফ কিন্তু তখনো বেশ ধীরেসুস্থে খেলে চলেছেন। তাঁর বয়স মোটে ১৮ বছর হলে কি হবে, রান্‌ করলেন ৫৬। কিন্তু তার পরেই ফাদকারের বল সোজা রামচাঁদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন। এবার এলেন পাকিস্তানের নামজাদা ব্যাট-চালিয়ে ইম্‌তিয়াজ আমেদ। এঁরা দু'জনে চা-পান পর্য্যন্ত ব্যাট চালিয়ে গেলেন।

চা-পানের পরে কিন্তু উইকেট পড়া শুরু হ'লো। ফাদকারের বলে ওয়াকার এল. বি. ডব্ল্যু হলেন। তিনি এক রানের জন্যে ৩০ পূরোতে পারলেন না। তাঁবু থেকে বেরোলেন অধিনায়ক আবদুল হাফিজ কারদার। লম্বা ফর্সা—সুন্দর চেহারা কারদারের। পাকিস্তানের জন্মের আগে তিনি ছিলেন ভারতের নাম-করা ন্যাটা ব্যাট্‌স্‌ম্যান। তারপর হয়েছিলেন কেম্ব্রিজ ব্লু। কিন্তু এবারের খেলায় তাঁর পুরোনো কৃতিত্ব দেখতে চেয়ে হতাশ হ'লাম। প্রত্যেক বলেই তিনি এগিয়ে মারবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ফাদকারের বলে এগিয়ে এসে পেটাতে গিয়ে ফস্কে যাওয়ায় তাঁর উইকেট উড়ে গেল। ৭ রানের বেশী তিনি করেন নি। মকসুদ এসে একবার মানকড়ের বলে রামচাঁদের হাতে ক্যাচ তুললেন, কিন্তু রামচাঁদ অন্য দিকে চেয়ে থাকায় সেটা ধরবার চেষ্টাই করতে পারলেন না। ১৭ রানের মাথায় অমরনাথের বল লেগে পেটাতে গিয়ে অবশ্য মকসুদকে ফিরে যেতে হলো, মঞ্জরেকর দৌড়ে এসে তাঁকে লুফলেন। শেষের দিকে খেলা দেখালেন ইম্‌তিয়াজ। কয়েকটা ভালো মার মেরে দিনের শেষ বলে তিনি নিজের ৫০ রান্ আর দলের ২৩০ রান তুললেন। সারা দিনে পড়লো মোটে পাঁচটা উইকেট। অমরনাথের ভুলের খেসারৎ দিতে হ'লো এইভাবে।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের বাকী পাঁচটা উইকেট ফেলতে কিন্তু একঘণ্টার বেশী লাগলো না। সকালের গোলমেলে উইকেটে ফাদকার-রামচাঁদের বল মারাত্মক হয়ে উঠ্‌লো। পাকিস্তানের মোট রান্ হ'লো ২৫৭।

ভারতবর্ষের হয়ে গোড়ায় খেলতে নামলেন পংকজ রায় ও দাতাজী গায়কোয়াড়। গায়কোয়াড় বেশ মেরে খেলছিলেন, মাঝে মাঝে ক্যাচও তুলছিলেন। রায় কিন্তু খুব সাবধানে খেলে লাঞ্চের আগে মোটে ১০ রান্ করলেন। এদিকে গায়কোয়াড় ২১ রান্ করে ফেলেছেন। লাঞ্চের পর গায়কোয়াড় আর কোন রান্ না করেই মামুদ হোসেনের বলে পরিষ্কার বোল্ড্ হলেন। মানকড় নামলেন তুমুল হাততালির মধ্যে। কিন্তু ফজল মামুদ আর মামুদ হোসেনের নিখুঁত বলে তাঁরা রান্ করবেন কি, উইকেট বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমীর বল করতে এসে প্রচণ্ড মার খেলেন মানকড়ের হাতে। দেখাদেখি পংকজ রায়ও মারতে গিয়ে জুলফিকারের হাতে সোজা ক্যাচ তুলে ২৯ রান করে ফিরলেন। মঞ্জরেকর আসার পরই মানকড় আমীরের বলে ছক্কা মারলেন, কিন্তু ৩৫ রান্ করে মানকড়কেও ফিরতে হ'লো ফজলের বলে এল. বি. ডব্ল্যু হয়ে। দিনের শেষে ৫ উইকেটে মোটে ১৭৩ রান্ ওঠায় ভারতের অবস্থা সংগীন হয়ে উঠ্‌লো।

তৃতীয় দিনে ভারতের ভাঙন দেখে আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। টেস্ট ক্রিকেটে আন্‌কোরা আমদানী ন্যাটা ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ দীপক শোধনকে দেখে মোটেই উৎসাহিত হলাম না। কিন্তু তাঁর খেলা দেখে টনক নড়লো। তিনি ঘন ঘন বল বাউণ্ডারীর চিহ্ন পার করতে লাগলেন। লাঞ্চের একটু আগে কারদার ফাদকারকে তাঁবুতে ফেরৎ পাঠালেন। তিনি ৫৭টি দামী রান্ করেছিলেন। লাঞ্চের পর খেলা দেখালেন শোধন আর রামচাঁদ। শেষ খেলোয়াড় গোলাম আমেদ যখন এলেন তখন শোধনের সেঞ্চুরীর আর ৮ রান্ বাকী। কিন্তু তিনি মোটেই ঘাব্‌ড়ালেন না; ফজলের বাম্পারে জোরালো হুক্ করে আর পরের বলে নিখুঁত লেগ-গ্লাইড্

করে তিনি নিজের সেঞ্চুরী পূরো করলেন। ভারতের পক্ষে তিনিই প্রথম খেলোয়াড় যিনি প্রথম বার টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসেই সেঞ্চুরী করলেন। এর আগে ১৯৩৩-৩৪ সালে বোম্বাইয়ে এম. সি. সি.র বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলে লালা অমরনাথও সেঞ্চুরী করেছিলেন, তবে তিনি করেছিলেন দ্বিতীয় ইনিংসে। সুদূর গুজরাটের এই চৌকস ন্যাটা খেলোয়াড় তাঁর ১১০ রানের মধ্যে একটিও চান্স না দিয়ে চা-এর সময় যখন তাঁবুতে ফিরলেন তখন হাজার হাজার দর্শক ভারতের ক্রিকেট-আকাশের এই নতুন তারকাকে জানালো তুমুল অভিনন্দন। চা-এর পর শোধন কিন্তু আর কোনো রান্ না করে ফজলের প্রথম ওভারেই ইম্‌তিয়াজের হাতে ক্যাচ্ তুলে ধরা পড়লেন। ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হলো ৩৯৭ রানে—পাকিস্তানের ১৪০ রান্ ওপরে।

পাকিস্তান কোণঠাসা হয়ে দ্বিতীয়বার খেলতে নামলো। ভারত জেত্‌বার আশায় উঠে-পড়ে লেগে গেলো। মানকড় আর রামচাঁদ হানিফের ব্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁকে লুফবার জন্যে। দিনের শেষে এক উইকেটে পাকিস্তানের উঠ্‌লো মোটে ৩৮ রান্।

শেষ দিন। টপাটপ্ করে ছ'টা উইকেট পড়ে গেল ১৫২ রানে। আমরা ভারতের জিত দেখবার আশায় নড়েচড়ে বসলাম। ফজল এসে মার-মার করে খেলতে লাগলেন, কিন্তু বিপদ্ বুঝে পরে শান্ত হলেন। ওয়াকার আর ফজল চা-পান পর্য্যন্ত বল ঠেকিয়ে ভারতের আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে দিলেন। ওয়াকার অপূর্ব দৃঢ়তার সংগে খেলে নিজের দলকে হার থেকে বাঁচালেন। দর্শকেরা তাঁর সেঞ্চুরীর আশায় আগে থেকেই হাততালি দিচ্ছিলেন, কিন্তু চা-এর পর রামচাঁদের বলে বোল্ড হওয়ায় তিনি মাত্র তিন রানের জন্যে সেঞ্চুরী 'মিস্' করলেন।

ভারতের জেত্‌বার আশা যখন লোপ পেয়ে গেলো, অমরনাথ হাল ছেড়ে দিয়ে পংকজ রায় আর মঞ্জরেকরকে বল করতে ডাকলেন। তখন কারদার পাকিস্তানের ৭ উইকেটে ২৩৬ রানেই দান ছেড়ে দিলেন। খেলা শেষ হবার পনেরো মিনিট আগে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে এলেন রায় আর গায়কোয়াড়। এই পনেরো মিনিট বেপরোয়া পিটিয়ে দলের ২৮ রান্ তুলে পংকজ (৮) আর দাতাজী (২০) নট্ আউট রইলেন। ভারত-পাকিস্তান শেষ টেস্ট ম্যাচ ড্র হয়ে যাওয়ায় সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলায় প্রথম বার রাবার পেলো ভারতবর্ষ। অনেকগুলো সহজ ক্যাচ্ না ফস্কালে ভারতের সেরা মাঠ কলকাতার এই ইডেন গার্ডেনে আমরাও ভারতকে বিজয়ীর বেশে দেখতাম।

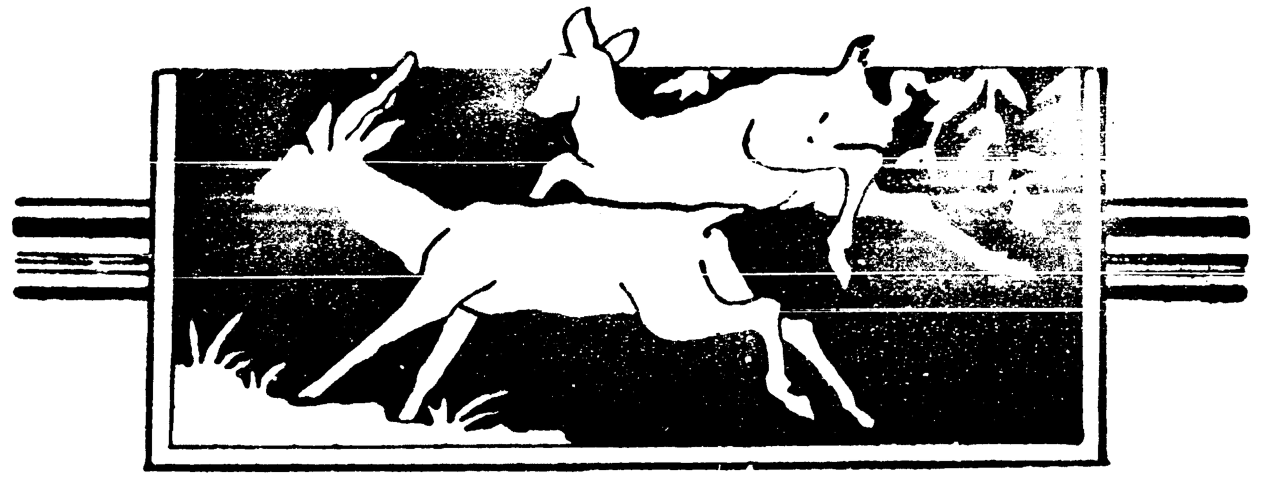

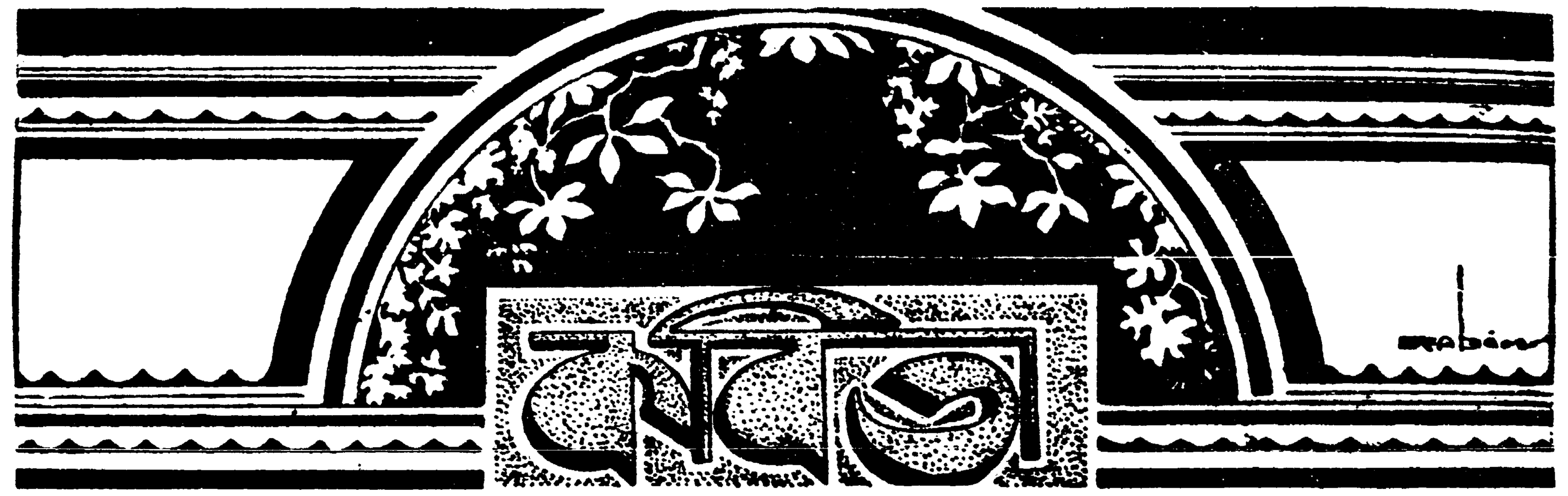

আমাদের লক্ষ্য

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

স্বাধীন ভারত, স্বাধীন ভারত,
আমরা স্বাধীন দেশের ছেলে ;
এগিয়ে যাবো সমুখ পানে
সকল বাধা-বিঘ্ন ঠেলে।
ভাবলে বসে চল্‌বে না আর,
লাগতে হবে কাজে এবার ;
যার যা আছে শক্তি মোদের
দেশের কাজেই দেব ঢেলে।

বিশ্বসভায় দেশকে মোদের
দিতেই হবে শ্রেষ্ঠ আসন,
করতে হবে কাজ নিরলস—
প্রাণ ভরে কর্‌ তার আয়োজন।
দায়িত্ব নয় কম তো রে ভাই,
নিষ্ঠা গভীর তার তরে চাই ;
থাক্‌তে হবে ক্লান্তিবিহীন
কর্ম্মে সদা লিপ্ত—মগন।

স্বার্থসেবার দিন গিয়াছে,—
আজকে যে দেশ সবার বড় ;
আজকে মোরা স্বাধীন জাতি,—
হ’তেই হবে তেমনি দড়।
দেশের গ্লানি—জাতির কালি
মুছ্‌বো প্রাণের রক্ত ঢালি ;
ঘুম-ভাঙ্গারই গানে মোদের
উঠ্‌বে জেগে সুপ্ত জড়।

চুটকী

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

একরত্তি ছুটকী।
দিন-রাত্তির হাঁকে-ডাকে
মাতিয়ে রাখে পাড়াটাকে,
তিন বছরেও তেমনি আছে
লিক্‌লিকে আর শুঁটকী।

চাঁদের দেশে যাবার তরে
মায়ের কাছে বায়না ধরে,
বক দেখিয়ে রাগায় বড়
পাশের বাড়ীর মুটকী।

ধরলে ধারাপাতের পড়া
চোখ ছ’টো হয় ছানাবড়া,
পেটকাটা ‘ষ’ লিখতে গিয়ে
তলায় দেবে ফুটকী।

হঠাৎ এসে চেয়ার নাড়ে,
হাত থেকে মোর পেন্‌টা কাড়ে—
রেগে গিয়ে ওর নামে তাই
লিখে দিলাম চুটকী।

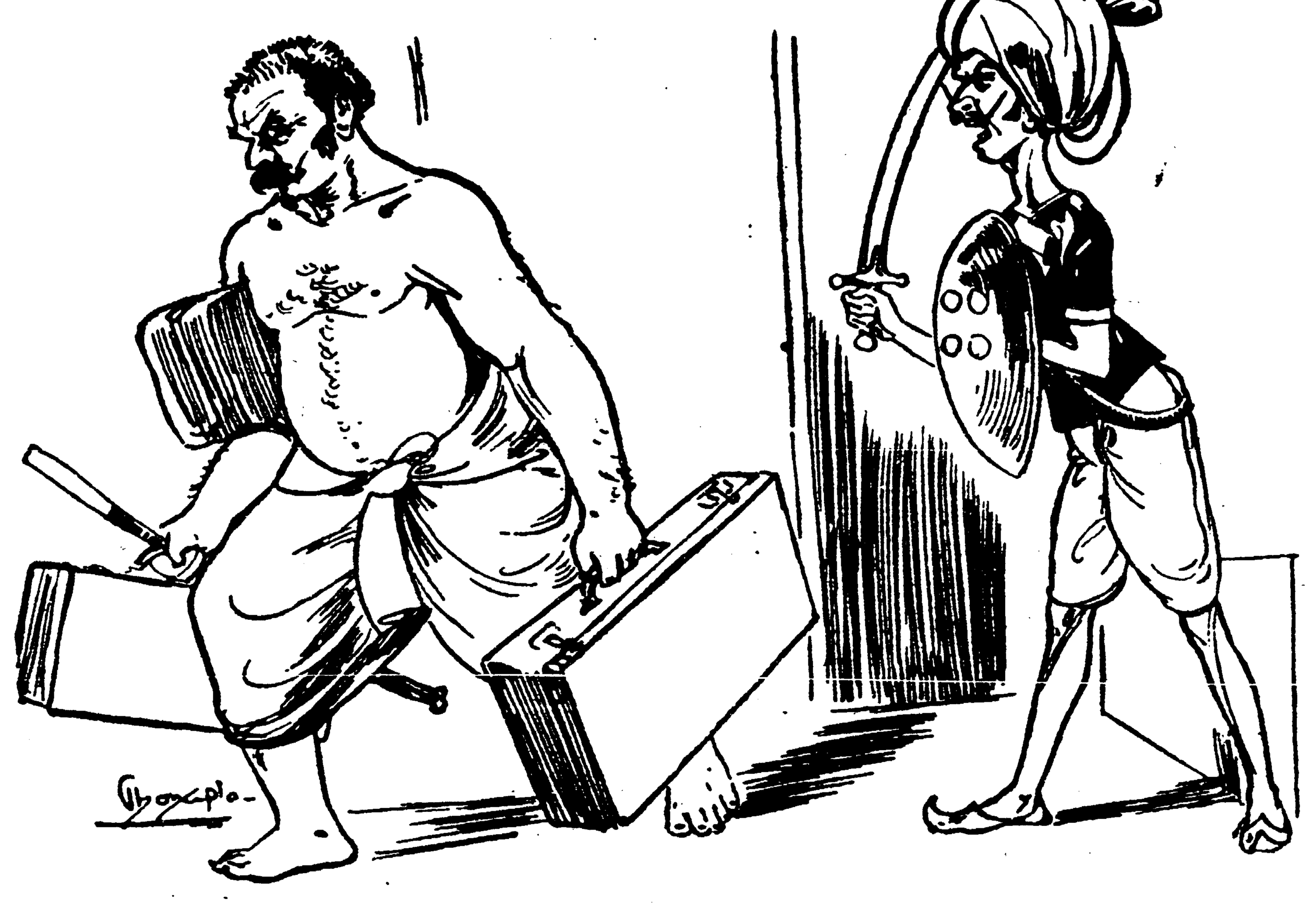

প্রতিযোগিতার ছবি

যাত্রায় অযাত্রা

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহু, এম্. এ, বি. টি, কাব্যপুরাণতীর্থ

এবার পূজার সময় কী পালা করা যাবে তাই নিয়ে ছোকরাদের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি হচ্ছিল। অনেকের মতে—আজকালকার একটা দেশপ্রেম-জাগানো আধা-সামাজিক নাটক অভিনয় করা হোক্। কিন্তু কমলাসন আর কালাপাহাড় তার বিরোধিতা কর্‌ল। তারা বল্‌ল,—করুণরসের একটা পৌরাণিক পালা বাছা হোক্। পৌরাণিক পালা ছাড়া পাড়াগাঁয়ে জমে না।

নিজেরা কিছু ঠিক করতে না পেরে তারা তাদের মাষ্টার বুড়ো ত্রিবেণী বৈরাগীর কাছে গেল। মাষ্টার বললেন,—'পালা খুলতে হলে পৌরাণিক। আমাদের আগেকার 'সীতার বনবাস' পালার এক একখানা গানে গাছের পাতা ঝরে পড়ত। এই বলেই তিনি বেহালাটা নিয়ে একখানা গান ধরে ফেললেন,—'ওরে

যা রে ভাই লক্ষ্মণ, পঞ্চবটী-বন, অভাগিনী সীতা দে রে বিসর্জ্জন।' গানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভুরু কুঁচকে চোখ মুদে বেহালায় করুণ তান তুললেন। ছোকরারা সকলে মুগ্ধ হয়ে গেল। ঠিক হ'ল 'সীতার বনবাস' নাটকই অভিনয় হবে।

বই আনানো হ'ল, পাঠ লেখা সুরু হ'ল। এবার সমস্যা দাঁড়াল পাঠ নির্ব্বাচন নিয়ে। হনুমানের পাঠটা কেউই নিতে চায় না। সবাই চায় রাবণের পাঠ। যাত্রার আসরে যদি ঝক্‌ঝকে পোষাক আর পালকের মুকুট পরে না নামা গেল—তাহ'লে সবই মিছে। মাষ্টার সকলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা মীমাংসা করে দিলেন। রাবণের পাঠ লঙ্কেশ্বরকে দেওয়া হ'ল—রামের পাঠ রাজনন্দনকে। মাষ্টার বোঝালেন,—ওরা ঐ রকম পাঠ করবে ব'লে ভগবান্ ওদের ঐ রকম নাম দিয়েছেন। একজন ছোকরা আপত্তি করে বসল। লঙ্কেশ্বরের আসল নাম ফটিক,—ছেলেবেলায় খুব লঙ্কা খেতে পারত বলে তার ঠাকুরদাদা ঐ নাম দিয়েছেন। যাই হোক, মাষ্টারের উপর কারও কথা চলে না—মাষ্টারকে না পেলে পালাই সেট হবে না। সকলেই তাঁর নির্ব্বাচন মেনে নিল। তিনি কালাপাহাড়কে ডেকে বললেন,—'তুমি করবে হনুমানের পাঠ। ত্রেতা যুগের হনুমান কলি যুগে কালাপাহাড় হয়ে জন্মেছিলেন,—এ কথা আমি নিজে গীতায় পড়েছি।' সকলে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকাল।

মাষ্টার বোঝালেন, বইখানার মধ্যে হনুমানের পাঠই শ্রেষ্ঠ পাঠ। তাঁকে হারমোনিয়াম বাজাতে হবে,—নচেৎ তিনি নিজেই একবার দেখিয়ে দিতেন আসরে সবচেয়ে বেশী হাততালি কে পায়। কালাপাহাড় উৎসাহিত হয়ে বল্‌ল—'আপনি একটু দেখিয়ে দেবেন,আমার ও-পাঠ খুব পছন্দ।'

যাত্রার দিন বিপুল উৎসাহে সকলে কাজে লেগে গেল। ছোকরা পার্টির মুস্কিল এই যে—সমস্ত কাজ তাদের নিজেদের করতে হয়। ভিন্ন গাঁয়ের দল এলে গাঁয়ের মাতব্বরেরা তাদের একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। কিন্তু গাঁয়ের ছোকরারা যাত্রা করলে তাঁরা কোন ব্যবস্থা করতে নারাজ—উপরন্তু নানারকম জুলুম করেন।

আসর করা, সামিয়ানা টানানো, চাটাই বিছানো, আসরে যন্ত্র দেওয়া—সমস্ত কাজ পার্টির লোককেই করতে হ'ল। ভিন্ন গাঁ থেকে সাজ ভাড়া ক'রে আনা হয়েছে,—তার জন্যে পার্টির মাতব্বর ছোকরাদের চৌদ্দ সিকা ক'রে চাঁদা দিতে হবে। দু'-একজন বলেছিল—'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' পার্টির বাকি ছোক্‌রারা লাল চোখে তাকানোতে তারা চুপ ক'রে গেল। বাঁশী

বাজানো, পেণ্ট করা ইত্যাদি বাবদে বাইরে থেকে জনকতক লোক আনা হয়েছে—তাদের লুচি খাওয়াতে হবে—তাও নিজেদের পকেট ভেঙ্গে। নিজেরা বাড়ীতে গিয়ে খাবে—জলে ভিজানো ভাত। অভিনয়ের পর অধিকাংশ সময় তাদের লাভ হয় কদর্য্য সমালোচনা ; তবু তাদের উৎসাহের কমতি নেই।

একটা প্রধান মুস্কিল হ'ল গাঁয়ের মাতব্বরদের নিয়ে। তাঁরা সন্ধ্যে হতেই সাজঘরে এসে চীৎকার করতে লাগলেন—'হতভাগারা, রাত ত্বপুরে যাত্রা যুড়ে সব লোককে নিউমোনিয়ায় ভোগাবি ?—এখনই পালা যোড়্, নচেৎ সবাই চলে যাব।'

তাঁদের তাড়াতাড়ির চোটে রাজনন্দন চুল না পরেই আসরে চলে গেল। রামের পাঠটা গোড়াতে সে জমাল মন্দ নয়। তারপর মাথায় হাত দিয়ে 'মোশান্ দেখাতে গিয়ে সে বুঝতে পারল যে চুল পরে নি। তার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। নিতান্ত দায়ে পড়ে মন-মরার মত গোটাকতক কথা বলে চেয়ারে বসে পড়ল সে।

কয়েকটা সীন হবার পর হনুমানের সীন এলো। হনুমান আগে হতেই তৈরী ছিল। মাষ্টারের কথামত সে লেজ কোমরে জড়িয়ে সদন্ত হুঙ্কারে আসরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। সাজঘর থেকে আসরটা ছিল অনেকটা তফাতে। অনেকখানি রাস্তা পেরিয়ে তারপর আসরে যেতে হয়। হনুমান যখন সাজঘর থেকে আসরের দিকে অগ্রসর হ'ল, তখন কোথা হতে গাঁয়ের যত কুকুর এসে তাকে ঘেরাও করল।

সে যতই আসরের দিকে যেতে চায় ততই তারা তেড়ে তাকে কামড়াতে আসে। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে সে আসরেও যেতে পারে না, সাজঘরেও ফিরতে পারে না। পাশেই একটা খড়ের ঘর ছিল, নিরুপায় হয়ে কালাপাহাড় সেই ঘরটার চালে উঠে পড়ল। চালটা খুব পুরোনো। যেমন ওঠা—অমনি চাল ভেঙ্গে সে ভিতরে পড়ে গেল।

এদিকে আসরে রামচন্দ্র 'হনুমান্' হনুমান্' ক'রে ঘন ঘন চীৎকার করছেন। সাজঘর থেকে একজন গিয়ে আসরে মাষ্টারের কাছে একটু সময় চাইল। মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কনসার্ট সুরু করে দিলেন। রামচন্দ্র আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন।

হনুমানকে উদ্ধার করার জন্য সকলেই সেই ঘরের পাশে হাজির হ'ল। হায়! হায়! ঘরটা তালাবন্ধ, আবার সেই তালা গবর্ণমেণ্ট থেকে সীল করে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা নিয়ে নাকি মালিকের কোন্ মামলায় ঘরটার এই পরিণতি হয়েছে। এখন হনুমানকে উদ্ধার করা সামান্য ব্যাপার নয়।

গাঁ থেকে থানা তিন ক্রোশ দূরে। থানা থেকে চাবি এনে ঘর খুলতে অনেক দেরী। তা ছাড়া থানাও সীল ভাঙ্গবে কিনা সন্দেহ। এমত অবস্থায় কালাপাহাড়কে উপর পানে তুলে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। তাড়াতাড়ি একজন হনুমান সেজে আসরে যাবে সে উপায়ও নেই। হনুমানের পোষাক মোটে একটি, সেটি কালাপাহাড় পরে আছে। তা ছাড়া ওরকম বড় পাঠ আর কেউ মুখস্থও করে নি।

সাজঘর থেকে ম্যানেজার কমলাসন সকলের সঙ্গে যুক্তি করে ঠিক করল—যাত্রা বন্ধ রাখা হোক। বিরিঞ্চি সীতার পাঠ করছিল, সে একটু বলতে কইতে পারে। সে সীতার পোষাক পরেই আসরে গিয়ে মিহি গলায় যেমন ঐ কথা বলল—অমনি চারিদিক্ থেকে লোক হৈ হৈ করে উঠে পড়ল। কতকগুলো ছোকরা অসভ্যতা করে চারদিকের সামিয়ানার দড়ি খুলে দিল। সীতা, মাষ্টার সবাই চাপা পড়ল।

ঝগড়াটে পড়ুয়া

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

টুটুল আর পিণ্টু ঘুমিয়ে পড়েছিল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তার ঠিক নেই। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল টুটুল দিদি। কে ডাকছে না ?

(নেপথ্যে) : টুটুল ! (টুটুল চোখ রাগড়াচ্ছে।)

নে : টুটুল, টুটুল, টুটুল !!

টু : হুঁ:, কে ডাকছেই তো ! কে গা ? এই পিণ্টু, ওঠ্ না— ! (পিণ্টু উঠে বসল।)

(নেপথ্যে) : টুটুল—টুটুল—টুটুল—টুটুল !

টু : এই তো—এই তো আমি।

নে : আ—আ—আসবো ?

টু : হ্যাঁ তো। তুমি কে ?

নে : আ—আর কে আছে টুটুল ?

টু : আমার জলি পুতুল।

পি : আ—আমি আছি—পিণ্টু। ১১ এক্কে ১১, তুমি কে বল না ?

নে : আ–আ–আ–আমার ক-কথা বলছ– (বলতে বলতে নামতা দাদার প্রবেশ। গায়ে নামাবলী—কিন্তু তাতে হরিনাম লেখা নেই,– নামতাবলী বলা যেতে পারে। চাদরটির

আষ্টেপৃষ্ঠে নামতা ছোপান রয়েছে। মাথায় তিনটে মস্ত মস্ত টিকি, তাতে আবার ছোট্ট কার্ডবোর্ডের ওপর কালি দিয়ে লেখা—"সাত সাত্তে উনপঞ্চাশ")

নামতা : আমার কথা ব-ব-বলছ ? আ-আ-আমার নাম না-না-নামতা।

পি : ও বাবা : ! তু—তু—তুমি তোতলা নামতা-?

টু : তাই বুঝি ? আমতাবেড়ে ধাম তার ?

না : ঠা-ঠাট্টা নয়। আমি স—স—সত্যি বলছি।

তি—তি—তি তিন তিরিক্কে নয়,
তি—তি—তি তিন দু'গুণে ছয়,
আট দু'গুণে ষো—ষো - ষোল।
আমার না—নাম নাম্‌তা।
মা—মামার বাড়ী আ—আমতা,
আমায় কে - কেন ভো-ভোল ?

পি : ওঃ, তোমায় ভোলবার যো আছে ?

টু : মা তো নামতা দিয়েই বসিয়ে গেল—যত সব বিদ্‌ঘুটে নাম্‌তা—

না : না—না, মোটেই বিদ্‌ঘুটে নয়.— সো-সো-সোজা !

পি : সো-সো-সোজা ! ষোল ষোলং ষোল না ?

না : উহুঃ হো-হো-হোল না।

টু : নয় তো কত বলো না ?

না : উঁহুঃ, তা—তা আমি বলব না।

পি : বেশ, আমতাবেড়ের নাম্‌তা, আমরা তোমায় চাই নে, যাও—

টু : তুমি সরে পড়ো—

না : বা—টু-টুটুল,—আ-আমি যে তো-তোমার কাছেই এলাম।

টু : এলে তা কি নাচব ?

ষোল বারং কপ চানি।
আমরা তোমায় বেশ জানি ॥

পি : তোমার জ্বালায় খিদে পেলে খবার যো নেই—

টু : ঘুম পেলে ঘুমোবার যো নেই। এখন তুমি ভাগো।

না : মি মিথ্যে কেন রাগো টুটুল দি—

পি : ও মা, আবার দিদি ! ও তোমার দিদি হতে যাবে কেন ? টুটুল তো আমার দিদি—

না : স—সত্যি বলছি পি—পি—পিণ্টু দাদা—। তোমরা ডা-ডাকলে তা—তাইতো আমি খেলতে এলাম।

টু : আহাহাহা ! তাতেই আমি বর্ত্তে গেলাম ! তোমার সঙ্গে খেলি, আর মা যখন বল্‌বেন, "নয় ষোলং কত ?"

পি : আর না বলতে পারলেই মা বলবেন—পিণ্টু, কিছু হয় নি—ফের নামতা মুখস্থ কর—তখন ?

টু : হ্যাঁ, তখন ?

না : বে—বেশ, যা মনে আসে ব'লো।

টু : তোমার বাঁধা নামতা আমরা বলতে পারবো না।

পি : ঠিক, পারবোই না তো। তাহ'লে কি হবে ?

না : বে—বে—বেশ, না—না বল্‌লে। আমার কি—কিস্যু আপত্তি নেই।

টু : তুমি তো বল্‌লে আপত্তি নেই ! মাষ্টার মশাই আর মা শুনবেন কেন ?

পি : হ্যাঁ তো, কান পট্‌পট্‌ পিঠ ঝট্‌পট্‌ হয়ে যাবে—

না : (ভীষণ চটে)

আ—আলবৎ শু—শু—শুনেগা।
আমি শ্রীমান্ না—নামতা।
মা—মা—মামার বাড়ী আমতা ॥

আমি হু - হু—হু - হুকুম দিলে শু—শু—শুনতেই হবে।

টু : যদি বলি সাত তেরোং সতেরো ?

না : বে—বেশ তো, তবে সতেরো।

পি : ধরো, যদি মাকে বলি নয় তেরোং আঠারো ?

না : উ—উ—উত্তম, ত - তবে আঠারো।

(শুভঙ্করীর প্রবেশ। ফিট্‌ফাট্‌ ভয়ঙ্কর চেহারা - খোঁচাখোঁচা শণের নুড়ীর মত চুল—উঁচু করে টেনে খোঁপা করে বাঁধা—কোমরে আঁচল জড়ানো। কে বলবে পণ্ডিত শুভঙ্কর কোন দিন এ মূর্ত্তি কল্পনা করেছিলেন !)

শু : আঠারো আমার মেজমামা, লোক ভালো। তবে লোকে বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। সেটা বিলকুল মিথ্যে—আমি—আমি হলপ--

টু : হলপ তোমায় করতে হবে না। তুমি কেমন লোক গা ? বলা নেই কওয়া নেই, ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকে পড়া ?

না : তা—তা—তা শো—শো—শোন টুটুল –

পি : শু—শুনবে কি ? টেরেসপাস করবে ?

টু : বিনে টিকিটে গাড়ী চড়বে ?

পি : গাছের ডালে চড়ে মোহনবাগানের খেলা দেখবে ?

টু : বিনে নেমন্তন্নের ভোজ ?

পি : তুমি কে ? তোমার পাশ আছে ?

টু : মান্থলি টিকেট প্লীজ ? পুলিশ ডাকবো ?

শু: আহাহাহা! আমি কোথা যাবো গো? একটু আগে ডাকছিলে কাকে শুনি? মার হুকুমটা কি একবার বল তো?

কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিহ্যে।
কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিহ্যে॥

মাগো মা, আঁক শিখিয়ে মুখে ফেনা উঠে গেলো, আর আমায় হেনস্থা!

আমি হচ্ছি আঁকের মাসী শুভঙ্করী।
নামতার বেলায় নেমন্তন্ন,
আমার বেলায় থানা-পুলিশ, কাণাকড়ি!

এবার অমি চেঁচিয়ে কাঁদবো, হ্যাঁ— (তারপর?)

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

ইংরেজী বছরের শেষে তোমাদের অনেকেই এবার নতুন ক্লাসে উঠলে। এই সুযোগে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছাটাও জানিয়ে রাখলাম। আজকাল অবশ্যি নববর্ষ বলতে আমরা ১লা বৈশাখকেই বুঝি, কিন্তু অধিকন্তু আর একটা শুভেচ্ছা জানাবার সুযোগ পেলে দোষ কি?—বিশেষতঃ যখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এই সময়টাকেই নববর্ষ ব'লে গণ্য করা হচ্ছে?

এই সময় সমস্ত দেশ যুড়ে সভা-সমিতির—সম্মেলনের যেন হিড়িক পড়ে যায়, এবারেও তার কিছুমাত্র কমতি দেখছি না। সাহিত্য-সম্মেলন, বিজ্ঞান-সম্মেলন, ইতিহাস-সম্মেলন, অর্থনীতি-সম্মেলন, দর্শন-সম্মেলন ইত্যাদি তো আছেই, তা ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও এই সময়ে বার্ষিক উৎসবের ধূম পড়ে গেছে। ছোটদের প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই সময়েই যত কিছু উৎসবের ঘটা। তা ছাড়া আছে নানা রকমের প্রদর্শনী। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার কথা বল্‌ব? নিমন্ত্রণ-চিঠিতে আমার টেবিল প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে। এই সুযোগে এঁদের সকলকেই আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গোস্বামী—(খিদিরপুর)—সব মানুষের মধ্যেই ভালমন্দ মিশিয়ে আছে। কেবল মাত্র গুণ কিংবা কেবল মাত্র দোষ কারুর মধ্যেই থাকতে পারে না—বাস্তব জগতে তা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের দোষ-ত্রুটিগুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি,—তুমি-আমিও যখন তার থেকে মুক্ত নই? প্রত্যেকের মধ্যেকার ভালটকুই শুধু দেখতে শিখলে জীবনের অনেক অশান্তি—অনেক অতৃপ্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। শ্রীশিবানী ভৌমিক (লক্ষ্ণৌ)—শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জণের 'ঠাকুমার ঝুলি' শুধু বাংলা শিশুসাহিত্য কেন, বিশ্বের শিশুসাহিত্যের একখানি অনবদ্য বই। কিন্তু তাঁর পরবর্ত্তী কালের লেখা বইগুলি তত জনপ্রিয় (তোমার ভাষায় "ছোটদের কাছে লোভনীয়") হয় নি কেন জানতে চেয়েছ। এর কারণ বলা কঠিন। হয়তো তিনি বর্ত্তমানে যে রকম ভাষা—লিখবার যে পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন শিশুচিত্তে তা তত সাড়া

আনতে পারে নি। শ্রীমল্লিকা দেবী (পাটনা)—তোমার ধারণা ঠিক নয়। লাডলীমোহন নামটা শুনে ইংরেজী নাম বলেই মনে হয় বটে কিন্তু আসলে ওটি শ্রীকৃষ্ণের নাম।

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে ভীষণ, তাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এবারের চিঠি এখানেই শেষ করি।

—ইতি রাঃ সঃ

আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ

হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস

হায়দ্রাবাদে সমারোহের সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসের ৫৮তম অধিবেশনের আয়োজন হচ্ছে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল

এবারেও সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন শ্রীজওহরলাল নেহরু।

কলকাতায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের আগমনে কলকাতা কয়েকদিন বেশ সরগরম হয়ে ছিল। কলকাতা হচ্ছে রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রথম জীবনের কর্ম্মভূমি; তাঁর কলেজ-জীবনও এই সহরেই কেটেছে। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে ঐ কলেজের মিলনী সভায় তিনি এ সম্পর্কে আবেগময়ী ভাষায় অনেক কথা বলেছেন। এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবেও

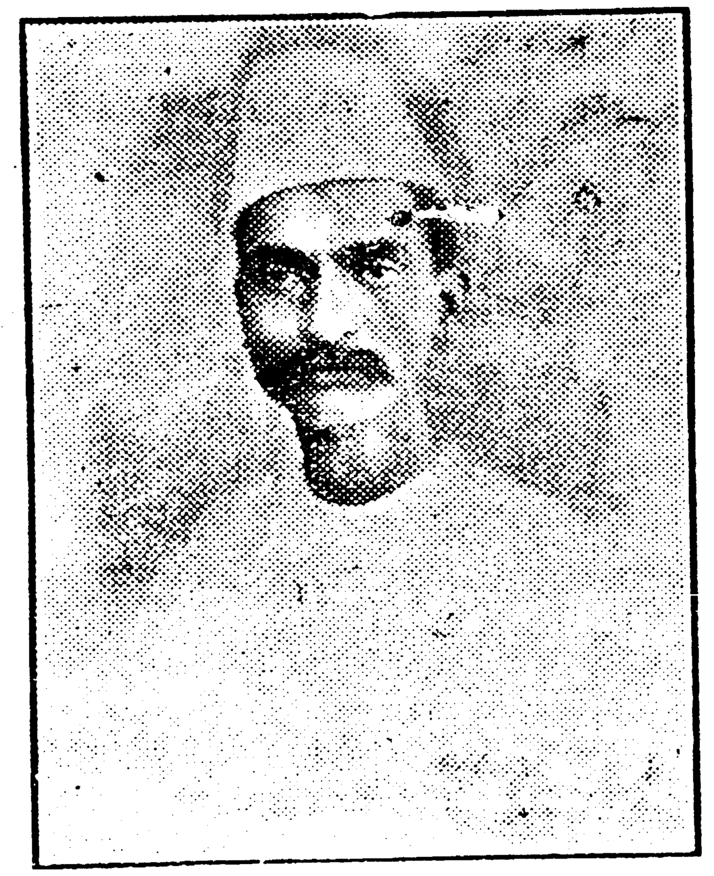

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—যখন কলকাতায় থাকতেন।

তিনি ভাষণ দিয়েছেন,—সবই বাংলা ভাষায়। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর উপাধি দেওয়ায় তিনি বলেন, ছাত্রজীবনে যে উপাধি

গবেষণা দ্বারা অর্জ্জন করার জন্য তিনি এক সময়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন আজ সেই পরম কাম্য উপাধি বিনা পরিশ্রমে অর্জ্জন করে তিনি নিজেকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করছেন।

খেলাধূলার খবর

ভারতীয় দলের সঙ্গে পাকিস্তান দলের শেষ ক্রিকেট টেষ্ট কলকাতায় অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। মোট ৫টি খেলার মধ্যে ভারত ২টি খেলায় জয়ী হয়েছে, পাকিস্তান হয়েছে ১টিতে। বাকি ২টি ড্র হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দলই বিজয়গৌরব "রাবার" অর্জ্জন করল। ভারতের সুদীর্ঘ ক্রিকেট-ইতিহাসে তাদের এই সর্ব্বপ্রথম সরকারী ভাবে রাবার লাভ হ'ল।

বিজয় হাজারের নেতৃত্বে ভারতীয় দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এ ক্রিকেট খেলতে গেছে।

কলকাতায় ন্যাশনাল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এবারে সিংগ্‌ল্‌স্‌এ বিজয়ী হয়েছেন সুমন্ত মিশ্র।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। রাজা মৃগয়ায় গেছেন, রাজপুরী অন্ধকার। (গয়া, পুরী)
২। মহেঞ্জোদড়োয় প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে। (চীন, সিন্ধু)
৩। তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমি কিন্তু পাট না নিয়ে যাব না। (যাভা, পাটনা)
৪। বৈকাল বেলা উত্তরের জানালা খুল না, কাশী হ'তে পারে। (বৈকাল, খুলনা, কাশী)
৫। ঘরের সবটাই টালি দিয়ে ঢাকা। (ইটালি, ঢাকা)

উত্তরদাতাদের নাম :— শিপ্রা সোম (কলিকাতা); মনোজিৎ রায় (এলাহাবাদ); রেবা, খোকন, মন্তু ও ডলি (কটক); সীমা ও তৃপ্তি (কলিকাতা-২৯); জ্যোৎস্না দাশগুপ্ত (নিউদিল্লী); চন্দন ও পল্টু (বালীগঞ্জ); পঙ্কজিনী সাহু (পুরী); কাননকুমার ঘোষ (গয়া); সমীর ভট্টাচার্য্য (মেদিনীপুর); নিমাই দাস (হুগলী); বলু, ধলু ও শিশির (কুসুমডাঙ্গা); নন্দলাল দত্ত (কলিকাতা-২৯); শেখর সেন (কলিকাতা ১২); নমিতা ও অমিতা (নাগপুর); রুক্মিণী বটব্যাল (শিলং)।

নূতন ধাঁধা

এবার ছুটীতে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছি? জায়গাটার নামের প্রথম অক্ষর আমি বলব না। শেষে রয়েছে পুর—এইটুকু শুনে রাখতে পার। বল দেখি কোন্ জায়গায় যাচ্ছি?

কার্ত্তিক মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

সবচেয়ে ভাল রচনার জন্য পুরস্কার পেলেন শ্রীনন্দিতা চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা-২৯)।

আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে—শ্রীঅরিজিৎ বসু (কানপুর), শ্রীগৌরকিশোর চৌধুরী (মণিনাথপুর), শ্রীসুবর্ণা গুপ্তা (দিল্লী)।

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এই সংখ্যা রামধনুর ৪০০ পৃষ্ঠায় 'প্রতিযোগিতার ছবি' নামে যে ছবিটি বেরিয়েছে সেইটি দেখে একটি ছোট গল্প, কবিতা বা রসরচনা লিখে পাঠাতে হবে। আমাদের বিচারে যার লেখা সব চেয়ে ভাল হবে সে-ই পাবে পুরস্কার। প্রতিযোগিতায় যে কেউ যোগ দিতে পারবে তবে প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে, পূর্ণ ক'রে, আঠা, পিন বা সূতো দিয়ে যুড়ে দিতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। লেখা আগামী ২৯শে মাঘের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

কুপন
রামধনু
পুঃ পৌষ ৫৯

নাম—
ঠিকানা—
বয়স— নিজে গ্রাহক কিনা—

— পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। —

বিশ্ব পরিচয়

পৃথিবীর সকল দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস সহ পাঁচশতাধিক একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ ৮৲

বিশ্বকথা সিরিজ

সোভিয়েৎ দেশ ১।০

দশ বছর পরে পুনরায় ছাপা হইল।

বিশ্বকথা সিরিজ

জার্ম্মান দেশ ১।০

শ্রীপ্রভাবতী দেবীর

কৃষ্ণা-সিরিজ

(মেয়েদের অ্যাড্‌ভেঞ্চার)

প্রথম-গ্রন্থ :—

কারাগারে কৃষ্ণা ১॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

বিচিত্রা-সিরিজ

(ডিটেক্‌টিভ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার)

প্রথম গ্রন্থ :—

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন

অনুবাদ সাহিত্য

অলিভার টুইষ্ট ১॥০
ব্ল্যাক অ্যারো ১॥০
ট্রেজার আইল্যাণ্ড ১॥০
টেল্ অব্ টু সিটিজ.
অ্যাড্‌ভেঞ্চার অব মার্কো পোলো ১॥০
কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিষ্টো ১॥০
ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড ১॥০

শিশু-মাসিক

শুকতারা

প্রতি সংখ্যা— ।৵০
বার্ষিক— ৪৲

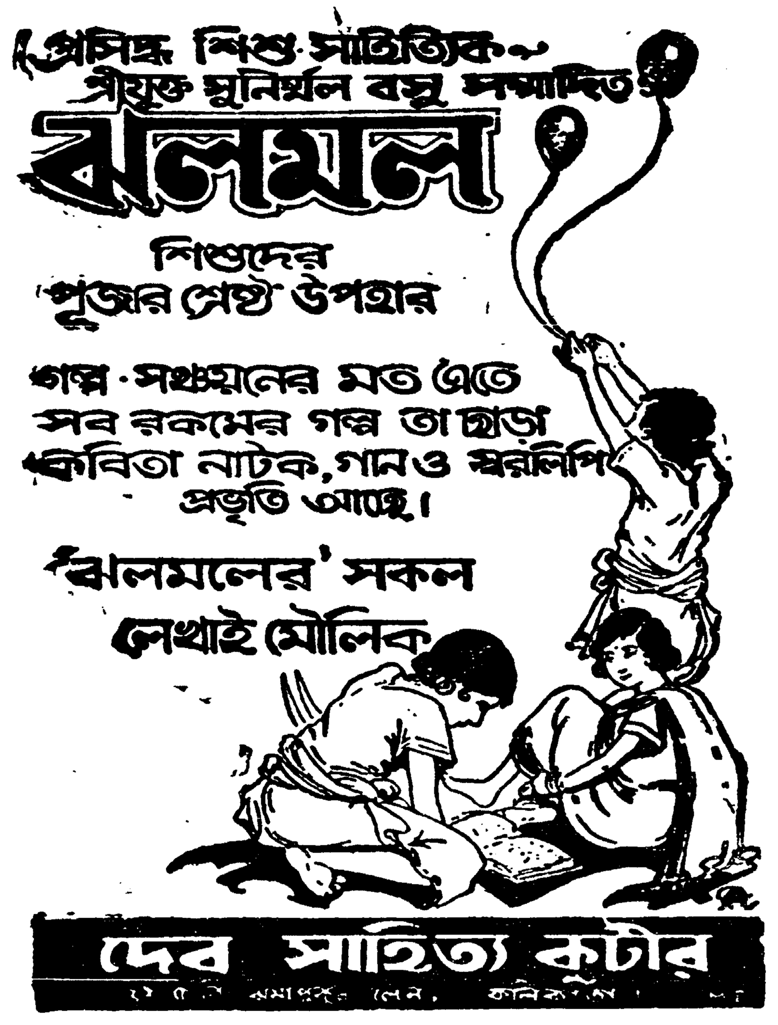

১৬ খানি রঙ্গিন ছবি ও অসংখ্য রেখাচিত্রে পরিশোভিত। দাম—৩৲

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প সঞ্চয়ন
আলো দিয়ে গেল
যারা—২৲

*

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

চতুর্দশ গ্রন্থ :—

কমলাকান্তের দপ্তর ১৲

অমর বীর সিরিজ

দশম গ্রন্থ :—

বারীন ঘোষ ।০

ভ্রমণ, শিকার ও অ্যাডভেঞ্চার

আকাশ গঙ্গা ১॥০
দুর্গমের বিভীষিকা ১৲
সুন্দর বনের শিকারী ১৲
আবার যখের ধন ১।০
হিমালয়ের বুকে ১৲
বামনের দেশ ৸০
দৈত্যপুরী ৸০

শিশুনাটক

সিপাহী বিদ্রোহ ১৲
কেদার রায় ॥৵০
বীর শিবাজী ॥৵০
স্বামীজী ॥৵০
স্বাধীনতা জাগলো ॥০
জাগো রে ধীরে ॥৵০

দেবসাহিত্য কুটীর * * * ২২।১বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিত্বায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা.

রামধনু

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই

[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোস্যাল এডুকেশন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত]

১।	মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু	...	৪৸০
*২।	গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১।০
*৩।	মাঞ্চুসেনের অ্যাড্ভেঞ্চার— „	...	৸০
*৪।	ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস	...	১।০
*৫।	„ আইনষ্টাইন— „	...	১।০
৬।	„ মার্কনি— „	...	১।০

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত
বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

চয়নিকা

মাসিক পত্রিকা
নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নেতাজীর জন্মদিনে

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ | মাঘ ১৩৫৯ | ১০ম সংখ্যা

এসো ফিরে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

নেতাজীর নামে আজো জাগে বিস্ময়,
শিরায় শোণিত টগবগ করে ফুটে,
নেচে ওঠে প্রাণে অনন্ত প্রত্যয়,
সব কলরব প্রণাম হইয়া লুটে।

ক্ষাত্র-শৌর্য্যে সর্ব্বদা ভরপূর,
আত্মিক বলে দীপ্ত বৈশ্বানর ;
মন্ত্রের মত জয় হিন্দের সুর
রাঙায়ে দিয়াছে বাঙালীর অন্তর।

দেশ-জননীর এ হেন পাগল ছেলে
দেখেছে কি কেউ ? দেখেছে কি কোন কালে ?

চক্ষে যাহার বাঁকা বিদ্যুৎ খেলে—
ইঙ্গিতে প্রাণ জাগে মৃত কঙ্কালে।

একটি নিমেষে যার উদাত্ত ডাকে
জন-সমুদ্রে জাগে মহা আলোড়ন,
বিভেদ ভুলিয়া নর-নারী লাখে লাখে
স্বাধীনতা-রণে প্রাণ করে অর্পণ।

বাংলার ছেলে, এসো আজ তার লাগি
প্রার্থনা করি মসজিদে মন্দিরে;
বাংলার মেয়ে, এসো তার অনুরাগী,
ডাক দিয়ে যাই—ফিরে এসো, এসো ফিরে।

ভৌতিক সিন্দুক

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

আওয়াজ শুনে সকলেই দ্রুতপদে ছুটল সিঁড়ির দিকে। অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল সিঁড়ির নীচে একটা লোক পড়ে গোঁ গোঁ করছে।

সকলের মুখেই শংকিত ভাব। ডাক্তার নাড়ী দেখে বলল, "ও কিছু নয়, ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওর চোখে-মুখে জল দাও।"

একটু পরেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এলো। তার চোখে-মুখে একটা ভয়ার্ত্ত ভাব। চারিদিকে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে লোকটি অস্ফুট স্বরে বলল, "ভূত···ভূত···!"

লোকটি খালাসী। তাকে ধাক্কা দিয়ে বললাম, "কি বাজে বকছিস্?"

"বাজে নয়, হুজুর," খালাসীটি বল্ল, "আমার মাথায় এক চড় মেরে পালিয়ে গেল। আমি চড় খাওয়ার সংগে সংগে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম কেউ নেই!—হুজুরের বিশ্বাস না হয় ঝাড়ুদারকে জিজ্ঞাসা করুন—"

লোকটার কথা শুনে সকলেই যেন কেমন ভয় পেয়ে গেল। তখন বুড়ো ঝাড়ুদার এগিয়ে এসে বলল, "হ্যাঁ, হুজুর, আজ সন্ধ্যায় আমিও ভূত দেখেছি। ঘর ঝাঁট দেবার জন্য আমি একবার গুদাম-ঘরে গিয়েছিলাম। ঐ লোহার সিন্দুকটার কাছে ঝাঁট দেবার সময় আমি ওর কড়াটা ধরে একবার টেনেছিলাম। সংগে সংগে কেমন একটা বিশ্রী ধুপ্ ধুপ্ শব্দ হতে লাগল; মনে হ'ল কারা যেন ছুটে আসছে। ভয়ে আমি দৌড় দিলাম। একবার ফিরে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম একজন কে যেন আলমারীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে—কি ভীষণ তার মুখ—!" ঝাড়ুদার বলতে বলতে ভয়ে আঁৎকে উঠল।

আমাদের সকলের গায়ের মধ্যেও কেমন যেন শির শির করে,—লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

ক্যাপ্টেন হতভম্বের মত মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "জানি না এ কি ব্যাপার। ভগবান্ আমাদের রক্ষা করুন।"

উত্তেজিত কণ্ঠে ডাক্তার বলল, "ঐ ভূতুড়ে সিন্দুকটা আসার পর থেকেই আমাদের জাহাজে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে। কাল সকালেই ওটাকে ভাঙ্গা হোক।"

ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেন বললেন, "সেই ভাল, আমার মতও তাই।"

এর পর আর কথা হ'ল না। সকলেই স্থির করল আর ঘুমোনো নয়, বড় হল্ ঘরটায় চারিদিকে আলো জ্বেলে দল বেঁধে সবাই বসে থাকবো।

সকলে হল্ ঘরে গিয়ে বসে নানা রকম জল্পনা করতে লাগলাম। শুধু মৃণাল দেখলাম চুপটি করে নিজের চেয়ারে বসে আছে।

ক্যাপ্টেনের ঘরের বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করে রাত্রি তিনটা ঘোষণা করল।

আমি একদৃষ্টিতে গুদাম-ঘরের দিকে চেয়ে ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, ওখানে এখনও হয়তো অতৃপ্ত আত্মাগুলি কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। এখুনি হয়তো অন্ধকার গুদাম-ঘরের সকল রহস্য-যবনিকা ভেদ করে জেগে উঠবে একটা মুখ—ভয়ংকর—কুৎসিত! কিন্তু সে রাত্রে আর কোন ঘটনা ঘটল না।

পরদিন ব্রেক-ফাস্টের পরই সকলে এসে সমবেত হ'লাম গুদাম ঘরে। মৃণাল ক্যাপ্টেনকে বলল, "আমাকে যদি অনুমতি দেন তা হলে আমিই সিন্দুকটা ভাঙ্গি।"

ক্যাপ্টেন খানিকটা ভেবে বললেন, "বেশ, তুমিই তা হলে ভাঙ্গ।" বলতে বলতে তিনি পকেট থেকে পিস্তলটা বার করলেন। তাঁর দেখাদেখি আমি এবং ডাক্তারও পিস্তল বার করলাম।

মৃণাল সকলের দিকে চেয়ে বল্ল, "আপনারা সকলে পাশে সরে দাঁড়ান, কেউ সিন্দুকের সামনে থাকবেন না। আর যদি সিন্দুকে কিছু দেখেন, তাহ'লে তাকে গুলি করে বসবেন না।"

সিন্দুকের কপাটের কব্জার ওপর হাতুড়ির পর হাতুড়ি ঠুকতে লাগল মৃণাল। অন্যান্য সকলে একদৃষ্টিতে চেয়ে ওর কার্যকলাপ দেখতে লাগল। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল! আচম্বিতে যেন একদল দানব ঘুম থেকে জেগে উঠল! সমস্ত ঘর প্রকম্পিত করে শব্দ হতে লাগল—ধুপ—ধুপ্—ধুপ্—ধুপ্! প্রতি মূহূর্ত্তেই মনে হতে লাগল শব্দ যেন এগিয়ে আসছে কাছে আরো কাছে!

ঘরের সব ক'টি লোক লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভীত দৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে লাগল। চকিতে মৃণাল সিন্দুকের এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বল্ল, "খবরদার, কেউ বাইরে যাবে না, এখানে সকলে একসঙ্গে থাকো।"

সহসা সেই ধুপ্-ধুপ্ শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের কপাটের একটা পাল্লা খুলে গেল। মুহূর্ত্তে সকলের শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত শির শির করে বয়ে গেল—বিস্ময়ে সকলের চোখের মণিগুলো স্থির হয়ে গেল। সুস্পষ্ট দিবালোকে আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ওকি—কে? কে? ও কে?

৫

সিন্দুকের ভিতরে কপাটটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মানুষ! এ বুঝি কোন শ্মশানচারী প্রেতলোকবাসী। যুগ যুগান্তরের বিভীষিকা যেন মূর্ত্তিমান্ হয়ে কবর খুঁড়ে উঠে এসেছে!

পরক্ষণেই সিন্দুক থেকে প্রায় চার হাত লম্বা একটা কি বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে বেরিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। তার পরই কপাটটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

কারো মুখে একটি কথাও নেই, নড়বারও শক্তি নেই কারো। ভয়ে, বিস্ময়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে সকলে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু মৃণাল! ও কি পাগল হয়ে গেছে? নইলে এই ব্যাপারের পরও কেউ আবার সাহস করে এগিয়ে গিয়ে কপাটের কব্জার ওপর হাতুড়ী ঠুকতে পারে?

আমরা তখনও তেমনি নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে মৃণালের হাতুড়ি সমানে ওঠা-নামা করছে।

মিনিট পনেরো অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কপাটের একটা পাল্লা ভেংগে পড়ে গেল। সংগে সংগে মৃণাল একলাফে একপাশে সরে গেল। আবার সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই বীভৎস মূর্ত্তি,—আর সেই সংগে শোনা গেল সেই প্রাণ-কাঁপান ধুপ্ ধুপ্ শব্দ। পর মুহূর্ত্তেই সিন্দুক থেকে প্রায় চার হাত লম্বা কি যেন একটা বিদ্যুৎ-বেগে সামনের দিকে বেরিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

এবারে সকলে ভীত দৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে লাগল। ধুপ্ ধুপ্ করে যার পদশব্দ শোনা গেল সে কে?—কোথায় সে?—কই, কেউ তো নেই কোথাও! অথচ এই ঘরেই তার পায়ের শব্দ শোনা গেছে একটু আগে—দু'-দু'বার।

আমি পিস্তলের বাঁটটা আরও জোরে চেপে ধরলাম। ক্যাপ্টেন বিকৃত স্বরে চীৎকার করে উঠলেন, "কে—কে তুমি?—বেরিয়ে এসো, নইলে গুলি করবো—।"

কিন্তু আশ্চর্য্য! বীভৎস মূর্ত্তিটা একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ একেবারে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে, চোখে পলক নেই,—দৃষ্টিতে জীবনের কোন লক্ষণই নেই। মনে হ'ল ও বুঝি জীবন্ত পাষাণ—তেমনি স্থির—তেমনি নিশ্চল!

(ক্রমশঃ)

গয়াসুরের উপাখ্যান

শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী

একদিন শুক্রাচার্য্যের কাছে পড়তে গিয়ে ফিরে এসে একটি অসুর বংশের ছেলে তার মা প্রভাবতীকে বললে, "মা, আমি আর পড়তে যাবো না। বাবার নাম বলতে পারি নি বলে সবাই আমায় ঠাট্টা করে। তুমি সত্যি করে বল আমার বাবার নাম কি, কি তাঁর পরিচয়, এখন তিনি কোথায় আছেন?" বলতে বলতে ছেলেটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ছেলের অন্তরের ব্যথা বুঝতে পেরে প্রভাবতীর চোখেও জল এলো। কোন রকমে সামলে নিয়ে বললেন, "বাবা, তুই সত্যিই বড় অভাগা। নইলে তোর বাবা মারা যান? ধুন্দ অসুরের বংশের ছেলে তুই। তোর বাবার নাম ত্রিপুর। তাঁর মত বীরপুরুষ ত্রিভুবনে আর কেউ ছিল না। তিনি দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তখন দেবতারা সকলে মিলে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে গিয়ে করযোড়ে প্রার্থনা করে, তিনি না বাঁচালে দেবকুল আর বুঝি বাঁচে না! দেবতাদের কথা শুনে মহাদেব তোর বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন। যুদ্ধে যাবার সময় নারদের কথায় তোর বাবা আমাকে এখানে রেখে যান এবং এই যুদ্ধেই তোর বাবা মারা যান। তোর বাবা এঁত বিক্রমশালী ছিলেন যে তাঁকে বধ করার জন্যে শিবের নাম হয় ত্রিপুরারি।"

মায়ের কথা শুনে ছেলটীর মুখে হাসি ফুটে উঠল, সে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো গুরু শুক্রের কাছে এবং তাঁকে তার বংশ-পরিচয় দিয়ে বলল, "গুরুদেব, আমাকে বাবার থেকেও বড় রকম বীরপুরুষ হতে হবে—আমাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিন।"

সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য তাকে কোলের মধ্যে সস্নেহে টেনে নিলেন এবং তার পর থেকে তার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হলো।

গুরুর কাছে অস্ত্রশিক্ষা শেষ করে যৌবনারম্ভে ছেলেটি মাকে প্রণাম করে সৈন্য সংগ্রহে বেরুল এবং ত্রিভুবনের সমস্ত অসুরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলো। তারপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুমেরু-শিখরে অসুর সৈন্য সমাবেশ করলো। ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাগণকে তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলো। শেষে স্বয়ং শিবের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। দেবতারা ভীতত্রস্ত হয়ে এবার জগৎ-ঈশ্বর বিষ্ণুর কাছে গিয়ে করযোড়ে স্তব আরম্ভ করলেন।

বিষ্ণু দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আপনারা নির্ভয়ে বাড়ী যান, আমি আজই এই অসুরকে বধ করবো।"

বিষ্ণু বালকবেশ ধারণ করে উপস্থিত হলেন অসুররাজের সম্মুখে। অসুররাজকে সম্বোধন করে বললেন, "আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কর অসুররাজ।" অসুররাজ বালকের দর্প দেখে অট্টহাসি হেসে উঠলো ; বললো, "ওরে বালক, তুই আমার আঙ্গুলেরও যোগ্য নোস্—আমার যে কোন সৈন্যই তোকে পরাস্ত করতে পারে।" কিন্তু বালক নাছোড়বান্দা। তখন মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হলো। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জগতের ঈশ্বর বিষ্ণুও একশ' বছর যুদ্ধ করে অসুররাজকে পরাস্ত করতে পারলেন না। এদিকে অসুররাজ বালকের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে বললে, "তোমাকে আমি মহাবিক্রমশালী বলে বুঝতে পেরেছি এবং তোমার উপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি—তুমি যা ইচ্ছা আমার কাছ থেকে বর চেয়ে নাও।"

বালকরূপী বিষ্ণু হেসে উত্তর করলেন, "মহাবীর অসুর, তুমি যখন একান্তই আমাকে বর দিতে ইচ্ছা করেছ তখন এই বর দাও—তুমি আর কখনও দেবতা বা মানুষের উপর হিংসা করবে না এবং পাষাণ হয়ে থাকবে।"

অসুররাজ বিষ্ণুর কথা শুনে এবং নিজের পূর্ব্বকথা স্মরণ করে মুস্কিলে পড়লো। অবশেষে নিরুপায় হয়ে বিষ্ণুর কথাতে রাজী হলো।

বালকরূপী বিষ্ণুও তখন আনন্দিত হয়ে বললেন, "আমিও নিজের থেকে যেচে তোমাকে বর দিচ্ছি। তোমার কীর্ত্তি জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

অযাচিত কথা শুনে অসুররাজ বললে, "আমি বুঝতে পারছি তুমিই ত্রাণকর্ত্তা। তুমি দয়া করে আমার মাথায় পা দাও এবং আমার নামে এ জায়গার নাম হোক এই আমার মনোবাঞ্ছা। আর এক কথা, যদি কোন দিন তুমি আমাকে ছাড় তবে আবার আমি উঠবো—পাপে পূর্ণ পৃথিবীতে ভুলভ্রান্তির মাঝে তোমায় আবার নিয়ে আসবো।"

বিষ্ণু তখন অসুরের মাথায় পা দিয়ে বললেন, "তোমার উপরে যে তর্পণ করবে এবং পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করবে তার পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বপাপ থেকে মুক্ত হবে! তোমার নাম অনুযায়ী এ স্থানের নাম ত্রিভুবনের সকলে মনে রাখবে, এ স্থানটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে।"

এই মহাপরাক্রমশালী অসুররাজ হলো গয়াসুর। পুরাণে বলে, এরই নাম থেকে গয়া তীর্থের নামকরণ হয়েছে।

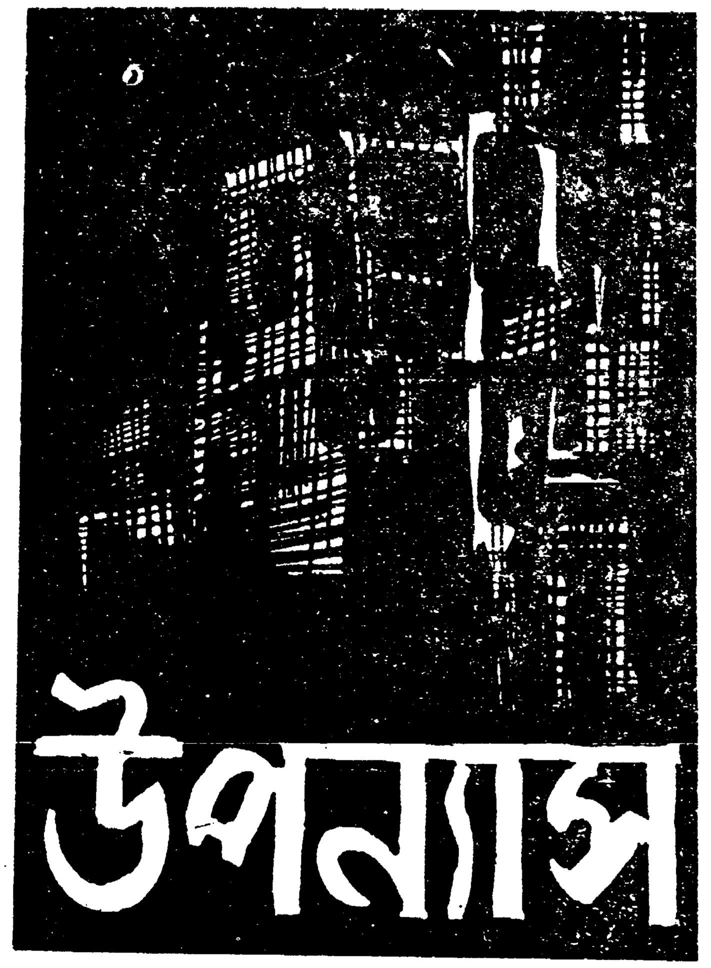

বক ধার্মিক

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ

৩

টিকটিকিটাকে নিজের চোখে দেখলামও। জগদীশদা'দের বাড়িতে বসবার ঘরের জান্‌লায় পরিষ্কার পর্দা টানাচ্ছে। কি চালাক সে আর কি বলব! কে বলবে গোয়েন্দা, স্রেফ একটা চোরের মত দেখ্‌তে। খুদে খুদে ক'রে চুল ছাঁটা, থ্যাব্‌ড়া নাক, ছোট্ট ছোট্ট চোখ নাকের কাছ ঘেঁষে বসানো, কক্ষণও সোজা তাকায় না। কুচ্‌কুচে কালো রং আর ক্যায়সা হাতের পায়ের গুলি। আবার একটা হাত-কাটা গেঞ্জী আর কালো হাফ্‌প্যাণ্ট পরেছে! জগদীশদা'র পিসিমা দেখ্‌লাম লোকটার উপর হাড়ে চটা। মা'কে বল্‌লেন—"বক রাক্ষসের সঙ্গে কোনও তফাৎ নেই। সারাদিন খালি খাই আর খাই। কিছু যদি রাখবার জো থাকে! কি জানি বাবা, সমস্ত ক্ষণ যদি গিল্‌বেই তবে চোর ধরবে কখন?"

লোকটা দেখলাম ততক্ষণে পর্দা টানানো শেষ ক'রে রান্নাঘরের সিঁড়ির উপর বসে বসে এক ঠোঙা মুড়ি কাঁচা লঙ্কা আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে বেশ একমনে খাচ্ছে। এমন সময় জগদীশদা' হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে বল্‌ল, "গুটে কোথায়? এই ব্যাটা, তুই এখানে বসে মুড়ি গিল্‌ছিস্ আর মাইনে খাচ্ছিস, ওদিকে অপূর্বদা'রা ত' সব বের ক'রে ফেল্‌ল!" গুটে মুখে একমুঠো মুড়ি আর একগাল হাসি নিয়ে বল্‌লে—"কি যে বলেন জগদীশ বাবু, চোর ধরা ঐ শা—র কম্ম নয়, ধরে যদি এই শর্ম্মাই ধরবে।"

জগদীশদা'কে ততক্ষণে পিসিমা, মা, জ্যেঠিমা সবাই ঘিরে ফেলেছেন। "কি সর্বনাশ! ও মা, অপূর্বটার পেটে পেটেও এত বুদ্ধি, বাইরে দেখ্‌তে ত' একটা ইষ্টুপিড্! তা' ক'টাকে ধরল? একজনের কাজ ত' নয়।"

"আরে তোমরাও যেমন! চোর ধরা কি অত সহজ? তবে এই প্রথম তাদের আস্তানার একটা চিহ্ন পাওয়া গেছে। আরে, কি মুস্কিল! সব বল্‌ছি। খেলার মাঠের ওপারে জঙ্গলটার মধ্যে ব্যাটারা মহা ফিষ্টি দিয়েছে। অপূর্বদা'রা গিয়ে দেখে চারদিকে কেবল মুর্গীর হাড় আর চিবোন মুণ্ডু, আর খালি খালি সব রসগোল্লার হাঁড়ি, লুচির ঝোড়া। কি রকম সাহস বেড়ে গেছে ভেবে দেখ!

একেবারে প্রায় আমাদের দোর-গোড়াতে বসে ভোজ মেরেছে আর ষড়যন্ত্র করেছে। এবার কী হয় কে জানে! আচ্ছা পিসিমা, তুমি কি সেই সব—"

পিসিমা ভীষণ রেগে বললেন, "চোপ্, ইডিয়ট! হাটের মাঝে হাঁড়িখানা না ভাঙলেই নয়!" গুটে একেবারে পিসিমার ঘাড়ের কাছে এসে হাঁ করে সব কথা শুনছে। পিসিমা বিরক্ত হয়ে নাকে কাপড় দিয়ে বললেন, "কাঁচা পেঁয়াজ গিলে এসে, বাছা, আমার কানের কাছে কি নিশ্বাস না ফেল্‌লেই নয়?" গুটে একটু পরে গিয়ে বল্‌লে, "দেখুন জগদীশ বাবু, আমাকে সব কথা খুলে না বললে কিন্তু চলবে না, তা হলে আমি তদন্ত করব কি করে? আর দেখুন, না হয় চাকরীর খাতিরে চাকর সেজেই আছি, তাই বলে আপনার পিসিমার কি আমার সঙ্গে সত্যি চাকরের মত ব্যবহার করা উচিত? দেখুন, একবার দেখুন, আমার হাতের দশা! সেই সকাল থেকে যে পেছনে লেগেছেন্ এক মিনিটের বিরাম নেই। তার উপর বাইরের লোকের কাছে নানান নিন্দা করছেন, বেণী খাই, বক রাক্ষস! এমন করলে কি করে পারা যায় আপনিই বলুন?"

জগদীশদা' বিরক্ত হয়ে পিসিমাকে বল্‌ল, "আঃ, পিসিমা, সব বোঝ, তবু কেন এ রকম কর বল ত'? চোর ধরলে গভর্ণমেণ্ট থেকে পাঁচশ' টাকা পাওয়া যাবে তা জান? তোমার হরিদ্বার যাবার খরচ উঠে যাবে।"

"না বাপু! আমি হরিদ্বার যাই আর তোমার গুটে গুণধরটি আমার বাবার অত কষ্টের বাকি গয়নাগুলো—" জগদীশদা' ছুটে গিয়ে পিসিমার মুখ চেপে ধরল। গুটে বল্‌ল, "কি গয়না? কোথায় রেখেছেন? না বললে রক্ষা করব কি করে?"

পিসিমা কোনও জবাব দিচ্ছেন না দেখে জ্যেঠিমা রাগ করে বললেন, "চল তোমরা, এখানে আর নয়। আমরা আছি বলে এঁদের কথাবার্ত্তার অসুবিধা হচ্ছে। তা দিদি, তোমাদের সব জুয়ো খেলার গয়নাতে আমরা কেউ নজর দিতে যাচ্ছি না। আমার বাবা যে আমাকে আশী ভরির সোনার গয়না দিয়েছিলেন, আমার তাই যথেষ্ট। গয়না পরার বয়সও গেছে, গুপের বউএর জন্য রেখে দিয়েছি। সেও এমন লুকিয়ে যে চোরের বাবাও তার সন্ধান পাবে না। হ্যাঁ।"

জ্যেঠিমা আমাদের এক রকম টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে এলেন। এসে দেখি গুপেটা একেবারে লাফাচ্ছে। "পুলিশের লোকেরা কিছু পেল না, আর আমাদের অপূর্বদা' কত হাড়গোড় সংগ্রহ করেছেন।" শুনে ভীষণ হাসি পেল। তাও যদি নরকঙ্কাল হ'ত! মুখে শুধু বললাম, "রেখে দে তোদের অপূর্বদা'র বাহাদুরী! কে ওখানে পিকনিক্ করে গেছে, আর তাই দেখে তোদের অপূর্বদা' নেচে কুঁদে একাকার!"

গুপে চটে গেল। "কেউ পিক্‌নিক করবে না ঐ বনের মধ্যে। সবাই জানে ওখানে ভূতের ভয়। বাইরের লোক ছাড়া কেউ ওখানে খাওয়া-দাওয়া করবে না সেটা তুই বেশ জানিস্! ও সব তোর হিংসের কথা। তোদের লাবণ্য দিদির চোখে কাজল লাগাতে আর কপালে টিপ পরতেই দিন কাবার হয়ে যায়, উনি আবার চোর ধরবেন! জানিস্, কাল সকালে পুলিশের সাহায্যে বনটাকে গোরু-খোঁজা করা হবে, সরু চিরুণী দিয়ে আঁচ্‌ড়ান হবে। ভূতের বাড়িটার আগে পর্য্যন্ত চষে ফেলা হবে।"

"হ্যাঁ, তাই বল্। ভূতের বাড়ির নাম শুনেই তোদের অপূর্বদা'র দাঁত কপাটি লেগে যায়, উনি যাবেন সেখানে সার্চ করতে! রেখে দে তোর বড় বড় কথা! পূজোর সময় থিয়েটার দেখে ফেরার পথে বাঁশ গাছের ছায়া দেখে কি কাণ্ডটা করলেন এখনও ভুলে যাই নি স্যার!" ততক্ষণে বড়দাদা, বৌদি সব গোলমাল শুনে এসে জড় হয়েছেন। দাদা বললেন—"ভূতের বাড়িতে কিচ্ছু নেই, ইন্স্‌পেক্টর বাবুর কাছে শুন্‌লাম। দিনের আলোতে ভালো ক'রে দেখা হয়েছে। সূর্য্য ডোবার পর ত' কোনও পুলিশও যাবে না ওধারে! যত সব কুসংস্কার এ সব জায়গায়। তবে সেখানে কিচ্ছু নেই সেটা দেখা হয়েছে। সত্যি সত্যিই জঙ্গলটাকে আরও ভালো ক'রে দেখা দরকার। কাছাকাছি একটা আস্তানা না থাকলে, এমন রাশি রাশি জিনিষ একেবারে উবে যায় কী ক'রে? ট্রেনে ক'রে যায় না, ষ্টেশনে গুপ্তচর রাখা হয়েছে। লরী ক'রে যায় না, মোড়ে মোড়ে পুলিশ রয়েছে। এ ত' আর ভেল্কিবাজি নয় যে বেমালুম হাওয়া হ'য়ে যাবে!"

গোলমালের মধ্যে গুটের বিষয় কিছু বল্‌তেই ভুলে গেলাম। পরদিন সকালে শোনা গেল জগদীশদা'র পিসিমার বাবার বড় ফোটোর পিছনে যে ময়লা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে চুনীর মাকড়ি লুকোন ছিল সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। পিসিমা আবার এক নতুন ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন, প্রকাশ্যে গুটেকে সন্দেহ করছেন। তাই নিয়ে ওদের বাড়িতে দারুণ অশান্তি।

(ক্রমশঃ)

এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেস

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস-সি

তোমাদের মধ্যে যারা খবরের কাগজ পড় তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীর বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশন হ'য়ে গেছে লক্ষ্ণৌ সহরে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্র, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি এসে এতে প্রতি বছর যোগ দেন। এখানে তাঁরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, সে সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলে, এক কথায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাব এবং জ্ঞানের আদান-প্রদান চলে। তাছাড়া গত কয়েক বছর যাবৎ এ অধিবেশনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম-করা বৈজ্ঞানিকগণ আমন্ত্রিত হ'য়ে যোগ দিচ্ছেন। এবারেও ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইতালী, জাপান, ব্রহ্মদেশ,

নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে চল্লিশ জন প্রতিনিধি এ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। গত বছর অধিবেশন বসেছিল কলকাতায়।

ইতিহাসবিখ্যাত লক্ষ্ণৌ সহর! অতি প্রাচীন কাল থেকেই বহু ভাঙ্গা-গড়া, সুখদুঃখের সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে এই সহরটি। খৃঃপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে কোশল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল লক্ষ্ণৌ,—রাজধানী ছিল অযোধ্যা। তারপর বহুদিন লক্ষ্ণৌএর ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ থেকেই আবার লক্ষ্ণৌ ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করতে থাকে। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এটি ছিল জৌনপুরের রাজাদের সাম্রাজ্যভুক্ত। পাঠানরাজ শেরশাহের সময়েই লক্ষ্ণৌএর বিশেষ উন্নতি হয়। ১৭২৪ খৃঃ অব্দে মহম্মদ আমিন সাদাদ্ খান নামে এক নবাব অযোধ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের বংশের আসাফউদ্দৌল্লা ১৭৭৫ সালে ফয়জাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এ সময় থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অযোধ্যায় কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। তারপর থেকে ইংরেজ রাজত্বের বহু ঘটনা, বহু অত্যাচার-অবিচারের কাহিনীতে বিজড়িত হ'য়ে ওঠে লক্ষ্ণৌএর ইতিহাস। সর্ব্বশেষ ঘটনা সিপাহী যুদ্ধ—ইংরেজের ভাষায় 'সিপাহী বিদ্রোহ'। এই যুদ্ধে অযোধ্যা যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল সে খবর ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন।

যাক্ গে সে অতীত ইতিহাস। বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ হ'ল ভারতের আধুনিক সহরগুলির একটি,—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র-সমন্বিত উন্নতিশীল এবং আধুনিক একটি সহর। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েই এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল।

এ সময়টা লক্ষ্ণৌতে ভীষণ শীত পড়ে। তবে প্রথম অধিবেশনের দিন (২রা জানুয়ারী) এখানকার আবহাওয়া ছিল ভারী চমৎকার। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর অধিবেশন উদ্বোধন করবার কথা ছিল। কিন্তু দিল্লী থেকে তাঁর প্লেন পৌঁছাতে দেরী হয়ে যায়। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে বেলা ১১টার সময় 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হয়। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীমুন্সী উদ্বোধনী ভাষণ দেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুগলকিশোরের ভাষণের পর উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ বৈজ্ঞানিকদের সাদর সম্ভাষণ জানান। এরপর বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি ডক্টর জে. এন্. মুখার্জ্জী নব নির্ব্বাচিত সভাপতি ডক্টর ডি. এম. বোসকে উপস্থিত বৈজ্ঞানিকদের নিকট পরিচিত করিয়ে দেন। এর পর কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বিদেশাগত বৈজ্ঞানিকদের সভায় পরিচিত করান। তারপর সভাপতি ডাঃ ডি. এম. বোস তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণ দান করেন। তাঁর অভিভাষণের মাঝামাঝি সময় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন এবং বিলম্বের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন।

তোমরা বোধ হয় জান যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন মূল সভাপতি থাকেন; তাছাড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একজন করে সভাপতি থাকেন—যাঁদের বলা হয় শাখা সভাপতি। এবারকার অধিবেশনে মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছিলেন কলকাতার বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু। ইনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৬ সালে পদার্থবিদ্যায় এম. এ পাশ করে তিনি আচার্য্য জগদীশের সহকারী হিসাবে এক বছর গবেষণা করেন। ১৯১২ সালে লণ্ডন গিয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে আবার কিছুদিন পরই তিনি জার্ম্মানী যান এবং ১৯১৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ্. ডি ডিগ্রী পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনা করে ১৯৩৮ সালে আচার্য্য জগদীশের মৃত্যুর পর তিনি বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ হন। এখনও তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত আছেন।

সংখ্যাতত্ত্ব বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ছিলেন ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহ। ১৯১৯ সালে ইনি ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস্-সি পাশ করেন। ১৯২৭ সালে পি-এইচ. ডি হন। ১৯২৪ সাল থেকে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন।

রসায়ন শাখায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর ইউ. পি. বসু। ইনি কলিকাতাস্থ বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। এঁর জন্মস্থান বরিশাল জেলায়। ইনিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস্-সি, ডি. এস্-সি এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার।

চিকিৎসা এবং পশুচিকিৎসা শাখার সভাপতি ছিলেন ডক্টর এস্. দত্ত। ইনি আইজতনগরের ভারতীয় পশুচিকিৎসা গবেষণা-মন্দিরের অধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্-সি পাশ করার পর ইনি লণ্ডন থেকে এম্. আর. সি. ভি. এস্ ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর ১৯৩৮ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস্-সি ডিগ্রী পান। এঁর জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলায়। অন্যান্য শাখায়

যাঁরা সভাপতিত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে এঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি ডক্টর এস্. সরকার বাঙ্গালী। অন্যান্য শাখার বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ:

অঙ্কশাস্ত্র—সভাপতি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্ চ্যান্সেলার অধ্যাপক বিষ্ণুবসুদেব নরলিকার, বি. এস্-সি (বোম্বাই), বি. এ (ক্যাম্ব্রিজ)। পদার্থ বিজ্ঞান—সভাপতি ডক্টর নানাসাহেব রণজী তাওদে, এম. এস্-সি (বোম্বাই) পি-এইচ্. ডি (লণ্ডন)। ভূতত্ব ও ভূগোল—সভাপতি অধ্যাপক নিরঞ্জনলাল শর্ম্মা। ইনি ধানবাদের ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্স্এর অধ্যাপক। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান—সভাপতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ডক্টর রামকুমার শকসেনা। প্রাণি-বিজ্ঞান ও কীটতত্ব—সভাপতি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডক্টর এন. কে. পানিকর। নৃতত্ব ও প্রত্নবিদ্যা—সভাপতি ভারত সরকারের প্রত্নবিদ্যা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল পণ্ডিত মাধোস্বরূপ ভাট। মনস্তত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান—সভাপতি ভারতীর কৃষি গবেষণা-পরিষদের উদ্ভিদ্-শাখার অধ্যক্ষ ডক্টর পার্থসারথি।

মহাকালের পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—তেরো—

সাধারণ মানুষের কাছে গুণের চেয়ে বিত্তের সম্মানই বেশী। অতি প্রাচীন কালেও রথারূঢ় মণিমুক্তাখচিত শিরস্ত্রাণধারী একজন বিত্তবান্ সাধারণের কাছে যে সম্মান পেতো একজন সুপণ্ডিত শাস্ত্রবিদ্ তত সম্মান পেতেন না। বেদজ্ঞ ঋষিকেও সেইজন্য অনেক সময় নিভৃত তপোবনের

শাস্ত্র পাঠ ছেড়ে এসে দাঁড়াতে হোত রাজসভার মাঝে রাজ-সকাশে অনুকম্পার ভিখারী হয়ে। দারিদ্র্য মনীষার অহঙ্কারকে খর্ব করে. মনীষীরা সে কথা উপলব্ধি করেই বিত্তের আড়ম্বরকে ছোট করতে চেয়েছেন, বলেছেন—সহজ সরল জীবনধারাই শ্রেয়ঃ, আর এই ব্যবহারিক জগৎটা মোটেই বড় নয়। এটা মায়া, যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তার মূল্য নেই, বেঁচে থাকাটা নশ্বর, সত্য পরলোক, সত্য মৃত্যু, সত্য ভগবান্, যা দেখা যায় না, যা জানা যায় না, যা পাওয়া যায় না। মানবসভ্যতার আদি কাল থেকেই এই দ্বন্দ্ব চলে আসছে। তেইশ-শো বছর আগে উত্তরাপথের এক গণ্ডগ্রামে একদিন এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়, তাতেই এক বিরাট সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়ার সূত্রপাত ঘটে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল পঞ্চনদের গোল্লরাজ্যের এক গ্রামে।

তখনকার দিনে এ দেশের গ্রামগুলি এখনকার মত নির্জীব ছিল না। গ্রামগুলি ছিল দেশের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামের ধনীরা গ্রামেই বাস করতো. পয়সা হলেই শহরে এসে ভীড় জমাতো না। শহরের নিষ্প্রাণ নাগরিকতা তখন সভ্যতার নামে হিন্দু সমাজে পরিব্যাপ্ত হয় নি।

এক নামকরা পণ্ডিতের স্ত্রী এসেছিলেন ভাইয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে। পণ্ডিত ছিলেন সর্বশাস্ত্রে বিশারদ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে তিনি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলে মনে করতেন, বিত্ত ও সম্পদ্‌কে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কোন রকমে খেয়ে-পরে দিন কেটে গেলেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু নিজের ঘরে যে ভাবে চলা যায় বাহিরের জগতে তো সে ভাবে চলে না। পণ্ডিতানী সাধারণ একখানি শাড়ী প'রে ও একখানি সাধারণ ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছিলেন ভাইয়ের বাড়ীতে। ভাই বিত্তশালী, বোনেদেরও সমৃদ্ধি আছে। ভাইয়ের গৃহে এসে পণ্ডিতানী দেখলেন আর কোন বোন তাঁর মত সাধারণ বেশে আসে নি। ছোটবোন তো মুখের উপর বলেই বসলো—ও মা, বড়দিদি যেন কী! বিয়েবাড়ী, কত কুটুম-বাটুম আসবে, তাদের মাঝে এই সাজ-পোষাকে তুমি বরের বোন বলে পরিচয় দেবে কেমন করে!

পণ্ডিতানী বললেন,—আমি গরীব, আমার তো, ভাই, তোমাদের মত পোষাকী সাজ-পোষাক নেই, যা আছে প'রে এসেছি।

বোন ঠোঁট উল্টে বললে,—জামাইবাবু তো শুনেছি মস্ত পণ্ডিত, তা তিনি এটা জানেন না যে কুটুম-বাড়ীতে যেতে হলে ভালো সাজপোষাক লাগে, অতি গরীব লোকেরও তো দু'খানা পোষাকী পরিচ্ছদ থাকে।

পণ্ডিতানী চুপ করে থাকেন।

মা বলেন,—হ্যাঁরে, তোর ওই কানের দুল দু'টি বুঝি রূপার?

পণ্ডিতানী মাথা নেড়ে বলেন,—হ্যাঁ।

—ও দু'টো তুই খুলে রাখ্ বাছা. বিয়েবাড়ীতে কি রূপার দুল প'রে ঘোরে? কর্তার যেমন কাজ,—পণ্ডিত দেখে জামাই করবো! তা এমন পণ্ডিতের হাতে মেয়ে দিলেন যার কিছুই নেই, শুধু নাম-ডাকই সার। হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিলে। আমার যেমন পোড়া কপাল!

পণ্ডিতানী আর কি করেন, দুল দু'টি খুলে আঁচলে বেঁধে নিলেন। বোনেরা মুখ টিপে হাসলো।

শুধু আত্মীয় নয়, ঝি-চাকরদের ব্যবহারের তারতম্য পণ্ডিতানীর চোখে পড়ে। অন্যান্য বোনেদের সাজ-পোষাক অনেক ভালো, দাসদাসীরা তাদের খাতির করে। বড়লোকের বাড়ীর ঝি-চাকর গরীবকে চেনে। তারা জানে যে গরীবকে যত্ন করার কোন দরকার নেই, গরীব যত্ন না পেলেও কোন অভিযোগ তুলবে না, গৃহস্বামীও অসন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু বড়লোকের পান থেকে চুণ খসলেই অনর্থ বাধবে। পণ্ডিতানীর দিকে দাসদাসীরা তাই দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। পণ্ডিতানী সব কিছু দেখেন, দেখে বোঝবার মত বয়স তাঁর হয়েছে।

কোন এক সময় মা এসে বললেন,—বেলা পড়ে এলো, পাঁচজন আসবে, এখন আর চুপ করে বসে থাকিস নে মা, সাজপোষাক বদলে নে।

—আমার এর চেয়ে ভালো কাপড় তো আর নেই মা, যা এনেছি তা এরই জোড়া।

—নিজের না থাকে কোন বোনের কাছ থেকে চেয়ে নে না, ওদের তো দু'-দশখানা আছে। এমন ভাবে পাঁচজনের সামনে তোকে বের করবো কেমন করে? লোকে বলবে কি?—জামাইয়ের কিচ্ছু নেই!

যে বোনেরা তাঁর দারিদ্র্য দেখে মুখ টিপে হেসেছে তাদের কাছ থেকে কাপড় চেয়ে পরতে হবে! পণ্ডিতানীর আত্মাভিমানে আঘাত লাগলো। গরীবের যখন এখানে কোন স্থান নেই, শুধু লজ্জার উপকরণ হয়ে এখানে থাকার কি দরকার? রইল ভাইয়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ খাওয়া, পণ্ডিতানী সেখান থেকে বাহির হয়ে পড়লেন। কারো দৃষ্টি ছিল না তাঁর উপর, যারা দেখলো তারাও একবার জিজ্ঞাসা করলো না তিনি কোথায় যাচ্ছেন!

—চৌদ্দ—

চাণক্য আসছিলেন শ্যালকের বিবাহের নিমন্ত্রণে। মধ্যপথে গৃহিণীর সঙ্গে দেখা, বললেন,—কি হোল, এখনই ফিরে যাচ্ছ যে?

গৃহিণী ঝংকার দিয়ে উঠলেন,—ফিরলাম তোমার জন্য। তুমি মস্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কিনা, তোমার সম্মান খুব বেশী, তাই এই ভাবে ফিরে আসতে হোল।

চাণক্য বুঝতে পারলেন কোথাও একটা কিছু গোলযোগ ঘটেছে, বললেন,—ব্যাপারটা কি হয়েছে বল ত'?

—ব্যাপার সামান্যই। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ঘরে চলতে পারে, সমাজে চলে না।

—আহা, খুলেই সব কথা বল না?

—বলবো আমার মাথা আর মুণ্ডু। মোটা মোটা পুঁথি তো অনেক পড়ে শেষ করেছ, এটা জানো না যে বড়লোকের বাড়ীর নিমন্ত্রণে যেতে হলে এই রকম আটপৌরে শাড়ী আর রূপার দুলে চলে না?

—ওঃ, এই সামান্য ব্যাপার? আমি মনে করেছিলাম বুঝি একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে গেল।—চাণক্য হাসলেন।

—হাসি দেখলে গা জলে যায়! গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছা করে।

—একখানা রেশমী শাড়ী আর একজোড়া সোনার দুলের জন্য গলায় দড়ি দিয়ে মরবে! জীবনের দাম কি এতই কম?

—কথা তো অনেক জান দেখছি, কিন্তু কই, দু'পয়সা উপার্জন করে একখানা শাড়ী তো কিনে দিতে পার না! তোমার জন্য আজ আমাকে কী অপমানই হতে হোল!

চাণক্য তখনও হাসছেন।

চাণক্য-পত্নী স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে এবার কেঁদে ফেললেন।

চাণক্য এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। স্ত্রীকে নিয়ে গৃহে ফিরলেন। স্ত্রীর মুখ থেকে খুঁটিনাটি সব কিছু শুনে বললেন,—উত্তম, আমি অর্থই উপার্জন করবো। যারা আজ তোমাকে দেখে হেসেছে, তোমার পরিচয় দিতে 'কিন্তু' বোধ করছে, তারাই একদিন তোমার একটু অনুগ্রহ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। পাণ্ডিত্য দিয়ে পয়সা রোজগার করা যায় কিনা আমি একবার দেখবো।

পরদিন প্রত্যূষে চাণক্য গৃহত্যাগ করলেন। (ক্রমশঃ)

যাঁদের লেখা তোমরা পড়

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৫

ক্ষিতীশ বাবু নিজে গল্পের আসর তেমন জমাতে পারতেন না, কিন্তু তিনি এলেই আসর জমে উঠতো। তাঁর কাছে থাকতো খবর। তিনি একটি করে খবর ছাড়তেন আর আসরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত। তবে সে সব খবর দুনিয়ার, শহরের বা পল্লীর নয়, প্রকাশক মহলের, বিশেষ করে দু'-একজন প্রকাশকের এবং মাত্র জন কয়েক শিশুসাহিত্যিকের। ক্ষিতীশ বাবু ছিলেন কাজের মানুষ। তাই দু'-একজন প্রকাশককে তিনি সত্যিই মানুষ করে তুলেছিলেন।

তাঁর মাথায় ঘুরতো নানা রকমের পরিকল্পনা—তবে তার কোনটিই পাঁচশালা বা দশশালা নয়। তবে তা ছিল শ্রেণীসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ শিশুসাহিত্য, শিশুসাহিত্যিক ও শিশুপাঠক-পাঠিকাসম্বন্ধীয়। তাই থেকেই তিনি বাংলা জয়ের

স্বপ্ন দেখতেন। নিজে এক সময়ে ছিলেন সুকুমার শিল্পায়তনের ছাত্র। তাই পুস্তকের সাজ-সজ্জা এমন সুদৃশ্য করে তুলতেন যে দেখলেই হাতে তুলে নিতে ইচ্ছা হত। তাঁর রচনাশৈলীও ছিল চিত্তাকর্ষক। শিশুসাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণ-তুল্য। তার কল্যাণের জন্য তিনি যেমন শ্রম, তেমনি ত্যাগ স্বীকার করেচেন। এই সাহিত্যে নূতন কিছু দেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর বরাবরকার। তাই কিছুকাল প্রকাশ ও সম্পাদন করেছিলেন শিশুসাপ্তাহিক পত্রিকা "রবিবার"। পত্রিকাখানি "মাসপয়লার" পদাঙ্ক অনুসরণ না করে প্রতি রবিবারেই প্রকাশিত হত। কিন্তু পাঁজির মতে রবিবার নিস্ফলা। তাই তাঁর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। "রবিবার" কিছুকাল পরেই একেবারে ছুটি হয়ে গেল। তবুও ক্ষিতীশ বাবুই যে শিশু-সাপ্তাহিকের অন্যতম অগ্রপথিকের সম্মান লাভের অধিকারী এ কথা অস্বীকার করা যায় না। শুনেছি, তার আগেও এক-আধখানা শিশুসাপ্তাহিক বেরিয়েছিল, কিন্তু তার কোনটাই উল্লেখযোগ্য নয়।

ক্ষিতীশ বাবুর জীবন একখানি বিয়োগান্ত নাটকের মতোই অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী। এই শহরে যখন আসেন তখন কৈশোরের সীমা অতিক্রম করেচেন। কিন্তু অন্তরে দারিদ্র্যের বেদনাকে ভিত্তি করে অঙ্কুরিত হয়ে উঠচে উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তা ক্রমে মুঞ্জরিত হয়ে তাঁর জীবনকে বিচিত্র পথে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিয়ে একদিন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এনে পোঁছে দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ব্যর্থ হয়ে গেচে। আজ তিনি এমন এক দুঃখময় মানসিক রোগে জীবন্মৃত যা থেকে উদ্ধারের আশা বুঝি আর নেই। অথচ তিনি মানুষটি সৎ, পরোপকারী, পরিশ্রমী, সহানুভূতিশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। যাঁদের সঙ্গে তিনি মিশেচেন তাঁদের মধ্যে এমন একজনকেও জানি না যিনি তাঁর প্রতি সামান্য উপেক্ষা বা অবহেলা প্রদর্শনের ঈষৎ লক্ষণও কোনদিন প্রকাশ করেচেন।

বাংলা দেশে যে শিশুসাহিত্য-পরিষদ্ স্থাপিত হয়েছে তার প্রথম আজীবন সদস্য তিনিই। কি ভাবে যে তিনি আজীবন সদস্যের দেয় একশত টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন তা শুনলেই জানা যায় শিশুসাহিত্যের প্রতি তাঁর দরদ কত গভীর! আমরা সকলেই কামনা করি, তিনি সুস্থ হয়ে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন। কিন্তু কামনা ও প্রার্থনায় সত্যই কি রোগ নিরাময় হয়? তবে হারানো সন্তানের জন্য মাতৃবক্ষে এত বেদনা, চোখে এত অশ্রু কেন?

শেষের প্রসঙ্গটির সঙ্গে আসে আর একজনের কথা। তিনি হলেন কবি শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কবিতাগুলি সুপক্ক আঙুরের মতো সুমিষ্ট এবং

বালক-বালিকাদের অতি প্রিয়। তিনি থাকেন বিহারের কয়লা-প্রধান অঞ্চলে এবং জীবনে পেশা নিয়েছেন ডাক্তারী। জীবনে সংসার করেন নি কিন্তু সংসারীর দুঃখ-বেদনা তাঁর মর্ম স্পর্শ করে। তাই রোগার্তকে সাহায্যের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর মধ্যে রয়েচে যা তাঁর আয়ের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ মানুষটি, কথা বলেন অল্প; চাল-চালন ধীর, ব্যবহার স্নিগ্ধ, দৃষ্টি একটু উদাস। শুনেচি চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারেন কিন্তু পিয়ানোওয়ালা বাড়িতে আমাদের গতায়াত নেই, কাজেই ওটা সুরলোকের গল্প হয়েই আছে। জীবনে তিনি সঞ্চয় কত করেচেন জানি না, তবে জানি, শিশু-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে দু' হাজার টাকা দান করেচেন—যার সুদ থেকে একটি করে স্বর্ণখচিত পদক তাঁর স্বর্গতা মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর নামে বাংলার শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিককে প্রতি বৎসর দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েচে অবনীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণারঞ্জনকে। শুনচি শীঘ্রই আবার দেওয়া হবে।

এই এক ধরণের মানুষ। নিজে কবি ও শিশুসাহিত্যিক কিন্তু নিজের জন্য কিছুই চান না, অপরকে পুরস্কার ও সম্মানিত করতে সর্বস্বান্ত হন।

কোথায় তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় ঠিক মনে করতে পারচি না। যত দূর মনে হয় অনেক কাল আগে "বাঁশরী" নামে বয়স্কদের সাপ্তাহিক পত্রিকার কার্যালয়ে। আমি তখন সেখানে চাকরি করতাম। তারপর আরও দু'-একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। শেষে আবার যখন তাঁর সাক্ষাৎ পাই তখন মনে হয়েছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন মানুষের দেখা পেলাম এবং আরও ভাল লেগেছিল। কাজে-কর্মে এই শহরে বৎসরে দু'-একদিনের জন্য আসেন কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও একবার দেখা দিয়ে, দু'টি কথা বলে পরম তৃপ্তি দিয়ে যান। বিহারের ধূমল শৈলমালা, সুগভীর অরণ্য, লীলায়িত শস্যক্ষেত্র, আঁকা-বাঁকা পার্বত্য স্রোতস্বতীমালার মাধুর্য ও ভাষা থাকে তাঁর কণ্ঠে, ব্যবহারে থাকে স্নিগ্ধতা ও সরলতা, অন্তরে থাকে সুগভীর দরদ। নিজেকে পিছনে ও আড়ালে রেখে অন্যকে উন্নতির দিকে এগিয়ে দেয় যারা তিনি হলেন তাদেরই অন্যতম। এমন মানুষের সংখ্যা সংসারে তো বেশি নেই!

কবিপ্রসঙ্গই যখন উত্থাপন করেচি তখন কবি শ্রীসুনির্মল বসুর কথা এই সুযোগে বলে নিই। তিনি এমন বিখ্যাত, এমন পরিচিত, বালক-বালিকাদের এত প্রিয় যে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলবারই নেই। মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকে তাঁর ছবি অনেক বার ছাপা হয়েচে। তবে সে সব প্রতিকৃতি তাঁর বর্তমান

বয়সের—পঞ্চাশোর্ধ্বের নয়। এখন দেখলে মনেই হবে না যে এক সময়ে তিনি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও নধরকান্তি ছিলেন। অবশ্য চশমা জোড়া বরাবরই তাঁর চোখে দেখ্ছি। শৈশবে তাঁকে দেখি নি, কাজেই বলতে পারি না তখন চক্ষু দুটি নগ্ন ছিল কিনা। তাঁর সঙ্গে প্রথম কোথায় আলাপ হয় মনে পড়ে না। সেইজন্য মনে হচ্ছে, আলাপই হয় নি, এমনিই পরিচয় ঘটেচে।

তিনি কোথাও গেলে, খবর পেয়ে পাড়ার ছেলে মেয়েরা তাঁকে দেখতে ছুটে আসে। তিনি মানুষটিও বড় রসিক। যেমন কবিতাগুলি ছন্দে ও ভাবে সুমিষ্ট, সুন্দর ও রসালো তাঁর কথাগুলিও তেমনি সরস। শুনলে না হেসে থাকা যায় না।

শ্রীসুনির্মল বসু

সুনির্মল বাবু কবি বলেই শিশুপাঠক-সাধারণে সুপরিচিত। তাঁকে স্বভাব-কবিই বলা ঠিক। কবিতা ও ছন্দ তাঁর হাতে আপনি এসে ধরা দেয়। কিন্তু তিনি যে চিত্রশিল্পীও এ কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। তবে শিল্পজগতে তাঁর গতিবিধি এখন নেই-ই!

তিনি শ্রীকেশব চক্রবর্তীর সহযোগিতায় পরিচালন করতেন "কিশোর এশিয়া" নামে একখানি সুন্দর পাক্ষিক পত্রিকা। কাজেই বাংলার শিশুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকাজগতে তাঁরা অন্যতম অগ্রপথিকের সম্মানের অধিকারী।

পাকিস্তানের আদিবাসী হলেও তাঁর শৈশবের অনেকগুলি বৎসর কেটেচে সাঁওতাল-পরগণার উশ্রী নদীর তীরে। তাই তাঁর এক সময়ের কবিতায় রয়েচে সাঁওতাল ছেলের সুমিষ্ট ও উদাসী বাঁশীর সুর, উশ্রীতটের শ্যামলশ্রী, দূরস্থিত শৈলমালার স্নিগ্ধতা ও স্থৈর্য, ছন্দে উশ্রীধারার চঞ্চলতা ও কলধ্বনি, ভাবে প্রান্তরের বিশালতা। তাঁর পেশা সাহিত্য, তাই অর্থসঞ্চয় কতখানি হয়েছে বলতে পারি না। তবে শিশু-পাঠকসাধারণের অন্তরে তাঁর স্থান যে একেবারে পাকা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সেখান থেকে ইদানীং কালে কেউ তাঁকে টলাতে পারে নি।

কবিপ্রসঙ্গ ছেড়ে এবার নীরস গদ্যে আসা যাক্। কিন্তু কার কথা বলবো? অনেকগুলি মুখ মনের মধ্যে ভিড় করচে। কাজেই রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্যের কথাই বলা যাক। তবে নতুন করে বলবোই বা কি? কিছু

বলতে গেলেই তা মিথ্যাও হতে পারে, আবার অতিরঞ্জন হওয়ারও ভয় আছে। তবুও বলি।

ক্ষিতীন বাবুর চেহারা তো অন্ততঃ ছবিতে পাঠক-পাঠিকাদের দেখাই আছে। গায়ের রঙ কেমন তা বলে আর বিপদ ডেকে আনতে চাই নে, তবে মাথায় মানুষটি লম্বা ন'ন কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে বেশ লম্বা, আর লেখার নমুনা তো "রামধনুতেই" রয়েচে। তবে একটা কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে, যে, শিশুসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের রচনায় ইদানীং কালে তাঁকে অতিক্রম কেউই করতে পারেন নি। তাঁর মতো সুন্দর ও সরস রচনা আর একজনের। তিনি হলেন অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তবে তাঁর রচনার সংখ্যা খুবই অল্প। এই দু'জনের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা পাঠ করে সুন্দর গল্প পাঠের যে আনন্দ তা লাভ করা যায়।

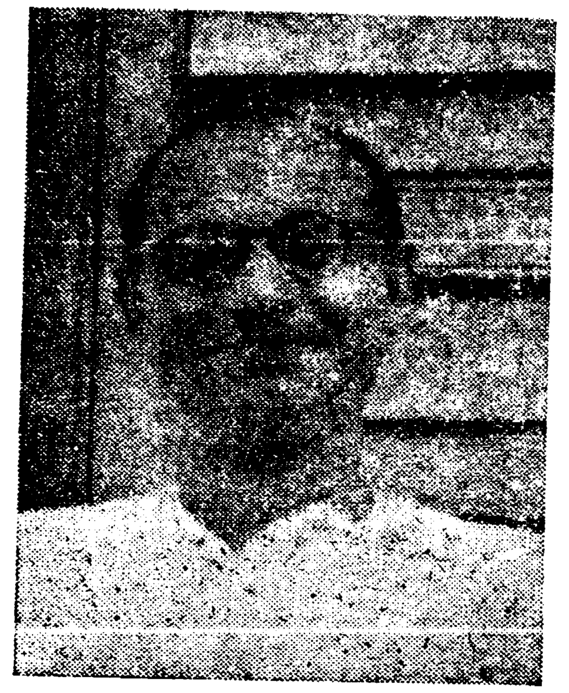

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাঁর পেশা ঠিক সাহিত্য নয়, আবার চাকুরিজীবীও ন'ন। কোনও পেশা গ্রহণ না করলে যে তাঁকে বিপদে পড়তে হত তাও নয়। (এটা অবশ্যি আমার ধারণা, তাঁর নয়।) পাকিস্তানের "আদিবাসী" হলেও কলিকাতারই বাসিন্দা হয়ে গেচেন। যত দূর জানি তাঁরা দু'পুরুষে সাহিত্যিক। তাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ঋণী। তিনিই উত্তর বঙ্গ অঞ্চলের "মাণিকচাঁদের গান", "গোপীচাঁদের গান" প্রভৃতি অমূল্য কাব্যগাথা সংগ্রহ করে বঙ্গসাহিত্যকে সম্পদ্‌শালিনী করেচেন।

ক্ষিতীন বাবুর বয়স এখনও পঞ্চাশের ৬।৭ ধাপ নীচে। এ কথা তিনিও আমাদের সকলের বয়সের হিসাব প্রায়শঃই করে, বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রকাশ করে, মৃদু মৃদু হাস্য করেন। শিশুসাহিত্য-পরিষদের জন্ম থেকে এ পর্যন্ত তিনিই তার সম্পাদক ছিলেন এবং পরিষদ্‌কে তাঁরই গৃহে আশ্রয় দিয়ে এসেচেন। হয়তো এ জন্য কত অসুবিধা ভোগ করচেন, তবুও পরিষদের প্রতি তাঁর দরদের ফলে কোনদিন সামান্য বিরক্তিও প্রকাশ করেন নি। কিন্তু থাক্, তাঁর বদান্যতা বা সৌজন্যের প্রশংসা তাঁরই কাগজে প্রকাশ করলে তিনি লজ্জা পাবেন।

জগন্নাথ

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

অনেক দিন বাদে হঠাৎ লেক মার্কেটের সামনে বসন্তের সঙ্গে বারীনের দেখা হ'য়ে গেলো। দু'জনেই খুব খুসি। নানারকম বকর বকর করবার পর একসময় বসন্ত বললো,—তারপর, তোর খবর বল? আজকাল কী করছিস?

বারীন অবশ্য আজকাল রাস্তায় রাস্তায় ফেকলুর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে কথা কি বলা যায়? যায় না। তাই বারীনও কায়দা ক'রে জবাব দিলে,—যা করছি তা এমন কিছু বলবার মতো নয়। খবরও ঐ, মানে একরকম কেটে যাচ্ছে আর কি।

এমন কিছু বলবার মতো নয়! কলকাতায় সাদা-কালো দু'রকম কারবার আছে; হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বারীনও একজন কালোকারবারী। হুঁ, তাই এমন কিছু বলবার মতো নয়!

আবার বসন্ত বললো,—তবু শুনি না?

বারীনের সেই এক কথা—না না, তা এমন কিছু শোনবার মতোও নয়।

বলবার মতোও নয়, শোনবার মতোও নয়! বটে, বটে! বারীন নিশ্চয়ই তাকে টিকটিকির লোক ভেবেছে।—বসন্ত মনে মনে হাসলো। প্রথমে মনে মনে, তারপর খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে হাসতে হাসতে বসন্ত ফুটপাথের উপরেই ব'সে পড়লো।

কাঁচুমাচু মুখে বারীন জিজ্ঞেস করলো,—অমন পাগলের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে হাসছিস কেন? কী হয়েছে?

বসন্ত কায়দা ক'রে বললো,—তা এমন কিছু বলবার মতো নয়।

আবার বারীন বললো.—তবু শুনি না?

বসন্তের সেই এক কথা—না না, তা এমন কিছু শোনবার মতোও নয়।

বলবার এবং শোনবার মতো বস্তু হচ্ছে গোপেশ্বর বাবুর কথা। গোপেশ্বর বাবু হচ্ছেন বসন্তের কাকা আর বারীনের মামা। আপন তো দূরের কথা, বসন্ত আর বারীনের সঙ্গে গোপেশ্বর বাবুর কাছাকাছি কোনো সম্পর্কও নেই। নানারকম লতায়-পাতায় জড়িয়ে-পেঁচিয়ে গোপেশ্বর বাবু ওদের আত্মীয়। যাকে বলে সুদূরসম্পর্কের আত্মীয়।

তবে কি গোপেশ্বর বাবুর নিকট-আত্মীয় বলতে কেউ নেই? থাকবে না কেন, আছে। কিন্তু ইহধামে কেউ নেই। এদিকে সব সাফ।

বছর পাঁচেক আগে গোপেশ্বর বাবুর সঙ্গে বারীনের দেখা হয়েছিলো। বৌবাজারের মোড়ে উনিই বারীনকে পাকড়াও করেছিলেন। কী? না, কিছু টাকা ধার চাই। ট্র্যাফিক-পুলিশের হাত না মেনে, প্রাণের মায়া ছেড়ে বারীন সেই যে একলাফে রাস্তা পার হয়েছিলো তারপর থেকে আর আজ পর্যন্ত গোপেশ্বর বাবুর সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি।

হবে কেমন ক'রে? দিন কয়েক বাদেই গোপেশ্বর বাবু লক্ষ্ণৌ গিয়ে একটা তামাকের দোকানে মুহুরীর কাজে লেগে গেলেন। তারপর কপাল থাকলে যা হয়। ডার্বির ফার্ষ্ট প্রাইজ!

তারপর আর কি? ঝাড়ু মার অমন চাকরির মাথায়। দেড় বছর হ'লো, বালিগঞ্জে বাড়ি বাগিয়েছেন, গাড়ি হাঁকিয়েছেন। দিব্যি জমানো টাকার সুদে পোলাও-কালিয়া, দই-সন্দেশ খাচ্ছেন। তোফা!

শুনে বারীন জামার হাতায় চোখ মুছলো।—তোর শরীরও তাই অমন তাগড়াই দেখাচ্ছে বসন্ত! তুই বুঝি ওঁর ওখানেই—?

ডান হাতের মাস্‌ল্ ফুলিয়ে বসন্ত বললো,—হুঁ, তাই তোর খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম। তা তুই তো তখন কিছু বলতেই রাজি হ'লি না। এখন যদি ইচ্ছে হয়, চলো। ঢেলে পায়ের ধূলো নিয়ে তোমার মামাকে একখানা পেন্নাম ঠুকে দাও। ব্যস, তারপর আর দেখতে হবে না।

বারীন একেবারে বসন্তের হাত চেপে ধরলো। —আমার কথা তোকে আর কী বলবো? মেছোবাজারে একটা লক্কড় মেসে থাকি, রাস্তায় রাস্তায় ফেকলুর মতো টো-টো ক'রে ঘুরি। চল ভাই, যদি ভগবানের দয়ায় কপাল খোলে তো দেখি।

—কিন্তু—

—কিন্তু কিরে?

—কিন্তু হচ্ছে জগন্নাথ। ওটাকে নিয়েই যত ঝামেলা।

—জগন্নাথ কে রে?

—জগন্নাথ হচ্ছেন মহাপ্রভু! —খুক খুক ক'রে হাসতে হাসতে বসন্ত হাতযোড় ক'রে কপালে ঠেকালো। যাবি তো এক্ষুণি চল, বারীন!

মস্ত বড় গ্যেট খুলে সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই ঘেউ ঘেউ, ঘৌ ঘৌ! তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে জন্তুটা সাঁ ক'রে ছুটে এসে ত্যাথ্-না-ত্যাথ্ বারীনের দু'পায়ের মধ্যে ঢুকে এমন এক গোঁত্তা মারলো যে বারীন সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে প্রথমে উপুড়, তারপরে চিৎ। শুধু কি এই? বাঘের মতো সেই কুকুরটা তখন থাবা গেড়ে রইলো বারীনের বুকে, আর লক্‌লকে জিভ বের ক'রে ঘ্রব্ ঘ্রব্ করতে লাগলো। মানে, একটু নড়েছো কি জান নিকলে দেবো।

অবশ্য নড়বার সাধও নেই, সাধ্যও নেই; বারীনের তখন এমনিতেই হয়ে এসেছে। অথচ বন্ধুর কাণ্ড দেখ! বসন্ত তখনও কাছে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে।—বারীন, ডরো মৎ, ঘাবড়াও মৎ। এই হচ্ছেন মহাপ্রভু, ইনিই জগন্নাথ। আমাকেও আগে এমনি করতো, এখন আমার ওপর প্রভুর একটু দয়া হয়েছে। তবে হ্যাঁ, তোমার মামা এসে হুকুম না করা পর্যন্ত প্রভু

তোমার বুকেই থাবা গেড়ে বসে থাকবে, বাপধন! আর শোনো, যদি নিজের কপাল ফেরাতে চাও তো পেন্নাম ঠুকবার পরেই তোমার মামার কাছে প্রাণ খুলে জগন্নাথের প্রশংসা ক'রো।

জগন্নাথের গলা কিন্তু দোতলায় গোপেশ্বর বাবুর কানে গেছে। জুতোর শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তিনি হাঁক ছাড়লেন,—বসন্ত! অ বসন্ত?

হাড় জ্বালালে একেবারে! দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বসন্ত বললো।—কেন, অমন চেঁচাচ্ছেন কেন? আমি নীচে আছি, এখানে যে আপনার জগু আপনার ভাগ্নের বুকে থাবা গেড়ে বসেছে।

—ভাগ্নে! আমার ভাগ্নে?—নীচে নেমে গোপেশ্বর বাবু কোমরে হাত দিয়ে বসন্তের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।—পাজি, নচ্ছার, গুণ্ডা, পকেটমার, চোর-ছ্যাচোড় না হলে কাউকে আমার জগু কক্ষণো কিছু বলে না। আচ্ছা, তোর কি চক্ষুলজ্জা বলেও কোনো জিনিষ নেই বসন্ত? কাকার ঘাড়ে বসে খেয়ে কাকার মুখের ওপর কাকার জগুরই নিন্দে? কালই তোকে আমি বাড়ি থেকে তাড়াবো, আলবৎ তাড়াবো। দেখি তো বাবা জগু, উঠে আয়। একবার দেখি ইনি আবার কোন কাপ্তেন এলেন!

উঠে এসে জগু গোপেশ্বর বাবুর পায়ের কাছে গুটিশুটি হয়ে বসলো। মরীয়া হয়ে বারীন উঠে সাষ্টাঙ্গে মামার পায়ে একখানা পেন্নাম ঠুকলো, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললো।—মামা, আমি।—আমি বারীন।

—ও, বারীন! পাঁচ বছর আগে সেই যে বৌবাজারের মোড়ে হাইজাম্প মেরে সট্‌কেছিলে, তারপরে আর খব্বর কি?

বসন্তের উপদেশ বারীন ভোলে নি।—আমার আবার খবর! কিন্তু মামা, এই জগন্নাথকে আপনি কোথায় পেলেন? আশ্চর্য, খুব আশ্চর্য! এই দেখুন, আমার বুকে থাবা গেড়ে বসেছে, বসেছিলো তো?—আরে ও তো আর জানে না যে আমি আপনার ভাগ্নে, ওর দোষ কী? চোর ভেবেই আমাকে—যাক গে। কিন্তু কাণ্ড দেখুন, থাবা গেড়ে বসেছে সত্যি, কিন্তু একবিন্দু লাগে নি কোথাও, সত্যি বলছি লাগে নি।

গোপেশ্বর বাবু বারীনের কাঁধে হাত দিলেন। —চলো বারীন, খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করো, তোমার সঙ্গে গপ্প-টপ্প করবো'খন তারপর। আর হ্যাঁ, এখন থেকে এখানেই থাকবে কিন্তু তুমি। থাকবে তো? তোমার এই বুড়ো মামাকে ছেড়ে আর কোথাও চ'লে যাবে না তো বারীন?

মামা গোপেশ্বর যদি কায়া তো ভাগ্নে বারীন তার ছায়া। মামা ছাড়া বারীন এখন আর কিছু জানে না। না, ভুল বললাম। বারীন আরও জানে, জগন্নাথকে জানে। মর্মে মর্মে জানে!

মামার মুখে এর মধ্যেই অন্ততঃ সতেরো বার জগন্নাথের কাহিনী আগাপাশতলা শোনা হ'য়ে গেছে।

লক্ষ্ণৌ থেকে মামা জগন্নাথকে জোগাড় করেছেন। দেশে যাবার আগে ওখানকার একজন খাস্ বিলিতি সাহেব নাম মাত্র দামে (সেল ট্যাক্স বাদে তিনশ' টাকা!) মামাকে দিয়েছেন। তখন

ওর নাম ছিল জ্যাক্। মামাই ওকে জ্যাক থেকে জগন্নাথ করেছেন। মামা একেবারে ঘোরতর স্বদেশী।

"কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি—বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!"

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার লাইনটা ঝট্ ক'রে মনে পড়লো বারীনের। হ্যাঁ, তাই সই। জগন্নাথকে ধরে মামাকে তুষ্ট রাখতে হবে। তা হ'লে, চাই কি, এই গাড়ি-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি—মামা খুসি থাকলে কী না হতে পারে?

তারপর মামা যখন ৺ হ'য়ে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি চেপে কেওড়াতলা যাবেন, তখন আর কি? জগন্নাথকে তখন হাফ্ দামে চৌরঙ্গীপাড়ার কোনো সাহেবের কাছে চালান ক'রে দেবে বারীন। হাফ্ দামও যদি না পায় তো অমনিই ও আপদ্‌কে বিদায় করবে।

কিন্তু কে না জানে, দুঃখ ছাড়া দুনিয়ায় সুখ লাভ হয় না। অতএব বারীনও দুগ্ গা ব'লে ঝুলে পড়লো।

বলতে গেলে জগন্নাথ এখন বারীনের নয়নের মণি। বারীন আজকাল জগন্নাথকে সাবান মাখিয়ে স্নান করায়, নিজের হাতে জগন্নাথকে রুটি-মাংস খাওয়ায়, বিকেল বেলা জগন্নাথকে লেকের হাওয়ায় বেড়াতে নিয়ে যায়। ভাবখানা যেন জগন্নাথের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগলেও বারীনের বুক কষ্টের চোটে ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে।

এত কষ্ট বিফলে যাবার নয়। ব্যাপারটা চোখে পড়তেই মামা তো একেবারে আনন্দে গদগদ।—সত্যি বারীন, তুমি না এলে আমার জগুর যে কি দশা হ'তো কে জানে! বসন্তটা তো আমার জগুকে একেবারে দু'চোখে দেখতে পারে না!

বসন্তের নামে একহাত ঝেড়ে দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করার এই একটা মস্ত সুযোগ। বারীন বললো।—য়্যাঁ? কী বললেন? বসন্ত আমার জগন্নাথকে দু'চোখে দেখতে পারে না? বেশ, আমার জগন্নাথকে যে ভালো চোখে দেখতে পারে না আমিও আর এ-জীবনে তার মুখদর্শন করতে চাই না।

মামা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—শুধু কি তাই? ঐ বজ্জাত বসন্তটা কি বলে জানো? বলে কিনা, আমার জগু মরলে ও হরির লুট দেবে।

য়্যাঁ! এর পর বারীন এমন একখানা কাণ্ড করল যে পলকে মামার মনে হ'লো জগন্নাথের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় বারীনের এই দুঃখের কাছে সদ্যবিধবার দুঃখও বোধ হয় নস্যি!

সত্যি, দুঃখ হয় বসন্তের অবস্থা ভাবলে। দিব্যি খায়-দায়, তুড়ি মেরে বেড়ায়। এদিকে যে কত কীর্তি-কাণ্ড হচ্ছে, বসন্ত বুঝি তার খোঁজও রাখে না!

বিকেল বেলা জগন্নাথকে নিয়ে বেড়িয়ে বাড়িতে ঢুকেই সেদিন বারীন পড়লো বসন্তের মুখোমুখি। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো, বসন্ত খপ্ ক'রে বারীনের ডান হাতখানা ধ'রে ফেললো।—কি রে, তুই যেন আজকাল আমাকে চিনতেই পারিস্ না! শুনি নাকি জগু কুত্তাটার সঙ্গে তোর আজকাল খুব গলাগলি!

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বারীন খেঁকিয়ে উঠলো,—খবর্দার বসন্ত, আমার জগন্নাথকে ফের অমন ক'রে কুত্তা কুত্তা বলবি না।

সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের হ্যাঃ—হ্যাঃ, খ্যাক—খ্যাক। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছাদ-ফাটানো চীৎকার—চোপ্ রও ইষ্টুপিড্!

বেদম রাগলে গোপেশ্বর বাবু হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে ফেলেন।—আড়াল থেকে সব আমার কানে গেছে, সব আমি শুনেছি। নিকালো, আভি নিকালো।

যেন কিছুই হয় নি এমনি নির্বিকার ভাবে বসন্ত শিস্ দিতে দিতে হেলে-দুলে গোপেশ্বর বাবুর চোখের সামনে থেকে চ'লে গেলো,—রান্নাঘরের দিকে।

খানিকক্ষণ গুম হ'য়ে থাকার পর আস্তে আস্তে গোপেশ্বর বাবু মুখ খুললেন।—দেখ বারীন, সংসার হচ্ছে অসার স্থান। আর বিষয়-আশয় হচ্ছে বিষ। এই বিষের জ্বালা নিয়ে আমি আর এখানে থাকতে চাই না, পরশুদিনই আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে কাশী চ'লে যাবো।

আবার মুখ বুঁজে রইলেন খানিকক্ষণ। আবার মুখ খুললেন,—কিন্তু আমার জগন্নাথের সঙ্গে বসন্তের ব্যাভারটা দেখলে?

জগন্নাথের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বারীন ছলছল গলায় বললো,—আমার জগুর কথা ছেড়ে দিন মামা, আপনার ওপরেই বসন্তের যা ছেদ্দা-ভক্তির ঠ্যালা!

ঠিকঠাক ঝোপের ওপর একেবারে মোক্ষম কোপ! গোপেশ্বর বাবুর বুকের হাড়-পাঁজরা ঠেলে একটা মার-মার রকমের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।—আমার জগুকে বসন্ত কি হিংসাটাই না করে! যদি—যদি শত্রুতা করে—! তুমি বাবা, বারীন, রাত্তিরে যদি ওকে নিয়ে শোও—

—বেশ, আজ থেকে আমার জগুর সঙ্গেই রাত্তিরে আমি শোবো। সত্যিই রাত্তিরে জগন্নাথের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে পড়ল বারীন।

পর পর দু' রাত্তির দু' চোখের পাতা এক করতে পারে নি বারীন। আঁচড়ে-কামড়ে শরীরের ছাল-চামড়া তুলে ফেলেছে জগন্নাথ। যত পারিস কর ব্যাটা, কর্। ওদিকেও চুপে চুপে চৌরঙ্গীর এক ফিরিঙ্গি সাহেবের সঙ্গে কথা-বার্তা পাকা হয়ে আছে বারীনের। মামার ট্রেনও কাশীর দিকে ছুটবে, বারীনও ইষ্টেশান থেকে ফিরতি-পথে সেই ফিরিঙ্গি সাহেবের কাছে এই নচ্ছার কুত্তাটাকে সাতাশ টাকা সাড়ে তেরো আনায় ঝেড়ে দিয়ে চৌরঙ্গীপাড়া থেকেই এন্তার চপ্-কাটলেট সেঁটে ফিরবে। হুঁ, পাকা কথা হয়ে আছে।

গোপেশ্বর বাবুর কথাও পাকা। মুখের কথামতো উনি এলেন ইষ্টেশানে; সঙ্গে বসন্ত। বারীনও আছে, বারীনের হাতে সুন্দর লম্বা শিকল সমেত জগন্নাথও আছে।

ট্রেন ছাড়বার সামান্য বাকি। বসন্ত বললো,—এই কুত্তাটাকেও কাশী নিয়ে যান কাকা! ওটাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়!

—চোপ্ রও ইষ্টুপিড! তোমাকে দেখলেও আমার গা জ্বলে যায়। দাঁড়াও, তোমাকেও আক্কেল দেখাচ্ছি। বুঝবে ঠ্যালা! নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে থাকবে আজীবন, এই ব্যবস্থা আমি ক'রে যাচ্ছি।—গোপেশ্বর বাবু তাকালেন বারীনের দিকে। বারীন জগন্নাথের

গলা জড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের ধূলোর উপরেই বসে আছে। এ দৃশ্য দেখলেও চোখ জুড়োয়। বারীন আর জগন্নাথ, যাকে বলে অভিন্নহৃদয়। বারীন ছাড়া জগন্নাথের আপনার বলতে এখন আর কে রইলো? আহা!

ঘণ্টা বাজলো, সময় হ'লো ট্রেন ছাড়বার। গোপেশ্বর বাবু বললেন,—বারীন, তুমি ছাড়া আমার জগুর আর কে রইলো, বলো? বারীন গদগদ গলায় বললো,—আমার জগন্নাথ ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর কে রইলো বলুন?

—বুঝেছি, বারীন বুঝেছি। সে জন্যেই আমার জগন্নাথকে আমি তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি। আর বসন্ত, এই বসন্ত! তোর মতো হাড়পাজি আমি জন্মে দেখি নি। বেশ, তোর ব্যবস্থাও শোন। বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি হচ্ছে বিষ। আমার সেই সবটুকু বিষ তোকেই দিয়ে গেলাম। এই বিষের জ্বালায় তুই আজীবন, যাকে বলে জর্জরিত, হবি, নাকের জলে চোখের জলে একাকার হবি, ঠ্যালা বুঝবি!

গোপেশ্বর বাবু ট্রেনে উঠলেন তাড়াতাড়ি। বসন্ত বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটু দোলাচ্ছে।

ট্রেন ছাড়ো-ছাড়ো। যেন মাথায় বাজ পড়েছে, এমনি ভাবে প্ল্যাটফর্মে ধুলোর মধ্যেই বসেছিলো বারীন। সত্যি-সত্যিই মামা বারীনকে একেবারে পথে বসিয়েছেন।

কিন্তু যে জগন্নাথের জন্য বারীনের এই দুর্দশা, বারীন কি তার একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে? উঁহু।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো বারীন। তারপর লম্বা শিকলশুদ্ধ জগন্নাথকে টানতে টানতে তাড়াতাড়ি চলে গেলো ট্রেনের একেবারে পিছনে। লাগেজ-ভ্যানের পিছনের একটা গাব্দাগোব্দা লোহার সঙ্গে ক'ষে বেঁধে দিলো শিকলটা।

যাক, মামার ট্রেনের সঙ্গে এই নচ্ছার জগু কুত্তাটারও হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে কাশীধামের দিকে গতি হোক।

গতি কিংবা দুর্গতি, যাই বল।

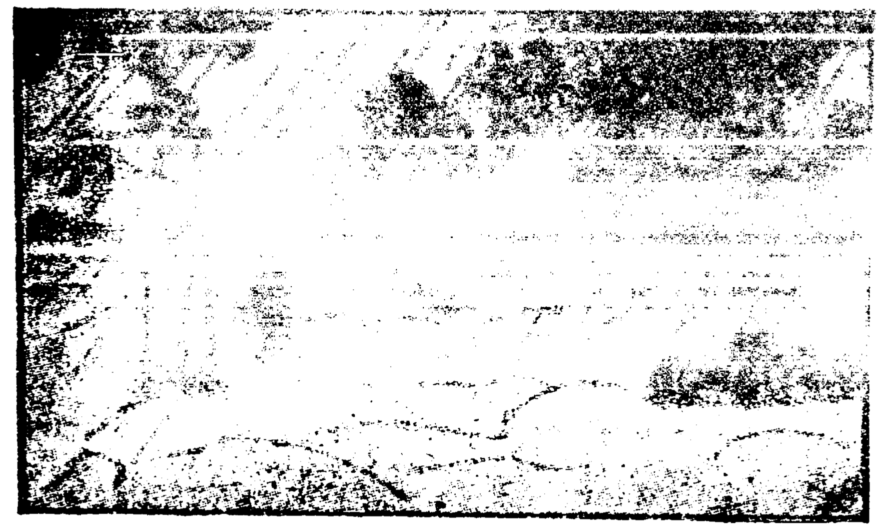

বল তো ?

নীচের ছবি দু'টি দেখে বল তো কোন্‌টা কিসের ছবি.! না পারলে শেষের দিকে উত্তর দেখ।

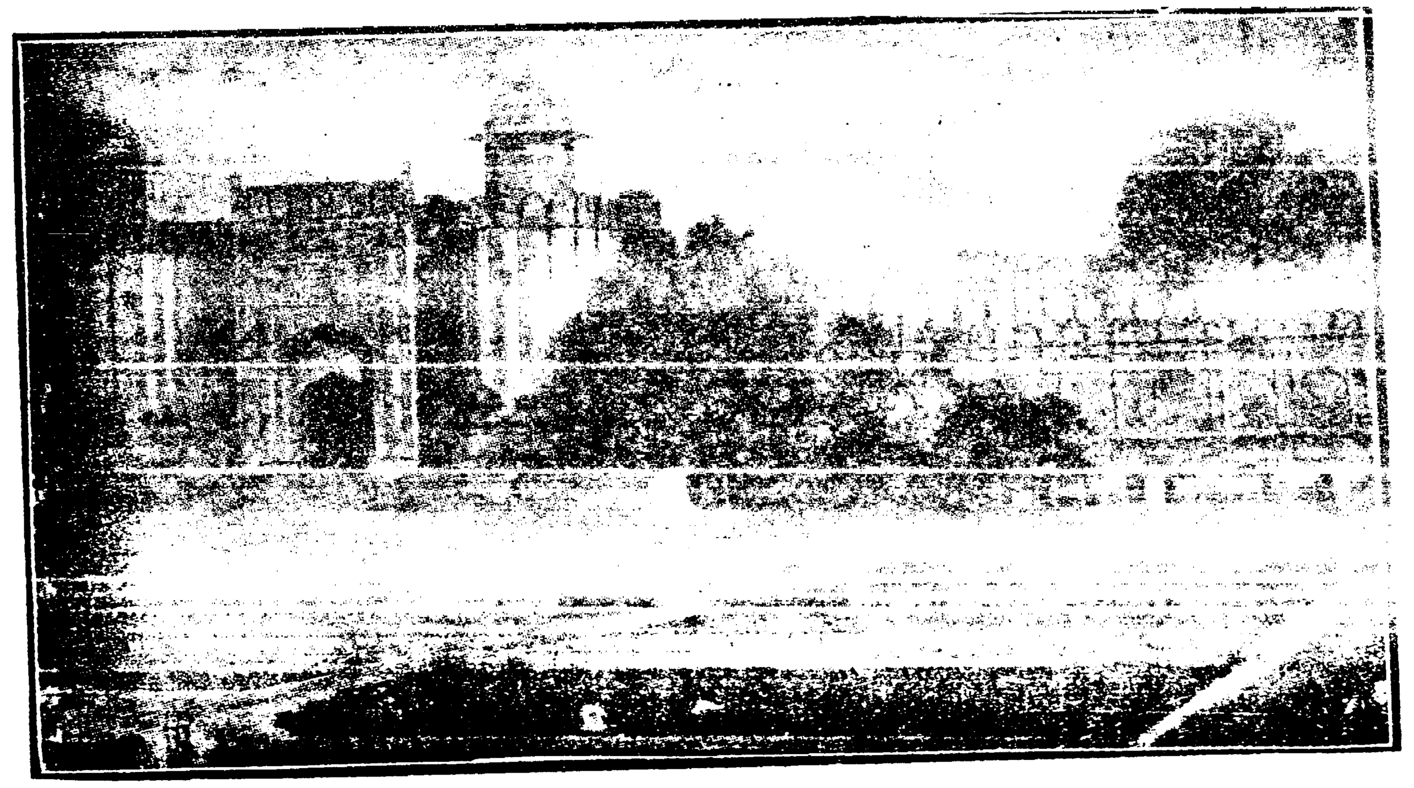

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্‌-সি

জলধরদা'র বাঘ শিকার

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় জলধর সেন ছিলেন ছোট-বড় সব সাহিত্যিকেরই “দাদা”—জলধরদা'। তিনিই এই গল্পটি বলেছিলেন। এই শিকারীদের দলে তিনিও ছিলেন একজন, যদিও নিজের হাতে বন্দুক ধরেন নি।

বহুদিন আগেকার কথা, জলধরদা' তখন সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ছুটি কাটাতে বেরিয়েছেন দেশভ্রমণে। সৈয়দপুরে (রংপুর জেলা) তাঁর এক দূর সম্পর্কের কাকা রেলে চাকরী করতেন। খুব আমুদে লোকটি। সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারতেন, আবার বন্দুকের হাতও বেশ ভালো ছিল। জলধরদা' তাঁরই ওখানে গিয়ে হাজির হলেন।

সেখান আরও কয়েকজন সঙ্গী জুটল। তখন ঠিক হ'ল সকলে মিলে একদিন বাঘ শিকারে যেতে হবে। কাছেই শিলিগুড়ি, আর তার পাশেই গভীর জঙ্গল। সে আমলে সে জঙ্গল ছিল আরও ভয়ানক। ঐ অঞ্চলের এক চা বাগানের ম্যানেজার সাহেবের ছিল শিকারের খুব বাতিক; তিনিই সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করে দিলেন।

শিলিগুড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোর বেলা চা-পানান্তে ৬.৭ জন মিলে শিকারের পোষাক পরে তৈরী হলেন। সাহেবেরও সঙ্গে যাবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ একটা জরুরী কাজে আটকে পড়ায় তাঁর আর যাওয়া হ'ল না। সাহেব বললেন, “আমার বেহারা দু'টো বন্দুক নিয়ে যাবে। ও-ই আপনাদের পথ-টথ দেখিয়ে দিতে পারবে। ও নিজেও একজন শিকারী, আর এ অঞ্চলের সবই ওর নখদর্পণে।”

ডিসেম্বর মাস। বেশ শীত পড়েছে। কাকাবাবু গায়ে একটা মোটা আলষ্টার চাপিয়ে নিয়েছেন, আর নিয়েছেন তাঁর সাধের বাঁশীটি। আর সকলেও যে যার নিজের নিজের গরম জামা গায়ে দিয়েছে। সাহেবের বেহারাও বন্দুক নিয়ে সঙ্গী হয়েছে।

একটু পরেই সহর ছেড়ে তাঁরা বনের মধ্যে এসে পড়লেন। সামনে একটা ছোট নদী। তারই পাড়ে বিরাট এক অশ্বত্থ গাছের ওপর অনেক উঁচুতে সাহেবের ব্যবস্থা মত মাচা বা 'টঙ' তৈরী করা হয়েছে, যার ওপর বসে বাঘ শিকার করা হবে। অদূরে ঐ রকম আর একটি গাছের ওপর আরও একটি টঙ। বেহারা বল্‌ল, একটু বেলা হলেই বাঘেরা এখানে জল খেতে আসবে। অবশ্য খুব বড় বাঘ নয়, তবে বাঘই।

শিকারীরা দুই দলে ভাগ হয়ে দুই মাচায় গিয়ে উঠলেন। জলধরদা', তাঁর কাকাবাবু আর সাহেবের বেহারা একই মাচায় রইল।

মাচায় উঠেই কাকাবাবু তাঁর আলষ্টারের পকেট থেকে বাঁশীটা বার করে বাজাতে সুরু করলেন। আগেই বলেছি, বাঁশী তিনি চমৎকার বাজাতেন। আজ যেন সুর আরও অদ্ভুত মনে হতে লাগল। সুরের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনভূমি যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বাঁশীর সুরে সাপ যেমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে কাকাবাবু বোধ হয় তেমনি বাঘকেও মন্ত্রমুগ্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, বাঘ আর বেরোয় না।

এদিকে রোদ আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে। তখন বেহারা বল্‌ল, বাঘ বোধ হয় কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে, একটু নেমে দেখলে ভাল হয়।

টঙের নিরাপদ উচ্চতায় বসে বাঘ মারা (বা বাঘ মারা দেখা হয়তো সহজ, কিন্তু মাটিতে নেমে বাঘের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান তত সহজ নয়। কেউই নামতে চায় না। হঠাৎ কাকাবাবু বললেন, "আমি যাব। ভারী তো বাঘ! তোরা বাঘের সাড়া পেলে বরঞ্চ আওয়াজ করিস।"

একটানে আল্‌ষ্টারটা খুলে ফেলে তিনি তর্ তর্ করে মাচা থেকে নামতে লাগলেন। সবাই বল্‌ল, "আরে, আল্‌ষ্টারটা নিয়ে যান। যা শীত! আর বাঁশীটাও ফেলে যাবেন না।"

কাকাবাবু বাঁশীটা তুলে নিলেন, কিন্তু আল্‌ষ্টারটা নিতে চাইলেন না। তখন বেহারা সেটা কাঁধে ক'রে তাঁর পিছন পিছন চল্‌ল। একটু পরেই দু'জনে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আরও প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল।

হঠাৎ মনে হ'ল, জঙ্গলের ধারে ঘাসের ভেতর কেমন একটা সর্ সর্ আওয়াজ হ'ল। তবে বোধ হয় এতক্ষণে সত্যি বাঘ এল! সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিলেন রেলের গার্ড, তাঁর পকেটে সর্ব্বদাই থাকত হুইস্‌ল্ বাঁশী। তিনি আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে জোরে সেই হুইস্‌ল্ বাজিয়ে দিলেন। সর্ সর্ শব্দ চকিতে থেমে গেল।

আরও খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। তার পর আবার ঝোপের পাতাগুলি নড়ে উঠলো। তার পরই দেখা গেল ঝোপ ঠেলে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে—প্রথমে বেহারা, তার পেছনে কাকাবাবু, তাঁর পেছনে কয়েকজন কুলি। বেহারা কাঁধ থেকে আলষ্টারটি নামিয়ে মাটিতে রেখেছে, তার পর বন্দুক বাগিয়ে বনের দিকে নিশানা করছে। কাকাবাবুও বন্দুক বাগিয়ে ধরেছেন।

তারপরই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বেহারার বন্দুক সবেগে গর্জ্জে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বাঘ বোধ হয় ততোধিক বেগে লাফিয়ে পড়ল তাদের মধ্যে। বন্দুকের গুলি বাঘের গায়ে লাগে নি।

কাকাবাবুও বন্দুক ছুঁড়বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সময় পেলেন না। তার আগেই বাঘ তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে। টঙের উপর সঙ্গীরা চীৎকার ক'রে উঠল। তাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে। কাকাবাবুর আজ আর রক্ষা নেই; তিনি হামাগুড়ি দিয়ে কোন রকমে বাঘের পেটের তলা দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছেন।

হঠাৎ বেহারা এক কাণ্ড করে বস্‌ল। তার সামনেই মাটিতে পড়ে ছিল কাকাবাবুর বিরাট আল্‌ষ্টারটা। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সে সেটা নিয়েই বাঘের মাথার ওপর চেপে ধরল, আর, কি করে কে জানে, হয়তো আলষ্টারের ২।১টা বোতাম লাগানই ছিল,—সেটা ঠিক বস্তার মত বাঘের মাথায় আটকে গেল! অনেকটা 'টুনটুনির বই'এর সেই 'ইঁড়িমিড়িকিড়ি বাঁধনের' মত আর কি!

বাঘ বেচারা জীবনে এমন অবস্থায় পড়ে নি! বিরাট, ভারী আলষ্টারটা ব্রহ্মদৈত্যের মত তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। যতই লাফায় ততই সেটা আরও আঁট হয়ে বসে যায়। তখন আর কি, কোন রকমে লেজ গুটিয়ে আলষ্টার মাথায় নিয়েই সে চোঁচা দৌড় দিল বনের দিকে।

টঙের ওপর সঙ্গীরা এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে এই আজব কাণ্ড দেখছিলেন।

বাঘ পালাতে তাঁদের হুঁশ হ'ল। সকলে তখন তাড়াতাড়ি মাচা থেকে নেমে ছুটলেন কাকাবাবুর দিকে।

ওদিকে কাকাবাবু তখন উঠে দিব্যি গায়ের ধূলো ঝাড়ছেন। আশ্চর্য্য, এত কাণ্ডের পরও তাঁর গায়ে একটি আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নি!

আর শিকার নয়, এবার মানে মানে ফিরতে পারলে সবাই বাঁচে। ফিরবার পথে কাকাবাবুর খেয়াল হ'ল তাঁর বাঁশীটাও নেই। ঝুটোপুটির সময় ওটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, তারপর বাঘ পালাবার সময় আলষ্টারের সঙ্গে ওটাও হয়তো টেনে নিয়ে গেছে।

আলষ্টার গেছে, যাক্, তার জন্য কাকাবাবুর তেমন দুঃখ হয় নি। কিন্তু সাধের বাঁশীটি হারিয়ে তিনি নাকি বহুদিন মন-মরা হয়ে ছিলেন।

বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দ

মহাকবি কালিদাস তাঁর অমর কাব্য 'মেঘদূত' রচনা করে গেছেন মান্দাক্রান্তা ছন্দে। হ্রস্ব-দীর্ঘ অনুযায়ী অল্প বা বেশী টেনে এই ছন্দ পড়তে হয়। সংস্কৃত পড়বার নিয়মও তাই। সে জন্য এই ছন্দ খুব শ্রুতিমধুর। যেমন ধর—

"যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নাপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।"

কিংবা

"জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুস্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মাঘোন।"

আ-কার, এ-কার, ও-কার প্রভৃতি দীর্ঘ শব্দগুলি টেনে পড়তে হবে। ঠিকমত পড়তে পারলে, যারা ভাল সংস্কৃত জানে না তাদের কাছেও, এর মাধুর্য্য ধরা পড়ে।

বাংলায় কিন্তু এই মন্দাক্রান্তা ছন্দের তেমন চল হয় নি। এর কারণ আর কিছুই না, বাংলা ভাষা সংস্কৃতের মত হ্রস্ব-দীর্ঘ অনুযায়ী পড়া হয় না। এবং, হয় না বলেই, কেউ ওই ভাবে পড়লে তা একটু অস্বাভাবিক শোনায়। রবীন্দ্রনাথ কখনও মন্দাক্রান্তা ছন্দে বাংলা কবিতা লিখেছেন বলে মনে পড়ছে না, তবে কবি সত্যেন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন। কেউ কেউ হয়তো সেটা পড়েছও।

"নির্ম্মল হোক পথ শুভ ও নিরাপদ দূর সুদুর্গম নিকট হোক,
হ্রদ-নদ নির্ঝর নগরী মনোহর সৌধ সুন্দর জুড়াক চোখ।"

এখানেও টেনে টেনে পড়তে হবে কিন্তু ঠিক হ্রস্ব-দীর্ঘ অনুযায়ী পড়লে চলে না। তা ছাড়া বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত শব্দও এখানে প্রচুর।

কবি প্যারীমোহন সেনগুপ্তও তাঁর মেঘদূতের অনুবাদে অনেকটা এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"দুঃখে রামগিরি আশ্রমে সে রহে হারায়ে সহজাত মহিমা তার,
স্নিগ্ধ ছায়া যেথা বিতরে তরু যত সীতার স্নানে পূত সলিল যার।"

অবশ্য এতে ঠিক মন্দাক্রান্তার লালিত্য ধরা পড়ে নি।

কিন্তু আজ তোমাদের এমন একটি বাংলা মন্দাক্রান্তা ছন্দের নমুনা দেব যেটিকে অনেকটা খাঁটী বাংলাই বলা যেতে পারে। আবার মজা এই, এই কবিতাটি বহুদিনের পুরোনো। প্রায় ৭৫ বছর আগে যখন বাংলা ভাষা সংস্কৃতকেই বিশেষ ভাবে অনুসরণ করে চলত তখন এটি লেখা হয়েছিল। সত্যব্রত সামশ্রমী নামে একজন পণ্ডিত যজুর্ব্বেদের বাংলা অনুবাদ করে তাতে তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন এই ছন্দে, অথচ প্রায় খাঁটী বাংলায়। অবশ্য রসভঙ্গ না করে ঠিকমত পড়তে হলে এটিও হ্রস্ব-দীর্ঘ করেই পড়তে হবে,—বিশেষ করে আ, ঈ, উ, এবং ওকারান্ত শব্দগুলি টেনে পড়তেই হবে। কবিতাটি পড়তে বেশ মজা লাগে। যেমন ধর—

"গোড়ে কাল্না সুরধুনি-তটে ধাইগাঁ গ্রাম জানো,
সে-ই স্থানে নরগুরুকুলে রামকান্তো ছিলেনো।
পাট্না জেলা জজিয়তি পদে মান্যযুক্তো হলেনো,
তাঁরী পুত্রো বহুগুণযুতো রামদাসো পিতা নো।"

তার পর

"রাজেন্দ্রেরী অভিমত লয়ে আসিয়া কল্যতাতে
যুক্তো হৈলাম এডিটরি পদে এসিয়াটিক সভাতে।" ইত্যাদি।

রাজেন্দ্রেরী অর্থাৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরই; কল্যতা হচ্ছে কলকাতা। বানান অবশ্য ছন্দের খাতিরে জায়গায় জায়গায় ইচ্ছেমত বদলানো হয়েছে, আর সংস্কৃতও কবি একেবারে বাদ দিতে পারেন নি। যেমন 'পিতা নো' হচ্ছে 'পিতা নঃ'। নঃ অর্থাৎ আমাদের।

তোমরা, যারা কবিতা লিখতে জান, একবার এই মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবিতা লিখবার চেষ্টা করে দেখতে পার।

———

বীণাপাণি

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

উঠুক উদাত্ত তব বীণার ঝঙ্কার,
কর, মাতঃ, জড় দেহে পীযূষ সিঞ্চন ;
দিশি দিশি নব প্রাণ জাগুক্ আবার,
বেদবেদান্তের ধ্বনি ভরুক গগন।

পিতা তব বিশ্বনাথ, মাতা কাত্যায়নী,
কমলা ভগনী, ভ্রাতা দেবসেনাপতি ;
বরিষ করুণাধারা, বিদগ্ধ জননি,
শস্ত্রে শাস্ত্রে কর কৃপা সন্ততির প্রতি।

ভুলে গেছে রণবাদ্য বঙ্গের সন্তান,
কর দেবি, দেহে তার শক্তি সঞ্চালন ;
উঠুক দিগন্তব্যাপী তব বীণা-তান,
মধুরে কঠোরে কর শুভসম্মেলন।

এস তবে বীণাপাণি, দেহ পদছায়া,
উজলি' নবীন তেজে এ বঙ্গের কায়া।

তেইশে জানুয়ারী

শ্রীনবগোপাল সিংহ

আশা নিরাশার দোলনায় তুলি
ভাবি আর বসে প্রহর গুণি,
জানি না তোমার অজ্ঞাতবাস
কবে হবে শেষ হে ফাল্গুনী !

আজিও কি তব রণপ্রস্তুতি,
অস্ত্রশিক্ষা হলো না সারা ?
শমীবৃক্ষের রক্ষিত তূণ
এখনো কি তব হয় নি পাড়া ?

নব ভারতের নবীন পার্থ,
এসো হে ভারততীর্থে ফিরে,
বাজাও তোমার বিজয় তূর্য্য
বিস্মিত কর সংশয়ীরে।

তোমার ভারত আজিকে স্বাধীন
কিন্তু এ কি এ বিকৃত রূপে !
সোনার অঙ্গ ঢেকে গেছে তার
কলুষতা আর গ্লানির স্তূপে।

রবি-বিবেকের মহান্ তীর্থ,
বঙ্গ ঋষির ধ্যানের ছবি,
সে ভারতে তুমি রাঙ্গাও আবার,
জাগাও চেতনা হে বিপ্লবী !

হে যুগস্রষ্টা, আনো নব যুগ,
সফল কর হে স্বপ্ন তব ;
জনম-লগনে রাঙাও গগন
হে নব তপন পুনর্ভব !

ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন যাঁর আবিষ্কার

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস-সি

ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন !

নামটা আজকাল বোধ হয় আর তোমাদের কাছে অপরিচিত নয়। নানা রকম দুরন্ত রোগে —বিশেষ ক'রে যক্ষ্মার মত নিদারুণ রোগেও এমন কার্য্যকরী ওষুধ আর নেই। পেনিসিলিন দিয়েও যে সব রোগে ঠিকমত কাজ হয় না ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের কল্যাণে আজকাল ডাক্তারেরা হামেশাই তা সারিয়ে দিচ্ছেন।

সম্প্রতি এই ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কারককে বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

এই আবিষ্কারকের নাম তোমরা এর আগেই রামধনুতে পড়েছ। ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত আমেরিকান্ বিজ্ঞানী ডাঃ সেল্ম্যান্ ওয়াক্স্ম্যান্।

ওয়াক্স্ম্যান্ কিন্তু আসলে আমেরিকার লোক ন'ন। এমন কি অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি আমেরিকার ভাষাও জানতেন না। তাঁর জন্ম হয়েছিল ইউক্রেনের একটি গ্রামে, সে আজ ৬৫

বছর আগেকার কথা। ২২ বছর বয়সের সময় তিনি পড়াশোনা করবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি লাভ ক'রে কিছু দিন পরে তিনি যোগ দেন নিউ জার্সির গবেষণা-মন্দিরে। এখানেই, ১৯৪৩ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার প্রকাশ করেন।

ওয়াক্‌স্‌ম্যান্ কিন্তু চিকিৎসক ন'ন ; অবশ্য শরীরতত্ত্ব নিয়ে তিনি অনেক পড়াশোনা করেছেন। আসলে তিনি হচ্ছেন একজন জীবাণুতত্ত্ববিদ্। বিশেষ করে মাটীর ভিতরকার জীবাণু নিয়েই তিনি বেশীর ভাগ গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, মাটীই হচ্ছে আমাদের মা,—কল্যাণময়ী মা। এরই বুকে মিশিয়ে আছে মায়ের বুকের অপরূপ যাদু। কথাটা তিনি প্রমাণ করেছেন।

তোমরা নিশ্চয়ই জান হিন্দু ছাড়া প্রায় অধিকাংশ সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ মরে গেলে তাকে মাটীতে কবর দেওয়ার প্রথা আছে। মানুষ সাধারণতঃ মারা যায় নানা রকম কঠিন রোগে, আর দুনিয়ার যত রকম রোগ সবই হয় নানা রকমের জীবাণুর কল্যাণে। কাজেই গোরস্থানের কাছাকাছি মাটীতে ঐ সব রোগের জীবাণু বা বীজাণু থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

একবার একদল বিজ্ঞানী রোগের বীজাণু নিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য এই রকম এক গোরস্থানের কাছাকাছি খানিকটা মাটি সংগ্রহ করলেন। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল, ওমা, এ মাটীতে তো কোনও রোগের বীজাণু পাওয়া যাচ্ছে না! রোগের জীবাণু সেখানে নিশ্চয়ই ছিল এবং এতদিনে তাদের বংশ ওখানে আরও বেড়ে যাবার কথা, কিন্তু কোথায় গেল সেগুলো?

এখন, বিজ্ঞানীরা জানতেন. কতকগুলো জীবাণু যেমন আমাদের ঘোরতর শত্রু, তেমনি আমাদের বন্ধু-জীবাণুও আছে অনেক। তারা এই সব বিষাক্ত জীবাণুদের শত্রু, দেখতে পেলেই তাদের ধরে খেয়ে ফেলে। তবে কি মাটির মধ্যেও এই রকম বন্ধু-জীবাণু আছে যারা রোগ-জীবাণু-গুলিকে ধ্বংস করে ফেলছে? তা যদি সত্যি হয়, তবে তাদের খুঁজে বার করে নিয়ে তাদের দিয়ে ওষুধ বানাতে পারলে হয়তো অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কারণ রোগীর শরীরের মধ্যেও তো ঐ সব শত্রু-জীবাণুরাই কাজ করছে। তখন খোঁজ্—খোঁজ্—খোঁজ্। একদল বিজ্ঞানী উঠে পড়ে লাগলেন। ওয়াক্‌স্‌ম্যান্‌ও এঁদের একজন।

কিন্তু কাজটা যত সহজ মনে করছ মোটেই তা নয়। কী অসীম ধৈর্য্য, অসীম পরিশ্রম এবং অসীম একাগ্রতা এর জন্য দরকার তা কল্পনা করাই কঠিন। এক কণা মাটির মধ্যে হয়তো লক্ষ লক্ষ জীবাণু ভীড় করে আছে—হাজার হাজার রকমের জীবাণু। এদের প্রত্যেকটিকে চিনে বাছাই করতে হবে। সে কি সহজ কথা! ওয়াক্‌স্‌ম্যান্ লিখেছেন—"আমি প্রথমে খানিকটা রোগ-বীজাণু বাছাই করে শ্লাইডের ওপর ছড়িয়ে দিতাম। তারপর যে মাটি নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে তারই খানিকটা জলে গুলে শ্লাইডের ওপর ঢেলে দিতাম। তারপর অণুবীক্ষণের নীচে সে শ্লাইড বসিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লক্ষ্য করতাম কোথাও রোগ-বীজাণুর কিছুটা অদৃশ্য হয়েছে কিনা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিছুই পাওয়া যেত না। কিন্তু তাতে দমে গেলে চলবে কেন? আবার নতুন ক'রে পরীক্ষা সুরু করতে হ'ত।" এই ভাবে চল্‌ত মাসের পর মাস. বছরের পর বছর।

মাঝে মাঝে এমন এক-আধটা জীবাণুর সন্ধান মিলত যারা, সত্যিই দেখা যেত, রোগ-বীজাণু ধ্বংস করে ফেলছে। অনেক আশা-ভরসা নিয়ে ওয়াক্‌স্‌ম্যান হয়তো কঠিন পরিশ্রম করে তা দিয়ে ওষুধ বানাতেন, কিন্তু হরি হরি, প্রাণিদেহের ওপর পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা যেত সে জীবাণু শুধু রোগের জীবাণুই ধ্বংস করে না, প্রাণিদেহের ওপরেও তার তেমনি রাগ। জীবন্ত কোষ ধ্বংস করে তাকেও সে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেয়। অর্থাৎ এরাও আমাদের শত্রু-জীবাণু, বন্ধু নয়।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র ন'ন ওয়াক্‌স্‌ম্যান, আবার সুরু হ'ত গোড়া থেকে নতুন ক'রে পরীক্ষা। এমনি ভাবে অবশেষে পুরুষকারেরই জয় হ'ল। ১৯৪৩ সালে ওয়াক্‌স্‌ম্যানের পরীক্ষা সার্থক হ'ল – তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য পেয়ে গেলেন। এ কাজে তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন ডাঃ স্কাজ্।

"ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারের সময়"—ওয়াক্‌স্‌ম্যান বলছেন—"আমরা দশ হাজার জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা সুরু করি। শেষে দেখা যায় এদের মধ্যে মাত্র শতকরা দশটি জীবাণুর রোগ-বীজাণু ধ্বংস করার অল্পবিস্তর ক্ষমতা রয়েছে। তার পর এদের থেকে ১০০টি জীবাণু বেছে নিয়ে তা থেকে দশ রকম ওষুধ তৈরী করা হ'ল। এরই একটি হচ্ছে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন।"

ওষুধ তৈরী করে প্রথমেই তো আর তা মানুষের ওপর প্রয়োগ করা চলে না, তাই প্রথম পরীক্ষা চল্‌ল গিনিপিগের ওপর। গিনিপিগের শরীরে প্রয়োগ করে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গেল। তখন একে একে নানা জন্তুর ওপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা চল্‌ল। ওয়াক্‌স্‌ম্যান নিজে ডাক্তার ন'ন, তাই তাঁকে সাহায্য করবার জন্য কম করে ৫০ জন ডাক্তার এগিয়ে এলেন।

অবশেষে মানুষের ওপর প্রয়োগের পালা। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে. যুদ্ধে আহত সৈনিকে হাসপাতাল ভর্ত্তি। তাদের অনেকেরই জীবনের কোন আশা নেই। ডাক্তারেরা এই সব রোগীর ওপর তাঁদের নতুন ওষুধ প্রয়োগ করতে লাগলেন। এবারেও ফল পাওয়া গেল আশ্চর্য্য। দেখতে দেখতে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে পরিগণিত হ'ল। ওয়াক্‌স্‌ম্যানের তো জয়-জয়কার!

টাইফয়েড, কলেরা, পেটের অন্যান্য ব্যারাম. বুকের ব্যারাম—কত শত শত রকমের রোগে যে আজকাল ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ব্যবহার করে ডাক্তারেরা অব্যর্থ ফল পাচ্ছেন তার হিসেব দেওয়া কঠিন। যক্ষ্মার কথা তো আগেই বলেছি। এ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প শোন। অল্প কিছু দিন আগে ওয়াক্‌স্‌ম্যান নোবেল পুরস্কার আনতে সুইডেন যান। সুইডেনের রাজা যখন ওয়াক্‌স্‌ম্যানকে পুরস্কার দিতে যাচ্ছেন তখন একটি ছোট্ট মেয়ে এসে ওয়াক্‌স্‌ম্যানের হাতে একটি ছোট্ট গোলাপের তোড়া দিল। তোড়ায় পাঁচটি টকটকে লাল গোলাপ জ্বল জ্বল করছে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই : পাঁচ বছর আগে মেয়েটি অত্যন্ত কঠিন এক অসুখে পড়ে। জীবনের কোন আশাই ছিল না তার, কিন্তু অবশেষে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগ করায় তার জীবন রক্ষা পায়। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের কল্যাণে নতুন-করে-পাওয়া জীবনের পাঁচটি বছর, তারই স্মারক চিহ্ন হচ্ছে ঐ পাঁচটি লাল গোলাপ। মেয়েটি তার জীবনদাতাকে তাই দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। ওয়াক্‌স্‌ম্যান্ বললেন, "এই হচ্ছে আমার পরিশ্রমের আসল পুরস্কার। নোবেল পুরস্কারের চেয়েও এটিকে আমি অনেক বেশী মূল্যবান্ মনে করি।"

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

ছোটদের আজব দেশে এলিস : লেখা—শ্রীঅমল দাশগুপ্ত, ছবি—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—বাণীতীর্থ, ২৪৬-এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯। দাম ৷৷০

লিউইস কেরলের লেখা "য়্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" বইখানি ইংরেজি শিশুসাহিত্যের একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। সেই গল্পটি-ই বাংলায় ছোট্ট ক'রে লিখে তোমাদের উপহার দিয়েছেন শ্রীঅমল দাশগুপ্ত। ছোট্ট করতে হয়েছে বলে মূল বইএর অনেক অংশ বাদ দিয়ে হয়েছে। তা সত্ত্বেও, যেটুকু আছে তার মধ্যেই, যথেষ্ট হাসির খোরাক ছড়ানো আছে। লেখা বেশ ঝরঝরে. ছবিগুলিও সুঅঙ্কিত—বিশেষ করে মলাটের ছবিটি। বড় বড় অক্ষরে দু'রংএর কালিতে ছাপা চিত্রবহুল বইখানি ছোটদের কাছে খুবই লোভনীয় হবে সন্দেহ নেই।

সিনডেরেলা : লেখা—শ্রীমণিলাল অধিকারী, আঁকা—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—বাণীতীর্থ, ২৪৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯। দাম ৷৷০

বিখ্যাত ফরাসী রূপকথা সিনডেরেলার কাহিনী অবলম্বন করে এই সুন্দর বইখানি লেখা হয়েছে। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীটি সুন্দর, ছবিগুলিও তার সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। বড় বড় অক্ষরে দু'রঙের কালিতে ঝরঝরে ছাপা। উপহার দেবার পক্ষে চমৎকার।

দি ইন্‌ভিজিব্‌ল্ ম্যান্—অনুবাদক শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ২৪বি, লেক্ রোড, কলিকাতা-২৯। দাম ১৷৷০

সুবিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক এইচ. জি ওয়েল্‌সের লেখা অদৃশ্য মানবের এই কাহিনী ইংরেজি ভাষায় একখানি অত্যন্ত জনপ্রিয় বই। বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসে ওয়েল্‌স্ সিদ্ধহস্ত—আর এখানি, অনেকের মতে, তাঁর ঐ ধরণের বইএর মধ্যে সেরা বই। কাজেই এর অনুবাদ, কিছু সংক্ষিপ্ত হলেও, বাঙ্গালী পাঠকেরা আদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবে। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ—পড়তে বসলে মূল গল্প বলেই ভুল হয়—অনুবাদ বলে মনে হয় না। এটি অনুবাদকের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

দরকারী কথা

রামধনু কার্য্যালয়ের টেলিফোন নম্বর আগামী ২৫শে মাঘ থেকে বদলে যাচ্ছে। নতুন নম্বর হবে—সাউথ ৩১৮১।

এ মাস থেকে রামধনুর ১বি, রসা রোডস্থ শাখা কার্য্যালয় তুলে দেওয়া হ'ল। আগামী বছর থেকে আমরা উত্তর বা মধ্য কলিকাতায় আর একটি শাখা কার্য্যালয় খুলবার চেষ্টা করব।

আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় ক্রিকেট দল

বিজয় হাজারের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে খেলতে গেছে, সেখানে তাদের প্রথম টেষ্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'ল। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংস্এ ৪১৭ রান্ তোলায় সকলেই ভেবেছিল তাদের ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হ'ল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ১ম ইনিংস্এ করল ৪৩৮। ভারত ২য় ইনিংস্এ করল ২৯৪। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ কোন উইকেট না হারিয়ে ১৪২ রান্ করার পর সময় পার হয়ে যাওয়ায় ভারত রক্ষা পেল।

শিশুসাহিত্য-পরিষদ্

সম্প্রতি শিশুসাহিত্য-পরিষদের সাধারণ অধিবেশন ও নির্ব্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। নতুন বছরে পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তাদের পদে যাঁরা নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নাম এখানে দেওয়া হ'ল। সভাপতি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সহ-সভাপতি ডাঃ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, শ্রীস্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য। সম্পাদক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। সহ-সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল ও শ্রীকল্যাণকুমার রায় চৌধুরী। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য—অধ্যক্ষ শ্রীক্ষেত্র-পাল দাস ঘোষ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, শ্রীঅমল-শঙ্কর রায় শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী, শ্রীননীগোপাল মজুমদার, শ্রীকমলা দত্ত, শ্রীমীরা রায় চৌধুরী।

প্রবাসী বা নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

বড়দিনের ছুটিতে উড়িষ্যার কটক সহরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন সমারোহের সঙ্গে হয়ে গেছে। সম্মেলনের নাম এবার থেকে

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বদলে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' রাখা হয়েছে। এবারে মূল সভাপতি হয়েছিলেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী ছিলেন খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও এবং শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)।

কলকাতায় শিশু-উৎসব

সম্প্রতি শিশু-রংমহলের উদ্যোগে কলকাতার মিউজিয়াম-প্রাঙ্গণে ৫ দিন ধরে যে বিরাট শিশু-উৎসব হয়ে গেল নানা দিক্ দিয়ে তা স্মরণযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এবং ভারতের বাইরেরও নানা জায়গার শত শত

শিশু একত্র হয়ে বিশেষ ভাবে তৈরী সুবিশাল রঙ্গমঞ্চে যে আশ্চর্য্য অভিনয়-অনুষ্ঠান দেখিয়েছে এ দেশে তা বোধ হয় নতুন। শিশুদের স্বপ্নরাজ্য বলতে যা বোঝায় এ যেন তাই! শিশু-রংমহল কলকাতায় এই রকম কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলবার পরিকল্পনা করেছেন।

অগ্রহায়ণ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

সব চেয়ে ভাল ছোট গল্পের জন্য পুরস্কার পেলেন—শ্রীরেণুকা চট্টোপাধ্যায় (বনারস)। আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে:— শ্রীমিহির দাশগুপ্ত (জামসেদপুর), শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত (রায়পুর), শ্রীসোমনাথ মজুমদার (উছলপুখুরী)।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

নাগপুর। (প্রথম অক্ষর 'না' তো বলেই দেওয়া হচ্ছে।)

উত্তরদাতাদের নাম:—গৌতম, গুণু, কেপ্টেন, বাপ্পা, মাণিক, বৌটিস, ফুলটিস (করিমগঞ্জ); দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-৭); হেমেন্দ্রনাথ সেন (বালিগঞ্জ); সীমা, রুবি, শান্তনু, গৌতমদা, শ্যামা, ছবিদি ও দিদিমণি (করিমগঞ্জ); বেণু ঘোষ (কাটিহার (; ১৩নং কালীতারা বসু লেন স্থিত কর্পোরেশন্ ফ্রী প্রাইমারী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ (কলিকাতা); শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত (নাগপুর); শ্রীমলিনা সোম (দিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি এমন এক একটি শব্দ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে যার সামনে থেকে পড়লে যা হয়, পেছন থেকে পড়লেও তাই হবে। (যেমন ধর, 'জলজ' শব্দটি।)

—বাবু — যুবক, থাকেন — সহরে। ভারী সৌখীন, — কাপড় ছাড়া পরেন না। বন্ধুদের তিনি — মণি। কিন্তু ভদ্রলোকের এক বাতিক, রোজ — খাওয়া চাই, আর চাই মুখে—ঘষা। রং নাকি ওতে ফর্সা হবে। অথচ এমনিতেই তাঁর — চাঁপার মত রং!

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

"এক ঘণ্টার জন্য যদি তোমার যা খুসী তাই তোমাকে করতে দেওয়া যায় তবে তুমি কি করবে?"—এই বিষয়ে একটি লেখা পাঠাতে হবে। আমাদের বিচারে যার উত্তর সব চেয়ে ভাল হবে সে-ই পাবে পুরস্কার। প্রতিযোগিতায় যে কেউ যোগ দিতে পারবে তবে প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে পূর্ণ করে যুড়ে দিতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। এ মাসের কুপনই দিতে হবে, পুরোনো কুপন দিলে হবে না। লেখা আগামী ২৯শে ফাল্গুনের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

কুপন
রামধনু
পুঃ মাঘ ৫৯

নাম—
ঠিকানা—
বয়স—
নিজে গ্রাহক কিনা—

— পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। —

বিশ্ব পরিচয়

পৃথিবীর সকল দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস সহ পাঁচশতাধিক একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ ৮৲

বিশ্বকথা সিরিজ

সোভিয়েৎ দেশ ১।০

শ্রীপ্রভাবতী দেবীর

কৃষ্ণা-সিরিজ

(মেয়েদের অ্যাডভেঞ্চার)

প্রথম-গ্রন্থ :—

কারাগারে কৃষ্ণা ১॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

বিচিত্রা-সিরিজ

(ডিটেক্‌টিভ ও অ্যাডভেঞ্চার)

প্রথম গ্রন্থ :—

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন

অনুবাদ সাহিত্য

অলিভার টুইষ্ট ১॥০

ব্ল্যাক অ্যারো ১॥০

ট্রেজার আইল্যাণ্ড ১॥০

টেল্ অব্ টু সিটিজ

অ্যাডভেঞ্চার অব মার্কো পোলো ১।০

কাউণ্ট অব মণ্টিক্রষ্টো ১।০

ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড ১॥০

শিশু-মাসিক

শুকতারা

প্রতি সংখ্যা— ।৵০

বার্ষিক— ৪৲

দশ বছর পরে পুনরায় ছাপা হইল।

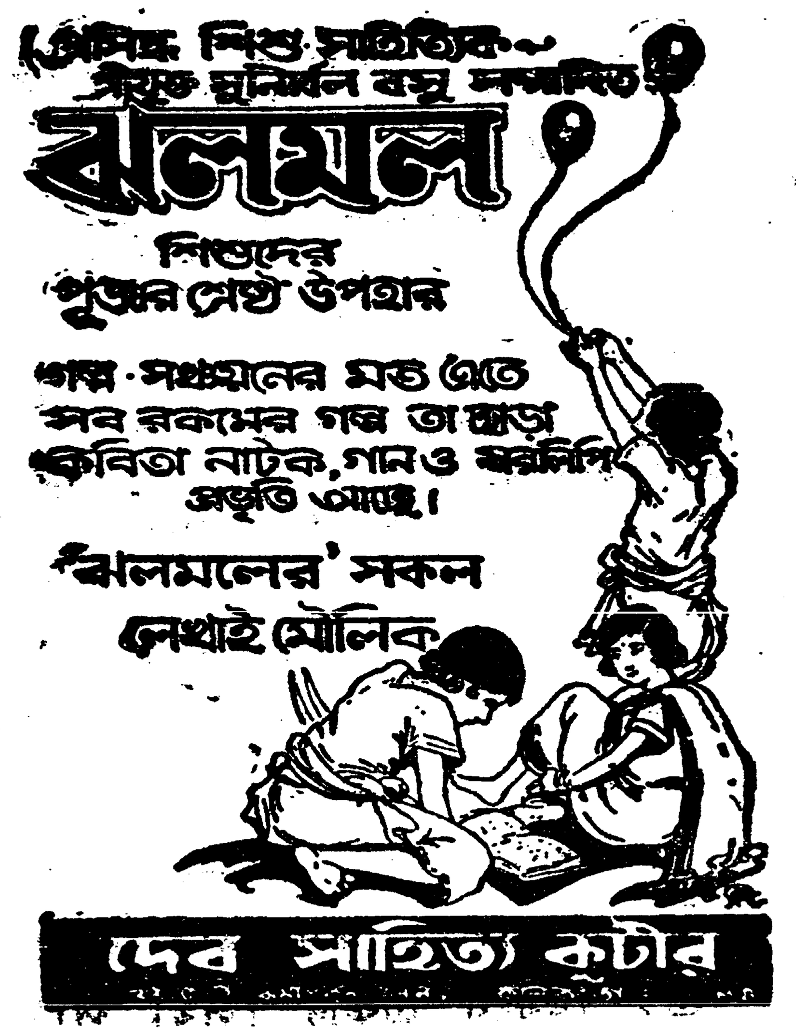

১৬ খানি রঙ্গিন ছবি ও অসংখ্য রেখাচিত্রে পরিশোভিত দাম - ৩৲

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প সঙ্কলন
আলো দিয়ে গেল
দাম—২৲

*

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

বিশ্বকথা সিরিজ

জার্ম্মান দেশ ১।০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

চতুর্দ্দশ গ্রন্থ :—

কমলাকান্তের দপ্তর ১৲

অমর বীর সিরিজ

দশম গ্রন্থ :—

বারীন ঘোষ ।০

ভ্রমণ, শিকার ও অ্যাডভেঞ্চার

আকাশ গঙ্গা ১॥০

দুর্গমের বিভীষিকা ১৲

সুন্দর বনের শিকারী ১৲

আবার যখের ধন ১।০

হিমালয়ের বুকে ১৲

বামনের দেশ ৸০

দৈত্যপুরী ৸০

শিশুনাটক

সিপাহী বিদ্রোহ ১৲

কেদার রায় ॥৵০

বীর শিবাজী ॥৵০

স্বামীজী ॥৵০

স্বাধীনতা জাগলো ॥০

আগোরে ধীরে ॥৵০

দেবসাহিত্য কুটীর * * * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ১৲

বিজ্ঞান-বুড়ো ১৲

আকাশের গল্প ১।০

আবিষ্কারের গল্প ৸০

ধূমকেতু ৸০

অয়েল পেন্টিং (নাটক) ।০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রংচং ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অব্ দি মোহিকান্‌স্ ॥৵০

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি ১।০

পদ্মরাগ ১॥০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ৸৵০

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর সহযোগে)

নূতন পুরাণ ৸৵০

হাস্য ও রহস্য ৸৵০

চায়ের ধোঁয়া ৸০

দমাদম্ দামোদর (নাটক) ।৵০

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত

অলিভার টুইষ্ট ॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ও রামধনু কার্য্যালয়, ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

লিলি বিস্কুট

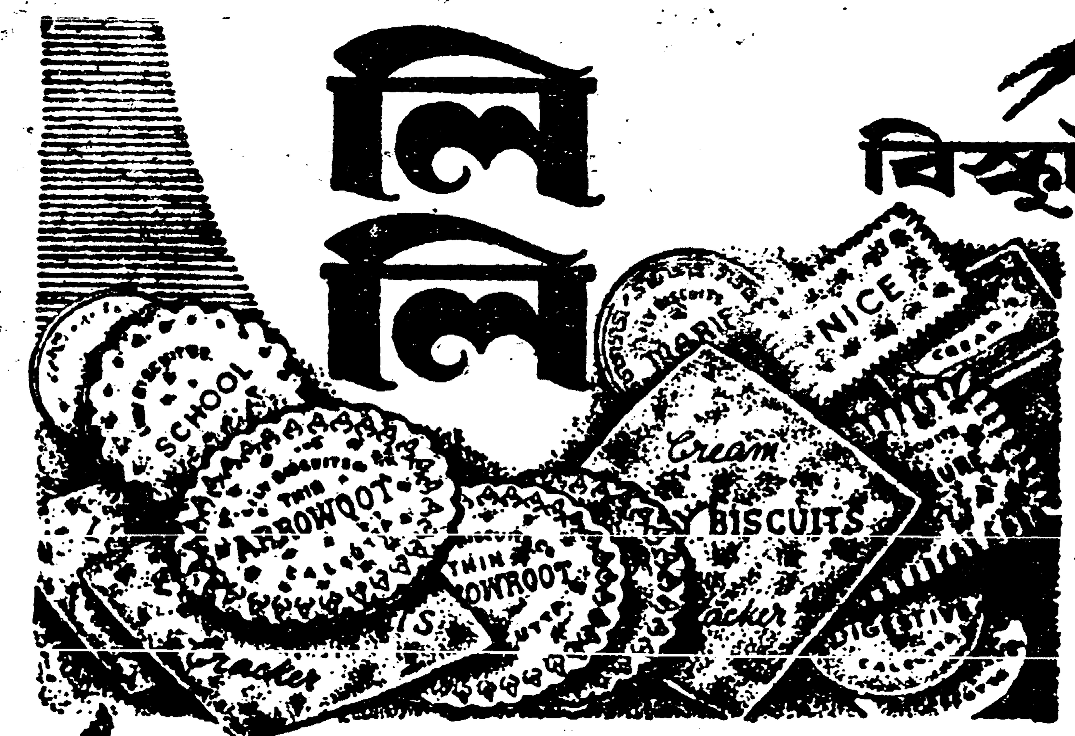

কয়েকটী মনোরম ও স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

রজত জয়ন্তী বর্ষ

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই

[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাল এডুকেশন বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত]

১।	মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু	...	৪৸৹
*২।	গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১৷৹
*৩।	মাঞ্চুসেনের অ্যাড্ভেঞ্চার— „	...	৸৹
*৪।	ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস	...	১৷৹
*৫।	„ আইনষ্টাইন— „	...	১৷৹
৬।	„ মার্কনি— „	...	১৷৹

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

চয়নিকা

মাসিক পত্রিকা

নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

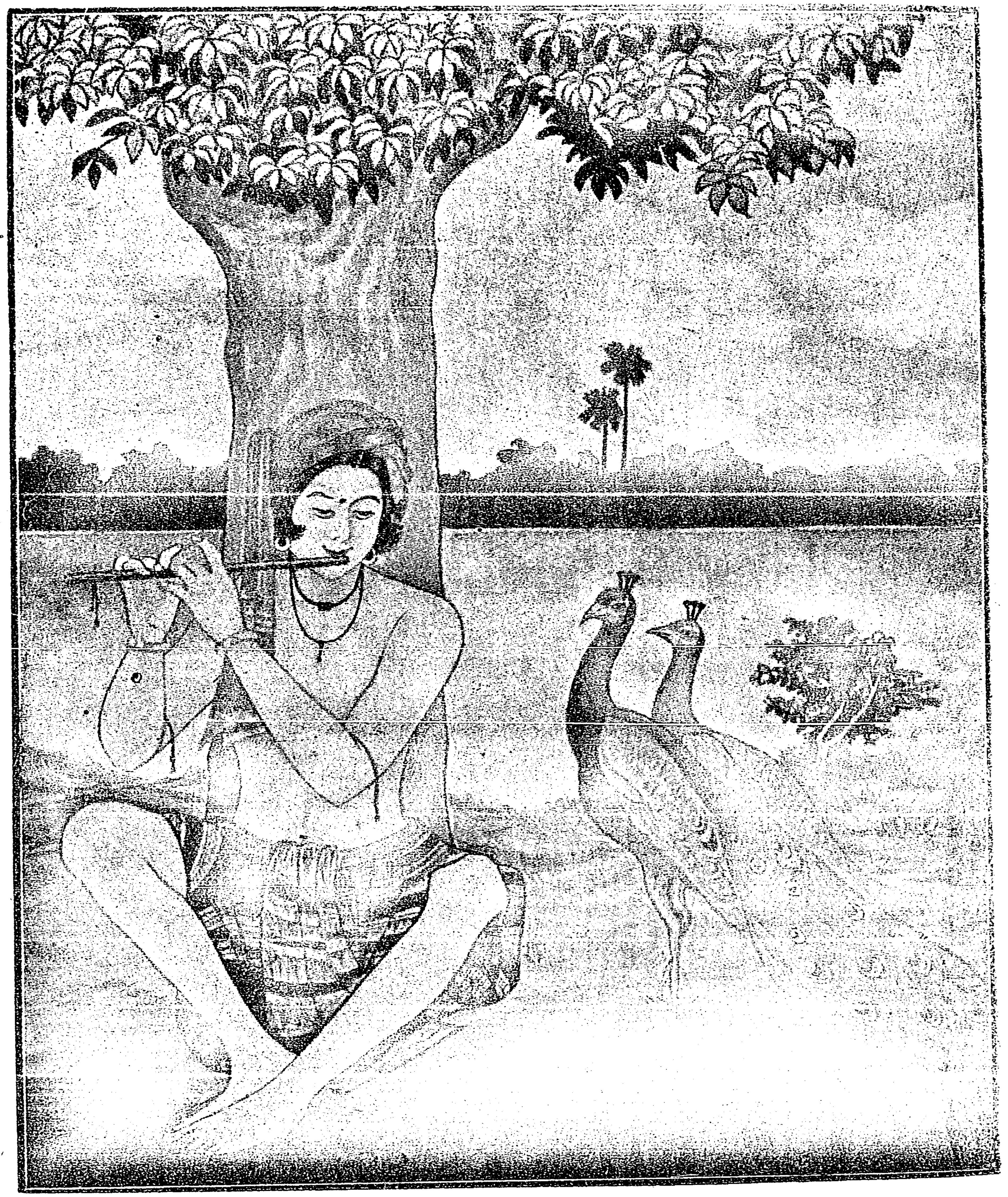

বাঁশীর সুর

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৫৯ {১১শ সংখ্যা।

পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সসাগরা দ্বীপময়ী হে ভারত, বহু জনমের পুণ্যফলে,
তোমার অঙ্কে লভিয়াছি ঠাঁই, পুষ্ট প্রসাদী অন্ন জলে।
আকাশ বাতাস শুচি নির্ম্মল, পূত পবিত্র পথের ধূলি,
প্রতি দিন আমি অঙ্গে বুলাই, সম্ভ্রমে লই মাথায় তুলি।
দিব্য কান্তিমতী ধরিত্রী, নমো নমো নমো, জননি, নমঃ ;
সদা সঙ্কোচে চরণ ফেলি মা, পাদস্পর্শ আমার ক্ষম।

কোথাও তোমার হোমের কুণ্ড, কোথাও চক্রতীর্থ তব,
কোথাও সতীর পুণ্য পীঠ মা, কোথা পা ফেলবো, কোথায় যাবো ?

লুপ্ত সুপ্ত মন্দির কোথা, সাধুর সমাধি, বীরের চিতা,
নদ নদী সব পুণ্য সলিল—গাহন করিল শ্রীরাম, সীতা।
গোটা এই দেশ মহামন্দির—সুবৃহৎ মণিকোঠার সম,
অতি সঙ্কোচে চরণ ফেলি মা, পাদস্পর্শ আমার ক্ষম।

দেবতা-গড়া এ মৃত্তিকা তোর, পূজা-করা জল পুষ্প পাতা,
সব ঠাঁই তোর দেব-অঙ্গন, গড়াগড়ি দিই, লুটাই মাথা।
শত রাজসূয়, অশ্বমেধ আর বিশ্বজিতের যজ্ঞভূমি,
ধর্ম্মক্ষেত্র সিদ্ধিক্ষেত্র সর্ব্বতীর্থময়ী মা তুমি।
নিত্যলীলার পাদপীঠ তুমি—যোগের ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতম,
সদা সঙ্কোচে চরণ ফেলি মা, পাদস্পর্শ আমার ক্ষম।

মহাকালের পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—পনেরো—

চাণক্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে পথে নেমেছিলেন। সারারাত তিনি ঘুমুতে পারেন নি। শৈশবের একটি ঘটনা বার বার তাঁর মনে উদয় হচ্ছিল।

চাণক্য যখন জন্মেছিলেন তখন তাঁর দাঁত ছিল। শিশুর দাঁত ওঠে ছ'মাস বয়সে কিন্তু চাণক্যের দাঁত ছিল জন্ম থেকেই। গ্রামের মহিলারা বিস্মিত হয়েছিলেন। এমন তো দেখা যায় না! এর কারণ কি?

পিতা চণী পণ্ডিত ছিলেন বড় পণ্ডিত। তিনি দৈবজ্ঞ ডাকলেন,—এই অপূর্ব্ব শিশুর ভবিষ্যৎ কি গণনা করে বলুন।

দৈবজ্ঞেরা জন্মসময়, রাশিচক্র ও লগ্ন ধরে গণনা করে বললেন,—এই ছেলে একদিন রাজা হবে।

প্রায় দু'শ' বছর আগে বুদ্ধদেব ও মহাবীর দেহরক্ষা করেছেন। তাঁদের নীতিকথা তখনও উত্তরাপথের চিন্তারাজ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। চিন্তাশীল দার্শনিকেরা বৌদ্ধ ও জৈন নীতিকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখছেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে এদের সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করছেন। আর একদিকে ছোট বড় বহু রাজ্য উত্তরাপথকে শত-স্বার্থে শতধা বিচ্ছিন্ন করেছে। যুদ্ধ ও সংঘাতের বিরাম নেই। ছোট রাজ্য বড় রাজ্যকে গ্রাস করার জন্য সদাই উগ্র। এই হিংসা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব চিন্তানায়কদের ভালো লাগে না। স্বার্থ ও সম্পদের চেয়ে ত্যাগ ও সত্য তাঁদের কাছে বড়, বহুকে শোষণ করে বিত্ত সঞ্চার করার চেয়ে বহুর কল্যাণে দারিদ্র্য বরণ করা তাঁদের কাছে শ্রেয়ঃ। পণ্ডিত চণীও ছিলেন সাধারণের কল্যাণকামী চিন্তানায়ক। দৈবজ্ঞদের কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন।—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশ, পুরুষানুক্রমে যাঁরা ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনা করে এসেছেন, সেই বংশের ছেলে রাজা হবে!—ভগবদ্‌চিন্তা ভুলে যাবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করবে! বহু লোকের রক্তপাত ও প্রাণহানির কারণ হবে! তাতে পিতৃকুল পরলোকে তো শান্তি পাবে না!

দৈবজ্ঞ বললেন,—পরাশর জটা নিয়ে জন্মেছিলেন, তখনই বোঝা গিয়েছিল যে তিনি সন্ন্যাসী হবেন, জটাই ছিল তাঁর মহর্ষির লক্ষণ। এই শিশু তেমনি দাঁত নিয়ে জন্মেছে। এ মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ হবে, এই দাঁতই হ'ল তার লক্ষণ।—কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডল দেখে যেমন বোঝা গিয়েছিল যে সে মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধা।

চণী বললেন,—দাঁতগুলি যদি এখনই ভেঙে দিই?

—তাতে ফলের কিছুটা তারতম্য হতে পারে। শিশু নিজে রাজা না হয়ে অন্য লোককে সিংহাসনে বসিয়ে পরোক্ষে রাজ্য শাসন করবে।

চণী বললেন,—এই সম্ভাবনা একেবারে রোধ করা যায় না?

দৈবজ্ঞ বললেন,—না, মৃত্যু ছাড়া এর প্রতিরোধ হয় না। জন্ম থেকেই দৈবশক্তি মানুষের ভাগ্য পরিচালিত করছে। আপনি ঐহিকশক্তি অর্থাৎ পুরুষকার দিয়ে তাকে কিছুটা লঘু করতে পারেন মাত্র, কিন্তু একেবারে প্রতিরোধ করবেন কেমন করে?

—কিন্তু রাজ্যশাসনের কর্ণধার হলে বহু যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাতের কারণ হবে, সেই পাপে এবং নিহত ব্যক্তির শোকার্ত আত্মীয়দের অভিসম্পাতে পিতৃপুরুষেরা নরকস্থ হবে ; শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে সে অশেষ দোষ !

—আবার ভালো রাজাও তো হয়, যার শাসনে প্রজাপুঞ্জ শান্তিতে, নিরুপদ্রবে বাস করে ও রাষ্ট্রের কর্ণধারকে আশীর্বাদ করে ? তা'তে পুণ্যসঞ্চয় হয়।

কিন্তু শিশু ভবিষ্যতে কি অবস্থার মধ্যে কেমন মানুষ হবে তা এখন থেকে কৃতনিশ্চয় হয়ে কি করে বলা যায় ? চণী চিন্তায় পড়লেন। দৈবজ্ঞেরা তো বিদায় নিলেন। চণী অনেক ভাবলেন, শেষে ঠিক করলেন পুত্রের দাঁতগুলি ভেঙে দেওয়াই ভালো, যতটা সম্ভব দোষণীয় ভবিষ্যৎকে দূর করা যায়। রাজা হবার সম্ভাবনা যতটুকু কমে ততটুকু লাভ। পুত্রকে তো আর একেবারে প্রাণে মারা যায় না ! তারপর শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজে তার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার ভার নেবেন, পুত্রের মনকে এমন ভাবে তৈরী করবেন যেন ভবিষ্যতে পণ্ডিতের ছেলে পণ্ডিতই হয়।

সে আজ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। মায়ের মুখ থেকে চাণক্য শৈশবের এই ঘটনা শুনেছিলেন। পিতা স্বহস্তে সদ্যজাত শিশুর দাঁত দু'টি ভেঙে দিয়েছিলেন। অত্যধিক রক্তপাতের ফলে পাঁচ-ছ' দিন শিশু নির্জীবের মত পড়ে ছিল। জীবনের আশা ছিল না, বৈদ্যের চিকিৎসায় তবে শিশুর দেহে আবার চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাকে সকল সংসর্গ থেকে আড়াল করে রাখেন। পিতার কাছে সর্বশাস্ত্র পাঠ শেষ করে, বিবাহ করে চাণক্য সংসারী হয়েছেন। পিতা আজ আর বেঁচে নেই, মাও গত হয়েছেন। কিন্তু পিতার শিক্ষা অন্তরে গাঁথা আছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সংসার, আজন্ম দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। দারিদ্র্যকে তাই কোনদিন বড় করে চোখে পড়ে নি, বিত্তকেও তাই সম্মান দিতে শেখেন নি। রাজা হবার কথা, রাজ্যশাসনের কথা মনের কোণেও কোনদিন ঠাঁই পায় নি। কিন্তু আজ নূতন করে সেই কথা মনে জাগলো। পণ্ডিত পিতা জীবনে একটি ভুল করে গিয়েছিলেন, পত্নীর কথা শুনে একমাত্র পুত্রের বধূ এনেছিলেন ধনীর ঘর থেকে। মায়ের মনে প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত দেখে চিরদারিদ্র্যের প্রতি তাঁর একটা ক্ষোভ ছিল, মাঝে মাঝে অভাব যখন নির্মম হয়ে উঠতো তখন তিনি পুত্রকে বলতেন,—শাস্ত্র ও দর্শন চর্চা করে যখন ইহকালেই কোন সমৃদ্ধি পাওয়া যায় না, তখন পরকালে যে পাওয়া যাবে এ কথা কি করে বিশ্বাস করি ?

দীর্ঘদিন পরে আজ চাণক্যের মনেও সেই দ্বন্দ্ব দেখা দিল। শাস্ত্রচর্চা যদি পরকালের কল্যাণ করে তাহলে ইহকালেই বা মূল্যহীন হবে কেন ? প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে যদি তার কোন মূল্য না থাকে তাহলে অ-দৃষ্ট ভবিষ্যতে তাকে তো মূল্যবান্ মনে করা যায় না ! তাঁর শ্বশুর ও তাঁর শ্যালক বড় পণ্ডিত ন'ন, শ্যালীপতিরাও কার্য্যকরী বিদ্যাটুকুর বেশী আর কিছুই জানে না ; তবু বিত্তসম্পদে তারা সমাজে আজ এত বড় যে পণ্ডিতকে, শাস্ত্রচর্চাকে অশ্রদ্ধা করতে তাদের বাধে না। পণ্ডিতেরা ব্যবহারিক ব্যাপারে অজ্ঞ হন বলে একটা প্রবাদ আছে, কিন্তু সত্যই কি শাস্ত্রবিদেরা সম্পদ্ অর্জন করতে পারেন না ? মূর্খেরা বিত্ত অর্জন করতে পারে আর পণ্ডিতেরা সম্পদ্ আহরণ করতে পারবে না,—তা' হয় না। পরীক্ষা করে একবার দেখতে হবে প্রবাদের মধ্যে কোন সত্য আছে কিনা। শাস্ত্রবিদেরা যদি অর্থশাস্ত্রেও জ্ঞানী না হয়, পণ্ডিত হয়েও যদি তিনি অ-পণ্ডিত শ্বশুর ও শ্যালকের চেয়ে বেশী বিত্তশালী হতে না পারেন, তাহলে তাঁর পাণ্ডিত্য বৃথা, তিনি আর ভিখারীর মুখ দেখাতে দেশে ফিরবেন না, এই তাঁর শেষ যাত্রা।

এত চিন্তা করে মনস্থির করে চাণক্য পথে নেমেছিলেন।

গান্ধার থেকে পঞ্চনদ, এবং পঞ্চনদ থেকে রাজগৃহ। রাজগৃহ থেকে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ হয়ে প্রশস্ত রাজপথ চলে গিয়েছিল রামেশ্বরমের মহা-মন্দির পর্য্যন্ত ! সেই পথে যেত তীর্থযাত্রী, চলতো সার্থবাহীরা, যুদ্ধের সময় ছুটতো সৈন্যদল। যাত্রী চলাচলে মানুষের প্রয়োজনে এই পথ পায়ে-পায়ে গড়ে উঠেছিল ; তারপর যে অংশের যিনি রাজা তিনি রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে এই পথকে করেছিলেন পাকা এবং প্রশস্ত। শত শত বছর পরে অধুনা এই পথকেই শেরশাহ্-পথ নাম দেবার কথা উঠেছে। মাত্র সামান্য ছ' বছরের যুদ্ধবিগ্রহ-উত্তেজিত রাজত্বকালের মধ্যে এত দীর্ঘ—এমন প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করার অর্থ ও অবসর কোথায় সেটাও চিন্তার বিষয়।

এই পথ ধরেই চাণক্য একদিন এসে পৌঁছলেন পাটলিপুত্রে। নন্দরাজারা তখন মগধে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুশাসনে প্রজাদের সমৃদ্ধি বেড়েছে, রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু শ্রমণদের রাজপ্রাসাদে অবারিত দ্বার, প্রার্থীর যাচঞা কখনও অপূর্ণ থাকে না। চাণক্য সে কথা শুনেছিলেন, সেই জন্যই তিনি বরাবর এসেছিলেন পাটলিপুত্রে।

(ক্রমশঃ)

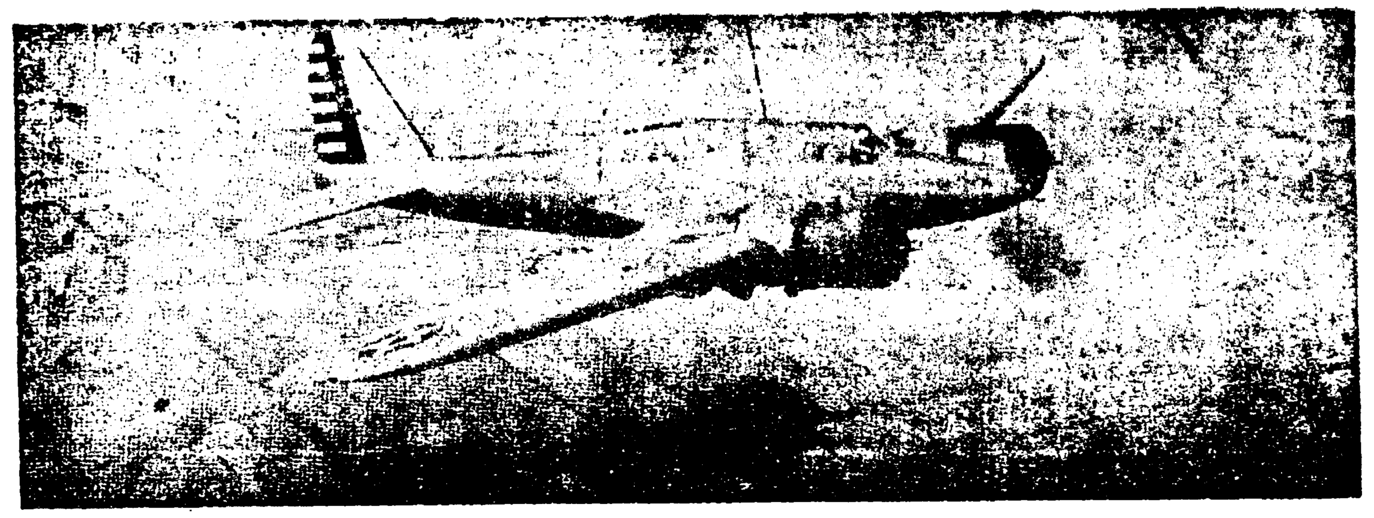

মৃত্যু যখন ঘুমিয়ে থাকে

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

কত বিচিত্র ভাবেই না মানুষের মৃত্যু ঘটে! কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনায় যখন জীবজগতে মৃত্যুর লীলা চলে তা যেমনি বিচিত্র এবং বিস্ময়কর, তেমনই আবার সে মৃত্যুকে আশ্চর্য্যজনক ভাবে ফাঁকি দেওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আমরা কাজ করে করে অনেক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি, বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করে বিশ্রাম নেই। মনে হয়, মৃত্যুও বুঝি বা কখনো কখনো পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই অবসরে ঘটে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা যার ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়—যা থাকে চিরদিন রহস্যাবৃত।

"এই সেফ্‌টি বেল্টটা বেঁধে নিন, মিঃ মেটা!"

"ধন্যবাদ। ওর দরকার হবে না আমার।"

"কিন্তু উড়ো-জাহাজে যাঁরা ভ্রমণ করেন তাঁদের প্রত্যেকেই এটা ব্যবহার করে থাকেন।"

"কোন চিন্তা করবেন না আপনি, উড়ো-জাহাজে চড়া আমার বেশ অভ্যেস আছে।"

এয়ার হোষ্টেস যেন একটু ক্ষুণ্ণ মনে চলে গেলেন। মিঃ মেটা তাকালেন একবার সহযাত্রীদের দিকে। তাঁদের প্রত্যেকেরই রয়েছে সেফ্‌টি বেল্ট বাঁধা।

যাত্রা সুরু হ'ল এবার। মিঃ মেটা জানালা দিয়ে অসীম শূন্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উপভোগ করতে লাগলেন প্রকৃতির বিরাটত্বের সৌন্দর্য্যরাশি। দেখতে দেখতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় কেটে গেল। হঠাৎ মিঃ মেটা লক্ষ্য করলেন,

বাইরের কোন কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ছে না। ব্যাপার কি পরীক্ষার জন্য তিনি তাকালেন একবার উড়ো-জাহাজের অন্য যাত্রীদের দিকে। না, তাঁর চোখের দৃষ্টি ঠিকই আছে। বাইরে জমেছে গভীর কুয়াসা—যার ঘন আস্তরণ ভেদ করে চোখের দৃষ্টি তো দূরের কথা, তীব্রতম বৈদ্যুতিক আলোও সামান্যতম দূরের দৃশ্য আলোকিত করতে পারছে না।

হঠাৎ একটা ভীষণ ধাক্কায় উড়ো-জাহাজখানা টাল সামলাতে পারল না। তারপর?—তার পর মিঃ মেটার আর কিছু মনে নেই।

চোখ খুলে দেখতে পেলেন মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছেন তিনি। সর্ব্ব-শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। অদূরে যাত্রীসহ জ্বলছে তাঁদেরই উড়ো-জাহাজখানা। আহতদের করুণ আর্ত্তনাদ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। উপলব্ধি করলেন মিঃ মেটা, সেফ্‌টি বেল্ট দিয়ে তিনি যদি নিজেকে বাঁধতেন উড়ো-জাহাজের সঙ্গে তবে তাঁর অবস্থাও অমনি হ'ত। বেল্ট বাঁধা না থাকায় ছিটকে পড়ে তিনি আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন।

মনে হচ্ছে গল্প। হ্যাঁ, গল্পই বটে, তবে সত্যি গল্প। ১৯৫১ সালের ২১শে নভেম্বর দমদম্ বিমানঘাঁটির অদূরে যে দুর্ঘটনা ঘটে তারই কাহিনী এটা। 'সেফ্‌টি' বেল্টই সেদিন যাত্রীদের 'আন-সেফ্‌টির' কারণ হয়েছিল। তোমাদের মধ্যে যারা রীতিমত খবরের কাগজ পড় তারা নিশ্চয়ই জান, যে, একমাত্র মিঃ মেটা ছাড়া উড়ো-জাহাজ এবং যাত্রীদের কেউই রক্ষা পান নি সে দুর্ঘটনায়। তবে আমরা এ ক্ষেত্রে বলতে পারি যে মিঃ মেটার মৃত্যুদূত সেদিন ঘুমিয়ে ছিল গভীর ঘুমে, সেই জন্যই সেদিন তিনি মৃত্যুর করাল রূপ উপলব্ধি করেন নি।

১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসের ঘটনা। দ্বিতীয় মহাসমর তখনও শেষ হয় নি। জার্ম্মানীর নানা স্থানে চলছে মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ। এমনি এক দিনে একখানা ব্রিটিশ বিমানের একজন সার্জেণ্টের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। বিমানখানা তখন আঠার হাজার ফুট ঊর্দ্ধাকাশে। হঠাৎ কলকব্জার গণ্ডগোলে আগুন ধরে যায় বিমানখানায়। মৃত্যু নিশ্চিত—জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে অন্যান্যদের সঙ্গে। সার্জ্জেণ্ট কোন রকমে লাফিয়ে পড়লেন তাঁর প্যারাসুট নিয়ে। কিন্তু ভাগ্য মন্দ, প্যারাসুট কাজ করল না।

তিন ঘণ্টা পরে চোখ খুললেন সেই বৃটিশ সার্জ্জেণ্ট। আশ্চর্য্য, তিনি বেঁচে আছেন, সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে। তাঁর নিজেরই তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। হাত-পা নেড়ে, ঘাড়া বাঁকিয়ে পরীক্ষা করলেন নিজেকে। না, কোথাও কোন ব্যথা নেই।

তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ—জীবিত। বোঝা গেল, তাঁর মৃত্যু সেদিন বিশ্রাম উপভোগ করছিল। জার্ম্মানদের হাতে বন্দী হ'য়ে লোকটি তাঁর অদ্ভুতভাবে জীবন রক্ষার গল্প বলেন। জার্ম্মানরা খোঁজ-খবর নিয়ে জানল যে ব্যাপারটা সত্যিকারের! আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এই ঃ প্যারাসুট কাজ না করলেও লোকটি এক ঢালু পাহাড়ের উপর পড়েন। বোধ হয় সেখানটায় নরম ঝোপঝাড় থাকাতে প্রথম পড়ার বেগটা তত হয় নি। তার পরই তিনি গড়িয়ে নীচে চলে আসেন – যেখানে ছিল অল্প জল। জলে পড়াতেই আঘাতটা গুরুতর হতে পারে নি।

এটম্ বোমার পরীক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা মনোনীত করলেন বিকিনী দ্বীপ। পরীক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হওয়ার দু'দিন পরে বৈজ্ঞানিকেরা গেলেন পরীক্ষাস্থলে। ঘাস, জঙ্গল পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, – বহুসংখ্যক বন্য পশুর জীবনলীলা সাঙ্গ হ'য়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, দু'টি ছাগলকে তাঁরা নিশ্চিন্ত আরামে ঘাস খেতে দেখলেন। সভ্য জগতের এত বড় একটা ব্যাপার যে ওখানে সংঘটিত হয়েছে তার বিন্দুমাত্র চিহ্নও ছাগল দু'টির শরীরে বা ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয় নি। এর কারণ বিজ্ঞানীরা আজও ভেবে উঠতে পারেন নি।

এবারে আমাদের দেশের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। বিহার প্রদেশের একটি আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় ভ্রমণ করছিল। হঠাৎ তার প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়। লজ্জায় স্ত্রীলোকটি কাউকে কিছু না বলে পাশের শৌচাগারে প্রবেশ করে। সেখানেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সত্যি সত্যিই ভূমিষ্ঠ। কারণ শিশুটি জন্মাবা মাত্র শৌচাগারের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে নীচে পড়ে যায়। ট্রেন তখন পুরো দমেই চলছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরে শিশুটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় রেল লাইনের মাঝখানে পাওয়া গিয়েছিল। কথায় বলে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

ফরাসী দেশের লিলি সহরের এক ঘটনা। একটি লোক একটা বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ তলাকার কার্নিশে কাজ করছিল। হঠাৎ সেখান থেকে পড়ে যায় লোকটি। সে যেখান থেকে পড়ে তার ঠিক নীচেই ছিল একখানা খোলা গাড়ী এবং গাড়ীতে শুয়ে ছিল একটি শিশু। শিশুটির মা, কেন জানি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই শিশুটির পরিত্যক্ত বিছানার উপর এসে পড়ল লোকটি। ফলে সে সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে বেঁচে গেল। নিতান্ত দৈবই বলতে হ'বে। নিশ্চয়ই সেদিন ঐ লোকটির এবং শিশুটির মৃত্যুদূত ঘুমিয়ে ছিল গভীর ঘুমে।

এই একই ভাবে দু'বছরের শিশু টমাসের মৃত্যুর পরোয়ানায় গভীর রকমের একটা ভুল ছিল সেদিন। পনেরো তলাকার একটা ফ্ল্যাটে বাস করত ওরা। একদিন কোনক্রমে জানালায় উঠে পড়ে টমাস। চারিদিক্‌কার দৃশ্য দেখতে দেখতে একেবারে মশগুল হ'য়ে যায় সে, ফলে পা পিছলে সঙ্গে সঙ্গে নীচে পড়ে যায়, কারণ জানালায় ওদের কোন গরাদ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ভাবে সে বেঁচে যায় একটা গাছের ছোট ছোট ডালপালার মধ্যে আটকে গিয়ে। অবশ্য তার পায়ে সামান্য আঘাত লেগেছিল।

এই তো সেদিনকার কথা। খিদিরপুর অঞ্চলের এক বাড়ীর তিনতলার ছাদের উপর থেকে একটি শিশু পড়ে যায়। তার মা ছুটে নীচে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বহাল তবিয়তে শুয়ে আছে শিশুটি ফুটপাথের উপর, অক্ষত দেহে।

আমেরিকার ফ্লোরিডা অঞ্চলের একটি নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি একদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ ভীষণ মেঘ করে ঝড় আরম্ভ হ'ল—আকাশ যুড়ে সুরু হ'ল বিদ্যুতের উৎসব ; কর্ণবিদারী শব্দ করে বজ্রপাত হতে লাগল। কাছাকাছি কোন বাড়ীঘরও ছিল না যে লোকটি সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অগত্যা খোলা জায়গায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল লোকটাকে। হঠাৎ তার একেবারে কাছে, মাত্র দেড় ফুট দূরে একটা বজ্রপাত হ'ল—যার ফলে মাটিতে একটা বড় আকারের গর্ত্তের সৃষ্টি হ'ল। লোকটার কিন্তু সামান্যতম ক্ষতিও হ'ল না।

ঠিক এই লোকটির মতই অন্য একটি লোকেরও মৃত্যুদূত সাময়িক ভাবে কর্ম্মোদ্যমহীন হয়ে ছিল একদিন। একটি ট্রাকটার যন্ত্র দিয়ে মাঠে চাষ করছিল লোকটি। ঘটনাক্রমে ট্রাকটারটি একদম উল্টে যায়, লোকটি চাপা পড়ে একেবারে ট্রাকটারের নীচে। কিন্তু মৃত্যু তার শীতল হস্ত দিয়ে লোকটিকে স্পর্শ ই করল না। আর একবার একটি ছোট শিশু উড়ো-জাহাজ থেকে পড়ে গিয়েছিল নীচে। এ ক্ষেত্রেও শিশুটী সম্পূর্ণ অক্ষত দেহেই রক্ষা পেয়েছিল।

কলকাতায় শিশু-উৎসব

শ্রীকৌটিল্য

গত মাসের রামধনুতে তোমরা শিশু রংমহলের উদ্যোগে কলকাতায় সর্ব্বভারতীয় শিশু-উৎসবের খবর পড়েছ। যারা এই উৎসব দেখেছ বা এতে অংশ

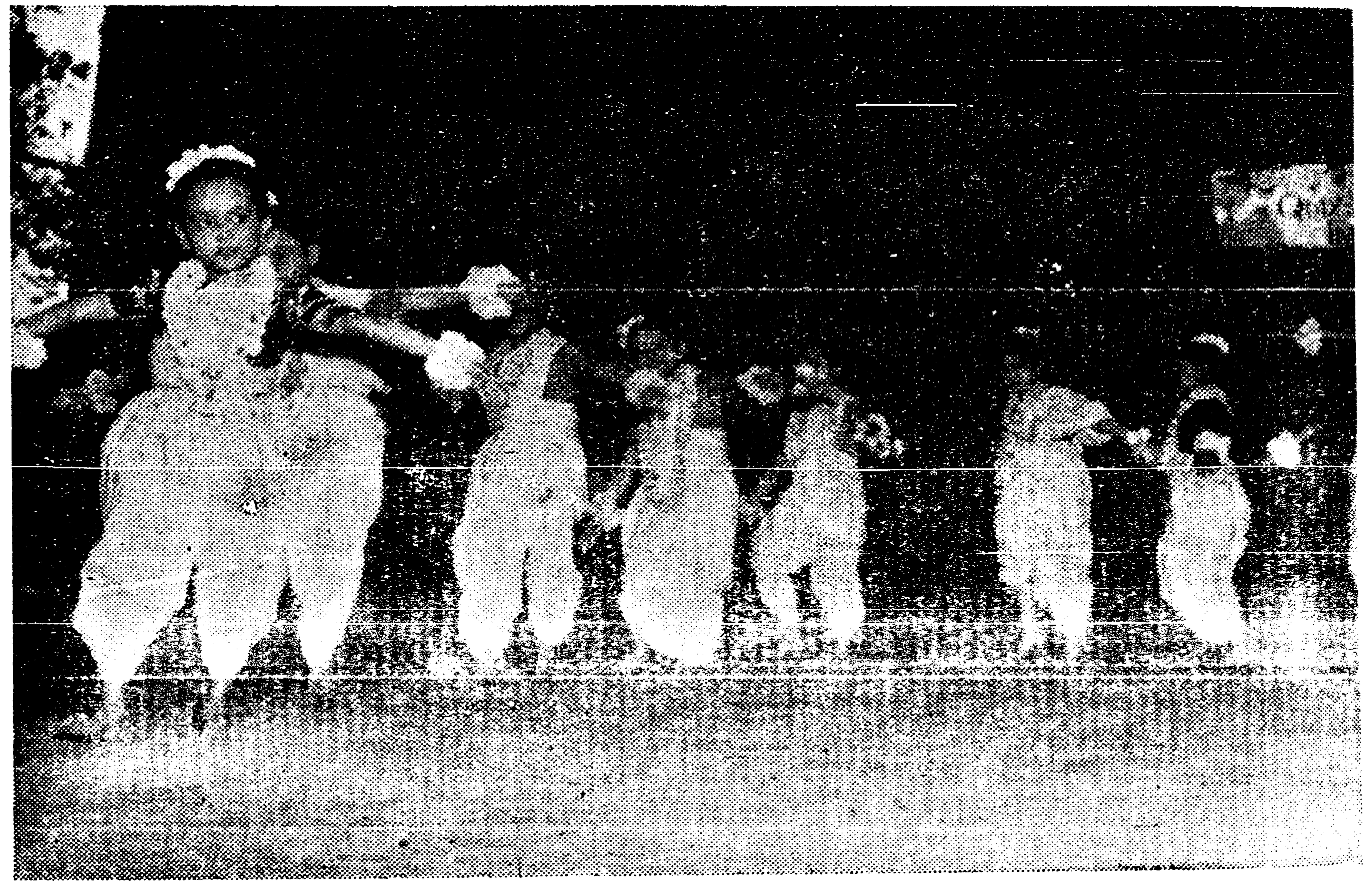

"ছোট্ট নদীর ঐ পাড়েতে ফলসা গাছে জলসা চলে—"

গ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছ তারা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্। যারা যেতে পার নি বা কলকাতা থেকে দূরে থাক তারাও এর কিছু কিছু বিবরণ খবরের কাগজে পড়ে থাকবে।

কলকাতা সহরের মাঝখানে চৌরঙ্গীর ওপর যাদুঘর বা মিউজিয়ামের বিরাট অট্টালিকা, তারই মাঝখানে বিরাট প্রাঙ্গণ। এইখানে তৈরী হয়েছিল ছোটদের

জন্য বিরাট এক রঙ্গমঞ্চ—৭৫ ফুট লম্বা আর ৪৫ ফুট চওড়া। এত বড় রঙ্গমঞ্চ বা ষ্টেজের কথা সচরাচর শোনা যায় না। ছোটদের উপযোগী আশ্চর্য্য রকম সব পটের ছবি দিয়ে এই রঙ্গমঞ্চ এমন করে সাজান হয়েছিল যা দেখলে রূপকথার রাজ্য বলেই মনে হয়। অথচ এত তা সুরুচিপূর্ণ! রঙ্গমঞ্চের সামনে বিরাট তে-রঙ্গা সামিয়ানার নীচে প্রায় তিন হাজার লোকের বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

পাখীর নাচ

প্রত্যহই দেখা যেত একটি আসনও খালি নেই—এবং প্রায় সমস্ত দেশের এবং প্রায় সব বয়সের দর্শকই এসে সেখানে জুটেছেন। অবশ্য যাঁদের আর্থিক অবস্থা ভাল তাঁরাই আসতে পেরেছেন। উৎসবের বিরাট ব্যয়ের কথা চিন্তা করেই হয়তো প্রবেশ-মূল্য সর্ব্বসাধারণের সহজলভ্য করা যায় নি। করতে পারলে অবশ্য খুবই ভাল হ'ত।

পাঁচদিন ধরে উৎসব। সমস্ত আয়োজন শেষ হয়েছে। উদ্যোক্তারা দিবারাত্র পরিশ্রম করে, ছোটদের মনের মত করে সব কিছু সাজিয়েছেন। উৎসব প্রাঙ্গণটিকে হঠাৎ দেখলে স্বপ্নরাজ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু হঠাৎ সকাল বেলা

সুরু হ'ল এক অভাবিত কাণ্ড। সারারাত ধরে কলকাতার আকাশে যে মেঘ জমে উঠছিল সকাল থেকে তাই নেমে এল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি রূপে। ক্রমে তার বেগ বাড়তে লাগল—গুঁড়ি গুঁড়ি থেকে সুরু হ'ল বড় বড় ফোঁটা—তার পর তা নামল মুষল ধারে। শীতের দিনে এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার যে ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করেন নি এবং তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না কেউই। ফলে দেখতে

কুমাওন নৃত্যের একটি দৃশ্য

দেখতে দর্শকদের আসন জলে থই থই করতে লাগল, ওপরের সামিয়ানা ঝড়ের বেগে ছিঁড়ে, গলে সে এক বিশ্রী কাণ্ড! পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উৎসব উদ্বোধন করতে এসে ব্যাপার দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, তার পর সমবেদনা জানিয়ে উৎসব পিছিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়ে বিদায় নিলেন। শেষে তাই ঠিক হ'ল। প্রথম দিনের উৎসব বন্ধ রেখে শেষের দিকে আর একদিন বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হ'ল।

পর দিনও সকাল পর্য্যন্ত আকাশের অবস্থা একেবারে অনিশ্চিত। কিন্তু

এত লোকের দীর্ঘশ্বাস—এ কি বিফল হতে পারে? সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাসেই হয়তো বিকেলের দিকে উড়ে গেল মেঘ। আকাশে ফুটল হাসি। যথা সময়ে উৎসব আরম্ভ হ'ল – বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে। সেদিন ২৩শে জানুয়ারী—নেতাজীর জন্মদিন।

নেতাজীর সঙ্গীত দিয়েই সুরু হ'ল উৎসব। অভিনয় করছে সব ছোট্ট ছোট্ট

'চড়ুইভাতি' গীতিনাট্যের একটি দৃশ্য

ছেলেমেয়েরা, আর তাদের পেছনে উঁচু মঞ্চে বসেছেন নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতকারীর দল। তার পর একে একে আরম্ভ হ'ল আর আর অনুষ্ঠান। হিন্দীভাষী ছেলেমেয়েরা করল 'ভরত মিলাপ', 'অভিমন্যু বধ', '৯টি বোকা জেলে' ইত্যাদি। আর বাংলায় হ'ল 'ঝগড়াটে পড়ুয়া' – পিন্টু-টুটুল, নামতা দাদা আর শুভঙ্করীর গল্প—যা তোমরা রামধনুতে পড়েছ; আর সেই সঙ্গে হাসিখুসির মেলা। এর মধ্যে কয়েকটি নাচ—বিশেষ করে পাখীর নাচ আর মাছরাঙার মাছ ধরার গান—"একটুকু জল নেড় না—জল নেড় না" মনে রাখবার মত। সেদিন এই পর্য্যন্ত।

২য় দিনের কার্য্যসূচী ছিল আন্তর্জ্জাতিক। চীন দেশের ছেলেমেয়েরা তাদের সূর্য্যোদয়ের আর ফসল কাটার নাচ দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। তার পর এল প্রবাসী আমেরিকান, চেক্, রুশ, ক্যানাডিয়ান্, ফরাসী আর ইংরেজ ছেলেমেয়ের দল। আর এল নেপালী ও দক্ষিণ ভারতীয় ছেলেমেয়েরা। সকলেই নিজের নিজের দেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক রূপ পরিবেশন করল।

৩য় দিন কলকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের মেয়েরা অভিনয় করল কবি সুনির্মল

নেপালী ছেলেমেয়েদের একটি অনুষ্ঠান

বসুর 'আনন্দনাড়ু', হিন্দীভাষী ছেলেমেয়েরা করল 'পুতুলের দোকান', আর বাংলায় হ'ল অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল', সুখলতা রাওএর সাতরঙা 'রামধনু' আর সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'। ক্ষীরের পুতুলের বাঁদর আর আবোল তাবোলের কুমড়োপটাশের কথা বহুদিন মনে থাকবে। 'রোদে রাঙা ইটের পাঁজায়'-বসা রাজার আর বারে বারে-আসা "হি-হি হি পাচ্ছে হাসি—নিম গাছেতে হচ্ছে সিম" নাচ তেমনি উপভোগ্য।

৪র্থ দিন হ'ল রবীন্দ্রনাথের গান, শ্রীঅখিল নিয়োগীর 'স্বপনবুড়ো' আর শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়ের গীতিনাট্য 'চড়ুইভাতি'।

তার পর সব শেষের দিন। প্রথমেই দেখলাম এক শোভাযাত্রা। পোষাক-শোভাযাত্রা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়েরা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের বিশিষ্ট পোষাক পরে এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করল। তার পর একে একে নানা দেশের লোকনৃত্য।—মণিপুরী নৃত্য (মণিপুর), কোলট্টম্ নৃত্য) মালাবার), দমফু নৃত্য (দার্জিলীং), কুম্মী নৃত্য (দক্ষিণ ভারত), কুমাওন নৃত্য (কুমাওন উপত্যকা), তেলেগু নৃত্য (অন্ধ্র), কুকরী নৃত্য (নেপাল), রাজস্থানী নৃত্য (রাজস্থান), মারুণী নৃত্য (নেপাল—দার্জিলিং), গুজরাটি গরবা নৃত্য (সৌরাষ্ট্র), নাগা নৃত্য (আসাম), ময়ূর নৃত্য (আসাম), ঝানরে নৃত্য (ভুটান)। এ ছাড়া ছিল উড়িষ্যার, বাংলার, উত্তর প্রদেশের আর পাঞ্জাবের গ্রাম্য নৃত্য। শেষেরটি অপূর্ব্ব।

তারপর ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে উৎসব শেষ হ'ল।

প্রায় ৩০০ ভারতীয় শিশু আর ১৫০ বিদেশী শিশু এই সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। ২০টি স্কুল ও শিশুপ্রতিষ্ঠান এতে যোগদান করে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় শিল্পী ফণিভূষণ, সুরকার প্রিয়লাল চৌধুরী আর সাধারণ সম্পাদক শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়ের। এ ছাড়া নেপথ্যে আরও যে সব কর্ম্মী অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সঙ্গে অমানুষিক পরিশ্রম করে উৎসবটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাও ধন্যবাদের পাত্র। আর উৎসব-কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত এন্. এন. ভোস তাঁর পরিণত বয়সেও যে কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের বিস্মিত করেছে।

এই উৎসব উপলক্ষে ২৬শে জানুয়ারী শিশুসাহিত্যিক, অভিভাবক ও শিক্ষকদের একটি আলোচনা-বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল শিশুসাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে। পরিষদ্-সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাতে সভাপতিত্ব করেন। একটি স্মরণিকা-গ্রন্থও (বাংলা ও ইংরেজীতে) প্রকাশ করা হয়। এর সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন রামধনু-সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুনির্ম্মল বসু, শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), শ্রীযুক্তা তারা সরকার (বেতারের আন্টি তারা) ও শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়।

তোমরা শুনে সুখী হবে, শিশু রংমহল,—যাঁদের প্রচেষ্টায় এই এত বড় ব্যাপারটা সম্ভব হ'ল,—তাঁরা শুধু এইখানেই কাজ শেষ করছেন না। শিশুদের

জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে গেলে তাদের শিক্ষায় আনন্দ-রসের প্রয়োজন খুব বেশী। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁরা এ বিষয়ে একমত, তাই পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলিতে ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, গান, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি শিশুশিক্ষার অন্যতম বাহন হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। শিশু রংমহল এ দেশেও তা প্রচারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ছোটদের উপযোগী নাটিকা, ছড়া, কবিতা, গান লিখিয়ে, প্রকাশ করে, তাতে ছোটদের উপযোগী সুর দিয়ে, স্বরলিপি দিয়ে, অভিনয়-কৌশলের শিক্ষা দিয়ে ছোটদের রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করাবার আয়োজন করছেন তাঁরা। অনেক প্রগতিশীল স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। শীঘ্রই এঁরা দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর কলকাতায় 'রবি-রঙ্গ', 'অবন-মহল' ও 'আবোল তাবোল' নামে তিনটি স্থায়ী শিশু-রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলবার পরিকল্পনাও করেছেন। তা যখন হবে তখন কি মজাটাই না হবে!

বক-ধার্মিক

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ

৪

সেখানকার সে দারুণ শীতের কথা আর কি বল্‌ব! একেবারে হাড়ের ভিতর ঢুকে যেত। রাত্রে শু'তে যাওয়াই এক ব্যাপার। ঠাণ্ডার চোটে বালিশ বিছানাকে মনে হ'ত ভিজে সপ্‌সপে। একটা গরম জলের ব্যাগ দিয়ে বিছানা গরম ক'রে নিয়ে তবে না শোয়া যেত! আর সকালে ওঠা? সে আরও কষ্ট। গরম জামা এঁটে, গরম মোজা পায়ে দিয়ে উঠতে হ'ত।

সন্ধ্যে সাতটা না হ'তেই যেন দুপুর রাত। পথেঘাটে জনমানুষ নেই। জনমানুষ নেই বটে, কিন্তু তবুও সকলের মনেই ভয়! আমাদের বাড়িতে আবার ইলেকট্রিক্ লাইট ছিল না। আমরা, ছেলেপুলেরা, এক ঘরে শু'তাম, আর পাশের ঘরে জ্যেঠিমারা শুতেন। মাঝখানে দরজা খোলা থাকৃত আর টিমটিম ক'রে একটা লণ্ঠন জল্‌ত।

মাঝে মাঝে ভালো ঘুম হ'ত না। জল তেষ্টা পেত। কিন্তু উঠ্‌তে যত না শীত করত তা'র চেয়েও বেশী ভয় করত। আলোর শিখাটা আবার একটু একটু নড়ত, আর দেয়ালে মস্ত মস্ত ছায়াগুলো আরও বেশী নড়ত, আমার ত' হাত-পা সব আড়ষ্ট হ'য়ে যেত। গুপেদের কাছে কিছু বলার জো ছিল না। তাই নিয়ে পরদিন বাড়িয়ে বাড়িয়ে সাত কথা বল্‌বে। লাবণ্যদি' লতিকাদি'দের সব টেনে আন্‌বে।

একদিন অনেক রাতে ঘুম ভাঙ্‌তেই দেখি ঘর ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। আমার ত' গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। কান খাড়া ক'রে থাকৃলাম। গলা শুকিয়ে তক্তা, জ্যেঠিমাকে ডাকব কি ক'রে? মনে হ'ল কা'রা যেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলছে; কা'রা যেন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল খস্ ক'রে সরে গেল; কা'রা যেন পা টিপে টিপে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। আরেকটু হ'লে মরেই গিয়েছিলাম আর কি, এমন সময় ওদিকের দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে জ্যাঠামশাই এসে ও ঘরে ঢুক্‌লেন। জ্যেঠিমা বল্‌লেন—"ধরলে নাকি?" জ্যাঠামশাই বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "এ কি ক্রিকেট বল যে ধরব? না না, মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। ভজহরি এসেছিল। আমাদের আপিসের পিণ্টো সাহেবের বাড়ীতে সার্চ হয়েছে। এদানিং যা' যা' চুরি গেছে সে সব কিছু পাওয়া যায় নি, কিন্তু আমাদের আপিসে গত কুড়ি বছরের মধ্যে যা' কিছু হারিয়েছে সব নাকি পাওয়া গেছে।"

"তা' ভজহরি তোমার কাছে এল কেন?"

"না. ইয়ে—কি বলে, পিণ্টো সাহেবের মেম একটু রাগী প্রকৃতির কিনা, তাই সার্চ করতে যা'রা গেছিল তাদের সব আইডিন লাগাতে হচ্ছে। ভজহরিরা ত' এলোপ্যাথিক লাগাবে না, তাই আমার কাছে এসেছিল আর্নিকা নিতে।"

জ্যেঠিমা নাক অবধি লেপ টেনে বল্‌লেন—"সখও আছে! এই শীতের মধ্যে আর্নিকার খোঁজে এসেছে!" জ্যাঠামশাই আরও বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন—"তোমার বাপের বাড়িতে কেউ হোমিওপ্যাথিকের মর্মই বোঝে না, তাই ওরকম বলছ"

এই রকম আরও কি সব কথাবার্ত্তা শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ছুটি। লাবণ্যদি' আর লতিকাদি' আমাদের দলের সাত জন খুব সাহসী মেয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বেড়াতে যাবেন, একেবারে সেই ভূতের বাড়ি পর্য্যন্ত।

সকাল থেকে সবার মুখে পিণ্টো সাহেবের পেজোমির গল্প ছাড়া কথা নেই। গুপের ত' সবটাতেই কিছু বলা চাই; এ ঘরে এসে বল্‌ল, "আরে শুধু পিণ্টো কেন, অনেক ওস্তাদের বাড়ী সার্চ করলে অনেক কিছুই পাওয়া যাবে।" বলে এমন বিশ্রী ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌ল যে আমার আর বুঝতে বাকী রইল না যে লাবণ্যদি'দের কথা বল্‌ছে। তবু কিছু না বলে মা'কে বলে শঙ্কর মালীর সঙ্গে লাবণ্যদি'র বাড়ি গেলাম। কি সুন্দর বাড়ি লাবণ্যদি'র, আর কি চমৎকার ক'রে রেখেছেন! দরজা-জানলায় গোলাপী পর্দা, বাগানে ছোট ছোট টবে কত রংএর ফুল! সাম্‌নের দরজা খোলা, ভিতরে পিতলের বড় বড় দু'টো ফুলদানী চক্ চক্ করছে। আর লাবণ্যদি'ও কি সুন্দর যে দেখ্‌তে সে আর কি বলব! কেমন লম্বা, খুব ফর্সা না হলেও রংটা কেমন মোলায়েম,

আর এক মাথা কি চমৎকার চুল! নীল একটি সাড়ি পরেছেন, কোমরে আঁচলটা দিব্যি ক'রে জড়িয়েছেন। আমাকে দেখেই বল্‌লেন—"বাঃ, এসে পড়েছ, ভালই হ'ল। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া হ'বে বলে এসেছ ত' ?" শঙ্করটা অমনি সর্দারি ক'রে ব'লে উঠল, "দিদিমণি কিন্তু মোটে ঝাল খায় না দিদি! ঝাল খেলেই দিদিমণির পেট—" এমন রাগ হ'ল! ধমক দিয়ে বল্‌লাম,—"আচ্ছা আচ্ছা, তুই থাম্ ত'। তোর আর থাক্‌বার দরকার নেই। যা, বাড়ি যা।" কিন্তু শঙ্কর কিছুতেই যাবে না। মা নাকি সঙ্গে যেতে বলেছেন।

কি মুস্কিল। আমাদের সঙ্গে বাইরের লোক গেলে চল্‌বে কেন? আমি ত' একেবারে বোকাই বনে গেলাম। কিন্তু লাবণ্যদি'র কি বুদ্ধি! চট্ ক'রে বল্‌লেন—"তুমিও যাবে? তা' বেশ ত' শঙ্কর, আমাদের দশজনের খাবারের টিনগুলো আর জলের বোতলগুলো তা'হলে তুমিই ব'য়ে নিয়ে চল।" তাই শুনে শঙ্করের সব উৎসাহ উড়ে গেল; সে বল্‌ল—"না দিদি, আমার আবার পায়ে গুঁপো, অত আমি পারব নি। তা' ছাড়া তোমরাই যখন যাচ্ছ, আমার যাবার কোনও দরকার নেই। বাড়িতে মেলা কাজও জমে রয়েছে।"—বল্‌তে না বল্‌তে শঙ্কর রওনা দিল। লাবণ্যদি'ও খুসী হ'য়ে বললেন—"দেখলে ত', ধমক ধামকে কিছু হয় না, প্যাঁচ কষতে হয়।" সত্যি, লাবণ্যদির'ই প্রধান মন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল।

তারপর আর কি? সবাই খেলার মাঠ পার হ'য়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। প্রত্যেকেরই ঘাড়ে একটা থলেতে খাবার, জলের বোতল, আইডিন্ এই সব। লতিকাদি'ও আছেন। লাবণ্যদি'র মত সুন্দর না হ'লেও ভীষণ ষণ্ডা। শুনেছি, একবার নাকি একটা চোরকে ধরে ছাতা দিয়ে এমনি পিটিয়েছিলেন যে সে চুরি করতে ত' পারেই নি, উপরন্তু অন্য জায়গা থেকে আনা মেলা চোরাই মাল ফেলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। লতিকাদি' আজ আবার সেই গল্প বলে বল্‌লেন,—"ভাগ্যিস পালাল, নইলে সেদিন একটা এস্পার ওস্পার করে ছাড়তাম। মেয়েরা, তোমরাও ঐ রকম করবে। এখন নাও ত', প্রত্যেকে একটা করে শক্ত ডাল ভেঙ্গে নাও ত'; দেখি চোরদেরই একদিন কি আমাদেরই একদিন।"

আমরাও তাই না শুনে, আশে পাশের গাছ থেকে একটা করে ডাল ভেঙ্গে পাতাটাতা ছাড়িয়ে দিব্যি লগুড় বানিয়ে নিয়ে চল্‌লাম। ভাগ্যিস গুপেটা সঙ্গে ছিল না, নইলে কি না জানি বল্‌ত!

সেই হাড়গোড় ছড়ান জায়গাটাও দেখলাম। ওতে কিছু বাহাদুরী নেই, রাস্তার ধারেই সব ছড়ান রয়েছে। লাবণ্যদি'কে না বলে পারলাম না, 'জানেন, লাবণ্যদি, ছেলেদের স্কুলের অপূর্ব্বদা এই সব দেখে কি কাণ্ড লাগিয়েছেন, সে আর কি বল্‌ব!"

লাবণ্যদি' কপালে চোখ তুলে বললেন,—"অপূর্ব্বদা আবার কোন্ জন?"

"ঐ যে গুণ্ডার মত দেখতে, গুঁফো লোকটা।"

তাই শুনে লাবণ্যদি' মুখে রুমাল দিয়ে খুব খানিকটা হেসে নিলেন। আমরা সবাইও রুমাল না পেয়ে মুখে হাত দিয়েই খুব হাসলাম।

হঠাৎ লতিকাদি' ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বললেন—"শ্ শ্! সাবধান! এই পথে খানিক

আগে অনেক লোক গেছে। ঐ দেখ ঘাস মড়ান, এখনও শুয়ে শুয়ে রয়েছে, আবার খাড়া হয়ে উঠবার সময় পায় নি। ওরে বাবা, ওটা কি? সমস্ত জঙ্গল কাঁপিয়ে গ্ ম্ ম্ ম্ করে একটা আওয়াজ হ'ল। লাবণ্যদির'ও মুখটা সাদা হয়ে গেল, কিন্তু কি সাহস তাঁর, আমাদের বল্‌লেন, "মেয়েরা, তোমরা আমার পিছনে এসো; হয় বাঘ, নয় বন্দুক!" আমরাও লাইন বেঁধে এর কাঁধে ও হাতে রেখে খুব সাবধানে চল্‌লাম।

আবার গ্ ম্ ম্ ম্ করে আওয়াজ হ'ল। লতিকাদি' একলাফে লাইনের শেষ থেকে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।—"শুনেছি বাঘ সর্ব্বদা লাষ্ট ম্যান্‌কে ধরে। আমাকে নিলে তোমাদের রক্ষা করবে কে?" মেয়েরা তখুনি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় আমার চোখে পড়ল ঝোপের মধ্যে একটা রামছাগলের শিং আট্‌কে গেছে, কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না, সে-ই হ্ ম্ ম্ হ্ ম্ ম্ করে ডাক্‌ছে। মহামুস্কিল! ছাগলের কাছে কেউ যেতে চায় না। তখন লাবণ্যদি' নিজের থলে থেকে মস্ত একটা কলা বের করে ছাগলের কাছ থেকে একটু দূরে মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। তাই না দেখে ছাগল লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে শিং ছাড়িয়ে এক নিমেষেই কলা সাবাড়! সত্যি, কি অদ্ভুত বুদ্ধি লাবণ্যদি'র!

পথের মাঝখানে একটা পেন্টেলুনের বোতাম পড়ে। লতিকাদি' বললেন, "পুলিশরা পর্য্যন্ত এসেছিল, তাদের বোতাম।" লাবণ্যদি বললেন—"নাও, ওটাকে যত্ন করে তুলে রাখ ত'। ওটা একটু আগেই পড়েছে, দেখছ না পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে, একটু শিশির পর্য্যন্ত লেগে নেই!"

তাই ত'! যত্ন করে বোতামটা তুলে আমার থলেতে রাখলাম। (ক্রমশঃ)

যাঁদের লেখা তোমরা পড়

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৬

তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী। নির্ভয়ে বলতে পারি তাঁর গায়ের রঙ বেশ কালো, দেহগৌরবেও তিনি গরীয়ান্, মুখে চমৎকার কমনীয়তা—যার প্রকাশ রয়েচে তাঁর বড় বড় চোখ দু'টিতে। এমন দৈহিক সম্পদের অধিকারী যে সে স্বভাবতঃই একটু অলস হয়ে থাকে। কিন্তু গিরীন বাবুর মতো চঞ্চল ও কর্মী মানুষ খুব কম দেখা যায়। তাঁর মাথায় যেমন সর্বদাই ঘুরচে "পরিকল্পনার" চাকা তেমনি বপুসম্ভারও একদণ্ডও কোথাও স্থির থাকে না, অনবরত চলাফেরা করে। জানি না তিনি নিদ্রা যান কিনা। মানসিক সজীবতা তাঁর মুখে সর্বদাই একটু হাসির ভাব প্রস্ফুটিত করে রাখে আর দৈহিক শক্তির পরিমাপ দেখা যায় ভোজনে।

আহার্য প্রত্যাখ্যান করতে তাঁকে কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। বয়স বেশ কয়েক বছর ধরে একই শুনছি। কাজেই তার ঠিক সংবাদটুকু দিতে পারা গেল না।

লেখনী তাঁর সবলীল; ভাষা এমন সুমিষ্ট, লেখবার ভঙ্গিমা এমন চিত্তাকর্ষক যে তা পড়তে পড়তে মনে অনেক সময় হিংসার উদ্রেক হয়। মনে হয় যেন সুমিষ্ট ঝরণা-ধারা ঝির ঝির করে বয়ে চলেচে। তিনি গাল্পিক ন'ন, কাজেই তাঁর সৃষ্টি কিছু নেই। কিন্তু প্রবন্ধ ও চরিতকথাদি লিখেচেন নিতান্ত কম নয়। অনুবাদেও তাঁর লেখনী এমন সাবলীল যে মনে হয় মূল গ্রন্থই পাঠ করচি।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

পাঁচটি বছর চলে গেল, বাংলা দেশে, কিশোর-বয়স্কগণের জন্য একখানি দৈনিক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়ে মাত্র একটি বছর জীবিত ছিল। পত্রিকাখানির নাম "কিশোর"—এ সংবাদটুকু আজ আর পরিবেশনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অত অল্প সময়ে অতটা জনপ্রিয়তা বাংলা দেশের আর কোন সংবাদপত্র লাভ করেছে কিনা তা বিচারের ভার তোমাদেরই ওপর। পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে ততখানি সাড়াও আর কোন দৈনিক পত্রিকা জাগাতে পেরেচে কিনা তাও তোমরাই বলবে। কিন্তু গিরীন বাবুর সহযোগিতা যদি লাভ না করতাম তাহলে সে পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদন আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না, আমারও মাথায় কুম্ভকারের চক্রের মতো পরিকল্পনাই ঘুরতো।

নামের মিল যে কী বিভ্রাট ঘটায় তা পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেরই হয়তো ধারণা নেই। তার ছু'-একটির উল্লেখ যদি এখানে করি তো সত্যিকারের হাসির গল্প না হয়ে যায় না। আমার কথা বাদ দিয়ে গিরীন বাবুর একটি ঘটনাই বলি।

একদিন গঙ্গার ওপার থেকে, মানে হাওড়া থেকে, তিনজন যুবক এলেন তাঁদের ব্যায়ামাদির অনুষ্ঠানে আমাকে পৌরোহিত্যের অনুরোধ করতে। একে তো পুরোহিত শ্রেণীর নই, তার ওপর ব্যায়ামানুষ্ঠানের পৌরোহিত্যের কথায় ও যুবক তিনটির—বিশেষ করে ভারোত্তলন-বীরের দেহভার দেখে সতর্ক হয়ে গেলাম। কেবলই মনে হতে লাগলো যদি অনুষ্ঠানে মন্ত্রের একটু এদিক্ ওদিক্ হয় তাহলে হয়তো সশরীরে গৃহে ফিরে আসা সম্ভবই হবে না।

ভারোত্তলন-বীর হঠাৎ সহাস্যে বললেন, "শুনেচি গিরীন চক্রবর্তীর সঙ্গে আপনার খুব আলাপ। একখানা চিঠি দেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

বললাম, "বেশ, এখনই দিচ্চি।"

"তাঁকে দিয়ে কিন্তু আপনাকে সেদিন গান গাওয়াতে হবে।"

চম্‌কে উঠ্‌লাম। শরৎ বাবু কাবুলীওয়ালার মুখে গান শুনে চমকে উঠেছিলেন এবং তারা সত্যিই গান গাইছিল। কিন্তু গিরীন বাবুর কণ্ঠে গান তাঁর ঘরের মানুষটিও কোনদিন শুনেচেন এমন তো কল্পনাতেই আনতে পারি না। এটা কি আমাকে দিয়েও একটি ব্যায়াম করানোর কৌশল? পরক্ষণেই মনে পড়লো, এ নামের বিভ্রাট।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

কিছুদিন পরে এই ঘটনাটি গিরীন বাবুকে বলি। শুনে তিনি সারা দেহ দিয়ে এমন হেসে-ছিলেন এবং আর একটি মজার গল্প বলেছিলেন যে আমার মতো নীরস ও রুক্ষ-মেজাজ ব্যক্তিও না হেসে থাকতে পারে নি।

ব্যায়ামবীরের কথাই যখন উঠেচে তখন ধীরেন বাবুর, মানে শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের, কথাও এই সঙ্গে সেরে নিই। চলনে, বলনে, আকারে, ইঙ্গিতে ধীরেন বাবু পুরোদস্তুর পাঁচসেরা ডাম্বেল-ভাঁজা মানুষ এবং মুষ্টিযুদ্ধেও আগুয়ান হতে পিছপা ন'ন এমনি একটা ভাব। মাথার চুলগুলির ছাঁট কতকটা পালোয়ানী, গায়ের রং একটু মাজা মাজা, চোখে চশমা, মাথার চুলে একটু একটু পাক ধরেছে, কিন্তু এখনও কুমার। এঁরও বয়স কয়েক বছর একই জায়গাতেই লেগে আছে। তবে শুনেচি, উনপঞ্চাশীতে পৌঁছতে বছর দশেক বাকি।

কিন্তু রচনায় রয়েচে তাঁর হৃদয়ের সুকোমলতা, নিবিড় মধুরতা ও স্নিগ্ধতা। তিনি গাল্পিক, তাই ছোট-বড় অনেক গল্প সৃষ্টি করে পাঠক-পাঠিকাগণকে অনেক দিন থেকে আনন্দরসে পরিতৃপ্ত করে আসচেন। বাংলার শিশুসাহিত্যে যে সামান্য কয়েকজনের রচনায় একদা প্রগতির সকল লক্ষণ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, ধীরেন বাবুও তাঁদের মধ্যে একজন। তবে তিনি যেন এখন একটু পিছিয়ে পড়েচেন এবং গিরীন বাবুও স্তব্ধ।

শিশুসাহিত্যে নতুন কিছু দেবার, শিশুসাহিত্যিকগণ যাতে যথাযোগ্য সম্মান লাভ করেন সেজন্য একটা প্রচেষ্টা ধীরেন বাবুর মধ্যে সর্বদাই দেখা যায়। নিজের পুস্তকাদি নিজেই প্রকাশ করে থাকেন। সেজন্য কোন প্রকাশকেরই তোয়াক্কা রাখেন না, বরং উল্টোটাই দেখা যায়।

অনেক লেখককে লেখনী বিশ্রাম দিতে দেখেচি, যেটা দরকার। কিন্তু ধীরেন বাবু রোগে একেবারে শয্যাশায়ী না হলে যে কোন দিন অন্ততঃ খানিকটাও লেখেন নি, এমন ব্যাপার ঘটেচে বলে তো ধারণা হয় না। প্রায় প্রত্যহ সকালে তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময়ে দেখি, মাছুর বা সতরঞ্চিতে বসে সামনে দপ্তর খুলে লিখে চলেচেন চার-পাঁচ শ' পাতার বই। এক একদিন থমকে দাঁড়াই, ভয়ে ভয়ে দু'-একটি প্রশ্নও করি, কিন্তু জানলা দিয়ে বুলেটের মতো উত্তর ছুটে আসতে থাকায় পালাতে পথ পাই না। ভাগ্যে তাঁর কথাগুলি লেখনীমুখে মধুবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে কাগজে জমাট হয়ে থাকে। না হলে মা সরস্বতীকেই হয়তো তাঁর নিজ বাসস্থান ছেড়ে বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকতে হ'ত।

ধীরেন বাবু ফরাসী চন্দন নগরের আদিবাসী এবং বর্তমানে আধাবাসী। তবুও তাঁর চরিত্রে ফরাসীয়ানা কোন দিনই দেখা যায় নি। তবে কর্মস্থলে "ফরাসী ছুটি" গ্রহণ করার আগ্রহ আছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁকে কর্ম-পীড়নে হা-হুতাশ করতে অনেক দিনই শুনেচি। সেজন্য সহকর্মীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ সর্বদাই প্রকাশ পায় আর তারই সুস্পষ্ট ছাপ তাঁর একসময়কার রচনাকে সমবেদনার অশ্রুতে কোমল ও অশ্রুময় করে তাঁকে পাঠকের হৃদয়ে একটি বিশিষ্ট ঠাঁই করে দিয়েছিল।

এ পর্যন্ত বলে গেলাম কেবল গদ্য লেখকদের কথা। অবশ্য লেখক মাত্রেই শৈশবে হামের মতো পদ্যেও আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তবে কারো কারো তো স্থায়ী হয়, কেউ কেউ কিছুকাল পরে তা কাটিয়ে উঠে একেবারে খাঁটি গাদ্যিক হন এবং প্রয়োজন বা খেয়াল হলে মাঝে মাঝে পদ্যের বুকনিও ছাড়েন। এবার এমন একজনের কথা বলচি যিনি গদ্যে ও পদ্যে সমান, হাস্য ও গাম্ভীর্যের জমাট স্তূপ। ইনি হলেন, "বিশ্বকাকা" শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু। বয়স কত তা জানলেও বলবো না। চেহারাটি বেশ—হৃষ্টপুষ্ট, নধর; চাল-চলন ও পোষাক-পরিচ্ছদ এবং কথাবার্তা কর্তাব্যক্তির মতো। অনেক দিন থেকেই লিখচেন। এঁর লেখা কোথায় না দেখা যায়? পাহাড়ের তলায় যাও বা চূড়ায় ওঠো, দেখবে সেখানে পাথরের গায়ে আলকাতরা দিয়ে লেখা—"এসেছিল হেথা প্রভাতকিরণ" ইত্যাদি। গভীর জঙ্গলে

যাবার দুঃসাহস যদি হয়, দেখবে, সেখানে মোটা গাছের গুঁড়িতে ছুরি দিয়ে লেখা "প্রভাতকিরণ সোনার বরণ" ইত্যাদি। গাছও বেড়েছে, লেখাও বড় হয়েচে। আবার সাময়িক পত্রিকার পাতা ওল্টাও, চোখে পড়বে, "রামমণি মোক্তার" এবং তার পাদদেশে অথবা শীর্ষে প্রভাতকিরণ চিক্ চিক্ করচে। আলকাতরা, তূলি, ছুরি, কলম ইত্যাদি বহুদিন থেকেই এঁর পকেটে পকেটে ফিরে কখনও হেসেচে, কখনও গম্ভীর হয়ে মারাত্মক কথা খোদাই করেচে। লর্ড কার্জন ভারতের বহু প্রাচীন স্থান ও ধ্বংসাবশেষকে "প্রটেক্‌টেড্ প্লেস্" করে গেচেন। না হ'লে সে সব জায়গার ইট-পাথরের সঙ্গেও তাঁর কবিতার টুকরো ও নামটি উঠে যে প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের দুশ্চিন্তায় ফেলতো এতে আর সন্দেহের কিছু নেই। কারণ উনি ভারতের যান নি কোথায়?

প্রভাত বাবুর হাতের লেখা ঠিক ছাপার অক্ষরের মতো; তা দেখে রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনেকেই হয়তো জানে না যে প্রভাত বাবু এক সময়ে ছবিও আঁকতেন। নিজে চিত্রশিল্পী নই; ছেলেবেলায় দেওয়ালের গায়ে, অঙ্কের খাতায় বন্ধুবান্ধব ও যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েচি তারই প্রতিকৃতি এঁকে প্রচুর ফলভোগ করেচি মাত্র। কাজেই প্রভাত বাবুর ছবির সমালোচনা করতে পারলাম না।

আজকাল ছেলেমেয়েদের পত্রিকায় সম্পাদক মশাইরা পাঠক-পাঠিকাগণকে উদ্দেশ করে যে পত্র লেখেন তার প্রচলন করেন প্রভাত বাবু। সেই থেকে তিনি বিশ্বের "কাকাবাবু"।

প্রসঙ্গতঃ এই সংবাদটি যদি দিই তা হলে বোধ হয় অবান্তর হবে না, যে, এঁরা তিনজনেই শিশুসাহিত্য-পরিষদের সদস্য ও কর্মী। পরিষদের উন্নতি ও স্থায়িত্বে তিনজনেই সচেষ্ট।

প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে আটটায় রেডিও সেট খুললেই কানে আসে "তোমাদের ইন্দিরাদি কথা বলচি।" যার ঘরে রেডিও তার ঘরেই "ইন্দিরাদির" কণ্ঠ। এঁর ছবি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ; তাই দেখেই বয়স ও চেহারা আন্দাজের চেষ্টা করলে কৌতূহল মিটবে। শিশুসাহিত্যে এঁর দান কি রকম সে বিচারেরও ভার তোমাদের ওপর ছেড়ে দিলাম। তবে যার যা প্রাপ্য সেটুকুর মর্য্যাদা দিতে হবে বৈকি! এঁর বৈশিষ্ট্য শিশুদের আনন্দ দানে এবং সেটা হয়ে থাকে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। কাজেই তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। এঁরই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিনয় ও নৃত্যনৈপুণ্য দেখিয়ে কয়েকটি বালিকা বেশ খ্যাতিসম্পন্না হয়ে উঠেচে। মনে হয়

ইনি যদি সুযোগ না দিতেন তাহলে হয়তো তাদের খ্যাতি ও নৈপুণ্য অর্জনের পথ এতটা সুগম হ'ত না। শিশুদের উন্নতির জন্য এঁর চেষ্টার বিরাম নেই। তবে আমার মনে হয়, উচ্চ ও অবস্থাপন্ন শ্রেণীর সঙ্গেই সম্পর্কটা একটু বেশী থাকার ফলে প্রচেষ্টার ব্যাপকতা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। বর্তমানে এর একটা মূল্য থাকলেও দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক চিন্তাধারায় এর স্থান হবে কি?

একখানি চিঠি

গত সংখ্যার 'যাদের লেখা তোমরা পড়" লেখাটি পড়ে কবি শ্রীসুনির্মল বসু এই চিঠিখানি আমাদের পাঠিয়েছেন :

সম্পাদক মশাই,

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র গত সংখ্যার রামধনুতে লিখেছেন, আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম কবে পরিচয় ঘটেছিল সেটা তাঁর মনে নেই। আমার কিন্তু মনে আছে। প্রায় ৩০।৩২ বছর আগে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে গিরিডির এক খেলার মাঠে। তিনি তখন নবীন যুবক, কবিতা লেখেন, গান করেন। আমাদের হাতের লেখা পত্রিকার জন্যে তিনি দু'টি গীতি-কবিতা লিখে এনেছিলেন। তার পরে মনে পড়ে সেইদিন সেই কবিতা দুটি আমাদের শুনিয়ে কবি ও গায়ক মিত্র মহাশয় মালকোঁচা মেরে আমাদের সঙ্গে পরম উৎসাহে ফুটবল খেলতে নেমে যান। মিত্র মহাশয়ের এখন মনে পড়বে কি? নমস্কার। ইতি—

শ্রীসুনির্মল বসু।

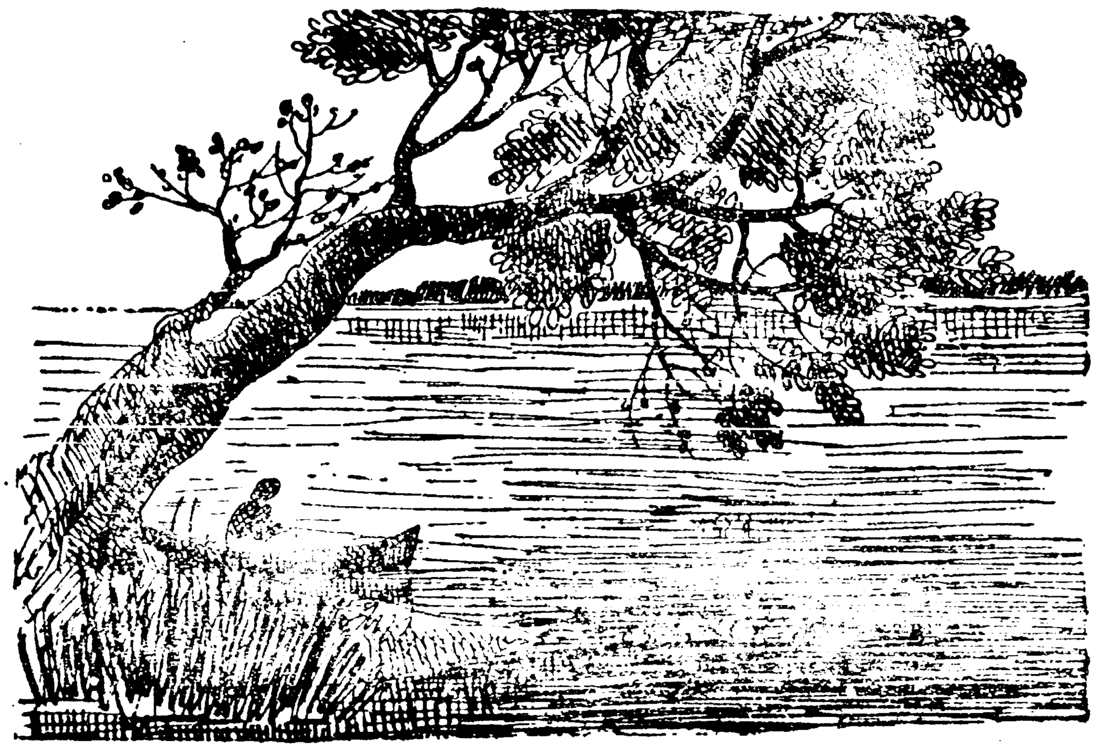

ভৌতিক সিন্দুক

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

৬

সকলে বিস্মিত—স্তম্ভিত—হতবাক। তারা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে না তো!

মৃণাল ততক্ষণ দ্বিতীয় পাল্লাটা ভাঙ্গতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরে এ পাল্লাটাও ভেঙ্গে পড়ে গেল। এবার কিন্তু ধুপ্ ধুপ্ শব্দও হ'ল না, চার হাত লম্বা সেই জিনিষটাও বার হ'ল না। সকলে সবিস্ময়ে দেখল সিন্দুকের ভিতরে এক পাশে, সেই বীভৎস মূর্ত্তিটার কানের কাছে জড়ান-পেঁচান একটা লোহার যন্ত্র। সেই যন্ত্রের মধ্যে থেকে একটা বড় ছোরার ফলা বেরিয়ে রয়েছে।

আমরা তখনও মূর্ত্তিটার দিকে তেমনি পিস্তল উঁচিয়ে রয়েছি। কারো মুখে কোন কথা নেই।

সকলের দিকে বিজয়-গর্ব্বে তাকিয়ে মৃণাল বল্ল, "বসুন আপনারা। ও কি, বসছেন না যে! ভয় পাচ্ছেন ঐ মূর্ত্তিটাকে দেখে? ওটা জীবিত নয়। মৃতও নয়,—রবারের তৈরী একটা বীভৎস পুতুল মাত্র।" জড়ান পেঁচান যন্ত্রটাকে দেখিয়ে মৃণাল আবার বল্ল, "আর এইটেই সকল রহস্যের মূল,—খুনী। এই ছোরার সাহায্যে খুন হ'ত।"

—"যন্ত্রটা খুনী!"—সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, তাই।"—মৃদু হেসে মৃণাল বলল। "তবে শুনুন। এই সিন্দুকটা এক অদ্ভুত জিনিষ। এর কড়া ধরে টানলে বা অন্য কোন উপায়ে দরজা খোলার চেষ্টা করলেই এই যন্ত্রটা নিজের কাজ সুরু করত। যন্ত্রটা থেকে একটা ধুপ্ ধুপ্ শব্দ শোনা যেত,—মনে হ'ত যেন কেউ এগিয়ে আসছে। তার পরেই যন্ত্রচালিত কপাটের প্রথম পাল্লাটা খুলে যেত এবং খুললেই দেখা যেত ঐ বীভৎস মূর্ত্তিটা। আর সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং লাগান ছোরাটা বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে বেরিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে যেত। যে সিন্দুক খুলত সে সামনেই দাঁড়িয়ে থাকত, ফলে ছোরাটা গিয়ে লাগত তার কপালে।"

"তা হ'লে সাদা মূর্ত্তিটা কে? আর সে পালালই বা কোথা দিয়ে?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

"সাদা মূর্ত্তিটা আর কেউ নয়, আমাদের মৃত পেণ্টার। পেণ্টারের দৃঢ় ধারণা ছিল যে নিশ্চয়ই কেউ সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। তাই হয়তো সে ভেবেছিল যে তাকে, মানে খুনীকে, ভয় দেখিয়ে কিছু টাকাকড়ি সরাবে। কিন্তু কড়া ধরে টান দেওয়া মাত্র ধুপ্ ধুপ্ শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে যায়; তার পর ঐ বীভৎস মূর্ত্তি দেখে দিশাহারা হয়ে গুলি করে।" মূর্ত্তিটার একজায়গা দেখিয়ে মৃণাল বলল, "এই সেই গুলির দাগ। বুড়ো ঝাড়ুদারটা বুদ্ধিমানের মত ঠিক সময়েই পালিয়েছিল। নইলে তার অবস্থাও হয়তো পেণ্টারের মত হ'ত। আর পেণ্টারই যে তুষারের ঘরে ঢুকেছিল পিস্তল চুরির জন্য এ তো বোঝাই যাচ্ছে!"

গত রাত্রের খালাসীটা বলল, "কিন্তু কাল রাতে যে ভূত আমার মাথায় চড় মারল!"

খিল্‌খিল ক'রে মেয়েলি হাসি হেসে মৃণাল বলল, "তোমার হাতে বাতি দেখে বোধ হয় কোন

বাদুড় বা চামকিকে বিরক্ত হয়ে ঐ বাতিটার ওপর ঝাপটা দিচ্ছিল। তারই একটা তোমার মাথায় ঠোক্কর খাওয়াতে তুমি ভাবলে যে বুড়ো ঝাড়ুদারের দেখা ভূতই বুঝি চড় মারল।"

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "প্রথম ছায়ামূর্ত্তিটা তা হলে কে?"

মৃদু হেসে মৃণাল বলল, "আমি আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলাম যে এর মধ্যে কিছু একটা গোলমাল আছে। প্রথমে মনে হয়েছিল খুনী বোধ হয় আমাদের জাহাজেরই কেউ। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভুল ভাঙ্গল ওয়ারলেস অপরেটারের মৃতদেহের অবস্থান দেখে। ডী, জেভাস্কের খালাসীর মৃতদেহের অবস্থানও ঠিক ঐ রকম ছিল। তখনই আমি বুঝতে পারি যে এই দুই খুনের খুনী একই লোক, অর্থাৎ আমাদের জাহাজের কেউ নয়। ছোট মিস্ত্রীর খুনের পরেই ডাক্তার এখানে এলেন। তিনি কাউকেই বার হতে দেখেন নি, অথচ ঘরেও কেউ নেই। আমি তখন ভাবলাম খুনী ডাক্তারের অলক্ষ্যে সরে পড়েছে। বড় মিস্ত্রীর হত্যার ঠিক পরমুহূর্ত্তে আমি এসে পড়েছিলাম। আমিও কাউকে বাইরে যেতে দেখি নি, অথচ ঘরেও কেউ নেই। তখন আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে খুনী সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু সে রাত্রে খুনীর সিন্দুকে না থাকার যে কারণগুলি তুষার দেখালে তাতে আমার ধারণা খানিকটা বদলে গেল।"

খানিকটা দম নিয়ে আবার মৃণাল বলতে থাকে: "তার পরই আমি ক্রমাগত ভাবতে থাকি। আমার মনে একটা কথা বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে গেল। বড় মিস্ত্রীর হত্যার একটু আগে হঠাৎ আমি একটা অমানুষিক ধুপ ধুপ শব্দ শুনেছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন বিরাট একটা কিছু তার ভারি ভারি পা ফেলে এগিয়ে আসছে। তার পরেই বড় মিস্ত্রীর চীৎকার শুনলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, সেই ধুপ ধুপ শব্দ তো আর শুনলাম না! হত্যাকারী অত জোরে জোরে পা ফেলে এল, হত্যা করল, অথচ ফিরে গেল না! কেন না ফিরে গেলে আবার সেই রকম শব্দ শোনা যেত। তখন আমার মনে অনেক রকম ধারণাই উঁকি মারতে লাগল। শেষটায় মনে হ'ল খুনী বাইরে কোন যায়গায় লুকিয়ে থাকে—যেখান থেকে বার করা অত্যন্ত কঠিন। কিংবা জাহাজের কোন লোককে সে টাকার লোভ দেখিয়ে নিজের দলে টেনে এনেছে এবং তারই সাহায্যে আত্মগোপন করে। খুনের পরে সে তাড়াতাড়ি সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। সকলের চলে যাওয়ার পর আবার নিজের গুপ্তস্থানে ফিরে যায়।

"কাল রাত্রে আমি কালো কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে বেরিয়ে পড়লাম। চুপি চুপি গুদাম ঘরে গিয়ে চারদিকে পাউডার ছড়িয়ে দিলাম। খুনীর গুপ্তস্থান বার করবার জন্যই আমি এ কৌশল অবলম্বন করি। বাইরে বেরিয়ে এঞ্জিনের আগুনের আলোতে দেখলাম যে তুষার আমাকে অনুসরণ করছে। আমি চট্ করে পিপের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম, তুষার খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে ফিরে গেল। তখন আমি আমার কেবিনে ফিরে এলাম।

"পেণ্টারের হত্যার পর আমি এসে দেখলাম ঘরের কোথাও কোন পায়ের ছাপ নেই। নিহত ব্যক্তি সিন্দুক থেকে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সিন্দুকের ভিতরে বসে তিন হাত দূরের কোন ব্যক্তিকে ছোরা দিয়ে খুন করা অসম্ভব। ছুঁড়ে মারলে ছোরা যাবে কোথায়? আর যদি বাইরে এসে মারত তা হলে পাউডারে তার পায়ের ছাপ পড়ে যেত।

"এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেউ ভাবতে পারে? ভূত আমি বিশ্বাস করি না, কাজেই এর একটা বৈজ্ঞানিক সমাধান আমি ভাবতে থাকি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হয় তবে কি কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এই ভয়ংকর কাজ হচ্ছে! নিজে এঞ্জিনীয়ার বলেই হয়তো কথাটা চট্ করে আমার মনে আসে।

"তখন মনে পড়ে প্রত্যেকটী নিহত ব্যক্তির অবস্থান এক রকম। সকলকেই দেখে মনে হয় কেউ আচমকা আঘাত করেছে। সব আঘাতই প্রায় একই জায়গায়। তারপর, যখন ডাক্তার বলল যে ছোরার ফলায় এমন এক তীব্র বিষ রয়েছে যা রক্তের সঙ্গে মেশার দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে, তখন আমি ভাবলাম তবে হত্যাকারী কপালের মত শক্ত জায়গায় আঘাত করে কেন? শরীরের অন্য যে কোন জায়গায় আঘাত করলেই তো হয়। আর সহসা অত জোরে আঘাত করে কি করে? যান্ত্রিক কৌশল ছাড়া এ অসম্ভব।"

"আশ্চর্য্য!"—আমি বলে উঠলাম—"যে এই সিন্দুকটা তৈরী করেছে সে কি বিজ্ঞানকে গুলে খেয়েছে? আচ্ছা, শুনেছিলাম সিন্দুকটা নাকি অজস্র ধনরত্নে ভরা, সে সব কোথায়? আর ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টের কাছে এটা পাঠানোরই বা মানে কি?"

"আমার মনে হয়," মৃণাল বলে, "টাকা ওতে কোন দিনই ছিল না। প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধ দলের কেউ ওটা পাঠাচ্ছিল। হয়তো ওরা প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করায় ষড়যন্ত্র করেছিল।"

ক্যাপটেন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন; এইবার দুই বাহু বিস্তার করে মৃণালকে বুকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "মৃণাল, তুমি হচ্ছ 'জিনিয়াস্'—অদ্ভুত প্রতিভার অধিকারী। তুমি আজ সিন্দুকের রহস্য ভেদ না করলে আজ সিন্দুক খোলার সময় আর একটি লোকের জীবন নষ্ট হ'ত। তুমিই আজ একজনকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে, ভাই!"

—শেষ—

নেতাজী, তোমারে চাই

সৈয়দ হোসেন হালিম

হে বীর নেতাজী, কোথা তুমি আজ বাঙ্‌লার দুর্দিনে?
ভীরু বাঙালীর ধরো এসে হাত – সুর দাও ভাঙা বীণে।
বাঙালী আজিকে বড় অসহায় দুরু-দুরু তার প্রাণ,
চোখে চোখে আজ পারে না তাকাতে, কণ্ঠে রুদ্ধ গান।
জীবন-নদীতে বেদনা জমিয়া পড়েছে বেদন-চরা,
বীর বাঙালী যে নাই—নাই আর,—ভীরুতায় সব ভরা!

জীবন-নদীর খুলে দিতে বাঁধ, জাগাতে বন্যা ফের,
আজিকে তোমার বড় প্রয়োজন, আর তব শমশের।

আজি দুর্দিনে মনে পড়ে তব দুর্মদ অভিযান,
ইম্ফল আর মণিপুরে তব অস্ত্রের খরশান।
শত্রুর সেনা বন্যার মতো—গতি তার উত্তাল,
ডরিলে না তবু,- চঞ্চল হোলো উন্নত করবাল।
নাই থাক্ সেনা, সাহস তো আছে,—অটুট মনের জোর,
তাই দিয়ে বীর যুগে যুগে লড়ে, সেই তার মণি-ডোর।
—এ কথা শেখালে জগৎ-বাসীরে ;—আজিকে আবার তাই,
মানুষের দাবী মানুষে বোঝাতে, নেতাজী, তোমারে চাই।

ওগো শার্দূল, দরদী বন্ধু, হে বীর স্বাধীন-চেতা,
তুমিই আড়ালে রহিলে আজিকে হইবে বলো কে নেতা ?
কে ধরিবে হাল ভাঙা তরণীর, কে দিবে সাহস বুকে,
ছেঁড়া পালে আজ কে লাগাতে তালি জালিমে দাঁড়াবে রুখে ?
অসহায় জাতি মরিছে কাঁদিয়া—কাঁদিছে বিশ্ব-ভূমি,
অভিমানী ছেলে, অভিমান করে রয়েছ কোথায় তুমি ?
অভিমান করা সাজে কি তোমার ? এসো এসো তুমি ফের,
তুমি এসো, আর সাথে নিয়ে এসো রণজয়ী-শমশের।

—ঝগড়াটে পড়ুয়া—

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

(শুভঙ্করীর রাগের কথা মনে আছে তো ? এইবারে শোন।)

নামতাঃ—না—না—না—না, তো-তোমায় কাঁদতে হবে না। ঐই দেখ টু-টু-টুটুল্ ! এই শুভি আমার বোন কিনা,—আ-আমি ওর মে-মে-মেজদা !

পিণ্টুঃ— ওঃ, বড়দা বুঝি জ্যামিতি ? তুমি হলে সামতাবেড়ের নামতা দাদা ! মামার বাড়ী আমতা ! তোমার বোন ছুছুন্দরী !

শুভঙ্করীঃ—(ভীষণ চটে) ছুছুন্দরী না। আমার নাম শুভঙ্করী প্রামাণিক—র‍্যাংলার—আই. সি. এস্।

টুটুলঃ—তা এখানে মরতে এলে কেন ?

শুভঙ্করীঃ—কেন ? নাচবো, গাইবো, খেলবো। পরে "কুড়বা" পেট পূরে খাব।

নামতাঃ—খে-খেতে না দাও, শুধু খে-খেলবো।

পিণ্টুঃ—
সামতাবেড়ের নামতা দাদা ;
তিন তিরিক্কে নাকটা খাঁদা।
তোমার খেলা ?
সে তো শুধু নামতা বলা !

টুটুল —হ্যাঁ তো। শুভঙ্করীর বক্‌বকানি।
কান কট্ কট্ হাড় মট্ মট্।

বাবা বাবা ! শুনতে পারি নে। শুধু ধামায় ধামায় "কড়লা লিহে—ঝিঙ্গে লিহে।"

শুভঃ—আর যদি বলি—
"পরটা পরটা পরটা লিহে
কাবাব, কোর্মা, রাবড়ি লিহে ?"

পিণ্টুঃ—কখনো না। শুভঙ্করীতে পরটার কথা মোটেই নেই।

টুটুলঃ—রাবড়িও না।

শুভঃ—থাকতেও তো পারতো। তুমি তো আর ও-সব পড় নি—

টুটুলঃ—কে বললে পড়ি নি ?

নামতাঃ—এ-এ-একুশখানা ধারাপাত ছিঁড়েছ।

শুভঃ—বাবার ব্যাগে পূরে দিয়েছ, মনে নেই ?

নামতাঃ—১৩, ১৭, ১৮, ১৯ ঘরের না-না-নামতার পা-পাতা কে-কে-কে ছিঁড়েছে শুনি ?

টুটুলঃ—ইচ্ছে করে ছিঁড়ি নি ত', ছিঁড়ে গেলে কি করবো ?

পিণ্টুঃ—যে পাঁচালীর পাতা,—ফুঁ দিলেই হাওয়া। ধারাপাত আমাদের মুখস্থ না টুটুল ?

টুটুলঃ—মুখস্থই তো—

শুভ :—বেশ, বলো দেখি, নয় তেরোং কত ?

পিণ্টু :—সোজা। বাইশ।

টুটুল :—আটচল্লিশ।

শুভ :—হ'ল না, দুয়োঃ। (নাচতে নাচতে) কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিহ্নে, হ'লো না।

পিণ্টু, টুটুল (এক সঙ্গে) :—এই নামতা, দেবো নামাবলী ছিঁড়ে? তবে যে বল্লি আমরা যা বলব তাই হবে ?

নামতা :- এই ম-ম মজালে! হ্যাঁ, ঠিকই ত'। নয় তেরোং বাইশও হয়, আবার আটচল্লিশও হয়।

শুভ :—মোটেই না -

পিণ্টু :—তবে গেট্ আউট্।

টুটুল :—নো য়্যাড্‌মিশন্, ভাগো।

নামতা :—আরে আরে, চ-চ-চট কেন? শুভি নামতার কি জানে? বি-বি-বিশ্বেস না হয় ধা-ধারাপাত দেখে মি-মি-মিলিয়ে নিক্।

টুটুল :—ও বাবা! আবার ধারাপাত! সে তো নেই। পিণ্টু ধারাপাত ছিঁড়ে ঘুড়ি যুড়েছে যে! বিশ্বেস কি করে হবে ?

(এই সময়ে অ-আ-ক-খ এসে ঘরে ঢুকল। তার পর ?)

অবিশ্বাস্য

শ্রীকমলা দত্ত

চারপাশ থম্ থম্ করছে। শুধু ঝিঁঝিঁর একটানা ঝঙ্কার, আর প্যাঁচার গম্ভীর কণ্ঠের দু'একটা ধমক শোনা যায় যেন!

বাইরের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুধীরের মনে হ'ল যেন জ্যোৎস্নাটা ভোরের জ্যোৎস্নার মতই মলিন দেখাচ্ছে। শীতের দিন; অস্পষ্ট কুয়াশাও চারপাশ ঘিরে রয়েছে। স্পষ্ট বুঝবার উপায় নেই কিছুই। যাই হোক, এবার উঠে এক্‌সারসাইজ আরম্ভ করতে হবে। তাতে তো অন্ততঃ আধ ঘণ্টা লাগবে! ততক্ষণে দুটো একটা করে ভোরের পাখী ডেকে উঠবে নিশ্চয়। তারপর বেরিয়ে একেবারে বিমল আর সতীশের বাড়ী যাওয়া যাবে।

সুধীর ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে। তিন বন্ধুর মধ্যে শক্ত শরীর গড়বার একটা প্রচেষ্টা চলছে।

এরা ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে তিনজনেই এক্‌সারসাইজ করত। তারপর পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ত সহরের সীমানা ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় বেড়াতে। ছয়টায় ফিরে এসে পড়াশোনায় মন দিত।

বিমল ও সতীশের বাড়ী পাশাপাশি, তবে সুধীরের বাড়ী খানিকটা সহরের মাঝের দিকে! তাই রোজ সুধীর এসে ডাকলে তবে ওরা বের হ'ত বেড়াতে।

সুধীর সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠল ও পা টিপে টিপে চলে গেল চিলে কোঠায়। বাবার ঘুম ভেঙে গেলে বিরক্ত হবেন।

তারপর আধঘণ্টা ধরে চলল শরীর-চর্চ্চা। শেষ হলে গরম জামা গায়ে দিয়ে সুধীর রওনা হ'ল যথা নিয়মে বিমল ও সতীশের বাড়ীর দিকে।

মফঃস্বল সহর। তাও প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। রাস্তার আলো তখন মিউনিসিপ্যালিটীর মর্জ্জি-মাফিক জ্বলত। যতটুকু আলো তার বেশী ধোঁয়া। অন্ধকার যেন আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে! কিন্তু তখনকার লোকের ওই ছিল যথেষ্ট। ইলেকট্রিক, গ্যাসের তোয়াক্কা রাখত না তারা। চাঁদের আলো, আকাশের তারা আর হাতের লণ্ঠন ছিল তাদের ভরসা। সুতরাং সুধীর যখন বের হ'ল চাঁদের আলো তখন ছড়িয়ে পড়েছে পথে প্রান্তরে, শস্যশীর্ষে পত্রে পল্লবে পুষ্পে,—গাছের তলায় তলায় সৃষ্টি করেছে আলো-আঁধারির কুহেলিলোক। সুধীরদের বাড়ী ছাড়িয়ে বিমলদের বাড়ী যেতে খানিকটা পথ বেশ নির্জন। দু'পাশে বিস্তৃত অনাবাদী জমি। মাঝে মাঝে দু'একটা বিরলপত্র গাছপালা। লোকের বাড়ীঘর বিশেষ নেই।

এই জায়গায় এসে কুয়াশাক্ষীণ আলো-আঁধারের খেলা দেখতে দেখতে সুধীরের মনটা যেন কেন চঞ্চল হয়ে উঠল—যেন মাঝে মাঝে চকিত হয়ে উঠছে। হঠাৎ সে দেখে সামনে তার একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়। বাঃ, এমনি অস্পষ্ট আলো আর কালো কালো ছায়া যে এত বড় ষাঁড়টা একেবারে সামনে না আসা পর্যন্ত তার চোখেই পড়ে নি! ভারি মজা তো! কাদের ষাঁড় এটা? এদিক ওদিক্ দেখে আবার সামনে তাকাতেই সেটা আর দেখা গেল না। নিশ্চয় পাশের জমিতে নেমে গেছে। প্রথম চকিত ভাবটা ষাড়টাকে দেখে কেটে গিয়েছিল। একটা পরিচিত প্রাণী তো! কিন্তু সেটা গেল কোথায়? দু' পাশে ফাঁকা জমি—অত বড় ষাঁড়টা এর মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল? কুয়াশার জন্য দেখা যাচ্ছে না? হবেও বা।

ঐ দেখ! কাছাকাছি কোনও আস্তাবল থেকে ছাড়া পেয়ে একটা ঘোড়াও আসছে এদিকে। ঐ তো ঘাস খাচ্ছে। সুধীরের পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল; আবার ঘাসে মন দিল। বাঃ, ষাঁড়টা তবে গেল কোথায়! আর একবার জমিটার দিকে সুধীর ভালো করে চাইল, ষাঁড়টা যদি দেখা যায়। তারপর সামনের দিকে চেয়ে দেখে ঘোড়াও নেই, বিলকুল অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সুধীর সাহসী ছেলে। কিন্তু এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামছে। হাত-পায়ের জোড়গুলো যেন এলিয়ে আসছে। মরিয়া হয়ে সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল; একেবারে বিমলদের বাড়ীর সামনে এসে চীৎকার করে ডাকল, "বিমল, বিমল!"

বিমল বেরিয়ে এসে বলল, "কি রে—হাঁপাচ্ছিস্ কেন ?"

সুধীর বলল, "কিছু না, খুব জোরে হেঁটে এসেছি তাই বোধ হয়।"

তু' মিনিটের মধ্যে সতীশও এসে জুটল। তারা বেড়াতে রওনা হবে এমন সময় সতীশ বলল, হ্যাঁ রে—পাখীও ডাকে না, জ্যোৎস্নাও বেশ রয়েছে, ব্যাপার কি রে ?"

বিমল বললে, "সত্যিই তো ! দাঁড়া ঘড়িটা দেখে আসি।"

একটু বাদে ঘড়ি হাতে করেই বিমল এসে বললে, "এ কি কাণ্ড ! এখন তো সবে রাত তিনটে রে ! আমরা কি সবাই তবে এক সঙ্গে আজ রাত আড়াইটেতে উঠেছি !"

সতীশ ওদের মধ্যে একটু কুঁড়ে প্রকৃতির। সে একটা হাই তুলে বললে, "এই মরেছে ! এইজন্যেই আধ ঘণ্টা একসারসাইজ করেও আমার ঘুম কাটে নি ! যাক, একসারসাইজ করে তো আর শোওয়া চলবে না, চল্ বেরিয়ে পড়ি।" তারা বেরিয়ে পড়ল।

সুধীরের যেন কেমন গোলমাল ঠেক্‌ছে। রাত তিনটে ! আধ ঘণ্টা আগে এই অনভ্যস্ত সময়ে তিনজনে একই সঙ্গে উঠেছে ! তার পর ষাঁড়—ঘোড়া—এ সব কি ! একটা রহস্য যেন দানা বেঁধে উঠছে না ? আজকের এই চাঁদের আলো, এই অস্পষ্ট দৃশ্য—এগুলো সবই একটু অস্বাভাবিক লাগছে না ? তবু সে চুপ করে থাকে। বিংশ শতাব্দীর ছেলে সে। সব কিছু ভাল করে বিশ্লেষণ না করে বিশ্বাস করতে চায় না কিছুই।

মফঃস্বল সহর। জমাট নাগরিকতা নেই। গ্রাম ও সহর যেন মিশে আছে। তাই দেখা যায় পল্লীর গা ঘেঁষে পাকা রাস্তা ও ইমারতের পাশে মাঝে মাঝে সুদূরবিস্তারী শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে গাছপালা ঝোপঝাড়ও যে নেই তা নয়। তেমনি শস্যপ্রান্তরের ধার ঘেঁষে তারা এসে দাঁড়ায় সহরের প্রান্তে। এখানে আবার শ্যামল শস্যক্ষেত্রের বুক চিরে চলে গেছে রেল লাইন দূরদূরান্তরের ডাক ইশারায় জানিয়ে। এরই একটা পুলের উপর তারা বসল। নীচে নদী নয়, একটা ছোট খাল। শস্যক্ষেত্রের প্রাণধারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরই উল্টো দিকে শ্মশান।

রোজই তারা এখানে বসে। কিন্তু আজ শ্মশানের দিকে চেয়েই সুধীরের মনটা আবার চকিত হয়ে উঠল। পূবের আকাশ তখন ফিকে হয়ে আসছে—চাঁদ হয়ে গেছে পাণ্ডুর। ঐ যে তিনজন সাদা পোষাক পরা লোক—ওরা এ সময় শ্মশানে কি করছে ? সুধীরের চোখ একবার তাকে ফাঁকি দিয়েছে, তাই সে কিছু বলে না। আজ হয় তো তার ভুল দেখারই দিন।

"হ্যাঁ রে, ও তিনটে লোক ওখানে করছে কি ?" সতীশ বললে।

"মরা পোড়াতে এসেছে বোধ হয়।"—বিমল উত্তর দেয়।

এবার সুধীর বলে, "তা হলে তিনজন কেন, আর আগুনই বা কোথায় ?"

সতীশ বলে, "তাই তো ! চোর টোর নয় তো ? ঐ মঠটার মধ্যে ঢুকল না ?"

বিমল বলে, "ঠিক বলেছিস্, চল ব্যাটাদের ধরি গে। মঠটার তো ঐ একটাই দরজা, বেরুলেই দেখতে পাব।"

এতক্ষণ উষার আলোয় সুধীরেরও জড়তা কেটে গেছে। তিন বন্ধু মাঠ ভেঙে শ্মশানের দিকে রওনা হ'ল। চোখ তাদের মঠের একমাত্র দরজার দিকে। কিন্তু মঠের কাছে পৌঁছে তারা

তার ভেতরে বা আশেপাশে দেখল, কেউ কোথাও নেই। সে রাত্রে যে কোনও মরা পোড়ানো হয়েছে তারও কোন চিহ্ন তারা পেল না। তিনজন অবাক্ হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

"ব্যাপার কি বল তো ! ব্যাটারা গেল কোন্ পথে ?"—বিমল জিজ্ঞাসা করে।

সুধীর বলে, "চল ভাই, বাড়ী ফিরি।"

একটা অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে তারা যখন ফিরছে তখন সুধীর তাদের তার রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলল। শুনে সতীশ বললে, "বাস্ রে ! থাক আমার মর্ণিং ওয়াক্, আমি সূর্য্য না উঠলে আর বের হচ্ছি না।"

বিমল বলল, "তুই কি এ সব বিশ্বাস করিস ? বলিস্ কি সুধীর ?"

সুধীরের মন তখন খানিকটা হাল্কা হয়েছে। বলল, "বিশ্বাস করি বলতে পারি না—আর একেবারে উড়িয়েও দিতে পারছি না। যাই হোক, আপাততঃ পরীক্ষা দরজার গোড়ায়। পাশ করতে না পারলে—বাবার চটির ওজন জানিস তো ?" *

* প্রায় ৬৫ বছর আগেকার একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা)

পুরস্কার

শ্রীসোমনাথ মজুমদার

মণ্টুরা পাঁচ ভাই, তাদের মধ্যে মণ্টু মধ্যম; তার বয়স ছয় বছর। মণ্টুর বাবা একজন নামকরা উকীল। সেদিন মণ্টুর বাবা কোর্টে গেছেন, মণ্টু তার ছোট ভাই নিধুকে নিয়ে খেলতে বসেছে। নিধুর বয়স দেড় বছর। খেলতে খেলতে হঠাৎ একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে গেল। এই অঘটন ঘটার জন্য মণ্টু রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল, এবং খেলা থামিয়ে বাইরে বাইরে ঘুরতে লাগলো। যদি বাবা কিছু বলেন এই তার ভয়।

মণ্টুর বাবা কোর্ট থেকে এসে কাচের গ্লাস কে ভেঙ্গেছে জিজ্ঞাসা করলেন। সবাই যখন অস্বীকার করলো তখন মণ্টু অতি ভয়ে ভয়ে বল্লে, "বাবা, আমি ভেঙ্গেছি।" কিন্তু আশ্চর্য্য, বাবা মণ্টুকে কিচ্ছু বল্লেন না, উল্টে তার হাতে ছ'আনা পয়সা দিয়ে বল্লেন, "সর্ব্বদা এই রকম সত্য কথা বলবে।"

এর পর বাড়ীতে ভাঙ্গাচোরার মাত্রা যেন অকস্মাৎ খুব বেড়ে গেলো। মণ্টুর বাবা কে ভেঙ্গেছে প্রশ্ন করলেই ছেলেরা স্বীকার করতো, মণ্টুর বাবাও সত্যবাদিতায় উৎসাহ দেবার জন্য তাদের পয়সা দিতেন।

সেদিন মণ্টুর মগজে হঠাৎ একটা বুদ্ধি এলো। আচ্ছা, বাবার দুধ খাওয়ার শ্বেত-পাথরের বাটীটা ভাঙ্গলে নিশ্চয়ই খুব বেশী পয়সা আদায় করা যাবে। তার পর বাবা যখন কোর্টে এবং বাসার সবাই যখন ঘুমে, তখন মণ্টু ঘর থেকে শ্বেত পাথরের বাটীটা বাইরে এনে ছুঁড়ে মারলে একটা পাথরের উপরে। এক আছাড়েই সাধের পাথরের বাটীটা ফেটে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। তখন মণ্টুর কি আনন্দ! মণ্টু আজ একটা মোটা বক্‌শীস্ পাবে। কখন বাবা ফিরবেন এই আশায় সে বাইরে এসে বসে রইল।

যথা সময়ে বাইরে বাবার গলার আওয়াজ শুনেই মণ্টু ছুটলো তাঁর কাছে, এবং জামা ধরেই বল্ল, "বাবা, আজ আট আনার কম কিছুতেই ছাড়বো না।" মণ্টুর বাবা তো অবাক্। মণ্টু বললে, "বা রে, তোমার শ্বেতপাথরের বাটীটা ভেঙ্গেছি যে! দাও পয়সা। উঃ—"

মণ্টুর কথা আর ভাল করে শেষ হতে পারল না। তার আগেই তার বাবার হাতের বিরাট এক চড়ে সে ঘুরে পড়ে গেল মাটীতে। সত্যি কথা বলার পুরস্কার হাতে হাতেই পেয়েছে সে।

আজ বাবার হঠাৎ এ রকম মতিভ্রম কেন হ'ল মণ্টু ভেবে পেল না।

হোক ফুলেরই মতো

শ্রীভারতী নন্দী

চিত্ত তোমার হোক পবিত্র
ফুলেরই মত,
দূর করে দাও আবর্জ্জনা
মনের ভিতর যত!
সত্যপথে চল তুমি—
নাইক' সেথা ভয়,
আস্থক যত বিঘ্ন-বাধা—
হবেই হবে জয়।

চিত্র পরিচয়—৪৩৬ পৃষ্ঠার (মাঘ সংখ্যা) ছবি দু'টি হচ্ছে: উপরে—শের-শাহের সমাধিসৌধ (সসারাম), নীচে—লাহোর দুর্গ (পশ্চিম পাঞ্জাব)।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

গত মাসে চিঠি লিখি নি বলে অনেকেই অনুযোগ করেছ। লিখি নি বলেই তো তোমাদের অমন সুন্দর সুন্দর চিঠিগুলি পেলাম। লিখলে তো আর পেতাম না! যাই হোক, তোমাদের চিঠির জবাব দিচ্ছি।

শ্রীমিহিরকান্ত রায় (মহেশদাড়ী)—তুমি সমস্ত লেখকদের ঠিকানা চেয়েছ। তা কি দেওয়া সম্ভব? যাঁর যাঁর ঠিকানা দরকার রিপ্লাই কার্ড দিলে আমাদের কার্য্যাধ্যক্ষ মশাই তা জানিয়ে দেবেন। ছাপা সম্বন্ধেও বিস্তৃত বিবরণ তাঁরই কাছে লিখলে জানতে পারবে। তোমার ধাঁধাটি কিন্তু বড্ড পুরোনো। শ্রীবেণু ঘোষ (কাটিহার)—জন্মভূমি চিরকালের জন্য ছেড়ে আসা কষ্টকর বই কি! আমরাও যে ভুক্তভোগী। শ্রীরত্না দেবী (বাঁকীপুর)—তোমার সুন্দর এবং আন্তরিকতা-পূর্ণ চিঠিখানি পেলাম। তোমার 'অন্যত্র' যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে তোমার বোন এখনও কিছু লেখে নি, তবে কারণটা আন্দাজ করতে পারছি এবং খুব খুসী হয়েছি। শ্রীঅমিয়কুমার সামন্ত (বীরসিংহ)—তুমি পরীক্ষায় ভাল ফল করেছ জেনে খুসী হলাম। আরও ভাল হওয়া চাই, বিদ্যাসাগর মশাইএর গ্রামের লোক তুমি। কিন্তু তোমাদের গ্রামের কথা তো কই, কিছু লিখলে না! শ্রীআত্রেয়ী দেবী (পাটনা)—জয়ন্তী রামধনুর কাজ সুরু হয়েছে। রামধনুর ২৫ বছর পূর্ণ হয়ে যাবার পর ওটি বার করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। কাজেই ওটি ১৩৬০ সালে প্রকাশ করা হবে। এ সম্বন্ধে যথা সময়ে রামধনুতে বিস্তারিত জানান হবে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (নিউ আলিপুর)—রামধনু না পাওয়ায় তুমি যে অনুযোগ করেছ তা ঠিক হয় নি। তোমার ঠিকানা পরিবর্ত্তনের খবর তো তুমি সময় মত আমাদের জানাও নি, কাজেই তোমার রামধনু তোমার পূর্ব্ব ঠিকানায় গিয়ে, অনেক ডাকের ছাপ খেয়ে, শেষে এই সম্প্রতি আমাদের হাতে ফিরে এসেছে—"মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল না" লিখন গায়ে এঁটে। কাজেই ত্রুটীটা কি আমাদের? এ রকম আরও কয়েকটি ঘটনা এ মাসে ঘটল, তাই লিখলাম। এতে যে দু' পক্ষেরই ক্ষতি! শ্রীনিমাই বসু (নাগপুর)—ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে গ্রাহকদের লেখা ছাপা হয়—কিন্তু তাই বলে কি যে কোন লেখা ছাপা চলে? লেখার একটা মান আছে তো? কাঁচা লেখা ছাপলে যার লেখা সে হয়তো খুসী হবে, কিন্তু হাজার হাজার পাঠক যে তার বদলে হবে অসুখী! একজনকে খুসী করতে গিয়ে হাজার জনকে অতৃপ্তি দেওয়া কি উচিত? তুমিই বল। শ্রীশিবানী দেব (মুঙ্গের), শ্রীজয়ন্ত রায় (কলিকাতা), শ্রীবিবেক দাশগুপ্ত (মেদিনীপুর)—পরীক্ষার আগে

"ব্রাহ্মণের" আশীর্ব্বাদ চেয়ে প্রত্যেক বছরই যেমন কিছু কিছু চিঠি আসে, এবারও তোমাদের কাছ থেকে তেমনি পেলাম। আশীর্ব্বাদ প্রাণ ঢেলেই করছি; কিন্তু পড়াশোনা ঠিক মত হয়েছে তো? ওটি না হলে কিন্তু কলিযুগে শুধু "ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে" কিছুই হয় না। শ্রীমালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ) —তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে "সতীশ"; কিন্তু ছোটদের কাগজে এ প্রশ্ন কেন?

ইতিমধ্যে তোমাদের কাছ থেকে আমরা অনেক নতুন লেখা পেয়েছি। তার মধ্যে আমাদের মনোনীত কয়েকটি লেখার নাম এবারে দিলাম, পরে আরও দেব, এবং ধীরে ধীরে তা "ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে" প্রকাশের ব্যবস্থা হবে।

আমরা তো সেই ছেলে, ডিম ডিম মাদলের শব্দ—সুব্রত রায়; সন্ধ্যা—কুমারশংকর চৌধুরী; শীতের ডাক—অঞ্জনকুমার দত্ত; আশা রাখো—রেবা সিংহ; প্রতিজ্ঞা—অনিলকুমার ঘোষ; বাঘের বাচ্চা—নিবেদিতা গুপ্ত; ফাল্গুন এলো—মুরারিমোহন বিট; বসন্ত আসে ফিরে—অমিয়কুমার সামন্ত; ম্যাজিক—জগদানন্দ সাহা; মালা—অরুণ পোদ্দার; বড় লোক—মিহির দাশগুপ্ত; ইণ্টারভিউ—উৎপল সেনগুপ্ত।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ এইখানে শেষ করি। —ইতি রাঃ সঃ

পরলোকে নলিনীরঞ্জন

খ্যাতনামা বাঙ্গালী নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। অল্প কিছুদিন আগেও তিনি পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে নিজের প্রতিভা-বলে কি করে বড় হওয়া যায় নলিনীরঞ্জন তাঁর জীবনে তা দেখিয়ে গেছেন। ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য বাঙ্গালী ইদানীং খুব বেশী দেখা যায় নি। অর্থ, পদ, যশ সবই তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর তিরোধান ঘটল।

জাতীয় গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী

সম্প্রতি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা জাতীয় গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সে যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় কলকাতার পাব্লিক লাইব্রেরী গঠিত হয়। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) এর প্রথম গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন সরকারের পক্ষ থেকে এই পাব্লিক লাইব্রেরীর ভার গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে সরকারী অন্য লাইব্রেরীগুলি মিলিয়ে বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেন। বহু-ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে এক সময়ে এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ভারত স্বাধীন হবার পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীই নাম বদলে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কলকাতায় এলে আলিপুরের যে বিরাট অট্টালিকায় থাকতেন সেই বেলভেডিয়ার প্রাসাদেই এখন এই গ্রন্থাগার চলে এসেছে। যে বিরাট হল্ ঘর একদিন নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ—বিলাসিতায় মুখর হয়ে থাকত এখন তাই হয়েছে সাধারণের পাঠকক্ষ। বর্ত্তমানে এখানে সড়ে সাত লক্ষ বই ও পুঁথি আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এটিই এখন সব চেয়ে বড় গ্রন্থাগার।

খেলাধূলার খবর

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এবারে ভারতীয় দল শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে।

কলকাতায় রণজি প্রতিযোগিতায় বাংলা দল সার্ভিসেস্ দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে।

এদিকে হকি মরশুমও সুরু হয়েছে। কলকাতায় লীগ প্রতিযোগিতা বেশ উত্তেজনার সঙ্গেই চলছে। বাইরে থেকে অনেক নাম-করা খেলোয়াড় এবারে কলকাতায় এসেছেন খেলায় যোগ দিতে। ভবানীপুর দল বেশ ভাল খেলছে। প্রথম ৮টি খেলায় তারা একটিতেও হারে নি, শুধু একটিতে ড্র করেছে। ভারতীয় অলিম্পিক্ দলের অধিনায়ক 'বাবু' ৮ম খেলা থেকে এই দলে যোগ দিয়েছেন। কাষ্টম্‌স্ দলও মন্দ খেলেছে না। গত বারের লীগ-বিজয়ী মোহনবাগান গোড়াতেই কতকগুলি পয়েণ্ট নষ্ট করেছে।

অবিরাম সাইকেল চালনায় পৃথিবীর রেকর্ড

সম্প্রতি কংগ্রেস সেবাদলের উদ্যোগে কলকাতায় একটি অবিরাম সাইকেল চালনার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ৩৯ জন প্রতিযোগী এতে যোগদান করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শ্রীসলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর সকলেই একে একে অবসর গ্রহণ করেন। সলিলকুমার একাদিক্রমে ১০৫ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট সাইকেল চালিয়ে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এর আগের রেকর্ড ছিল ১০৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। এই প্রতিযোগিতা সরকারী ভাবে স্বীকৃত হবে কিনা জানা নেই, কিন্তু সলিলকুমারের এই কৃতিত্বে তোমরা নিশ্চয়ই খুব গৌরব বোধ করবে।

পৌষ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

সব চেয়ে ভাল লেখার জন্য পুরস্কার পেলেন—শ্রীগৌরী মিত্র [হুগলী]। এ ছাড়া শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত [কলিকাতা] ও শ্রীলিলি চট্টোপাধ্যায় [পাণ্ডবেশ্বর]—এঁদের লেখাও ভাল হয়েছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মহিম (বা নরেন বা শচীশ), নবীন, কটক (বা কালকা), সরেস (বা নতুন), নয়ন, সালসা (বা কোকো), মলম, কনক।

উত্তরদাতাদের নাম ঃ—অমিয়কুমার সামন্ত (বীরসিংহ), অপর্ণা ভট্টাচার্য্য (কাঁচরাপাড়া) ; হেমেন্দ্রনাথ সেন (বালীগঞ্জ) ; শচী, কানু, ঝরণা, সানু, পানু, ভোঁদা, খাঁদা প্রভৃতি (কলিকাতা-১২) ; কল্যাণকুমার, মঞ্জুলা ও বাণী মজুমদার (বহরমপুর) ; সরিৎকুমার দত্ত (গুড়াপ—হুগলী) ; ঘোঁতন, ফুলু (কাঁচরাপাড়া) ; দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-৭) ; সোণা, বেণু, মণ্টি, রুবু, কিং ও চাঁহু (হাওড়া) ; সীমা, বৌরাণী, দিদিমণি, বেণু, শ্যামা ও অভিমন্যু (করিমগঞ্জ) ; রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর) ; শম্ভু, ডলি, লিলি, খোকন (বর্দ্ধমান) ; শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রণেন্দ্র ও শম্ভুনাথ (হাজারীবাগ) ; মালবিকা দত্ত, গুনুদা, দীনুদা মাওদেদা প্রভৃতি (করিমগঞ্জ) ; কৃষ্ণা সুর (কলিকাতা-৪)।

নূতন ধাঁধা

নীচের ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যাগুলির জায়গায় শরীরের এক-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বসিয়ে দিলেই লেখাটি পড়া যাবে। চেষ্টা কর তো ঃ—

এ১ ছেলে২ নিয়ে সোজা ৩ট কেটে চলে এস। দেশটাকে ৪ক ওরা। ৫৬ আর সাগর ৭গলি করে দাঁড়িয়ে অথচ কারও না৮ পাবে না। তে৯র মোড় পেরোলেই ১০মলা-বাগান। ছিঁড়লে কেউ কিছু বলবে ১১খনও। ফলের জন্য দো১২ খুঁজবারও দরকার ১৩।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনামূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ! আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ।৷৹ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১৷৹ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা মাত্র।

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১ বি, রসা রোড, কলিকাতা-২৬।

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

নীচে কয়েকটি নাম দেওয়া হ'ল। এগুলি সবই কোন-না-কোন বিখ্যাত বইএর চরিত্র। কোন্ নামটি কোন্ বই থেকে নেওয়া হয়েছে লিখে পাঠাতে হবে। যার উত্তর নির্ভুল হবে কিংবা, তা না হ'লে, যার উত্তর সব চেয়ে কাছাকাছি হবে সে-ই পাবে পুরস্কার। প্রতিযোগিতায় যে কেউ যোগ দিতে পারবে তবে প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে পূর্ণ করে যুড়ে দিতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। লেখা আগামী ২৮শে চৈত্রের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে।

নামগুলি হচ্ছে ঃ— (১) কলাবতী (২) ফ্রায়ার টাক্ (৩) য়্যালিস্ (৪) কাগ-তাড়ুয়া (৫) কমআক্কেল (৬) মিঃ বাম্‌সু (৭) গঙ্গারামের খুড়ো (৮) তাতা (৯) নবকুমার (১০) বোদা (১১) সামার্‌লি (১২) নিডিয়া (১৩) নির্ম্মলকুমারী (১৪) আগামেম্‌নন্ (১৫) চিরঞ্জীব।

কুপন নাম—

রামধনু ঠিকানা—

পুঃ ফাল্গুন ৫৯ বয়স—

নিজে গ্রাহক কিনা—

— পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। —

বিশ্ব পরিচয়

(বা পৃথিবীর ইতিহাস)

পৃথিবীর সকল দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস সহ পাঁচশতাধিক একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ ৮৲

সোভিয়েৎ দেশ ১।০

জার্ম্মান দেশ ১।০

শ্রীপ্রভাবতী দেবীর

কৃষ্ণা-সিরিজ

(মেয়েদের অ্যাডভেঞ্চার)

প্রথম-গ্রন্থ :—

কারাগারে কৃষ্ণা ১॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

বিচিত্রা-সিরিজ

(ডিটেক্‌টিভ ও অ্যাডভেঞ্চার)

প্রথম গ্রন্থ :—

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন ২৲

অনুবাদ সাহিত্য

অলিভার টুইষ্ট	১।০
ব্ল্যাক অ্যারো	১।০
ট্রেজার আইল্যাণ্ড	১।০
টেল্ অব্ ট্যু সিটিজ	১।০
অ্যাডভেঞ্চার অব মার্কো পোলো	১।০
কাউণ্ট অব মন্টিক্রষ্টো	১।০
ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড	১।০

শিশু-সাহিত্য

অপরূপকথা	১৲
ঘূর্ণিপাকে	১।০
রঘু সর্দার	১।০

—শিশু-মাসিক—

শুকতারা

বার্ষিক চার টাকা

প্রতি সংখ্যা ছয় আনা

ফাল্গুনে ষষ্ঠ বর্ষে পড়িল।

SCHOOL FINAL NOTES

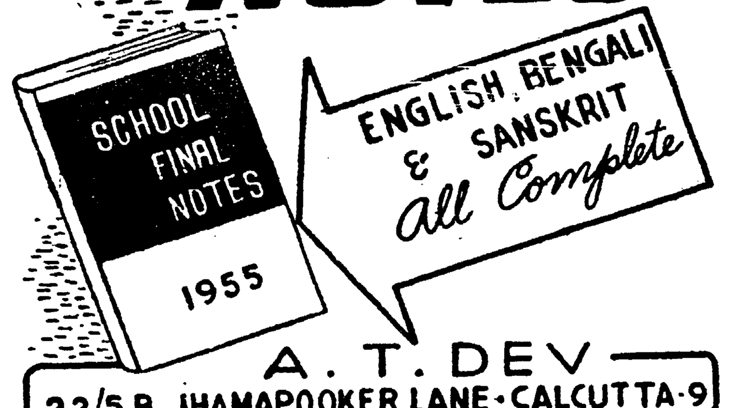

A. T. DEV

22/5 B JHAMAPOOKER LANE · CALCUTTA-9

for 1954 & 1955

English (Prose)	4/-
English (Poetry)	3/-
পাঠ সংকলন	3/-
সংস্কৃত পাঠমালা (গদ্য)	3/-
সংস্কৃত পাঠমালা (পদ্য)	2/-

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

চতুর্দশ গ্রন্থ :—

কমলাকান্তের দপ্তর ১৲

অমর বীর সিরিজ

দশম গ্রন্থ :—

বারীন ঘোষ ॥০

ভ্রমণ, শিকার ও অ্যাডভেঞ্চার

আকাশ গঙ্গা	১।০
দুর্গমের বিভীষিকা	১৲
সুন্দর বনের শিকারী	১৲
আবার যখের ধন	১।০
হিমালয়ের বুকে	১৲
বামনের দেশ	৸০
দৈত্যপুরী	৸০

শিশুনাটক

সিপাহী বিদ্রোহ	১৲
কেদার রায়	॥৵০
বীর শিবাজী	॥৵০
স্বামীজী	॥৵০
স্বাধীনতা জাগলো	॥০
জাগোরে ধীরে	॥৵০

দেবসাহিত্য কুটীর * * * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

সুস্বাদু ও পুষ্টিকর

আর্য্যের

থিন এরারুট ও স্কুল বিস্কুট

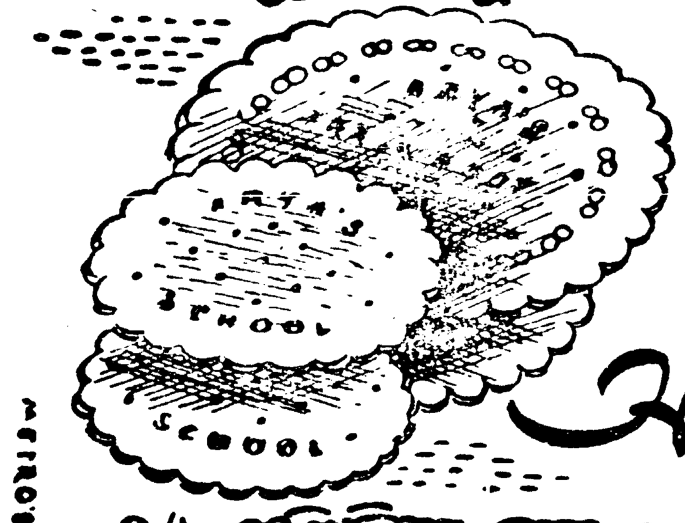

আর্য্য বেকারি

এণ্ড কনফেকসনারী

৪/১, পণ্ডিতিয়া রোড ও ৭/১, রসা রোড ; ফোন পি.কে. ৪৩৫৬।

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

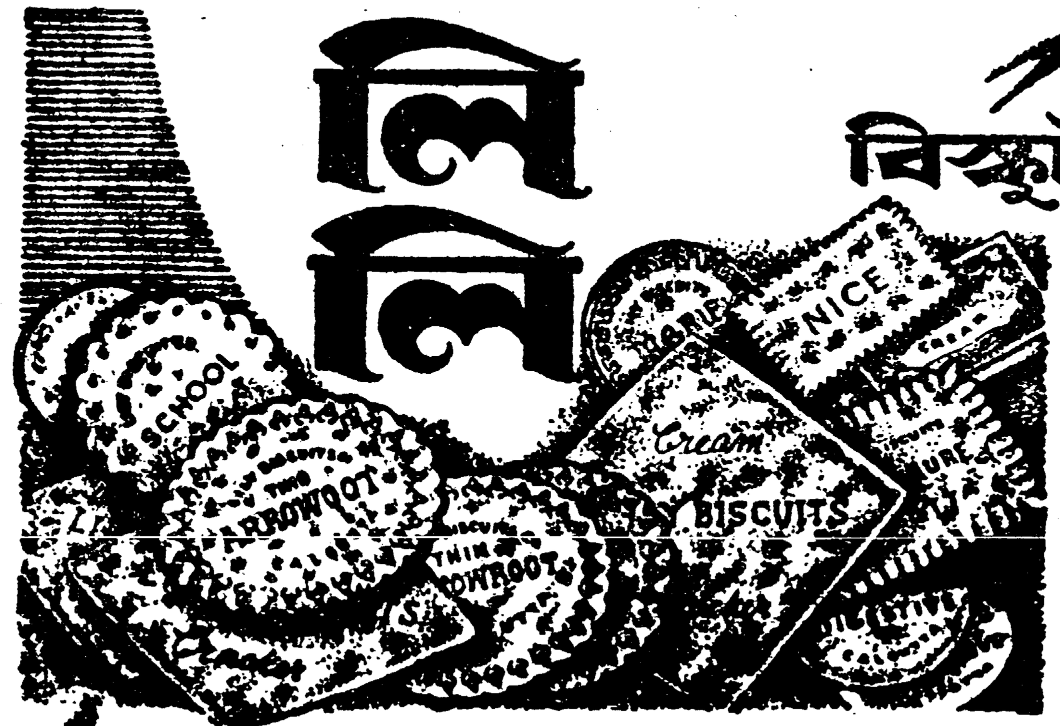

লিলি বিস্কুট

কয়েকটী মনোরম
ও
স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

রজত জয়ন্তী বর্ষ

গ্রন্থাগারের জন্য কয়েকটি যুগোপযোগী বই

[*পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাল এডুকেশন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত]..

১।	মুক্তি-সংগ্রাম—রবীন্দ্র কুমার বসু	...	৪৸০
*২।	গোর্কীর ছেলেবেলা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	১॥০
*৩।	মাঞ্চুসেনের অ্যাডভেঞ্চার— „	...	৸০
*৪।	ছোটদের নিউটন—ঋষি দাস	...	১।০
*৫।	„ আইনষ্টাইন— „	...	১।০
৬।	„ মার্কনি— „	...	১।০

গ্রন্থাগারের জন্য, ছেলেদের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

চয়নিকা মাসিক পত্রিকা

নমুনা কপি চারি আনা

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নতুন রাশিয়ার দুই মহান্ নেতা
লেনিন ও ষ্ট্যালিন

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৫শ বর্ষ | চৈত্র ১৩৫৯ | ১২শ সংখ্যা

চৈত্র

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটার পালা ফুরিয়ে এলো ফুলের বাগিচায় ;
শেষ ক'রে সব সাজের বাহার আজ বসন্ত যায়।
সবুজ সে-শ্যাম উত্তরী তা'র
গৈরিকেতে ওই একাকার,
বৈরাগীটির বিদায় এবার বন-বনান্ত গায়।

সজ্‌নে-শাখায় বেণীর দোলন ব্যাকুল বারংবার ;
দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ের বেদন বাজায় সারং তা'র।
চৈত্র কাঁদে পত্র-ঝরায়,
দীপ্ত দুপুর আগুন ছড়ায়,
কুঞ্জবনের গুঞ্জরণের গান যে ক্ষান্তপ্রায়।

ঝগড়াটে পড়ুয়া

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

টুটুল আর পিন্টুর পড়ার ঘরে নামতা দাদা আর শুভঙ্করী আগেই এসেছিল, তার পর ঢুকেছে অ-আ-ক-খ। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতেই অ ঘরে ঢুকেছে।

অ : সে আমরা জানি; না আঁচালে বিশ্বাস নেই। না হয় আগেই আঁচিয়ে নেবো। কিছু মনে ক'রো না টুটুলদি, একটু দেরী হয়ে গেল। ঠাঁই হয়েছে?

টুটুল : ঠাঁই! কিসের ঠাঁই? তোমরা কারা?

অ : আমরা অ-আ-ক-খ। কোরাস্ মাষ্টার। সকাল সন্ধ্যে ঘরে ঘরে কোরাস্ শোন নি?

পিন্টু : তা এখানে কেন মরতে এসেছ? এটা কি যাত্রার দলের আখড়া?

অ : কেন, ঐ যে শুভঙ্করী বল্‌লে এখানে নেমন্তন্ন—জলসা? তাই তো গান শোনাতে এলাম।

টুটুল : ও, সেই অ-য় অজগর? ছ্যাঃ, বিচ্ছিরি।

পিন্টু : "উট চলেছে মুখটি তুলে"—উট কই?

অ : সে আসে নি—তার কুঁজ কট্‌কট্ করছে।

পিন্টু : চন্দরবিন্দু?

শুভ : তাও জানো না? তাকে পেঁচোয় পেয়েছে। তা ছাড়া পেত্নী পিসির বাড়ী নেমন্তন্ন—পেল্লায় কাজ! সময় কই?

টুটুল : অনুস্বর তো আসতে পারতো?

অ : কি কথাই বল্‌লে! কি করে সে আসবে? এখানে তার চাকরী মিল্‌ল না—সে এখন হংকং সাংঘাতিক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে নানকিং গেছে। রেডিও টেলিফোনে তাকে চুংচাং বা হোংলানে পেতে পারো। চীনেরা তার আদর জানে। দেশে সে আর আসছে না।

নামতা : তা-তা-তা'লে আমার বারোং বারোং তেরোং ষোলোং চ-চ-চলবে কি করে?

পিন্টু : চ-চ-চলবে না তো বে-বে-বেশ হবে। তুমি থামো। আহা-হা-হা-হা, বেচারী অনুস্বরং!

অ-আ ক খ, শুভঙ্করী, টুটুল : (একসঙ্গে) আহাহাহা, বেচারী অনুস্বরং!

নামতা : আহাহাহা,-অ-অ-অ-অনু....

(সকলে)—স্বরং! হোলো তো?

নামতা : আ-আচ্ছা, এবার তা হলে গা-গা-গান হোক।

অ : পইলে কোরাস্—

শু : গণিতি খেয়াল তাল আটচালা। | একসঙ্গে

অ : না না, কোরাস্— | একসঙ্গে

টু : তোমরা সবাই একসঙ্গে কথা ব'লো না। আমার মাথা ধরেছে।

অ : কই, কে তোমার মাথা ধরেছে? উকুন বুঝি? আমাদের ঙ বুড়ীর মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে উকুন—

টু : তোমাকে আর কর্ত্তামি করতে হবে না—উঃ!

না : এই, চুপ্ চুপ্। আমি এবার গা—গা—গান গাইব।

শু : ইল্‌লি! আমি থাকতে তুমি? টুটুলদি, হুকুম কর, খেলুড়ি টপ্‌পা শুনিয়ে দি।

পি : খেলুড়ি টপ্‌পা? সে আবার কি? খেলোয়াড়ী গান? আচ্ছা, ফুটবলের গান জানো?

শু : ইয়েস্ স্যর। কি শুনবে বল। আও-বাহার না মান্না-মল্লার? ভেঙ্কট-কানাড়া না আপ্পা-জয়ন্তী?

পি : সত্যি, শোনাও না একটা—

শু : বেশ, তবে শোন,- স্যর একটু স্যুর দিন; হ্যাঁ—

ইষ্ট বেঙ্গল কি জয়!
সম্মুখে আপ্পা,
পশ্চাতে ব্যোমকেশ,
চঞ্চল চঞ্চল—এই বুঝি হয় শেষ!
আও বলে, হায় হায়,
বুঝি আজ মান যায়,
ধনরাজ করে পাস্,
সত্তার ল্যাংচায়।

সালে ভাই করে হেড্,
আপ্পাও মারে শট্,
ঠকে গেল মান্না,
গোল দিল ভেঙ্কট।

পি : (ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে) এই, মোহনবাগান হারবে না। শুনবো না তোমার গান। চুপ্।

না : চু-চু-চুপ্! মো-মো-মোহনবাগান হারবে না।

শু : ওঃ, বেশ কথা। তুমি বুঝি মোহনবাগান? তা বেশ কথা। মান্না-মল্লার শোন, য়্যায়সা বৃষ্টি নামিয়ে দেবো, ইষ্টি বেঙ্গলের, ব্যস্, সাড়ে বারোটা। এই, ধর তো—

ঘটকের ঘটে কিছু নাই রে,
কেঁদে বলে, ব্যোমকেশ ভাই রে!
বশিথের কিক্ হাই
ছুটে চলে সাঁই সাঁই,
ফ্যাল্ ফ্যাল্—সালে
দেখে তাই রে!

ঘটকের ঘটে কিছু নাই রে।
হেড্ করে সত্তার,
রায় বলে, ছুত্তার,
রুনু যদি মারে—
ঠকে যাই রে!
ঘটকের ঘটে কিছু নাই রে।

টু : এইও, চুপ্! খবরদার, মান্না-কান্না গেয়েছ কি মরেছ। তার চেয়ে ভেঙ্কট-কানাড়া গাও।— ইষ্ট বেঙ্গল হারবে না।

অ : হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেঙ্কট-কানাড়া—

পি : না, আও-বাহার—

(ভীষণ হট্টগোল—হঠাৎ সবাই একসঙ্গে চুপ। তারপর?)

হকি খেলার গল্প

শ্রীঅমলকুমার মিত্র, বি. এ

কলকাতায় হকির মরশুম সুরু হয়েছে।

হকি খেলায় ভারতবর্ষ বিশ্বজয়ী। গত ২৪ বছর ধরে পৃথিবীর কোনও দেশ এ খেলায় তাদের হটাতে পারে নি। কাজেই এই হকি খেলার ইতিহাস জানতে তোমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

পারস্য দেশেই হকি খেলার প্রথম প্রচলন হয়, যদিও সে খেলার সঙ্গে এখনকার দিনের খেলার সাদৃশ্য প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রীকদের অলিম্পিক প্রতিযোগিতাতেও এক রকমের বাঁকনো লাঠি দিয়ে বল পেটান হ'ত; বৃটেন্-বিজয়ী রোমান্‌রাও এক ধরণের হকি খেলত। কাঠের কিংবা হরিণের চামড়ায় তৈরী বল্ দিয়ে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান্‌রাও কয়েক হাজার বছর ধরে হকি খেলেছে শুনতে পাওয়া যায়। হরিণের ঠ্যাং হ'ত হকি-স্টিক। আয়ারল্যাণ্ডের হার্লি, স্কটল্যাণ্ডের সিন্টি এবং ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের ব্যাণ্ডি বর্ত্তমান হকি খেলার পূর্ব্বপুরুষ।

এই তো গেল আগেকার দিনের হকি খেলা। আজকাল যে হকি খেলার সঙ্গে আমরা সকলে সুপরিচিত তার ইতিহাস বেশী দিনের নয়—এই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ধর। কিন্তু তখনও খেলোয়াড়ের সংখ্যা আর খেলার মাঠে তাদের "পোজিশন্" সব সময়ে ঠিক থাকত না। দড়ির বল্ আর "অ্যাস্" স্টিক ব্যবহৃত হ'ত; খেলা চলত লম্বা মারের সাহায্যে, দ্রুতগতিতে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ব্ল্যাক হিথ ক্লাব নামে যে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটিই প্রথম সুগঠিত হকি ক্লাব। আস্তে আস্তে আরও কয়েকটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ক্লাব ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে হকি খেলা পরিচালনা করতে থাকে। অবশেষে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, বিখ্যাত উইম্বলডন ক্লাব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়ম-কানুনগুলি হকি খেলোয়াড়েরা গ্রহণ করে এবং সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত সব খেলা এই নিয়মই মেনে আসছে। হকি-স্টিকের ব্লেড আগে আড়াই ইঞ্চি চওড়া হ'ত। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আধ ইঞ্চি কমিয়ে তাকে দুই ইঞ্চি করা হয়। এতে খেলোয়াড়দের পক্ষে তাড়াতাড়ি বল্ পাস্ করে দিতে সুবিধা হয়ে পড়ে।

দেখতে দেখতে হকি খেলা বেশ জনপ্রিয় হতে আরম্ভ করে, গঠিত হয় হকি এসোসিয়েশন্।

এই এসোসিয়েশনের সুগঠিত নিয়ম-কানুনের দরুণই এই খেলাতে এখনও তেমন পেশাদারী প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নি।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড বনাম আয়ারল্যাণ্ডের প্রথম আন্তর্জাতিক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হয় ওয়েলস্ বনাম ইংল্যাণ্ডের। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্—এই তিনটি দেশ মিলে আন্তর্জাতিক হকি বোর্ড গঠন করে।

ইতিমধ্যে অন্যান্য দেশেও এই খেলা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতে তো বটেই, তা ছাড়া, পাকিস্তান, ফ্রান্স, জাপান, ডেনমার্ক, জার্মেনী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, আফগানিস্থান, নিউ জিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউ. এস. এ. প্রভৃতি দেশেও।

ফুটবলের মত হকি কেবল পুরুষদের একচেটিয়া খেলা নয়। মহিলাদের মধ্যেও খেলাটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জ্জনে সমর্থ হয়েছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মার্গারেট হল্ এবং সামারভিল হলের ছাত্রীরা হকি খেলতে শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে আয়ারল্যাণ্ডের মহিলারাও হাতে হকি-স্টিক নিয়ে খেলার মাঠে নেমে পড়েন। মহিলাদের হকি এসোসিয়েশন্ ১৮৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ১৯১৪ সালের আগে পর্য্যন্ত হকি এসোসিয়েশন এদের মেনে নিতে রাজী হয় নি। ইতিমধ্যে হল্যাণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মেনী, সুইটজারল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস, নিউ জিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রাশিয়াতেও মেয়েদের হকি খেলার রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষেও। এ বিষয়ে বোম্বাইএর মেয়েরা অন্যান্য রাজ্যের মেয়েদের চাইতে এগিয়ে গিয়েছে। তবে এংলো ইণ্ডিয়ান্ মেয়েরাই এতে বেশী উদ্যোগী। এই সেদিনও আন্তঃপ্রাদেশিক মহিলা হকি-প্রতিযোগিতায় তারা তীব্র প্রতিযোগিতার পর পশ্চিম বাংলাকে পরাজিত করেছে। আন্তর্জাতিক মহিলা হকি-প্রতিযোগিতায় ইংল্যাণ্ডের কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক। ১৯২০ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যত আন্তর্জাতিক মহিলা হকি-প্রতিযোগিতা হয়েছে তাতে ইংল্যাণ্ডের মহিলা একাদশ কেবল একবার। ১৯৩৩ সালে, স্কটল্যাণ্ডের কাছে। পরাজয় স্বীকার করেছে।

মহাকালের পূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—ষোল—

উত্তরাপথের বৃহত্তম সাম্রাজ্য মগধের রাজপ্রাসাদ। চাণক্য তোরণে এসে দাঁড়াতেই প্রতিহারী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো,—আপনি কি চান?

—সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী।

—পরিচয়?

—পঞ্চনদের গোল্ল গ্রামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত।

প্রতিহারী তৎক্ষণাৎ তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেল। পরিষদ্-কক্ষে তাঁকে পৌছে দিয়ে প্রতিহারী বললো,—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্রাটের দর্শন পাবেন।

প্রতিহারী চলে গেল। চাণক্য দেখলেন গৃহমধ্যে কয়েকখানি মৃগচর্ম বিছানো আছে, আর সম্মুখে আছে চন্দন কাষ্ঠ নির্মিত একখানি উচ্চাসন। চাণক্য সেই উচ্চাসনে গিয়ে বসলেন। চাণক্য সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু পাণ্ডিত্য থেকে যে বিনয় জন্মে সেটুকু চাণক্যের ছিল না। পাণ্ডিত্যের অহংকার ছিল তাঁর মনে, সেই জন্য নিম্নে অজিনাসনে তিনি বসলেন না। নম্রতাই যে প্রার্থীর শ্রেষ্ঠ গুণ তা তিনি বিস্মৃত হলেন।

কিছুক্ষণ পরে সম্রাট্ পার্ষদদের সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন; দেখলেন রাজাসনের উপর বসে আছেন এক খর্বকায় ব্রাহ্মণ। সম্রাট্ বিরক্ত হলেন, বললেন,—ব্রাহ্মণকে আসন দাও।

সম্রাটের পার্শ্বরক্ষী তৎক্ষণাৎ অন্যত্র থেকে একখানি কাষ্ঠাসন নিয়ে এলো। আসনটি সামনে রেখে নম্রভাবে বললো,—দ্বিজবর, আপনি এই আসনে উপবেশন করুন।

আসনটি ছিল নীচু; চাণক্য নেমে বসলেন না, হাতের কমণ্ডলুটি তার উপর রাখলেন।

পার্শ্বরক্ষী আর একটি আসন আনলো।

চাণক্য জপের মালাটি তার উপর রাখলেন।

পার্শ্বরক্ষী আর একটি আসন আনলেন।

চাণক্য তার মুখের পানে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলেন, কিন্তু আসন ছেড়ে উঠলেন না।

এবার একজন পার্ষদ বললো,—ব্রাহ্মণ; এটি সম্রাটের আসন। সম্রাট্ দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি অন্য আসন গ্রহণ করুন।

চাণক্য বললেন,—ব্রাহ্মণ নিম্নাসন গ্রহণ করতে পারেন না।

—সম্রাট্ ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ, সম্রাট্ প্রজাপালক। ব্রাহ্মণ সম্রাটের প্রজা—সম্রাটের পুত্রতুল্য। প্রজাপালকের আসন প্রজার উপরে।

—ব্রাহ্মণের আসন সম্রাটের উপরে।

—সত্যিকারের ব্রাহ্মণের আসন সত্যই সম্রাটেরও উপরে। তবে তিনি হচ্ছেন 'ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ'। কিন্তু আপনি হচ্ছেন 'বিপ্র', কলিযুগে আপনারা ব্রাহ্মণ বলে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান থাকলে আপনি রাজদ্বারে প্রার্থী হয়ে আসতেন না, সম্রাট্ স্বয়ং আপনার দ্বারে যেতেন।

—ব্রাহ্মণ, শত দোষ হলেও ব্রাহ্মণ। কলিযুগেও ব্রাহ্মণ।

—তাই নাকি? কই, দেখাও দেখি তোমার ব্রহ্মতেজ? বলে একজন পার্ষদ চাণক্যের শিখাগুচ্ছ ধরে এক টান মেরে রাজাসন থেকে নামিয়ে দিল। সকলে হো হো করে হেসে উঠলো।

আর একজন বললো,—এসেছ তো ভিক্ষা চাইতে, অত লম্বা লম্বা কথা কিসের বাপু?

চাণক্য এতখানি অপমানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। রাগে সারা দেহ থরথর করে কাঁপছিল। কয়েক মুহূর্ত তিনি কোন কথা খুঁজে পেলেন না, তারপর সহসা বারুদের মত ফেটে পড়লেন। বললেন,—ওই আসন থেকে তোমরা আজ আমাকে অপমান করে নামালে, তোমাদের সম্রাট্‌কেও যদি আমি এইভাবে ওই আসন থেকে নামিয়ে না আনতে পারি তাহ'লে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান নই। আমি দেখিয়ে দেব যে কলির ব্রাহ্মণেরও ব্রহ্মতেজ আছে কি না।

কমণ্ডলু ও জপের মালা পড়ে রইল, চাণক্য বাহির হয়ে গেলেন।

পিছনে পার্ষদের আর একবার উচ্চহাসির ধ্বনি শোনা গেল। চাণক্য আর পিছন পানে তাকালেন না।

—সতেরো—

নরক। মগধের ভারতপ্রসিদ্ধ ভয়াবহ কারাগার। প্রাসাদের নিম্নতল। পাষাণ দিয়ে তৈরী ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। দিনের বেলায় আলোর আবছা আভাস আসে কিন্তু আলো আসে না। বাহিরের বাতাসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। গ্রীষ্মের দিনে অসম্ভব গুমোট, শীতের দিনে মাটির নীচের সেঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। বাহিরের জগতের সঙ্গে এখানে কোন সম্পর্ক নেই। দিনে দু'বার শুধু প্রহরীর মুখ দেখা যায়,—দরজার পাশের ফোকরটি দিয়ে একখানি রুটি আর এক ভাঁড় জল দিয়ে চলে যায়। ভিতরের মানুষটি মরলো কি বাঁচলো সেটুকুও সে একবার উঁকি মেরে দেখে না।

অবশ্য এখানে যে একবার ঢোকে সে, বিশেষ দুর্ভাগা না হ'লে, দীর্ঘ দিন বাঁচে না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেহের হাড় ক'খানি চামড়ার নীচে থেকে ফুটে ওঠে, মাথার চুলগুলি সাদা হয়ে যায়, চোখে আর আলো যায় না। তারপর একদিন প্রহরী দেখে, কয়েদী আগের-বারে-দেওয়া খাবার স্পর্শ করে নি, তা যথাস্থানেই পড়ে আছে। তখন সে উঁকি মেরে দেখে; কিন্তু কয়েদীর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, কাজেই সে কিছুই করে না। দু'-চার দিনের মধ্যে যখন দেখা যায় পিপীলিকার সারি মৃতদেহটিকে ছেঁকে ধরেছে তখন সে ডোম ডেকে আনে মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাবার জন্য। জীবন্ত লোককে পাঠানো হয় এই কারাগারে, বাহির করে নিয়ে যাওয়া হয় তার মৃতদেহ।

এই ভয়াবহ কারাগারে কাত্যায়নের স্থান হয়েছিল। কিন্তু এই কারা-ভোগের দুর্ভোগ তাঁর একার হয় নি, হয়েছিল তাঁর কিশোর পুত্রেরও। একাকী কারাক্লেশ সহা হয়তো খুব কঠিন, কিন্তু পুত্র সঙ্গে থাকায় কাত্যায়নের পক্ষে তা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দৈহিক ক্লেশের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল মানসিক ক্লেশ।

আর কেউ হ'লে এই দুঃসহ ক্লেশের মধ্যে ভেঙে পড়তো, কিন্তু কাত্যায়ন ছিলেন বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ, পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে তিনি সব কষ্টই সহ্য করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। মনকে তিনি বাহিরের পরিবেশ থেকে তুলে নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক করার জন্য সচেষ্ট হলেন। মনকে দৃঢ় রাখার জন্য তিনি কাজ খুঁজে বের করলেন, সুরু করলেন ছেলেকে নিয়ে বেদান্ত অধ্যাপনা। বল্লেন,—দেখ, এখানে ভয় পাবার কিছু নেই। জীবনটাই একটা মায়া। এই পৃথিবীতে জন্মাবার আগে আমরা কোথায় ছিলাম তা আমরা জানি না, আবার মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব তা-ও আমরা জানি না। জন্ম থেকে মৃত্যু—এর মাঝে কয়েকটা বছর আমরা এই জগৎটাকে সত্যি বলে মনে করি, এখানকার লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখকে খুব বড় বলে মনে করি। কিন্তু এইখানেই আমরা ভুল করি। মৃত্যুর পর কোথায় থাকবে আমাদের এই জগৎ? এই কারাবাসও তেমনি। এখানে আসার আগে আমরা ছিলাম মুক্ত, এখান থেকে বেরুবার পরেও আমরা মুক্ত। মাঝে এই ক'দিনের কষ্ট বড় করে দেখলে আমাদের ভুল হবে।

পুত্র সব কথা না বুঝলেও কারাগার থেকে যে মুক্তি পাওয়া যাবে সে কথাটি তাকে চঞ্চল করে তোলে, বলে,—এই কারাগার থেকে আমাদের ছেড়ে দেবে বাবা! কবে?

—ছেড়ে দিতে হবেই, তবে কবে তা আমি ঠিক বলতে পারি না।

ছেলেটির আর উৎসাহ থাকে না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে। কাত্যায়নও অন্যমনস্ক হয়ে যান। কাত্যায়নের মনে তখন অন্য প্রশ্ন জাগে—সত্যই কি জীবনটা মায়া? জগৎ অলীক? তাহ'লে এই জীবনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান ও পুণ্য অর্জন করার কথা ওঠে কেন? যা স্বপ্নের মত অলীক তার মধ্য দিয়ে সত্যে গিয়ে পৌছাব কেমন করে? যদি স্বপ্নে আমরা দেখি কেউ আমাকে গালি দিচ্ছে কি মারছে—তাহ'লে কি প্রভাতে উঠে আমি তাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করতে পারি? জীবনটাও যদি স্বপ্ন হয়, তাহ'লে এই জীবনে যে পাপ বা পুণ্য আমরা অর্জন করবো পরকালে তার ফল লাভ করবো কেমন করে? জীবনটা যখন মায়া, তার অর্জিত পুণ্যটাও তো মায়া! কিন্তু মোক্ষটা যদি সত্য হয় তাহ'লে মায়ার ভিতর দিয়ে সত্যে পৌছাব কেমন করে? স্বপ্নে-পাওয়া অর্থ দিয়ে কি বিপণি থেকে পণ্য কেনা যায়? তাহ'লে?

কাত্যায়ন বেদান্তের সমস্যার মধ্যে ডুবে যান। সময়ের জ্ঞান থাকে না। কোন এক সময় পুত্র পিতার গায়ের উপর ঢলে পড়ে, কাত্যায়নের চমক ভাঙ্গে। পুত্রকে কোলের কাছে টেনে নেন, বলেন,—আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমো।

পুত্র ঘুমিয়ে পড়ে, পিতার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। চুপ করে কাত্যায়ন বসে বসে ভাবেন। চারিপাশের অন্ধকারের মধ্যে যে কোন আলোর দিশা খোঁজেন। সারাটা রাত তাঁর বসে বসেই কাটে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে হয়তো কোন সময় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যই।

প্রত্যূষে যখন ছেলেটির ঘুম ভাঙ্গে, চোখ মুছতে মুছতে সে ভালো করে ঠাহর করার চেষ্টা করে যে সত্যই তখনও রাত শেষ হতে বাকী আছে কি না। তারপর পিতার পানে তাকিয়ে সহসা বলে ওঠে,—বাবা, আমার ভয় করছে।

—ভয় কি ? আমি যে আছি।

—এখানে আর কতদিন আমাদের থাকতে হবে বাবা ?

—তা তো জানি না।

—তোমাকে কিছুই বলে নি ?

—না।

—আমরা কি করেছি, বাবা, যে ওরা এখানে আমাদের আটকে রেখেছে ? যারা চুরি করে, যারা খুন করে তাদেরকে তো এখানে আটকে রাখে। তুমি তো, বাবা, ঠাকুর পূজা কর, তোমাকে এখানে আটকে রাখলে কেন ?

—শুধু চুরি করলে আর খুন করলেই এখানে আটকে রাখে না বাবা, আর একদল লোককেও এখানে আটকে রাখে—যারা চুরি বন্ধ করতে চায়, খুন করা বন্ধ করতে চায়।

বালক কথাটা ঠিক বোঝে না, পিতার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। কাত্যায়ন তাকে বুঝিয়ে বলেন,—সাধারণ লোক যখন খুন করে তখন যে হয় দোষী, তাদেরকে সাজা দেওয়া হয়, কারাগারে রাখা হয়। কিন্তু রাজা যখন খুন করেন, যদি কেউ সেটাকে অন্যায় বলে, তাহ'লে সে হয় রাজদ্রোহী। তখন তাকেও কারাগারে রাখা হয়।

—অন্যায়কে অন্যায় বললেও কারাগারে রাখা হবে ?

—অন্য কেউ অন্যায় করলে বলা চলবে, কিন্তু রাজা অন্যায় করলে বলা চলবে না। কারণ কারাগার রাজার। যে বিচার করে সে রাজার মাইনে-করা লোক। রক্ষী ও সৈন্যেরা রাজার মাইনে পায়। কাজেই রাজার স্বার্থ রেখেই তারা কাজ করে।

—তাহ'লে রাজা অন্যায় করলে তার বিচার হবে না ?

—রাজার উপরে তো কেউ নেই যে বিচার করবে।

—তাহ'লে রাজার সাজা হবে না ?

—রাজার সাজা হয় তখন যখন তার চেয়েও শক্তিমান্ কোনও রাজা লড়াই করে তাকে হারিয়ে তাকে রাজ্যচ্যুত করে। যেমন আমরা দেখতে পাই মহাভারতে কৌরবদের অনাচার শেষ করেন পাণ্ডবেরা।

—যদি তেমন শক্তিমান্ রাজা কেউ না থাকে ?

—তাহ'লে বিচার হয় না।

বালক আপন মনে কি যেন ভাবতে থাকে, কাত্যায়নও মাথায় হাত রেখে চিন্তামগ্ন হন।

(ক্রমশঃ)

যাঁদের লেখা তোমরা পড়

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

৭

ছেলেবেলার কথা—

দুপুর। বাড়ির সামনে বড় আমগাছটির ছায়ায় বসে রূপকথার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাড়ির সামনের পথ জনহীন, অদূরে নদীর ঘাটে একখানি ডিঙি বাঁধা, নদীপারে ধূধূ বালুচর। তার শেষে ধূমল গ্রামরেখা। পাতার আড়ালে ঘুঘুর অবিরাম সকরুণ অলস সুর চারধারে ঝরে পড়ছে। কিন্তু চোখে এ দৃশ্য নেই, কানেও এ সুর পৌঁছচ্ছে না, বইয়ে লেখা রূপকথার রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

দেখছি সোনার গাছে হীরের ফুল, মুক্তোর ফল, নীল সায়রের তলায় সোনার রাজবাড়ী, সাদা পক্ষিরাজ ঘোড়া ডানা মেলে নীল আকাশপথে উড়ে চলেছে, সৎমায়ের গঞ্জনা, রাজকুমার ও রাজকুমারীর চোখে জল টলটল করছে—এমনই আরও কত কি! দুঃখ-আনন্দ দুই-ই যেন দুটি ভাই, মনের পথে বাঁশি বাজিয়ে আনাগোনা করছে। এ গল্প তো স্নেহময়ী মাতামহীর মুখেও শুনেছি। কিন্তু তখন যে রকম লেগেছিল বইয়ে পড়তে পড়তে লাগলো আর এক রকমের। কিন্তু কোন দিনই ভুলতে পারি নি জানি, তোমরাও শুনে ও পড়ে ভুলতে পার নি, বিশেষ করে দুঃখ পেলে রূপকথার পথে মন ছুট দেয়—যেখানে অবিচার ও অত্যাচার রাক্ষসের মতো তোমাদেরই কাছে হার মেনে তোমাদেরই সামনে লুটিয়ে পড়ে। অত্যাচারী, উৎপীড়নকারী যত ছদ্মবেশেই থাক, অন্তিমে নিজ রূপ ধারণ করে প্রাণত্যাগ করে। তোমাদেরই জয় হয়ে থাকে। লেখকের নাম তখন প্রধান ও স্মরণীয় হয়ে মনে থাকে না, থাকে গল্পের বিষয়বস্তু ও লেখকের প্রকাশভঙ্গী।

আবার, কর্মজীবনে মৈমনসিংহ জেলার এক অঞ্চল থেকে মাঝে মাঝে একখানি বইয়ের বিজ্ঞাপন আসতো, সে যেন কবিতার টুকরো। যেমন সুন্দর হস্তাক্ষর, তেমনই তার জায়গায় জায়গায় লাল, নীল পেনসিলের নির্দেশ-দাগ। সব মিলিয়ে যেন একখানি ছবি। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকতো—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। বিজ্ঞাপন আসতো আমার হাতেই, আমাকেই উদ্দেশ

করে ছোট ছোট পত্র। কী সুন্দর তার ভাষা! কী সুজনতা প্রকাশ পেত তাতে! যেন আমি বয়স্ক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্বোধনও এমন মর্য্যাদাদায়ক। ভাবতাম, যদি আমাকে দেখেন তখন হয়তো এ মর্য্যাদা হ্রাস পাবে।

তারও বহু বছর পরে দেখা হ'ল এক শিশুশিল্প-প্রদর্শনীতে। দক্ষিণারঞ্জন হয়ে এলেন সভাপতি। আমাকে দেখলেনও, তু-একটি কথাও বললেন, কিন্তু পুরোনো দিনের কোন কথাই তাঁর মনে পড়লো না; পড়বার কথাও নয়। বক্তৃতা দিলেন; কিন্তু তিনি বক্তা ন'ন, কবি, মনোজগতের স্বপ্নময় পরিবেশে ঘোরাফেরা করেন। সেখানকার সুর ও ভাষা, সেখানকার রঙ ও রেখা, সেখানকার রূপ ও শ্রী, সেখানকার মধু ও সৌগন্ধ সাধারণের নয়, তাদের তা উপলব্ধিরও সামর্থ্য নেই। কাজেই তা শিশিরের মতো মনের বনে যেন আগোচরে পড়ে ক্ষাণিক টলটল ঝলমল করে মিলিয়ে গেল।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

কবিগুরু লিখে গেছেন —

"কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান
বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদেয় এল বান।"

আজও তো বাংলার ঘরে ঘরে রজনীতে মায়ের কণ্ঠ বেয়ে শিশুর কানে ঘুম-পাড়ানী সুরের সঙ্গে "বৃষ্টির টাপুরটুপুর" জলছন্দ প্রবেশ করে তাকে ঘুমের দেশে নিয়ে যায়। এ গান যেই বাঁধুক সে এক সুদূর অতীত কালের ঘটনা। বাংলার গ্রামে ও নগরে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল ছিন্ন মুক্তোর মালা সদৃশ রূপকথা। তার কতক দক্ষিণারঞ্জন, কতক লালবিহারী দে, কতক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী কুড়িয়ে সযত্নে মালা গেঁথে বঙ্গবাণীর কণ্ঠে তুলিয়ে দিয়েছেন—যার দ্যুতি ও শোভা চির-অম্লান। তুর্ভাগ্য যে লালবিহারী দে যে ভাষায় রূপকথাগুলি রূপান্তরিত করেছিলেন সে ভাষা প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালিনী হলেও আমাদের সুমিষ্ট মাতৃভাষা নয়। আর, তা বিদেশী পাঠকগণের জন্য রচিত হয়। তাই তাকে আমরা ভুলতে বসেছি। এই প্রসঙ্গে একজন চিত্রশিল্পীর নামও উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তিনি হলেন শ্রীত্রিভঙ্গ রায়। রাঙামাটিময় বর্ধমান অঞ্চল থেকে মুক্তাসদৃশ কতকগুলি রূপকথা সংগ্রহ করে তিনি বাংলার শিশুদের উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলির মধ্যে সার্বজনীন সুর ও রসের কিঞ্চিৎ অভাব। তবুও সেগুলি মধুময়। কোন্ সে কবির অন্তরসিন্ধু থেকে কোন্ কালে এই সকল মুক্তা উঠে বাংলার গ্রামে ও নগরে ছড়িয়ে গেছে কে বলবে? কে বলবে, তাঁরা নিরক্ষর ছিলেন কিনা, তাঁদের জীবন অনশনে ও অনটনে কেটে গেছে কিনা। আজও তো কত নিরক্ষর ও দরিদ্র কবি ও শিল্পী গান ও শিল্প সৃষ্টি করচেন, কত গ্রাম্যিকের গল্পের ঝরণাধারা পানে কত জন শীতল ও স্নিগ্ধ হচ্ছে! আর, এঁদের অধিকাংশই হয়তো তথাকথিত নিম্নবর্ণের। যে কালে রূপকথার সৃষ্টি হয়েছিল সে কাল গিয়েছে কিন্তু যা সৃষ্টি হয়েছে তা কোন কালেই যাবে না এবং যাঁরা সেগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন দেশের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের নামও অক্ষয় হয়ে ক্রমেই বিস্তার লাভ করবে।

এই প্রসঙ্গে যদি বলি দক্ষিণারঞ্জন ও লালবিহারী যে রূপকথাগুলি সংগ্রহ করেছেন সেগুলি একই শ্রেণীর—তাহ'লে অবান্তর হবে না। ত্রিভঙ্গ রায়ের রূপকথায় এতখানি জাঁকজমক ও শ্রীসম্পদ্ না থাকলেও সেগুলি উপেন্দ্রকিশোরের সংগৃহীত রূপকথার মতো নিরাভরণা ও সাধারণ নয়। শেষোক্তগুলি সারল্যে অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন রূপকথা-কারের নামোল্লেখ করা যেতে পারে,—যেমন ৺শিবরতন মিত্র, শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রূপকথা কাদের মনোরঞ্জনার্থে সৃষ্ট হয়েছিল কে বলবে? এগুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত হলেও কিন্তু একালে সকল দেশেরই শিশুমহলের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। তবে হ্যান্স অ্যান্ডারসন্-সৃষ্ট কতকগুলি রূপকথা বয়স্কদেরও সুন্দর কবিতার মতো মুগ্ধ করে। থাক্, রূপকথা নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু সে সব তোমাদের ভাল নাও লাগতে পারে, তাই আবার দক্ষিণারঞ্জনের কথা বলি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

পাকিস্তানের অধিবাসী হলেও তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অনেকগুলি বছর কেটেছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। বর্তমানে তিনি পরিণত বয়সে কলিকাতার অধিবাসী। তাঁর সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক কথা জানা আছে। সবাই জানে তিনি শিশুসাহিত্যিক। কিন্তু তাঁর রূপকথাগুলি পল্লীবাংলার কথাসাহিত্য আর তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু হয় বয়স্কদের জন্য সাহিত্য রচনায়। কাজেই তোমরাই বিচার করে দেখ তিনি শিশুসাহিত্যিক কি না। আজকাল বাংলা ভাষার গ্রন্থে তিনরঙা ছবির বড় ছড়াছড়ি, সে জন্য প্রকাশকে প্রকাশকে পাল্লাপাল্লি। কিন্তু দক্ষিণা বাবুর আগে বাংলা গ্রন্থে তিনরঙা ছবি কেউই ছাপেন নি। তবে বাংলায় পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রবাসী পত্রিকাতেই প্রথম তিনরঙা ছবি ছাপা হয়েছিল। দক্ষিণা বাবুর গ্রন্থে যে সব ছবি দেখে থাক সে সব কার আঁকা জান? তাঁরই।

কিন্তু আজ জীবনসায়াহ্নে তাঁর দীর্ঘশ্বাসে ও অশ্রুজলে সোনার গাছে হীরের ফুল পরিসিক্ত হয়ে বেদনায় তুলছে, নীলসায়রে ঢেউ উঠে হাহাকারে হৃদয়কূলে আছড়ে পড়ছে। তাঁর একমাত্র পুত্র ও আমাদের সহকর্মী রবিরঞ্জন অকালে পরলোক গমন করেছেন! বৃদ্ধ তাঁরই স্মৃতিভারে আজ অতি ভারাক্রান্ত।

বেদনার কথা থাক্। তাই বলে যে হাসির কথাও লিখতে পারবো এমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নেই, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগও পার হয়ে গেল। এখন আর লাঠি, তামাকু, আলবোলা ইত্যাদির গুণগান কেউ করে না, করতেও পারে না, করার দরকারও নেই। তাই আমি ইকমিক কুকার সম্বন্ধে তু'-একটি কথা বলচি।

ইকমিক কুকারকে আমাদের পাশের বাড়ির খুকু বলে "মিট্‌মিট্ কুকার"। কারণ এত মিটমিটে আঁচে রান্না আর কিছুতেই হয় না, হতেও পারে না।

এই উনুনটিকে কে না দেখেচে, কে না এর নাম শুনেচে ? ভ্রাম্যমাণের সঙ্গী, অম্লরোগীর বন্ধু, রক্তচাপীর সহায়, মাংসবিলাসীর আমিরের, গৃহহীনের পাচক, অলসের পরিত্রাতা এই যন্ত্রটির উদ্ভাবক কে তোমরা কেউ জান কি ? তিনি হলেন আমাদের তরুণ কবি শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের পিতা স্বর্গত ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক। উপেন বাবু কিন্তু তাঁর হাস্যরস-ভরা কবিতাগুলির রসে বিজ্ঞানকে একেবারে রসিয়ে তলিয়ে দিয়েছেন। অথবা উনি হয়তো অন্তরে বৈজ্ঞানিক, তাই অমন হাস্যরসাত্মক কবিতা লিখে শ্রোতা ও পাঠক-পাঠিকাগণকে প্রচুর হাসিয়ে থাকেন। সুকুমার রায়, লুই ক্যারোলও ছিলেন বিজ্ঞানী। কিছুকাল আগে এই "রামধনুতেই" লিখেছিলাম, "ওঁর মনে আছে যেন হাস্যমল্লিকার অফুরন্ত বন। তারই জমাট নির্যাস কবিতার রূপে প্রকাশিত হয়ে পাঠক-পাঠিকাকে মাতিয়ে তোলে।" এখনও সেই কথার পুনরাবৃত্তি করি এবং সেই সঙ্গে বলি, সেই বনের হাস্যময় স্নিগ্ধ শ্রীও রয়েছে ওঁর মুখে-চোখে। মানুষটি নাতিদীর্ঘ, গৌর ও নধরকান্তি এবং বিদ্যাবুদ্ধিতেও কম ন'ন।

শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী

উপেন বাবু পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী, বয়স চল্লিশের কিছু ওপর কিন্তু মন তরুণ কিশোরের মতো তাজা। কথায় হাসি, মুখে হাসি, লোককে চেষ্টাও হাসাবার। কেবল সাহিত্যসৃষ্টিতে নয়, অভিনয়েও উনি সুনিপুণ। নিপুণতা এতখানি যে ওঁকে কবির মতোই "স্বভাব-নট" বললেও বেশি বলা হয় না।

অভিনয়ের কথা যখন উঠলো তখন 'শ্রীঅ' মানে শ্রীঅখিল নিয়োগীর কথা বলি,—অবশ্য অভিনেতা ব'লে নয়, ছেলেমেয়েদের জন্য নাটক রচনা করেন এবং সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে ঝোঁকটা সেই-দিকেই খুব বেশী ব'লে। অখিল বাবু বোধ হয় স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন এবং বার্ধক্য আসবার আগেই তার প্রতি একটি আকর্ষণ আছে বলেই আরও একটি নাম নিয়েছেন। সেই বুড়োটি পত্রিকার পৃষ্ঠায়, গ্রামোফোন রেকর্ডে, বিজ্ঞাপনে এবং আরও নানা জায়গায় দাড়ি উড়িয়ে দেখা দেয়। শীতের দেশে দারুণ শীতের রাতে বরফের ঝড় মাথায় করে খ্রীষ্টমাসে ছেলেমেয়েদের জন্য উপহার আনে বুড়ো সাণ্টাক্লজ। আর আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দিনে-রাতে ছেলে-মেয়েদের জন্য বুড়ো সেজে উপহার আনছেন অখিল বাবু। তবে উনি বয়সে এখন আর তরুণ ন'ন, বানপ্রস্থে যেতে চাইলে ওঁকে শাস্ত্রমতো বাধা দেয় হেন সাধ্য কারো নেই।

মানুষটি লম্বায় এবং গায়ের রঙে তোমাদের সম্পাদক মশাইএরই মতো (দোহাই মা লক্ষ্মীরা !), কথাগুলি চিরবিজ্ঞের মতো, হাবভাব ধীর এবং মুখে চাপা হাসি,—বিনয়ের, সন্তোষের, বিজ্ঞতার,

বিদ্রূপের, কি কিসের তা বলতে পারি নে। তবে হাসি লেগেই আছে মুখে। চশমার কাচের ওধারে চোখের দৃষ্টির ধরণও ঐ জন্য ঠিক ধরা যায় না। মানুষটি হয়তো একটু প্রচার-প্রিয় কিন্তু খুব মিশুক। এক সময়ে গল্প লিখতেন,—এখনও যে লেখেন না তা নয়, উপন্যাস লিখতেন, কবিতা লিখতেন, ছবি আঁকতেন। গান গাইতেন কিনা জানি না। কিন্তু এ কথা জানি, ওঁর রচিত কয়েকখানি উপন্যাস সত্যই সার্থকসৃষ্টি হয়ে পাঠক-পাঠিকাকে আজও সে-সকল ছবি স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ সেগুলি ছিল বাংলার চিরশ্যাম গ্রামের ও সুমধুর রসময় পল্লীজীবনের। তার মধ্যে আজকের দিনের নীতির পীড়ন নেই, আছে রচয়িতার শিল্পীপ্রাণের প্রকাশ ও দরদ। "মাসপয়লা" সম্পাদনে উনি ছিলেন ক্ষিতীশ বাবুর সহযোগী এবং তাঁর মতোই নতুন কিছুর জন্য উৎসুক।

এখানে আর একটা কথা বলা যেতে পারে। অখিল বাবুর 'বিষ্ণুশর্মা'-ই বোধ হয় বড়দের পেশাদারী রঙ্গালয়ে ছোটদের জন্য রচিত প্রথম নাটক।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ে। ছবি আঁকায়, কবিতা লেখায়, বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য নাটিকা রচনায় তিনিও জীবনের অনেকগুলি বছর কাটিয়ে দিলেন। বয়স্কগণের দৈনিকে তিনিই প্রথম বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বিভাগ পরিচালনা সুরু করেন। তিনি হলেন শ্রীবিমল ঘোষ। তবে একটি বিশিষ্ট পতঙ্গের ছদ্মনামেই তিনি সুপরিচিত। তাঁর আসল নাম বাংলার অন্যতম আধুনিকখ্যাত কবির নামের সঙ্গে অনেক সময়েই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকে। বিমল বাবুর সাহিত্যপ্রতিভা তাঁরই সাংগঠনিক সামর্থ্যের কাছে ম্লান। বয়স অখিল বাবুর সমান না হলেও কম নয়; চেহারাটি বেশ, মেজাজ একটু কড়া। ওটুকুই বোধ হয় হুল, বাকিটুকু সব মোম আর মধু যা কিছু সব ভাঁড়ে জমা।

সংগঠনের কথায় আরও একজনের নাম না করলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে। তিনি হলেন স্বামী প্রেমঘনানন্দ। এত ঘনত্বেও তাঁর কোন রূপ নেই, তিনি একেবারে "অরূপ"। শ্রীভূমির প্রাক্তন অধিবাসী কিন্তু বাংলার ওপর তাঁর প্রবল টান। বাংলা ভাষার যাতে প্রচার হয়, বাঙালীর ছেলেমেয়ে যাতে শক্তিমান্ হয়ে ওঠে এ জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাসিকের মলাটের ছবিই সুন্দরবনের "রয়াল বেঙ্গল টাইগার"! তিনি এর নামও দিয়েছেন "হালুম বুড়ো"। এঁরও "বুড়োমী" অনেক দিনের। তাই ছেলেমেয়েদের নীতি ও লাঠি খেলা সমানে শিক্ষা দিয়ে আসছেন। ভাবছ, তিনি পাকা গুরুমশাই। কিন্তু তা নয়। স্বামী হলেও তিনি শিল্প ও সাহিত্যরসিক।

বয়স পঞ্চাশোর্ধ হলেও তাঁর বানপ্রস্থের প্রয়োজন নেই। কারণ এ কালে হয়তো বনের অভাবেই ও মহৎ ধর্মটি কেউ পালন করে না, বরং ঐ বয়সের পরই বিষয়-বুদ্ধিতে ভাল করে তেল মাখিয়ে, পাকিয়ে তুলে গদি আঁকড়ে বসবার চেষ্টা করে। তার ওপর তিনি তো "স্বামী", পরেন গেরুয়া, সর্বদাই মুক্তকচ্ছ, পায়ে স্যাণ্ডাল, মাথার চুলগুলি কদমছাঁট। দেহও সাধু মহারাজের মতো সুপুষ্ট, সভুঁড়ি নয়—কৃশ, চোখে চশমা, কথাবার্তা অমায়িকভাববর্জিত নয়। মোটের ওপর মানুষটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বেশ কাজের। মাথায়ও সর্বদাই কতকগুলি অদ্ভুত পরিকল্পনা ঘুরচে যা পাগলামো বলে উড়িয়ে দেবার আগে ভাল করে ভাবতে হয়। কারণ ওরই বলে তাঁর সঙ্ঘ সংগঠিত ও সচল, আর ওরই ফলে তিনি স্তুতি-নিন্দা কুড়িয়ে থাকেন।

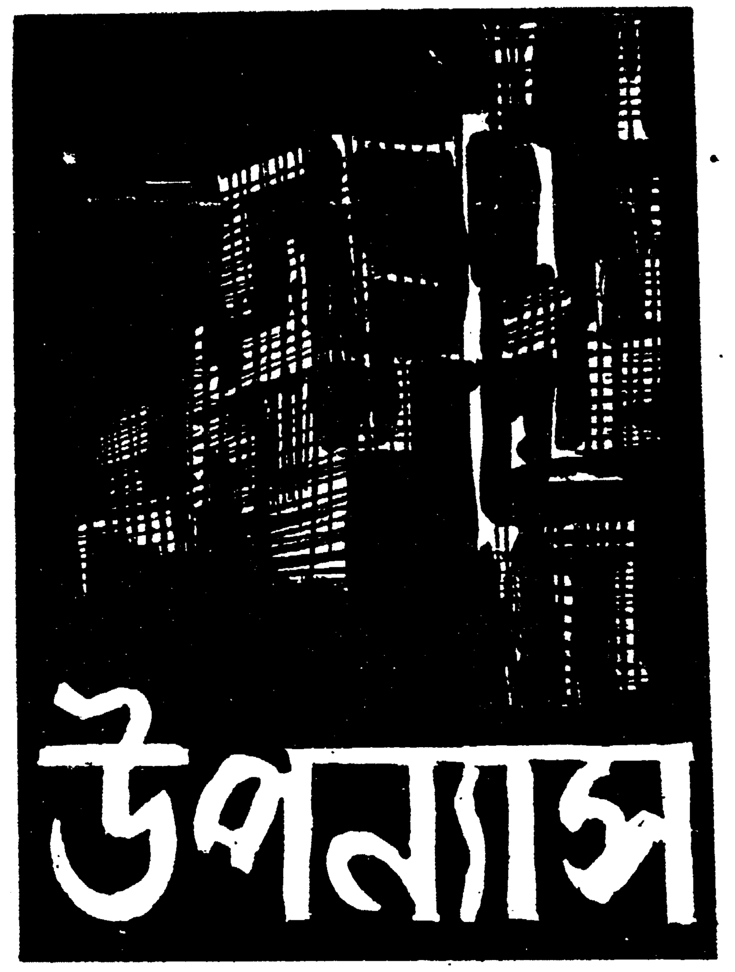

বকধার্মিক

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ

৫

সত্যি, আমারও বুকটা একটু ঢিপ্-ঢিপ্ করছিল, আর আমাদের ক্লাসের মঞ্জির কথা কি বল্‌ব! ন্যাকার একশেষ, তার উপর ওর বাবার মেলা টাকা, নিজেদের মোটর গাড়ি চেপে স্কুলে আসে বলে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। নিত্য নতুন সাড়ি পরা চাই, কানের গয়না বদ্‌লান চাই, ঢং দেখে বাঁচি নে! আবার নিজে সঙ্গে করে টিফিন আনে না, ঠাণ্ডা খাবার খেতে নাকি গা ঘিন্‌ঘিন্ করে, তাই রোজ চাকরে টিফিন-ক্যারিয়ারে ভরে লুচী, চপ্, সন্দেশ – এই সব নিয়ে আসে, আর ও আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খায়। আর টিচারদের খোসামুদি, দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। ঠিক হয়েছে, আজ নিজের খাবার নিজের কাঁধে নিয়ে ডাণ্ডা হাতে আমাদের সঙ্গে আস্‌তে হয়েছে! তবু ন্যাকামির শেষ নেই। "উঃ, লতিকাদি, কি একটা আমার পায়ের উপর দিয়ে সুড়সুড় করে চলে গেল!" আমি বল্‌লাম—"ও কিছু না; সাপটাপ হবে।" বল্‌বা মাত্র "ওঁ বাঁবা!" বলে এক লাফে লাবণ্যদির পাশে। সেখানে মাটিতে পা পড়্‌বা মাত্র, বাবা রে, সে কি চিল্লানি! আরে, কি হ'ল তাই বল্ না। বল্‌বে কি, ঠ্যাং চেপে মাটিতে বসে পড়েছে। অবাক্ হয়ে দেখি, পা দিয়ে রক্তের গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, আর ঠিক তার মাঝখানে লাল-নীল-সবুজ পাথর বসান একটা সোনার পিন বিঁধে রয়েছে। আমাদের কারো মুখে কথাটি নেই। ভয়ে ভয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে লাগলাম।

লাবণ্যদি কিন্তু তখুনি ওর পা থেকে পিনটা টেনে বের করে ফেলে, জায়গাটা বোতলের জল দিয়ে পরিষ্কার ক'রে আইডিন লাগিয়ে, নিজের রুমাল দিয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফেলেছেন। আর মঞ্জির কি ঢং! "ও লাবণ্যদি, আপনি আমার পায়ে হাত দিলেন! দিন দিন, আপনার পায়ের ধূলো, নইলে আমার পাপ হবে।" ছোঃ, সাধে গুপে মেয়েদের ঘেন্না করে!

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হ'লে আমরা সবাই লাবণ্যদিকে ঘিরে পিনটা দেখতে লাগলাম। পিন না, একটা কানের ফুল। লাবণ্যদির হাতে তা'র লাল-নীল-সবুজ পাথর থেকে লাল নীল হল্‌দে সবুজ আলো ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে।

আমরা বল্‌লাম—"ইস্, এ রকম কখনও চোখে দেখি নি।" অমনি মঞ্জিটা বলে উঠ্‌ল—"আমার ঠাকুমার এ রকম মেলা আছে। হার আছে, বাজু আছে, রতনচূড় আছে, কানবালা আছে।" লাবণ্যদি কিছু না বল্‌লেও লতিকাদি বাধা দিয়ে বল্‌লেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে, তোমাদের বড় মানষীর আর ফিরিস্তি দিতে হবে না।" আমিও আর থাকতে না পেরে বল্‌লাম—"আমাদের বুড়ী ঝিরও ও রকম আছে।" লতিকাদি ধমক দিয়ে বললেন,—"তুমিও এবার থামো।"

এতদিনে চোরাই মালের একটা চিহ্ন পাওয়া গেল। এ সব কি আর ব্যাটাছেলেদের কর্ম্ম? আমার বাবাকে ত' রোজ পাঞ্জাবীর বোতাম খুঁজে দিতে হয়। অথচ গুপেটার কি চাল!

একটা জিনিষ যখন পাওয়া গেছে, ওটা নিশ্চয় অসাবধানে পড়ে গেছিল, অন্য জিনিষও তা' হ'লে কাছাকাছিই লুকোনো আছে। সামনেই ভূতের বাড়ি, সেখানেও থাকা আশ্চর্য্য নয়।

মস্ত বাড়ি। আশেপাশে বিশাল বিশাল সব শিশু গাছ। তা'দের ঝোলান পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে আর কি রকম একটা শিরশির শব্দ হচ্ছে। এত ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়েছে গাছগুলো যে তা'দের পাতার মধ্যে দিয়ে ভালো ক'রে রোদ ঢুক্‌তে পারছে না। চারদিক্‌টা কেমন ছায়া ছায়া, দিব্যি গা ছম্ ছম্ করে।

বাড়ীটাও বিশাল। সারি সারি জান্‌লা, তার একতলার অনেকগুলোই ভেঙ্গে ঝুলে রয়েছে; বাতাসে একটু একটু দুল্‌ছে। আর দরজাটা হাঁ করে খোলা।

লাবণ্যদি বল্‌লেন - "এত ভয়ও পাও তোমরা! আরে, এ সব জায়গা পুলিশে ত' সার্চ ক'রে গেছে একবার। তা'দের যত কাণ্ড, দরজাটাকে বন্ধ ক'রে যায় নি পর্য্যন্ত। এখন ঘরে ঘরে বাঘ শেয়ালে আস্তানা করুক।" লতিকাদি সকলের পিছন থেকে বল্‌লেন—"চল, চল, এত আস্তে কেন? ঘরের মধ্যে আরামে ব'সেই খাওয়াদাওয়া করা যাবে।"

ঢুকে ত' পড়লাম। ক্ষিদেও পেয়েছিল দারুণ। এ ঘর ও ঘর করে একটা খাবার জন্য ভালো জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি, কেউ কেউ খিড়কী পুকুরে গেছে হাত-পা ধু'তে। হঠাৎ হাউ মাউ। কি জ্বালা! কে নাকি বারান্দার ধূলোতে পায়ের ছাপ দেখেছে! এমন ভীতু হয় মেয়েরা! লতিকাদি সিঁড়ির কাছ থেকে

হঠাৎ সরে এসে বল্‌লেন—"ওপরে লোক আছে।" আমরা ত' তখুনি যে যা'কে পারি জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু লাবণ্যদি বল্‌লেন—"চল, ওপরে গিয়ে দেখে আসি; দেখ্‌তেই ত' এসেছি।"

উপরটা একটু অন্ধকার মত, জান্‌লা-টান্‌লা খোলা নেই। দু'-একটা যা ভেঙ্গে রয়েছে তারই মধ্যে দিয়ে একটু একটু আলো আসছে। যেখানেই যাই, মনে হয় এই একটু আগে কেউ ছিল, এখুনি চলে গেছে। যে দিকে তাকাই মনে হয় সেদিক্ থেকে এতক্ষণ কেউ আমাদের দেখছিল, এইমাত্র চোখ সরিয়ে নিয়েছে। মাঝখানে একটা বড় হল্, দু'পাশে সারি সারি খালি ঘর। তবু মনে হয় ঠিক আমাদের আড়ালে রেখে রেখে কেউ সরে সরে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ভয়েই আধমরা, কারো মুখে কথাটি নেই।

হঠাৎ তাদের সঙ্গে সাম্‌না সাম্‌নি দেখা। গুপে আর ওর অপূর্ব্বদা। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। গুপে অপূর্ব্বদার পিছনে প্যাণ্ট আঁকড়ে ধরে কাঁচু-মাচু মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে যেন সাহস পেল, "এই, সেফ্‌টিপিন আছে?" মেয়েরা, কতকটা তাই শুনে, কতকটা ভয় কেটে যাওয়াতে, সবাই একসঙ্গে হিহি-হোহো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। গুপেকে একটা বড় সেফ্‌টিপিন আর সেই বোতামটা দিয়ে দিলাম। অপূর্ব্বদা ততক্ষণে লাবণ্যদিদের সঙ্গে দিব্যি ভাব পাকিয়ে নিয়েছেন, ও সবাই একসঙ্গে খাবার যোগাড়যন্ত্র করছেন। তারপর সারাদিন ধ'রে সারা বাড়িটাকে গোরু-খোঁজা ক'রে ফেললাম। কিচ্ছু পেলাম না। কানের ফুলটার কথা কাউকে বল্‌তে লাবণ্যদি বারণ ক'রে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যের আগে একসঙ্গে বাড়ি ফেরা হ'ল। বাড়ি ফিরেই এক কাণ্ড। গুপে শোবার ঘরে ঢুকেই পকেট থেকে একটা জিনিষ বের ক'রে পড়ার টেবিলের উপর রেখে বলল, "দেখ্, তোদের লাবণ্যদির কেরামতি দেখ্!" তাকিয়েই আমার পিলে চম্‌কে গেল। টেবিলের উপর লাল নীল-সবুজ পাথর বসান কানের ফুলটা জুল জুল করছে। "কোথায় পেলি, গুপে?" গুপে বললে—"আমি কুড়িয়ে পেলাম ভূতের বাড়িতে। অপূর্বদার ব্যাগে রেখেছিলাম, কোন্ সময় তোদের লাবণ্যদি সরিয়েছেন। আমিও তাগে তাগে ছিলাম, যেই না তোমরা খেয়েদেয়ে হাত ধুতে গেছ, ওটিকে ভদ্রমহিলার থলি থেকে উদ্ধার করেছি। উঃ, কি রাবিশে ভর্তি যে থলিটা!—পাউডারের কৌটো, চুলের কাঁটা—"

আমার হাত কাঁপছিল। বললাম—"গুপে, থাম্।" আমার থলি থেকে আর একটা কানের ফুল বের করে ওটার পাশে রাখলাম। টেবিলের উপরে দুটিতে

জুল জুল করতে লাগল। গুপের মুখটা বোয়াল মাছের মত হাঁ হয়ে গেছে। অবাক্ হয়ে খানিক তাকিয়ে, আমাকে বল্‌লে,—"কোথায় পেলি রে?"

"আমি বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেলাম। লাবণ্যদির থলিতে রেখেছিলাম। তোদের অপূর্বদা নিশ্চয় সরিয়ে নিজের ব্যাগে পুরেছিলেন। আমরা হাত ধুয়ে এলে পর, তোমরা যখন গেলে, ব্যাগ সার্চ করে ওটিকে উদ্ধার করলাম।" খানিকটা চুপ করে আবার বল্‌লাম, "অন্ততঃ তাই ভেবেছিলাম।"

কখন যে জগদীশদা'র পিসিমা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন তা টের পাই নি। হঠাৎ, "ওমা, কোথায় যাব গো! এত ছোট কিন্তু এত সাংঘাতিক! বলি বনবাদাড় হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছি আর চোর বাছাধনেরা ঘরের মধ্যে! ও শ্যামদাস, ও হরিচরণ, ও বড় বৌমা, মেজ বৌমা, কে কোথা গেলে, দেখ কাণ্ড দেখ এসে!"

মা, জ্যেঠিমা দুড়দাড় ক'রে ছুটে এলেন। পিসিমা ফুল দুটিকে তুলে ধরে বার বার বল্‌তে লাগলেন—"ওমা, এই না আমার মাণিকজোড়, এই না আমার হারানিধি!" হঠাৎ এক হাতে গুপের কান চেপে ধরে গর্জন ক'রে উঠলেন—"বল্ হতভাগা, সাত নহর কোথায় রেখেছিস? উঃ, দেখে মনে হয় যেন গাল টিপ্‌লে দুধ বেরুবে, অথচ ভিতরে ভিতরে একেবারে কাল কেউটে!" কান ধরে ভীষণ এক নাড়া দিয়ে বল্‌লেন—"দে শীগ্‌গির। নইলে আজ তোকে পুঁতেই ফেলব। ও মা, এর জন্যই না আমার পূজনীয় পিতৃদেব হাজার বছর নরক ভুগ্‌ছেন! ও কি আমি অত সহজেই ছেড়ে দেব? বের কর্ বলছি।" আর এক প্রচণ্ড কান-নাড়া।

জ্যেঠিমা হঠাৎ ছুটে এসে পিসিমার পিঠে এক বিরাশী শিক্কা ওজনের কীল বসিয়ে দিলেন। পিসিমা চমকে গিয়ে যেই না কান ছেড়ে দিয়েছেন, গুপে সেই মুহূর্ত্তে একেবারে হাওয়া! আমি মাঝখানে পড়ে বল্‌তে লাগলাম—"ও জ্যেঠিমা, ও পিসিমা, আমার কথা শোনই না।"

জগদীশদা'ও বোধ হয় পিসিমার সঙ্গেই এসেছিল, এতক্ষণ কথা বলতেই পারছিল না, এবার ঢোক গিলে বল্‌ল, "আহা পিসিমা, গুটে থেকে গুপে পর্য্যন্ত সবাইকে সন্দেহ করলে কি ক'রে চলে?"

(ক্রমশঃ)

বিষে বিষক্ষয়

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

মহেশ্বরী দেবী—আমার বড় পিসীমা,—বাবা. কাকা, জ্যাঠা সকলের বড় বোন—সেকালের নামকরা মেয়ে ছিলেন, শুনেছি। পিসীমা নাকি দুর্দ্দান্ত রকমের পণ্ডিত। যে কালে ছেলেরা বি. এ পাশ করলে গভর্ণমেণ্ট তাকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ করে দিত সেই কালের মেয়ে হয়ে তিনি করেছিলেন বি.এ পাশ। তাও যেমন তেমন ভাবে পাশ নয়, কি একটা নামকরা বৃত্তি নিয়ে সসম্মানে পাশ। বাইরে সকলের কাছে পিসীমার খুব নাম-ডাক, বাড়ীতে কিন্তু পিসীমার পাল্লায় পড়লে মনে হ'ত যে এর চেয়ে প্রাণ যাক। তাঁকে কেউ বল্‌ত 'পণ্ডিত', কেউ বল্‌ত 'পাগল'। আমার ত' মনে হয়, ও দুই-ই এক কথা। পণ্ডিত হলেই মানুষ পাগলের সামিল হয়ে যায়, আর পাগল না হলে কেউ পণ্ডিত হওয়ার চেষ্টাও করে না। এ হেন পণ্ডিত পিসীমার পাল্লায় পড়ার ভয়ে বাড়ীর সকলে নিজের বাড়ীতেই চোরের মত আনাচ-কানাচ দিয়ে চলে। পিসীমা, শুনি, বৃত্তি পেয়েছিলেন অঙ্কে, কিন্তু প্রবৃত্তি দেখি তাঁর সব বিষয়ে - কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান, কি ডাক্তারী, কি সাহিত্য, কি ইতিহাস—কিছুই বাদ যায় না। পিসীমার পোষাক পরা অদ্ভুত, খাওয়া অদ্ভুত, কথা বলা অদ্ভুত, এমনি শোওয়া-বসাও অদ্ভুত। পোষাকে খানিকটা সরোজিনী নাইডু, খানিকটা মা আনন্দময়ী, খানিকটা লেডি মাউণ্টব্যাটেন্। আহারে খানিকটা মহাত্মা গান্ধী. খানিকটা লর্ড লিন্‌লিথগো, খানিকটা বা পাড়ার হীরু ধোপা—এমনি সব কিছুতেই। প্রত্যেকটীর পিছনে পিসীমার বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও ডাক্তারী যুক্তি আছে। তাঁর পাল্লায় পড়ে আমাদের প্রাণপাখী যে রোজ কি রকম ঝাপটা মারত তা সবিস্তারে বল্‌তে গেলে একটা ইতিহাস হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই সব না বলে দু'-একটা বললেই আমাদের অবস্থাটার হয়ত খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

সে একদিন। দারুণ শীতের রাত্রি,—রাত বোধ হয় তখন দুটো হবে। দেখি, পিসীমা আমার ছোট ভাই বুধোকে ডেকে লেপের মধ্যে থেকে টেনে তুলেছেন। হাতে তাঁর একটী হোমিওপ্যাথী ওষুধের শিশি—"রাস্‌টক্স"। হুকুম হ'ল যে গোয়ালে গিয়ে নাদার ভিতর গরুর খাওয়ার জন্য যে জাব দেওয়া আছে তার ভিতর ঐ ওষুধ দু' ফোঁটা ঢেলে দিয়ে আস্‌তে। পিসীমা শুয়ে শুয়ে শুনেছেন যে গোয়ালে গরুটা সমানে হাঁচ ছে. সর্দ্দি লেগেছে নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে "রাসটক্স" পড়লে সর্দ্দির উপশম হবে, নইলে বেড়ে যেতে কতক্ষণ? বুধোকে ঐ কন্‌কনে শীতের মধ্যে লেপ ছেড়ে উঠে যেতে হ'ল সেই গোয়াল-ঘরে। গরুর সর্দ্দি সারল কি না জানি না, তবে বুধোর পরের দিন খুব জ্বর এসে গেল দেখলাম।

আমের সময়। যদু বাবুর বাজার থেকে চাকরদের জন্য মাঝে মাঝে একশ' করে দেশী আম কিনে আনা হয়—একটাকা চার আনা শ'। পিসীমা খবর পেয়েছেন পোস্তায় এক টাকা দু' আনা করে শ'। পিসীমা রোজ বাবার মোটরখানা নিয়ে পোস্ত থেকে এক টাকা দু' আনা শ'এর আম কিনে আনতে লাগলেন। অর্থাৎ চার টাকার পেট্রোল খরচ করে দু' আনা লাভ। বলবার

উপায় নেই,—তা হলেই যে বলবে তাকে ধরে হয়ত "আইনষ্টাইন থিওরি" দিয়ে বোঝাতে আরম্ভ করবেন যে মোটেই ক্ষতি হচ্ছে না। বাবার কাছে পরে শুনেছিলাম যে ঐ আম আনার জন্য একশ' কত টাকার পেট্রোল লেগেছিল সেবার।

ছোটকাকার খুব ফুলের সখ। তাঁর এক বন্ধু সেবার তাঁকে ক্রীসান্‌থিমাম্, পাপি, ডালিয়া প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ফুলের চারা দেন। টব কিনে এনে তাতে মাটি ভর্ত্তি করে ছোট কাকা চারাগুলি পুঁতে দিলেন তাতে। পিসীমার কানে গেল সে কথা। পিসীমা ছোটকাকাকে ডেকে বল্‌লেন—"গাছ ত' লাগাচ্ছ, ওতে কি সার দিতে হয় জান?" বলে কতগুলি সারের নাম করলেন ও প্রত্যেক দিন কতখানি করে শিকড় বাড়বে তারও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন। পরদিন সার এল। পিসীমা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। প্রতিদিন চারাগুলিকে একবার করে মাটী থেকে টেনে তুলে স্কেল্ দিয়ে শিকড়ের দৈর্ঘ্য মেপে আবার পুঁতে দিতে লাগলেন। ফল. কি দাঁড়াল বলাই বাহুল্য। ছোটকাকা আড়ালে গিয়ে চোখের জল ফেল্‌তে লাগলেন।

কিন্তু সব যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে উঠত পিসীমার মাষ্টারীগিরি। যখন তখন যাকে তাকে ধরে পড়াতে সুরু করবেন। আর সে পড়ান যে সে পড়ান নয়ত! আমার বড়দার সাত বছরের ছেলেকে ধরে একদিন পড়াতে বসলেন—ইংরেজী, মানে—"ইংলিশ প্রাইমারী রীডার"। ক্ষানিকক্ষণ পরে ঘুরে এসে দেখি, পিসীমা তাকে সেক্‌স্‌পীয়রের লেডি ম্যাক্‌বেথের চরিত্র বোঝাচ্ছেন। সে বেচারা বেকুবের মত হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সেদিন কাকীমা পূজার ঘরে বসে চণ্ডীমঙ্গল পড়ছিলেন, তাঁকে দেখি ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের "লাইফ ডিভাইন" বোঝাতে আরম্ভ করেছেন। শুনেছি ও বই নাকি কলকাতার অতি বড় পণ্ডিতেরাও বুঝতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যান। সব চেয়ে মুস্কিল ছিল আমার আর সেজদার। কুক্ষণে আমরা বি. এস্-সি পাশ করেছিলাম। অঙ্ক ছিল আমাদের বি. এস্-সিতে। অঙ্কের মধ্যে 'ক্যাল্‌কুলাস্' বই দুটীর কথা মনে হ'লে আজও হৃদ্‌কম্প হয়। ঐ বই দুটোকে কোনও রকমে সামলে নিয়ে বি. এস্-সি পাশ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, 'বাঁচলাম, পাশ করে গেছি,' আর ক্যালকুলাস্ থেকে অঙ্ক কষতে হবে না। কি ভুলই ভেবেছিলাম! যাদের ঘরে অঙ্কে-বৃত্তি-পাওয়া পিসীমা বিরাজিতা তাদের কি নিস্তার আছে? পিসীমা যখন তখন আমাকে আর সেজদাকে ধরে ক্যাল্‌কুলাসের অঙ্ক কষাতে বসতেন; বস্‌তেই হ'ত, না বসে উপায় নেই। বাবা, কাকা, জ্যাঠা সকলের বড় বোন,—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তাঁর। কোথায় লাগে ষ্ট্যালিন কি হিট্‌লার? কিন্তু, ঐ বসানোই সার। একটা অঙ্কই কি ছাই পারতাম? বেছে বেছে সব চেয়ে শক্ত অঙ্ক দিতেন যে পিসীমা! আমরা যখন পারতাম না পিসীমা তখন "মূর্খ্য" থেকে সুরু করে আরও অনেকগুলি অনুরূপ গালাগালি দিয়ে নিজে কষে দিতেন অঙ্কগুলি। পিসীমার জীবনের পরম গর্ব্ব ছিল. যে, ঐ অঙ্কগুলি—যা কষতে অতি বড় পণ্ডিতদেরও নাকি বহু সময় লাগে—তা তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে ঠিকভাবে কষে দিতে পারতেন।

ক্যাল্‌কুলাসের অত্যাচারে যখন আমরা দু'ভাই বাড়ী ছেড়ে পালাব কিনা ভাবছি সেই সময় এল আমাদের বাড়ী বেড়াতে আমাদের মামাতো ভাই "আদিত্য দা"। আদিত্যদা'র মুস্কিল

আসানের উপায় বাৎলাবার মাথা ছিল বিশ্ববিশ্রুত। আদিত্যদা'র উপদেশ মত, যা কখনও করি নি, তাই করলাম। একটা দ্বিতীয় চাবি যোগাড় করে তা দিয়ে পিসীমার বইএর আলমারীটা খুলে ক্যাল্‌কুলাস্ বইটা বার করে একেবারে গুদাম ঘরের এককোণে সরিয়ে রেখে এলাম। আদিত্যদা' বোঝালে, আত্মরক্ষার্থে সব কিছু করা যায়। যাই হোক, পিসীমা ক'দিন খুব চীৎকার করলেন বইটা হারিয়ে; খোঁজাখুঁজি করলেন যথেষ্ট, না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন। আমরাও বাঁচলাম।

কিন্তু এ সব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা আমাদের সকলের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। পিসীমার মাথায় এমন এক খেয়াল চাপল, এমন কাণ্ড বাধাবার উদ্যোগ করলেন যাতে দুঃখ-কষ্ট ত' ছাড়, পরিবারের মান, সম্ভ্রম সব বজায় রাখা দায় হয়ে উঠল। শুনেছি বেশী পণ্ডিত হলে, বেশী চিন্তা করলে মানুষের মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন তার নানা অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা হতে থাকে মনের মধ্যে যা দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। পাগল নয়, সব বিষয়ে ঠিক ঠিক খেয়াল আছে, অথচ আজগুবি ধারণাও ঠিক আছে। পিসীমারও হ'ল তাই।

কিছুকাল থেকে পিসীমার মনে ধারণা হ'তে সুরু হ'ল তিনি খ্যাতনাম্নী এক ফিল্মষ্টার। ওঃ, কি সে সাজ-পোষাক, কি সে চাল-চলন! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কি সে নিজে নিজে অভিনয়! দিন যায়, মন থেকে ফিল্মষ্টার বিদায় হ'ল—সে জায়গায় এলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দদায়িনী। সুরু হ'ল পিসীমার জপ, তপ, সাধনা। খাওয়াদাওয়া চল্‌লো সেই রকম ভাবে। আমাদের সকলকে তাঁর ভক্তবৃন্দ সেজে চারপাশে বসে থাকতে হ'ল। কয়েকদিন বাদে আনন্দদায়িনী মা অন্তর্হিতা হলেন, সে জায়গায় এলেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। দিনের পর দিন চল্‌ল খাদ্য-চুক্তির ব্যাপার নিয়ে আমেরিকার পক্ষে অনুরোধ ও মিনতি, তর্ক ও বিতর্ক! কখনও বাবাকে, কখনও জ্যাঠামশায়কে হতে হ'ল আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। চলছিল মন্দ নয়। হাঙ্গামা পোহাতে হলেও মন্দ মজা লাগছিল না। কিন্তু সত্যিকারের বিপদ্ বাধল সেই দিন যেদিন ফিল্মষ্টার, আনন্দদায়িনী মা, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রূপান্তরিত হ'লেন পাড়ার ভেলু গোয়ালার বৌএ।

এত দিন তবু উঁচুস্তরের ব্যাপার চলছিল এবং ব্যাপার যা চলছিল তা বাড়ীর মধ্যে। কিন্তু এবার তা নেমে এল নীচুস্তরে, একেবারে গোয়ালার বৌএ—এবং বাড়ীর বাইরে সে ব্যাপার ছড়িয়ে পড়বার যোগাড়! পিসীমা হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু করে তুলেছেন কাপড়। ঝিকে দিয়ে কোথা থেকে রূপার মল আর বালা নিয়ে এসে পরেছেন। বাড়ীর গোয়ালঘরে তাল তাল গোবর নিয়ে বসতে সুরু করেছেন ঘুঁটে দেওয়ার জন্য। কারো কথা শুন্‌ছেন না, কেউ বোঝালে বুঝছেন না। কোথায় গেল পিসীমার সেই বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী ভাষা! গোয়ালার বৌ-এর খাস্ হিন্দুস্থানী ভাষায় সকলকে গালাগালি সুরু করেছেন। শুধু কি তাই? ক'দিন থেকে জিদ্ ধরেচেন, তিনি যখন ভেলু গোয়ালার বৌ তখন ঐ গোয়ালাদের বস্তিতেই চলে যাবেন—যাবেনই চলে। কি সর্ব্বনাশ! অত বড় বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে—বাবা, কাকা, জ্যাঠাদের মত বিখ্যাত লোকদের বোন—আমাদের সকলের পিসীমা—যদি বাড়ী ছেড়ে বস্তিতে চলে যান—কি কেলেঙ্কারীটাই না হবে! যত দিন যায় পিসীমার জিদ ততই বাড়ে; শেষ পর্য্যন্ত আটকানো দায় হয়ে উঠলো। শেষে

মনে হ'ল বেঁধে রাখা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। কিন্তু বাঁধবে কে? বাবা, কাকা, জ্যাঠার বড় বোন - সমস্ত বাড়ীর মাথার মণি—তাকে বাঁধবে কে? সমস্ত বাড়ীময় সে কি চরম অবস্থা! এমনি অবস্থার মধ্যে একদিন হঠাৎ আদিত্যদা'র পুনরাবির্ভাব। আদিত্যদা' সব শুনল—চুপ করে শুনল! গুম্ হয়ে ভাবল কি কতক্ষণ। তারপর আমাকে ডেকে বলল—"হ্যাঁরে, সেই ক্যালকুলাস্‌খানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলি? পাওয়া যাবে এখন?"

উত্তর দিলাম আমি একটু বিস্মিত হয়েই—"হ্যাঁ, পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ক্যাল্‌কুলাসে কি হবে?"

আদিত্যদা উত্তর দিলে না সে কথার, শুধু বল্লে, "নিয়ে আয় তবে।"

নিয়ে এলাম ক্যালকুলাসটা বার করে গুদাম থেকে, এবং আদিত্যদা'র কথামত বারান্দার চৌকির উপর আমি আর সেজদা বসলাম ক্যালকুলাস আর খাতা-পেন্সিল নিয়ে। একটা শক্ত অঙ্ক খাতায় লিখে নিয়ে মিছিমিছি কষবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু পরেই দূরে পিসীমাকে দেখা গেল। দেখা মাত্রই আদিত্যদা অতি মধুর সম্বোধনে ডাক দিল পিসীমাকে, "আরে, এই যে ভেলুর বৌ, খবর কি? শোন শোন!"

আদিত্যদা'র ভেলুর বৌ সম্বোধনে পিসীমা খুসী হয়ে একটু সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে আদিত্যদাকে একটা গড় করে সঙ্কুচিত হয়ে তার সামনে মাটীতে বসলেন।

আমরা আড়চোখে সব দেখছি, আর খাতায় হিজিবিজি দাগ কেটে যাচ্ছি। আদিত্যদা পিসীমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলেই বল্লে—"দাঁড়াও ত' ভেলুর বৌ! দেখি চেষ্টা করে আর একবার। ক্যালকুলাসের এই একটা অঙ্ক কিছুতেই হচ্ছে না; কেউ পারছে না। অঙ্কটা নাকি এমনি শক্ত যে কোন কলেজের মাষ্টারও পারছেন না। কেউ নেই যে এ অঙ্কটা সঠিক কষতে পারে।"

এ কথা শুনেই ভেলুর বৌ-রূপী পিসীমা লাফিয়ে উঠলেন। লাফিয়ে উঠে ক্যালকুলাসের বই আর খাতা পেন্সিল কেড়ে নিলেন আমার হাত থেকে। খস্‌খস্ করে ঐ বিরাট অঙ্কটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে কষে দিলেন। দিয়ে বেশ একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্লেন—"কি, হবে না যে?" ক্যালকুলাসের এমন কোন অঙ্ক আছে যা মহেশ্বরী দেবী পারে না?—মহেশ্বরী দেবী ইচ্ছা করলে ওরকম দু'-দশটা ক্যালকুলাসের বই লিখে দিতে পারে।"

আদিত্যদা চীৎকার করে উঠল—"আরে তাই ত', এ ত' দেখছি মহেশ্বরী দেবী—বুধো-মেধোর পিসীমা! ভেলুর বৌ হতে যাবে কেন? ভেলুর বৌ কি ক্যালকুলাসের অঙ্ক এত অনায়াসে কষতে পারে?"

পিসীমা একটু চুপ করে থেকে বল্লেন—"ঠিকই ত'!"

বিষে বিষক্ষয় হ'ল। ক্যালকুলাসের কল্যাণে ভেলুর বৌ সেবারের মত চাপা পড়ে মারা গেল, আমরাও বাঁচলাম।

আমার মেয়েটাকে স্কুলে দিয়েছিলাম। পড়াশুনাও করছিল ভালই। কিন্তু তবুও ছাড়িয়ে নিয়েছি এই ভয়ে যে পণ্ডিত হয়ে উঠলে যদি পিসীমার মত হয় সে।

বিচিত্র ভারত

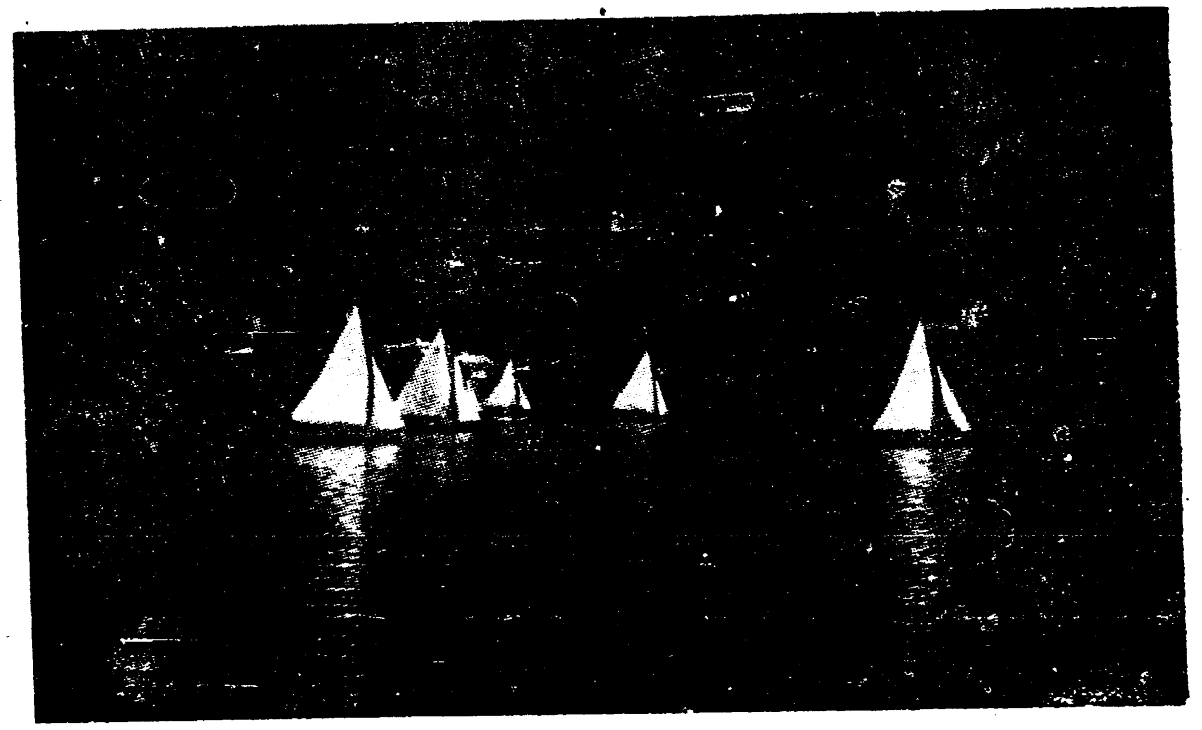

নৈনিতাল হ্রদের দৃশ্য

শিলং হ্রদের একটি দৃশ্য

রোগ দু' রকম

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

রোগ দু'রকমের—রোগ আর Rogue, তোমাদের তা অজানা নয়। তবে দু' নম্বরেরটি সাধারণতঃ ছেলেদের মধ্যে বড় দেখা যায় না।

সে-ই একবার যা দেখেছিলাম—আমার ছেলেবেলায়। হোস্‌টেলে থেকে ইস্কুলে পড়ার সময়।

তা, যে রকমেরই হোক না, রোগের বৃত্তান্ত সমস্ত খুঁটিয়ে বলাই উচিত। তাই গোড়ার থেকেই বলা যাক .....

আমাদের নতুন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাতিকটা টের পাওয়া গেল দু'দিনের মধ্যেই।

ডাক্তারি করা তাঁর ব্যামো। ব্যামোর ডাক্তারি।

পরশু রোববারের সকালে তিনি আমাদের সবার স্বাস্থ্য জরীপ করবেন, হোস্‌টেলের মনিটারের মুখে খবরটা এলো। রীতিমতন—যাকে বলে মেডিক্যাল এগজামিনেশন। জিভের তলায় থার্মোমিটার দিয়ে, বুকের ওপর চোঙ বসিয়ে—সমস্ত।—জানালো মনিটার।

আরো জানালো যে এর আগে যে হোস্‌টেলের উনি কর্ত্তা ছিলেন—তার মামাত ভাই নাকি থাকে সেখানে—তার কাছ থেকেই মনিটারের শোনা,—সেখানকার ছেলেরা ওঁর চিকিৎসার ঠেলায় ক্ষেপে গিয়ে ষ্ট্রাইক বাধিয়ে বসেছিল নাকি!

শুনে তো সবাই আমরা ভারী ভাবিত হলাম। রবিবারের আর কীই বা বাকী! বুক দুর দুর করতে লাগলো সকলের।

শুধু দিনেশ বল্লে—'যাক্, একটা দুর্ভাবনা গেল। সোমবার থেকে আর আমায় ইস্কুল যেতে হবে না। দেখে নিস্।'

বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি দিনেশ খুব মন দিয়ে বই পড়ছে,—পড়ছে আর বিড় বিড় ক'রে আওড়াচ্ছে। 'ইস্! ভারী যে পড়ায় মন দেখছি!' না বলে আমি পারলাম না।

খেলাধূলা ফেলে রেখে বিকেল বেলায় বই পড়ছে দিনেশ, এমন দৃশ্য স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

'ধর তো একটু বইখানা, এই পাতাটা। বল্ল দিনেশ—'আমি মুখস্থ বলে যাই শোন্—হোলো কি না দ্যাখ তো।'

বইটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখলাম। মোটেই কোনো পড়ার বই নয়। 'সরল রোগনির্ণয়' বইখানার নাম। বটতলার ছাপানো। যত রাজ্যের ব্যারামের ব্যাখ্যানায় ভর্তি।

'ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে একটা পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে বাগিয়ে এনেছি।'—বলে, আমার কৌতূহল চরিতার্থ করলো দিনেশ।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তার পড়াটা মুখস্থ বলে গেল—ঝাড়া গড় গড় ক'রে। চমৎকার! ক্লাসের পড়াও কোনোদিন সে এমন ক'রে আওড়াতে পারে না।

'এ সব কিসের লক্ষণ ?' অবাক হয়ে আমি শুধাই।

'হৃদ্রোগের। আমাকেও ঐ ব্যারামে ধরেছে যে! ঠিক ওই ওই-সব লক্ষণ আমারও।' সে কাতর স্বরে জানায়; 'আমি আর বাঁচবো না ভাই! সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে তুমি খবরটা দেবে ?'

দিনুর মৎলবটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমিও কোনো ঝামেলায় মাথা গলাবার ছেলে নই। ঐ খবর দিতে আমি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ধার ঘেঁষি গে, আর উনিও আমাকে হাতে পেয়ে তখুনি তখুনি আমার নাক-মুখ, বুক-পিঠ বাজিয়ে দেখতে সুরু করুন আর কি!

কিন্তু খবরটা পৌছতে দেরী হ'লো না। দিনেশ রাত্তিরে না খেতেই সুপারিন্টেণ্ডেন্টের টনক নড়লো। রোববারের জন্যে আর সবুর করতে হোলো না তার পর। পরের দিন সকালেই তিনি স্টেথিস্কোপ হাতে হাজির হলেন।

'কী হয়েছে তোমার ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি দিনেশকে।

'কিছু না স্যর্, হৃদ্রোগ।' বল্ল দিনেশ আম্লানবদনে; 'বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে কি রকম।'

'কদ্দিন ধরে এ রকমটা হচ্ছে তোমার ?' নাড়ি টিপতে টিপতে তিনি শুধালেন।

'তা হপ্তা দু-তিন হবে। কাল রাত্তিরে একটু বেশী রকম হয়েছিল. তাই আর খাবার ঘরে যেতে পারি নি। তা, এটা তো তেমন মারাত্মক নয়, কি বলেন স্যর্ ?'

'চুপটি করে শুয়ে থাকো তুমি।' বলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট চোঙের মতন একটা জিনিষ (সেইটেই নাকি স্টেথিস্কোপ) তার বুকের ওপর বসালেন, তার পর মুখ গম্ভীর করে বল্লেন—'তোমার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা তো ভালো নয়! তুমি আর নড়াচড়া কোরো না। চুপটি করে শুয়ে থাকবে সব সময়। আমি মাংসের সুরুয়া করে পাঠাচ্ছি তোমার জন্য, তাই খাবে এখন। বিকেলে দুধ আর ফলটল। রাত্তিরে মুর্গীর রোস্ট্। সব আমি ব্যবস্থা করে দেব। কিছু ভেব না।'

'ইস্কুলে যাব না ?'

'ইস্কুল ? এখন তিনটি মাস ইস্কুল নয়। 'আগে বাঁচো, সেরে ওঠো আগে—ইস্কুল ফিস্কুল তার পরে।'

ইস্কুলে সেদিন শেষ ঘণ্টাটা বঙ্কাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটাতে হোলো। বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে।

ছুটির পর হোস্টেলের পথে সে জিজ্ঞেস করলো আমায়: 'আচ্ছা ভাই, যক্ষ্মা ধরলে কাশি হয়, না কাশি হলে তবেই যক্ষ্মা ধরে ?'

আমি বল্লুম—'যুগপৎ। প্রাণের বন্ধুর মত ওরা হাত ধরাধরি করে দেখা দেয়।'

'মনে হচ্ছে আমার—আমারো যক্ষ্মা হয়েছে।' বলে বিদ্ঘুটে কাশির বিচ্ছিরি এক নমুনা সে বার করলো।

'কিন্তু কাশি ছাড়াও যক্ষ্মার আরো সব লক্ষণ আছে।' বলতে হোলো আমায়।

'আছে নাকি ?' বলে কাশিটা তখনকার মতো সে থামালো। কিন্তু সেইখানেই থামলো না, দিনেশের কাছে গিয়ে বললো—'দাও দেখি আমায় বইটা।'

'বিরক্ত কোরো না আমায়। শুনলে না স্যর কি বল্লেন ?—আমার হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল ?'

'না, তুমি আমায় বইটা দাও।'

'অমন করলে আমি হার্টফেল করতে পারি। তা জানো ? সেটা কিন্তু ভারী খারাপ হবে। তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।'

'হোক না খারাপ। তুমি দেবে আমায় বইটা একবার ? মনে হচ্ছে আমার একটা শক্ত রোগ হয়েছে। যক্ষ্মা-টক্ষ্মা গোচের। তা যাই হয়ে থাক্—সেটা আমি মিলিয়ে দেখতে চাই। যদি ভালো কথায় না দাও তো এক ঘুষিতে তোমার হৃৎপিণ্ড-ফিণ্ড সব আমি তাল-গোল পাকিয়ে দেব।'

দিনেশের কাছ থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে পড়তে সুরু করলো বঙ্কা। বইটাতে এত রকমের রোগের বর্ণনা আছে যে যক্ষ্মার বদলে যে কোন রোগকেই অক্লেশে বেছে নেওয়া যায়। ভালো ভালো যত রোগ। খাসা খাসা নাম। অনেক প্রলোভন কাটিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সে যক্ষ্মাকেই পাকড়ালো। আর এমন এক পিলে-চম্কানো কাশি বার করলো যার আওয়াজে সে রাত্তিরে কারু চোখেই ঘুম এলো না আমাদের।

পরদিন সকালে সুপার যখন দিনেশকে দেখতে এলেন তখন বঙ্কুর কাশির ধমকে দিনেশ দূরে থাক, নিজের কথাই ভালো করে শুনতে পেলেন না।

'ভারী বিচ্ছিরি রকমের কাশি কাশছো যে! কী হয়েছে তোমার ?'

'ও কিছু না স্যর', বল্ল বঙ্কা অচ্ছিল্যভরে: 'কয়েক মাস ধরেই এ রকমটা হচ্ছে। ও কিছু না।'

'কিছু না ? তার মানে ? কাশি সমস্ত রোগের বাবা—তা জানো ?' বলে ওঠেন সুপার—'কাশির মতন মারাত্মক ব্যাধি আর আছে নাকি ?' বলে তিনি আমার দিকে তাকান।

'কাশি পাওয়া মানেই কাশি-প্রাপ্তি।' সায় দিতে আমায় বলতে হয়।—'আর কাশি-প্রাপ্তি মানে···'

'কাশি হয়, আর কি হয় শুনি ?' সুপার শুধান বঙ্কাকে।

'ঘামও হয় স্যর—সেই সঙ্গে। ঘামটা হয় ভোর রাতের দিকেই। কুলকুল করে ঘাম।'

'অ্যাঁ! বলো কি ? ঘামও হয় আবার ?' বিচলিত হতে হোলো সুপারকে।

'ঠিক ফোয়ারার মতন। অ্যাতো ঘাম হয় যে সকালে জামা নিঙড়াতে হয় আমাকে। ঘাম হওয়া তো বেশ ভালোই,—কি বলেন স্যর ? তাতে তো শরীরের সব বিষ বেরিয়ে গিয়ে কাশির আরাম হতে পারে ? তাই নয় কি স্যর ?'

'চুপ টি করে শুয়ে থাকো তুমি।' স্তর বলেন; 'এরা চৌকি সমেত তোমায় ধরাধরি করে চিলকোঠার ঘরে রেখে আসবে। সেখানে প্রচুর আলো আর হাওয়া আর সূর্য্যকিরণ আর মুক্ত বাতাসের অক্সিজেন—প্রচুর। এই তোমার প্রয়োজন এখন। সেই সঙ্গে বলকর পথ্য। তার জন্য ভেব না। সে সব ব্যবস্থা আমি করছি। হোস্টেলের যে এস্পেশাল ফণ্ড আছে তাই থেকেই তোমাদের দু'জনের সব করা হবে।'

বঙ্কু তখুনি টান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। আর আমাদের হোলো ভোগান্তি। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে যেতে হোলো ছাদের ঘরে।

তোফা আরামে রইলো ওরা দুজনে। ইস্কুলে যেতে হয় না, পড়াশুনার হাঙ্গামা নেই। সারাদিন মজা করে গল্পের বই পড়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। আর মুর্গীর সুরুয়া মারে। মুখের কাছে হালুয়া আর চুমুকে চুমুকে বেদানার রস। তিন ঘণ্টা অন্তর দুধ আর ফলের সরবৎ। সুপার আর আমরা ইস্কুলে গেলে খেয়েদেয়ে ফূর্তি করে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায়। কখনো বা ছাদে গিয়ে তাস পেটে বসে বসে। তারপর আমরা ইস্কুল থেকে ফেরার আগেই অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়ে যে যার বিছানায়।

জটলা পাকাতে সুরু করল

দেখে দেখে গা জ্বালা করে আমাদের। সুপারের ভয়ে কিছু বলতে পারি না। হোস্টেলের মনিটার চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে তাকায়। ঝক্কিটা তার ওপর দিয়েই বেশী যায় তো। বাজার

থেকে আঙ্গুর, বেদানা সব কিনে আনো। মুর্গীর রোস্ট্ আর র' মিট্ জুস্ বানাও ঠাকুরকে দিয়ে। নিয়মিত ভাবে দুধ খাওয়ানো রোগীদের—সমস্তই ওর দায়। অথচ ও-বেচারা আঙ্গুর-বেদানা, কি মুর্গীর ঠ্যাংয়ের সোয়াদটুকুও পায় না আমরা তো নয়ই।

কয়েকদিন এইভাবে কাটবার পর হোস্টেলের আর সব ছেলেও জটলা পাকাতে সুরু করলো – কি করে কোন্ অসুখে পড়া যায়। মাংসের গন্ধে ক্ষেপে যাবার যোগাড় হোলো সকলে। তারা বল্লে তারাও এক একটা অসুখ বাধাবে এবার।

শুনে বঙ্কা আর দিনেশ চেঁচিয়ে উঠলো—'মাটি করবে দেখছি! নিজেদেরও কোনো সুবিধে করতে পারবে না, মাঝখান থেকে শুধু আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।'

'কেন, একসঙ্গে কি অনেকের করতে নেই অসুখ? হতে পারে না কখনো? তাহ'লে মড়ক লাগে কি করে শুনি?' বঙ্কাদের তারা শুধোয়—'গোয়ালকে গোয়াল উজাড় হয়ে যায় কি ক'রে তাহ'লে?'

'বই ছাড়া কি অসুখ হবার যো আছে? কি কি অসুখ যে করতে হয় তা কি তোমরা জানো? অসুখ-বিসুখের কিছুই জানো না তোমরা।' এই বলে দিনেশ ওদের দমিয়ে দেবার চেষ্টা করে।—'এক করতে আর এক করে ধরা পড়ে যাবে শেষটায়।'

'বেশ তো, দাও না তাহ'লে বইটা—নেড়েচেড়ে দেখি একবার।'

'সবই আমি চুলোয় দিয়েছি—বামুন ঠাকুরকে দিয়ে। বঙ্কাটার অসুখ হবার পরেই।' দিনেশ জানায়: 'ও বইয়ে আর আমার কি দরকার? যা অসুখ হবার তা তো আমার হয়েই গেছে। আর তো আমার অসুখ-বিসুখের দরকার নেই। এই যা হয়েছে এতেই আজীবন সুখে কাটাতে পারবো।'

শুনে সব ছেলেই হাল ছেড়ে দিল—দু'জনা বাদে। পট্লা আর ফট্কে। পট্লা বল্লে তার পিঠে ফোড়া হয়েছে। বলেই পট করে নিজের পিঠের জামা তুলে দেখালো। না দেখালেও চলতো, কেন না তার পিঠের ঐ ফোলা জায়গাটা হোস্টেলে এসে অবধি আমরা দেখছি। আর ফট্কেটা করলো কি, হঠাৎ গোঁ গোঁ করে তিন পাক না ঘুরে শুয়ে পড়লো বিছানায় সটান্। বল্লে যে তার পক্ষাঘাত হয়েছে।

'পক্ষাঘাত? সে আবার কি রে বাবা?' আমরা তো চম্‌কে উঠি। আঘাতটা আমাদের সবার পক্ষেই একটু বেশী হয়।

'পক্ষাঘাত জানিস্ নে? আমার দাদামশায়ের হয়েছিল।' ফট্কে জানায়: 'আর যার হয় সে মোটেই নড়তে-চড়তে পারে না, সারা দেহ তার অবশ হয়ে যায় কিনা।'

'তাই নাকি? তাহ'লে তো ভারী মজা রে! তোর তাই হয়েছে নাকি? তাহ'লে তো এখন তোকে ধরে বেশ করে চাঁটানো যায়।' গাঁট্টা বাগিয়ে মোহিত এগিয়ে আসে।

'আয় না একবার কাছে, দেখতে পাবি এখনই'—ফটিক বলে: 'আমার খালি বাঁ ধারটা ধরেছে দাদামশায়ের মতন। ডান ধারটা টন্‌কো রয়েছে ঠিক। এমন একখানা লাথি ছুঁড়বো যে বুঝতে পারবি তখন।'

আরো দু' দু'টো টাট্কা রোগী পেয়ে সুপার তো আহ্লাদে আটখানা। খুশি আর ধরে না তাঁর। সারাদিন ধরে মোটা. মোটা ডাক্তারি বই ঘাঁটেন। ইস্কুলে গিয়ে ক্লাসে পড়াতে বসেও ঐ। রোগের লক্ষণ মেলান, ওষুধ বাছেন, পথ্যের বিষয়ে বিবেচনা করেন। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় মনিটারকে তাঁর তলব হয়।

মনিটার বেচারী তো কাহিল হয়ে পড়লো। নতুন হুকুম শুনতে আর তাই তামিল করতে করতে পড়াশুনা মাথায় উঠে গেল তার। লেখাপড়ায় ভালো বলেই ক্লাসের ফার্স্ট বয় সে—আর সেই কারণেই হোস্‌টেলের মনিটার। বোর্ডিং লজিং ফ্রি। কিন্তু সবই বুঝি তার যায় যায়—ওই হতভাগা দুটোর অসুখের ধাক্কায়। রোগীদের সেবা করে আর খিদ্‌মৎ খেটে খেটে আমরাও হয়রান হয়ে গেলাম।

শনিবার ইস্কুল থেকে ফেরার পথে মনিটার আমার হাতে একটা টাকা দিয়ে বলে, 'যা তো, ডাকঘর থেকে দু' শিশি কুইনাইন কিনে আন্। আমি বাজার থেকে কিছু চিটেগুড় নিয়ে যাই।'

হোস্‌টেলে ফিরে দেখি সে রান্নাঘরের কোণে বসে প্রকাণ্ড এক খোরায় চিটেগুড়ের সঙ্গে সাবানের ফেনার মত কি একটা এবং আরো কি কি বেশ করে মেশাচ্ছে। একটা বড় চামচ দিয়ে ফেটাচ্ছে কষে। আমাকে দেখে বল্লে, 'কাউকে বলিস্ নি কিন্তু। কুইনাইনের পিলগুলো গুঁড়ো কর তো শিলের উল্টো পিঠে। বেশ মোলায়েম করে গুঁড়োবি। আর এই গুঁড়োর কথাটাও—'

'বলতে হবে না। এ গূঢ় রহস্যও গোপন থাকবে।' আমি বল্লাম। ওর কথায় ভারী মজার একটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল যেন।

'এটা একটা 'ফাসক্লাস' দাবাই।' বলে খানিকটা হলুদগোলা মিশিয়ে দাবাইয়ের রঙটা ফিরিয়ে বোতল ভর্তি করে মনিটার রহস্যময় হাসি হাসলো: 'দেখতে পাবি কাল সকালে।'

সকালে সুপার রোগী-পরীক্ষায় আসতেই সে বল্ল, 'স্যর্, আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি ওদের সারাবার একটা চেষ্টা করি।'

'তুমি সারাবে?' অবাক্ হলেন সুপার—'কি করে শুনি?'

আমাদের বাড়ীর একটা টোট্কা দাবাই আছে—মন্ত্রের মতন কাজ দেয়। বাড়ীর কি আমাদের পাড়ার কারুর কখনো কোনো অসুখ হলে ওই ওষুধ খেয়ে সেরে যায়। হাম হোক, সর্দ্দি হোক, আমাশা হোক, বাত হোক, যক্ষ্মা হোক, কি পক্ষাঘাত—সব সেরে যায়। দিতে না দিতে আরাম! সে ওষুধ বাড়ির থেকে আসার সময় আমি এনেছিলাম। মস্ত এক বোতল ভর্তি। সব সময়েই আমার সঙ্গে থাকে—একটু কিছু হলেই আমি খাই। খেয়ে বেশ উপকার পাই স্যর! তক্ষুনি তক্ষুনি। যদি বলেন তো এদের ওপরও সেটা একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়।'

'পাগল! হার্ট ডিজিজ আর টিবি সেরে যাবে এক ওষুধে? প্যারালিসিস আর কার্বাঙ্কল? তা কখনো হতে পারে? এক ওষুধে সব রোগ সারবে—গোরু হারালে গোরু খুঁজে পাওয়া যাবে,

তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না! এত সব মোটা মোটা ডাক্তারি বই তাহ'লে কে আর কষ্ট করে পড়তো শুনি?'

'কিন্তু আমরা যে বাড়িশুদ্ধ সবাই সাত পুরুষ ধরে খাচ্ছি। খেয়ে খেয়ে ভালো হচ্ছি চিরকাল। আমার বাবার ব্যত, দাদামশায়ের পক্ষাঘাত, পিসিমার হিষ্টিরিয়া, বৌদির ফিটের ব্যামো, আমার ছোট বোনের উকুন, ঘণ্টুর দাঁতের পোকা আর আমার দিদিমার ইয়া ঢাউস্ এক ফোড়া—সব সেরে গেছে ঐ এক ওষুধে। নেপালের কোন্ এক সাধুবাবা দিয়েছিলেন আমার ঠাকুরদাকে—'

তাই থেকে একটু একটু খাইয়ে দেওয়া হোলো

'বেশ, আনো তোমার ওষুধ। পরীক্ষা করে দেখা যাক্ না হয়।' রাজি হতে হোলো অবশেষে সুপারকে। বোতল থেকে একটা কাচের জগে ওষুধ ঢেলে নিয়ে এল মনিটার। তাই থেকে একটু একটু খাইয়ে দেওয়া হোলো চারজনকেই। খেয়ে না তারা যা এক একখানা ডাক ছাড়লো তা শোনবার মত। তারপর চারজন মিলে এমন চেঁচামেচি লাগালো যে কান পাতা দায় হোলো।

মনিটার বল্ল, 'চুপ করে থাকো। ওষুধের কাজ হতে দাও। অমন করলে উপকার হবে কেন? পনের মিনিট বাদে আবার এক দাগ খেতে হবে। এম্‌নি চলবে এখন পনের মিনিট অন্তর অন্তর—যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ব্যারাম সারে। এই হচ্ছে এ ওষুধের নিয়ম।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তৈরী রইলো মনিটার।

বঙ্কা বললো চেঁচানি থামিয়ে সব প্রথম, 'কাশি আমার সেরে গেছে স্যর, আমার আর ওষুধ খাবার দরকার হবে না।'

'না। ভালো করে সারতে হলে আরও কয়েক দাগ খাওয়া দরকার।' জানালো মনিটার: 'না বন্ধু, অমন করে রোগ পুষে রেখো না। ও ফ্লাজ ভালো নয়।'

পটলা বল্লে ভীত নেত্রে তাকিয়ে—'ফোড়াটা আমার সেরে গেল নাকি? আর তো কই, আমি টের পাচ্ছি নে!' বলে নিজের পিঠে নিজেই হাত বুলুতে লাগলো।

'তাহ'লেও আরো কয়েক ডোজ খেয়ে রাখা ভালো। যাতে আবার অন্য কোথাও না মাথা তোলে—ফিরে দেখা না দেয় ফের—সেই জন্যেই।'

'ফোড়া-টোড়া আর হবে না। কখনো না।'

'তাহ'লেও খেলে তো কোনো ক্ষতি নেই? ফোড়া ছাড়াও এই ওষুধের আরো ফল আছে। রক্ত পরিষ্কার করে। খোস্-পাঁচ্ড়া, চুলকানি এ সবও আট্কায় আবার। মাথার খুস্কি, মরামাস—নাও, আর এক ডোজের সময় হোলো। তৈরী হও এখন।'

'মরামাস সারবে, আমি কিন্তু, স্যর, মারা পড়বো, আপনি দেখবেন।' গোঙাতে লাগলো পটলা।

'ছিঃ, অমন করে? ওষুধ খেতে কখনো অমন করতে আছে? বলে কত মরণাপন্ন মানুষ এই ওষুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলো! জানেন স্যর, একবার এক গঙ্গাযাত্রীকে এই ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল—ওষুধ না খেয়ে খাট থেকে লাফিয়ে উঠে সে গঙ্গাযাত্রীদের ধরে এমন পিটুনি লাগালে যে—নাও, হাঁ করো দেখি।'

চামচ ভর্তি দাবাই নিয়ে এগিয়ে গেল মনিটার।

দিনেশ লাফিয়ে উঠলো—'ইস্! দশটা বেজে গেছে যে! ইস্কুলের দেরী হয়ে গেল। আমি ইস্কুল চল্লুম।' বলে বই-খাতা বগলে সে বেরিয়ে যেতে ব্যস্ত হোলো।

মনিটার পাকড়ালো তাকে—'রবিবার আবার ইস্কুল কিরে? নে, হাঁ কর্।'

'ওষুধ খাইয়ে দেখছি তুমি মাথা খারাপ করে দিলে ছেলেটার!' সুপার বিরক্ত হয়ে তাকালেন মনিটারের দিকে।

'মাথা খারাপও সারবে, স্যর, এই ওষুধেই। আমার মেজমাজার পাগলামো এতেই তো সেরেছিল। মাথার গোলমালে নিয়ম হচ্ছে দু' চামচ করে খাওয়ানোর—পাঁচ মিনিট পর পর।'

তারপর কিছুতেই আর রোখা গেল না দিনেশকে। মনিটারের হাত ছাড়িয়ে বইপত্তর ফেলে রেখেই সে দৌড় মারলো ইস্কুলের দিকে।

ফটুকের হোলো মুস্কিল। পক্ষাঘাতের রোগী, ফট্ করে সে উঠতে পারে না। মনিটার তার কাছে এগিয়ে বল্ল,—'এই শিবু, এর ডান পা-টা চেপে ধর্ তো ভালো করে। ওষুধটা একে খাওয়াই। আহা বেচারী, নড়তে-চড়তে পারে না, কত কষ্ট, আহা!—'

আমি ওর ডান পা-টা, যেদিক্‌টা অবশ নয়, আমার সব জোর দিয়ে স্ববশে রাখি। আর সে বাঁ-ধার থেকে ওর গালে আর এক দাগ দাবাই ঢালে।

ঢালতেই হাতীর মত এক ডাক ছেড়ে, তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো পক্ষাঘাতের রোগী।

সত্যিই, মহৌষধ বলতে হয় মনিটারের। লাফিয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি টপকে সটান্ সে উঠে গেল ছাদে। চিলকোঠার টঙে গিয়ে বসে থাকলো। সেখানে বসে বসে মনিটার আর তার ওষুধের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগলো।

দিনেশ সেদিন ইস্কুল থেকে আর ফিরলই না।

পতিঘাতিনী সতী

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র ব্রহ্মচারী

তোমরা পুরাণে সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির গল্প পড়েছ।, আজ তোমাদের একটি ঐতিহাসিক সতীর গল্প শোনাব। মল্লভূমের ইতিহাসে ইনি "পতিঘাতিনী সতী" চন্দ্রপ্রভা নামে পরিচিত।

মল্লভূম কোথায় জান তো? বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের কিছু কিছু অংশ নিয়ে এক সময়ে এক স্বাধীন হিন্দু রাজ্য গড়ে ওঠে। তারই নাম মল্লভূম। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম আদিমল্ল। তাঁরই নামে ঐ রাজ্যের নাম হয় মল্লভূম আর তাঁর বংশের নাম হয় মল্লবংশ। শুধু তাই নয়, তাঁর নাম থেকে একটি সাল বা অব্দও প্রচলিত হয়—মল্লাব্দ। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে এই মল্লাব্দ গণনা করা হয়। এই মল্লবংশ প্রায় ১২০০ বছর রাজত্ব করেন। মল্লভূমের রাজধানী আগে ছিল প্রদ্যুম্নপুরে; পরে তা স্থানান্তরিত করা হয় বিষ্ণুপুরে। এই বিষ্ণুপুর হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর। এখানে এখনও এঁদের বহু কীর্ত্তি দেখা যায়।

কিছুদিন আগে দৈনিক বসুমতীতে বিষ্ণুপুরের রাজবংশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তাতে চন্দ্রপ্রভা সম্বন্ধে সামান্য কিছু লেখা হয়েছিল; কিন্তু যা লেখা হয়েছিল সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত ন'ন। দৈনিক আনন্দবাজারেও

কিছুদিন আগে মল্ল-রাজধানী সম্বন্ধে একটি বিবরণ বেরিয়েছিল,— নিজস্ব প্রতিনিধির লেখা। তাতেও চন্দ্রপ্রভা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হয় নি। যাই হোক্, চন্দ্রপ্রভার যে কাহিনী মল্লভূমে বিশেষ ভাবে প্রচলিত সে গল্পই তোমাদের বলছি।

চন্দ্রপ্রভা ছিলেন মেদিনীপুরের ঘাটালের কাছে চোতবরদার জমিদারের মেয়ে। ঐ জমিদারের ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হ'লে মল্লভূমের তখনকার রাজা রঘুনাথ সিংহ চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে আনেন। তার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রপ্রভার পরিচারিকা লালবাঈকেও নিয়ে আসেন নিজের রাজ্যে। লালবাঈ ছিল মুসলমান এবং বিখ্যাত সুন্দরী।

রঘুনাথ সিংহ চন্দ্রপ্রভাকে বিয়ে করে করলেন পাটরাণী। কিন্তু লালবাঈএর অপরূপ রূপ তাঁকে মুগ্ধ করল, তিনি তার জন্য একটি আলাদা প্রাসাদ তৈরী করিয়ে দিলেন। ঐ প্রাসাদের সামনে বাঁধ কেটে বর্ষার জল আটকে এক বিরাট হ্রদের মত জলাশয় তৈরী করা হ'ল। লালবাঈএর নাম থেকে তার নাম রাখা হ'ল 'লালবাঁধ'।

দিন যেতে থাকে। ক্রমে লালবাঈ রাজাকে এমন ভাবে বশ করে ফেলল যে রাজা রাজকার্য্য, পাত্র-মিত্র, পাটরাণী—সব কিছু ছেড়ে লালবাঈএর প্রাসাদেই সমস্তক্ষণ কাটাতে সুরু করলেন। রাজ্যের প্রজারা এতে খুব বিরক্ত হয়ে উঠল।

কিছুদিন পরে শোনা যেতে লাগল রাজা নাকি লালবাঈএর পরামর্শ মত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করবেন বলে ঠিক করেছেন। লালবাঈএর একটি ছেলে ছিল; লালবাঈএর কথামত রাজা ঠিক করলেন এই ছেলের অন্নপ্রাশনে একটা মস্ত ভোজ দেবেন আর তা'তে হিন্দু মুসলমান – সমস্ত প্রজাকে একসঙ্গে খেতে হবে!

দু'শ' বছর আগেকার এই ঘটনা। তখনকার সমাজ এখনকার মত ছিল না। হিন্দুরা ছিল ভীষণ গোঁড়া। অন্য ধর্ম্মের লোকের সঙ্গে একত্র বসে খাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারত না। খেলে জাত যেত। হিন্দু সমাজে আর তাদের স্থান হ'ত না। লালবাঈ এটা জানত, তাই কৌশলে এই উপায়ে রাজ্যশুদ্ধ লোককে মুসলমান করে নেবার মতলব ছিল তার।

এদিকে রাজার এই খামখেয়ালীতে সমস্ত হিন্দু প্রজারা ক্ষেপে উঠল। নিরুপায় হয়ে তারা ছুটল পাটরাণী চন্দ্রপ্রভার কাছে, তিনি যদি তাদের ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারেন।

চন্দ্রপ্রভা বিচলিত হলেন। প্রজারা তাঁর পুত্রতুল্য, আর তিনি নিজেও হিন্দুনারী, এ অনাচার কি করে সহ্য করবেন?

রাণী চন্দ্রপ্রভা রঘুনাথ সিংহকে নানা ভাবে এ আয়োজন বন্ধ করতে নিষেধ করলেন, অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন; কিন্তু রাজা কিছুতেই কোন কথা শুনতে চাইলেন না। লালবাঈএর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য ছিল না তাঁর।

চন্দ্রপ্রভা মহামুস্কিলে পড়লেন। একদিকে রাজ্যশুদ্ধ প্রজার করুণ আবেদন, অন্য দিকে স্বামীর স্বেচ্ছাচার। কিন্তু শেষটায় তিনি ভাবলেন, তিনি সহধর্ম্মিণী, স্বামীকে অধর্ম্ম থেকে রক্ষা করাই সহধর্ম্মিণীর কাজ। আর তিনি রাণী, প্রজাদের মা। প্রজার সুখের জন্য তাঁকে কঠোর হতেই হবে। তিনি তাঁর দেবর গোপাল সিংহকে ডেকে পাঠালেন।

গোপাল সিংহ চন্দ্রপ্রভাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। তা ছাড়া বড়ভাইএর এই অনাচারে—প্রজাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর এত বড় আঘাত হানাতে তিনিও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। পরামর্শ করে ঠিক হ'ল রাজাকে পৃথিবী থেকে না সরালে এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার নেই। অবশেষে তাই করাই স্থির হ'ল, রাণী দেবরকে স্বামীহত্যার আদেশ দিলেন।

গোপাল সিংহ বিশ্বাসী লোকদের সাহায্যে সত্যি সত্যি রাজাকে হত্যা করলেন। তারপর দলমাদল কামান দেগে লালবাঈএর প্রাসাদ উড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু চন্দ্রপ্রভার অবস্থা তখন কল্পনা করতে পার? প্রজার মঙ্গলের জন্য, দেশের ধর্ম্ম বাঁচাবার জন্য তিনি যে পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? ইতিহাসে হয়তো তিনি স্বামীহন্ত্রী পাষণ্ড নারী বলেই চিরকাল পরিচিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু কি অবস্থায় যে তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছে তা যদি তারা জানত!

চন্দ্রপ্রভা শোকে পাগলের মত হয়ে ছুটে এলেন রাজার মৃতদেহের কাছে, তারপর আদেশ দিলেন চিতার চারপাশে তুষের আগুন জ্বালাতে। পাহাড় প্রমাণ তুষ যোগাড় হ'ল। সতী চন্দ্রপ্রভা নির্ভীক্ চিত্তে সেই জ্বলন্ত তুষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন।

আর লালবাঈ? ব্যাপার দেখে সে নাকি পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু উন্মত্ত জনতা তাকে রেহাই দিল না। তাকে বেঁধে ঐ লালবাঁধেরই জলে ডুবিয়ে মারা হ'ল।

বিষ্ণুপুরে এই লালবাঁধ এখনও আছে; আর আছে সেই লালবাঁধের সন্নিকটে, সতী চন্দ্রপ্রভার কথা পথিককে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য,—"পতিঘাতিনী সতীর ঘাট"।

———

রাশিয়ার নেতা ষ্ট্যালিন

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ, বি. এল্

১৯১৭ সাল। বিপ্লবী সাম্যবাদীদের নেতা লেনিন্ চিন্তাভারাক্রান্ত—টাকার যোগাড় নেই, দলের কাজ কি করে হবে! তখনও রাশিয়ায় জারের প্রতাপ—ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশ সহায়ক।

অত্যন্ত সাদাসিধে পোষাক-পরা একটি ভদ্রলোক শুধু বল্লেন, "আমি টাকার যোগাড় করব।"

কয়েকদিন বাদেই খবর পাওয়া গেল যে ৩,৪১,০০০ রুবল্ নিখোঁজ। সেণ্টপিটার্সবার্গ থেকে টিফ্লিসে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে সেই টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন ক্যাশিয়ার কুর্দ্দুমফ। সঙ্গে চারজন সশস্ত্র প্রহরী এবং কোজাকদের দল। লাটপ্রাসাদের কাছাকাছি হ'ল বোমার নিদারুণ আওয়াজ, পাগলের মত ঘোড়ারা দিল লাফ কিন্তু বোমার আঘাতে তাদের জীবনান্ত হ'ল। ছিট্‌কে পড়ল ক্যাশিয়ার গাড়ি থেকে। কোজাক প্রহরীদের বোকা বানিয়ে সরে পড়ল ষ্ট্যালিনের আজ্ঞাবহ কামো পেট্রোসিয়ান্। লেনিনের হাতে পৌঁছল সেই টাকা। ষ্ট্যালিন এর একটি পয়সাতেও হাত ছোঁয়ান নি।

কথা কম বলে শক্ত শক্ত কাজ সুচারু ভাবে করে যাওয়ায় ষ্ট্যালিনের যুড়িদার দুনিয়ায় আর বোধ হয় দেখা যায় নি ইদানীং। তাঁর আচারে ও হাবভাবে এত বেশী সাদাসিধে ভাব ছিল যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রট্‌স্কি বা জিনোভিফ্ গোড়ায় ষ্ট্যালিনকে নিয়ে মাথাই ঘামান নি। কাজের গৌরব জাহির করে বেড়াবার লোক ছিলেন না তিনি। নিঃশব্দে বিরাট বিরাট কাজ করে রাশিয়া ও নিজের ব্যক্তিগত সম্মান দুই-ই ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে রেখে দিয়ে গেছেন ককেশাসের সামান্য মুচির ছেলে এই ষ্ট্যালিন্।

২১শে ডিসেম্বর, ১৮৭৯ সালে ষ্ট্যালিন জন্মগ্রহণ করেন জর্জিয়ার টিফ্লিস্ প্রদেশের অন্তর্গত গাউ বলে ছোট একটি সহরে। জোসেফ ভিসারিয়োনোভিচ্ ষ্ট্যালিনের বাপ ভিসারিয়ানো আইভানোভিচ্ জুগাশভিলি ছিলেন ব্যবসায়ে মুচি,—কিছুদিন টিফ্লিসে জুতোর কারখানায়ও তিনি কাজ করেছিলেন। ষ্ট্যালিন-জননী ছিলেন চাষীর মেয়ে।

এ থেকেই বুঝতে পারছ যে ইংরেজিতে যে বলে রূপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মানো—ষ্ট্যালিনের সে সুযোগ হয় নি!

ষ্ট্যালিন কিছুদিন ধর্ম্ম বিষয়ে লেখাপড়ার পর রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। যেখানে ধর্ম্ম অধ্যয়ন করতেন সেখান থেকে বিতাড়িত হলেন তাঁর রাজনীতির দিকে নতুন ঝোঁকের ফলে। ১৮৯৮ সালেই তিনি রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন—যার ফলে ধর্ম্ম-অধ্যাপকরা তাঁকে তাড়িয়ে দেন। এর পর সুরু হ'ল লেনিনের শিষ্যত্ব। তবে তিনি লেনিনের অনুরাগী হলেও তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব শুধু শিষ্যত্বেই নির্ব্বাপিত করেন নি। গুরুর মন্ত্রে পথ পেয়েছিলেন হয়ত, কিন্তু তাঁর জীবনের ইতিহাস তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বেই দেদীপ্যমান।

১৯০০-১৯০১ সালে ষ্ট্যালিন কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে শ্রমিক আন্দোলনে কাজ করে যেতেন। গুপ্ত ভাবে কাজ করলেও ১৯০১ সালে টিফ্লিস্ রেলওয়ে ধর্ম্মঘটীদের শোভাযাত্রার আগে ছিলেন ষ্ট্যালিন। পুলিশ কর্ম্মচারী যখন ছত্রভঙ্গ হবার হুকুম দিলেন ষ্ট্যালিন নির্ভীক্‌ভাবে উত্তর দিলেন যে তাঁরা ভয় পেয়ে ভেঙ্গে যেতে রাজী ন'ন, দাবী পূর্ণ হলে তবেই ছত্রভঙ্গ হবার কথা উঠতে পারে। যেমন আমাদের দেশেও এ ক্ষেত্রে হয়,—পুলিশ শোভাযাত্রার উপর হ'ল চড়াও, কাজেই শোভাযাত্রা ভেঙ্গে গেল। কর্ত্তৃপক্ষ এবার আরো কঠোর হয়ে উঠলেন। ষ্ট্যালিনকে এ সময়ে মহামুস্কিলের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল। তাঁর পেছনে সর্ব্বদাই পুলিশ। একবার ত' ভাগ্যের জোরে ভুট্টার ক্ষেতে লুকিয়ে থেকে পরিত্রাণ পান। সেখানে আলাপ হয় চাষী কাসিমের সঙ্গে। তারই বাড়িতে গুপ্ত ছাপাখানার কাজ চলে। কাসিমের মাথায় তরকারীর ঝুড়ি। সহরে পৌঁছলে সেই 'রাশিয়ান শিবাজীর' ঝুড়ি থেকে বেরোত সব ইস্তাহার ও প্রচার-কাগজ। যখন ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লব জয়যুক্ত হয় কাসিম তার ছেলেকে ছাপাখানা খুঁড়ে দেখিয়ে নাকি বলেছিল, "এখানেই—এই ছোট যন্ত্রটাতেই বিপ্লবের আরম্ভ।"

১৯০২ সালে ষ্ট্যালিন তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে বসে ধূমপান করছেম এমন সময় পুলিশ তাঁকে করল ঘেরাও। বলা বাহুল্য রুশ সরকার তাঁকে খাতির করলেন না। বাটুম্ ও কুটাইস্ জেলে বছরখানেক কাটাবার পর ফের জেলে জেলকর্ম্মীদের ধর্ম্মঘটে নেতৃত্বের ফলে তাঁকে যেতে হ'ল ফলভোগ করতে হিমশীতল সাইবেরিয়ার ইরখুটস্কে। কয়েক মাসের মধ্যেই দুঃসাহসী ষ্ট্যালিন পালালেন বাটুমের দিকে।

শোনা যায় তিনি ক্ষয়রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। একদিন নাকি তিনি

খোলা জায়গায় তুষার-ঝড়ের ভিতর পড়ে যান। ষ্ট্যালিন আর পাঁচজনের মত বরফের নীচে শুয়ে আত্মরক্ষা না করে জমাট নদীর উপর দু' মাইল অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন ক্লান্ত দেহে বরফে ঢাকা অবস্থায় তিনি একটি কুটীরের কাছে পৌঁছলেন তাঁকে প্রথমটা মানুষ বলে চেনাই দুঃসাধ্য হ'ল। ষ্ট্যালিনের তখন চেতনা নেই। যাই হোক, সেখানকার শুশ্রূষায় তিনি ভাল হয়ে উঠলেন এবং ক্ষয়-রোগও নাকি চিরদিনের জন্য সেরে গেল। শোনা যায় যে সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীতে যদি ক্ষয়রোগীর মৃত্যু না হয় তবে সে একেবারে ভাল হয়ে যায়।' জানি না এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিনা।

এরপর ১৯০৫ সালে হ'ল বিদ্রোহ। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দল দু' ভাগ হয়ে গেল— বলশেভিক ও মেনশেভিক - চরম ও নরমপন্থী। বলা বাহুল্য এঁদের অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টা সত্বেও সেই বিদ্রোহ ফলপ্রসূ হ'ল না। এ সময় থেকে ১৯১৩ পর্য্যন্ত ষ্ট্যালিন ধরা পড়লেন সাত বার আর পালালেন ছ'বার। আর এরই ভেতর চল্‌ল তাঁর বলশেভিক্ দল গঠন আর নানা বই লেখা, যেমন—"মার্ক সিজ্‌ম্ ও জাতীয় প্রশ্ন" ইত্যাদি। ১৯১৩ সালে সপ্তম বার ধৃত হয়ে সাইবেরিয়ার এক সুদূর গ্রামে নির্ব্বাসিত হলেন। সেই তিন বছর তাঁর কাটল অতি কষ্টের জীবন।

১৯১৭ সালে মার্চ মাসে জার-তন্ত্রের পরাজয় হ'ল এবং ষ্ট্যালিন ফিরে এলেন সেন্টপিটার্সবার্গে। এসে সুরু করলেন "প্রাভদা" কাগজ সম্পাদনা। এরপর অক্টোবরের বিপ্লবে লেনিনের সাথে হাত মিলিয়ে ষ্ট্যালিন আনলেন রাশিয়ায় পূরো সোভিয়েট কর্ত্তৃত্ব। ষ্ট্যালিন 'রেড আর্মি' বা 'লাল ফৌজ'কে (বলশেভিক্ সৈন্যদল) গড়ে তুললেন শক্ত করে। কেরেনস্কির নেতৃত্বে চালিত মেন্‌শেভিক্‌রা হ'ল সম্পূর্ণ পরাজিত।

এরপর সুরু হ'ল দেশ গড়ে তোলার কাজ। লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিনকে নিতে হ'ল রাষ্ট্রকে তিলে তিলে গড়ে তোলার দায়িত্ব। বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শক্ত করে গড়ে তুলতে হ'ল দেশকে। যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, কৃষি, বিজ্ঞান এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করে তুললেন অতি সুষ্ঠুভাবে—এবং কখনও বা নির্ম্মম ভাবেও। চাষীদের দল বেঁধে চাষ করতে শেখান হ'ল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোকে পূরোপূরি কাজে লাগিয়ে নিন্দুকের মুখ বন্ধ করলেন।

তারপর এল বিরাট বিশ্বযুদ্ধ। তোমরা জান যে কি বিরাট জার্ম্মান্ আক্রমণ প্রতিহত করেছিল রাশিয়ানরা! দেশপ্রেমের বর্ম্ম পরে এবং পাল্টা আক্রমণে বিরাট জার্ম্মান্ জাতিকে কেমন নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল তারা!

রাজনীতির মতামত যাই হোক্ না কেন, ষ্ট্যালিনের নাম থাকবে ইতিহাসে সম্পূর্ণ সার্থক মানুষ হিসেবে—যে সৌভাগ্য নেপোলিয়ান্ বা হিট্‌লারের হ'ল না; যদিও, চিন্তা করলে, তাঁদের ব্যক্তিত্ব বা কর্ম্মকুশলতাও বিরাট পাহাড়ের মত।

লোহার মানুষ ষ্ট্যালিন কাজের সময় বাজে জিনিষ পছন্দ করতেন না। গল্প আছে, এক আলোচনা-সভায় কেউ তার ছোট ছেলেকে নিয়ে বসেছিলেন এবং ষ্ট্যালিন নাকি ছেলেটিকে কোলে করে বাইরে রেখে এসে যা বললেন, তা ইংরেজী করে বললে হয়, "দিস্ ইজ্ নট্ ইন্ এজেণ্ডা" (সভার কার্য্যসূচীতে এ নেই)।

কিন্তু কঠোর ষ্ট্যালিনের ভেতর নাকি এক অতি মধুর মানুষও ছিল এবং যখন নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা সুরু করতেন তখন ষ্ট্যালিনের উচ্ছল হাসিতে ও রসাল ঠাট্টায় ঘর ঝম্‌ঝম্ করে উঠত। প্রাণ খুলে আড্ডা যখন তিনি দিতেন সে ষ্ট্যালিনে আর কর্ম্মকঠোর ষ্ট্যালিনে ছিল সম্পূর্ণ তফাৎ। দুটো রূপই সত্য।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

ফার্ণের গল্প

নন্তুর দাদার গাছপালার ভারী সখ, কিন্তু তাদের বাড়ীতে একটুও ফাঁকা জায়গা নেই। নন্তুর দাদা তাই কতকগুলো টব কিনে এনে ছাদের ওপর ছোট্ট একটা ফুলের বাগান তৈরী করেছেন। নন্তুও রোজ সকালে দাদার সঙ্গে টবের গাছগুলিতে জল দেয়।

সেদিন নন্তুর দাদা কোথা থেকে একটা নতুন ধরণের গাছ নিয়ে এলেন। গাছে ফুল

নেই, কিন্তু পাতাগুলো দেখতে এমন সুন্দর আর গাছের গায়ে এমন কায়দা করে সাজান যে দেখলে অবাক্ লাগে। এক একটা ডাল যেন এক-একটা পাখীর পালক।

"এ কি গাছ এনেছ দাদা ?"—নন্তু সহর্ষে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

দাদা হাসতে হাসতে বললেন, "চিনিস না ? এগুলোকে বলে ফার্ণ। খুব বনেদী গাছ।"

"বনেদী মানে ? খুব বনেদী পরিবারের লোকেরা বুঝি এ সব গাছ লাগায় ?"

দাদা তেমনি হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক তা নয়, মানুষের বেলায় যেমন খুব প্রাচীন বড় বংশের ছেলেদের আমরা বলি বনেদী পরিবারের ছেলে, তেমনি এই ফার্ণ গাছেরাও আদ্যিকালের খুব নাম-করা গাছের বংশধর। পৃথিবীতে এমন দিনও গেছে যেদিন গাছ বলতে ধরতে গেলে এই ফার্ণকেই বোঝাত। তবে সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখন পৃথিবীতে মানুষ জন্মায় নি। সেকালকার সেই অতিকায় সরীসৃপরা তখন পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করত।"

নন্তু তো শুনে অবাক্।

সেকালকার অতিকায় ফার্ণ

বাস্তবিক ফার্ণ গাছ অত্যন্ত আদিম জাতের গাছ। অবশ্য সেকালকার অনেক ফার্ণই আজকাল পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। এখন বড় জাতের ফার্ণ বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু সেকালের ফার্ণ আকারে হ'ত বিরাট বিরাট, আর বাহারেও হ'ত তেমনি। লম্বায় তাল গাছ, নারকেল গাছের মত ফার্ণ হামেশাই দেখা যেত। তাদেরও ফুল-ফল ছিল না, কিন্তু পাতার বাহার ছিল চমৎকার। তোমরা নিশ্চয়ই জান কয়লার উৎপত্তি হচ্ছে গাছ থেকে। লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার বন-জঙ্গল মাটীর তলায় চাপা পড়ে ক্রমে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এ রকম কয়লার খনি তোমরা অনেক দেখে থাকবে। এই সব কয়লার অনেকগুলিই ফার্ণ জাতীয় গাছ থেকে হয়েছে। এখনও মাঝে মাঝে কয়লার গায়ে তাদের পাতার ছাপ চোখে পড়ে।

অবশ্য বড় জাতের ফার্ণ যে এখনও একেবারেই হয় না এ কথা বলা যায় না। 'ট্রী-ফার্ণ' বা 'বৃক্ষ-ফার্ণ' নামে এক জাতের ফার্ণ এখনও পৃথিবীর নানা জায়গায় হয়। আমাদের দার্জ্জিলিং, সিকিম প্রভৃতি অঞ্চলেও এই বৃক্ষ-ফার্ণের জঙ্গল দেখা যায়। সাধারণ বৃক্ষের মতই এদের কাণ্ড ঠেলে ওপরে ওঠে, আর এক-একটা গাছ লম্বায় ২০।২৫ ফুট থেকে ৬০।৭০ ফুট পর্য্যন্ত হতে পারে।

ফার্ণ গাছ প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মাতে পারে। সুদুর্গম পাহাড়ের চূড়া থেকে সুরু করে গহন অরণ্য, এমন কি সমুদ্রের বেলাভূমিতেও ফার্ণ দেখতে পাওয়া যায়। তবে অপেক্ষাকৃত গরম দেশেই এদের প্রাচুর্য্য বেশী। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর ফার্ণ দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় হাজার হাজার জাতের ফার্ণ আছে। সমস্ত পৃথিবীতে আছে নাকি প্রায় ৮০০০ জাতের। আমাদের দেশের ঢেঁকী শাকও আসলে ফার্ণ, তা জান কি ?

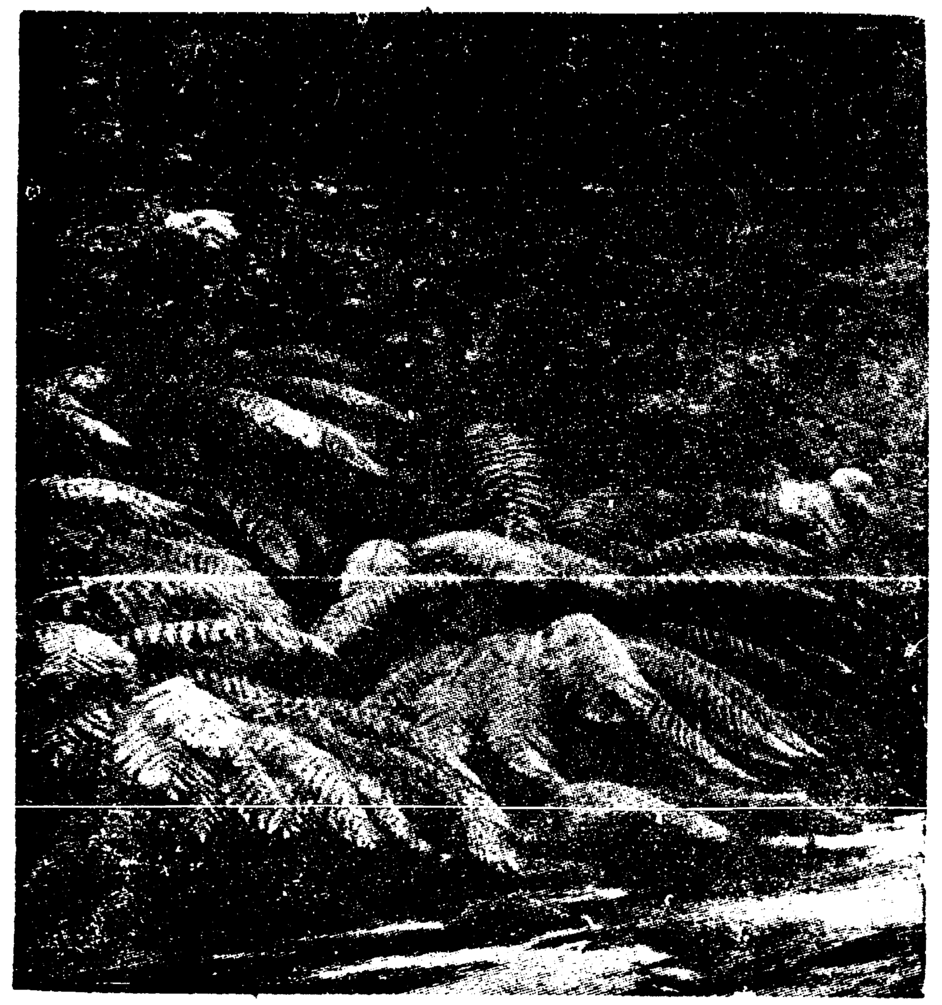
ফার্ণের জঙ্গল

কোন কোন জাতের ফার্ণ খুব দুষ্প্রাপ্য। আজকাল ইয়োরোপ, আমেরিকায় অনেক ধনী লোক সখ হিসাবে ফার্ণের চাষ করেন, যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি 'হবি'। তেমন তেমন দুষ্প্রাপ্য ফার্ণের জন্য এঁরা হাজার হাজার টাকা—এমন কি অবিশ্বাস্য পরিমাণ টাকা খরচ করতেও পিছ-পা হ'ন না। ইংলণ্ডের জলবায়ুতে ফার্ণ ভাল হয় না, সেজন্য সেখানে 'হট্ হাউস' তৈরী করে কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে ফার্ণের চাষ করার রেওয়াজ হয়েছে। সে দেশে অনেক নার্সারী এই ফার্ণের ব্যবসা করে একেবারে 'লাল' হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের কাছেও কোন কোন জাতের ফার্ণের খুব কদর।

আমেরিকার সাধারণ লোকও খুব ফার্ণ ভালবাসে। সেখানে একটা কথা চলতি আছে,—ছাদের কোণায় টবে লাগান ফার্ণের একটা ভাঙ্গা ডাল দেখলেও নাকি সুদূর রকি পর্ব্বতমালার কথা মনে পড়ে যায়।

নাম কি ক'রে এল

প্রত্যেক নামেরই কিছু না কিছু অর্থ আছে, এবং কোন কোনটার পেছনে আছে ইতিহাস, প্রবাদ বা কোন পৌরাণিক ঘটনা। এগুলি জানতে পারলে ভারী মজা লাগে। কয়েকটি শোন :

উমা—উমা হচ্ছে পার্ব্বতীর নাম। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, তার পর শিবকে স্বামী রূপে পাবার জন্য অতি অল্প বয়সেই সুরু করলেন তপস্যা। তখন তাঁর মা মেনকা তাঁকে তপস্যা করতে নিষেধ ক'রে বলতেন, 'উ' (হে পার্ব্বতী), মা (না, অর্থাৎ তপস্যা ক'র না)। বার বার ঐ রকম বলতে বলতে পার্ব্বতীর নামই হয়ে গেল 'উমা'। মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবেও উমা নামের উৎপত্তির এই কাহিনীটি আছে।

কোজাগর—শরৎকালে দুর্গাপূজার পর যে পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা হয় তাকে বলা হয় কোজাগর বা কোজাগরী পূর্ণিমা। কথাটা এসেছে 'কঃ জাগর'?—'কে জেগে আছে?' এই থেকে। পুরাণে বলে, ঐ দিন রাত্রে লক্ষ্মী দেবী এসে বলেন, "কে জেগে আছ, তাকে আমি ধন দেব।" এইজন্যই কোজাগরী পূর্ণিমার দিন রাত জাগার প্রথা আছে।

পুত্র—পুত্র হচ্ছে ছেলে। কিন্তু এই নামেরও উৎপত্তি পৌরাণিক ধারণা থেকে। 'পুন্নাম' অর্থাৎ 'পুৎ' নামে যে নরক আছে মৃত্যুর পর সবাইকে সেখানে যেতে হয়; আর এই নরক থেকে উদ্ধার করতে পারে শুধু বংশধর অর্থাৎ ছেলে। পুৎ নরক থেকে ত্রাণ করে বলেই ছেলেকে বলা হয় পুত্র।

বৈঠকখানা—বাড়ীর বৈঠকখানা নয়, কলকাতা সহরে এই নামে একটি পাড়া, একটি রাস্তা এবং বিখ্যাত একটি বাজার আছে। কলকাতার স্থাপয়িতা জব্ চার্ণক থাকতেন বারাকপুরে। তিনি কলকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর গ্রাম বাদশাহের কাছ থেকে ইজারা নেন। প্রত্যহ পালকী করে বারাকপুর থেকে তিনি কলকাতায় আসতেন, এবং পথের মধ্যে রোজই একটি ছায়া-শীতল জায়গায় পাল্কী নামিয়ে বিশ্রাম করতেন। সঙ্গীদের সঙ্গে এইখানে বসে তাঁর নানা আলোচনা হ'ত। সেই থেকে ঐ জায়গার নাম হয়ে যায় বৈঠকখানা। আজও জায়গাটি সেই নামেই পরিচিত।

দি য়্যাশেস—ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে বিখ্যাত ক্রিকেট টেষ্ট খেলা হয় তারই কাপের নাম 'দি য়্যাশেস্' অর্থাৎ 'ভস্ম'। এই নামটির উৎপত্তি হয়েছে প্রায় ৭০ বছর আগে। ১৮৮২ সনে ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডকে ভীষণ ভাবে হারিয়ে দিয়ে কাপ নিয়ে চলে যাওয়ায় বিলেতের 'স্পোর্টিং টাইম্‌স্' নামে একখানা নাম-করা পত্রিকা ঠাট্টা করে লেখে—"ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটের মৃত্যু হয়েছে। তাকে দাহ করে তার চিতাভস্ম এবার অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" সেই থেকে টেষ্ট খেলার বিজয়সূচক কাপেরই নাম হ'য়ে যায় 'দি য়্যাশেস্' বা 'ভস্ম'।

মানে জান ?

নীচের শব্দগুলির ব্যবহার অনেক সময়েই হয়তো দেখেছ। ওদের ঠিক ঠিক মানে জান? বল দেখি কোন্‌টা ঠিক। পাশে নম্বর দেওয়া রইল।

ক। প্রজাপতি—(১) ব্রহ্মা (২) বিষ্ণু (৩) মহেশ্বর (৪) এক রকম পতঙ্গ।
খ। বিশ্বক্‌সেন—(১) একজন বড় দিগ্বিজয়ী (২) মুনি বিশেষ (৩) শ্রীকৃষ্ণ (৪) ক্ষত্রিয়।
গ। নেমি—(১) অসুর (২) রথের চাকা (৩) চাকার পরিধি বা প্রান্ত (৪) তীর্থস্থান।
ঘ। তক্র—(১) জলজন্তু (২) ঘোল (৩) সাপ (৪) বটের আঠা।
ঙ। নক্র—(১) কুমীর (২) দুধ (৩) জলজন্তু (৪) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
চ। কম্বু—(১) এক রকম পাখী (২) বজ্র (৩) মেঘ (৪) শঙ্খ।
ছ। আলাবু—(১) তামাক (২) লেবু (৩) লাউ (৪) পারস্যের জমিদার।
জ। বার্ত্তাকু—(১) খবর (২) খবরের কাগজ (৩) বাতাস (৪) বেগুন।

ঠিক উত্তর—ক—১, ৪; খ—৩; গ—৩; ঘ—২; ঙ—১, ৩; চ—৪; ছ—৩; জ—৪।

ভাবীসাহিত্যিকের বৈঠক

সোনা ঘুমা'ল

শ্রীসুচেতা ভট্টাচার্য্য

সোনা ঘুমা'ল মায়ের পাশে—
রাত্রি হ'ল ওই,
চাঁদ যে এসে ডাকছে সোনায়—
'মুখটি তোমার কই ?
একটুখানি মুখটি তোল,
টিপ পরিয়ে দি,
মিষ্টি-মাখা মুখ যে এমন
কোথাও দেখি নি!'
মুখ তুলিতে সোনামণি
টিপ পরাল চাঁদ,
ছুট্টে শেষে পালিয়ে গেল
পেরিয়ে মেঘের ফাঁদ।
সকাল বেলা অবাক্ যে মা
সোনার পানে চেয়ে—
চাঁদের হাসিই উছলে পড়ে
গাল দু'খানি বেয়ে।

শীতের শেষে

শ্রীমুরারিমোহন বিট্

শীতের শেষে জাগলো সাড়া ফুলের বনে বনে;
যূঁই, মালতী, টগর, বেলী,
হাস্‌লো সুখে দুঃখ ফেলি;
হিমের কণা বিদায় নিলো বিরস হৃদি-মনে।
দোয়েল-শ্যামা গাছের সাথে গাইছে কি গান বল্?
মৌমাছি-দল গুন্‌গুনিয়ে
যায় হরষে গান শুনিয়ে;
বকুল-ডালে কোকিল-বধূ গাইছে অবিরল।
সোনার গুঁড়ো ছড়ায় ওকে সর্ষে ক্ষেতে ক্ষেতে?
রক্ত-ঝরা শিমুল গাছে
শালিক-ছানা কেমন নাচে;
দীঘির জলে পদ্ম-আসন কে দিয়েছে পেতে?

বসন্ত আসে ফিরে

শ্রীঅমিয়কুমার সামন্ত

শীতের জড়তা কাটিয়া গিয়াছে আজ,
বরষের পরে বসন্ত আসে ফিরে,
ধূলির ধরণী পরেছে নূতন সাজ,—
বনে বনে তাই ফুল ফোটে ধীরে ধীরে।
কচি কচি পাতা দুলিছে আপন মনে—
মৃদুল বাতাসে সারাদিন করে খেলা,
রং-বেরংয়ের ফুল ফোটে বনে বনে,
পলাশের ডালে যেন আগুনের মেলা!
রাখালের বাঁশী গাছের শীতল-ছায়
সারাদিন ধরি বাজিছে উদাস সুরে,
গাছের আড়ালে বসিয়া কোকিল গায়,
কণ্ঠ তাহার যায় দূর হতে দূরে॥
দখিনা বাতাসে শিহরণ জাগে মনে,
ফুলের গন্ধে পুলকিত সদা প্রাণ;
বসন্ত আসে পৃথিবীর বনে-মনে,
আপনারে যেন নিঃশেষে করি' দান।

মাঘ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

সব চেয়ে ভাল লেখার জন্য পুরস্কার পেলেন—শ্রীকমলা দাশগুপ্তা (কলিকাতা-৩৩)। আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে:—শ্রীমনিময় মজুমদার (গৈচী), শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর), শ্রীনন্দিনী বসু (লক্ষ্ণৌ), শ্রীমিহির দাশগুপ্ত (জামসেদপুর), শ্রীরেবা রায় (কলিকাতা-৭)।

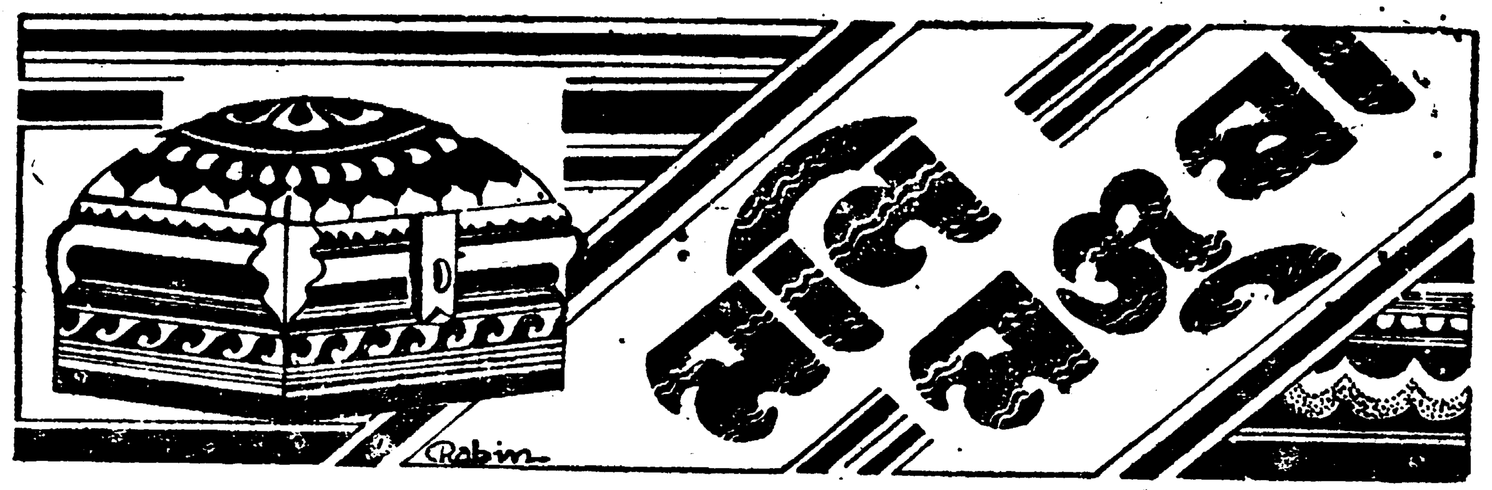

পোড়া মহেশ্বর

পোড়া মহেশ্বরের কাহিনী ছোট্ট একটি উপন্যাসের আকারে লিখে গেছেন ৺দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু মিত্র নাট্যকার হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। গল্প বা উপন্যাসের সংখ্যা তাঁর খুবই কম। চাগদা রেল ষ্টেশন থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে সরাবপুর গ্রাম। এই গ্রামেরই এক প্রান্তে পোড়া মহেশ্বরের (শিব) মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বিরাট শিবলিঙ্গ, কিন্তু শিবের মাথার একটা দিক্ ভাঙ্গা। কি ক'রে ভাঙ্গল তাই নিয়ে ঐ অঞ্চলে একটা মজার কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। সেই কিম্বদন্তী অবলম্বন করেই এই ছোট উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল। এখানে তার গল্পাংশ দেওয়া হ'ল।

* * *

পোড়া মহেশ্বরের মাথার ভিতর লুকোনো ছিল একটা স্পর্শমণি, কেউ তা জানত না। শুধু জানতেন এক সন্ন্যাসী। একদিন সেই সন্ন্যাসী ঘুরতে ঘুরতে ঐ গ্রামে এসে হাজির হ'লেন, তার পর মন্দিরের সামনে এক অশথ গাছের তলায় আস্তানা গাড়লেন। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ দেহ, প্রশান্ত চেহারা, ধপধপে সাদা চুল-দাড়ি দেখে গ্রামের লোকেরা তাঁর প্রতি খুব আকৃষ্ট হ'ল। কিন্তু সন্ন্যাসী মৌনব্রতী, কারও সঙ্গে কোন কথা বলেন না। দেখতে দেখতে তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম গল্প ও গুজব মুখে মুখে রচিত হয়ে উঠল।

একদিন তুপুর বেলা নির্জন মন্দিরের ভিতর থেকে চীৎকার শোনা গেল, "কে কোথায় আছ, গ্রামবাসীরা, মন্দিরে এস। পাগল সন্ন্যাসী আমাকে আগুন দিয়ে পোড়াচ্ছে।"

চীৎকার শুনে সবাই ছুটে এসে দেখে, মন্দিরে আর কেউ নেই, শুধু সেই সন্ন্যাসী চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে বসে ঐ রকম চীৎকার করছেন। কেন ঐ রকম করছেন জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না।

পর দিনও ঐ রকম ব্যাপার। ঠিক তুপুর বেলা সন্ন্যাসী আবার ঐ ভাবে চীৎকার করতে সুরু করলেন। আজও গ্রামের লোকেরা এসে হতাশ হয়ে ফিরে

গেল। এই রকম রোজই চলতে লাগল। শেষে গ্রামের লোকেরা আর ব্যাপারটায় কোন গুরুত্ব দিত না, চীৎকার সুরু হলেই বলত, "ঐ,—ঐ সেই পাগল সন্ন্যাসীটা চেঁচাচ্ছে।"

এই ভাবে কিছু দিন কাটলে পর যখন সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন যে কেউ আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না তখন তিনি কতকগুলি কাঠ-খড় এনে সত্যি সত্যি মন্দিরের শিবমূর্ত্তির চারদিকে পাঁজা করে সাজালেন। তার পর তার মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিলেন। পাথরের শিবমূর্ত্তি দেখতে দেখতে আগুনের বেড়াজালে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তখন সেই মূর্ত্তির ভিতর থেকে মহাদেব চীৎকার সুরু করলেন—"কে কোথায় আছ, গ্রামবাসীরা, শীগ্‌গির এস। পাগল সন্ন্যাসী আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারল।" কিন্তু, অনেকটা কথামালার সেই রাখাল আর বাঘের গল্পের মতই, আজ আর কেউ সে ডাক শুনে এল না। সকলেই মনে করল, সন্ন্যাসীই ক্ষেপে গিয়ে আগের মত চেঁচাচ্ছে।

দেখতে দেখতে প্রবল আগুনের তাপে শিবলিঙ্গের মাথা ফেটে তু'ভাগ হয়ে গেল. আর তার ভিতর থেকে সেই স্পর্শমণি ছিটকে বেরিয়ে এসে পড়ল সামনের ধানক্ষেতে। অমনি সেখানে একটা হ্রদ হয়ে গেল, আর মণি চলে গেল সেই হ্রদের জলের নীচে।

সন্ন্যাসী কিন্তু দমলেন না। তিনি সেই হ্রদের জল সেঁচতে আরম্ভ করলেন, এবং রাতারাতি সমস্ত জল সেঁচে মণি বার করে ফেললেন। তারপর সন্ন্যাসী মণি নিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন গ্রামের লোক এসে দেখে সত্যি সত্যি শিবমূর্ত্তির মাথা পুড়ে ফেটে গেছে, সন্ন্যাসীও উধাও। সেই থেকে ঐ মূর্ত্তির নাম হ'ল "পোড়া মহেশ্বর"।

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। এই রজত-জয়ন্তী বছরে তোমাদের সকলের কাছ থেকে যে শুভেচ্ছা—যে সহযোগিতা পেয়েছি তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সুযোগে রামধনুর অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদেরকেও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নতুন বছরের রামধনু কেমন হবে তা নিয়ে অনেকেই কৌতূহল দেখিয়েছ। কি রকম হবে তা তো কাগজ বেরোলেই দেখতে পাবে। তবে এটুকু বলতে পারি, রামধনুর মান যাতে অক্ষুন্ন থাকে এবং উন্নত হয় সে বিষয়ে চেষ্টার ক্রুটী হবে না। শ্রেষ্ঠ লেখকদের সহযোগিতা থেকে এ বছরও রামধনু বঞ্চিত থাকবে না। তা ছাড়া আসছে বছর রামধনু যাতে মাসের আরও গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখার আয়োজন করছি আমরা। তোমাদের ভালবাসাই হবে রামধনুর পাথেয়।

এবারে ব্যক্তিগত চিঠির জবাব দেই। শ্রীতুষারকান্তি চাকী (আগমনী)—"জয়ন্তী রামধনু" আগামী বছর আর্থাৎ ১৩৬০ সালে বেরোবে তা তো আগেই শুনেছ। রামধনু পেয়ে তোমরা যেমন খুসী হয়েছ লিখেছ, তোমরা তিন ভাইবোনই এবারে ক্লাসে প্রথম হয়েছ জেনে আমরাও তেমনি খুসী হয়েছি। শ্রীপ্রতিমা দত্ত (ভারওয়েলি)—এর আগে তোমার চিঠির জবাব পাও নি জেনে লজ্জিত হ'লাম। অনেক—অনেক চিঠি এসে জমে যায়, তাই জবাব দিতে সময় সময় দেরী হয়ে যায়। শুধু বাছাই-করা গ্রাহক-গ্রাহিকার চিঠির জবাব দেওয়া হয় এ ধারণা ভুল। তোমার অনুরোধ মত কয়েকটি লেখনী-বন্ধুর নাম পৃথক ভাবে পাঠানো হ'ল। তোমার "উদাসী মন" কিন্তু ছোটদের পক্ষে বড় গুরুগম্ভীর হয়ে গেছে। তুমি বোধ হয় এখন থেকেই মস্ত দার্শনিক হয়ে পড়েছ! ছন্দের দিকে আরও নজর দেবে। শ্রীমালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ)—প্রশ্নের জন্য আবার অপরাধ হয় নাকি? খটকা লাগলে জিজ্ঞাসা করবেই তো! তবে এমন প্রশ্ন করলে ভাল হয় যার উত্তর রামধনুর সব পাঠক-পাঠিকারাই উপভোগ করতে পারে। শ্রীনির্ম্মলেন্দু সরকার (ভাগলপুর)—আই. এ. পরীক্ষার পর এখন তো অখণ্ড অবসর। এখন কার্য্যসূচী কি? শ্রীমানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (আগরতলা)—মহাকালের পূজারী, বকধার্মিক এবং যাঁদের লেখা তোমরা পড়—তিনটেই তোমাকে মুগ্ধ করেছে? জেনে খুব ভাল লাগল। হ্যাঁ, 'ফুলের মূল্যই' 'দি ব্ল্যাক টিউলিপ' অর্থাৎ ওর আসল নামে পুস্তকাকারে বেরিয়েছে। 'রাধামাধবের রত্নহার' এখনও বেরোয় নি। পুরোনো রামধনুর মধ্যে ১ম, ৩য়, ১১শ, ১২শ বর্ষ বাঁধান পাওয়া যায়। দাম তিন টাকা করে। আর তার পরের অন্যান্য বছরের সংখ্যাগুলো খুচরো পাওয়া যায়—পূরো সেট চার টাকা করে। তবে কোন কোন বছরের কোন কোন সংখ্যা নাও থাকতে পারে। কোন্ কোন্টা চাই জানালে খুঁজে দেখা যাবে। শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী)—তুমি এবারে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এড্ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান (২য় শ্রেণীতে ১ম) হয়েছ এ খবর রামধনুর সমস্ত পাঠক-পাঠিকাকেই আনন্দ দেবে। 'হকি খেলার গল্প' আগেই ছাপা হয়ে গিয়েছিল।

গত মাসে কয়েকটি মনোনীত কবিতার নাম জানিয়েছিলাম, এবারে আর কয়েকটা দিচ্ছি: তোমাকে—অঞ্জনকুমার দত্ত, পারো—সুব্রত রায়, একটি করুণ কাহিনী—মুরারিমোহন বিট্, শরৎ এল—গৌরকিশোর চৌধুরী, জেনে রাখ—জ্যোৎস্না দাশগুপ্তা, তুমি—আবুল ফজল।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ চিঠি শেষ করি। ইতি —শুভার্থী রাঃ সঃ

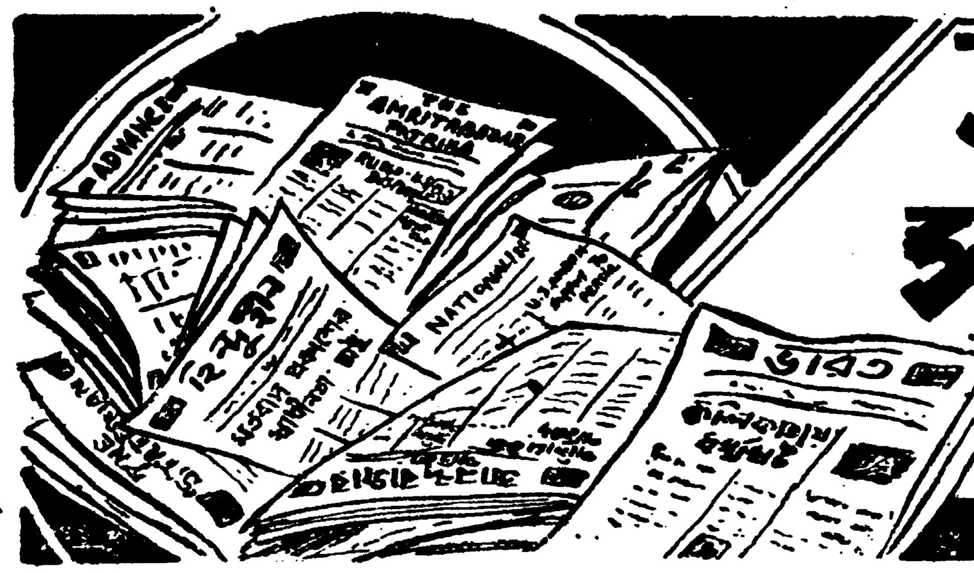

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

পরলোকে স্তালিন

গত ২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ) রাশিয়ার সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা, বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল স্তালিন পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। স্তালিনের মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক এ যুগে অল্পই জন্মেছেন। তাঁকে বলা হ'ত রাশিয়ার লৌহমানব। অনেকটা তাঁরই অতুলনীয় প্রতিভার জন্য সোবিয়েৎ রাশিয়া আজ পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলির একটিতে পরিণত হতে পেরেছে। তাঁর জীবন-কথা অন্যত্র প্রকাশিত হ'ল। স্তালিনের জায়গায় রাশিয়ার নতুন প্রধান মন্ত্রী হলেন মঃ ম্যালেনকভ্।

কলকাতার মেয়র

কলকাতার মেয়র প্রসিদ্ধ সলিসিটর নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তিনি যেমন সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন, তেমনি দেশের কাজেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন প্রচুর। এক সময় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী ছিলেন।

নির্ম্মলচন্দ্রের শূন্যপদে নতুন মেয়র হলেন ডেপুটি মেয়র শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, আর ডেপুটি মেয়র হলেন শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুশেখর বসু।

খেলাধূলার খবর

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ৩য় টেষ্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংস্এ ২৭৯ করলে প্রত্যুত্তরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ করে ৩১৫। উইক্স্ একাই করেন ১৬১ রান্। ২য় ইনিংস্এ ভারতীয় দল ৭ উইকেটে ৩৬২ করে ডিক্লেয়ার করে। আপ্তে একাই করেন ১৬৩, মানকড় করেন ৯৬। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ ২য় ইনিংস্এ ২ উইকেটে ১৯২ করলে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ষ্টলমেয়ার এই ইনিংসে ১০৪ রান্ করেন।

পরবর্ত্তী খেলা বৃষ্টির জন্য শেষ হতে পারে নি, অমীমাংসিত বলে ঘোষিত হয়েছে।

কলকাতার হকি লীগ পূরো দমে চলছে। ১ম বিভাগে কাষ্টম্স্ দলই এখন সকলের ওপরে আছে। তার পর ভবানীপুর রাজস্থান, মোহনবাগান, ইষ্ট বেঙ্গল প্রভৃতি।

জাপানী মল্লবীর ও মুষ্টিযোদ্ধা

সম্প্রতি কয়েকজন জাপানী মল্লবীর ও তার পর কয়েকজন মুষ্টিযোদ্ধা ভারতে এসেছেন। ভারতীয়দের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কুস্তিতে তাঁরা বাংলাকে ৫-২ ম্যাচে হারিয়ে দেন। মুষ্টিযুদ্ধেও একটি ছাড়া সব ক'টিতে বিজয়ী হন।

বাংলা বনাম উর্দ্দু

সম্প্রতি ঢাকা সহরে পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলন সুরু হয়ে হট্টগোলের মত বন্ধ হয়ে গেছে। সভাপতি ডাঃ সৈয়দ সুলেমান নদ্ভি উর্দ্দুর স্বপক্ষে বলতে গিয়ে বাংলা ভাষাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভাষা বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। বলা বাহুল্য পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা—বিশেষতঃ ছাত্রেরা এই অসত্য ভাষণ শুনতে রাজী হন নি। তাঁরা শুধু সভাপতিকে বাধাই দেন নি, শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে দিয়ে লিখিত ভাবে তাঁর উক্তি প্রত্যাহার করিয়েছেন।

মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মরণে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। বিষয় :—"১৩৫৯ সালের রামধনুতে যে সব লেখা বেরিয়েছে তার মধ্যে তোমার কাছে সব চেয়ে ভাল লেগেছে এই রকম ৩টি গল্প, ৩টি কবিতা ও ৩টি প্রবন্ধের নাম লিখে পাঠাও।" সকলের ভোট নিয়ে আমরা একটি তালিকা প্রস্তুত করব এবং যার তালিকা ঐ তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি হবে সেই পাবে পুরস্কার। যে পুরস্কার পাবে তার ছবিও, তার আপত্তি না থাকলে, রামধনুতে বার করা হবে। প্রতিযোগিতার লেখা ১৯শে বৈশাখ, ১৩৬০-এর মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

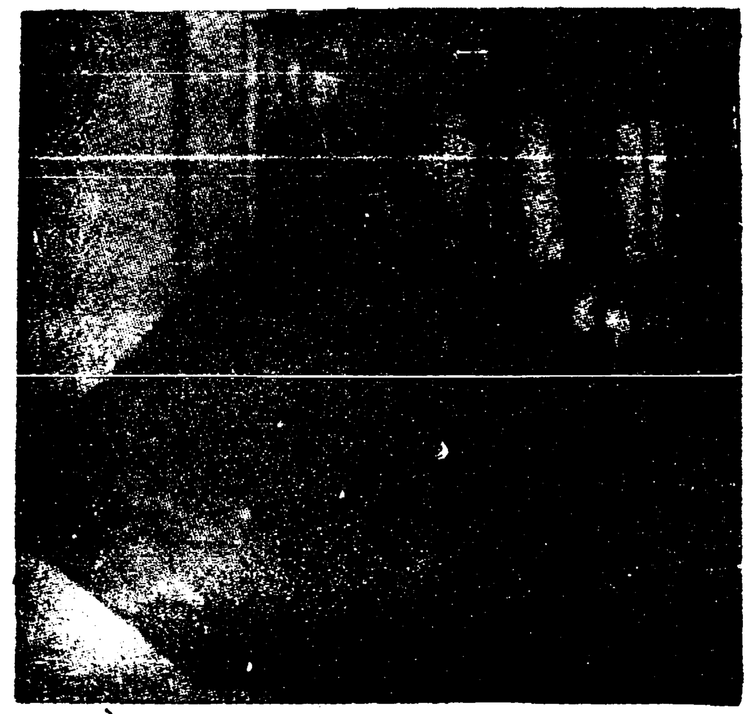

প্রত্যেক লেখার সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে প্রতিযোগীর নাম, ঠিকানা ও বয়স উল্লেখ করতে হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে, এবারে কোন কুপন দরকার হবে না। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১—কপাল, ২—পিলে, ৩—টিকি, ৪—জানু, ৫—পা, ৬—হাড়, ৭—গলা, ৮—গাল, ৯—মাথা, ১০—মস্তক, ১১—নাক, ১২—কান, ১৩—নাই।

উত্তরদাতাদের নাম :—সরিৎকুমার দত্ত (গুড়াপ); যমুনা, শুক্লা, খুকু, জাহ্নবী (মালঞ্চ গ্রন্থাগার—ধুবড়ী); মালবিকা দত্ত, বাপ্পা, গুনুদা, সুবিকাশ, গৌতম, সেজদা (করিমগঞ্জ); ঘোঁতন, ফুলু, অপর্ণা ভট্টাচার্য্য (কাঁচড়াপাড়া); বেণু ঘোষ (কাটিহার); স্বপনকুমার, রথীন্দ্র, রণেন্দ্র, শঙ্করনাথ, মণি (হাজারীবাগ); কমলা চৌধুরী (কলিকাতা-২৯); রমা মৈত্র (দিল্লী); শম্ভুনাথ ঘোষ (পাটনা); স্বতীশ চট্টোপাধ্যায় (বনারস) ; নিতু, সিতু ও রঙিন বসু (কলিকাতা-৬); নন্দা ও সুনন্দা (কলিকাতা-১৯) ; বঙ্কিম শচীন, নিতাই (শিলং) ; অসীমা, গৌতম দা, দিদিমণি বৌদি, ছবি, ও বিদিত (করিমগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

নীচের সংখ্যাগুলির বদলে একটি ক'রে জীবজন্তু, পাখী ইত্যাদির নাম বসাতে পারলে লেখাটা ঠিক মত পড়া যাবে। বসাও দেখি ?—

১ হে, ২া কোথায় ? ৩কা বেড়াতে গেছেন ? তবে যে শুনলাম ময়মন ৪ ? এদিকে গাঁ ৫ না কথা শুনছি যে ! আর ঘাঁ ৬ কাজ নেই। এবার ৭ করে দিতে ৮। ডেকে বললেই হবে, বা৯গুগোল ক'র না। দেখলে তো এক নি ১০এর মধ্যে কি ঘটতে পারে ?

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনামূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ! আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ।৷৹ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১৷৹ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা মাত্র।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১ বি, রসা রোড,
কলিকাতা-২৬।

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি, এ

— পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। —

বিশ্ব পরিচয়

(বা পৃথিবীর ইতিহাস)

পৃথিবীর সকল দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস সহ পাঁচশতাধিক একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে পরিশোভিত প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ ৮৲

সোভিয়েৎ দেশ ১।০

জার্ম্মান দেশ ১।০

শ্রীপ্রভাবতী দেবীর

কৃষ্ণা-সিরিজ

(মেয়েদের অ্যাড্ভেঞ্চার)

প্রথম-গ্রন্থ :—

কারাগারে কৃষ্ণা ১॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

বিচিত্রা-সিরিজ

(ডিটেক্‌টিভ ও অ্যাড্ভেঞ্চার)

প্রথম গ্রন্থ :—

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন ২৲

অনুবাদ সাহিত্য

অলিভার টুইষ্ট	১॥০
ব্ল্যাক অ্যারো	১॥০
ট্রেজার আইল্যাণ্ড	১॥০
টেল্ অব্ টু সিটিজ	১॥০
অ্যাড্ভেঞ্চার অব মার্কো পোলো	১॥০
কাউণ্ট অব মণ্টিক্রুষ্টো	১॥০
ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড	১॥০

শিশু-সাহিত্য

অপরূপকথা	১৲
ঘূর্ণিপাকে	১।০
রঘু সর্দার	১॥০

—শিশু-মাসিক—

শুকতারা

বার্ষিক চার টাকা

প্রতি সংখ্যা ছয় আনা

ফাল্গুনে ষষ্ঠ বর্ষে পড়িল।

SCHOOL FINAL

NOTES

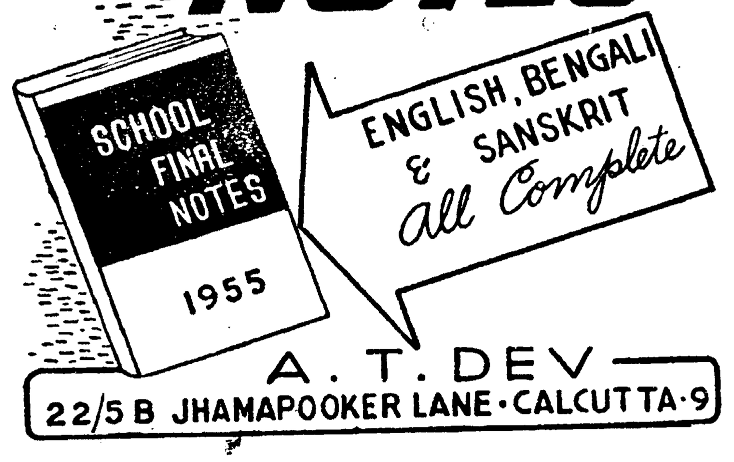

A. T. DEV

22/5 B JHAMAPOOKER LANE · CALCUTTA-9

for 1954 & 1955

English (Prose)	4/-
English (Poetry)	3/-
পাঠ সংকলন	3/-
সংস্কৃত পাঠমালা (গদ্য)	3/-
সংস্কৃত পাঠমালা (পদ্য)	2/-

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

চতুর্দ্দশ গ্রন্থ :—

কমলাকান্তের দপ্তর ১৲

অমর বীর সিরিজ

দশম গ্রন্থ :—

বারীন ঘোষ ॥০

ভ্রমণ, শিকার ও অ্যাডভেঞ্চার

আকাশ গঙ্গা	১॥০
দুর্গমের বিভীষিকা	১৲
সুন্দর বনের শিকারী	১৲
আবার যখের ধন	১।০
হিমালয়ের বুকে	১৲
বামনের দেশ	৸০
দৈত্যপুরী	৸০

শিশুনাটক

সিপাহী বিদ্রোহ	১৲
কেদার রায়	॥৵০
বীর শিবাজী	॥৵০
স্বামীজী	॥৵০
স্বাধীনতা জাগলো	॥০
জাগোরে ধীরে	॥৵০

দেবসাহিত্য কুটীর * * * ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা	১॥০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রংচং	৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অব্ দি মোহিকানস্	॥৵০
অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান)	১॥০

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১॥০
এপ্রিলস্য প্রথম দিবস (শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর সহযোগে)	৸৵০
নূতন পুরাণ	৸৵
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত

অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ও রামধন কার্য্যালয়

রামধনু—

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ

স্কুল-কলেজের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক বিক্রেতা

ফরোয়ার্ড পাবলিশার্স

১৪১।১বি, রসা রোড ('হাজরা পার্কের

বিপরীত দিকে)

কলিকাতা-২৬